প্রকাশক : শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ — ১৯৫৯

মুদ্রাকর : দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা স্ট্রীট, কলি-৬

শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ , পি-এইচ. ডি.,

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণ

সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পটভূমিকায় চারি খণ্ডে পরিকল্পিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এপর্যন্ত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসূরিগণ যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে খ্রীঃ দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, তৃতীয় খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দী এবং চতুর্থ খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আলোচিত হইবে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বহু পুঁথির সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও এশিয়াটিক সোসাইটীর কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার শিক্ষাগুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনুলাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ.. পি-এইচ. ডি. মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে নূতন আলোক লাভ করিয়াছি। হাওড়া গার্লস্ কলেজের সহাধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, এম. এ., কাব্যতীর্থ, সাহিত্যশাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ-আলোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যাদি সম্পর্কে অনেক সন্দেহ নিরসন করিতে পারিয়াছি। তাঁহাদিগকে প্রণিপাত জানাইতেছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এম. এ., ডি. ফিল. মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনখানি ব্লক ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমার প্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীমান্ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপক শ্রীমান পাঁচুগোপাল দত্ত এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীমান্ মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ('শংকর') এই গ্রন্থ মুদ্রিত-আকারে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে এই অবকাশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য, সনতারিখ, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপারে আমার স্ত্রী শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত পুঁথি হইতে আমার নির্দেশমত প্রাসঙ্গিক অংশ সমূহ নকল করিয়া আমার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছেন। ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীর (হাওড়া) কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে একখানি আলোকচিত্র ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। এইজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু, এম. এ., মহাশয়ের সান্নিধ্য ও সাহচর্য ব্যতীত এই বিপুলায়তন গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিত না। তাঁহাকে শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়া বিব্রত করিতে চাহি না।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু মহাশয় ও সুহৃদবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা সাহিত্য বিভাগ,
১৩৬৬ ॥ ১৯৫৯

অ. কু. ব.

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য (১০০-১১৪)

চতুর্থ অধ্যায়ঃ বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষা (১১৬-১৪৪)

পঞ্চম অধ্যায়ঃ চর্যাগীতিকা (১৪৫-২০৪)

দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্‌চৈতন্যযুগ

[খ্রীঃ ১৩শ—১৪৯৩ অব্দ]

ষষ্ঠ অধ্যায় : পটভূমিকা (২২৫-২৫৭)

সপ্তম অধ্যায় : বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা (২৬০-২৭৯)

অষ্টম অধ্যায়ঃ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (২৮০-৩১৪)

নবম অধ্যায়ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপরিচয় (৩১৫-৩৪৮)

দশম অধ্যায়ঃ কবি বিদ্যাপতি (৩৪৯-৩৮৬)

একাদশ অধ্যায়ঃ বিদ্যাপতির পদাবলী পরিচয় (৩৮৭-৪২৩)

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (৪২৪-৪৫৬)

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী (৪৫৭-৫২২)

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ কৃত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (৫২৩-৫৫৬)

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ (৫৫৭-৬১৩)

ষোড়শ অধ্যায়ঃ মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ) শ্রীকৃষ্ণবিজয় (৬১৪-৬৫৬)

পরিশিষ্টঃ দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার (৬৫৭-৬৭১)

চিত্রতালিকা

প্রথম পর্ব ঃ আদিযুগ

খ্রীষ্টীয় দশম—দ্বাদশ অব্দ

প্রথম অধ্যায়

দেশ, কাল ও জনজীবন

সাহিত্য একান্তরূপে মানস-প্রক্রিয়ার বাঙ্‌ময় রূপ হইলেও বস্তুগ্রাহ্য জীবনধারার সহিত তাহার অন্তর্গূঢ় যোগাযোগ রহিয়াছে। আত্মার রূপলাভের জন্য যেমন দেহ-আধারের প্রয়োজন, ঠিক তেমনই সাহিত্যেরও একটা বাস্তব আধার চাই। জাতির ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া সেই আধার গড়িয়া ওঠে; দেশ, কাল ও পাত্রের সহযোগিতায় অনন্ত কালপ্রবাহের কিয়দংশকে খণ্ডিত করিয়া রচিত হয় জাতির কালিক ইতিহাস, আর নরগোষ্ঠীর অযুত চিত্তপ্রবাহের কয়েকটি তরঙ্গভঙ্গ সৃষ্টি করে সাহিত্য, শিল্পকলা,—অধিমানসের বিচিত্র বিস্ময়। দেশে-কালে পরিব্যাপ্ত জনজীবনের ধারা-উপধারার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উচ্চাবচতা পার হইয়া আমরা ভৌগোলিক বেষ্টনীর মধ্যে আজ নরগোষ্ঠীর যে জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি, তাহা বাহ্যতঃ মৃত্তিকাতলচারী হইলেও তাহার মূল চৈতন্যের গভীরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। চিত্র লইয়া, কাঠপাথরের মাপজোখ কষিয়া, লিপিলেখনের পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক গবেষক একটা সংহত জনপ্রবাহের উৎসমূল আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান—কখনও-বা তাহার মোহানাও খুঁজিয়া পান। কিন্তু বিশিষ্ট কোন নরগোষ্ঠীর অন্তর্জীবনের সুগভীর পরিচয় পাইতে হইলে ইটকাঠপাথরের বস্তুপিণ্ডের উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিলেই চলিবে না,—তাহার আত্মার আকৃতি, প্রকাশের অকুণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা এবং দেশকালে আপনাকে প্রসারণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে। একটা জাতির সেই সুগভীর পরিচয় অনুধাবন করিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাসের তটে বসিয়া বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন। সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে জাতির ধ্যানধারণার কথঞ্চিৎ পরিচয় মিলিয়া যাইতেও পারে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রূপরীতির বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিকাশধারাটির স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন। সাহিত্য বিচারে শুধু 'প্রসাধনকলা' নহে, 'সাধনবেগ' অর্থাৎ জাতির জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। কহ্লণ 'ভূতার্থকথন'কেই ইতিহাসের মৌলিক উপাদান বলিয়া

ধরিয়া লইয়াছিলেন ; কথাটা আধুনিক কালেও প্রণিধানযোগ্য। অধুনা ঐতিহাসিকগণ অবহিত আছেন যে, রাজা ও রাজবংশের তালিকাবিবৃতি বা যুদ্ধ-বিগ্রহের নিপুণ বর্ণনাই একমাত্র ইতিহাস নহে। অতীত জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ এবং সেই জীবনের সহিত বর্তমানের সেতুরচনা করাও তীক্ষ্ণধী ঐতিহাসিকের কর্তব্য। তাই অতীত জীবনের 'অর্থকথন' অর্থাৎ তাৎপর্য-বিশ্লেষণ ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জাতির বহির্জীবনের ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা দুরূহতর। বহির্জীবনের ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের গোত্রবন্ধন স্থাপন করিতে না পারিলে সাহিত্যের ইতিহাস নিছক বিবৃতিতে পর্যবসিত হইবে। দেশে-কালে যে ইতিহাস বিকীর্ণ হইয়া আছে, তাহার সহিত মানবচৈতন্যের যোগাযোগ নির্ধারণ করিতে হইলে, মানুষের যে বাণীময় সত্তা হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহার কালিক ও স্থানিক স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে জাতির যে জীবনবৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সুমহৎ পার্থিব কীর্তির মধ্যে বাঙালীর জীবন বিকশিত হয় নাই ; কিংবা হয়তো দেশের জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প বা অন্যবিধ পুরাতন ভৌম-শিল্পের অচিরে সমাধি হইয়াছে। বাঙলাদেশের প্রাচীন কীর্তি পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত—অধিকাংশ স্থলে ভগ্নস্তূপে পরিণত। কিন্তু আটশত বৎসর ধরিয়া (১০ম শতাব্দী—১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ) বাঙালী যাহা ভাবিয়াছে, চিত্তলোকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সমস্ত মানস-ঐশ্বর্যের মধ্যেই এই জাতির যথার্থ কুলপরিচয় নিহিত আছে। তাই আমরা বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাহিত্য বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেশ ও কালের সহিত তাহার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

॥ ১ ॥

প্রাচীন বাঙলার দেশপরিচয়

প্রাচীন বাঙলার দেশপরিচয় ও ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে অবহিত হইবার পূর্বে আমাদিগকে প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত সঙ্কেত হইতে বিচার করিয়া দেখিতে

হইবে যে, উত্তরাপথের আর্যগণের দ্বারা নিন্দিত পূর্ব-প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংস্কারবর্জিত জাতি কী ভাবে ধীরে ধীরে একটা বিশিষ্ট জনপদজীবন লাভ করিল এবং উত্তরাপথের আর্যসংস্কৃতির কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া একটা মিশ্র জীবনবোধ গড়িয়া তুলিল। কোন্ কোন্ প্রাচীন গ্রন্থে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দেওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন গ্রন্থে বাঙলাদেশের উল্লেখ ॥

একদা ব্রহ্মাবর্তবাসী আর্য পিতৃগণের উন্নাসিক আর্যাভিমান এমন প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারা প্রাচ্যদেশকে আর্যসভ্যতা ও ভাবাদর্শের পরিমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচ্যখণ্ডে— বিশেষতঃ অঙ্গ, মগধ, পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের আর্যেতর কৌম-অধ্যুষিত দুর্গম জনপদ ও জনজীবনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য হিন্দ্-য়ুরোপীয় আর্যভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর্যাবর্তবাসিগণ এদেশের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিতেন না। এই প্রতিকূলতার প্রধান কারণ—সুদূরতা, দুর্গমতা ও আর্যেতর জাতির জীবনধারণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আর্যাবর্ত হইতে অঙ্গবঙ্গের দূরত্ব কিছু অল্প ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, জলাজঙ্গল পরিবেষ্টিত নাব্য অঞ্চল বলিয়া আর্যগণ দীর্ঘকাল এদেশে আসিবার চেষ্টা করেন নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতে আর্য-আগমনের পূর্বেই এই অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয়া হইতে আগত অধিবাসী কৌম বাস করিত; তাহাদের জীবনযাপন, অশনবসন ধ্যানধারণার এমন কতকগুলি অভিনবত্ব ছিল যাহা আর্যগণের মনঃপূত হয় নাই। বোধহয় অপরিচয়ের জন্যই এই অঞ্চল প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত গ্রন্থে এত নিন্দিত হইয়াছে। কালক্রমে আর্যগণ যখন নানা কর্মব্যপদেশে পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই এই অঞ্চলের প্রতি তাঁহাদের বিরূপতা কিয়দংশে লোপ পাইল এবং আর্য-অধ্যুষিত অঙ্গবঙ্গ গৌড়সমতট ধীরে ধীরে নবসংস্কার লাভ করিয়া আর্যবেষ্টনীর মধ্যে শ্লাঘনীয় স্থান লাভ করিল।

বৈদিক সংহিতা, আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ—মধ্যদেশের আর্যগণ ঋক্-সংহিতায় বাঙলাদেশের নামোল্লেখ করেন নাই, এই অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁহাদের

কোন ধারণাই ছিল না। ঋগ্বেদে 'কীকট' নামক দেশের উল্লেখ আছে।[১] যাস্ক তাহার টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ"। পরবর্তী কালে সংস্কৃত লেখকগণ এই 'কীকট'-কে মনে করিয়াছিলেন মগধ।[২] কীকটদেশের অধিবাসীরা 'প্রমগন্দ' নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে চালিত হইত এবং তাহারা বৈদিক সূক্তের বিরোধী ছিল। এই কীকট দেশ পূর্বাঞ্চলেই হওয়া সম্ভব। ইহাদিগকে পুরাপুরি অনার্য কৌমের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ ইহারা বৈদিক আচার-আচরণের বিরোধিতা করিত বটে, কিন্তু শক্তিসামর্থ্যে নগণ্য ছিল না ; সুতরাং সংস্কৃতি বিচারে ইহাদিগকে একেবারে বর্বরের শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। হয়তো পরবর্তী কালে অঙ্গবঙ্গের জনজীবনের সহিত এই কীকটদেশের অধিবাসীরা একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

অথর্ববেদেও অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। মধ্যদেশের আর্যগণ ইহাদিগকে এত ঘৃণা করিতেন যে, দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন—ইহারা যেন জ্বরে ভুগিয়া মরে।[৩] ঐ অথর্ববেদের ব্রাত্যস্তোত্রে আবার মগধের অধিবাসীদিগকে ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত আর্য বলা হইয়াছে। হয়তো অথর্ববেদের যুগে কিছু কিছু আর্য পূর্বাঞ্চলে আসিয়া ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণে পূর্বদেশের অধিবাসীকে অসুর অর্থাৎ দানবগোষ্ঠীসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৪] পরবর্তী কালেও দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে' গৌড, পুণ্ড্র, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে অসুরভাষা বলা হইয়াছে।[৫] যজুর্বেদেও পুরুষ-মেধের জন্য মাগধ অর্থাৎ মগধবাসীকে বলিরূপে গ্রহণের কথা আছে।

ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের স্পষ্টতর উল্লেখ আছে—অবশ্য তাহাতে প্রাচ্যদেশবাসীদিগকে নিন্দাই করা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ

১ ঋগ্বেদ, ৩য়, ৫৩, ১৪। "কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু গাবঃ। ন আশিরম্।"

২ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম)

৩ অথর্ববেদ, ৫ম, ২২, ১৪

৪ শতপথব্রাহ্মণ, ১৩শ, ৮, ১, ৫

৫ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প

জাতি পক্ষীকল্প, অর্থাৎ পাখীর মত অস্ফুটভাষী অথবা যাযাবর।[৬] এই বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ কাহারা, সে সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ইহারা পূর্ববঙ্গ, মগধ, পশ্চিম-বিহারের কোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চের জাতি।[৭] তাহা হইলে ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গের প্রথম উল্লেখ মিলিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর্যভাষাভাষিগণের জ্ঞান ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। বঙ্গ ও মগধবাসীরা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই ছিল ঐতরেয় আরণ্যক যুগের শিষ্ট মত। তাঁহারা এই অঞ্চলেব শুধু নামটুকু জানিতেন, আর কোন সংবাদ রাখিতেন না।

পূর্ব-ভারতের অধিবাসীদের প্রতি অপ্রসন্ন মনোভাব আবও প্রকটরূপে ধরা পড়িল ঐতবেয় ব্রাহ্মণে।[৮] আর্যসীমার বাহিরে যে সমস্ত অনার্য জাতি বাস কবিত তাহাদিগকে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দস্যু বলা হইয়াছে। অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব—ইহারাই ছিল দস্যুশ্রেণীভুক্ত। অন্ধ্র (দক্ষিণ-ভারতের তেলুগুভাষী জন), শবর (সম্ভবতঃ বিশাখাপত্তনের পাহাড়ী জাতি সবরলু বা গোয়ালিয়রের সবরী[৯]) পুলিন্দ (বুন্দেলখণ্ডের অনার্যজাতি) এবং মুতিব কৌম (হায়দরাবাদের নিকট মুসি নদীর তীরে বাস করিত)[১০]—এই চারিটি জাতিই দাক্ষিণাত্যেব অধিবাসী। একমাত্র পুণ্ড্রই পূর্ব-ভারতে, বর্তমান বাঙলাদেশের উত্তরাংশে বাস করিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'শুনঃশেপ' কাহিনীর মধ্যেও 'পুণ্ড্র'-সংক্রান্ত একটা কৌতূহলপ্রদ গল্প আছে।[১১] বিশ্বামিত্র 'শুনঃশেপ' নামক এক ব্রাহ্মণ বালককে স্নেহবশে যজ্ঞবলি হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ কবেন। ঋষির পঞ্চাশ জন পুত্র পিতাব এই কার্যেব প্রতিকূলতা করিলে ঋষি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীর শেষ সীমা অধিকার কবিবে। তাহাদের সন্তানগণ অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব প্রভৃতি নামে পরিচিত হইল। মহাভারতেও এই জাতীয় আর একটা

৬ ঐতরেয় আরণ্যক (২।১।১।৫)—"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ংস্তানীমানী বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।"

৭ Dr. S K. Chatterji—*Origin and Development of Bengali Language*, Vol, I

৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৮

৯ Hem Chandra Raychaudhury—*Political History of Ancient India*

১০ *Ibid*

১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭ম, ১৩—১৮

গল্প আছে।[১২] এই সমস্ত উদাহরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, যজুর্বেদ, ঐতরেয় আরণ্যক এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে হীনার্থবাচক উল্লেখ থাকিলেও অথর্ববেদের যুগে বহুনিন্দিত অঙ্গ ও বঙ্গ ব্রাত্য-আর্যগণের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল।

পাণিনি-পতঞ্জলি ও ধর্মশাস্ত্র—আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে পূর্বদেশের উল্লেখ থাকিলে তাহা অতিশয় প্রাচীন বলিয়াই ধরিতে হইবে। পাণিনির ষষ্ঠ অধ্যায়ে (২।১০০) "অরিষ্ট গৌড পূর্ব্বে চ" সূত্রে 'গৌড়পুরের' উল্লেখ আছে। অনেকেই ইহাকে গৌড়ের কোন নগর বা রাজধানী বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ইহা যে পূর্বাঞ্চলের কোন নগর হইতে পারে না, তাহা ইহার পূর্ববর্তী সূত্রে 'পুরে প্রাচাম্' হইতে জানা যায়।[১৩]

পাণিনির প্রায় পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে আবির্ভূত মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি[১৪] অন্ততঃ দুই বার পূর্বদেশ ও দেশবাসীর উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির ৪।১।১৭০ সূত্রের ('দ্ব্যঞ্ মগধ-কলিঙ্গ-সূরমসাদন্') ভাষ্য রচনাকালে পতঞ্জলি রাজা বাচক অন্-প্রত্যযযোগে নিষ্পন্ন 'আঙ্গঃ' 'বাঙ্গঃ' এই দুইটি শব্দের উদাহরণ দিয়াছেন। আঙ্গ-বাঙ্গ—অর্থাৎ অঙ্গরাজ, বঙ্গরাজ। পতঞ্জলি অঙ্গ ও বঙ্গের রাজার কথাও উল্লেখ করিযাছেন। পাণিনির 'বিষয়োদেশে (৪।২।৫২) সূত্রটির বৃত্তি করিয়া কাত্যায়ন লিখিযাছেন, "বিষয়াভিধানে জনপদে লুগ্ বহুবচনবিষয়াৎ"। মহাভাষ্যকার কাত্যায়ন-বার্তিকের উদাহরণ দিয়াছেন, "অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুহ্মাঃ, পুণ্ড্রাঃ"। তিনি ভাগলপুর, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিবাসীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন। 'বোধায়নধর্মসূত্রে'ও পূর্বাঞ্চলকে নিন্দা করা হইয়াছে। আরট্ট (পঞ্জাব), পুণ্ড্র, সৌবীর (দক্ষিণ-পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ) বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলকে আর্যসীমার বহির্ভূত অনার্য দেশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পুণ্ড্র-বঙ্গ অঞ্চলে স্বল্পকালের জন্য অবস্থান

১২ মহাভারত, আদিপর্ব

১৩ ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)

১৪ সুশীল গুপ্ত-সম্পাদিত গোল্ড স্টুকরের *Sanskrit and Culture* গ্রন্থের Patanjali অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।[১৫] অনুমান 'বোধায়নধর্ম-সূত্র'-রচনাকালে অঙ্গ-বঙ্গ-পুণ্ড্র দেশে আর্যগণের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এই অঞ্চল সংস্কারবর্জিত ছিল বলিয়া ধর্মসূত্রে নিন্দিত হইয়াছে।

'মানব ধর্মশাস্ত্রে'ও অশ্রদ্ধাবাচক পৌণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের সংস্পর্শহীন হইয়া যে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার তালিকার মধ্যে পৌণ্ড্রগণের নাম আছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, 'মানব ধর্মশাস্ত্রে'র যুগে পূর্বভারতে আর্যাভিগমন আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অসংস্কৃত আর্যগণ স্মৃতিশাস্ত্রে শ্রদ্ধার আসন পান নাই। হয়তো তাঁহারা স্থানীয় অধিবাসীর সহিত কোন কোন ব্যাপারে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়া ব্রাত্যের মতো বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত—মহাকাব্যের যুগে বাঙলাদেশ ধীরে ধীরে আর্যীকৃত হইতে থাকে, এবং এই অঞ্চলের প্রতি উত্তরাপথের আর্যগণের বিতৃষ্ণাও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। রামায়ণে বাঙলা সম্বন্ধে যেটুক্ প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে বরং শ্রদ্ধাই সূচিত হইয়াছে। অভিমানিনী কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ প্রসন্ন করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার অধীনে দ্রাবিড, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল প্রভৃতি অবস্থিতি করে।"[১৬] কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪০শ সর্গে মগধ, পুণ্ড্র ও অঙ্গের উল্লেখ আছে। সীতা অন্বেষণের জন্য সুগ্রীব বিনত নামক যূথপতিকে পূর্বদেশ অনুসন্ধানের নির্দেশ দেন; তাহাতে তিনি মগধ, পুণ্ড্র ও অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহাভারতের একাধিক স্থানে বাঙলার নানা জনপদের উল্লেখ রহিয়াছে। আদিপর্বে অন্ধঋষি দীর্ঘতমসের যে গল্প আছে, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋষি দীর্ঘতমস্ বলির স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম।[১৭] ইহারা যে দেশে বাস করিয়াছিল, সেই দেশ ইহাদের নামানুসারে পরিচিত হইয়াছে।

১৫ বোধায়নধর্মসূত্র—১।২।১৪

১৬ বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণ, ৩য় সং (পৃ ১১৫)

১৭ মহাভারত, আদিপর্ব

মহাভারতের নানা স্থানে বাঙলাদেশের রাজা, রাজধানী, জনপদ ও দেশবাসী সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে। কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে বাঙলার নানা জাতি-উপজাতির নাম পাওয়া যাইতেছে। পুণ্ড্রদের রাজা সুপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড্রক বাসুদেব বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাতদের একতাবদ্ধ করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি ভারত-যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ভীমও পৌণ্ড্ররাজ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম ও সমুদ্র-তীরবাসী ম্লেচ্ছদের (সুন্দরবন অঞ্চল ?) পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। কর্ণ অঙ্গ ও বঙ্গকে এক শাসনের অধীনে আনয়ন করিয়া তাহাদের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। পূর্ব-ভারতের এই সমস্ত জাতি কৃষ্ণবিরোধী দুর্যোধন বা জরাসন্ধের পক্ষপাতী ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভাগবতে সুহ্মদের 'পাপ' বলা হইয়াছে। হূণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস—ইহারাও 'পাপ' জনের অন্তর্ভুক্ত। সে যাহা হউক, রামায়ণ মহাভারতে পূর্ব-ভারতের পুণ্ড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত—প্রধানতঃ এই কয়টি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। কালিদাসের রঘুবংশে বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে (রঘু, ৪।৩৫-৩৬)।

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ—জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'আয়ারাঙ্গ সুত্তে' ('আচারাঙ্গ সূত্র') সুহ্মভূমি ও বজ্রভূমির (সুব্‌ভভূমি ও বজ্জভূমি) উল্লেখ আছে।[১৮] খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর অতিদুর্গম লাঢ (রাঢ়) দেশের অন্তর্গত বজ্জভূমি ও সুব্‌ভভূমিতে প্রচারকার্য করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহার সহিত অতিশয় দুর্ব্যবহার করিয়াছিল এবং 'ছু ছু' করিয়া কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। পশ্চিম বাঙলার অশনবসন রীতিনীতি—কিছুই মহাবীরের মনঃপূত হয় নাই। পথহীন লাঢ় অর্থাৎ রাঢ় দেশে ভ্রমণ করা যে অতিশয় কষ্টকর, তাহা 'আয়ারাঙ্গ সুত্তে'র লেখক ক্ষোভের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবীর রাঢ় পরিভ্রমণ করিলেও বঙ্গে অথবা পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য পরবর্তী কালে জৈনসূত্রে প্রায়শঃই বঙ্গের উল্লেখ আছে।[১৯] কল্পসূত্রানুসারে[২০] দেখা যাইতেছে যে, ২য় খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাঙলাদেশে চারিটি জৈন শাখা স্থাপিত হইয়াছিল—

১৮ *Jaina Sutras*, Part I (Sacred Books of the East Series)

১৯ Levi—*Pre-Aryan and Pre-Dravidian* (Tr. by Dr P. C. Bagchi)

২০ Winternitz—*A History of Indian Literature*, Vol. II

তাম্রলিপ্তিক, কোটিবর্ষীয়, পুণ্ড্রবর্ধনীয় এবং দাসী-খারবটিক। ২য় খ্রীঃ পূর্বাব্দেই উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও বঙ্গ ও সুহ্মের উল্লেখ আছে। প্রাচীন পালিসাহিত্যে ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গের নাম না থাকিলেও 'অঙ্গুত্তনিকায়ে'র অন্তর্গত 'মহাবগ্‌গে' "বংগের" উল্লেখ আছে।[২১] জাতকের এক গল্পে আছে যে, লাল্‌হ অর্থাৎ রাঢ়বাসী এক যুবক তক্ষশীলায় বিদ্যা শিখিবার জন্য গিয়াছিল। 'দিব্যাবদানে' পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ আছে।[২২] অশোকের সময় হইতে পশ্চিম বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করিত থাকে, কিন্তু অশোকের পরেই পুণ্ড্রবর্ধনে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল।[২৩] খ্রীঃ প্রথম শতকে লিখিত 'মিলিন্দ পঞ্‌হে' সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে বঙ্গের নাম আছে।[২৪] 'ললিতবিস্তর' ও 'মহাবস্তু'তে বঙ্গলিপির প্রসঙ্গ লক্ষণীয়।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা গেল, পুণ্ড্র, বঙ্গ ও সুহ্ম প্রধানতঃ প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। গুপ্তযুগ হইতে বাঙলাদেশ যথাযথভাবে উত্তরাপথের নিবিড় সংস্পর্শ লাভ করিলেও তাহার পূর্ব হইতে নানা গ্রন্থে বাঙলার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। পুণ্ড্রবর্ধনই বোধহয় সর্বপ্রথম আর্যপ্রভাব স্বীকার করিয়াছিল; বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রথম কেন্দ্রও এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অবস্থানভূমি নির্ণয় প্রসঙ্গেও দেখা যাইবে, প্রধানতঃ প্রাচীন রাঢ় ও পুণ্ড্রবর্ধনেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সংস্থান ॥

ইংরাজ আমলের বাঙলাদেশ ও প্রাচীনকালের গৌড়বঙ্গের মধ্যে সীমানা, আয়তন এবং ভৌগোলিক সংস্থানগত নানা পার্থক্য আছে—থাকাই স্বাভাবিক। রাজকতন্ত্রের কর্মনির্বাহের জন্য এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচারে প্রাকৃতিক ভূগোল বা রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ মানবনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট সীমারেখা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। ভাষাকেই

২১ *Mahavagga* III, 70, 17, Part I, Edited by R. L. Morris

২২ *Divyavadan*, Ch. XXIII—Cowel and Neil

২৩ শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত—বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

২৪ *Sacred Books of the East*, XXXVI, II

সংস্কৃতি বিচারের প্রধান মানদণ্ড ধরিতে হইবে। বাঙলার অতীত ও বর্তমান ভূবিন্যাস যেরূপ হউক না কেন, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গভাষা-ভাষী অঞ্চলকে এক ও অখণ্ড সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করা কর্তব্য। সুতরাং আমরা তখনই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব, যখন বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ভূগোলের যথাযথ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিব। বাঙলার সীমা সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিক যে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থগূঢ় ইঙ্গিত দিয়াছেন এখানে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে। তাঁহার মতে, "এইভাবে বোধহয় বাঙলার সীমা নির্দেশ করা চলে : উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটানরাজ্য ; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা ; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি ; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পযন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাঙলার গৌড়-পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী-রাঢ়া সুহ্ম-তাম্রলিপ্তি-সমতট বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদনদী-বিধৌত বাঙলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম কর্ম-নর্ম-ভূমি"।[২৫]

ইতিহাসের পটে বাঙলাদেশ ॥

সমগ্র বাঙলাদেশ কোন্ সময় হইতে 'বঙ্গ' বা 'বাঙলা' নাম গ্রহণ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। হিন্দুযুগে এমন কি মুঘল-যুগের পূর্বেও বাঙলাদেশ গৌড় নামে অভিহিত হইত। বোধহয় আবুল ফজল তাঁহার 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সর্বপ্রথম সমগ্র দেশবাচক 'বাঙলা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে এদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ। তাহাতে বাঁধ বা জমির সীমাবাচক 'আল' (—আলি, আইল) প্রত্যয়ের যোগে 'বাঙলা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আবুল ফজলের এই শব্দব্যুৎপত্তি ঠিক নহে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া না বুঝাইলেও চলে। কারণ প্রাচীন বাঙলার ভূগোল-ইতিহাসে বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক জনপদবিভাগ-রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

২৫ ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)

বঙ্গাল শব্দ হইতে বাংলা, বাঙলা, বাঙ্গালা প্রভৃতি শব্দ সাধিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পর্যটকগণও ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেশকে Bengala বলিয়া আসিয়াছেন।[২৬] পর্যটক মার্কো পোলো ইহাকে বলিয়াছেন Bengala। ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে জাও দ্য বারোস বাঙলাদেশের যে মানচিত্র ও নকশা অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র বাঙলাদেশকে তিনি Bengalla বলিয়াছিলেন। ইহার একশত বৎসর পরে (১৬৬০) ফান ডেন ব্রুক যে মানচিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে Bengala বলিতে সমস্ত দেশকেই নির্দেশ করিয়াছেন। বাঙলার দক্ষিণে প্রসারিত সাগরকেও (বঙ্গোপসাগর) উক্ত নকশায় Golf Van Bengala বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। রেনেলের বিস্তারিত মানচিত্রে এই দেশের নাম দেওয়া হইয়াছে Bengal[২৭]; ইংরাজ শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব হইতেই ইংরাজ বণিকগণ এই দেশকে Bengal বলিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বাংলাভাষাকেও Bengal Language বলিতেন। হ্যালহেড ইংরাজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাকে *Grammar of the Bengal Language* (1778) বলিয়াছিলেন। মানোএল-দা-আস্‌-সুম্প্‌সাঁও ১৭৪৩ সালে পর্তুগীজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিসবন হইতে মুদ্রিত করেন। তিনি উক্ত ব্যাকরণের আখ্যা দিয়াছিলেন, *Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez.*[২৮]

হিন্দুযুগে বাঙলাদেশের সামগ্রিকভাবে কোন একটিমাত্র দেশবাচক নাম ছিল না; গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি জনপদ ইতিহাসে, তাম্রপটে, প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে। তবে প্রাক্‌-মুসলমান যুগের হিন্দুবৌদ্ধ রাজগণ 'গৌড়েশ্বর' আখ্যাটিতে অধিকতর গৌরব বোধ করিতেন। অবশ্য ধর্মপাল 'বঙ্গপতি' নামেও কদাচিৎ পরিচিত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজগণ বঙ্গ বঙ্গাল-সমতট-হরিকেলের অধীশ্বর হইয়াও শুধু 'বঙ্গেশ্বরে' তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না। প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতে গৌড়ের কোন উল্লেখ নাই (পাণিনির 'গৌড়পুর' সন্দেহজনক)। পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ—এই তিনটি নাম আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও

২৬ ডঃ নীহাররঞ্জনের উক্ত গ্রন্থ

২৭ ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *History of Bengal*, Vol. I সংযোজিত মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

২৮ ডক্টর শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

মহাভাষ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুপ্তযুগের পরে শশাঙ্কের সময় হইতেই 'গৌড়' নামটি একটা ব্যাপকতর সংজ্ঞা লাভ করে। অবশ্য গৌড় বলিতে প্রধানতঃ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গকেই নির্দেশ করা হইত। 'রাজতরঙ্গিণী'র লেখক পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌড (উত্তর বঙ্গ অথবা সমগ্র বঙ্গ), সারস্বত (পঞ্জাবের পূর্বভাগ), কান্যকুব্জ (কনৌজ), মিথিলা (উত্তর বিহার) এবং উৎকল (উড়িষ্যার উত্তরাংশ)—এই পাঁচটি অঞ্চল লইয়া পঞ্চগৌড় গঠিত হইয়াছিল। পালযুগে গৌড়ের প্রাধান্যের ফলেই এই জনশ্রুতির উদ্ভব হয়।

পাঠানযুগে সমগ্র বাঙলা গৌড় নামে আখ্যাত হয়। মুঘলযুগেই সর্বপ্রথম রাজকার্যাদিতে গৌড়ের পরিবর্তে সমগ্র দেশবাচক 'বাঙলা' নাম গৃহীত হয়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, আকবরের আমলেই সমস্ত বাঙলাদেশ 'সুবা বাঙলা' নামে পরিচিত হয়।

আকবরের যুগে 'সুবা বাঙলা' প্রচলিত হইলেও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড শব্দটি সমস্ত বাঙলাদেশের অর্থে প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইত। পাল ও সেন-রাজগণ পূর্ববঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াও যেমন গৌড়েশ্বর শব্দে অধিকতর শ্লাঘা বোধ করিতেন, সেইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া গৌড শব্দটি বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মধ্যযুগে 'গৌড়ীয়া' শব্দটি সমস্ত বাঙালীকেই বুঝাইত, কদাচিৎ 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গজ' শব্দের দ্বারা পূর্ববঙ্গকে নির্দেশ করা হইত। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ বর্ণনা করিবার কালে এই অঞ্চলকে 'বঙ্গদেশ' বলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতেও 'বঙ্গদেশ' ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র 'মহা-রাজ বঙ্গজ কায়স্থ' (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ) বাক্যাংশের ব্যবহার করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'বাঙলার' পরিবর্তে সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদিতে 'গৌড' শব্দ অধিকতর ব্যবহৃত হইত। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণ 'গৌডীয় ব্যাকরণ' নামে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ১৮২৬ সালে তিনি ইংরেজী ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন *Bengalee Grammar in the English Language*। রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রগণ (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) ১৮৩২ সালে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামক যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রচারপত্রে "গৌড়ীয় ভাষা উত্তমরূপে অর্চ্চনার" উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সভার পরবর্তী বিবরণে দেখা যাইতেছে যে, বাংলাভাষাকে কখনও 'গৌড়ীয় ভাষা' কখনও-বা 'বঙ্গভাষা' বলা হইয়াছে।

মধুসূদনের "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" সুপরিচিত। তিনি মহাকাব্যে গৌড় শব্দটি সমগ্র বাঙলাদেশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

এই কয় ছত্রে রাঢ়কে পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গকে পূর্ববঙ্গ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

কবিতাটিতে তিনি গৌড়ের কাছে নহে, রাঢ়বঙ্গের কাছেও নহে—সমগ্র বঙ্গদেশের পথিককে আপনার সমাধিপার্শ্বে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্যারীচাঁদ তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' 'বঙ্গদেশীয়' বলিতে পূর্ববঙ্গীয় বুঝাইয়াছেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ঈষৎ পরিহাসচ্ছলে 'বঙ্গদেশীয়' শব্দের দ্বারা পূর্ববঙ্গীয় নির্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই 'বাঙ্গালা' ও 'বঙ্গ' শব্দ সমগ্র দেশ বা দেশভাষা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। 'সদুক্তিকর্ণামৃতের' অজ্ঞাতনামা কবি আপনার রচনাকে গঙ্গার পাবনী ধারার সহিত তুলনা দিয়া বলিয়াছিলেন—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢা চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ (সদুক্তি ৫।৩১।২।)

সমগ্র বাঙলাদেশ সেই গঙ্গামাহাত্ম্য এবং 'বঙ্গালবাণী'কে আপনার পারত্রিক কল্যাণ এবং ঐহিক বাসনার বাণীময় আত্মপ্রকাশ রূপে গ্রহণ করিয়াছে।

হইতেই বঙ্গ-বঙ্গাল-সমতট-হরিকেল অঞ্চলের অধিবাসিগণ গাঙ্গেয় ভূমিকেই বিশেষ শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। পাঠানযুগ হইতেই ভাগীরথীর তীরে তীরে গৌড়বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংহত আকার ধারণ করে।

প্রাচীন বাঙলার হিন্দুযুগে গৌড়বঙ্গের ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমা নানা সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভৌগোলিক বিচারে তিনটি অংশের পার্থক্য প্রায়ই অপরিবর্তনীয় ছিল। রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ (আধুনিক বর্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কিয়দংশ) এবং বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ (প্রেসিডেন্সি বিভাগের বৃহদংশ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ)—প্রধানতঃ এই তিনটি হইল প্রাচীন বাঙলার ভূ-বিভাগ। রাঢ় দেশ সুহ্ম নামেও পরিচিত ছিল। ইহার দুইটি বিভাগ—উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়; অজয় নদ দুই অংশের সীমারেখা। রাঢ়ের দক্ষিণে তাম্রলিপ্তি (তমলুক), দণ্ডভুক্তি (দাঁতন) প্রভৃতি বন্দর-জনপদগুলি বর্তমান ছিল। মধ্যযুগের মেদিনীপুরের অন্তর্গত এই দুই দেশও রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে সুহ্ম নামের প্রচার থাকিলেও আধুনিক কালে রাঢ় নামটি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছে। বরেন্দ্রী বা পুণ্ড্র অঞ্চল প্রধানতঃ উত্তর বাঙলাকে বুঝাইত। পুণ্ড্র বা পুঁড়ো নামক কোন আর্যেতর জাতি এই অঞ্চলে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পুণ্ড্রদেশ। একদা রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা-চট্টগ্রাম বিভাগের প্রায় সবটাই পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির (ভুক্তি—Division বা বিভাগ) অন্তর্গত ছিল। বরেন্দ্র বা পুণ্ড্রবর্ধনকে বাঙলাদেশে আর্যসভ্যতার প্রথম কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পুণ্ড্র জাতি বা পুণ্ড্র দেশের উল্লেখ আছে, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী শব্দটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ নামটি লইয়া বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে; বোধহয় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ প্রাচীনযুগে বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি বিভাগ এই প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে অর্থাৎ পাঠানযুগের পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই দুই নামে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ গৌড় ও বঙ্গ দীর্ঘকাল আপনার ভৌগোলিক পার্থক্য বজায় রাখিয়াছিল।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে রাঢ়ভূমি ॥

বাংলা সাহিত্যালোচনার ভূমিকা হিসাবে বাঙলাদেশের ভূগোল আলোচনার প্রধান কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগী' বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ কোন্ ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নির্ণয় করা। মধ্যযুগের প্রারম্ভ (১৪শ শতাব্দী) হইতে অন্ত্যপর্ব (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোষ্ঠী বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রধানতঃ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস বীরভূমে, কৃত্তিবাস ফুলিয়ায় (যদিও তাঁহার পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন), মালাধর বসু বর্ধমানের কুলীনগ্রামে, কাশীরাম দাস বর্ধমানের সিঙ্গী গ্রামে, মুকুন্দরাম ঐ বর্ধমানের দামিন্যায় এবং শেষজীবনে মেদিনীপুরের আড়রায়, মাধব আচার্য সপ্তগ্রামে, বিপ্রদাস পিপলাই চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নাদুড্যা বটগ্রামে, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ সম্ভবতঃ বর্ধমান জেলায় এবং ভারতচন্দ্র ভুরশুটে (হাওড়া-হুগলীর সীমানায়) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রায় প্রত্যেক কবি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্মগুরু, পদকর্তা ও চৈতন্যজীবনীকারগণের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহট্ট চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি হইলেও তাঁহার জীবনলীলা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের অনুচর নিত্যানন্দ বীরভূম, এবং অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রায় অধিকাংশ পদকর্তাই বর্ধমান জেলায় আবির্ভূত হন। পদাবলীর চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বীরভূমের অধিবাসী। এতদ্ব্যতীত কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস—সকলেই বর্ধমান জেলাকে ধন্য করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বৈষ্ণবতীর্থক্ষেত্রও (যথা—শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, কালনা, দেনুর ঝামটপুর, বাগনাপাড়া) বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। নরোত্তমের জন্মভূমি বরেন্দ্রের খেতুরীগ্রাম (রাজশাহী জেলা) উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্য নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কেবল মনসামঙ্গলের প্রধান কবিগণ পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। পদ্মাপুরাণের অন্যতম প্রাচীন কবি নারায়ণদেব ব্রহ্মপুত্র তীরে বোরগাঁও (বোরগ্রাম—কিশোরগঞ্জ মহকুমা) বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন। নারায়ণের বৃদ্ধপিতামহ রাঢ়দেশ

ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেন।[৩০] বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের গৈলাগ্রামের কাছে ফুল্লশ্রীগ্রামে (অধুনা লুপ্ত) জন্মগ্রহণ করেন।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সমস্ত কবি এখনও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই রাঢ়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পাঠানযুগে গৌড়, মুঘলযুগে মুর্শিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগর নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতি যে একটা বিশেষ মহিমা লাভের চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

॥ ২ ॥
প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস

ইতিহাস প্রধানতঃ অতীতচারী ও ভূমিবিহারী। অজস্র ঘটনার মধ্যে কোন কোনটি একটা ভূখণ্ডের ভৌমচেতনা ও আত্মিক সত্তাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া থাকে। যে ঘটনাগুলির মধ্যে অমরত্বের বীজ নিহিত আছে এবং যাহা দেশের জনজীবনকে প্রভাবিত করে, সাহিত্যের ইতিহাসকার তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। 'রাজ্য ভাঙা গড়া' যত প্রত্যক্ষ ও প্রবল ভাবে চলুক না কেন, তাহা যদি জাতির অন্তর্জীবনে কোন পরিবর্তন বা প্রভাব সঞ্চার করিতে না পারে, তবে তাহার বস্তুগত যত মূল্যই থাক, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার ভূমিকা যৎসামান্যই। ঐতিহাসিক ঘটনা পুরাতন বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, একথা বলিবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসের সহিত বাস্তব জীবনের এই যে অপরিচয়—ইহা শুধু বাঙলার নহে, সমগ্র ভারতীয় জীবনেরই ত্রুটি। বাংলা সাহিত্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের ছায়া না পড়িলেও গভীর মনলোকে যে ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও ছায়া সঞ্চার হয় নাই, তাহা মনে হয় না। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রিক ইতিহাস ও তাহার সহিত জনজীবনের যোগাযোগ লক্ষ্য করা প্রয়োজন; তাহা না হইলে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও গূঢ় তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। তাই আপাততঃ

---

৩০ বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ।
রাঢ়দেশ ছাড়িয়া সে আসিলা আপন॥

অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও, যে ইতিহাস প্রধানতঃ রাজপাদোপজীবী, তাহারও কিছু কিছু পরিচয় লইতে হইবে।

বাঙলাদেশের আদিযুগের ঐতিহাসিক কাল খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী (গুপ্তযুগ) হইতে ১২শ শতাব্দী (লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়) পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট সাত শত বৎসরের ইতিহাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে বাঙালীর ইতিহাসচেতনার যে স্বরূপগুলি লক্ষ্য করা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

গুপ্তযুগে বাঙলা ॥

বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত বাঙলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। গুপ্তবংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত (খ্রীঃ ৩য়-৪র্থ শতক) সম্ভবতঃ বরেন্দ্র বা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। বাঁকুড়ার চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করিয়া বোধহয় সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙলার উপর প্রাধান্য অর্জন করেন। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ সমতট প্রথমে গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে করদ রাজ্যে পরিণত হইলেও পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গও গুপ্ত সম্রাটদের অধীন লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—সমস্ত অংশই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। তৎপূর্বে মৌর্য ও কুষাণ রাজত্বের সীমা বাঙলার কিয়দংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাবাধীনে আসিয়া বাঙলার আর্যেতর সংস্কৃতি নানা দিক দিয়া লাভবান হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ যেমন এক দিকে স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলিকে নির্জিত করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অপর দিকে সে ক্ষতির অনেকটা পূরণ হইয়াছিল উত্তরাপথের জীবন, সাধনা ও সংস্কৃতির প্রভাবে।

গুপ্ত সম্রাটগণ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে যে অসপত্ন মহিমা লাভ করিয়াছিলেন, অচিরে তাহার অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিল। প্রধানতঃ হূণ জাতির আক্রমণেই এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল। ফলে পূর্ব-ভারতের হতবল স্থানীয় রাজ্যসমূহ আবার প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। যশোবর্মণ সমগ্র আর্যাবর্ত এবং পূর্ব-ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিলে গুপ্ত

সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ইহার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের স্থানীয় শাসন-কর্তারা স্বাতন্ত্র্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পূর্ব-বাঙলার গোপ-চন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব সম্ভবতঃ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া-ছিলেন। এই নৈরাজ্যের উৎকট রাষ্ট্রসঙ্কটে শশাঙ্কের আবির্ভাব হইল।

শশাঙ্ক ও গৌড়ের প্রতিষ্ঠা ॥

৬০৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেই শশাঙ্ক নরেন্দ্র- গুপ্ত গৌড়েশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, আধুনিক মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি। বস্তুতঃ, শশাঙ্কই সর্বপ্রথম গৌড়কে একটা সর্বভারতীয় মহিমা দান করিযাছিলেন। মহাকাব্যের যুগে যেমন পৌণ্ড্রক বাসুদেব স্থানীয় রাজন্যবর্গকে মিলিত করিয়া একটা পূর্বাঞ্চলিক শক্তি সংহত করিয়াছিলেন, শশাঙ্কও প্রায় অনুরূপভাবে গৌড়কে আর্যাবর্তের ভীতিস্থল করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। শশাঙ্ক হইতেই বাঙলার স্বাতন্ত্র্য সূচনা, এইজন্য বাঙলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটা বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। অবশ্য তাঁহার তথাকথিত বৌদ্ধ-বিদ্বেষের জন্য তিনি য়ুয়ান চুয়াঙের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন; এই অপরাধের জন্য 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে'র বৌদ্ধ লেখক তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অপরদিকে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনহত্যার নিমিত্তের ভাগী হইয়াছিলেন এবং হর্ষবর্ধনকে বিব্রত করিয়া কান্যকুব্জ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইজন্য হর্ষ-বর্ধনের সভাকবি ও সুহৃৎ বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' শশাঙ্ককে "গৌড়াধম" "গৌড়-ভুজঙ্গ" প্রভৃতি অপনামে কলঙ্কিত করিয়াছেন। যাহা হউক, শশাঙ্কের ব্যক্তিগত চরিত্র লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই। তিনি ৬৩৭ খ্রীঃ অব্দের কিছু পূর্বে তিরোহিত হন এবং জীবিতকালে গৌড, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল এবং গঞ্জাম জিলাস্থ কোঙ্গোদের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন—ইহা ইতিহাসের ঘটনা। পরবর্তী কালে গৌড়বঙ্গ উত্তরাপথের প্রভাব খর্ব করিয়া যে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে, কখনও-বা উত্তরাপথেও রাষ্ট্রিক প্রভাব বিস্তার করিবার চেষ্টা করে—ইহার প্রাথমিক সূচনা করেন গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা (গুপ্তবংশীয়?) জানা যায় না; কিন্তু তাঁহার অভ্যুত্থানের পর গৌড়ও যে একটা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও সামরিক উৎকর্ষ লাভ করে, তাহা অযথার্থ নহে।

বাঙলায় পালবংশ ॥

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান হইলে এই অঞ্চলে যে অরাজকতা আরম্ভ হয়, তাহা ভারতীয় রাজনীতিতে 'মাৎস্য ন্যায়' নামে পরিচিত। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে আছে, "মাৎস্য ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুল-চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৩১] শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বর্ষ ধরিয়া (আনুঃ ৬৩৫-৭৫০ খ্রীঃ অঃ) গৌড়বঙ্গে 'মাৎস্য ন্যায়ে'র বন্যা বহিয়া চলিয়াছিল। পরে জনসাধারণ ও রাজকর্মচারিগণ (সামন্ত ?) বপ্যটের পুত্র গোপালকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙলার ইতিহাসে ইহা একটা স্মরণীয় ঘটনা। যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সম্ভবতঃ কোন সম্রান্ত সামন্তের পুত্রও ছিলেন না, তিনি কী ভাবে রাজা নির্বাচিত হইলেন, তাহা ইতিহাসের জটিল প্রশ্ন। তবে এইটুকু অনুমিত হইতেছে যে, শশাঙ্কের তিরোধানের পর একদিকে যেমন অরাজকতা চলিতেছিল, ঠিক তেমনি আবার, সেই অবকাশে প্রকৃতিপুঞ্জ (অথবা নেতৃগণ) এমন প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যে, গোপালদেবের নির্বাচনে তাহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই পালবংশের দীর্ঘস্থায়ী রাজ্যকাল ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল, রামপাল বাঙালীর ইতিহাসে সুপরিচিত। ইহারা মগধবাসী হউন বা না হউন—দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়া বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। 'গৌড়েশ্বর' উপাধিদৃষ্টে মনে হয় গৌড়ই ছিল তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বাঙলার বাহিরে পশ্চিম দিকেও তাঁহাদের প্রবল অধিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল।[৩২]

৩১ মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতির্ভিলক্ষ্ম্যা করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশিদিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পূর্ণমাস রজনী জ্যোৎস্নাতিভার-শ্রিয়া ॥

৩২ অবশ্য সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বরেন্দ্রীকেই পালবংশের 'জনকভূঃ' বা পিতৃভূমি বলা হইয়াছে। ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন, পালরাজগণের প্রধান কেন্দ্র ছিল বরেন্দ্রভূমি।

পাল সাম্রাজ্যের শেষভাগে দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে বাঙলায় যেমন রাষ্ট্রসঙ্কট দেখা দেয়, তেমনি পালবংশের অবসানও ঘনাইয়া আসে। মহীপালের অদূরদর্শিতা এবং পারিবারিক কলহের ফলে পালবংশের বিরাট শক্তি ক্রমেই হতবল হইয়া পড়িল। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে বরেন্দ্রে দিব্বোক (দিব্য) নামক এক কৈবর্ত সামন্ত বিদ্রোহী হন এবং মহীপালকে নিহত করেন। দিব্বোক তাঁহার ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রকে বেশ কিছুদিন স্বাধিকারে রাখিয়াছিলেন। অবশ্য পরে মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল মগধ ও রাঢ়দেশের সামন্তগণের সহায়তায় দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের হস্ত হইতে পিতৃভূমি বরেন্দ্র পুনরধিকার করেন এবং ভীমকে সপরিবারে হত্যা করেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামক একখানি দ্ব্যর্থবোধক কাব্যে (একপক্ষে অযোধ্যার রামচন্দ্র, আর একপক্ষে গৌড়েশ্বর রামপাল) বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদীপ নিভিবার পূর্বে উজ্জ্বলতর হইয়া ওঠে ; অনন্ত তিমিরতলে অন্তর্হিত হইবার পূর্বে রামপাল শেষবারের মতো পালবংশ-প্রদীপটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। রাঢ়ের সামন্তগণ তাঁহার সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিলেন, উৎকলের সিংহাসনে তিনি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিকে স্থাপন করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, অঙ্গ-মগধেও তাঁহার আধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। কিন্তু নিমজ্জমানা পালরাজলক্ষ্মীকে কিছুতেই আর উদ্ধার করা সম্ভব হইল না। অন্তর্ঘাতী বিদ্রোহের ফলে পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলিয়াছিল, রামপালের পক্ষে সে অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের গতিরোধ করা কিছুদিন সম্ভব হইলেও, তাঁহার মৃত্যুর পর পালবংশ বিলুপ্তির পথে চলিল। তাহার পর বাঙলার রাজসিংহাসনে যাঁহারা উপবেশন করিলেন, তাঁহারা বাঙালী নহেন, —কর্ণাটদেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনরাজবংশ। ইঁহারাই গৌড়ের ভাগ্যবিধাতা হইলেন।

পালযুগের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমাদের অনুমান পালবংশের উৎকর্ষের মূলে ছিল সামন্তদের প্রাধান্য। গোপালদেবকে যাঁহারা নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে ঠিক 'প্রকৃতি' বা সাধারণ প্রজা ছিলেন, তাহা মনে হয় না। হয়তো অরাজকতায় বিরক্ত হইয়া সামন্তগণ বা রাজপাদোপজীবী রাজসেবকগণই (রাজকর্মচারী) গোপালদেবের

নির্বাচনের ব্যাপারে অগোচরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। মহীপালের অত্যাচারের ফলে সামন্তগণ কোথাও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কোথাও-বা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের কৈবর্ত সামন্ত দিব্বোকের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অরাজকতার সুযোগে ঢেক্করীতে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরী ঘোষ স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ইনিই বোধহয় ধর্ম-মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষ। বাঙলাদেশে এই সামন্ত-প্রাধান্য সেনযুগে—এমন কি মুঘলযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সামন্তগণ কেন্দ্রীয় শক্তি মানিয়া চলিলেও, রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেন। লক্ষ্মণ সেনের সামন্ত খাড়িমণ্ডলের (সুন্দরবন) ডোম্মন পাল এইভাবে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। পাঠানযুগেও সামন্তপ্রাধান্য অব্যাহত ছিল। মুঘলের সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় শক্তি বাঙলা-দেশের বারভূঁইয়া অর্থাৎ সামন্তগণকে নির্মূল করিয়া বাঙালীর সামন্তচক্রকে বিনষ্ট করে।

গৌড়বঙ্গে সেনশাসন ॥

পালবংশ অবসানের কিছু পূর্বে বাঙলাদেশে আরও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধমতাবলম্বী খড়্গ বংশ (৬৫০-৭০০ খ্রীঃ অঃ), বৈদিক ধর্মাবলম্বী বর্মণবংশ (১০৭৫-১১৫০ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি স্থানিক রাজবংশগুলি স্থানীয় প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। সেই দিক দিয়া সেনবংশকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। কারণ তাঁহারা বাঙালী না হইয়াও বাঙলার রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সেনবংশের আদিপুরুষ সামন্ত সেন কর্ণাটদেশে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার পর বৃদ্ধবয়সে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন কোন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। তাঁহার পুত্র বিজয় সেন পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই গৌড়েশ্বর হন এবং বর্মণরাজকে পরাভূত করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১২৫ খ্রীঃ অব্দে সম্ভবত তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৫৮ খ্রীঃ অঃ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 'অরিরাজ-

নিঃশঙ্ক-শঙ্কর' উপাধিধারী স্মার্ত পণ্ডিত বল্লাল সেন বাঙলাদেশে, বিশেষতঃ বাঙলার কুলজীগ্রন্থে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছেন। স্মৃতি ও সংহিতায় পরম প্রাজ্ঞ বল্লাল শুধু স্মৃতিগ্রন্থ ('দানসাগর' 'অদ্ভুতসাগর' প্রভৃতি) রচনা করেন নাই, বাঙলাদেশে পালযুগে সহজযান মতপ্রচারের ফলে বৈদিক ও স্মার্ত সংস্কার দুর্বল হইয়া পড়িলে তিনিই নূতন করিয়া উত্তরাপথের ভাবধারার দ্বারা বাঙলাকে পুনঃ-সংস্কৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন বাঙলার ইতিহাসে পরাজয়ের কলঙ্কতিলক ধারণ করিয়া লোকস্মৃতিতে বাঁচিয়া আছেন। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে (১১৭৮ খ্রীঃ অঃ) লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গেও তাঁহার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছিল—মগধেও প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার অবসানের পরেও বাঙলার বাহিরে তাঁহার নামানুসারে প্রচলিত লক্ষ্মণ সংবত (ল. সং.) দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং একদা তিনি ধর্মপাল-দেবপালের মতোই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ভাগ্যবিড়ম্বিত লক্ষ্মণ সেন, ইতিহাসে না হইলেও, দেশে-বিদেশে প্রায় সকলের কাছে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত। তাহার প্রধান কারণ তিনি তুরুষ্ক জাতির অধিনায়ক ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন বিন-বখ্‌তিয়ার খিলজীর অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত হইয়া অতি বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। রাঢ় ও বরেন্দ্র তুর্কী অধিকারে চলিয়া গেলেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইখ্‌তিয়ার পূর্ববঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই, তিব্বত অভিযানে গিয়া বিফল মনোরথ হন, এবং ভগ্নদেহে প্রাণত্যাগ করেন।

মিন্‌হাজ উদ্দিন নামক দিল্লীর সুলতানের এক পদস্থ রাজকর্মচারী নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ১২৬০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরে 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক যে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাতে ইখ্‌তিয়ার কর্তৃক 'নুদিয়া' জয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা অবলম্বনে আমরা এতদিন মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া আসিয়াছি এবং মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া নবদ্বীপ জয় করিয়া লয়, এই বালভোলন রূপকথাকে সত্যের মর্যাদা দিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ রূপকথা

ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে, মিন্‌হাজ উদ্দিনের বর্ণনা অতিরঞ্জিত গালগল্প মাত্র।

অবশ্য অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা একেবারে মিথ্যা নহে। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১১৯৯, ১২০২ বা ১২০৩ খ্রীঃ অঃ) নবদ্বীপ বিজিত হইবার কিছুকালের মধ্যে ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন শেষ জীবনে রাজকর্মচারীদের হস্তে রাজকার্যাদির ভার অর্পণ করিয়া নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে তীর্থজীবন যাপন করিতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পালবংশের মতো সেনারাজাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে আবার সামন্তগণ প্রাধান্য অবলম্বন করিতেছিল; প্রধান দৃষ্টান্ত—খাড়িমণ্ডলের সামন্ত ডোম্মন পালের স্বাতন্ত্র্যলাভ। তৃতীয়তঃ, বৈদিক মতাবলম্বী ও স্মার্তনীতিতে বিশ্বাসী সেনবংশ বাঙলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত নিম্নস্তরের জনসাধারণের কিছুমাত্র যোগ ছিল না—তাহারা তখনও কালচক্রযান, বজ্রযান, সহজযান, নাথধর্ম প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের সুড়ঙ্গপথে গতায়াত করিতেছিল। চতুর্থতঃ, সেনগণ বিদেশী, বহিরাগত; ফলে বাঙলার জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের নিবিড় পরিচয় স্থাপিত হইবার অবকাশ ঘটে নাই; ইত্যাদি কারণে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতে পারে নাই—বৃদ্ধ, অশক্ত ও ধর্মজীবনে আত্মস্থ লক্ষ্মণ সেন সেরূপ কোন চেষ্টাও করেন নাই।

এই সময়ে হিন্দুসমাজে বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী বলিয়া বিশেষভাবে নিন্দিত হইত। ঐরূপ রাষ্ট্রিক সঙ্কটের সময়ে এই 'সদ্ধর্মিগণ' কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাও বিবেচ্য। লামা তারনাথের মতে, এই সময়ে বৌদ্ধগণ নাকি ইখ্‌তিয়ারের গুপ্তচরের কার্য করিয়াছিল। কথাটা অমূলক নাও হইতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কৌতূহলোদ্দীপক যে ছড়াটি পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, মুসলমান কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণ ও হিন্দু-নির্যাতনে বৌদ্ধগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। উক্ত ছড়াটির কিয়দংশ—

নিরঞ্জন নিরাকার হইল ভেস্ত অবতার
মুখেত বলয়ে দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ সভে হৈয়া একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার

ব্রহ্মা হইল মহাম্মদ বিষ্ণু হইল পেগাম্বর
আদম হইল শুলপাণি
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুণি ॥—শূন্যপুরাণ

'নিরঞ্জন নিরাকার' অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্য দেবদেবীগণ মুসলমানের বেশ ধরিয়া বৈদিক হিন্দুদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন—'শূন্যপুরাণে'র এই ছড়াটির ইহাই তাৎপর্য। সুতরাং এই প্রকার সামাজিক অনৈক্যের ফলে সেনযুগের শেষ-ভাগে গৌড়ের রাষ্ট্রযন্ত্র যে কতদূর বিকল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়; ইহার ফল লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়—বাঙালীর ভীরুতাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। ইহা ছাড়িয়া দিলেও তৎকালীন আর্যাবর্তের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে, লক্ষণ সেন অতর্কিতে আক্রান্ত না হইলেও নববলে উদ্দীপ্ত মুসলমানের শাণিত তরবারিকে হিন্দুগণ দীর্ঘকাল বাধা দিতে পারিতেন না। ইখ্‌তিয়ারের নবদ্বীপ জয় আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, সমকালীন আর্যাবর্তের অধঃপতিত ইতিহাসের ইহাই অন্তিম পরিণতি। 'নুদিয়া' বিজয়ের জন্য বাঙালী জাতি বা লক্ষ্মণ সেন—কেহই দায়ী নহেন। লক্ষ্মণ সেন না হয় বার্ধক্য বা ভীরুতাবশতঃ তুর্কী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরাপথের হিন্দু নৃপতিগণই কি মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনরূপ ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তবেই তো ইসলামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা পূর্বভারতে প্রোথিত হয়। সুতরাং বঙ্গে মুসলমান অধিকার স্থাপনের মূল কারণ লক্ষ্মণ সেনের নিষ্ক্রিয়তা নহে, আর্যাবর্তবাসীদের পারস্পরিক কলহ ও ক্ষতিকর অনৈক্যই মুসলমান শক্তিকে এতখানি উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছিল।[৩৩]

॥ ৩ ॥

জনজীবন-ধারা

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে তৎকালীন জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ

[৩৩] এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা হইয়াছে: *History of Bengal*, Vol. I (D. U.), বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বাংলা দেশের ইতিহাস—ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ বাঙলার জনজীবনের নির্মিতিরহস্য উদ্‌ঘাটন করিলে যে বিচিত্র জীবনধারার রাসায়নিক সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যাইবে, তদ্দ্বারা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তাৎপর্য এবং বাঙালী-জীবনের সহিত এই সাহিত্যের আত্মিক সম্পর্ক অনুধাবন করা যাইবে। কাজেই সাহিত্য আলোচনার পূর্বে যে-জীবনধারা ও মনোভঙ্গীর মধ্যে সেই সাহিত্য বিধৃত হইয়া আছে, তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে।

জনতত্ত্ব ॥

বিভিন্ন মানুষের জাতিগত সংমিশ্রণে বাঙালী নামক যে মিশ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইতিহাস প্রায়শঃই ছায়াধূসর প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত। বিশেষজ্ঞেরা বাঙালীসমাজের বিভিন্ন মানুষের করোটি মাপিয়া, দেহের নৃতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালী জনতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রায়ই পরস্পরবিরোধী। রিজ্‌লে সাহেব বাঙালীজাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা স্বীকার করেন নাই; চন্দ মহাশয় যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন তাহা আবার হারাণচন্দ্র চাকলাদার মানিতে পারেন নাই; এবং পূর্বতন আচার্যদের মতবিরোধিতা করিয়া শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহোদয় আবার ভিন্নতর মত পোষণ করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন মতামতের জটিলতার ফলে সাহিত্যের ঐতিহাসিক যে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তবু সাহিত্যের বাস্তভিত্তিকে অপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপরে কোন প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

যেখান হইতে ইতিহাস শুরু হয়, তাহার পূর্বেও আর-একটা পরিচ্ছেদ আছে —তাহা প্রাগিতিহাস। যাহার লিপিলেখন নাই, পুঁথিপত্র নাই, মঠমন্দির শিল্প-কর্মের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। একমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রাগিতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিছু প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্রাদি, নরকঙ্কাল—কিছু-বা উত্তরপুরুষদের নৃতাত্ত্বিক মাপজোখ এবং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দ্বারাই প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠী-সম্বন্ধে কিছু আলোক নিক্ষেপ করা যাইতে পারে,—অবশ্য সে আলোক অতিশয় নিষ্প্রভ।

জনতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙলাদেশের প্রাগিতিহাস ও

ইতিহাসযুগের নরগোষ্ঠী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—প্রাগার্য নরগোষ্ঠী এবং আর্য নরগোষ্ঠী। প্রাগার্য নরগোষ্ঠীই বাঙালী-জীবনের মেরুদণ্ড। আর্যীকরণের যুগে এই আদিম নরগোষ্ঠীর দেহে ও মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উত্তরাপথের আর্যজনের পালিশ পড়িয়াছে মাত্র। নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বাঙলার আর্যেতর জন মূলতঃ নেগ্রিটো (Negrito-Negroid), অষ্ট্রিক (Austric) দ্রাবিড এবং ভোটচীনীয় (Sino-Tibetan)—মোট চারিটি শাখায় বিভক্ত।

নিগ্রোদের অনুরূপ দেহগঠনযুক্ত একপ্রকার আদিম জাতি আজ হইতে বহু বৎসর পূর্বে ভারতে বাস করিত। দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজ আর ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না। এখনও আসামের পার্বত্যজাতির মধ্যে ইহাদের শেষ চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে, অবশ্য অনুমানমাত্র। আসাম ছাড়াও ভারতের অন্যান্য স্থানে কদাচিৎ কোন আদিবাসী মানুষের দেহগঠনের মধ্যে নেগ্রিটো জাতির চকিত আভাস পাওয়া যায়। বাঙলাদেশের প্রান্তে প্রত্নপ্রস্তর যুগের কয়েকটি অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। অনুমান ইহারা হয়তো এই অমসৃণ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত এবং কৃষিকর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া আদিম স্তরের জীবন যাপন করিত। বাংলাভাষা বা বাঙালীর জনজীবনে ইহাদের প্রভাবের অনুমাত্রও আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বাঙালীজাতির মধ্যে প্রধান অংশটি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীসম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে ‘নিষাদ’ জাতি বলিতে চাহেন। পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বাঙলাদেশের যে নিন্দা করা হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ এই অষ্ট্রিক জাতি। ইহারা কৃষিসভ্যতার ধারক হইলেও সাধারণতঃ সভ্যতা ও কৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝায়, ইহারা তাহা হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিত। ইন্দোচীন হইতে অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা আসাম হইয়া বাঙলায় প্রবেশ করে অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এবং ক্রমে ক্রমে নেগ্রিটো জাতিকে উৎখাত করিয়া বা গ্রাস করিয়া এদেশে সর্বপ্রথম একটা আদিম স্তরের সঙ্ঘবদ্ধ জনজীবন ও ভূমিচারী সভ্যতা সৃষ্টি করে। ইহারাই ভারতের আদিবাসী, কোল ভীল, সাঁওতাল (প্রাচীন গ্রন্থের নিষাদ, কোল্ল-ভীল্ল), মুণ্ডা প্রভৃতির পূর্বপুরুষ, বাঙালীর রক্তে ইহাদের প্রভাব অল্প নহে। তাই পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বাঙালী নিম্নবর্ণের সহিতই বাঙালী ব্রাহ্মণের অধিকতর দৈহিক সাদৃশ্য দেখা যায়। আধুনিক

কালের বাঙালী হিন্দু—কি 'জল-অচল', আর কি 'জল-চল'—উভয় শ্রেণীর জীবনধারা আচার-আচরণ জন্ম-মরণ, বিবাহসংস্কারের মধ্যে এই অষ্ট্রিক জাতির প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু বাংলাভাষার মধ্যেই ইহাদের বিশেষ প্রভাব দেখা যাইতেছে। বাংলাভাষায় আমরা প্রত্যহ যে শব্দ ব্যবহার করি, অনেক গ্রাম ও নদ-নদীর নামেও যে শব্দ বাঁচিয়া আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অষ্ট্রিক প্রভাবান্বিত। যেমন দৈনিক ব্যবহার্য শব্দ—বাখারি, খামার, পাগল, পেট, ঝোড়ঝাড়, ঝোপ, ডোম, চোঙা, চোয়াল, দা, বাইগন (বেগুন), পসার, গড, নারিকেল, কদল, তাম্বুল, গুবাক—এ সমস্তই অষ্ট্রিক শব্দ এবং সম্ভবতঃ এই ফলের গাছগুলি ইহাদের দ্বারা বাহির হইতে আনীত। দামোদর, গঙ্গা, কপোতাক্ষ, (কবতক্ষ)—এই নদ-নদীর নামগুলিও মূলতঃ কোলগোষ্ঠীর ভাষা হইতে আসিয়াছে, শুধু পরবর্তী কালে কিছু আর্যীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধ, নাথপন্থ, ধর্মঠাকুরের পূজা, শিবের গাজন, মেয়েদের ব্রত-আচার—সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তরালে হয়তো এই অষ্ট্রিকজাতির পরোক্ষ প্রভাব আছে।

তাহার পরে উল্লেখ করিতে হয় দ্রাবিড়ভাষী জাতির কথা। অষ্ট্রিক জাতি যেমন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাঙলায় প্রবেশ করে এবং ক্রমে সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া পড়ে, দ্রাবিড়ভাষী জাতিও সেইরূপ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। অবশ্য ইদানীং দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করা হইতেছে না। নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, দ্রাবিডভাষাভাষী জাতি থাকিলেও দ্রাবিড নামক কোন নরগোষ্ঠী কোন সময়ে বর্তমান ছিল কিনা সংশয়স্থল। বর্তমান প্রসঙ্গে সে জটিল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আলোচনার সুবিধার জন্য শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, অষ্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে আজি হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে দ্রাবিডভাষী জাতি প্রবেশ করে। এই দ্রাবিড় জাতির আদিনিবাস ছিল ইরাণ, ইরাক, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, ও গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে। ইহাদের সহিত সুমেরীয়, আসিরীয়, বাবিলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সাদৃশ্য আছে। সে যাহা হউক, দ্রাবিড় জাতি সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিল এবং তাহারা অল্পকালের মধ্যে অষ্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বাঙলাদেশেও এই স্বাঙ্গীকরণের পালা

চলিয়াছিল। বাঙলার আর্যেতর জাতি বলিতে আমরা এই উভয় জনের সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতিকেই বুঝি। বাঙালী উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের মধ্যে এই অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র জাতির রক্ত প্রবহমান। আর্য সভ্যতায়ও দ্রাবিড় জাতির প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। বাঙলাদেশে ও ভাষায় ইহাদের প্রভাব অল্প নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দ্রাবিড়গণ নাগরিক-সভ্যতায় পারদর্শী ছিল; কিন্তু বাঙলাদেশে যদি দ্রাবিড়দের প্রভাবই থাকিবে, তাহা হইলে প্রাক্-মুসলমান যুগে এখানে নাগরিক সভ্যতার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না কেন? অনুমান, প্রথমতঃ, এখানে হয়তো পূর্বে-আগত অষ্ট্রিক জাতির অধিকতর প্রভাব ছিল; দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বাঙলার নাব্যভূমিতে স্বভাবতঃই একটা কৃষিসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

দ্রাবিড়গণের প্রভাবে এদেশে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার মতো কোন নাগরিক সভ্যতা গড়িয়া না উঠিলেও বাংলাভাষায় ইহাদের নানা প্রভাব রহিয়াছে। গ্রামের নাম—মুড়ুন্দী, বালুটে, নাড়াজোল, ডোমজুড়, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, হাওড়া, চুঁচুড়া, রিষড়া, সোমড়া, চাপড়া,—এগুলিকে দ্রাবিড় বলিয়াই মনে হয়। যে সমস্ত দ্রাবিড় শব্দ সংস্কৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে (উর, পুর- কুট প্রত্যয়ান্ত নগর বাচক শব্দ, এবং রূপ, কলা, কপি, মর্কট, ময়ূর তণ্ডুল, ব্রীহি, শিব<শিবম্, শম্ভু<শম্বু প্রভৃতি), তাহাকে না হয় এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া গেল। প্রত্যহ আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কত যে দ্রাবিড় শব্দ ব্যবহার করি তাহারও ঠিক ঠিকানা নাই। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার *The History of the Bengali Language* গ্রন্থে বাঙলায় ব্যবহৃত বহু দ্রাবিড় শব্দের তালিকা দিয়াছেন। কাঁইবিচি, খোকা-খুকি, খাড়ি, ঘোঁটা, গণ্ডগোল, গঁদ, ছোলা, ছেলে-পিলে (পিল্লাই), আরও কত শব্দ বাংলাভাষার ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে—যাহারা মূলতঃ দ্রাবিড় বংশীয়।

অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির জনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এদেশের যে নিন্দা আছে, তাহা প্রধানতঃ এই মিশ্র অষ্ট্রো-দাবিড় জাতির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে উৎসাহী আর্যগণ এদেশে আসিয়া কিছুকাল বসবাস করিতেন, খাদ্য,

শৌচাশৌচ ও যৌনাচারে মিশ্র জাতির সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারাই 'ব্রাত্য' 'বৃষল' ও 'অদীক্ষিত' নামে নিন্দিত হইতেন।

বাঙলাদেশে দ্রাবিড়দের পরে আর্যদের আগমন হইলেও আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য আগে ভোটচীনীয় বা তিব্বতচীনীয় গোষ্ঠীর কথা সারিয়া লইতেছি। ভোটচীন জাতির (Sino-Tibetan) মূল শাখা ইয়াং-সিকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে বাস করিত। সম্ভবতঃ উহারা খ্রীঃ প্রথম সহস্রাব্দের নিকটবর্তী সময়ে হিমালয় পার হইয়া ভোটতিব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ বাঙলাদেশে আর্যীকরণের পরেই ইহারা এতদঞ্চলে আগমন করে। তাই বাঙলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এখনও ইহাদের জাতিহিসাবে স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। বাঙালীর শিরাধমনীর মধ্যে বা ভাষায় ইহাদের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার আর্যীকরণ ইহাদের আগমনের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহারা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। বোধহয় তিস্তা নদীটির নাম (আর্যীকৃত নাম 'ত্রিস্রোতা') ভোটচীনীয় 'দিস্তাং' হইতে আসিয়াছে। ভাষা ও সংস্কৃতিতে ইহাদের বিশেষ কোন প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না, যদিও মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে বাঙালীর মধ্যে দুই-একটি উৎকট-রকমের পীত-মানুষের সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়।

বাঙলাদেশে এই যে প্রাগার্য আদিম জাতি, যদিও ইহারা বাঙালী জন-সাধারণের তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করিয়া আছে এবং বাংলাভাষা ও গ্রামীণ বাঙালীর জীবনে এখনও তাহাদের প্রভাব স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু বাঙলাদেশে আর্য অভিযানের পর এই সমস্ত অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় জন আর্যভাষা ও জীবনধারার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইহারাই সর্বপ্রথম পূর্ব-ভারতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, জৈনধর্মকে স্বীকৃতি দেয়; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইহাদের মানসলোকে নূতন প্রভাব বিস্তার করে; এবং উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এই আর্যেতর বাঙালী জাতি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে ৭ম শতকের মধ্যে আর্যপরিমণ্ডলে শ্লাঘনীয় আসন লাভ করে।

বাঙলায় আর্যীকরণ ॥

আর্যসংস্কৃতির মূল কথা গ্রহণীশক্তি,—অন্য কথায় গ্রাস করিবার অপরিমেয়

সামর্থ্য। সেই সামর্থ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে একটা তীব্র গতিশীল যাযাবর জীবনবেগ। তাহারই ফলে আর্যগণ ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করিয়া আর্যাবর্তে, আর্যাবর্ত হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্বে প্রসৃত হইয়া মগধ, অঙ্গ, মিথিলা, কলিঙ্গ, রাঢ়, বঙ্গে আপনাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করেন। আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ যুগে বাঙলাদেশ 'মধ্যদেশের' আর্যদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল না; তাহার পরেও দীর্ঘকাল এদেশ বিশিষ্ট-জনপদ-বহির্ভূত ছিল। অঙ্গ ও মগধে আর্যীকরণ প্রথম আরম্ভ হয় এবং তাহার তরঙ্গ আসিয়া আহত হয় রাঢ় ও পুণ্ড্র অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই পূর্বাঞ্চলে আর্যেরা যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসের লুপ্ত গ্রন্থে ('ইণ্ডিকা') 'গঙ্গারিডই' ও 'প্রাচ্য' জাতির সশ্রদ্ধ উল্লেখ ছিল; গঙ্গানদী এই গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্বসীমা। অনুমান এই গঙ্গারিডই হইতেছে প্রাচীন রাঢ়ভূমি। বাঙলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক) পূর্বাঞ্চলে আর্যপ্রভাব বিস্তারলাভের সুযোগ ঘটিল। মৌর্য বিজয় হইতে গুপ্তাধিকার পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ৩০০—খ্রীঃ ৫০০ অব্দ) মোট আট শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আর্যীকরণের ধারা চলিতেছিল। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে য়ুয়ান চুয়াং যখন বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এখানে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যমত ও বৌদ্ধ-জৈনমতের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনি দেখিয়াছিলেন, সমগ্র বাঙলাই আর্যভাষী হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের অনুমান, মৌর্যযুগ (খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) হইতে য়ুয়ান চুয়াঙের আগমন কাল (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) পর্যন্ত —এই হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙালীর আর্যীকরণের ধারা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

'অর্থশাস্ত্রে' (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) পুণ্ড্র, সুবর্ণকুড্য (মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত ?) ও বঙ্গের রেশমজাত দ্রব্যের প্রশংসা আছে। সুতরাং ৪র্থ খ্রীঃ পূর্বের পূর্ব হইতেই বাঙলার সহিত উত্তরাপথের, বিশেষতঃ মগধের বাণিজ্যিক ব্যবহার চলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩য় অব্দে মগধ ও কলিঙ্গ অশোকের শাসনভুক্ত হয়; বোধহয় তাম্রলিপ্তিতেও অশোকের শাসন সম্প্রসারিত হইয়াছিল। 'দিব্যাবদান' অনুসারে মনে হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধন অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।[৩৪] এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, বাঙলায় গুপ্তযুগ (৪র্থ-৫ম

[৩৪] Edited by E. R. Cowell and R. A. Neil—*Divyavadan* (1886)

শতক) আরম্ভের পূর্বেই আর্যজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির গতায়াত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

গুপ্তযুগেই বাঙলাদেশে আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণ মধ্যদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙলাদেশে বসবাস করিতে সাহায্য করিতেন। নিম্নে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মণ্যমত ॥

গুপ্তযুগের পূর্বে বাঙলায় আর্য আগমন আরম্ভ হইলেও ঠিক যাহাকে ব্রাহ্মণ্যমত বলে, অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসংস্কৃতি—তাহা গুপ্তযুগ হইতেই এদেশে প্রচারিত হয়। অবশ্য য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকেরা যে সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম (Brahminical Religion) এবং সমাজতাত্ত্বিকগণ যাহাকে পুরোহিততন্ত্র বলেন, তাহা প্রাচীনযুগে আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইত না, অন্ততঃ বাঙলাদেশে হয় নাই। তবে একথা সত্য যে, গুপ্তরাজ, সেনরাজ ও বর্মণ রাজগণ বৈদিক স্মার্ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন এবং উত্তরাপথের সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে মধ্যদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। গুপ্তযুগের অনুশাসনগুলিতে এই ব্রাহ্মণ আনয়ন, অগ্নিহোত্র, পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার অনেক প্রসঙ্গ রহিয়াছে। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে দুইশত পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে শ্রীহট্টে ভূমিদান করিয়া বসবাস করান হইয়াছিল। পালরাজগণ ধর্মমতে মহাযান বৌদ্ধ হইলেও বৈদিক ও স্মার্ত আচারবিচারের প্রতিকূলতা করিতেন না। অবশ্য পূর্বভারতে বেদবিদ্যা উচ্চস্তরে সুপ্রচলিত থাকিলেও ব্যাপক অনুশীলনের অভাবে ইহা ক্রমশঃই অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছিল। আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের গল্প ইতিহাস-সম্মত না হইতেও পারে, কিন্তু গুপ্তযুগ হইতে সেন-আমল পর্যন্ত বাঙলাদেশের শাসকবর্গ যে আর্যাবর্ত হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি পৌরাণিক যুগের ধর্ম ও দেবদেবীর আরাধনা-জনসাধারণের মধ্যে নানাভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, বর্মণ ও সেনরাজগণ এ বিষয়ে অধিকতর উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। ফলে

জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ অষ্ট্রো-দ্রাবিড় ধর্মবোধ ও বৌদ্ধ-জৈনমতের সংমিশ্রণজাত একটা মিশ্র ধর্মাচার—তাহার সহিত এই আর্যীকরণের কতদূর যোগাযোগ ছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। শ্যামলবর্মা সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবাদী' সামন্ত সেন শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে যাগযজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন তো পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিলেন। তবে রাজসামন্ত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও শ্রুতিস্মৃতি লইয়া মত্ত থাকিলেও, জনসাধারণের ধর্মবোধ ও জীবনচর্যার সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল না বলিয়াই অনুমিত হয়। তথাপি সেনযুগে যখন ভিন্ন দেশবাসী রাজগণ হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য নানা স্মৃতির অনুশাসন রচনা করিতে লাগিলেন, সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের উৎসাহ দিলেন,—তখন একটা গুরুতর ব্যাপার অলক্ষিতে সমাধা হইল। বাঙালীর আর্যেতর সংস্কারের উপর, বৈদিক না হইলেও, পৌরাণিক সংস্কৃতির পলিমাটি পড়িতে লাগিল এবং এই সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ সেনযুগেই একপ্রকার পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই ব্যাপার ঘটিতে বিলম্ব হইলে তুর্কী অভিযানের পর বাঙলার হিন্দুসমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপ্রবেশ বাধা দিতে পারিত না। বস্তুতঃ তুর্কী অভিযানের অনেক পরে খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে যে বাঙালী হিন্দু-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহার অনেকটাই এই সেনযুগের সৃষ্টি।

অনেকে পালযুগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে, পালগণ সাধারণ বাঙালীর সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারা যে ধর্মমতে বিশ্বাস করিতেন, তাহা সমকালীন বাঙালীরই গণধর্ম। তাঁহাদের লিপিলেখনেও জনসাধারণের কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে। সেই তুলনায় সেনগণ বাঙলার সংস্কৃতিকে গণমানস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরোহিতের সাহায্যে একটা কৃত্রিম বৈদিক-স্মার্ত সংস্কৃতির দুর্বহ ভার সাধারণ বাঙালীর শিরে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। সেনযুগের লিপিলেখনে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের কথা যতবার বলা হইয়াছে, সাধারণ লোকের কথা ততটা নাই। কিন্তু পালগণ ধর্মমতে অতিশয় উদার ছিলেন; তাঁহারা ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াও বৈদিক-পৌরাণিক অনুষ্ঠানে বাধা দিতেন না, বরং কোথাও কোথাও ইহার সহিত সহযোগিতা করিতেন।

অপর দিকে সেনগণ প্রবলভাবে পৌরাণিক মতাবলম্বী ছিলেন, কোন বৌদ্ধ সংঘারাম ও ভিক্ষুকে কিছু দান করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। বল্লাল সেন তো নাস্তিকদের (বৌদ্ধ) উচ্ছেদের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্মন রাজবংশের প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট ভবদেব 'বৌদ্ধপাষণ্ড বৈতণ্ডিকের' দর্প নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১১শ শতাব্দীতে বঙ্গালদেশের সৈন্যগণ সোমপুর মহাবিহার (রাজশাহীর পাহাড়পুর) ধ্বংস করিয়াছিল। সেনযুগে হিন্দু-বৌদ্ধে কিছু বিরোধ ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তুর্কী আক্রমণের পর বাঙালী যখন নূতন করিয়া ঘর-দুয়ার গুছাইতে আত্মনিয়োগ করিল, তখন এই পৌরাণিক সংস্কৃতি তাহার আন্তর সত্তাকে বর্মের মতো রক্ষা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, আর্যাবর্তের বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং স্মার্ত আচারবিচার বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, তাঁহাদের এই অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। বাঙালার রাজন্যতন্ত্রে যদি 'পালায়ন' স্থায়ী হইত, এবং সেনবংশের আবির্ভাব না হইত, তাহা হইলে আজ বাঙলার যে সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহা মধ্যযুগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়াও এক বংশোদ্ভূত বলিয়া আমরা পরম গৌরব বোধ করিতেছি, তাহা যে কোন্ রূপান্তর গ্রহণ করিত, তাহা বলা যায় না। বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য লোকধর্ম বাঙালীর একমাত্র সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হইলে মধ্যযুগে আমরা বড় জোর চর্যাগীতি, নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন আর কিছু আউলবাউল ও সহজিয়াদের সাধনসঙ্গীত পাইতাম। বৈষ্ণবসাহিত্য ও অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালী-জীবনের যে বিচিত্র রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার আবির্ভাব বহু বিলম্বিত হইত। তাই বাঙালী-মানসের পূর্ণ বিকাশের জন্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অত্যাবশ্যক ছিল।

বৌদ্ধ ও জৈন মত ॥

বাঙলাদেশে আর্যীকরণের ধারার সহিত সমান্তরাল রেখায় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব দীর্ঘকাল বহমান ছিল। পূর্বভারতে যে অবৈদিক ব্রাত্য সংস্কার প্রচলিত ছিল, বোধহয় তাহা জৈন ও মহাযান বৌদ্ধমতকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। এই মত দুইটিকে আমরা আর্যেতর ধর্মচর্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইহারা বেদবিরোধী হইয়াও ভারতীয়

সংস্কার বর্জন করে নাই এবং করে নাই বলিয়া বাঙলাদেশে ইহারা পৌরাণিক সংস্কারের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছে। একদা এদেশে বিশেষতঃ পুণ্ড্রবর্ধনে জৈনমতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। 'আয়ারাংগ সুত্তে' বর্ণিত মহাবীরের কাহিনী অনুসারে মনে হয়, রাঢ়ের অস্ট্রো-দ্রাবিড় জন প্রথমে জৈনধর্মকে বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করে নাই—যদিও খ্রীঃ পূঃ ২য় অব্দের পূর্বেও বাঙলাদেশে জৈনমত সুপ্রচারিত হইয়াছিল।[৩৫] অতি প্রাচীন কালেই জৈনমতের মধ্যে চারিটি উপশাখা সৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে তিনটি শাখাই বাঙলার অন্তর্ভুক্ত; যথা—তাম্রলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় (বাণগড) এবং পুণ্ড্রবর্ধনীয়। সুতরাং একসময়ে বাঙলাদেশে জৈনধর্ম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পাল বা সেন যুগের লিপিলেখনে জৈনমতের বিশেষ উল্লেখ নাই। অবশ্য য়ুয়ান চুয়াঙ (৭ম শতাব্দী) বাঙলাদেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়া উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে জৈনমতের প্রসার দেখিয়া গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও পৌরাণিক মতের মাঝখানে পড়িয়া জৈনমত বাঙালীর নিকট ক্রমশঃ হতাদর হইয়া পড়ে।

বাঙলাদেশে বৌদ্ধমত যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জানা যাইবে ফা-হিয়েন, য়ুয়ান চুয়াঙ, ইৎসিঙ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলে। অশোকের সময় হইতেই বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং সে প্রভাব পালরাজত্বের চারি শত বৎসরব্যাপী শাসনে সুদৃঢ় হইয়াছিল। বহু বৌদ্ধ অধ্যাপক, প্রচারক, ভিক্ষু, যতি বাঙলাদেশকে ধন্য করিয়াছিলেন; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শীলভদ্র এই বাঙলার সমতটের এক রাজপুত্র ছিলেন। কুমিল্লার রাজবিহার, তাম্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধসঙ্ঘ, পুণ্ড্রবর্ধনের বিশটিরও অধিক বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুর বিহার, ওদন্তপুর বিহার, জগদ্দল বিহার, দেবকোট বিহার, পট্টিকের বিহার—এখানে অসংখ্য বাঙালী শ্রমণ, আজীবক, আচার্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন। পালযুগে বহু বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বাঙালী সংস্কৃতির পৌরাণিক স্তরের অন্তরালে এখনও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বহমান—অবশ্য কিঞ্চিৎ প্রচ্ছন্নভাবে। মহাযান বৌদ্ধমত ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই বাঙালীর প্রভাবে যে অভিনব রূপান্তর লাভ করিল, তাহা ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে এক

৩৫ *History of Bengal*, Vol. I (D. U.)

বিচিত্র ব্যাপার। মহাযান মত হইতে উদ্ভূত সহজিয়া ধর্ম পূর্বভারতের আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্মে বাঙালীর দান।[৩৬]

বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন ও বৌদ্ধ মতের প্রভাবে পূর্বাঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের অস্ট্রো-দ্রাবিড় সংস্কার এমনভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে যে, আজ তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া সহজ নহে। আর্যীকরণের যুগে রাজন্য, সামন্ত, যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়, রাজপাদোপজীবী অভিজাত সম্প্রদায় আর্য হইবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিলেন এবং বোধহয় মৌর্যযুগ হইতে সেনযুগ পর্যন্ত প্রায় দেড হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশের উচ্চ কোটির জনসাধারণ কোথাও পৌরাণিক কোথাও-বা জৈন-বৌদ্ধ বনিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু নিম্ন কোটির জনসাধারণ অত সহজে পৈত্রিক সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে নাই, হয়তো উচ্চ বর্ণের নিপীডনের ভয়ে কখনও মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিয়াছে, কখনও-বা প্রবল জলস্রোতের মুখে নমনীয় বেতসীলতার মত উচ্চ বর্ণের সংস্কারকে কিয়দংশে গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু নব-অর্জিত আর্য সংস্কারকেও আপনাদের দীর্ঘকাল অনুশীলিত শীলসদাচারের দ্বারা এমনভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে যে, আজ তাহা সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বাঙলার জনজীবন, যাহা অন্ততঃ দেড হাজার বৎসরের অনুশীলন, গ্রহণবর্জন, স্বাঙ্গীকরণ ও রূপান্তরীকরণের দ্বারা একটা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিবর্তিত হইয়াছে।[৩৭]

৩৬ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৭ 'জনজীবনধারা' সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে : বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম (রাখালদাস), বাঙ্গালীর ইতিহাস (নীহাররঞ্জন) বাংলাদেশের ইতিহাস (রমেশচন্দ্র), পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি (বিনয় ঘোষ), বৃহদ্‌বঙ্গ—১ম (দীনেশচন্দ্র), প্রাচীন বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়), *History of Bengal*, Vol. I (D U.)

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য

বাঙলাদেশে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের চর্চা, অনুশীলন ও রচনা চলিয়াছিল। বস্তুতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাণরহস্যের যবনিকা উন্মোচন করিতে হইলে আদিপর্বের সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনেরও পরিচয় লইতে হইবে। কারণ বাঙালীর চিত্তলোকে উত্তরভারতীয় প্রভাবটুকু প্রধানতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যের বাহনেই উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তরভারতীয় আর্যপ্রভাব না পড়িলে বাংলা সাহিত্য আজ যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকীর্তিরূপে শ্রীসৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, হয়তো তাহার সেই উৎকর্ষ অতীতের গর্ভেই অবলুপ্ত হইয়া যাইত; কোন প্রান্তীয় অঞ্চলের অপরিণত-গঠন ভাষা ও সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্য পূর্বভারতের আর্দ্র ভূমিতে আত্মগোপন করিয়া থাকিত। কিন্তু বিধাতার কোন্ অভিপ্রায়ে বাঙলাদেশে আর্য আগমনের সমকালেই সংস্কৃতচর্চা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে! যে সমস্ত আর্য এদেশে আসিতেন তাঁহারা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিলেও পোষাকী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষাকেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন; সংস্কৃতই ছিল তাঁহাদের আধিমানসিক 'রাষ্ট্রভাষা'। শাসক, বণিক, বিশেষতঃ পুরোহিত-সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে কাজকর্ম চালাইয়া যাইতেন, বাঙলায় আর্যীকরণের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'সংস্কৃতি-করণের'ও একটা প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। তাই এদেশেও স্মৃতিসংহিতা বেদপুরাণ, তন্ত্রমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাদি যেমন সংস্কৃতে অনুশীলিত হইত, তেমনি আবার বিশুদ্ধ সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্যাদি এখানে নিতান্ত অল্প রচিত হয় নাই। বাঙালী কবির 'গীতগোবিন্দ' একদা সর্বভারতে কালিদাসের 'মেঘদূতের' মতো প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

অবশ্য বাঙালীর সংস্কৃতচর্চা প্রায়ই প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। শাস্ত্রসংহিতার প্রভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সমাজের উচ্চস্তরে সংস্কৃতচর্চা কিছু কিছু প্রচার লাভ করিলেও সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর

কৃতিত্ব সামান্যই। 'গীতগোবিন্দ' ছাড়িয়া দিলে বাঙালীর রচিত আর কোন সংস্কৃত 'সুকুমার সাহিত্য' সর্বভারতীয় প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান শাখা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র-সংহিতার ছায়াপাত হইয়াছে, এবং হইয়াছে বলিয়াই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মতো একটা অপরিণত-গঠন দুর্বল সাহিত্য মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বিশাল সংস্কৃতির বাহক হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চা বাঙালীর সাহিত্য-জীবনকে যে নানা দিক দিয়া রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, উত্তরভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্রানুশীলন বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জাতির মনোজীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল বলিয়াই পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি একটা সৃষ্টিক্ষম বিপুলবিস্তারী সাহিত্যের বাহক হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ১ ॥

গুপ্তযুগের পূর্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচ্যভূমি নানা অপনামে আখ্যাত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহাভারতের যুগেও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র-তীরবাসী জনগণকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হইয়াছে। আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও এই সমস্ত আর্যেতর জাতির সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার ধারা বাঙালীর বাস্তবজীবনে ও ভাবজীবনে এমন সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে যে, এখনও তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর নহে। যাহা হউক, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্যে প্রাচ্য খণ্ডের আদিজাতির ভাষাগত নানা বৈশিষ্ট্য আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের মনোলোকের ভাববৈচিত্র্যগুলিও মহাযান শাখার 'উপযানে'র মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তী কালের নাথসাহিত্য, ধর্মঠাকুরের বার-ব্রতপূজা-উপাসনা, শিবের গাজন, গম্ভীরা গান, বৌদ্ধ-সহজিয়া ও বৈষ্ণব-সহজিয়া নানা গুরুমুখী আচার-আচরণের মধ্যে তাহার ক্ষীণতম ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পাণিনির পূর্বে (খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্বে) প্রাচ্য অঞ্চলে অর্থাৎ অঙ্গ-বঙ্গ-গৌড়ে যে একটা বিশিষ্ট বৈয়াকরণ রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা

স্বীকার করিতে হইবে। উদীচ্যের অধিবাসী পাণিনি অবশ্য উদীচ্য রীতিকে ব্যাকরণের শিষ্টরীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে 'অষ্টাধ্যায়ী'র নানা স্থানে তিনি প্রাচ্য খণ্ডের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু ভাষারীতিই নহে, প্রাচীর জন, দেশ, নগরগ্রাম, খেলাধূলা, উচ্চারণপদ্ধতি প্রভৃতিরও উদাহরণ দিয়াছেন। ইহাতেই অনুমিত হয় পাণিনির বহু পূর্ব হইতে প্রাচ্য অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল; হয়তো এই সময়ে প্রাচ্যদেশবাসিগণ সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচনাও করিয়া থাকিবেন। তবে গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচ্য অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশেষ কোন সাহিত্য বা অন্যবিধ রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না।

মৌর্যযুগেই বোধহয় বাঙলাদেশে আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রসার আরম্ভ হয়। মহাস্থানের নিকট এই যুগে ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে কেহ কেহ বাঙলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যচর্চার লিখিত রূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই লিপিটি মাগধী প্রাকৃতে রচিত; অনুমান মৌর্যযুগে বাঙলাদেশে প্রাকৃতভাষা রাজকার্যাদিতে ব্যবহৃত হইত; তাহা না হইলে রাজাজ্ঞা-জ্ঞাপক উক্ত লিপিটি প্রাকৃতভাষায় উৎকীর্ণ হইত না। পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) সর্বপ্রথম মৌর্যাধিকারে আসে; উক্ত লিপিতেও 'সংবংগীয়' এবং 'পুণ্ড্রনগরের' উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাঙলাদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে মৌর্যযুগের আর্যভাষা (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উত্তরভারত হইতে আগত বণিক, যাজক-পুরোহিত, জৈনবৌদ্ধ যতি-সন্ন্যাসীর দল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত সংহিতা ও সাহিত্য গ্রন্থাদি লইয়া বাঙলাদেশে আসিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে এই আর্যভাষা স্থানীয় ভাষাকে একেবারে পর্যুদস্ত করিয়া ফেলে। যে-সমস্ত 'কোল্লভীল্ল' কৌম পার্বত্য অঞ্চল ও দুর্গম অরণ্য প্রদেশে পলাইয়া গেল, তাহাদের মধ্যেই স্থানীয় আর্যেতর ভাষা কোমক্রমে বাঁচিয়া রহিল।

॥ ২ ॥

গৌড়ী রীতি

বাঙলাদেশে যে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত, কাব্যরীতির নিপুণ চর্চা চলিয়াছিল এবং এই দেশের 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ' ভারতের আলঙ্কারিকগণ এবং কবিযশঃ-

প্রার্থীরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ গৌড়ী রীতি। সংস্কৃত-সাহিত্যতত্ত্বে 'রীতি' কথাটি সুপরিচিত। আমরা য়ুরোপীয় কাব্যতত্ত্বের অনুসরণে রীতি ও styleকে একার্থবাচী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। 'রীতি' শব্দটি কাব্যশরীরের একপ্রকার অঙ্গসংস্থান মাত্র; রীতির সহিত কাব্যস্রষ্টার কোনরূপ আত্মিক সম্পর্ক নাই। সুতরাং 'পদরচনা'কেই রীতির একমাত্র লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপীয় style শব্দটি প্রধানতঃ কাব্যনির্মিতি অপেক্ষা কবির ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে। 'Style is the man himself' এই বাক্যেই প্রমাণ যে—কাব্যের style কবিচেতনার গভীরতা হইতে উত্থিত। সহজ করিয়া বলিতে পারা যায়, 'রীতি' কাব্যশরীরের বস্তুগত মণ্ডনকলা, আর style কাব্যশরীরে অন্তর্লীন রচনাকারের ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার প্রতিফলন।

বাঙলাদেশে অন্ততঃ খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই এমন একটা কাব্যকলা অনুশীলিত হইত যাহা 'গৌড়ী রীতি'* নামে পরিচিত হইয়াছিল, এবং এই গৌডী রীতির মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা থাকিলেও একদা ভারতবর্ষের সর্বত্রই কবিগণ এই রীতি অনুশীলন করিতেন। রীতির শ্রেণী লইয়া আলঙ্কারিকদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। তাহা হইলেও গৌড়ের অবলম্বিত সংস্কৃত-রচনারীতি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল; ইহার দ্বারা বাঙলাদেশে সংস্কৃতসাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাপক প্রসারের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বাণভট্ট 'গৌড়ভুজঙ্গ' শশাঙ্কের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাই বোধহয় গৌডী রীতিকে তিনি প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি সংক্ষেপে রীতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

> শ্লেষপ্রায়মুদীচ্যেষু প্রতীচ্যেষ্বর্থমাত্রকম্।
> উৎপ্রেক্ষা দাক্ষিণাত্যেষু গৌড়েষ্বক্ষরডম্বরঃ॥
> নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্টঃ স্ফুটো রসঃ।
> বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম্॥—হর্ষচরিতম্, ৭-৮ শ্লোক

অনুঃ উত্তরে শ্লেষ (শব্দপ্রয়োগ-কৌশল), প্রতীচ্যে কেবল অর্থের গৌরব, দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের বাহুল্য, গৌড়ে শুধু অক্ষরডম্বর (শব্দাড়ম্বর)। নূতন, অগ্রাম্যজাতি (মার্জিত

* *The Gaudi Riti in Theory and Practice*—Sibapada Bhattacharya ('Indian Historical Quarterly', 1927)

রচনাকৌশল), অক্লিষ্ট শ্লেষ, স্ফুটরস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ (স্পষ্ট উচ্চারণ) কোন একটি রচনায় পাওয়া দুষ্কর।

বাণভট্ট গৌড়ী রীতিকে আড়ম্বরপূর্ণ বলিয়া কিছু ব্যঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল গৌড়ী রীতির নিন্দা করেন নাই। এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার রচনাবৈশিষ্ট্য; কোন একস্থানে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না—ইহাই তাঁহার উক্তির নিহিতার্থ। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ গৌড়ী রীতি বা গৌড়-মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন। বামনের মতে, রীতি ত্রিবিধ—"সা ত্রিধা—বৈদর্ভী গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী চ ('কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি')।" তাঁহার মতে বৈদর্ভীই শিষ্ট রীতি, কারণ ইহাতে শ্রেষ্ঠ রচনার দশটি গুণ বর্তমান : শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি। গৌড়ী রীতিও নিন্দনীয় নহে; ইহারও দুইটি গুণ প্রশংসনীয়—ওজঃ ও কান্তি। ইহাতে সাধারণতঃ মাধুর্য বা সৌকুমার্যের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ওজঃ প্রকাশের জন্য গৌড়ী রীতির ভাষা কিছু সমাসবহুল এবং অত্যুল্বণপদযুক্ত (অর্থাৎ উৎকট শব্দ-সঙ্কুল) হয়। বামনের মতে শুধু বৈদর্ভী নহে, রচনাবিশেষে গৌড়ী রীতির অনুশীলন করাও কর্তব্য। তাঁহার আর-একটা মত উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট-জনপদের সঙ্গে এক-একটি রীতির নামসম্পর্ক থাকিলেও দেশের ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত রচনারীতির চিরকালীন যোগাযোগ নাই। একদা হয়তো অঞ্চলবিশেষের প্রবণতা অনুসারে একপ্রকার রীতি গড়িয়া উঠে, তারপর তাহা ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর শিষ্টসমাজে ছড়াইয়া পড়ে। বামনের মত বিচার করিলে গৌড়ী রীতিকে নিন্দা করিবার কারণ থাকিবে না। বীররসাত্মক ব্যাপার বা উৎকট বর্ণনার ক্ষেত্রে, প্রশস্তি, প্রশংসা, অভিনন্দন প্রভৃতি রচনায় যে কিছু 'অক্ষরডম্বর' প্রয়োজন, তাহা বোধহয় সকলেই বুঝিবেন। এইজন্যই বাঙলার বাহিরে যে সমস্ত লিপিলেখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও গৌড়ী রীতির সমাসবাহুল্য ও অক্ষরডম্বর অনুসৃত হইয়াছিল।

দণ্ডীও তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' বলিয়াছেন, বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ আছে। গৌড়মার্গ বৈদর্ভমার্গের যেন বিপরীত। গৌড়ী রীতি অনুপ্রাস-বহুল, অপরিচিত শব্দে পূর্ণ; ইহাতে সমতাগুণের অভাব এবং অলঙ্কারের আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয়। দণ্ডীর মতে বৈদর্ভীই আদর্শরীতি। তাহা

হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদভী রীতির প্রতি দণ্ডীর পক্ষপাত থাকিলেও তিনি গৌড়ী রীতিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় গৌডী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 'কর্পূর-মঞ্জরী'তে রীতিবর্ণনার স্থলে গৌডী রীতির উল্লেখ না করিয়া তিনি মাগধী রীতির কথা বলিয়াছেন। ভরত, 'নাট্যশাস্ত্রে' চারিপ্রকার 'প্রকৃতি' বা শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন—আবন্তী, পাঞ্চালমধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং ওড্র-মাগধী। এখানে বোধকরি তিনি নাটকরচনায় মাগধী অর্থাৎ প্রাচ্য অঞ্চলের বিশেষ কোন লিখনভঙ্গীকেই নির্দেশ করিয়াছেন। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, রীতি চারি প্রকার—গৌডী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী এবং লাটী। তাঁহার মতে গৌডী রীতি ওজঃপ্রকাশক, গাঢ়বন্ধ, আড়ম্বরপূর্ণ এবং সমাসবহুল। বিশেষ কোন রীতির প্রতি বিশ্বনাথের পক্ষপাত নাই।*

জেকবি সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, গৌড়ী রীতিই প্রাচীনতর; সরলতর বৈদর্ভী রীতি বরং তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তী কালে উদ্ভূত হয়।[১] তাঁহার মত অবশ্য অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। আমাদের অনুমান গৌডী রীতি বৈদর্ভী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অনুজ হইলেও খ্রীঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীর মধ্যে এই দুই রীতি সংস্কৃতসাহিত্যে প্রাধান্য অর্জন করে। বৈদর্ভীর অর্থগৌরব অধিক ছিল বলিয়া শিষ্ট জনে বোধহয় এই রীতির অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের শেষপর্বে প্রায় সর্বত্র গৌড়ীরীতির শব্দ ও অর্থের আড়ম্বর, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও মণ্ডনকলার নিপুণতা অধিকতর গৌরব অর্জন করিয়াছিল। আদি আলঙ্কারিকগণ বৈদর্ভী ও গৌডী এই দুই পৃথক রীতি স্বীকার করিতেন। কেহ বৈদর্ভী রীতির উচ্চ প্রশংসা করিতেন, কেহ-বা বৈদর্ভী-গৌড়ীর বিশেষ কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন আলঙ্কারিক ভামহ বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব হইতেই এই দুই রীতির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাঁহার মতে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ নাই।[২]

দণ্ডীই বৈদর্ভীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান প্রচারক। দণ্ডীর পরবর্তী আলঙ্কারিকদের

---

১ *Maharastri*, p xvi—Jacobi

২ ভামহ—কাব্যালঙ্কার, ৩১-৩৩

* *History of Sanskrit Poetics* (Vols. 1-2)—Dr. S. K. De.

প্রায় সকলেই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৈদর্ভীর দশগুণান্বিত বৈশিষ্ট্যের জয়গান করিয়াছেন।

বাঙলাদেশে সংস্কৃতসাহিত্য-সংক্রান্ত যে কয়খানা পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কিন্তু গৌড়ী রীতির অতিশয় প্রাধান্য নাই। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রাম-চরিত' স্পষ্টতঃ দ্ব্যর্থবোধক কাব্য, কাজেই তাহাতে অলঙ্কার ও অক্ষরডম্বর থাকিবেই। ইহা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য সংস্কৃতরচনায় বরং বৈদর্ভী রীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সংস্কৃতসাহিত্যের শেষপর্বের ইতিহাসে গৌড়ী রীতির অক্ষরডম্বরটাই কিছু অধিক হইয়াছিল; কাজেই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কোন কোন শ্লোক বা গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'র কোথাও কোথাও কিছু কিছু আড়ম্বর দেখা গেলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে। বাঙলাদেশে যে সমস্ত প্রশস্তি ও লিপিলেখন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশেই গৌড়ী রীতির দোষগুণ প্রকটভাবে ধরা পড়িয়াছে। আদর্শস্বরূপ একটি গদ্যে ও একটি পদ্যে রচিত তাম্রশাসনের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

১। যস্যানুত্তর-বঙ্গ-সঙ্গরজয়ে নৌবাট হীহীরব ত্রস্তৈর্দিক্‌করিভিঃ
যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্‌গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুক-ফেনিপাত-পতন-প্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈরাকাশে
স্থিরতা কৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী॥

—বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি

অনুঃ দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয়-ব্যাপারে তদীয় নৌবাট-'হীহী'রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও দিগ্‌গজ-সমূহ গম্যস্থানের অসদ্ভাবেই বিচলিত হইতে পারে নাই। (কিঞ্চ) উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে চন্দ্র-মণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত।[৩]

২। স খলু ভাগীরথী-প্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাট-সম্পাদিত-সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখর শ্রেণী-বিভ্রমাৎ, নিরতিশয় ঘনঘনাঘন-ঘটা-শ্যামায়মান-বাসরলক্ষ্মী সমারব্ধ-সন্তত-জলদ-সময়-সন্দেহাৎ, উদীচীনানেকনরপতি-প্রাভৃতীকৃতা-প্রলয় হয়বাহিনী-খরখুরোৎখাত-ধূলি-ধূসরিত-দিগন্তরালাৎ, পরমেশ্বর-সেবা-সমায়াতাশেষ-জম্বুদ্বীপ-ভূপালানন্ত-পাদাত-ভরন-মদবনেঃ। —নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসন

অনুঃ ভাগীরথী নদীতে অবস্থিত নানাবিধ নৌবহর যেখানে সেতুবন্ধের গিরিশিখরের বিভ্রম উৎপন্ন করে, যেখানে ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবসশ্রী শ্যামায়মান হইয়া চিরবর্ষার সন্দেহ সৃষ্টি

৩ গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুবাদ

করে, উত্তরদেশীয় নরপতিগণের অশ্বসৈন্যবাহিনী যেখানে তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দ্বারা উৎখাত প্রলয়কালীন ধূলিজালের ন্যায় দিগন্তরাল ধূমায়িত করিয়া ফেলে, রাজেশ্বরের (নারায়ণ পাল) সেবার জন্য সমাগত অশেষ জম্বুদ্বীপের ভূপালগণের পদাতি সৈন্যের পদভরে যেখানে অবনী নমিত হয়, ইত্যাদি।

এই যে শব্দসমাবেশ, সমাসের উৎকট আতিশয্য—ইহাই গৌড়ী রীতির একপ্রকার চূড়ান্ত উদাহরণ। এই জাতীয় একটা গুরুগম্ভীর, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম রীতি অধিকাংশস্থলে স্তুতি, নান্দী, প্রশস্তি লিপিলেখনেই অধিকতর ব্যবহৃত হইত; এবং শুধু বাঙলাদেশেই নহে, ভারতবর্ষের তাবৎ প্রশস্তিতেই এইরূপ একটা আলঙ্কারিক বাগ্‌বিন্যাস-প্রণালী অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, বাঙলাদেশে সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্যের বিশেষ রচনা ও অনুশীলন না হইলেও গৌড়ী রীতি একদা শিষ্টরীতি বৈদর্ভীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহাতেই গৌড়জনের শ্লাঘা বোধ করিবার কারণ আছে।

॥ ৩ ॥

সংস্কৃত শাস্ত্র-সংহিতা

ইতিপূর্বে আমরা গৌড়ী রীতি আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বাঙলাদেশে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সেনযুগ পর্যন্ত দীর্ঘ আট শত বৎসর ধরিয়া রাজপাদোপজীবী অভিজাত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রহণযোগ্য একটি রীতিপ্রকরণ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ব্যাকরণে পাণিনি প্রাচ্য ভাষারীতির যে সমস্ত উদাহরণ দিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে ক্রমে আর্যভাষাকে বিকৃত করিয়া মাগধী প্রাকৃতে পরিণত করিল এবং তাহা হইতে মাগধী অপভ্রংশ, পরিশেষে ঐ অপভ্রংশ হইতে পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জন্ম হইল। কিন্তু রাজপুরুষ এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ উত্তরাপথের শিষ্টভাষাকেই শাসন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে ব্যবহার করিতেন। শাসনকর্তাদের লিপিলেখনে মার্জিত সংস্কৃত ব্যবহৃত হইত; অপরদিকে ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করিতেন, শাস্ত্রচর্চা করিতেন। ভাষার দিক হইতে ইঁহারা আর্যাবর্তের সংস্কৃত ভাষাকে অনুসরণ করিলেও ধর্মকর্ম, শীলসদাচার, জীবনের মর্ত্য ও অমর্ত্যবিষয়ক নানা প্রকরণ বর্ণনায় বাঙালীর ব্রাত্যসংস্কার অল্পস্বল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে

বাঙালীর যে নূতন সংস্কার গড়িয়া উঠিল, দৈনন্দিন আচারবিচার, সমাজের শ্রেণীবিন্যাস, ধর্মদর্শন, দণ্ডনীতি, প্রভৃতির নব নব পরীক্ষা এবং জীবনে তাহার প্রভাব—সমস্তই উত্তরাপথ হইতে আগত ব্রাহ্মণ, যতি, যাজক, জৈন-বৌদ্ধ আচার্যগণের দীর্ঘকাল অনুশীলনেব ফলে বাঙালীর সংস্কৃতিকে নূতনভাবে নির্মাণ করিয়াছে।৮

প্রথমেই ধরা যাক বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও অনুশীলনের কথা। বাঙলাদেশে সাধারণের মধ্যে যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক সাহিত্য ও আচার-অনুষ্ঠান কোন দিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই। ববং যে সমস্ত ব্রাত্য আর্য এদেশে বসবাস করিতেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ যজ্ঞীয় বেদবিদ্যাকে বিশেষ সুনজবে দেখিতেন না। যাঁহাবা সদ্যঃ আযসংস্কারে দীক্ষিত হইযাছিলেন, তাঁহারাও বোধকবি যজ্ঞীয আচাব-অনুষ্ঠান ততটা মনোযোগসহকাবে গ্রহণ কবেন নাই। তাই গুপ্তরাজগণ এদেশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ স্থায়ী কবিবার জন্য 'মধ্যদেশ' হইতে যজ্ঞকার্যে অভিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনাইতেন, তাঁহাদিগকে ভূমিদান কবিয়া দুর্গম অঞ্চলেও বসবাস করাইতেন। গুপ্তযুগের যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, 'মধ্যদেশ বিনির্গতঃ' ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ (বাজসনেয় শাখা) ও সামবেদে অভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে বাঙলা-দেশে ভূমিদান করিয়া বসবাস করান হইয়াছিল।

পালযুগে বৌদ্ধধর্মেব প্রাধান্য সত্ত্বেও বৈদিক সংস্কাব যে আরও গতিবেগ সঞ্চয় কবিয়াছিল, তাহাব নানা প্রমাণ আছে। এই যুগের লিপিলেখনে বেদবেদাঙ্গে অভিজ্ঞ অনেক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। মহাযান মতাশ্রয়ী ধর্মপাল স্বয়ং এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। নারায়ণ পালও যে বৈদিক সংস্কৃতির সংবক্ষক ছিলেন, তাহা লিপিলেখন হইতে বুঝা যাইতেছে। বর্মণ-রাজগণ বিশেষভাবে বৈদিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্মণ ও সেনরাজগণ বাঙলাদেশে বৈদিক সংস্কার প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের নিম্নস্তরে বৈদিক যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে তখন মহাযান শাখার নানা উপধর্ম ও শৈব নাথধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র বৈদিক সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। পালরাজবংশের অন্যান্য মন্ত্রী দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র এবং বর্মণবংশের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী

ভট্ট ভবদেবের বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু ১০ম শতাব্দীতে 'কুসুমাঞ্জলি'-প্রণেতা উদয়ন লিখিয়াছেন যে, বাঙলার মীমাংসকগণ বেদের অর্থ অবগত ছিলেন না। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বাঙালার বেদচর্চাকে তেমন মর্যাদা দেন নাই। বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁহার 'পিতৃদয়িতা'-গ্রন্থে বলিয়াছেন, বাঙালী বেদচর্চায় অবহেলা করিত। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্বে' অনুরূপ প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন। গুপ্ত, পাল, সেন ও বর্মণ রাজগণ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও এদেশে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই, তাহা উদয়ন প্রভৃতি আচার্যগণের মন্তব্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। সেইজন্য এখানে বৈদিক গ্রন্থাদির বিশেষ কোন টীকাভাষ্য রচিত হয় নাই। একমাত্র নারায়ণের রচিত 'প্রকাশ' নামক টীকাগ্রন্থ (কেশবমিশ্রের 'ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে'র টীকা) ব্যতীত বাঙলাদেশে বৈদিক পণ্ডিতের রচিত বিশেষ কোন টীকাভাষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

স্মৃতি, মীমাংসা, ব্যাকরণ, অভিধানও এই অঞ্চলে অল্পাধিক রচিত হইয়াছিল। পালকাপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' (হস্তিচিকিৎসাশাস্ত্র), মাধবের 'রুগবিনিশ্চয়', চক্রপাণি দত্তের 'চিকিৎসা সারসংগ্রহ', বঙ্গসেনের 'চিকিৎসা সারসংগ্রহ'—এ সমস্তই চিকিৎসাগ্রন্থ। শুধু মানুষের আয়ুর্বেদ নহে, হস্তীরও রোগনিদান রচিত হইয়াছিল, ইহাই বিস্ময়াবহ ব্যাপার। অবশ্য পূর্বভারতে হস্তীর সামরিক প্রাধান্য সর্বজনস্বীকার্য।

বাঙলাদেশে কিছু ন্যায়বৈশেষিক-সংক্রান্ত তর্কবিদ্যা এবং অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' নামক টীকাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে (হুগলী জেলার ভুরশুট গ্রাম) শ্রীধর ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। প্রশস্তপাদ বৈশেষিক সূত্রের 'পদার্থ-ধর্মসংগ্রহ' নামক যে ভাষ্য রচনা করেন, শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' তাহারই টীকা। ইনি বেদান্ত ও মীমাংসা অবলম্বনে 'অদ্বয়সিদ্ধি', 'তত্ত্বসংবাদিনী', 'তত্ত্বপ্রবোধ', 'সংগ্রহটীকা' প্রভৃতি রচনা করেন। শ্রীধরভট্ট বাঙালীর প্রখর ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই প্রথম তর্কসঙ্কুল ন্যায়বৈশেষিকের ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বাঙলাদেশে তাহার গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হয় নাই; তাহার কারণ অজ্ঞাত। আমাদের অনুমান, তৎকালীন বাঙলাদেশের উচ্চস্তরে একদিকে যেমন বেদবেদান্তের চর্চা চলিতেছিল, তেমনি আবার সমাজগঠনের নিমিত্ত

নানা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন শুরু হইয়াছিল। এই দুই চাপে পড়িয়া শ্রীধরভট্ট বাঙলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

গৌড়পাদ 'আগমশাস্ত্র' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে যেমন বৌদ্ধ শূন্যবাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তেমনি আবার বৈদান্তিক ঈশ্বরতত্ত্বও আছে। শূন্যবাদ ও মায়াবাদের বিচিত্র রসায়ন নির্মাণ করিয়া গৌড়পাদ বলিয়াছেন,

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতদতদ্ উত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্নজায়তে ॥

—গৌড়পাদকারিকা, ৪।৭১

অনুঃ জীব জন্ম গ্রহণ করে না, জন্মের সম্ভাবনাও নাই। একমাত্র সার সত্য এই যে, কিছুই জন্মায় না।

কিন্তু বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ববাদ বা চিন্তাচর্যা বাঙলাদেশে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নাই। এখানে ষড়্‌দর্শনের অতি সামান্যই অনুশীলিত হইয়াছে। গৌড়পাদকে বাদ দিলে এ বিষয়ে বাঙালীর দীনতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বেদের সামান্য টীকা, ন্যায়বৈশেষিকের ব্যাখ্যা—এইরূপ সামান্য শাস্ত্র ও দর্শন প্রচেষ্টা বাদ দিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা এদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। বরং উচ্চবর্ণের মধ্যে কিছু স্মৃতিসংহিতা চর্চা চলিত। ভবদেব, অনিরুদ্ধ, হলায়ুধ, জীমূতবাহন প্রভৃতি বাঙালী স্মৃতিকারগণ নানা বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলিয়া বাঙালী সমাজকে উত্তরভারতীয় আর্যপ্রভাবে আনিয়া একটা স্থায়িরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। ভবদেবের 'ব্যবহার তিলক', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'ব্যবহারমাতৃকা', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালীর উচ্চ কোটির সমাজগঠনের বিচিত্র প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত স্মৃতির সহিত উত্তরাপথের স্মৃতির প্রভেদ থাকিলেও, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পালযুগের শেষভাগ হইতে বাঙলাদেশে যখন স্মার্ত বিধিনিষেধ প্রাধান্য পাইতে লাগিল, তখন হইতেই বাঙালীর সমাজকে উত্তরাপথের আর্যসংস্কারের দ্বারা বিশুদ্ধীকরণের জন্য এইরূপ বহুবিধ ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বাঙলাদেশে কিছু কিছু ব্যাকরণ-অভিধান রচনার চেষ্টা চলিয়াছে বটে, কিন্তু সর্বভারতের আয়োজনের তুলনায় তাহা সমুদ্রের নিকট গোষ্পদমাত্র। চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ, সুভূতিচন্দ্রের 'কামধেনু' নামক অমরকোষের টীকা,

বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' নামক অমরকোষের টীকা—এগুলিতে বাঙালীর সংস্কৃত ভাষা চর্চার এমন কিছু সার্থক প্রমাণ মিলিতেছে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, ব্যাকরণের নানা শাখা—কাতন্ত্র, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার, সারস্বত,—সবগুলিই বাঙলাদেশে অনুশীলিত হইত। কিন্তু যেমন দর্শনবিষয়ে বাঙালীর বিশেষ কোন মৌলিক সৃষ্টি নাই, ঠিক তেমনি শব্দশাস্ত্র ও কোষগ্রন্থ সঙ্কলনে বাঙালীর প্রতিভা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। অথচ 'গৌড়ী রীতি' নামক একটা বিশিষ্ট সাহিত্যপদ্ধতি এদেশের মাটী হইতেই জন্মলাভ করিয়াছিল।

পরবর্তী কালে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন বাঙালীর জীবনকে দুই দিক হইতে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন; রঘুনাথের নব্যন্যায় এবং রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থের মূল রহস্য পূর্বতন যুগেই নিহিত। নব্যন্যায়ে আসিয়া ন্যায়বৈশেষিকের তর্কবিতর্ক বুদ্ধির জটিল জালে জড়াইয়া পড়িল, এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি সংহিতা বাঙালীর সমাজবিস্তারকেও নানা বিধিনিষেধের রজ্জুতে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। পরবর্তী কালেও শুধু ন্যায়মীমাংসাই এদেশে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। অনুশীলনের অভাবে উপনিষদ বেদান্তাদি ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। আধুনিক যুগে রামমোহনই পুনরায় উপনিষদ্-বেদান্তের প্রচার করেন। বেদের অনুবাদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষয়কুমার দত্ত-সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কৃতিত্ব অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' বাঙলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্মারক গ্রন্থ। পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল ও তদীয়পুত্র মদনপাল দেবের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া 'রামচরিত' নামক শ্লেষকাব্য (চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত) রচনা করেন। ইহা দ্ব্যর্থবোধক কাব্য, অর্থাৎ প্রতি শ্লোকেই দুইটি অর্থ নিহিত আছে; একপক্ষে অযোধ্যার রামচন্দ্র আর-একপক্ষে পালসাম্রাজ্যের শেষ কুলতিলক রামপালের কাহিনী। এই গ্রন্থের ২য় পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক পর্যন্ত সংস্কৃতটীকা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারই সাহায্যে রামচরিতে-বর্ণিত পৌরাণিক অংশের সহিত ঐতিহাসিক অংশের সৌসাদৃশ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক কালে ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ

বসাক ইহার বাকি অংশেরও টীকা করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার উপর আলোক-পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'হর্ষচরিত' (বাণভট্ট) 'নব-সাহসাঙ্ক চরিত' (পদ্মগুপ্ত), 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' (বিহ্লণ), 'কুমারপালচরিত' (হেমচন্দ্র) এবং 'রাজতরঙ্গিণী' (কহ্লণ) ঐতিহাসিক কাব্য হিসাবে সুপরিচিত। সন্ধ্যাকর নন্দীও সেই একই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। বোধহয় তিনি দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের সাহায্যে কাব্যনির্মিতির আদর্শ শ্রীকবিরাজ পণ্ডিতের 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' হইতে পাইয়াছিলেন। 'রাঘব-পাণ্ডবীয়ে' একই শ্লোকে একপক্ষে রামায়ণ আর-একপক্ষে মহাভারতের কাহিনী সুকৌশলে শ্লেষের সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। সন্ধ্যাকর নন্দী সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কবি আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ রামায়ণমিদং কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ॥

অনুঃ রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব (রামপাল)—এই দুই রাজার এই অবদান বা প্রশস্তকর্মের ইতিহাস কলিযুগের রামায়ণরূপে পরিগণনীয়; এবং এই কবিও (সন্ধ্যাকর নন্দী) কলিকালের বাল্মীকিস্বরূপ ছিলেন।[৪]

'কলিকাল বাল্মিকী'র আত্মঘোষণা বাদ দিলে, ইহাতে পালরাজত্বের শেষাংশের অনেক গূঢ় ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিহিত আছে। সমস্ত টীকাটুকু পাওয়া যায় নাই বলিয়া তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার অনেক হারান রত্ন উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

অবশ্য রামপালের পক্ষের শ্লেষার্থ অতিশয় কষ্টকল্পিত। তাহা হইলেও পালযুগের অন্তিমপর্বের গ্রন্থ বলিয়া ইহার সবিশেষ মর্যাদা স্বীকার্য—কাব্যমূল্য যাহাই হউক না কেন।

॥ ৪ ॥

সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধশাস্ত্র

বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, বহু সঙ্ঘারাম নির্মিত হইয়াছিল, প্রায় তাবৎ বাঙালী একদা বৌদ্ধ মহাযান ও তাহার নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ

৪ রামচরিত—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক অনূদিত

ধর্মমতে মহাযান শাখাভুক্ত ছিলেন বলিয়া বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং এই অঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান পালযুগে অর্থাৎ ৮ম-১১শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে সিদ্ধাচার্য নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধগুরুর আবির্ভাব হয়। ইঁহারা প্রায় সকলেই মহাযান মতের বিভিন্ন উপশাখা—বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান পথের পথিক ছিলেন। তন্ত্র-মন্ত্র, মুদ্রা-মণ্ডল প্রভৃতি রহস্যাচারকে কেন্দ্র করিয়া মহাযান বৌদ্ধশাখার যে বিচিত্র পরিবর্তন হয়, তাহার একটা বড় অংশ এই বাঙলাদেশেই ছিল। এই মতের আচার্যগণ উক্ত ধর্মমত সম্বন্ধে বহু মৌলিক গ্রন্থ, টীকাটিপ্পনী ও গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন।[৫] দুঃখের বিষয় গ্রন্থগুলির প্রায় কোনখানাই বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই। তিব্বতে 'তেঙ্গুর' নামক গ্রন্থতালিকায় এই সমস্ত তান্ত্রিক ও মহাযানী বৌদ্ধ আচার্যদের নাম, গ্রন্থপরিচয় ও অন্যান্য তথ্যের উল্লেখ আছে। তাঁহাদের সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল; তাহার কিছু কিছু এখনও তিব্বতে পাওয়া যায়। সেই তিব্বতী অনুবাদগুলির তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, খ্রীঃ ৮ম-১০শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে সংস্কৃতভাষায় বহু তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অবশ্য তিব্বতী অনুবাদ ভিন্ন এই গ্রন্থগুলির মূল সংস্কৃত উদ্ধারের উপায় নাই। প্রথমতঃ, তিব্বতী অনুবাদক মূলগ্রন্থকে তিব্বতী ভাষার মারফতে অনুবাদ করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও সংশয়স্থল। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থোক্ত বিষয়সমূহ গুরুমুখী, দুরূহ সাধন সাপেক্ষ, জটিল কৃত্য ও দুর্বোধ্য রহস্যাচারে পরিপূর্ণ। 'সন্ধ্যাভাষা'র[৬] বাধা ঠেলিয়া বেশি দূর অগ্রসর হওয়া দুঃসাধ্য। তৃতীয়তঃ, ইহাতে যৌনপ্রতীকের এত বাড়াবাড়ি যে, আধুনিক পাঠক ইহার স্থূল রিরংসার উত্তাল তরঙ্গ পার হইয়া কদাচিৎ তত্ত্বের মুক্তা লাভ করিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, গ্রন্থগুলি অনেক সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া শিষ্টজন অপশব্দযুক্ত গ্রন্থপাঠে উৎসাহী হইবেন না। "লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা" গ্রন্থের 'বিমলপ্রভা' নামক টীকায় স্পষ্টতঃ ভুল সংস্কৃতের সমর্থন করা হইয়াছে ঃ

---

৫ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে চর্যাগীতিকাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৬ পরে চর্যাগীতিকাপ্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাভাষা' সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

"তেষাঞ্চ সুশব্দবাদিনাং সুশব্দাগ্রহবিনাশায় অর্থশরণাতামাশ্রিত্য কচিৎ বৃত্তে অপশব্দঃ। কচিৎ বৃত্তে যতিভঙ্গঃ। কচিৎ অবিভক্তকং পদং। কচিৎ বর্ণস্বরলোপঃ। কচিৎ দীর্ঘো হ্রস্বঃ। হ্রস্বোঽপি দীর্ঘঃ। কচিৎ পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী, কুত্রাচিৎ পরস্মৈপদিনি ধাতৌ আত্মনেপদং। আত্মনেপদিনি পরস্মৈপদং। কচিৎ একবচনে বহুবচনং। বহুবচনে একবচনং পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গং, নপুংসকে পুংলিঙ্গং।" (*A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection :* Vol. I, p. 78. Edited by Mm. H. P. Shastri)

অনু: যাঁহারা ব্যাকরণগত শব্দের প্রতি আগ্রহশীল, তাঁহাদের সেই আগ্রহ নষ্ট করিবার নিমিত্ত অর্থের শরণ লইয়া কোন বৃত্তিতে অপশব্দ, কোথাও যতিভঙ্গ, কোথাও অবিভক্ত পদ, কোথাও স্বরবর্ণ লোপ, কোথাও দীর্ঘস্বর হ্রস্ব, হ্রস্বস্বর দীর্ঘ, কোথাও পঞ্চমী অর্থে সপ্তমী, চতুর্থী অর্থে ষষ্ঠী, কোথাও বা পরস্মৈপদী ধাতুকে আত্মনেপদী, আত্মনেপদীকে পরস্মৈপদী, কোথাও একবচনের স্থলে বহুবচন, বহুবচনের স্থলে একবচন, পুংলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গে পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইঁহাদের বক্তব্য বিষয় যেমন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যতা ত্যাগ করিয়া সুগোপনচারী হইল, ঠিক তেমনি ভাষাপ্রয়োগেও ইঁহারা ইচ্ছা করিয়াই অমনোযোগী হইলেন। চিন্তা ও চিন্তার প্রকাশক্ষম যে ভাষা—উভয়েই শিথিলতা প্রবেশ করিল। ফলে শিষ্টজনের নিকট এই ব্যাকরণপীড়িত ও রহস্যময় আচার-অনুষ্ঠান বিরক্তি এবং ব্রীড়াজনক হইয়া পড়িল। কাজেই পালযুগে এই গ্রন্থগুলির অতিশয় জনপ্রিয়তা থাকিলেও সেনযুগে যখন পূর্ণোদ্যমে সংস্কৃত-ভাষায় স্মৃতিপুরাণ মীমাংসা ও কাব্যের অনুশীলন শুরু হইল, তখন হইতেই অপশব্দযুক্ত এই সমস্ত গ্রন্থ জঞ্জালের মতো বাঙলাদেশের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। এইজন্য বাঙলাদেশে এই সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদের সাহায্য ভিন্ন বাঙলাদেশে সংস্কৃতে রচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যের স্বরূপ জানিবার উপায় নাই।

এই আচার্যগণের অনেকেই বাঙলাদেশের অধিবাসী ছিলেন, এইটুকুই আমাদের গৌরবস্থল। শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্তিদেব, শান্তিরক্ষিত প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যগণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সুদূরবিস্তারী হইয়াছিল। মহাজেতারি, কনিষ্ঠ জেতারি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, কুক্কুরীপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ, বিরূপ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও সহজযোগী সিদ্ধাচার্যগণ একদা বাঙলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সংস্কৃতে রচিত ইঁহাদের গ্রন্থের মধ্যে 'আর্যবুদ্ধভূমি-

ব্যাখ্যান' (শীলভদ্র), 'বোধিচর্যাবতার' (শান্তিদেব), 'অভিসময় বিভঙ্গ' (লুইপাদ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে, মূল সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায় নাই। বজ্রযান কালচক্রযান-সহজযান, নাথপন্থ, কৌলধর্ম—প্রভৃতি রহস্যচারী গোষ্ঠী-জীবী উপধর্ম পালযুগেই বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে। এই আচার্যগণের কেহ কেহ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ রাজবংশীয়, কেহ বা নীচ অন্ত্যজশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেন।

এই সমস্ত আচার্য শুধু ধর্মাচার সম্বন্ধেই গ্রন্থ রচনা করেন নাই; ব্যাকরণ (চন্দ্রগোমিন্), তর্কবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়েও ইঁহারা প্রচুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তিব্বতী উৎস হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সেনপর্বে বাঙালী জীবনের উচ্চ কোটির অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটে; পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কার দৃঢ়মূল হয়; তাহার ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ রহস্যাচার বাঙালী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চতর বর্ণের নিকট অপাংক্তেয় হইয়া পড়ে। তাই পরবর্তীকালে আদিবাংলা ও অপভ্রংশে রচিত দুই-চারিখানি পুঁথি ভিন্ন এই জাতীয় গ্রন্থ বাঙলাদেশে পাওয়া যায় নাই। সেনবর্মণ পর্বে বাঙালীর উচ্চতর শ্রেণীকে উত্তরাপথের বিশুদ্ধ পৌরাণিক সংস্কারে দীক্ষিত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য না হইলেও সমাজের ভদ্রেতর শ্রেণীর মধ্যে এই বৌদ্ধতান্ত্রিকতা একেবারে লোপ পাইয়া যায় নাই, নানা নামে ও বেশে উহা দীর্ঘকাল জীবিত ছিল।

এই বিচিত্র উপধর্মগুলিকে মিলাইয়া একটা বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ বা দার্শনিক প্রত্যয় বোধহয় গড়িয়া উঠে নাই। একই আচার্য একাধিক উপমতে বিশ্বাস করিতেন এবং একই আচার্য বিভিন্ন যানাশ্রয়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের চিত্তলোকের একটা অসাম্প্রদায়িক আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু উপধর্মকে ধর্মের পর্যায়ে এবং রহস্যাচারকে দর্শনের সীমায় তুলিয়া না ধরিলে কোন ধর্মান্দোলনই স্থায়ী হইতে পারে না। ইঁহাদের ধর্মান্দোলন গুরুমুখী ও গোপনচারী, দর্শন দুরূহ ও বিভিন্ন মতের স্থূল সমন্বয়, কদাচিৎ দেহঘটিত কৃত্যাশ্রয়ী। কাজেই সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করিলেও বৌদ্ধ আচার্য-গণের তান্ত্রিক গ্রন্থাদি পরবর্তী কালে শিষ্টসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল।

॥ ৫ ॥

সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা

বাঙলাদেশে সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও পৌরাণিক সংস্কারের ছায়াতলে কিছু কিছু কাব্য-কবিতা রচিত হইলেও সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর) গুপ্তযুগের প্রভাবে বাঙলাদেশে সংস্কৃত ভাবাদর্শ ও পৌরাণিক সংস্কার বাঙলার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্য পাইতেছিল। কিন্তু পালযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্যগণ নানা উপধর্ম সম্বন্ধে টিকাটিপ্পনী ও মৌলিক গ্রন্থাদি রচনা করিলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যশ্রেণীর কোন রচনাই তাঁহাদের লেখনীকে ধন্য করিতে পারে নাই। তাঁহারা অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়ম-শাসন লঙ্ঘন করিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেন* ; সুতরাং কাব্য-সাহিত্যের কথা উঠিতেই পারে না। অথচ পালযুগের লিপি-লেখনে কিছু কিছু কাব্যোৎকর্ষ দেখা যাইতেছে। সে যুগে সংস্কৃত লেখকগণ ইচ্ছা করিলে মৌলিক কাব্যাদি রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থ ও রহস্যাচার-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র লইয়া এই আচার্যগণ এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাই অনুভব করেন নাই। অবশ্য ইঁহারা অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবজ্র প্রভৃতি দেবদেবীর যে স্তবস্তুতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কাব্যের চকিত স্পর্শ পাওয়া যায়। কোন এক অজ্ঞাতনামা বৌদ্ধলেখক যখন তারা স্তুতি করিতে গিয়া বলেন,

আনন্দানন্দবিরসা সহজস্বভাবা চক্রত্রয়াদপরিবর্তিতবিশ্বমাতা।
বিদ্যুৎপ্রভাহৃদয়বর্জিতজ্ঞানগম্যা তুভ্যং নমোঽস্তু মনসা বপুষা গিরা নঃ ॥

অনুঃ আনন্দযুক্তা অথচ আনন্দবিমুখ, সহজস্বভাব, চক্রত্রয়ের ঘূর্ণনেও অপরিবর্তিতা, বিদ্যুৎ-প্রভাযুক্তা, আবেগবর্জিতা জ্ঞানগম্যা বিশ্বমাতাকে মন, দেহ ও বাক্যের দ্বারা নমস্কার করি।

তখন বুঝিতে পারা যায়, ইঁহারা ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-আচরণের জন্য লেখনী ধারণ করিলেও আসলে কবিচেতনাকে ভুলিতে পারেন নাই।

বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে সংস্কৃত সাহিত্যরচনার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত না হইলেও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র দৃষ্টান্তে অনুমিত হয় যে, বৃহৎ বা ব্যাপক কোন কাহিনী-আখ্যান লইয়া খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গদ্যকাব্য বা নাটক রচিত না হইলেও উদ্ভটশ্রেণীর বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত

* পূর্বে দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, এবং শুধু বাঙলাদেশেই নহে, বাঙলার বাহিরেও কোষকাব্য-সঙ্কলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, এবং এই সমস্ত সঙ্কলনে বাঙালী কবির রচিত অনেক শ্লোক স্থান পাইয়াছিল। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর দিকে ভারতের নানা স্থানে অপভ্রংশের ছায়াতল ছাড়িয়া প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ধীরে ধীরে কলেবর লাভ করিতেছিল; কাজেই এমন একটা পরিবর্তনের যুগে বাঙলাদেশে লক্ষ্মণ সেনের সভা ব্যতীত আর যদি কোথাও সংস্কৃত 'সুকুমার সাহিত্যে'র বিশেষ কোন স্ফুরণ না দেখা যায় তাহা হইলে বাঙালীর এ বিষয়ে কৃতিত্বের অভাব ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবার কারণ নাই। ভারতের উত্তরাপথে তখন তুরুষ্ক-ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কিছু পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধ মত লইয়াও সমাজে আদর্শগত বিরোধ বাধিয়াছিল। বৌদ্ধ আচার্যগণ তখন মিশ্রসংস্কৃত ও অপভ্রংশে মহাযান শাখার উপমতগুলিকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। এইরূপ মানসিক ভাবাকাশে গৌড়বঙ্গে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণচন্দ্রোদয় না হয়, তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

লিপিলেখনে সংস্কৃতভাষা ॥

খ্রীঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাদেশে এবং বাঙলার বাহিরে বাঙলাদেশ-সংক্রান্ত যে সমস্ত লিপিলেখন, পট্টোলী, প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা অন্যূন একশত চৌত্রিশ।[৭] প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বাঙালী কবিপণ্ডিত, রাজকবি বা রাজানুগ্রহভাজন পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে যে-সমস্ত লিপি-প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, তাহাতেই দেখা যাইতেছে, এদেশে গুরুগম্ভীর ছাঁদের আলঙ্কারিক গদ্য-পদ্য রচনা এককালে সবিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। গুপ্ত, পাল, সেনযুগে সর্বত্রই সংস্কৃতে লিপি-প্রশস্তি রচিত হইয়াছে। ভাষায় বিশুদ্ধ গৌড়ীরীতি অনুসৃত হইয়াছে; সমাসবহুল, সন্ধিসমাকীর্ণ, আভিধানিক শব্দভারাতুর বাক্য-সমষ্টি লিপিলেখন ও রাজা বা মন্ত্রি-প্রশস্তির সার্থকতম বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। সুতরাং তিনি রাজসাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরগাত্রে যদি ৩৬টি শ্লোকযুক্ত একটি প্রশস্তি-রচনা করিয়া থাকেন, তবে

৭ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? স্বয়ং জয়দেবই বলিয়া গিয়াছেন যে, পল্লবিত বাক্যে উমাপতি কৃতী ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য লিপি প্রশস্তির অনেকগুলিতেই রচনাকারের নাম নাই, অথচ অজ্ঞাতনামা রচনাকারদের বিচিত্র কারুকার্যকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ভাস্কর বর্মার সভাকবি নিধানপুর অনুশাসনে যে ভয়াবহ বাগ্‌ভঙ্গী ব্যবহার করিয়াছেন,[৮] তাহা গৌড়ীরীতির এক উৎকট দৃষ্টান্ত। বাণভট্টও 'কাদম্বরী'তে প্রায় অনুরূপ বিলম্বিত বাক্যাবলী ব্যবহার করিলেও, প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর যে প্রধানগুণ পরিমাণবোধ, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন না বলিয়াই সমাস-ভারে আকণ্ঠমগ্ন দীর্ঘ বাক্যগুলি রসভোগের বাধাজনক না হইয়া রসনিষ্পত্তিরই কারণ হইয়াছে। অবশ্য বাঙলাদেশের সমস্ত লিপিলেখনেই কৃত্রিম জড়ভার ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই। কয়েকটিতে সমাস সন্ধির আতিশয্য সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কবিশক্তির চিহ্ন আছে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি—

গোপৈঃ সীম্নিবনচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতি চত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকরুদ্গীত-মাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিচলিতা-নম্রং সদৈবাননং ॥

অনু: সীমান্ত দেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্তৃক (গৃহ) চত্বরে শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ (?) কর্তৃক, এবং বিলাস-গৃহের শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে।[৯]

অথবা বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের অনুশাসনের মঙ্গলাচরণ—

ক্রৌঞ্চারিদ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো
গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্যে জটম্।
শৈবালাবলিমধ্যবদ্ধ শফরীবুদ্ধ্যা সমাকর্ষতো-
ৰাক্রন্দস্ফুটকন্দলেন বিহসন্নব্যাজ্‌ জগদ্ ধূর্জটিঃ ॥

৮ "স জগদুদয়কল্পনাস্তময়হেতুনা ভগবতা কমল সম্ভবেনাবকীর্ণ-বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবিভাগায় নির্মিতো ভুবনপতিরিবোদয়ানুরক্ত মণ্ডলো যথাযথমুচিতকরনিকরবিতরণাকুলিত-কলিতিমিরনশ্বরতয়া প্রকাশিতার্যধর্মালোক......মহারাজাধিরাজঃ শ্রীভাস্করবর্মণদেবঃ কুশলী।"—কামরূপশাসনাবলী —পদ্মনাথ ভট্টাচার্য।

৯ গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত অনুবাদ

অনু: শৈশব চপলতাহেতু পিতার মস্তকে স্থিত গঙ্গাজলে খেলা করিতে করিতে জটার মধ্যে চন্দ্রকলাকে দেখিতে পাইয়া শৈবালদামে বদ্ধ শফরী মৎস্য মনে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে কলহরত ক্রৌঞ্চারি (কার্তিক) এবং গণেশ (দ্বিরদ-আস্য)—দুই ভাইয়ের অস্ফুট কলরব শুনিয়া সহাস্যমুখ ধূর্জটি জগৎ রক্ষা করুন।

এই সমস্ত রচনায় বাস্তবিক অভিলষিত কবিশক্তির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে' বাঙালী কবির যে-সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতা বা উদ্ভট শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহার সূচনা এই সমস্ত শিলালিপিতেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। অভিনন্দের 'রামচরিত' বাদ দিলে সেনপর্বের পূর্বে দীর্ঘতর বিশেষ কোন কাহিনী-কাব্য-রচনায় বাঙালী কবি আত্মনিয়োগ করেন নাই। আখ্যানকাব্যের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকের আকারে, কোথাও শিলালিপি, তাম্রপট্টোলী, স্তম্ভগাত্র, মন্দিরচত্বরে—কোথাও-বা কোষকাব্যে (যথা 'সদুক্তিকর্ণামৃত') বাঙালী কবির সংস্কৃতচর্চা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে পূর্বীপ্রাকৃতে রচিত যে প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথম জনসাধারণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। বোধ করি সে সময় বাঙলাদেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাই রাজকোষ হইতে দরিদ্র জনসাধারণকে ধান্য ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য সেই অনুজ্ঞায় ইহাও লিখিত ছিল যে, সুদিন আসিলে গণ্ডা (মুদ্রা) ও ধান্যের দ্বারা রাজকোষ পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে দেখা যাইতেছে, পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব বাঙলাদেশকে 'মাৎস্য ন্যায়'* (অরাজকতা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার) হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ফলে প্রকৃতিগণ (প্রজা বা অভিজাত শ্রেণী) তাঁহাকে রাজপদে নির্বাচিত করিয়াছিল। ভট্ট ভবদেব (বর্মণবংশের হরিবর্মদেবের প্রধানমন্ত্রী) ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার গাত্রে ইঁহার প্রশস্তি-সূচক যে ফলক আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ভট্ট ভবদেব রাঢ়দেশের জাঙ্গলপথযুক্ত জলহীন গ্রামসীমায় তৃষ্ণার্ত পথিকদের কল্যাণের নিমিত্ত জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

সেনপর্বে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বিষ্ণু ও হরপার্বতীর স্তবস্তুতির অধিকতর

* পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

প্রাধান্য দৃষ্ট হইলেও পালপর্বের লিপিলেখনে বুদ্ধদেব ও লোকনাথের উল্লেখ রহিয়াছে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবে তাম্রশাসনে সুগত সিদ্ধার্থের স্তবস্তুতি করা হইয়াছে, নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রশাসনে "মৈত্রীকরুণারূপ প্রেয়সীকে ধারণকারী শ্রীমান্ লোকনাথ দশবলের" জয়ধ্বনি করা হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে (রামপাল এবং কেদারপুরে প্রাপ্ত) ভগবান জিন, ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের উল্লেখ আছে। পালরাজগণের তাম্রশাসনে যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি থাকিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ?

পুরাণাশ্রয়ী সেনবংশ ও বর্মণবংশের শাসনাবলী ও প্রশস্তিতে বিষ্ণু ও হরপার্বতীর যে সমস্ত উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই আদিরসাত্মক। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

১। ভোজদেবের তাম্রশাসন

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রদুর্বভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ॥

অনু : সেই পূজনীয় পুরুষ (হরি) জগতে ভূমি ভারোদ্ধারকারী অংশাবতাররূপে এবং গোপীশতকেলিকার মহাভারত নাটকের সূত্রধার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।[১০]

২। ভট্টভবদেবের প্রশস্তি

গাঢোপগূঢ় কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবঃ বনমালিকেতি বাগ্দেবতাপহসিতো হস্ত হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥

অনু : কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভ পত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়, এই বলিয়া বাগ্দেবতা যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদিগের শ্রীর হেতু হউন।[১১]

৩। বিজয়সেনের প্রশস্তি—

বক্ষোঽংশুকাহরণ সাধ্বস কৃষ্টমৌলি মাল্যচ্ছটা হতরত্নালয়দীপ ভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাতিবীক্ষ্যাননানি হসিতানি
জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

অনু : বক্ষের অংশুক হরণ করিলে যখন লজ্জায় আকৃষ্ট শিরোমাল্যের ছটায় রত্নালয়দীপের দীপ্তি ম্লান হইল, তখন ইন্দুকিরণে লজ্জায় মুকুলিত দেবীর মুখদর্শনে শম্ভুর বদনসমূহের যে হাস্য, তাহার জয় হউক।[১২]

সেনপর্বে প্রাপ্ত শাসনাবলী ও প্রশস্তিতে কৃষ্ণ-গোপী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী ও হর-

১০-১২ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)—ডক্টর সুকুমার সেন অনূদিত

পার্বতীর আদিরসাত্মক শ্লোক পাওয়া যাইতেছে। বাঙলাদেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—সেনপর্বেই তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা যাইবে। এই বিষ্ণু-লক্ষ্মীর প্রেমের চিত্রগুলি জয়দেব গোস্বামীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিতও ইহার নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। এই সমস্ত লিপিলেখনে শৈব ও বৈষ্ণব চিত্রই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-যতিসমাজে সম্ভবতঃ বৈষ্ণব মতই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। সমাজে চৈতন্যপ্রভুর পূর্বেই বৈষ্ণব মতের বেশ প্রভাব দেখা দিয়াছিল, একথা বিশ্বাস করিবাব কাবণ আছে, লিখনগুলিই তাহাব প্রধান প্রমাণ। 'গোপীশতকেলিকাবঃ' এই শব্দে বৃন্দাবনেব কৃষ্ণগোপী-লীলাব উল্লেখ রহিয়াছে—ইহা ভাগবত বা অন্য কোন বিষ্ণুলীলাত্মক পুবাণের প্রভাব। বাঙলাদেশের শিষ্টসমাজে একদা ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা পাংক্তেয় হইযাছিল। কৃষ্ণলীলার দুই পর্ব—একটি বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুলক্ষ্মী, অপরটি বৃন্দাবনের কৃষ্ণগোপীলীলা। বাঙলাদেশে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই পরবর্তী কালে বাঙালীব চিত্তধর্মকে আমূল পরিবর্তিত কবিযা দেয়। লিপিলেখনে উমা-মহেশ্ববেব যে চিত্র আছে, তাহা প্রধানতঃ পুরাণাশ্রয়ী ; মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পৌরাণিক হরপার্বতী অপেক্ষা গ্রাম্য মানস হইতে উদ্ভূত শিবদুর্গার অপৌরাণিক গ্রামীণ মনোজীবনেব অধিকতর প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। যাহা হউক, পাল সেনপর্বের লিপিলেখন হইতে জনসাধারণের জীবনধাবা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওযা না গেলেও উচ্চশ্রেণীর অভিজাত সমাজের আধিমানসিক বৈশিষ্ট্য উহাতে স্পষ্টই চিত্রিত হইযাছে।

বাঙলায় সংস্কৃত কাব্যনাট্য-চর্চা ॥

ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙলাদেশে সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রসংহিতা, ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষযে কিছু কিছু টীকাটিপ্পনী ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইলেও যাহাকে 'রসসাহিত্য' (Literature of Power) বলে, যাহার দ্বারা একটা জাতির প্রাণ ও মনের গূঢ়রহস্য আবিষ্কার করা যায়, বাঙলাদেশে সংস্কৃত-ভাষায় সেরূপ সাহিত্যের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া

যায় না। তাহার কারণ সেনযুগে যখন নূতন করিয়া সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যানুশীলন আরম্ভ হইয়াছে তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের যুগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অপভ্রংশ সাহিত্যের ছায়াতল ছাড়িয়া উত্তর-ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কেবল স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতেছিল; সুতরাং এতদঞ্চলে সংস্কৃতভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনার বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই।

বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্রপট্টোলীতে নানা স্থানে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট ছোট স্তবস্তুতি, গদ্যে রচিত দীর্ঘ-সমাসসঙ্কুল উচ্ছ্বাস—ইহাদের মধ্যেও হীনপ্রভ সংস্কৃত সাহিত্যের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছে। যখন স্বতোৎসারিত আবেগ বিদায় লইয়াছে, তখনই ঐ জাতীয় লিপিলেখনের অত্যুক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার যে নিদর্শনটুকু লিপিমালার ভাষার মধ্যে নিহিত আছে, তাহাতে যে পরিমাণে কৌশল ফুটিয়াছে, সেই পরিমাণে অকৃত্রিম আবেগ ফুটিবার সুযোগ পায় নাই।

কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের নাট্যকার বাঙালী ছিলেন, অথবা দুই-একখানি সংস্কৃত নাটক বাঙলাদেশে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ একটা লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। এদেশে অনেক পূর্ব হইতেই একপ্রকার অভিনয়োপযোগী গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে সেই আদিম লোকাভিনয়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকাতেও একাধিক স্থলে নট ও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাঙলাদেশে লোকাভিনয় প্রচলিত থাকিলেও প্রসিদ্ধ কোন সংস্কৃত নাটক এখানে রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহস্থল। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নারায়ণ ভট্টের (ভট্টনারায়ণ) 'বেণীসংহার', মুরারির 'অনর্ঘরাঘব', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক'—প্রধানতঃ এই নাটকগুলি বাঙলাদেশে অথবা বাঙালীর দ্বারা রচিত হইয়াছিল, একথা অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোন উল্লেখ নাই, যাহার দ্বারা নাট্যকারগণের জাতিকুল নির্ণয় করিতে পারা যায়।* 'মুদ্রারাক্ষস' চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ঘটনা লইয়া রচিত; বিশেষজ্ঞের মতে ইহার রচনা ৯ম শতাব্দীর পরে নহে। এই নাট্যকারকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করিবার মত বিন্দুমাত্র প্রমাণও আমাদের হস্তগত হয় নাই। কুলজীকারগণের কৃপায় ভট্ট-

* *History of Sanskrit Literature*—Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De

নারায়ণের বাঙালিত্ব আরও একটু সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—যাহা ইতিহাসের নিকষ পাথরের পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বাঙলার ইতিহাসের কাল্পনিক রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণ নাকি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আদিশূর যে রূপকথার রাজকুমার, তাহার একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সুতরাং ভট্টনারায়ণের বাঙালিত্ব মিথ্যা হইয়া পড়ে। অথচ স্টেন কোনোর মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার '*Das Indische Drama*' গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের বাঙালিত্বের দাবী কিয়দংশে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভট্টনারায়ণ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে দীর্ঘসমাস ব্যবহার করিযাছেন এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা বর্ণনা করিবার কালে বীররসাত্মক প্রচণ্ড ও কর্কশ শব্দপুঞ্জ ব্যবহার করিয়াছেন; ইহাতেই গৌড়ীরীতির কথঞ্চিৎ প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার জাতিকুল-নির্ণয়ের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'অনর্ঘরাঘব' নাটকের রচনাকার মুরারিকেও (৯ম-১০ম শতাব্দী) কেহ কেহ বাঙালী বলিতে চাহেন। কিন্তু এ বিষযেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব হয় নাই। এই নাটকের মুবাবি কলচুরী বংশের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা আধুনিক কালের মান্ধাতা শহর, নর্মদার তীরে অবস্থিত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ মুরারি সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি। কুলপঞ্জিকাকারদের জন্যই দুই মুরারির পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য 'অনর্ঘরাঘবে'র নাট্যকার মুরারি বাঙালী বনিযা গিযাছেন। ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটক হিসাবে অসার্থক; 'নৈষধানন্দ' নামক তাঁহার আর-একখানি নাটক ছিল। কেহ কেহ তাঁহাকেও বাঙালী বলিতে চাহেন। 'চণ্ডকৌশিকে'র প্রস্তাবনায় মহীপালের উল্লেখ আছে। মহীপালের রাজসভায় এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমাম করিয়াছিলেন যে, ইনি বাঙলার পালবংশের রাজা মহীপাল। অবশ্য তাঁহার এই মত সকলে স্বীকার করেন না। পিশেল সাহেবের অনুমান, এই মহীপাল হইতেছেন গুর্জর প্রতিহার রাজা প্রথম মহীপাল। এই নাটকের প্রাচীনতম পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা ক্ষেমীশ্বরকে বাঙালী প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে তুর্কী আক্রমণের সময় বাঙলাদেশের বহু পুঁথিপত্র নেপালে চলিয়া গিয়াছিল; সেইজন্য চণ্ডকৌশিকের প্রাচীন পুঁথি

নেপালে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সামান্য প্রমাণের বলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

এই নাটকগুলি যদি বাঙালীর রচিতও হইত, তাহা হইলেও ইহার দ্বারা বাঙালীর সাহিত্যিক গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না। 'অনর্ঘরাঘব' বা 'চণ্ডকৌশিক' সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে রচিত; কাজেই তাহাতে বাগ্‌ভঙ্গিমার বাহ্বাস্ফোট থাকিলেও নাট্য সাহিত্যের প্রশংসনীয় লক্ষণ নাই বলিলেই চলে। ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দে রচিত সাগরনন্দির 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' নামক গ্রন্থে বাঙালীর রচিত অনেকগুলি নাটকের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমগ্র দেশে তাহাদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল তাহা মনে হয় না। প্রভাব থাকিলে তাহাদের একাধিক পুঁথি পাওয়া যাইত।

এইবার কাব্য কবিতার কথা আলোচনা করা যাক। অভিনন্দ নামক একজন বাঙালী কবির রচিত 'রামচরিত' নামক রামায়ণ-বিষয়ক কাব্য পাওয়া গিয়াছে*। অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দুই জন অভিনন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে গৌড়াভিনন্দ হইতেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকার; ইঁহার অনেকগুলি শ্লোক 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'রামচরিত' কাব্যের কবি অভিনন্দও বাঙালী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়, অন্ততঃ তিনি দেবপালের সভাকবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাব্যটির বিশেষ কোন সারস্বত মূল্য না থাকিলেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইহাতে (১৬শ সর্গ) দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রের দেশ বাঙলা দেশে যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে নারীদেবতার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ থাকিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নৈষধচরিত' প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অন্তর্গত বলিয়া আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। মহাভারতে বর্ণিত নলোপাখ্যান অবলম্বনে কবি এই বিরাট মহাকাব্য রচনা করেন—ইহার মধ্যে পাণ্ডিত্য, দার্শনিক জ্ঞান, তর্কবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, কামশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কবির ভূয়োদর্শনজনিত পারঙ্গমত্ব বর্ণিত হইয়াছে; তবে আধুনিক রুচির নিকট এই শাব্দিক ব্যায়াম বিশেষ প্রীতিকর হইবে না। সে যুগেও কেহ কেহ এই অলঙ্কার-প্রধান কাব্যটির বিশেষ প্রশংসা করিতেন

Ramacharitam (Abhinanda)—Edited by K. S. Ramaswami Shastri

না। এ বিষয়ে একটা কৌতুককর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শুনা যায় প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট ছিলেন কবি শ্রীহর্ষের মাতুল। একদা কবি 'নৈষধচরিত' ('নৈষধীয়') রচনা করিয়. আলঙ্কারিক মাতুলকে উহার গুণাগুণ নির্ণয়ে অনুরোধ করেন। মম্মটভট্ট উক্ত কাব্য পাঠ করিয়া কবিকে বলেন যে, তিনি (অর্থাৎ মম্মট) কাব্যের 'দোষ পরিচ্ছেদ' লিখিতে গিয়া বৃথাই অসংখ্য কাব্য অনুসন্ধান করিয়াছেন; ভাগিনেয় শ্রীহর্ষরচিত 'নৈষধ-চরিত' কাব্যটি পূর্বে হাতে আসিলে তাঁহার অনেক পরিশ্রম লাঘব হইত। গল্পটি সত্য হউক বা না হউক, ইহার দ্বারা অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণিত হইতেছে যে, সে যুগেও 'নৈষধচরিত' সকল রসিকের কাছেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইত না।

'নৈষধে'র কবি শ্রীহর্ষ বাঙালী কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীহীব ও মামল্লদেবীর পুত্র শ্রীহর্ষেব বিশেষ কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় না। তাঁহার কাব্যের শেষ শ্লোকে আছে যে, তিনি কান্যকুব্জরাজের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রাজশেখর সূরির 'প্রবন্ধকোষ' (১৩৪৮ খ্রীঃ) অনুসারে মনে হয় যে, কবি হর্ষ ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনৌজরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদান্তিক গ্রন্থ 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যম্' সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে বাঙালী ছিলেন এমন কোন সুদৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ কনৌজরাজ বিজয়চন্দ্রকে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন রূপে গ্রহণ করিতে চান। কেহ বা, নৈষধে 'হুলুধ্বনি' আছে এবং মেয়েরা শঙ্খ পরিধান করিয়াছে—এই বর্ণনা আছে বলিয়া এই কাব্যকে বাঙলার সৃষ্টি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে চাহেন। কিন্তু মাঙ্গলিক কর্মে স্ত্রীলোকের হুলুধ্বনি বা মহিলাদের শঙ্খবলয় ধারণ শুধু বাঙলারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। পশ্চিমভারতের কোন কোন জৈনলেখকের গ্রন্থেও এই হুলুধ্বনির উল্লেখ আছে। মহাভারত ও কাদম্বরীতেও নারীর শঙ্খবলয় ধারণের কথা আছে।[১৩] বাঙলার কুলজী শাস্ত্রমতে শ্রীহর্ষ মেধাতিথির পুত্র। কুলজীগ্রন্থ ইতিহাসকে যে কী পরিমাণে রূপকথায় পরিণত করিয়াছে, তাহা মেধাতিথির উল্লেখেই বুঝা যাইবে। সুতরাং শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ নাই।

১৩ *History of Bengal* (D.U), Vol I, p. 306

নীতিবর্মার 'কীচকবধ' মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং পাঁচ সর্গে সমাপ্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের কাব্য, এই কাব্যটিও নানাপ্রকার আলঙ্কারিক আয়ুধে বিশেষভাবে সজ্জিত। কাহারও কাহারও মতে নীতিবর্মার এই কাব্য বাঙলা অথবা কলিঙ্গে রচিত হইয়া থাকিবে। অনুমান কবি নীতিবর্মা কলিঙ্গ বা বঙ্গের কোন রাজার সভাকবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের দুই স্থলে (১ম সর্গ—২১ শ্লোক, এবং ৭ শ্লোক) 'বিগ্রহ' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাতেই অনুমিত হয় যে, হয়তো তিনি পালবংশের বিগ্রহপালের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় রহিয়াছে। পালবংশের তিন জন বিগ্রহপালের (১ম বিগ্রহপাল, ৮৫০-৮৫৪ খ্রীঃ; ২য় বিগ্রহপাল, ৯৬০-৯৮৮ খ্রীঃ; ৩য় বিগ্রহপাল, ১০৫০-১০৭০ খ্রীঃ) আবির্ভাবকাল ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কারে' (১০৬৯ খ্রীঃ অঃ) নেমিসাধু নীতিবর্মার কাব্য হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। সুতরাং কবি যে ১১শ শতাব্দীর পূর্বে বা প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা জানা যাইতেছে না। তবে তাঁহার কাব্য যে বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার কয়েকটা স্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'কীচকবধে'র যে কয়েকটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সবগুলিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। উপরন্তু এই কাব্যের অধিকাংশ টীকা বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত পরোক্ষ প্রমাণের বলে নীতিবর্মাকে বাঙালী বলিয়া কিয়দংশে গ্রহণ করা যায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে একথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এতাবৎ কাল ধরিয়া আমরা যে সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদিকে বাঙালীর রচনা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা ঠিক নহে। অভিনন্দের 'রামচরিত' ও সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' নামক দুইখানি কাব্য ব্যতীত অন্যান্য কাব্য বা নাটক, যাহা এতদিন ধরিয়া বাঙালীর রচনা বলিয়া বাঙলাদেশ গর্ব করিয়াছে, তাহার মূলে ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব আছে। অবশ্য এইগুলি বাঙালীর রচিত হইলেও বাঙালীর তাহাতে গর্ব করিবার বিশেষ কিছু থাকিত না; কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের জরাজীর্ণতার যুগে এইগুলি রচিত হইয়াছিল এবং উহাতে কবিপ্রাণের স্বতোৎসারিত আত্মপ্রকাশ অপেক্ষা রচনাচাতুর্যের বৃথা আস্ফালনই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে।

শ্লোক সংগ্রহ ॥

সংস্কৃতে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভট শ্লোকাবলী বাঙলাদেশে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। বরং এই শ্লোকগুলিতেই বাঙালীর লীরিকপ্রতিভা একটা নূতন প্রকাশরীতি লাভ করিয়াছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণবপদের সহিত এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত শ্লোকের বেশ সাদৃশ্য আছে। এই জাতীয় দুইটি প্রাচীন সংগ্রহের উল্লেখ করা হয়—'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র পুঁথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে, ইহা ১২শ শতকের নেওয়ারী অক্ষরে রচিত। তৎকালীন বঙ্গাক্ষরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। ইহার অনেক কবি বাঙালী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই সঙ্কলনটিকে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পুঁথিটির প্রথমদিকের কিয়দংশ নষ্ট হওয়াতে ইহার প্রকৃত আখ্যা কি ছিল জানা যাইতেছে না। টীকার একস্থলে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এই শব্দগুলি আছে বলিয়া উক্ত সংগ্রহের সম্পাদক এফ. ডবলিউ. টমাস সমগ্র পুঁথিটিকে ঐ নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার সঙ্কলয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই; তবে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন; কারণ প্রথম দিকের শ্লোকে বুদ্ধ বন্দনা আছে। কিন্তু এইটুকু ছাড়িয়া দিলে সমস্ত সংগ্রহের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক আর বিশেষ কোন প্রভাব নাই। বরং হরিবিষয়ক কবিতার সংখ্যাই অধিক। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর উপর রচিত কবিতাগুলির নিখুঁত বর্ণনা ও বাস্তবধর্মী লীরিক-উচ্ছ্বাস প্রশংসনীয়। ইহার সমগ্র কবিতাসমষ্টির অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা (প্রায় ৩৫০) আদিরসাত্মক। আধুনিক পাঠকের নিকট 'অসতীব্রজ্যা'র অন্তর্গত শ্লোকগুলি কিছু স্থূল মনে হইতে পারে। ইহার মোট কবি সংখ্যা—১১১; তাহার মধ্যে কালিদাস-ভবভূতিও আছেন; তেমনি আছে অনেক অজ্ঞাত কবির অপরিচিত শ্লোক। এই অজ্ঞাত-পরিচয় কবিদের নাম দেখিয়া কয়েকজনকে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। যথা—বন্দ্য তথাগত, গৌড় অভিনন্দ, মধুশীল, শ্রীধরনন্দী, রতিপাল প্রভৃতি। এই সংগ্রহ হইতেই তৎকালীন বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতেছে। বাঙালী একদিকে যেমন টুকরা কবিতায় বাস্তব চিত্রণে কুশলতা অর্জন করিয়াছিল, তেমনি আদিরসাত্মক কবিতার প্রতিও তাহার আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তী কালের 'সদুক্তিকর্ণামৃত'

ও জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বিচার করিলে তাহার স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইবে। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা-বিষয়ক অনেকগুলি শ্লোক সংযোজিত হইয়াছে, বাঙলাদেশের পরবর্তী সংস্কৃতির সহিত এইখানে ইহার আত্মীয়তার যোগ রহিয়াছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া যে আদিরসাত্মক ভক্তিবাদের ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার উৎস এই 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শ্লোকের মধ্যেই নিহিত।

ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয় শ্রীধরদাস-সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র। কোন কোন পুঁথিতে ইহা 'সূক্তিকর্ণামৃত' নামেও পরিচিত। এই সঙ্কলনটিতে ১২শ-১৩শ শতকের বাঙালীর রসরুচি, জীবন ও সমাজের যে ছায়া পড়িয়াছে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার্য। লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত ও বন্ধু বটুদাসের পুত্র 'মহামাণ্ডলিক' শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন করিয়া ১২শ-১৩শ শতকের বাঙালীর সহিত পরবর্তী কালের বাঙালীর সেতু রচনা করিয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব ও মধ্যপর্বের অনেক রচনায় শ্রীধর দাসের সঙ্কলনের অনেক কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে। সেই দিক দিয়া এই সঙ্কলনখানি 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' অপেক্ষাও মূল্যবান। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলিত হয়। ইহাতে মোট পাঁচটি 'প্রবাহ', প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি 'বীচি' এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। কবিতার সংখ্যা—২৩৭০টি; মোট কবির সংখ্যা—৪৮৫ জন। তন্মধ্যে প্রায় পাঁচশত শ্লোকের কবির নাম পাওয়া যায় নাই। কবিদের মধ্যে যেমন সর্বভারতীয় ভাস, কালিদাস, ভামহ, অমরু, ভর্তৃহরি, রাজশেখর, বিশাখদত্ত প্রভৃতির কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে, তেমনি লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি-মনীষীদেরও বিবিধ ধরণের শ্লোক স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও ইহাতে প্রায় ৮০জন অজ্ঞাত-পরিচয় কবির নাম পাওয়া যাইতেছে যাঁহাদিগকে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, একদা বাঙলাদেশে বহু কবি উদ্ভট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সঙ্কলনটি প্রধানতঃ বাঙালীর রচিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দেবতা, নায়ক-নায়িকা, ঋতুবর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহ, গাছপালা, পশুপক্ষী, আদিরস প্রভৃতি বিষয়ে সংগৃহীত শ্লোকগুলির বিষয়বৈচিত্র্য স্মরণীয়। দেবদেবী-বিষয়ক অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইলেও মানুষের দৈনন্দিন

জীবনই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে দেবদেবীর কথা যাহাও বা আছে, তাহাতে মানবজীবনের বেদনামাধুরী অধিকতর সঞ্চারিত হইয়াছে। হর-গৌরীর বিবাহে দরিদ্র মহাদেবকে দেখিয়া গৌরীর দুরবস্থা স্মরণ করিয়া মেনকার রোদন—

জামাতা কোঽত্র? যোঽসৌ ভুজগ পরিবৃতো ভস্মরুক্ষ কপালী।

অনু: এই কি জামাতা? এ যে ভুজগপরিবৃত ভস্মভূষিত রুক্ষ নর-কপালধারী ব্যক্তি!

ইহাতে তো বাঙালী-জীবনেরই ছায়া পড়িয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের চিত্রযুক্ত শ্লোকের সংখ্যা অল্প নহে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত—

অভিনন্দের একটি মৎস্যবিষয়ক কবিতা—

শফর সংহর চঞ্চলতামিমাং চিরমগাধজলপ্রণয়ী ভব।
ইহহি কোমল বঞ্জুল জালকে বসতি দুষ্ট বকোট কুটুম্বকম্।।

অনু: হে শফর, এই চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া অগাধ জলে আসক্ত হও। এই কোমল বেতসকুঞ্জে বককুটুম্ব বাস করে।

জলচন্দ্র নামক এক কবির দরিদ্র গৃহের বর্ণনা—

ধূমেন রিক্তমপি নির্ভর বাষ্পকারি দূরীকৃতানলমপি প্রতিপন্ন তাপম্।
দৈন্যাতিশূন্যমপি ভূষিত বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্যমেব খলু খেদকরং ॥

অনু: দরিদ্রের গৃহ ধূমশূন্য হইয়াও বাষ্প পরিপূর্ণ, আগুন না থাকিলেও তাপ রহিয়াছে, দৈন্যের দ্বারা শূন্য, কিন্তু ভূষিত বন্ধুবর্গের দ্বারা পূর্ণ—ইহাই আশ্চর্য এবং বেদনাপূর্ণ।

অভিনন্দের আর-একটি কবিতা—হেমন্ত রাত্রির বর্ণনা—

"শীতোর্জাগরজম্বুকৌঘমুখর গ্রামোপকণ্ঠস্থলাঃ।"

অনু: শীতবশতঃ অনিদ্র শৃগালদলের আরাবে মুখর গ্রামোপকণ্ঠ।

উমাপতি ধরের একটি রাজমহিমাজ্ঞাপক ("দিগ্বিজয়ঃ") কবিতা—

আকৌমারং সমরজয়িনা কুর্বতোর্বীমবীরামেতেনামী কথমিব
দিশামীশিতারো বিযুক্তাঃ।
অন্তর্জ্জাতং বপুষি কলয়া তস্য তেজৌ প্রবিষ্টাঃ প্রহ্বীভূতে
প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥

অনু: যাঁহার কুমার কাল হইতেই সমর জয় হইয়া আসিতেছে, যাঁহার দ্বারা পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছে, তিনি দিক্‌পতিগণকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? ক্ষত্রিয়ের কৃপাণ নত জনকে আঘাত করে না।

পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়িলেও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা এবং মঙ্গলকাব্যে

দৈনন্দিন জীবন-বিষয়ক কবিতাগুলির বিশেষ ছায়া পড়িয়াছে। বরং মনে হয়, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র মধ্যে জীবনের যে বিচিত্র রূপ বিকীর্ণ হইয়াছে, পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রভাব খর্ব হইয়া পড়ে এবং উহার অন্তর্ভুক্ত দেবদেবী-বিষয়ক শ্লোকগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব স্থাপন করে। এই সঙ্কলনের শেষ তিনটি 'প্রবাহে' (চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচপ্রবাহ) বাস্তব-জীবনকেন্দ্রিক এমন সমস্ত উজ্জ্বল চিত্র আছে, যাহা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যায় না।

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র 'অসতীব্রজ্যা' এবং 'শৃঙ্গার প্রবাহ' নামক অধ্যায়ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, আদিরস ও ভক্তিরস ক্রমে ক্রমে সমীকৃত হইয়া বিচিত্র কাব্যপ্রেরণায় পর্যবসিত হইতেছিল; তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ মিলিবে লক্ষ্মণ সেনের সভাতলের সারস্বত পঞ্চরত্নের (জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন আচার্য, শরণ) 'বিলাসকলা কুতূহল' কাব্যানুশীলনের মধ্যে।

॥ ৬ ॥

জয়দেব গোষ্ঠী

লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া যে পঞ্চরত্নের (উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব) সমাবেশ হইয়াছিল তাহার মধ্যমণি হইতেছেন জয়দেব। কিন্তু জয়দেবের সমসাময়িক আর-চারিজন কবির কথা অগ্রে আলোচনা করিয়া লওয়া যাক। স্বয়ং জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' বন্ধু চতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মহাকালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' এই চারিজনের বহু শ্লোক সংগ্রহ করিয়া ইঁহাদের কবিপ্রতিভাকে পরবর্তী কালের পাঠকের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। জয়দেব 'গীতগোবিন্দে' এই চারিজন কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া চারিজনের পরিচয় দিয়াছেন—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।

শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্ধনস্পর্ধ
কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ (১।৪)

অনু : কবি উমাপতি ধর বাক্যকে পল্লবিত করেন। দুরূহ পদের দ্রুতরচনায় শরণ কবি প্রশংসনীয়। শৃঙ্গার রসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। ধোয়ী কবিরাজের শ্রুতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধি। জয়দেব কবি শুদ্ধ সন্দর্ভরচনায় সমর্থ।[১২]

এই শ্লোকেই জয়দেবসহ পাঁচজন কবির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং ইহারা সকলেই যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। 'সুভাষিতাবলী' (১৫শ শতাব্দী) নামক শ্লোক-সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ আছে—

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণ সেনস্য চ।

সুতরাং ইহারা সকলেই যে প্রায একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়।

উমাপতি ধর ॥ প্রথমেই উমাপতি ধরের কথা ধরা যাক। জয়দেবের মতে উমাপতি পল্লবিত বাক্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উমাপতি ধরের নামে অন্ততঃ নব্বইটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে। এই সঙ্কলনে আরও একজন উমাপতির কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা শুধু উমাপতি ধর-নামাঙ্কিত শ্লোকগুলি গ্রহণ করিতেছি। দেওপাড়া প্রশস্তিলিপিটি উমাপতি ধরের রচনা। বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেনের এই প্রশস্তিতে উমাপতি পল্লবিত বাক্যের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্র-লিপিতেও উমাপতির হস্তাবলেপ উপলব্ধি করা যায়। তিনি বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন—তিন পুরুষের সহিত সংযুক্ত ছিলেন কিনা জানা যাইতেছে না। তিনি লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। তাঁহার রচিত পূর্ণাকারের কোন কাব্য পাওয়া না গেলেও দেওপাড়া ও মাধাইনগর লিপি এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র ৯০টি শ্লোক অবলম্বনে উমাপতির কাব্যরীতির পরিচয় পাওয়া দুরূহ নহে। গৌডীরীতির আদর্শে 'অক্ষর ডম্বর' ও 'অলঙ্কার ডম্বরে'র সাহায্যে উমাপতি প্রশস্তিকে যে কত পল্লবিত করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার রচিত দেওপাডা লিপি পাঠ করিলেই উপলব্ধি

১২ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন—কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ

করা যাইবে। বাঙলাদেশে লিপিলেখনে যে জাতীয় ভাষাচাতুরী ব্যবহৃত হইত, ইহাতে তাহারই এক উৎকট দৃষ্টান্ত মিলে—

বিলেশযবিলাসিনী মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুর-
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপুরং।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্ন পৌরাঙ্গনা
স্তনৈনর্মদসৌরভোচ্ছলিত চঞ্চরীকং সরঃ॥

অনু: তিনি (বিজয় সেন) পুরশক্রর (মহাদেব) সম্মুখে একটি সরোবর খনন করাইযাছিলেন; এই সরোবরের জল সর্পরমণীদের মুকুটলগ্ন রত্নখণ্ড হইতে বিচ্ছুরিত কিরণমঞ্জরীতে পূর্ণ ছিল এবং নাগরিকদের স্নানার্থিনী স্ত্রীদের বক্ষোলিপ্ত কস্তুরীগন্ধে মধুকর আকৃষ্ট হইয়াছিল।

'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত তাঁহার আর-একটি বিচিত্র শ্লোক—

সাধু ম্লেচ্ছ নরেন্দ্র সাধু ভবতো মাতৈব বীরপ্রসূর্নীচেনাপি
ভবদ্বিধেন বসুধা সুক্ষত্রিণী বর্ততে।

অনু: ম্লেচ্ছরাজ, সাধু, সাধু; আপনার মাতাই বীরপ্রসবিনী; নীচ (বংশোদ্ভূত) হইলেও আপনার মত লোকের জন্যই বসুধা এখনও সুক্ষত্রিয় আছে।[১৩]

সেনবংশ পরাভূত হইয়া পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করিলে উমাপতি বোধহয় পশ্চিমবঙ্গ হইতে পলায়ন করেন নাই এবং বৃদ্ধ বয়সে ঐহিক স্বার্থের বশীভূত হইয়া ম্লেচ্ছরাজের স্তুতিবাদ করিয়া থাকিবেন।

শরণ॥ শরণের ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। জয়দেব তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।"—দুরূহ পদের দ্রুতরচনায় শরণ ছিলেন প্রশংসনীয়। শরণের কবিত্ব-শক্তির একমাত্র বিশেষণ 'দুরূহ ও দ্রুত' শব্দ দুইটি লইয়া কিছু মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। 'দুরূহ' ও 'দ্রুত' কে পৃথক ধরিয়া একটা অর্থ করা যাইতে পারে। —শরণ যেমন দ্রুতবেগে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনি কঠিন ধরণের কবিতারচনায়ও তাঁহার সম্যক প্রতিভা ছিল। কেহ-বা মনে করেন, ইহার অর্থ হইবে—শরণ দুরূহ শব্দকে অতি দ্রুত সহজ করিতে পারিতেন। সে যাহা হউক, ইনি বিশেষ কবিখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেহ তাঁহাকে 'দুর্ঘটবৃত্তি' নামক ব্যাকরণের রচনাকার শরণদেবের (১১৭৩ খ্রীঃ অঃ) সহিত একীভূত করিতে চাহেন। যদিও কবি শরণ এবং

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়-কৃত অনুবাদ—বাঙ্গালীর ইতিহাস

বৈয়াকরণ শরণদেব প্রায় সমসাময়িক, তথাপি একে অপর বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই।

শরণের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'-ধৃত একটি পদে 'সেনবংশতিলকের' উল্লেখ আছে, আর-একটি পদে 'গৌড়লক্ষ্মী'র ইঙ্গিত আছে। সুতরাং, তাঁহাকে সেনবংশের, বিশেষতঃ লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক বলিয়া ধরা যায়। বাঙলার বাহিরে অন্য কোন শ্লোকসংগ্রহে শরণের কোন কবিতা ঠাঁই পায় নাই। বাঙলাদেশের দুই খানি শ্লোকসংগ্রহ শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে'ই তাঁহার সামান্য কিছু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সদুক্তি'তে শরণদেব, শরণদত্ত, শরণ এবং চিরন্তন শরণ—এই নামে যে কবিতাগুলি সংগৃহীত হইযাছে তাহার সংখ্যা বাইশটি মাত্র। ইঁহারা বিভিন্ন কবি কিংবা কবি শরণই বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার শ্লোকগুলি কোন দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে এবং সেইজন্য জয়দেব শরণের কবিত্ব শক্তিকে 'দুরূহ দ্রুত' বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যকারের কবিত্ব প্রমাণিত হইতেছে না।

ধোয়ী ॥ উমাপতি এবং শরণের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেলেও তাঁহাদের রচিত কোন পৃথক্ কাব্য পাওয়া যায় নাই। ধোয়ী এবং গোবর্ধন আচার্যের নামে দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে এবং ইঁহারা কিয়দংশে সর্বভারতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকার্য। জয়দেব "শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতি"-র খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। কোথাও ধোয়ীকে 'কবিরাজ' বলা হইয়াছে ('সুভাষিতাবলী')। বলাবাহুল্য 'কবিক্ষ্মাপতি' ও 'কবিরাজ' শব্দ দুইটির অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। স্বয়ং ধোয়ীও তাঁহার পবনদূতে 'কবিক্ষ্মাপতি' শব্দটি আপনার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন (শ্লোক ১০১, ১০৩)। জয়দেব তাঁহাকে আবার আরও একটা বিশেষণ দিয়াছেন—'শ্রুতিধর'—অর্থাৎ প্রখর মেধাবী। রাণাকুম্ভ-কৃত গীত-গোবিন্দের "রসিকপ্রিয়া" টীকায় 'শ্রুতিধর'কে আর একজন পৃথক্ কবি বলা হইযাছে। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং 'শ্রুতিধর' শব্দটিকে ধোয়ীর বিশেষণরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ধোয়ী, ধোয়িকা এবং ধুয়ী—এই তিনটি নাম পাওয়া গেলেও ধোয়ী নামটি অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে

প্রামাণিকভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জলালুদ্দিন তাব্রিজি-রচিত 'সেকশুভোদয়া' নামক মিশ্রসংস্কৃতে লেখা একখানি মধ্যযুগীয় গ্রন্থে ধোয়ী সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি নাকি জাতিতে তন্তুবায় এবং প্রথম জীবনে নিতান্তই মূর্খ ছিলেন।[১৪] তাঁহার 'পবনদূতে' সুহ্মদেশের যেরূপ বাস্তব বর্ণনা আছে, তাহাতে তাঁহাকে রাঢ়ের অধিবাসী বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের বিষয়বস্তুর মৌলিকতা, ছন্দের মাধুর্য, রচনার অভিনবত্ব এবং আবেগের নিবিড়তা পরবর্তী বহু কবিকে 'দূতকাব্য'-প্রণয়নে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য—ধোয়ীর 'পবনদূত'। ঘটনা-পরিকল্পনা ও রচনারীতি প্রায় কালিদাসেব অনুরূপ, যদিও মূল ও অনুকরণে যে প্রভেদ, 'মেঘদূত' ও 'পবনদূতে' সেই পার্থক্য বর্তমান। 'পবনদূতে'র নায়ক স্বয়ং লক্ষ্মণসেন দেব। লক্ষ্মণ সেনের দাক্ষিণাত্য অভিযান-কালে কুবলয়বতী নাম্নী এক গন্ধর্বকন্যা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে ফিরিয়া আসিলে মদনশরে আহত কুবলয়বতী দক্ষিণ-পূর্ব পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণ সেনের নিকট স্বীয় বিরহব্যথার বার্তা পাঠাইয়াছিলেন। মোট ১০৪টি শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত এই কাব্যটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার নায়ক একজন মানুষ—অবশ্য সর্বগুণান্বিত নৃপতি। চরিতকাব্য বা ঐতিহাসিক আখ্যানে মানবচরিত্র নায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু গাথাকাব্যে সমসাময়িক ব্যক্তিকে নায়ক করিয়া ধোয়ী অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণে অভিযান করিয়াছিলেন কিনা সংশয়স্থল। কিন্তু এই কাল্পনিক কাব্যটির মধ্যে দক্ষিণ ভারত হইতে নবদ্বীপ পর্যন্ত পথের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ভৌগোলিক তথ্যের কিছু ভুলত্রুটি থাকিলেও[১৫], ইহার কাব্যসৌন্দর্য স্বীকার করিতে হইবে। পবনের যাত্রাপথ—পাণ্ড্যদেশের রাজধানী 'ভুজগনগরী' হইতে রামেশ্বর, কাঞ্চী কাবেরী নদী ধরিয়া মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করিয়া অন্ধ্রদেশ, কলিঙ্গ, কেরল, যাজপুর পার হইয়া সুহ্মদেশ—তারপরে গৌড়নগরীর বিস্তৃত বর্ণনা। সুহ্মদেশের বর্ণনাটি স্নিগ্ধ মধুর—

১৪ সেকশুভোদয়া (chap. XVI)—Ediied by Dr. Sukumar Sen

১৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৫

গঙ্গাবীচি প্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতং-
শোঽধ্যাসতুচ্চৈস্ত্বয়িরসময়ো বিস্ময়ঃ সুহ্ম দেশঃ।
শ্রোত্র ক্রীড়াভরণপদবীঃ ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলা কোমলং যত্র ভাতি॥

অনু: সেই সুহ্মদেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত। সুধাধবলিত প্রাসাদরাজি উহার কর্ণভূষণ স্বরূপ। সেই রসময় দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবে। সেখানে নবশশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণ মহিলাদের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে।

কবির প্রার্থনাটি সজ্জন জীবনরসিক বাঙালীর চিরকালীন কামনার প্রতীকরূপে গৃহীত হইতে পারে—

গোষ্ঠীবন্ধঃ সকলকবিভির্বাচি বৈদর্ভীরীতির্বাসো
গঙ্গাপরিসর ভূবি স্নিগ্ধ ভোগ্যা বিভূতিঃ।
সৎসু স্নেহঃ সদসিকবিতাচার্যাকং ভূভুজাং
মে ভক্তি লক্ষ্মীপতি চরণয়োরস্তু জন্মান্তরেঽপি॥

অনু: সকল কবিদের সহিত গোষ্ঠীপ্রীতি, বৈদর্ভীরীতিতে কাব্যরচনা, সুপ্রসর গঙ্গাতীরে বাস, স্বল্প ভোগের অনুকূল ঐশ্বর্য, সজ্জনের স্নেহ, কবিতাচাযরূপে খ্যাতি এবং জন্মান্তরেও লক্ষ্মীপতির চরণে ভক্তি, ইহাই আমার কামনা।

কেহ কেহ এই কাব্য অবলম্বনে লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক বাঙলাদেশের নৈতিক অধোগতির চিত্রকে ঐতিহাসিক পর্যায়ে তুলিয়া ধরিতে চাহেন।[১৬] ইহাতে লক্ষ্মণ সেনের সহিত কুবলয়বতীর আদিরসাত্মক প্রণয়চিত্র রহিয়াছে। যে-রাজসভায় সভাকবি পৃষ্ঠপোষক রাজাকে আদিরসের নায়ক করিতে পারেন, সে রাজসভার নৈতিক আদর্শ সহজেই অনুমেয়। গৌড় নগর বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি প্রকাশ্য সরোবরে রমণীদের নগ্ন জলক্রীড়া বর্ণনা করিয়াছেন, রাজপথে বারবনিতাদের অভিসারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মন্দিরে দেবদাসী-প্রথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। নবদ্বীপ কি করিয়া তুরস্ক সেনার দ্বারা অধিকৃত হইল, তাহার সামাজিক কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ ধোয়ীর 'পবনদূতে'র এই আদিরসাত্মক লীলার উল্লেখ করিয়া থাকেন। সমাজের উচ্চস্তরে অর্থাৎ 'নাগর সমাজে' যৌনশিথিলতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল এবং সেই দুর্বলতম পথ দিয়া মুসলমান প্রবেশ করে। কথাটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক হইতে কিঞ্চিৎ সত্য হইলেও ধোয়ীর 'পবনদূতে'র নজির

১৬ বৃহদ্বঙ্গ (১ম)—দীনেশচন্দ্র সেন

তুলিয়া তৎকালীন সমাজের নৈতিক শিথিলতার কাল্পনিক চিত্রাঙ্কন বোধহয় ইতিহাসসম্মত নয়। 'পবনদূত', 'মেঘদূত'-এর অনুকরণে রচিত আদিরসাত্মক গাথাকাব্য—যাহার নায়ক ঐতিহাসিক, কাহিনী কাল্পনিক, নায়িকা গন্ধর্বলোক-বাসিনী। এই শ্রেণীব কাব্যে যে-সমস্ত আদিরসের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সমাজের যথাযথ চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা সর্বদা যুক্তিসঙ্গত নহে।[১৭]

গোবর্ধন আচার্য ॥ 'পবনদূত'-এর মত গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' ও বাঙলার বাহিরে কিছু প্রসার লাভ করিয়াছিল। "শৃঙ্গার রসের সৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না"—গোবর্ধন সম্বন্ধে জয়দেবের এই প্রশংসাবাণী বন্ধুপ্রীতিজনিত অতিশয়োক্তি বলিযা গৃহীত হইতে পারে। গোবর্ধন 'আচার্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার 'আর্যাসপ্তশতী' কাব্যে 'সেনকুলতিলক ভূপতি'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কবিব 'আচার্য' উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ব্যাপক হইযাছিল। তাঁহার কাব্যটি প্রাকৃত কবি হালের 'গাথাসপ্তশতী'র আদর্শে আর্যাছন্দে রচিত প্রায় সাতশত বিচ্ছিন্ন আদিরসাত্মক কবিতার সমষ্টি। আদিবস যে কিঞ্চিৎ উগ্র ধবণের তাহা পূর্বেই অনুমান করা যায়, তবে ইহার সরসতা ও তীক্ষ্নতা যে প্রাকৃত কবির সমকক্ষ নয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। প্রাকৃত ছন্দেব ঝঙ্কার ও শব্দযোজনার বক্রতা সংস্কৃত ভাষায় ফুটাইয়া তোলাও অতিশয দুরূহ। কবিও তাহা জানিতেন, তাই বলিয়াছেন—

বাণীপ্রাকৃত সমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতং নীতা।
নিম্নানুরূপনীরা কলিন্দ কন্যেব গগনতলং ॥

অনু: যে কবিতারস প্রাকৃতেই স্ফূর্তি লাভ করে, তাহাকে সংস্কৃতে রচনা করা অনেকটা নিম্নাভিমুখী যমুনানদীকে বলপূর্বক গগনতলে লইয়া যাওযার মতো।

এই বিচ্ছিন্ন আদিরসের কবিতাতে মাঝে মাঝে কিছু পরিহাস ও ব্যঙ্গকতার সমাবেশ হইয়াছে। কন্যার শ্বশুরবাড়ী যাইবার দৃশ্যটিতে কবির সরস দৃষ্টি ও মনস্তাত্ত্বিক কৌশল বেশ ফুটিয়াছে—

---

১৭ ধোয়ী বোধহয় বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা করিযাছিলেন। নানা সঙ্কলনে তাঁহার বিশটি কবিতা গৃহীত হইয়াছে, যাহা 'পবনদূতে' নাই।

অস্যাঃ পতিগৃহগমনে করোতি মাতা হশ্রুহপিচ্ছিলাং পদবীম্।
গুণগর্ব্বিতা পুনরসৌ হসতি শনৈঃ শুষ্ককদিতমুখী ॥

অনু : কন্যা পতিগৃহে গমনের কালে মাতা অশ্রুজলে পথ ভিজাইয়া ফেলিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্যগর্বিতা কন্যা, মৃদু মৃদু হাসিতেছে আর বাহিরে শুষ্কমুখে কান্নার ভান করিতেছে।

নাগরিকা স্বৈরিণী রমণীদের প্রতি কটাক্ষও কম উপভোগ্য নহে—

ঋজুনা নিধেহি চরণৌ পরিহর সখি নিখিল নাগরাচারং।
ইহ ডাকিনীতি পল্লীপতিঃ কটাক্ষেহপি দণ্ডর্যতি ॥

অনু : সখি, নাগরী রমণীদের ভাবভঙ্গিমা ত্যাগ করিয়া সাবধানে চরণ ফেল। সামান্য কটাক্ষপাত করিলেই গ্রামের মণ্ডল ডাকিনী বলিয়া শাস্তি দেয়।

আদিরসের শ্লোকগুলি হালের মতো সরস ও তীক্ষ্ণ না হইলেও এই জাতীয় কবিতায় বাঙালীসুলভ পরিহাস-রসিকতার নিপুণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে—যাহা জয়দেব ও ধোয়ীর বচনার মধ্যে নাই বলিলেই চলে।

॥ ৭ ॥

জয়দেব

ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস তাঁহার 'ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেবের স্তুতি করিতে গিয়া বলিযাছেন—

জয়দেব কবি নৃপচক্কৈব, খণ্ডমণ্ডলেশ্বর আণি কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ॥

অনু : জয়দেব কবি হইলেন রাজচক্রবর্তী, অন্য কবিরা খণ্ডমণ্ডলেশ্বর (ক্ষুদ্র ভূস্বামী); তিনলোকেই গীতগোবিন্দ প্রচুরভাবে উজ্জ্বল হইয়া রহিযাছে।)

কথাটা প্রথমে সন্তকবি নাভাজীর ভক্তিনত চিত্তের উচ্ছ্বাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু একটু অবহিত হইযা দেখিলেই স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিকায় জয়দেবকে 'নৃপচক্কৈব' বলা যাইতে পারে, এবং তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ১০ম শতাব্দীর পরে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের চিতাভস্ম হইতে নবজন্ম লাভ করিল। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের চরম দুর্দিন; তখন পূর্ব গগনে

একমাত্র দীপ্ত তারকা জয়দেবের গীতগোবিন্দ। উর্দু কবি হালি ঠিকই বলিয়াছেন, "ইধর্ হিন্দ্ মেঁ হরতরফ অন্ধেরা।" তখন হিন্দুস্থানের চারিদিক অন্ধকার। সেই আসন্ন অন্ধকারে জয়দেবের 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' মণিদীপ্তির মতো শোভা পাইতেছিল।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও ভাগবত—এই মহাগ্রন্থ কয়খানি ভারতবাসীর লৌকিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সেতুবন্ধস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। যদি কোন আর-একখানি গ্রন্থকে জনপ্রিয়তা অনুসারে ইহাদের সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে গীতগোবিন্দকেই সেই শ্লাঘনীয় স্থান দিতে হইবে। ইহাব কাব্যমূল্য কিরূপ, লৌকিক না অলৌকিক,—এ সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চযই আধুনিক পাঠকের মনে সংশয় সৃষ্টি কবিবে। কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী যে এই কাব্যটিকে দীর্ঘকাল ধবিয়া একটা বিশিষ্ট মূল্য দিয়া আসিতেছে, ইহা কয়েকটি ভক্তি-শাখার উপনিষদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং মধ্যযুগীয় প্রায় তাবৎ সন্তসম্প্রদায় ইহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কোন সংস্কৃত গ্রন্থই অনুরূপ সর্বভারতীয় প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। বাঙলাদেশে গীতগোবিন্দের পূর্বে প্রায় আটশত বৎসর ধরিযা সংস্কৃতচর্চা চলিলেও সেই যুগের কোন গ্রন্থই সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট 'সরিৎ-সাগরে' কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। গীতি-গোবিন্দ তাহার উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম, বাঙালীর এই অভিনব সৃষ্টি সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয জয় করিয়াছিল, এবং এই একখানি কাব্যের দ্বারা বাঙালী সংস্কৃত সাহিত্যের সারস্বত সমাজে বিশেষ গৌরবলাভ করিয়াছে।

জয়দেবের জীবনকথা ॥ জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহু লোকশ্রুতি প্রচলিত থাকিলেও সুদৃঢ় প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া কোন বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না। চক্রদত্ত-প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে এই জাতীয় বহু উপ-কথা সংগৃহীত হইয়াছে।

জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের 'পঞ্চরত্নের' (জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, শরণ ও গোবর্ধন আচার্য) অন্যতম ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। অজয় নদের তীরে বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব (আধুনিক কেঁদুলি) গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি

নিজের সম্বন্ধে যে স্বল্প উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার করা যায় না। জয়দেবের টীকাকারগণও কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকের টীকা করিতে গিয়া কিছু কিছু নূতন তথ্য দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাতেও সংশয় আছে। যাহা হউক, সংক্ষেপে তাঁহার জীবনীবিষয়ে দুই-একটি তথ্য উল্লেখ করা যাইতেছে।

জয়দেবের পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী; মতান্তরে রাধাদেবী বা রামাদেবী। পত্নী পদ্মাবতী। গীতগোবিন্দের গায়েন ছিলেন কবির প্রিয়বন্ধু পরাশর। কবি এই কাব্যে তাঁহায় সমসাময়িক আরও চারিজন কবির (শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য) নাম করিলেও কোন নৃপতির নাম উল্লেখ করেন নাই। পদ্মাবতী কবির পত্নী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বয়ং কবি নিজেকে "পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী" এবং "পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি" আখ্যা দিয়াছেন। অবশ্য পরবর্তী টীকাকারগণ পদ্মাবতীকে লইয়া কিছু সংশয় সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের অন্যতম প্রাচীন টীকাকার রাণাকুম্ভ তাঁহার 'রসিকপ্রিয়া' টীকায় "পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তীর"-র ব্যাখ্যায় পদ্মাবতীকে জয়দেবের সহধর্মিণী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ঐ বাক্যাংশটিকে "পদ্মহস্তা লক্ষ্মী" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। রাণা কুম্ভকে বাদ দিলে অন্যান্য টীকাকারগণের প্রায় সকলেই পদ্মাবতীকে জয়দেব-পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ভক্তমাল এবং বাঙলায় প্রচলিত অন্যান্য জীবনীমতে পদ্মাবতী পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করিতেন, এবং জয়দেব বোধহয় নৃত্য-গীতের তাল রক্ষা করিতেন; তাই 'গীতগোবিন্দে' কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, "পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী"। কেহ কেহ পদ্মাবতীকে জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী বলিতে চাহেন। ধোয়ীর 'পবনদূতে' মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথার বর্ণনা আছে। পদ্মাবতী দেবদাসী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। ১৫শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত 'সেকশুভোদয়া' নামক বিচিত্র গ্রন্থে পদ্মাবতী ও জয়দেবের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই 'সেকশুভোদয়া'* গ্রন্থটির প্রামাণিকতা যাহাই হউক না কেন, পদ্মাবতী যে নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণব গোস্বামী ও মধ্যযুগীয় সাধকসন্তদের কৃপায় ভারতের প্রায়

* পরে এই পুস্তিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সর্বত্র জয়দেব সম্বন্ধে নানা গল্পকাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙলাদেশেও বীরভূম জেলা ছাড়া বগুড়া জেলায় কেন্দুল নামে যে গ্রাম আছে, স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে সেখানে নাকি জয়দেব কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে এখানে জয়দেবের নামে মেলা বসিত, এখনও স্থানীয় লোক উক্ত গ্রামের কোন এক স্থানকে 'জয়দেবের ভিটা' বলিয়া থাকে। জয়দেবের অতিশয় জনপ্রিয়তার ফলে শুধু বাঙলার একাধিক গ্রাম নহে, উড়িষ্যা ও মিথিলাবাসীরাও কবিকে তাঁহাদের দেশের কবি বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তীরহুত জেলায় অবস্থিত জেঞ্ঝারপুর শহরের কাছে কেন্দোলি নামক একটি গ্রাম আছে। মিথিলাবাসীদের মতে জয়দেব এই কেন্দোলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উড়িষ্যাবাসীরাও পুরীর নিকটে বিন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের আবির্ভাব কল্পনা করিতে চাহেন। ইহার দ্বারাই জয়দেবের ভারতব্যাপী প্রভাব প্রমাণিত হইতেছে। অবশ্য নানাবিধ প্রমাণ ও তথ্যদৃষ্টে জযদেবকে বীরভূমের কেন্দু-বিল্ব গ্রামের অধিবাসী বলিয়াই গ্রহণ কবিতে হইতেছে।

গীতগোবিন্দ-পরিচয় ॥ এইবার সংক্ষেপে গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচনা করা যাক। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত, উক্তি-প্রত্যুক্তি ও সঙ্গীতময় রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা লইয়া রচিত এই কাব্য বিষয়বস্তু, রচনা-কৌশল ও ভক্তির জন্য সারা ভারতবর্ষে অপ্রতিহত প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণকে বহু গোপীর সহিত রাসলীলায় মত্ত দেখিয়া রাধা ঈর্ষাভরে মানিনী হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণও অন্যান্য গোপযুবতীদিগকে ত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে রাধার আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন; বহু অনুনয়-বিনয় ও সখীদের অনু-রোধের পর রাধা কৃষ্ণের প্রতি বাম্যভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং এই কাব্যের ১২শ সর্গে "সুপ্রীত পীতাম্বর" রাধার নিবিড় আসঙ্গ লাভ করিলেন। বারোটি সর্গের কিছু বিবৃতি, সখী, রাধা ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং চব্বিশটি গানের মধ্য দিয়া কাহিনীটি (নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্বভাবে) বর্ণিত হইয়াছে জয়দেব কোন্ উৎসমূল হইতে ইহার আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনার যোগ্য। প্রায় যাবতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপনিষদগ্রন্থ ভাগবতের দ্বারা তিনি কতদূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ। ভাগবতে রাধার প্রসঙ্গ নাই, তবে একজন প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে; ইহাতে রাসলীলা 'শারদোৎফুল্ল যামিনীতে' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, গীতগোবিন্দে

রাস বর্ণিত হইয়াছে সরস বসন্তে,—"মধুকরনিকর-করম্বিত-কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে"। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অন্যান্য পুরাণেও রাধার কোন উল্লেখ নাই। একমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের 'কৃষ্ণজন্মখণ্ডে'র ১৫শ অধ্যায়ে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। এমন কি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের ("মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ" ইত্যাদি) সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের রচনাকাল লইয়া বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। উইলসন সাহেব এই পুরাণকে অর্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আধুনিক কালের গবেষকগণ নানা প্রমাণ উত্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই পুরাণে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকিলেও ইহার রচনাকাল ৮ম শতাব্দীর পরবর্তী নহে। সুতরাং জয়দেবের কাহিনীর সূত্রটি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে গৃহীত হইতে পারে। অবশ্য গীতগোবিন্দের ঘটনার মধ্যে এমন কোন অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য নাই যাহা কবি স্বীয় কল্পনাবলে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। 'রাধা' নামটি তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। দক্ষিণভারতে প্রাচীন গ্রন্থে রাধার উল্লেখ আছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের ভক্ত দার্শনিক নিম্বার্ক রাধাকৃষ্ণ উপাসনার প্রচলন করেন। ঋগ্বেদে (৮ম মণ্ডল, ৪৫ সূক্ত, ২৪ ঋক্) রাধা নামক গোপরমণীর উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রাধা ও অনুরাধাকে শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র বলা হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণেও (মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, দেবীভাগবত) রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রাকৃত-অপভ্রংশেই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বনে বহু শ্লোক রচিত হইয়াছিল। হালের 'গাথাসপ্তশতী'তেই শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও যশোদার বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রামাণিক সংস্কৃতগ্রন্থেও কৃষ্ণের গোপীলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্রে' রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ভট্টনারায়ণ তাঁহার 'বেণীসংহার' নাটকে রাধার কথা বলিয়াছেন। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' অনেকগুলি শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণিত হইয়াছে। আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোকে' রাধার কথা বলিয়াছেন। আমাদের অনুমান, গ্রামাঞ্চলে পৌরাণিক শিবের পাশে পাশেই যেমন কৃষক শিবের লৌকিক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল, ঠিক তেমনি ভারতের প্রায় সর্বত্র পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক নানা লৌকিক গল্পগাথা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত সংগ্রহে

তাহার অধিকতর প্রভাব দেখা যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে কিছু লৌকিক প্রভাব আছে এবং তিনি হয়তো রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে প্রাকৃত-অপভ্রংশে প্রচলিত লৌকিক আখ্যান বা শ্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

কেহ কেহ গীতগোবিন্দের উপর 'কৃষ্ণকর্ণামৃতের' কবি বিল্বমঙ্গলের 'লীলাশুক') প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। দক্ষিণ-ভারতের ভক্তকবি লীলাশুক বিল্বমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' লীলাশুকের একটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দাক্ষিণাত্যের এই ভক্ত-কবিকে জয়দেবের কিছু পূর্ববর্তী বা সমকালীন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কৃষ্ণকর্ণামৃতের দুইটি শ্লোকে রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে। জয়দেব কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে রাধা পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমাদের অনুমান, জয়দেবের কাব্যপরিকল্পনা এমনই গতানুগতিক যে, ইহার কাহিনীর জন্য তিনি অন্য কাহারও দ্বারস্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন প্রাকৃত কবিতা এবং সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উগ্র বর্ণনা আছে। জয়দেব বোধহয় ঐ সমস্ত শ্লোক হইতে এবং লৌকিক কাহিনীর আদর্শের অনুসরণে তাঁহার কাব্য, বিশেষতঃ রাধাচরিত্রের পরিকল্পনা করেন। তবে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকীর্ণ কবিতায় রাধার উল্লেখ থাকিলেও জয়দেবের পূর্বে আর-কোন কবি তাঁহাকে নায়িকা করিয়া পূর্ণকাব্য রচনা করেন নাই।

ভাষা ॥ গীতগোবিন্দের ভাষা বিচার করিয়া প্রথমে ল'সেন এবং পরে পিশেল সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, গীতগোবিন্দের পদগুলির (অর্থাৎ সঙ্গীত) ভাষা, ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাসে অপভ্রংশের স্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। তাই তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, হয়তো প্রথমে গীতগোবিন্দের 'পদ' বা গানগুলি অপভ্রংশে অথবা প্রাচীনতম বাংলাভাষায় রচিত হইয়াছিল; পরে সেগুলিকে গীতগোবিন্দের মধ্যে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া স্থান দেওয়া হয়। অনুমানটি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে; কারণ গাথাসপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃত সংগ্রহ দেখিয়া মনে হয়, রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে প্রাকৃত ও অপভ্রংশে বহু বিচ্ছিন্ন কবিতা জনপ্রিয় হইয়াছিল।

শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে' জয়দেব-নামাঙ্কিত অপভ্রংশ-সংস্কৃত মিশ্রভাষায় দুইটি পদ আছে। গীতগোবিন্দের পদগুলি প্রাকৃতের অনুরূপ মাত্রাচ্ছন্দে রচিত, ভাষার মধ্যেও প্রবল অনুপ্রাসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। কাজেই গীতগোবিন্দের গানগুলি অপভ্রংশে রচিত হওয়া কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে; আর তা'ছাড়া, পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত গান পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের কবি রামকৃষ্ণের 'গোপালকেলিচন্দ্রিকা'য় অনুরূপ পদাবলী আছে; মিথিলার উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ' নাটকেও সংস্কৃত সংলাপের সহিত মৈথিলী গান আছে। এই দৃষ্টান্ত দিয়া পিশেলের মতাবলম্বী কেহ মন্তব্য করিতে পারেন যে, গীতগোবিন্দের আখ্যান ও নাট্যাংশ সংস্কৃতে রচিত হইলেও পদ অর্থাৎ গানগুলি প্রথমে অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল। পরে সমগ্র গ্রন্থটিকে সংস্কৃতায়িত করিবার অভিলাষে স্বয়ং জয়দেবই বোধহয় ঐ গানগুলিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। যুক্তির দিক দিয়া ইহা অসম্ভব না হইলেও, এ পর্যন্ত এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জয়দেবের গানগুলির অপভ্রংশে রচনার কল্পনাকে কিছুতেই সত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, জয়দেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশে রাধাকৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণ গোপীর আলম্বন বিভাব অবলম্বন করিয়া লৌকিক প্রেমের কবিতা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। অপভ্রংশের মাত্রাচ্ছন্দ, পংক্তির মধ্যেই যুগ্ম অন্ত্যানুপ্রাস, অনুপ্রাস ও যুক্তব্যঞ্জনের ঝঙ্কার বাঙলার সে যুগের নাটযাত্রাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিয়দংশ গীতিধর্মী, কিয়দংশ নাটযাত্রাশ্রেণীর; সুতরাং তাঁহার গানে অপভ্রংশের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের কিছু প্রগাঢ় ছায়া পড়িবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

গীতগোবিন্দের ছন্দের মধ্যে যে অপভ্রংশের প্রবল প্রভাব রহিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ঘটনার বর্ণনা এবং কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি সংস্কৃত জাতিচ্ছন্দে রচিত। কেবল পদ বা গানগুলি প্রাকৃতের অনুরূপ মাত্রাচ্ছন্দে রচিত। জয়দেব যখন বলেন,

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতুহলম্।

মধুর কোমল কান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্ ॥

অনু : যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার বাসনা থাকে, যদি তাঁহার বিলাসকলা জানিবার কৌতূহল হয় তবে জয়দেবরচিত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন অনূদিত)

তখন সংস্কৃতে ব্যবহৃত ছন্দেরই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। কিন্তু যখন—

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥

অনু : পাখী উড়িয়া যাইতেছে, গাছের পাতা নড়িতেছে, তুমি আসিতেছ মনে করিয়া অমনি তিনি শয্যা রচনা করিতেছেন, এবং সচকিত দৃষ্টিতে তোমার পথপানে চাহিতেছেন। (অনু : হরেকৃষ্ণ)

অথবা,

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী ॥

অনু : পীতবসন পরিহিত বনমালীর নীলকলেবর চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাঁহার মণিময় কুণ্ডল দুলিতেছে এবং সেই কুণ্ডলচ্ছটায় ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল কপোলযুগল শোভিত হইয়াছে। (অনু : হরেকৃষ্ণ)

এই উদ্ধৃতিগুলির সুর যে ভিন্ন প্রকার তাহা ছন্দোবিশেষজ্ঞ ছাড়াও সাধারণেরও কর্ণগোচর হইবে। যেন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা পদের সহিতই ইহার বেশি ঘনিষ্ঠতা। 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র এই শ্লোকটি—

রণদক্‌খ দক্‌খহণু জিনকুসুমধনু অংধঅ বংসবিনাস কর।
সো রক্‌খউ সংকরু অসুরভঅংকরু গিরিনাযরী-অদ্ধংগধরু ॥

অনু : যিনি রণদক্ষ, দক্ষহন্তা, কামবিজয়ী, অন্ধকবংশ-বিনাশকারী এবং যিনি অর্ধাঙ্গে গিরিসুতাকে ধারণ ক'রে আছেন, সেই অসুরকুল ভয়ঙ্কর শঙ্কর তোমাকে রক্ষা করুন। (ডক্টর মনোমোহন ঘোষ-প্রণীত 'প্রাকৃত সাহিত্য')

অথবা,

পুত্ত পবিত্ত বহুত্ত ধণা ভত্তি কুটুংবিণি সুদ্ধমণা।
হাক্ক তরাসই ভিচ্চগণা কো কর বব্বর সগ্‌গমণা ॥

অনু : পুত্র পবিত্র, অনেক ধন, ভর্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রী এবং কুটুম্বিনীরা শুদ্ধস্বভাবা ; হাঁকে ত্রস্ত হয় ভৃত্যগণ ; এমন সব রাখিয়া কোন্ বর্বর স্বর্গে যাইতে চায় ? (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' উদ্ধৃত অনুবাদ)

তখন বেশ স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, গীতগোবিন্দের গানগুলি, যাহাকে কবি 'গীতম্' আখ্যা দিয়াছেন, এবং যে সমস্ত গানের শীর্ষদেশে রাগতালের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই, তাহাদের ছন্দ ও ধ্বনিগুচ্ছ বহুলাংশে প্রাকৃত-অপভ্রংশের অনুকারী। জয়দেবের প্রধান গৌরব—এই অপভ্রংশের ধরণে রচিত গানগুলি। প্রাদেশিক ভাষায় যে প্রকার অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ও ধুবা-সমন্বিত (ধ্রুব পদ) গানের প্রচলন ছিল, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যাহার সুপ্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, জয়দেবের পদগুলির অবস্থানভূমি ঐ জাতীয় বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। এইজন্যই ল'সেন ও পিশেল সাহেব একটা বিচিত্র মত প্রচার করিয়াছিলেন যে, গীতগোবিন্দের গানগুলি সর্বাদৌ অপভ্রংশ বা প্রাচীন দেশীয় ভাষায় রচিত হইয়াছিল ; পরে স্বয়ং জয়দেব তাহাকে সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। পিশেলের এই অনুমানের সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। বরং এই অনুমান অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, জয়দেব যখন গীতগোবিন্দের গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিয়াই ছন্দ ও শব্দঝঙ্কারে কিছুটা প্রাকৃত-অপভ্রংশের ছায়া অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখন দেশে কাব্যকবিতার ক্ষেত্রে শৌরসেনী অপভ্রংশের যথেষ্ট প্রভাব, এবং ঐ সময়ে বাঙলাদেশে যে গীতিধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা নিশ্চয় অপভ্রংশ অথবা বাংলাভাষায় গীত হইত। এইজন্যই জয়দেবের গানে কিছু প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলার সুর অনুরণিত হয়। তাই বলিয়া জয়দেবের সমগ্র কাব্য অথবা উহার কোন এক অংশ প্রাকৃত-অপভ্রংশ-প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃতে অনূদিত হইয়া গীতগোবিন্দে স্থান পাইয়াছে, তাহা স্বীকার্য নহে।

গীতগোবিন্দের গোত্র ॥ গীতগোবিন্দের রচনাপ্রণালী বিচার করিয়া বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন। উইলিয়ম জোন্‌স ইহাকে বলিয়াছেন রাখালী নাটগীতি (Pastoral Drama), ল'সেনের মতে ইহাকে গীতিনাট্য (Lyrical Drama) বলা চলিতে পারে। ভন শ্রোয়েডার (Von Schroeder) ইহাকে উন্নত ধরণের যাত্রা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। পিশেল এবং লেভি সাহেব ইহাকে গান ও নাটকের মাঝামাঝি 'অপেরা'র (Opera) শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন। পিশেল ইহাকে অতিনাটকীয় (Melodrama) লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বিশেষজ্ঞগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তের

মধ্যে কিছু কিছু যুক্তি আছে। এই যে গীতগোবিন্দের গোত্র লইয়া মতভেদ, ইহার কারণ যে-যুগে জয়দেবের আবির্ভাব সেই যুগে সংস্কৃতের বাঁধাবাঁধি শিল্পরীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, অপরদিকে অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক সাহিত্যও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কাজেই গীতগোবিন্দে যদি সঙ্গীতের আধিক্য থাকে, প্রাচীন নাটগীতের প্রভাব থাকে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিশুদ্ধ বিধিবিধান যে ঐ যুগে কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক প্রকরণ বিচার করিলে তাহাই প্রমাণিত হয়। অবশ্য কবি যে অলঙ্কারশাস্ত্রের সমস্ত বিধান অস্বীকার করিয়া একটা অদ্ভুত ধরণের কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠিক নহে। কাব্যটির বহিরঙ্গ বিচার করিলে ইহাকে খণ্ডকাব্য বলিয়াই মনে হয়। খণ্ডকাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আখ্যান এবং গীতগোবিন্দে উক্তি-প্রত্যুক্তি ও গানের সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহাকে খণ্ডকাব্য বলিতে হইবে; কারণ ইহা প্রধানতঃ আখ্যানকেন্দ্রিক। আখ্যানটি প্রায়শঃই কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর সংলাপ এবং গানের সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে। তবে নাটকের মত কেবল চরিত্রগুলি কথা বলে নাই, স্বয়ং কবিও অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ করিয়া ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর সংযোগসূত্র রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত—এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যেরই প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং গীতগোবিন্দ বাহ্যতঃ আখ্যানকেন্দ্রিক খণ্ডকাব্য বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ ইহার নাট্য-লক্ষণটির দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। ইহাতে তৎকালীন নাট্যগীতির প্রচুর প্রভাব আছে। চর্যাগীতিতেও 'বুদ্ধ নাটক' ও নটের সাজসজ্জার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নেপালে প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত গোপীচন্দ্রের কাহিনীবিষয়ক নাটকের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কাজেই অনুমান হয়, এই সময়ে ইংলণ্ডের 'Miracle' ও 'Morality Play'-র অনুরূপ একপ্রকার যাত্রাভিনয় লোকজীবনে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। জয়দেব জ্ঞাতসারেই হোক, বা অজ্ঞাতসারেই হোক এই জাতীয় রচনাবৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র কাব্যটিকে গীতিনাট্য, উন্নত ধরণের যাত্রা, রাখালী নাটগীতি বা অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত রচনা বলা যায় না। আখ্যান, নাটকীয়তা ও গান থাকিলেও আধুনিক পাঠকের নিকট ইহা গীতিরসার্দ্র আখ্যানকাব্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

গীতগোবিন্দের স্বরূপ। গীতগোবিন্দের 'আবেদন'প্রসঙ্গে কিছু মতভেদ হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহা বিশুদ্ধ মর্ত্যপ্রেমের কাব্য;—রাধাকৃষ্ণের চরিত্র কাহিনীর অবলম্বন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার কেহ-বা মধ্যযুগীয় সন্ত-সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ ভক্তির কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অভিলাষী। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে যে উত্তপ্ত দেহকামনামুখর কবিতার বিশেষ জনপ্রিয়তা হইয়াছিল, জয়দেবের মধ্যে তাহারই স্পর্শ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিরা সেই একই রসের রসিক ছিলেন। গোবর্ধন আচার্য ও ধোয়ীর রচনার মধ্যে আদিরসের উল্লাসই সর্বাধিক। সমকালীন লিপিলেখনে হরপার্বতী ও বিষ্ণুলক্ষ্মীর স্তবস্তুতিগুলিও মিথুন-রসেই অভিসিঞ্চিত। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সংগৃহীত শ্লোকের মধ্যে আদিরসাত্মক পংক্তিরই সমারোহ। লক্ষ্মণ সেনের সভাতলে আদিরসের কিছু বাহুল্য ছিল; জয়দেবের গীতগোবিন্দেও সেই মার্জিত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের প্রাধান্যই সূচিত হয়। রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক লীলাসম্পৃক্ত অনেক কবিতা শুধু মর্ত্যরসের উল্লাস বহন করিতেছে—সমকালীন লিপিলেখন এবং প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ হইতে তাহাই প্রমাণিত হয়; 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী 'অসতী ব্রজ্যা' অর্থাৎ অসতী রমণীর প্রেমের পর্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং জয়দেব হয়তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনুরূপ বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবের দ্বারা বিমোহিত হইয়াই রাধাকৃষ্ণের 'রহঃ-কেলয়ঃ' বর্ণনা করেন নাই।

কবি প্রধানতঃ 'বিলাসকলাকুতূহলের' বশবর্তী হইয়া এই 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করেন। অবশ্য হরিস্মরণে তাঁহার মন সরস হইয়াছিল। হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, প্রধানতঃ ইহাই গীতগোবিন্দ পাঠের ফলশ্রুতি। কবির প্রকাশ্য ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে প্রথম সর্গের "প্রলয়পয়োধিজলে" গানে, বিষ্ণুর দশ অবতার বর্ণনায়। দ্বিতীয় সংখ্যক গানেও "মুনিজনমানসহংস" এবং "যদুকুলনলিনদিনেশ" ভগবান বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া কবি বলিয়াছেন,

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু॥

অনু: আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইহা জানিয়া আমাদের কুশল বিধান কর।

পঞ্চম সর্গের ১৬শ শ্লোকে কবি আপনাকে 'হরিসেবক' বলিয়াছেন, ৯ম সর্গের সমাপ্তি-শ্লোকেও কবি 'শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দ' বন্দনা করিয়াছেন। কিন্তু

এইরূপ দুই-চারিটি ভক্তিরসার্দ্র শব্দ বা পংক্তি বাদ দিলে দেখা যাইবে যে, জয়দেব কৃষ্ণকে দেহকামনার্জজর আদিরসের দেহলীতলে স্থাপন করিয়াছেন। প্রথম সর্গের "সামোদ দামোদর" হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ সর্গের "সুপ্রীত পীতাম্বর" পর্যন্ত আদিরসের উত্তপ্ত ফেনোচ্ছ্বাস বহিয়া গিয়াছে।)কাব্যসমাপ্তির মুখে পাঠকচিত্তে যাহা সঞ্চারিত হয়, তাহা মর্ত্যপ্রেমের বিষামৃতমধুর উপলব্ধি ভিন্ন অন্য কোন অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা বহন করে না। দ্বাদশ সর্গের ২৭শ শ্লোকে কবি সুধী শ্রোতাদের গান্ধর্ব কলাকৌশল, শৃঙ্গার, বিবেকতত্ত্ব এবং বিষ্ণুর কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও শেষ পর্যন্ত "শৃঙ্গার সারস্বতমিহ জয়দেবস্য" প্রাধান্য পাইয়াছে। এডুইন আরনল্ড্, উইলিয়ম জোনস্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই কাব্যের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও দ্বাদশ সর্গের সম্মুখে আসিয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। আরনল্ড্ *The Indian Song of Songs* নামক 'গীতগোবিন্দে'র ইংরাজী অনুবাদে ১২শ সর্গটি একেবারে বাদ দিয়াছিলেন। জোনস্ গীতগোবিন্দের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে "reciprocal attraction between the divine of goodness and the human soul" বলিয়া গ্রহণ করিয়াও ১২শ সর্গের মিলনরসোজ্জ্বল শৃঙ্গার চেষ্টাকে পুরাপুরি স্বীকার করিতে পারেন নাই ; য়ুরোপীয় রুচির নিকট কিছু আপত্তিজনক মনে হইতে পারে অনুমান করিয়া তিনি ঐ অংশগুলিকে অনুবাদ হইতে বাদ দিয়াছিলেন। এডুইন আরনল্ড্ ও জোনস্ গীতগোবিন্দের অধ্যাত্মতত্ত্বে পুরাপুরি বিশ্বাসী হইয়াও ১২শ সর্গকে য়ুরোপীয় দৃষ্টি হইতে আবৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা মূল প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের মতে, বোধহয় ১২শ সর্গটির বিষয়বস্তু ভক্তিরসের অনুকূল নহে। অথচ ১২শ সর্গকে মূলকাব্য হইতে কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে ১২শ সর্গের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাধাকৃষ্ণের মিলনরভসে কাব্য সমাপ্ত হইবে, সংস্কৃত আদিরসাত্মক আখ্যানকাব্যে তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। জয়দেব সেই প্রথাকেই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

এখন দেখা যাক, গীতগোবিন্দে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে জোনস্-কথিত "reciprocal attraction between the divine of goodness and the human soul" বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা।

জয়দেবের কবিচিত্তমথিত 'উজ্জ্বল'রসাত্মক ভক্তিভাবের অনুপ্রেরণা গীত-গোবিন্দের রচনার পশ্চাতে কার্যকরী হইয়াছিল কিনা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু রচনার অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষেই এই কাব্যখানি যে ভক্তিশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভুদের আবির্ভাবের পূর্বেই গীতগোবিন্দের ভারতব্যাপী খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দের অন্ততঃ ৪০ খানি টীকা এবং ১৫ খানি অনুকরণকাব্য (ভানুদত্তের 'গীতগৌরীশ', প্রভাকরের 'গীতরাঘব', গজপতিরাজ পুরুষোত্তমদেবের 'অভিনব গীতগোবিন্দ', নন্দদাসের 'পঞ্চাধ্যায়ী', জয়নারায়ণ ঘোষালের 'গীতশঙ্করী' প্রভৃতি) রচিত হইয়াছিল। রাণা কুম্ভের নামে গীতগোবিন্দের যে টীকাটি ('রসিকপ্রিয়া') সুপ্রচলিত, তাহা প্রাচীনতম না হইলেও অন্যতম সুপ্রাচীন টীকা। রাণাকুম্ভ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি 'রসিকপ্রিয়া' টীকাতে গীতগোবিন্দের ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। জয়দেবের আবির্ভাবের দুই শত বৎসরের মধ্যেই সুদূর রাজ-পুতানায় এই কাব্য ভক্তিগ্রন্থরূপে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল। পুরীর জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের একটি শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ১৫শ শতাব্দীতে কলিঙ্গসম্রাট প্রতাপরুদ্র জগন্নাথমন্দিরে গীতগোবিন্দ ব্যতীত অন্য যে কোন গান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। শিখসম্প্রদায়ের 'গ্রন্থসাহেবে' জয়দেবের নামাঙ্কিত যে দুইটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা এই জয়দেবের কিনা জানা যায় না; কিন্তু জয়দেব ভক্তকবিরূপে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন যে, ১৬শ শতাব্দীর মধ্যেই শিখগুরু অর্জুন-সঙ্কলিত 'গ্রন্থসাহেবে' তাঁহার নামাঙ্কিত দুইটি পদ স্থান পাইয়াছিল। সুতরাং জয়দেবের ভক্তচিত্তটি যে কেবল গৌড়ীয় ভক্তদের সৃষ্টি নহে, পরন্তু তাহার পূর্ব হইতেই বাঙলার বাহিরে গীতগোবিন্দ ভক্তিধর্মের গ্রন্থরূপে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই।

কেহ হয়তো বলিবেন, জয়দেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যদের আবির্ভাবের পূর্বে ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেও তাঁহার যে রূপটি পরবর্তী কালে সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে তাহা বাঙলার বৈষ্ণবদের সৃষ্টি। গীতগোবিন্দে বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের আদিরসাত্মক প্রেমকেই তাঁহারা রাধাঠাকুরাণীর 'মহাভাবে' রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু লীলাশুকের (বিল্বমঙ্গল) কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ করিলে মনে হইবে, আদিরসাত্মক উচ্ছ্বাসও সত্যকারের ভক্তির পাখায় ভর করিয়া অপাপবিদ্ধ

দিব্যলোকে উন্নীত হইতে পারে। লীলাশুক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও এটুকু বুঝা গিয়াছে যে, তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ জয়দেবের সমকালে বা কিছু পূর্বে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' রচনা করিয়াছিলেন) কারণ ১২০৫ সালে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই কৃষ্ণকর্ণামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির মধ্যে আদিরস ও ভক্তিরসের সুষ্ঠু সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়:

১। কান্তাকুচ গ্রহণ বিগ্রহলব্ধ লক্ষ্মী খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিত মঞ্জুলশ্রীঃ।
গণ্ডস্থলী মুকুরমণ্ডল খেলমান ঘর্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ॥ ৯১

অনু: শ্রীরাধিকার কুচ গ্রহণ সময়ে যে কলহ হয়, তাহাতে কৃষ্ণ অঙ্গের যে শোভা, তদ্দ্বারা অঙ্গরাগ বিখণ্ডিত হইয়া নবরঞ্জিত সুন্দর একটি শোভার উদয় হয়। কৃষ্ণের সে সময় প্রেমকলহে গণ্ডস্থলরূপ মুকুরমণ্ডলে যে সকল ঘর্মাঙ্কুর বাহির হয়, সেইগুলিকে কৃষ্ণ যেন অপূর্ব হারকাপে গুম্ফিত করিয়া পরিয়াছেন। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অনুবাদ. শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম—৪৬১ গৌরাব্দ)

২। তরুণারুণ করুণাময় বিপুলায়ত নয়নং
কমলাকুচকলসীভর বিপুলীকৃত পুলকং
মুরলীরব তরলীকৃত মুনিমানসনলিনং
মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতম্॥ ১৮

অনু: যাঁহার তরুণ অরুণসদৃশ করুণাময় বিপুল বিস্তৃত নয়ন, কমলার কুচভরে যাঁহার অত্যন্ত পুলক উৎপাদিত হইয়াছে, মুরলীরব দ্বারা মুনিজনের মানস পদ্মকে যিনি তরল শিথিল করিয়াছেন, সেই মধুর অধরস্থিত অমৃত আমার মনে খেলা করুক। (অনুবাদ—ঐ)

৩। প্রেমদশ্চ মে কামদশ্চ মে বেদনশ্চ মে বৈভবশ্চ মে
জীবনশ্চ মে জীবিতঞ্চ মে দৈবতঞ্চ মে দেবনাপরম্॥ ১০৪

অনু: হে দেব, তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জ্ঞাতা), বৈভব জীবন জীবিত (প্রাণধারণের উপায়) এবং দৈবত, আর কেহ নহে।
—(১২৯৭ সনে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

জয়দেবের "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্" —এই পংক্তির সহিত উল্লিখিত তৃতীয় শ্লোকটির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পূর্বেও যে আদিরসাত্মক ভক্তিবাদের বিশেষ প্রাধান্য দেখা গিয়াছিল, তাহা দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভক্তিবাদ আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বিদ্যাপতির অনুরূপ পঞ্চোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' ধৃত জয়দেবের অন্যান্য শ্লোক বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে তিনি শুধু রাধাকৃষ্ণকেই প্রণাম নিবেদন করেন নাই। পঞ্চোপাসক (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য) সাধারণ স্মার্ত হিন্দুর মত অন্যান্য দেবদেবীকেও তিনি যথোচিত ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ অবশ্য চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের ব্যাপার ; সেই হিসাবে জয়দেবকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় 'গোস্বামী' আখ্যা দিয়া স্বদলভুক্ত করিতে চাহিলেও, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহার মনের প্রবণতা যে রাধাকৃষ্ণের প্রতি উৎসারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' তাঁহার যে সমস্ত শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার কোনটির সাহিত্যিক উৎকর্ষ গীত-গোবিন্দের সমপর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে কি? গীতগোবিন্দের মিলনচিত্রের মধ্যে কিছু কিছু উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষার মৃত্তিকাস্পর্শ রহিয়াছে বটে ; য়ুরোপীয় রুচির দ্বারা বিচার করিলে উহাকে ইন্দ্রিয়-পারবশ্যের চূড়ান্ত বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু দেবতাকে আদিরসের মধ্য দিয়া উপলব্ধির প্রয়াস শুধু ভারতেই নহে, *Old Testament* এর 'The Song of Solomon-এর চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইয়াছে, ফরিদুদ্দিন আত্তর ও জলালুদ্দিন রুমির ভক্তিভাবোজ্জ্বল কবিতা এবং জামির য়ুসুফ-জেলেখার কাহিনীতেও আদিরসের মারফতে অধ্যাত্মরস ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় 'Bride of Christ'-এর কথা স্মরণ হইবে। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের মধ্যে যে গোপীপ্রেম বর্ণিত হইয়াছে, দেহ-আসক্তির নিবিড় আশ্লেষ রহিয়াছে—আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে তাহাকে তো ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।* কিন্তু সেই কামরসার্দ্র পদগুলি সাধকচিত্তে যেমন একটা নূতনতর ভাবরসের আস্বাদ দান করে, ঠিক তেমনি জয়দেবও ভক্তচিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে ঊর্ধ্বতর সত্তায় লইয়া যাইতে পারেন। চৈতন্যপ্রভু জগন্নাথদেবের রথের অগ্রভাগে এই গানটি গাহিতে গাহিতে ভাবোন্মত্ত চিত্তে গমন করিতেন—

* 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (২য় খণ্ড) এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা স্তে-
চোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥

অনু: যে আমার কৌমারহরণকারী (অর্থাৎ আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল) সেই (আজ) আমার বর; আজও সেই চৈত্রনিশি, সেই বিকশিত মালতীর সুরভি, সেই কদম্ববনের পরিণত বা বর্ধিত বায়ু, আমিও সেই আছি, তথাপি সেই রেবানদী-তটের বেতসীতরুতলে যে সব সুরতব্যাপারের লীলাবিধি, তাহাতেই আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। ('শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ', ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত অনূদিত)

এই শ্লোকটির বাহ্য অর্থ তো পরিপূর্ণ পার্থিব প্রেমের উত্তাপভরা; এমন কি সমাজনেতৃগণ ইহাতে প্রাগ্‌বৈবাহিক অসামাজিক প্রেমের জয়ধ্বনি শুনিয়া হয়তো কিছু বিমর্ষও হইতে পারেন। শিলাভট্টারিকা নাম্নী কোন এক মহিলাকবি নাকি এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে নিশ্চয় কোনপ্রকার ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয় নাই; কারণ ঐ যুগের মহিলাকবির ভণিতায় রচিত উদ্ভট শ্লোকে ভক্তিরস অপেক্ষা পার্থিব জীবনেরই অধিকতর প্রাধান্য দেখা যায়। তথাপি ইহা চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তজনের নিকট ভক্তিরসের তীব্র অনুভূতি বলিয়াই শ্রদ্ধা পাইয়াছে। সেইরূপ জয়দেবের কাব্য প্রথমে হয়তো ধোয়ীর 'পবনদূতে'র মতো পার্থিব রসের কাব্য ছিল; পরে মধ্যযুগীয় সন্তসম্প্রদায়, বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃপায় ইহার পার্থিব রস মুছিয়া গিয়া ভক্তিভাবটি ভক্তজনহৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

এই যুক্তিটির সারবত্তা কিয়দংশে স্বীকার্য। কিন্তু জয়দেব শুধু পার্থিব রসের বশে এই কাব্য রচনা করেন নাই, তিনি পার্থিব রসের দ্বারা পরিচালিত হইলে রাধাকৃষ্ণকে আলম্বনবিভাব হিসাবে গ্রহণ করিতেন না। শুধু মর্ত্য-জীবনের কাব্য লিখিবার ইচ্ছা থাকিলে তিনি 'পবনদূতে'র মত কোন পার্থিব কাহিনী গ্রহণ করিতে পারিতেন। গীতগোবিন্দে আদিরসের উদ্দামতা থাকিলেও কবি যে হরিভক্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রায় প্রত্যেক সর্গের সমাপ্তির মুখে তিনি ভক্তির অভ্রান্ত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন; সর্গটি শেষ হইবার পূর্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জয়োচ্চারণ করিয়াছেন, আরও বহুস্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঐকান্তিকী ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। অবশ্য তাহাকে 'বৈধী-ভক্তি' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—'রাগানুগা ভক্তি'র মহাভাব গীতগোবিন্দের

মধ্যে না পাইবার সম্ভাবনাই অধিক। হিন্দুজাতির বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় অন্তর্নিহিত ভক্তির জন্যই ইহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

(জয়দেব লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' জয়দেবের সময়ে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না; কারণ শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে লীলাশুক যেমন সখীভাবে রাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন, জয়দেবের মধ্যে ঠিক সেই জাতীয় অনুভূতি পাওয়া যায় না।) লীলাশুক আপনাকে কৃষ্ণলীলার সহায়তায় নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু গীতগোবিন্দের কবির মধ্যে ঠিক সেই জাতীয় পরিকরবৃত্তি বা সখীসাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া এই কাব্যকে পুরাপুরি পার্থিব রস এবং মর্ত্যপ্রেমের কাব্য বলিলে পরবর্তী কালে গীতগোবিন্দের ভারতব্যাপী প্রভাবের কোন হেতু নির্দেশ করা যাইবে না। বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের চেষ্টায় গীতগোবিন্দের উপর অযথা ভক্তিরস আরোপিত হয় নাই। উহার মধ্যে সেই ভক্তিরসের সম্ভাবনা না থাকিলে রচনার ঈষৎ পরবর্তী কালে ইহা সমগ্র ভারতবর্ষেই ভক্তিরসের প্রধান কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত না। ল'সেন, জোনস্, আরনল্ড্, এমন কি গ্যয়ঠে পর্যন্ত যে এই কাব্যের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা শুধু কাব্যপরিকল্পনা বা রচনারীতির জন্য নহে। কাব্যপরিকল্পনায় জয়দেবের বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই; কর্ণসুখকর মঞ্জুল শ্লোকাবলী শাব্দিক কবির ভাষাচাতুর্যকেই ফুটাইয়া তোলে; ইহার অতিরিক্ত কোন গৌরব তাঁহার প্রাপ্য নহে। আদিরসের উল্লোলের মধ্যে ভক্তিরস নিহিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ ১২শ শতকের কিছু পরবর্তী কাল হইতেই সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভক্তিরসের কাব্য বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে R. W. Frazer তাঁহার *Literary History of India*-য় (পৃ, ৩৪৩) যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—"The poem of Jayadave marks the gradual development in the twelfth century of the doctrine of Faith (bhakti), of emotion, and personal love towards a deity in human form."

জয়দেবের অন্যান্য রচনা ॥ 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' জয়দেবের যে ৩১টি পদ

সঙ্কলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি পদ 'গীতগোবিন্দ' বহির্ভূত ভিন্ন ধরণের রচনা। যাঁহারা 'গীতগোবিন্দে'র ভক্তিভাবের মূল্য স্বীকার না করিয়া বরং ইহার পার্থিব চেতনার অধিকতর পক্ষপাতী, তাঁহারা জয়দেবের এই পদগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন। এই পদগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ, বীররস, লক্ষ্মণ সেনের স্তুতি—কিছু-বা নিতান্তই ব্যঞ্জনাহীন স্থূল দেহকেন্দ্রিক আদিরসের বর্ণনা। তন্মধ্যে যুদ্ধ, দিগ্বিজয়, রাজস্তুতি, যুদ্ধস্থলের বর্ণনা, পৌরুষ, বীর্য, তেজ প্রভৃতি পদগুলির ওজস্বল ভাবপ্রকাশরীতি কিছু প্রশংসা দাবী করিতে পারে। যেমন—

ভীষ্মঃ ক্লীবতাং দধার সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুর্
মিথ্যা ধর্মসুতেন জল্পিতমভূদ্ দুর্যোধনো দুর্মদঃ।
ছিদ্রেষ্বেব ধনঞ্জয়স্য বিজয়ঃ কর্ণপ্রমাদী ততঃ
শ্রীমন্নস্তি ন ভারতেঽপি ভবতো যঃ পৌরুষৈর্বর্ধতে॥

অনু: ভীষ্ম ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (ক্লীবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই), যুদ্ধে দ্রোণ ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্মপুত্র মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, দুর্যোধন অত্যন্ত মদগর্বিত ছিলেন, এবং কর্ণ ছিলেন অনবধান দোষযুক্ত। অতএব ধনঞ্জয়ের কুরুক্ষেত্রসমর-জয় ছিদ্রপথে ঘটিয়াছিল (নিজ পৌরুষের বলে নহে); সুতরাং মহারাজ, এমন কি মহাভারত যুদ্ধেও কেহই এরূপ ছিলেন না, যিনি পৌরুষে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দুইটি পদে মহাদেব ও কল্কীর বর্ণনা আছে। লক্ষ্মণ সেনের স্তুতিবাচক দুইটি পদ নিতান্ত অসার্থক রচনা নহে। কিন্তু এগুলি যে 'গীতগোবিন্দে'র পার্শ্বে স্থান পাইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, জয়দেব শুধু শৃঙ্গাররসাত্মক 'গীতগোবিন্দ'ই রচনা করেন নাই, আদিরস-ভক্তিরস বহির্ভূত বস্তুপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ক বিচিত্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য 'গীতগোবিন্দ' ব্যতিরিক্ত তিনি অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জয়দেব হয়তো লক্ষ্মণ সেনের দিগ্বিজয় বিষয়ে কোন একটি কাব্য লিখিয়া থাকিবেন; তাহা হইতেই 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র বীররসাত্মক শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে। ইহা অনুমান মাত্র; সুতরাং এ বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। কালিদাসের নামে যেমন 'পুষ্পবাণবিলাসম্' 'নলোদয়' প্রচলিত আছে, 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উল্লিখিত জয়দেবের পদগুলির অধিকাংশই ঐ জাতীয়। অবশ্য ঐ পদগুলি জয়দেবেরই রচনা। গীতগোবিন্দের কোন কোন স্থলে

ঐ বীররসাত্মক কবিতাগুলির অনুরূপ কিছু কিছু ওজস্বী বর্ণনা আছে। ১০ম সর্গের ১৭শ শ্লোক এবং ১১শ সর্গের ৩৪শ শ্লোকে কুবলয় হস্তী হননের বর্ণনায় জয়দেব প্রায় 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কবিতার মতই পরুষব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই যুগের সংস্কৃত কবিতার পরিণতি বিচার করিলে জয়দেবের এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনার অর্থ উপলব্ধি করা যাইবে। খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর দিকে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জন্ম হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগ হ্রাস পাইল। ইহার কিছু পূর্ব হইতে মর্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রাকৃত-অপভ্রংশে আদিরসের বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনার রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। সুতরাং এই যুগে পূর্ণাঙ্গ কাব্য অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনাই অধিকতর আদরণীয় হইয়াছিল। উমাপতি ও শরণের অনেক বিচ্ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেলেও তাঁহাদের কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায় নাই। জয়দেবও হয়তো তৎকালীন রীতি অনুযায়ী মর্ত্যজীবন-বিষয়ক বিচিত্র শ্রেণীর শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন যাহার কিছু কিছু 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই শ্লোকগুলির দ্বারাই 'গীতগোবিন্দ'কারের কবিত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং এই কবিতাগুলি অনেকটা গতানুগতিকতার পথ অনুসরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল, কাব্যোৎকর্ষও শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। দুষ্মন্তের বিদূষকের উপদেশের মতো হয়তো জয়দেবও পিণ্ডখর্জুরের মিষ্টরসে কিছু ক্লান্ত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ-বিষয়ক তিন্তিড়ীরসের দ্বারা মানসিক রসভোগের স্বাদ বদলাইতে চাহিয়াছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'ছন্দঃসূত্রে'র রচয়িতা জয়দেব বাঙলার জয়দেবের অনেক পূর্ববর্তী, 'প্রসন্নরাঘব' নামক নাটকের জয়দেবও ভিন্নতর ব্যক্তি। ১৬শ শতাব্দীতে শিখগুরু অর্জুন 'গ্রন্থসাহেবে' দেশীয় ভাষায় রচিত ভক্তির পদ (কিছু কিছু বিকৃত সংস্কৃতসহ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে জয়দেবের কবিখ্যাতি সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তাই ভক্তির গান সংগ্রহ করিবার সময় শিখগুরু অর্জুন বাঙলার জয়দেবের কথা ভুলিতে পারেন নাই। 'জৈদেব জীউ'-এর দুইটি পদ 'গ্রন্থসাহেবে' গৃহীত হইয়াছে। ইহার যে গানটি 'রাগ গুজরী' রাগে গেয়, তাহাতে রাম ও হরির প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পদটি 'মারু রাগ' অবলম্বনে রচিত। তাহা পুরাপুরি যোগসাধনার পদ। বাঙলার সহজিয়া বৈষ্ণবগণ যেমন জয়দেবকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন,

ঠিক তেমনি মধ্যযুগের যোগিসম্প্রদায়ও জয়দেবের নামে যোগবিষয়ক অনেক পদ চালাইয়াছেন। এই পদগুলিতে কিছু কিছু ভাঙা সংস্কৃত থাকিলেও, ইহাতে অপভ্রংশের—বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার ভাষাভঙ্গিমার কিছু কিছু প্রভাব আছে। এই দুইটি পদ গীতিগোবিন্দকার জয়দেবের রচনা কিনা তদ্বিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে। হোক বা না হোক, জয়দেবের অপরিসীম খ্যাতির ফলে তাঁহার নামে অপরের রচিত আরও অনেক পদ চলিয়া গিয়াছে।

বাঙলাদেশের বাহিরে জয়দেবের যে কতদূর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত বারো তেরোটি কাব্যের হিসাব লইলে। প্রধানতঃ বাঙলাদেশের প্রতিবেশি-প্রদেশ উড়িষ্যা ও মিথিলাতে উহার স্পষ্ট প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়াছেন যে, গীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ টীকাকার শঙ্কর মিশ্র মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। ঐ মিথিলার আর-এক কবি ভানুদত্ত জয়দেবের অনুকরণে 'গীতগৌরীশ' নামক হরগৌরীলীলা রচনা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটকেও জয়দেবের অনুরূপ কয়েকটি পদ বা গান আছে। গবেষকগণ আরও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রবোধানন্দের 'সঙ্গীতমাধব', কবিকর্ণপূরের 'আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূ', জীবগোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' প্রভৃতিতে জয়দেবের সাক্ষাৎ অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। বাঙলার কবি পদলালিত্যে ও উজ্জ্বলরসাত্মক ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতরঙ্গে বাঙলার বাহিরেও যে প্রেমভক্তি প্লাবন আনিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত তথ্যগুলির ইঙ্গিত হইতেই বুঝা যাইতেছে।*

বাঙালী ও জয়দেব। বাঙালীর সহিত গীতগোবিন্দের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া আলোচ্য প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাক। বাঙালীর সহিত গীতগোবিন্দের দীর্ঘকালের সম্পর্ক ; উত্তরচৈতন্য যুগের কবিগোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিমার জন্য জয়দেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঙালীর মধ্যে কালজয়ী হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত কবি জয়দেবের কবিখ্যাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার উপর ভক্তের গৌরব আরোপিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিবারাত্র

* ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের 'নানা নিবন্ধে'র অন্তর্গত "জয়দেব ও গীতগোবিন্দ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আস্বাদন করিতেন, সহজিয়া মতের বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে 'নবরসিকে'র অন্যতম এবং আদিগুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব' উপাধি ধারণ করিয়া শ্লাঘা অনুভব করিতেন। বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যে ইহার অপূর্ব ছন্দস্পন্দ ও শব্দঝঙ্কারের অখণ্ড প্রভাব রহিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নানাস্থানে সাক্ষাৎভাবে জয়দেবের অনুসরণ আছে। আধুনিককালেও মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জয়দেবকে বাঙলা-দেশ ও সাহিত্যে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়াছেন। কাজেই জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জয়দেবের পদগুলির ছন্দ পরবর্তী কালের বাংলা পদসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; পয়ার ও ত্রিপদীর আদিম রূপ গীতগোবিন্দের কোন কোন পদে আকস্মিকভাবে ধরা পড়িয়াছে:

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।

কিংবা হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥

পংক্তিগুলি পাঠ করিলেই পয়ার ছন্দের সুর কানে ধরা পড়ে। পাদাকুলক, ত্রিপদী, চৌপাই—যেখান হইতেই পয়ারের জন্ম হোক না কেন, গীতগোবিন্দের মধ্যে তাহার একটা আদিম রূপ প্রত্যক্ষ করা যাইবে। এই যুগে ষোড়শ মাত্রাব পাদাকুলক ছন্দ যে ধীরে ধীরে পয়ারে রূপান্তরিত হইতেছিল তাহার প্রথম স্তর হইল গীতগোবিন্দের এই পংক্তিগুলি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যের প্রিয় ছন্দ ত্রিপদীর সুরও গীতগোবিন্দের কোথাও কোথাও অস্পষ্টাকারে মিলিতেছে।

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥

এই দুই পংক্তিকে সহজেই ত্রিপদীর আকারে পড়া যাইতে পারে—

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্॥

এমন কি আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্তছন্দে রচিত

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে,—

এবং সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

এই পংক্তিগুলির সহিত

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম্।

পংক্তির ধ্বনিস্পন্দন প্রায় একই রূপ।

বৈষ্ণব ভক্তগণ জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন, অবৈষ্ণব সমাজেও তাহা বহুলাংশে স্বীকৃত হইয়াছে; বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে জয়দেবকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অলৌকিক উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের বিস্তারিত পরিচয় গ্রহণ একান্ত কর্তব্য। বাঙালীর যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ, তাহার উৎস এই গীতগোবিন্দে নিহিত। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ধ্বনিঝঙ্কার, অলঙ্কার-কৌশল প্রভৃতিতে জয়দেবের পুনঃপুনঃ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে আদিরসিক বলিয়া ধরিলেও, আমরা তাঁহাকে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঊষা-আবির্ভাবের প্রাক্-মুহূর্তে কবি জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার রাধামাধবের সঙ্গে পরবর্তী কালের—বিশেষতঃ রূপগোস্বামীর রসশাস্ত্র এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আদর্শে গৌড়ীয় ভক্তিশতদলে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-রাধার মহাভাবস্বরূপের প্রকৃতিগত কিছু প্রভেদ আছে। বরং বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসই সাক্ষাৎভাবে জয়দেবের আদর্শ বহন করিয়াছেন। পদাবলীর চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায় শেখরের পদে রাধাকৃষ্ণ-লীলায় যাহার চূড়ান্ত পরিণতি, জয়দেবের মধ্যে তাহার সার্থক সূচনা। আধুনিককালে গৌড়ীয় ভক্তজন এই কাব্যকে ভক্তিশাস্ত্রের উপনিষদ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন; যাঁহারা বিশিষ্ট ধর্মীয় রসের রসিক নহেন, তাঁহারা আক্ষরিক অর্থ ধরিয়াও উহার দিব্য রসলোকে উপনীত হইয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুলভবন মানস-পরিক্রমা করিয়াছেন—

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে !

রবীন্দ্রনাথও বর্ষামেদুর শ্যাম বঙ্গদেশে বসিয়া কবি জয়দেবকে স্মরণ করিয়াছেন—

যেথা জয়দেব কবি কোন্ বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর ॥

তাই জয়দেবকে বাদ দিয়া কি প্রাচীন, আর কি আধুনিক—বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের আলোচনাই পূর্ণ হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য

প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্যের সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যাইবে কয়েকখানি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ গ্রন্থ আলোচনা কবিলে। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থগুলি বাঙলাদেশেই রচিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে, বিশেষতঃ 'গাথা সপ্তশতী' ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' বাঙলাদেশে সঙ্কলিত হয় নাই। তবে এই দুইখানি প্রাকৃত শ্লোকসংগ্রহে বাঙালী জীবনের অনুরূপ কিছু কিছু চিত্র আছে বলিয়া বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ইহাদেব উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পালি, বৌদ্ধ-সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, কাব্যের প্রাকৃত, অর্ধ-মাগধী—সমস্তই প্রাকৃতের অন্তর্ভুক্ত। খ্রীঃ ২য় শতকে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' কয়েকটি "ধ্রুবা" গানের উল্লেখ আছে। এগুলিকে প্রাচীনতম প্রাকৃত রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" নাটকের কোন কোন পুঁথিতে অপভ্রংশে রচিত গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকেব ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপ হিসাবেই প্রাকৃত ভাষা প্রথম শিষ্টসমাজে অনুপ্রবেশ করে। নাটকে স্বভাবের অনুকরণ হিসাবে বাস্তব চিত্রণের জন্য সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রী ও নাট্যকারগণ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাকে নাটকে স্থান দিয়াছিলেন। অবশ্য এই সংলাপ যে সাহিত্যিক সংলাপ, জনসাধারণেব মুখের ভাষা নহে—তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর পুরাপুরি প্রাকৃত নাটক পাওয়া যাইতেছে ১০ম শতকে, রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রধানতঃ শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত। তাহার পরেও কিছু কিছু প্রাকৃত নাটকের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও 'কর্পূরমঞ্জরী'র মতো কোনখানি খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে ৭ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত প্রবর সেনের 'সেতুবন্ধ' বা 'রাবণবহো' (৭ম শতকের কিছু পূর্ববর্তী), শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত বাক্‌পতিরাজের

'গৌড়বহো' (৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ), জৈন তীর্থঙ্করদের জীবনী অবলম্বনে রচিত প্রাকৃত মহাকাব্য ('পউমচরিঅ', 'মহাবীরচরিঅ'), অপভ্রংশে রচিত 'নেমিণাহচরিউ' প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। প্রাকৃতে রচিত কবি সোমপ্রভের 'কুমারপাল চরিত' কাব্যে (১১৮৪ খৃঃ) কিছু কিছু সংস্কৃতের মিশ্রণ আছে। কিন্তু প্রাকৃতে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকীর্ণ কবিতাগুলি একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম গীতিকবিতার স্বাদ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতেছে। এই শ্রেণীর কবিতার দুইখানি সংগ্রহ মহাকবি হাল-রচিত 'গাথা সত্তসই' এবং প্রাকৃত ছন্দের দৃষ্টান্তগ্রন্থ পিঙ্গল-রচিত (?) 'প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলে বাঙালীজীবনের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করা যাইবে।

॥ ১ ॥

গাথাসপ্তশতী ও প্রাকৃতপৈঙ্গল

এই দুইখানি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রাকৃত কবিতাসংগ্রহ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। (তন্মধ্যে মহাকবি হাল-রচিত 'গাথাসপ্তশতী' অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকজীবনের উজ্জ্বল চিত্র হিসাবে বিশেষ প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে।) দক্ষিণ-ভারতের সাতবাহন বংশের হাল নামক কোন-এক রাজা এই কবিতাগুলি মারাঠী প্রাকৃতে রচনা করেন। এই সাতবাহন রাজবংশ খ্রীঃ পূঃ ২য় বা ১ম হইতে খ্রীঃ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। হাল এই বংশের রাজা হইলে 'গাথাসপ্তশতী'র রচনাকাল আমাদের আলোচনার বাহিরে পড়িয়া যায়। আবার কাহারও মতে ৫ম শতকের শেষে শালবাহন নামক কোন-এক রাজা নাকি এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। ইনিই হাল। সন-তারিখ লইয়া গাথাসপ্তশতীর প্রামাণিকতা সম্পর্কে কিছু মতান্তর থাকিলেও, এই কাব্যটি একযুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনচিত্র বহন করিতেছে বলিয়াই ইহার বিশেষ মূল্য। দেবভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের মধ্যে অনেক সময়ে লোকজীবনের স্বরূপটি ঢাকা পড়িয়া যাইত। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত এই শ্লোকগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র রহিয়াছে। এই সাতশত শ্লোকে বিরহমিলনের অশ্রুবেদনা ও কামনার উত্তপ্ত উল্লাস যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, একমাত্র

'অমরুশতক' এবং 'শৃঙ্গারশতক' (ভর্তৃহরি) বাদ দিলে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে। ১৬শ শতকের হিন্দী কবি বিহারীও ঐ আদর্শে 'সাতসঈ' রচনা করেন। মনে রাখিতে হইবে, পরবর্তী কালে সংস্কৃতে যে সমস্ত শ্লোকসংগ্রহ রচিত হইয়াছিল ('সুভাষিতাবলী', 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি', 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত'), তাহার প্রধান আদর্শটি 'গাথাসপ্তশতী' হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত কামজীবনের নর্মলীলা বর্ণিত হইযাছে, বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অল্প যে কয়েকটি শ্লোকে কৃষ্ণের গোপীলীলা, বিশেষতঃ রাধাব উল্লেখ আছে, তাহাই প্রণিধানযোগ্য। হালের সঙ্কলনে রাধাব উল্লেখই রাধার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। নিম্নের দুইটি শ্লোক লক্ষণীয়—

১। মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণং বল্লবীনং অন্নান বি গোরঅং হরসি॥

অনু: হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখমারুতের দ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি অপনীত করিযা পুরোবর্তিনী অন্যান্য বল্লবীগণের গৌরব হরণ করিতেছ।

২। অজ্জ বি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ।
কণ্হ-মুহ পেসিঅচ্ছং নিহুহং হসিঅং বঅ-বহুহি॥

অনু: আজ পযন্ত দামোদর (কৃষ্ণ) বালকই রহিযা গেল—যশোদা এইরূপ বলিলে পর ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখপ্রতি নযন অর্পিত করিয়া গোপনভাবে হাসিলেন।[১]

ইহা ছাডাও দ্বিতীয় শতকের ১৪শ শ্লোকে, পঞ্চম শতকের ৪৭শ শ্লোকে এবং সপ্তম শতকের ৫৫শ শ্লোকে কৃষ্ণ ও গোপীপ্রেমের উল্লেখ আছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'গীতগোবিন্দে'ব রাধাকৃষ্ণ-সংক্রান্ত শ্লোকাবলী ও ভাবাদর্শে হালের যে কিছু প্রভাব নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

(কিন্তু হাল অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক ছন্দগ্রন্থ।) ইহাতে এমন অনেক শ্লোক আছে, যাহার ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষাকৌশল প্রায়ই বাংলার অনুরূপ। মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত এই দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ছন্দের উদাহরণ দিতে গিয়া সঙ্কলনকর্তা অনুরূপ ছন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ বহু শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি বিভিন্ন কবির রচনা, তাহার মধ্যে কিছু

১। ডা: রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত—গাথাসপ্তশতী

কিছু বাঙালীর হওয়া অসম্ভব নয়। কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীতে কাশীধামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সঙ্কলনকর্তা 'পিঙ্গল' নামে অভিহিত; ইনি কোন কাল্পনিক ব্যক্তি অথবা 'পিঙ্গল ছন্দসূত্রে'র রচনাকার পিঙ্গল, তাহা লইয়া কিছু কিছু মতান্তর থাকিলেও দুই জন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'পিঙ্গল ছন্দসূত্র' বহুপূর্বে রচিত; সুতরাং 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র সঙ্কলক ভিন্ন ব্যক্তি। সঙ্কলনকর্তা যেই হউন না কেন, তাঁহার সঙ্কলনে বাঙালী-জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ ও গোপীলীলা ইহাতেও আছে। তবে দৈনন্দিন জীবনের রুক্ষ ধূসর চিত্রই ইহার অন্যতম সম্পদ। কৃষ্ণের নৌকালীলার একটি পদ—

অরে রে বাহিহি কাহ্নু নাব
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহুঁ এথণই সন্তার দেই
জো চাহসি সো লেহি॥

অনু: ওরে রে, কৃষ্ণ, নৌকা বাহিতেছ, ডগমগ ছাড, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যা চাও তা লও। (ডাঃ সুকুমার সেন অনূদিত)

ইহার সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকটিও উল্লেখযোগ্য—

জিনি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআসিঅ
মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাস করে
গিরি হুত্থ ধরে।

অনু: যিনি কংস বিনাশ করিয়া কীর্তি প্রসারিত করিযাছেন, মুষ্টিক, অরিষ্ট বিনাশ করিয়াছিলেন, হস্তে গিরি ধরিয়াছিলেন।

এই সঙ্কলনে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত 'রাঈ'-এর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প কিছু পদে শিবের প্রসঙ্গ আছে। বাঙালীর স্বাদু জীবনভোগের চিত্রটি পরম উপভোগ্য—

ওগ্গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা॥
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণ্যবন্তা॥

অনু: ওগরাভাত কলাপাতায় ঢালা, গব্যঘৃত, সুস্বাদু দুগ্ধ, মৌরল্যা মাছ, নালতে শাক রন্ধন করিলেন কান্তা। দিতেছেন কান্তকে, আহার করিতেছেন পুণ্যবান।

এই অপভ্রংশ সংগ্রহে জীবনের একটা প্রসন্নরূপ আছে—

সো মানিঅ পুণ্ণবংত জাসু ভত্ত পংডিঅ তণঅ।
জাসু ঘরিণি গুণবংতি হোবি পুহবী সগ্গহ নিলঅ।

অনু: তাকেই মানি পুণ্যবান ব'লে, যার পণ্ডিতপুত্র ভক্তিমান, যেখানে গৃহিণী গুণবতী সেখানে পৃথিবীই স্বর্গ নিলয়। (ডঃ মনোমোহন ঘোষ—'প্রাকৃত সাহিত্য')

আবার দুই-একটি পদে জীবনের নেতিবাচক নৈরাশ্যব্যঞ্জক দিকটিও ফুটিয়া উঠিয়াছে।—

রাআ লুদ্ধ সমাজ খল,
বহু কলহারিণ সেবক ধুত্তউ,
জীবন চাহসি সুক্‌খ জই,
পরিহর ঘর জই বহু গুণ জুত্তউ॥

অনু: রাজা লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী কলহকারিণী, সেবক ধূর্ত, যদি জীবনে সুখ চাও তবে বহুগুণযুক্ত গৃহও পরিত্যাগ কর। (ডঃ মনোমোহন ঘোষ-কৃত অনুবাদ)

এই পদগুলি ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া এই অপভ্রংশে নব্যভারতীয় ভাষার অল্পস্বল্প প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। সাহিত্যের ইতিহাসপ্রসঙ্গে এই অপভ্রংশ সঙ্কলনটির আলোচনার একটি বিশেষ কারণ আছে। যদিও ইহা বাঙলাদেশে সঙ্কলিত হয় নাই, এবং সঙ্কলক সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না, তথাপি এই পদগুলির কোন কোনটিতে বাঙালী জীবন ও মনোভাবের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিতে হয়। কৃষ্ণের গোপীলীলা, প্রকৃতির বর্ণনা, দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ ও বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনচিত্র উহার কোন কোন শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য প্রাকৃতপৈঙ্গলের কোন কোন শ্লোকে বঙ্গগৌড়ের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতও আছে। 'ভঅ ভঞ্জিঅ বঙ্গা' (ভয়ে বঙ্গ পলাইল), 'বঙ্গলা ভঙ্গলা' (বাঙালী ভাগিল), বা—

রে গৌড় থক্কন্তি তে হত্থি জুহাই।
পল্লট্টি জুজ্‌ঝাহি পাইক্ক-বুহাই॥

অনু: রে গৌড়, তোর হস্তিযূথ থাকুক; পালটিয়া পাইকব্যূহের সঙ্গে যোঝ। (ডঃ সুকুমার সেন অনূদিত)

এই কবি কাশীশ্বরের স্তুতি করিতে গিয়া কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ, মারাঠা,

সৌরাষ্ট্র, চম্পারণ, ওড্র, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলের বীর্যকে উড়াইয়া দিয়াছেন। 'কাসীসর রাণা কিঅউ পআণা' (কাশীশ্বর রাজা অভিযান করিতেছেন)—সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল তো ভয়ে পলাইবেই। পিঙ্গলনামীয় কোন ব্যক্তি, যিনি এই কবিতাগুলির সঙ্কলক, কদাচিৎ নিজেও রচনাকার—তিনি সম্ভবতঃ কাশীশ্বরের রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে গিয়া কবি প্রতিপক্ষের বলবীর্য তুচ্ছ করিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। (যাহা হউক, বাঙালীর জীবনচিত্র হিসাবেই গাথাসপ্তশতী ও প্রাকৃতপৈঙ্গল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার বস্তু।

॥ ২ ॥

দোহাকোষ

(বাঙলাদেশে অপভ্রংশে রচিত যে গ্রন্থগুলির পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা বেশি নহে। কিন্তু নানা উৎস হইতে একথা স্পষ্ট করিয়াই বুঝা যাইতেছে যে, খ্রীঃ ৮ম হইতে ১০শ-১২শ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব-ভারতে, বিশেষতঃ বাঙলাদেশে বৌদ্ধ মহাযান শাখার অন্তর্ভুক্ত নানা উপধর্ম সম্বন্ধে অপভ্রংশ ভাষায় প্রচুর মৌলিক গ্রন্থ ও টীকাটিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই অপভ্রংশ শৌরসেনী প্রাকৃতের বংশধর শৌরসেনী অপভ্রংশ—পশ্চিমা হিন্দীর সাক্ষাৎ পূর্বপুরুষ। এই শৌরসেনী অপভ্রংশই ঈষৎ অর্বাচীনকালে 'অবহট্ট' নামে পরিচিত হয়, বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' অবহট্টেই রচিত। মাগধী প্রাকৃতের বংশজ মাগধী অপভ্রংশে রচিত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ, শৌরসেনী প্রাকৃত ছিল সে যুগের শিষ্টজনের ভাষা; কাজেই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি শৌরসেনী অপভ্রংশও দীর্ঘকাল সমগ্র পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব-ভারতের শিষ্টজনের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল। বাঙলার তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার্যগণও তাই শৌরসেনী অপভ্রংশেই তাঁহাদের দোহা-গীতিকা ও সাধনগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত বাঙলাভাষার কৌলীন্যের যোগ নাই, সুতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার্য অর্থাৎ সিদ্ধাচার্যের এই দোহাগুলির

আলোচনার সার্থকতা আছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ জাগিতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দোহাগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রথমতঃ, এই দোহা ও এই ধরণের অন্যান্য রচনার কবি-লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই বাঙলা, উড়িষ্যা ও আসামের অধিবাসী ছিলেন; প্রধান লেখকগণ প্রায়ই বাঙলাদেশের সহিত জন্মসূত্র বা কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন বাংলাভাষায় 'চর্যা' নামক বজ্র ও সহজযান গীতিকাও লিখিয়াছিলেন। এইজন্য শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সিদ্ধাচার্যদের দোহা-গুলিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রহণ করা কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের এই দোহাতে যে মত ও দর্শন সাঙ্কেতিক ভাষার দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহাও পূর্বভারতের বৌদ্ধ আচার্যদের একটা বিশেষ সাধন-প্রকরণ বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীনতম বাংলাভাষায় রচিত বৌদ্ধচর্যাগীতির সহিত তাহার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। সুতরাং বাঙালীর তদানীন্তন জীবনপ্রণালীর সহিত ঐ অপভ্রংশ দোহাগুলির আত্মিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না।)

পুঁথির পরিচয়॥ বৌদ্ধ অপভ্রংশ সাহিত্য এবং প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যের শূন্য স্থান পূরণ করিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খ্রীঃ ৮ম-১২শ শতকের মধ্যে বাঙলাদেশের সিদ্ধাচার্যদের রচিত অনেক অপভ্রংশ শ্লোকসংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা পুঁথির সন্ধানে কয়েকবার নেপালে গিয়া নেপাল রাজ-লাইব্রেরী হইতে পুরাতন নেওয়ারী অক্ষরে লেখা কয়েকখানি দুর্বোধ্য পুঁথি আবিষ্কার করেন।[২] তন্মধ্যে 'ডাকার্ণব', 'সুভাষিত সংগ্রহ', 'দোহাকোষ পঞ্জিকা', 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', সরোরুহ বজ্রের, 'দোহাকোষ' (অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকাসহ) এবং কৃষ্ণাচার্যের 'দোহাকোষ' উল্লেখযোগ্য। সেগুলি পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন যে, তাহা বাংলাভাষায় রচিত নহে, কিন্তু কোন্ ভাষা ঠিক ধরিতে পারিলেন না। পরে তিনি অনুমান করিলেন, সমস্ত পুঁথি প্রাচীনতম বাংলাভাষায়ই রচিত। তাঁহার অনুমান, এই পুঁথিগুলির রচনা-কাল ৭ম হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে। তিনি আরও আবিষ্কার করিলেন যে,

এ বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে চর্যাগীতিকা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে

এই পুঁথির অধিকাংশই তিব্বতে চলিয়া গিয়াছিল এবং তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তিব্বতী ভাষায় ভারতবর্ষীয় গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করিয়া দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যেগুলিতে শুধু বুদ্ধবচন গৃহীত হইয়াছিল, তাহাকে বলা হইত 'কেঙ্গুর' গ্রন্থমালা এবং বুদ্ধবচন ভিন্ন বৌদ্ধধর্মবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থগুলিকে 'তেঙ্গুর' (বা তাঞ্জুর) নামক আর-একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। ১৩শ শতকে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির তালিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন তিব্বতী লামা-বু-তোন।[৩] তারনাথের ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস এবং সুম্‌পা-রচিত 'পাগ্‌-সাম্‌-জোন-জাঙ' গ্রন্থের মধ্যেও এই সমস্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের উল্লেখ আছে। কোডিয়ার সাহেব পরে এই 'তেঙ্গুর' গ্রন্থমালার একখানি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।[৪] বেণ্ডল সাহেব যে 'সুভাষিতসংগ্রহ' প্রকাশ করেন, তাহাতেও এই জাতীয় গ্রন্থ ও রচনাকারের পরিচয় আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের *Les Chants Mystique de Kanha et de Saraha* নামক গবেষণা-গ্রন্থেও তৎকালীন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সন্ধান করা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে শহীদুল্লাহ্ সাহেব কাহ্নু ও সরহের অপভ্রংশ পদগুলির সহিত তাহার তিব্বতী অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই দোহাকোষ এবং অপভ্রংশ ভাষায় রচিত পদাবলী ও টীকাটিপ্পনী সম্বন্ধে নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে নেপালে অবস্থান করিবার সময় তিনি নেপালের মহামান্য রাজগুরু হেমরাজ শর্মার নিকট হইতে দোহাকোষের আর-একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন, এবং দরবার লাইব্রেরী হইতেও অনুরূপ পুঁথির খানকয়েক পাতা সংগ্রহ করেন। রাজগুরুর পুঁথিটি ১৩শ শতাব্দীর হইতে পারে; ইহাতে তিল্লোপাদ ও সরহ-পাদের দুইখানি দোহাকোষ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দোহাকোষের যে পুঁথি সংগ্রহ করেন, তাহাতে তিল্লোপাদের দোহা ছিল না; ইহা ডক্টর বাগচীর নূতন আবিষ্কার। তাঁহার আবিষ্কৃত সরহপাদের দোহাগুলি শাস্ত্রীমহাশয় সংগৃহীত দোহার অনুরূপ। ডক্টর বাগচী যে পুঁথির কয়েকখানি পাতা আবিষ্কার

৩ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাসের ৭০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪ P. Cordier—*Catalogue du fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale*, Paris. 1908

করিয়াছেন, তাহার রচনাকাল ১১০১ খ্রীষ্টাব্দে। হরপ্রসাদ ও প্রবোধচন্দ্র আবিষ্কৃত দোহাগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত করা যায়:—

১। সরহপাদের দোহাকোষ (অদ্বয়বজ্রের 'সহজাম্নায় পঞ্জিকা' নামক সংস্কৃত টীকাসহ)।

২। পুঁথির পত্র হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত সরহপাদের মোট বত্রিশটি দোহা (ডক্টর বাগচী আবিষ্কৃত)।

৩। কাহ্নপাদের দোহাকোষ (আচার্যপাদের 'মেখলা' নামক সংস্কৃত টীকাসহ)।

৪। ডাকার্ণব।

৫। তিল্লোপাদের দোহাকোষ ('সারার্থ পঞ্জিকা' নামক সংস্কৃত টীকা-সহ। ডক্টর বাগচী আবিষ্কৃত)।

দোহাকারের পরিচয়॥ এই দোহাগুলির মধ্যে সরহপাদ ও কাহ্নপাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব বিস্তারিত না হইলেও একেবারে স্বল্পও নহে। প্রথমে সরহপাদের কথা ধরা যাক। তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় সরোজবজ্র, পদ্মবজ্র, পদ্ম, রাহুলভদ্র, সরোরুহবজ্র প্রভৃতি শব্দে কয়জন সরহের ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। (মনে হয় অন্ততঃ দুই জন সরহের কথা তেঙ্গুরে স্বীকৃত হইয়াছে। যিনি প্রাচীনতর (আনুঃ ৮ম শতক) তিনিই সরোরুহবজ্র; তাঁহার অপর নাম পদ্মবজ্র। 'হেবজ্রতন্ত্রে'র তিনিই অন্যতম উদ্‌গাতা। বোধহয় তিনি উড্ডীয়ান বা উড়িষ্যায় (?) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দোহাকোষের সরহপাদ পরবর্তী কালে (খ্রীঃ ১২শ শতক) আবির্ভূত হন। এই সরহপাদ নাকি রত্নপাল নামক কোন রাজাকে স্বীয় মতানুবর্তী করিয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্যা হইতে মন্ত্রযান শিক্ষা করেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়া সিদ্ধাচার্য হন। তখন তিনি 'সরহপাদ' নামে বিখ্যাত হন। 'তেঙ্গুর' গ্রন্থমালায় সরহপাদের রচিত বলিয়া প্রায় ৩৫খানি তান্ত্রিকগ্রন্থ, ৬ খানিরও অধিক দোহাকোষগীতি ও চর্যাগীতি ('দোহকোষগীতি', 'দোহকোষ-চর্যাগীতি', 'দোহাকোষ উপদেশগীতি', 'দোহাকোষ মহামুদ্রোপদেশ' 'ভাবনাদৃষ্টি চর্যাফল দোহাকোষগীতিকা', 'মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি', 'ডাকিনীবজ্রগুহ্যগীতি', 'তত্ত্বোপদেশ-শিখর-দোহাগীতি' প্রভৃতি) এবং 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে'র অন্তর্ভুক্ত চারিটি পদ (পদ সং—২২, ৩২, ৩৮, ৩৯) পাওয়া গিয়াছে। সরহপাদ ও

সরোজবজ্র লইয়া কিছু সংশয় দেখা দিয়াছে; অবশ্য তেঙ্গুর গ্রন্থমালাদৃষ্টে তিন জন সরহকে পৃথক করা যাইতে পারে। একজন বজ্রযানী-সম্প্রদায়ের সরহরাহুলভদ্র, আর-একজন হইলেন হেবজ্রতন্ত্রের (বৌদ্ধতন্ত্র) উদ্‌গাতা সরহ; ইঁহার শিষ্য অনঙ্গবজ্র, অনঙ্গবজ্রের শিষ্য ইন্দ্রভূতি। দোহাকোষের সরহ অপর কোন সিদ্ধাচার্য হইতে পারেন।

কৃষ্ণাচার্যের (কৃষ্ণপাদ) 'দোহাকোষ' ছাড়াও 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' কাহ্নু, কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণপাদ এবং কৃষ্ণবজ্রের ভণিতায় এগারটি বাংলাপদ পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য অপভ্রংশে রচিত দোহা এবং চর্যায় উল্লিখিত বাংলা পদগুলি একই কবির রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে যে একাধিক কবি কৃষ্ণাচার্য নামে অভিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তেঙ্গুর গ্রন্থ-মালায় দুই জন কৃষ্ণাচার্যের নাম আছে। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ সম্ভবতঃ উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন এবং প্রধানতঃ তান্ত্রিকগ্রন্থের অনুবাদক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। সুম্পা রচিত 'পাগ-সাম্-জোন্-জাঙ্' গ্রন্থে তাঁহাকে কাহ্নু বলা হইয়াছে, ঐ বর্ণনায় দেখা যায় কৃষ্ণাচার্য উড়িষ্যায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং নাথধর্মের প্রধান আচার্য জালন্ধরিপাদের দ্বারা দীক্ষিত হন। অপর জন হইলেন কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য বা কৃষ্ণবজ্র। সুম্পার গ্রন্থে তাঁহাকে মহাযোগী বলা হইয়াছে। আরও একজন কৃষ্ণ সোমপুরী বিহারে অবস্থান করিতেন। এই তিন জনের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য, আর কেই-বা জালন্ধরি-পাদ শিষ্য কাহ্নুপাদ (দোহাকোষ ও চর্যার কবি), তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। ঐতিহাসিক তারনাথের মতে এই কাহ্নুপাদ ছিলেন বিদ্যানগর বা পাণ্ড্যনগরের অধিবাসী, আর একমতে তিনি ছিলেন সোমপুরীর অধিবাসী। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 'হেবজ্র পঞ্জিকা'র যে পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহার রচনাকারের নাম পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ, রচনাকাল আনুমানিক ১১৯৯ খ্রীঃ অব্দ। কেহ কেহ ইঁহাকে দোহাকোষ ও চর্যার লেখক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন, এবং তাহা সত্য হইলে ইঁহার আবির্ভাবকাল ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্দিষ্ট হইতে পারে। কৃষ্ণাচার্যের নামে ৫৭ খানি বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থ প্রচলিত আছে; দোহাকোষ ও ১১টি চর্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও কাহ্নুপাদ 'কাহ্নুপাদগীতিকা' নামক আর-একটি পদাবলী সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

অনুমান, ইহাতে তাঁহার বাংলাপদগুলি গৃহীত হইয়াছিল, যাহার কয়েকটি 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' স্থান পাইয়াছে।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে সরহ ও কাহ্নপাদ শৌরসেনী অপভ্রংশে যেমন নানা গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার মাগধী অপভ্রংশজাত আদিম বাংলাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন; তাহার সামান্য অংশ চর্যাপদে রক্ষিত হইয়াছে। তখন স্মার্ত ও পৌরাণিক হিন্দুসমাজে অপভ্রংশের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল এবং প্রাদেশিক ভাষা ক্রমেই অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছিল। তাহা হইলেও বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্যগণ যখন অপভ্রংশে তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন পশ্চিমা অপভ্রংশের সাহায্য লইয়াছেন, কিন্তু যেখানে ধর্মের আবরণে কাব্যরস পরিবেশন করিতে গিয়াছেন, সেখানে মাগধী অপভ্রংশের প্রাণরসে পরিপুষ্ট সদ্যোজাত বাংলাভাষার সাহায্য লইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে বজ্রযানী লেখক তিল্লোপাব নাম উল্লেখ করা কর্তব্য। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯২৯ সালে নেপাল হইতে তিল্লোপার দোহাকোষ টীকাসহ আবিষ্কার করেন এবং তিব্বতী অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়া স্বকৃত ইংরাজী টীকা ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৯৩৫)। তিল্লোপা 'তেঙ্গুর' গ্রন্থমালায় নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা—তিলিপা, তিল্লিপা, তিল্লপ, তৈলপ, তিল্লোপা, তৈলোপা, তেল্লিপা, তিলোপা, তেলিযোগী প্রভৃতি। সুম্পা তিল্লোপা সম্বন্ধে একটা কৌতূহলজনক গল্প বলিয়াছেন। তিল্লোপা নাকি এক তিলপেষিকা যোগিনীর সহিত যোগস্থ অবস্থায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার নাম তিল্লোপা। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি বোধহয় জাতি-ব্যবসার দিক হইতে তৈলিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাহারও মতে তিনি বাঙলার মহীপালের সমসাময়িক, তাঁহার বাড়ী ছিল সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে, তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কোর্ডিয়ারের (P. Cordier) তালিকায় তৈলিকপাদ নামক আর-এক সিদ্ধাচার্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইনি উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে তিল্লোপা ছিলেন পদ্মবজ্রের শিষ্য, জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই বিভিন্ন নামধারী তিল্লোপা একই ব্যক্তি কিনা জানা যাইতেছে না। একমতে তিনি ছিলেন তেলি, আর-একমতে ব্রাহ্মণ; একমতে তিনি উড়িষ্যাবাসী, অন্যমতে তিনি চট্টগ্রামবাসী। এই দুই আচার্য এক না হওয়াই

সম্ভব। শুনা যায়, চট্টগ্রামের তিল্লোপা বজ্রযানমত গ্রহণ করিয়া 'প্রজ্ঞাভদ্র' নামে পরিচিত হন। তিনি অন্ততঃ চারিখানি বজ্রযান গ্রন্থ এবং একখানি দোহাকোষ রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযান গুরু নাড়োপা তিল্লোপারই শিষ্য।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ডাকার্ণব' নামক যে পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন, তাহার লেখক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই পুঁথির মধ্যে ডাককে কখনও 'বজ্রডাক' কখনও বা 'ভগবান ডাক' বলা হইয়াছে। ইহার অধিক আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রবচনের ডাক-খনা ও 'ডাকার্ণবে'র গ্রন্থকার ডাকের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। তেঙ্গুর গ্রন্থমালাতেও ডাকের উল্লেখ নাই। সুতরাং ডাকার্ণবের ডাকের পরিচয় আবিষ্কার করা দুষ্কর।

দোহার স্বরূপ ॥ এই দোহাকোষধৃত শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত শ্লোক-গুলিতে তদানীন্তন বজ্রযান ও সহজযান মতালম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন-ভজন, শীল-সদাচার ও আধিদৈহিক প্রকরণ সম্বন্ধে কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও বা আভাসে-ইঙ্গিতে একপ্রকার গোপনচারী তত্ত্ববাদের আভাস পাওয়া যাইতেছে। চর্যাপদ প্রসঙ্গে মহাযান শাখাজাত বিভিন্ন 'উপযানের' পরিচয় দেওয়া হইবে। বর্তমান আলোচনায় শুধু এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য, কুমারিলভট্ট প্রভৃতি আচার্যদের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হইলে মহাযানাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্ম হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল; তাই সমাজের উচ্চস্তর হইতে আত্মগোপন করিয়া এই মহাযান মত গণস্তরে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহার সহিত আবার তন্ত্রোক্ত নানা-প্রকার 'আধিদৈহিক' প্রক্রিয়া জড়িত হইয়া পড়িল। নাথধর্ম, কৌলধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সংমিশ্রণে বিভিন্ন 'উপযান' ৮ম হইতে ১২শ-১৩শ শতক বা তাহার পরেও পূর্বভারতে (প্রধানতঃ উড়িষ্যা, বাঙলা ও আসামে) জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ বিস্তার লাভ করে; এবং এই মতের ধর্মগুরুগণ নিজ নামধাম গোপন করিয়া ছদ্ম বা অন্ত্যজ নামে আপনাদিগকে বিশেষিত করিয়া সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং বাংলাভাষার আদিতম রূপের সাহায্যে ধর্মাচারের গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সমকালে বা কিছু পরবর্তী কালে ঐ শ্লোকগুলিকে একটা শিষ্টজনোচিত মর্যাদা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল; ইহাদের সংস্কৃত টীকাই তাহার প্রমাণ।

তিল্লোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্নপাদের দোহাগুলি হইতে কয়েকটি সাধারণ

লক্ষণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি শুধু এই তিন জন দোহাকারেরই বৈশিষ্ট্য নহে। ৮ম-১২শ/১৩শ শতাব্দীর মধ্যে পূর্বভারতে সংস্কৃতে, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় যত বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থ, ব্যাখ্যা ও পদ রচিত হইয়াছে, সবগুলিতেই প্রায় ঐ একই আদর্শ লক্ষ্য করা যাইবে। বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান সকলেই মূলতঃ একই তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিভিন্ন যানগুলির মধ্যে তত্ত্বগত ঈষৎ পার্থক্য থাকিলেও সামান্য লক্ষণে তাহারা এক।[৫] দোহাকারগণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার ধর্মমতের পুঁথি-আশ্রয়ী আচারবিচার, রীতিপ্রকরণকে সুকঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, গুরুবচনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, দুর্বোধ্য প্রতীকের সাহায্যে তান্ত্রিকপ্রকরণের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন এবং বজ্রযান ও সহজযানের মূল দার্শনিকতা গূঢ়তর ব্যঞ্জনার সাহায্যে এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারিবে না। 'দোহাকোষে' সংগৃহীত সংস্কৃত টীকা, ব্যাখ্যা এবং শ্লোকগুলির তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে এখন আমরা উহাদের অর্থাদি একপ্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। অবশ্য তাহাতেও নানা বিরোধ ও বাদ-বিসংবাদ আছে। কারণ দোহাকোষে সংনিবদ্ধ সংস্কৃত টীকার সহিত তিব্বতী অনুবাদের সর্বত্র রেখায় রেখায় মিল নাই। দোহার অর্থবিশ্লেষণে ইহার সংস্কৃত টীকা, অথবা তিব্বতী অনুবাদ, কোন্‌টি অধিকতর প্রামাণিক, তাহা লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কিছু মতান্তর হইয়াছে।

তিনটি দোহাকোষের একটা সাধারণ লক্ষণ হইল যে, পুঁথিপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চতর বর্ণের দ্বারা অনুশীলিত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি উহাদের অনাস্থা। সহজসিদ্ধি যে যাগযজ্ঞাদি, মন্ত্রতন্ত্র ও স্নানাদি পুণ্য-কর্মের দ্বারা পাওয়া যায় না, এই কথাটাই তিল্লো, সরহ ও কাহ্ন নানাভাবে বলিয়াছেন। তিল্লোপাদের—

১। বঢ় অণ লোঅ অগোঅর তত্ত পণ্ডিঅ লোঅ অগম্ম।

অনু: তত্ত্বকথা মূর্খ, অন্যান্য লোক ও পণ্ডিতেও বুঝে না।

২। তিত্থ তপোবণ ম করহু সেবা।

অনু: তীর্থ ও তপোবনে যাইবে না।

৫ চর্যাগীতিকা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩। দেব ম পূজহু তিত্থ ণ জাবা।
দেবপূজাহি ণ মোক্‌খ পাবা ॥

অনু দেবতা পূজিও না, তীর্থে যাইও না, দেবপূজায় মোক্ষ পাওয়া যায় না।

সরহের—

কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ ॥
*   *   *
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণহিঁ বইসী ঘণ্ডা চালী ॥
অক্‌খি নিবেসী আসণ বন্ধী।
কন্নেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী ॥

অনুঃ কাজ ত্যাগ করিয়া হোমের আগুনে এবং কটু ধূমে চোখ অন্ধ করে, ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা বাজায়, আসনবন্দী হইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কানে কানে খুসখুস্ করিয়া মন্ত্র দিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়।

অন্যত্র--

জই ণগ্‌গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড়ণে অত্থি সিদ্ধি তা জুবই ণিঅম্বহ ॥

অনুঃ নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরেরও মুক্তি হইবে। লোমোৎপাটন করিলেই যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা হইলে যুবতীনিতম্বেরও হইবে।

অন্যত্র-

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জঁ।
কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ ॥
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী হ্নাই ॥

অনুঃ দীপে নৈবেদ্যে কি হইবে? মন্ত্রসেবার দ্বারাই বা কি কাজ? তীর্থ-তপোবনে গিয়াই বা কি কাজ হইবে? স্নান করিলেই কি মোক্ষলাভ হয়?

কাহ্নপাদও অনুরূপভাবে বলিয়াছেন—

আগম-বেঅ-পুরাণেঁ পণ্ডিআ মাণ বহন্তি।
পক্ক সিরিফলেঁ অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি ॥

অনুঃ আগম বেদপুরাণ পড়িয়া পণ্ডিতগণ মান বহন করেন। যেমন পাকা বেলের চারিদিকে ভ্রমর বৃথা ঘুরিয়া মরে।

এব জপহোমে মঙ্গলকম্মে।
অনুদিন অচ্ছসি কাহিউ ধম্মে ॥

অনু : এই সমস্ত জপ হোম মঙ্গলকর্ম প্রভৃতি ধর্মাচারে প্রত্যহ মগ্ন হইয়া আছিস কেন?

দোহাকারগণ এইভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই ধর্মাচার ও আচার-অনুষ্ঠানকে সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা তান্ত্রিক আচার-আচরণ এবং পারিভাষিক শব্দকণ্টকিত রহস্যাচারকেই সাধনমার্গে প্রধান স্থান দিয়াছেন, তথাপি উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

তিল্লো, সরহ ও কাহ্নু—তিন জনেই মন্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আদৌ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে—

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গাঙ্গা সাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু ॥ (সরহ)

অনু : এখানেই অর্থাৎ দেহের মধ্যে স্বর্গীয় নদী যমুনা, গঙ্গাসাগর, এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, এখানেই রহিয়াছে চন্দ্র ও দিবাকর।

অন্যত্র—

ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই।
পই দেখ্ কই পড়বেস পুচ্ছই ॥

অনু : ঘরে আছে, ঘরেই আছে, বাহিরে কোথায় পুছিতেছিস্? সামনে পতি দেখিয়াও প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিস?

সরহপাদ বলিতেছেন—

জহি মণপবণ ণ সঞ্চরই
রবি সসি ণাহ পবেশ।
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম করু
সরহে কহিঅ উএস ॥

অনু : যেখানে মনপবন সঞ্চরণ করে না, রবিশশীও প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে ওরে মূঢ়, তোমার চিত্ত বিশ্রাম করুক, সরহ এই উপদেশ দেয়।

কাহ্নুও এই চিত্ত-অবস্থা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

অহ ণ গমই উহ ণ জাই।
বেনি রহিঅ তসু নিচ্চল পাই ॥

ভণই কহ্ন মন কহবি ণ ফুট্টই।
ণিচ্চ পবন ঘরিণি ঘর বত্তই॥

অনু: অধে যায় না, উর্ধ্বেও উঠে না, দুইকে অর্থাৎ 'বেণি'কে ত্যাগ করিলে তবে চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়। কাহ্ন বলেন, ফুটিয়া কিছু বলিবে না।

সাধনমার্গের শেষ স্তরে কি করিয়া পৌছান যায়, চিত্তের সেই অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া দোহাকারগণ গুরুবচনকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুবাদ তাই দোহাগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা—

বর গুরু বঅণেঁ পডিজ্জহু সচ্চেঁ।
সরহ ভণই মই কথিঅউ বাঁচে॥

অথবা,

গুরুবঅণে দিঢ ভত্তি কর হই হই সহজ উল্লালু।

অথবা,

গুরু উবএ সো অমিঅরস হবহিঁ ণ পীঅউ জেহি।

এই সমস্ত রহস্যাচার প্রায়শঃই গুরুমুখী ছিল, এবং এইজন্যই গুরুর উপর এত আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে।

যদিও দোহাকোষ প্রধানতঃ সাধনগ্রন্থ, তথাপি কোন কোন দোহাকারের প্রশংসনীয় কবিদৃষ্টি ছিল। যেমন—

অদঅ চিত্ত তরুঅর ফরাউ তিহুঅণেঁ বিসারি।
করুণা ফুল্লিঅ ফল ধরহ ণামে পরউআর॥

অনু: অদ্বয় চিত্ততরুবর ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করিল। করুণা তাহার ফুল, যে ফল ধরিল তাহার নাম পর উপকার।

কিংবা—

তো বিনু তরুণি নিরন্তর নেহে।
বোহি কি লাভই এণ বি দেহে॥

অনু: হে তরুণি, তোমার নিরন্তর স্নেহ ব্যতীত এবং এই দেহ ছাড়া কি বোধি লাভ হয়?

ডাকার্ণবের পুঁথিটি ('শ্রীডাকার্ণব মহাযোগিনী তন্ত্ররাজ্য') একটু বিচিত্র প্রকার। ইহাতে তন্ত্রোক্ত দীর্ঘ সংস্কৃত উদ্ধৃতি আছে, এবং মাঝে মাঝে বজ্রযান মতের দুর্বোধ্য শ্লোকসমূহ অপভ্রংশ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ পটলে

বিভক্ত এই বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে সব 'পটল'গুলি যথাক্রমে উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জ,
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জ।
লোঅণ করুণা ভাবহু তুম্ম,
সঅল সুরাসুর বুজ্ঝহু জিম্ম॥

এই পুঁথিটিতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া বজ্রযান তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তবে প্রধানতঃ গুরুমুখী বলিয়া এবং সংস্কৃত শ্লোকের সহিত টীকা না থাকিবার জন্য এই সমস্ত সাধনসঙ্কেতের স্পষ্টতর কোন অর্থ আবিষ্কার করা যায় না।

দোহাকোষে ধৃত অপভ্রংশ পদগুলি যে ধর্মতত্ত্ব, সাধনভজন ও মানসিক পরিবেশে রচিত, তাহা চর্যাপদেরই সমগোত্রীয়। বজ্রযান ও সহজযান তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পূর্ব-ভারতে বসিয়া সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও বাংলা ভাষায় যে বিপুল সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তদতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই। এই গ্রন্থগুলির তিব্বতী অনুবাদ একদা তিব্বতে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং সেই অনুবাদ অবলম্বনে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিপুল পরিমাণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। যদিও উল্লিখিত দোহাগুলি শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত, তথাপি ইহার অধিকাংশই বাঙালীর রচনা এবং বৌদ্ধ সহজিয়া মতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া এখানে ঈষৎ বিস্তারিত আকারে আলোচনা করা হইল।

———

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষা

॥ ১ ॥

বাংলা লিপির কথা

একদা বাঙলার উত্তর-পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং উত্তর-পূর্বে আসাম পর্যন্ত বাংলা লিপির একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে বঙ্গাক্ষরের বিশাল ভৌগোলিক প্রাধান্য হ্রাস পাইয়া গিয়া ইদানীং রাষ্ট্র-শাসনের সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। এখন শুধু আসাম প্রদেশের ব্যবহার্য লিপিতেই বাংলা লিপির যাহা কিছু প্রভাব লক্ষ্যগোচর হইবে। উড়িষ্যার লিপি এমন পরিবর্তিত হইয়াছে যে, ইহার সহিত বাংলা লিপির কৌলীন্যের যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; অথচ বাংলা লিপি হইতেই ওড়িয়া লিপির আবির্ভাব। অর্ধ-শতাব্দীর পূর্বেও দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে মৈথিলী অক্ষর মৈথিলী ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন যুগে মৈথিলী ও বাংলা অক্ষরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও মিথিলাবাসিগণ তাঁহাদের লিপিমালায় বাংলা অক্ষরের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরের প্রভাবে মিথিলা হইতে মৈথিলী লিপি লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বাঙলা হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণ তিব্বত-চীন জাপানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই দেশে বাংলা অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধ পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। জাপানের কোন কোন মন্দিরে ১০ম-১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত গ্রন্থাদি এখনও রক্ষিত আছে। হুরিয়ুজি মন্দিরে 'উষ্ণীষ-বিজয়ধারিণী' নামক বৌদ্ধ-ধর্মবিষয়ক একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি আছে; তাহাতে নাকি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের পূর্ব-ভারতীয় অক্ষরের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে পিকিঙ্-এর নিকটে ও-তা-সুস্ (Ww Ta Sus) মন্দিরে তিনি বুদ্ধমূর্তির গাত্রে বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ 'মন্ত্র' বা 'ধারণী' দেখিতে পান। যবদ্বীপে ১২শ

শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে ; শ্যামের অঙ্কোরবট মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে লিখিত শ্লোকসংগ্রহ আছে। ক্ষিতিমোহন চীনদেশে বঙ্গাক্ষরে লিখিত 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক একখানি পুঁথি দেখিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। একদা বাঙালী তাহার পুঁথিপত্র লইয়া বাঙলার বাহিরে গিয়াছিল। তিব্বত, চীন, জাপান, শ্যাম, কম্বোজে তাহার যাতায়াত ছিল ; সুতরাং ঐ সমস্ত দূর দেশে বাংলা অক্ষরে লেখা দুই-চারিখানি পুরাতন পুঁথি পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে।

বাংলা অক্ষরের উদ্ভব ও বিকাশের একটা সুদূরপ্রসারী দীর্ঘকালের ইতিহাস আছে ; সেইটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতীয় লিপি ও য়ুরোপীয় সমালোচক ॥ য়ুরোপীয় লিপি-বিশারদগণ ভারতের প্রাচীনতম লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি-রহস্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অতিশয় বিব্রত বোধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মী অক্ষরের সুগঠিত রূপ অশোকলিপি ভারতবাসিগণ নিজেরাই উদ্ভাবন করিবে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই ভারতীয় লিপিকে ভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহাদের বিশেষ সঙ্কোচ হইয়াছে। অশোক অনুশাসনের ব্রাহ্মী অক্ষর যেহেতু সুগঠিত এবং তাহার পূর্ববর্তী কোন অপরিণত গঠন লিপি পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপি ভারতীয় নহে, বহির্ভারতীয়।

প্রিন্সেপ, উইলিয়ম জোন্স, টেলর, ওয়েবার, ব্যুলার প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে ভারতীয় লিপির মৌলিকতা লইয়া বিশেষ মতভেদ হইলেও, তাঁহারা একটি বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় মৃত্তিকা হইতে ভারতীয় লিপির জন্ম হয় নাই। প্রিন্সেপের মতে প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি গ্রীক লিপি হইতে গৃহীত। উইলিয়ম জোন্সের মতে ফিনিসীয় লিপির প্রভাবে ভারতীয় লিপি সৃষ্টি হয়। টেলর সেবীয় (Sabean) লিপি হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। ইনি বলেন, দক্ষিণ-সেমিটিক প্রদেশই ব্রাহ্মী লিপির জন্মনীড। আবার ওয়েবার ও ব্যুলারের মতে, উত্তর-সেমিটিক প্রদেশ হইতেই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে। অপর দিকে কানিংহাম ও টমাস এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

যাঁহারা মনে করেন, গ্রীক অথবা ফিনিসীয় অক্ষর হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের

জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের এই মত যুক্তির দ্বারা আদৌ প্রমাণিত হয় নাই। কারণ ভারতীয় অক্ষরের সহিত গ্রীক ও ফিনিসীয় অক্ষরের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চিত্রের দ্বারা* মোয়াবাইট (প্রাচীন ফিনিসীয় অক্ষর), ফিনিসীয় এবং ব্রাহ্মী অক্ষরেব মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে মুদ্রিত চিত্রগুলি দেখিযা সেই সাদৃশ্য বুঝা যাইতেছে না। ঐ চিত্রে মোয়াবাইট হইতে ফিনিসীয় অক্ষরের ক্রমবিবর্তন স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে বটে, কিন্তু ফিনিসীয় হইতে ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি কি করিযা কল্পনা করা যাইতে পারে, চিত্ররূপ দেখিয়া তাহা বোধগম্য হইতেছে না। টেলর, ওযেবার ও ব্যুলার ব্রাহ্মী লিপিকে সেমীয় লিপির আত্মজ বলিতে চাহিলেও কানিংহাম ও টমাস এই মতেব সম্পূর্ণ বিবোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সেমিটিক লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত; ব্রাহ্মী লিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত। সুতবাং ব্রাহ্মী লিপি সেমিটিক লিপি হইতে কি করিয়া উদ্ভূত হইতে পারে? কিন্তু ব্যুলাব আবাব ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত লিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন কোন ব্রাহ্মী লিপি দক্ষিণ হইতে বামেও লিখিত হইত। তিনি অশোক লিপির কোন কোন স্থলে ঐ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন। সিংহলের ব্রাহ্মী লিপিতেও এই বৈশিষ্ট্য কোথাও কোথাও দৃষ্টি গোচর হয়। তাই ব্যুলারের মত-ই য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে—অর্থাৎ ব্রাহ্মী লিপি উত্তর-সেমিটিক প্রদেশের লিপি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।

টমাস কিন্তু একটা সাধারণ যুক্তিব পথ ধবিয়াছেন। তাঁহার মতে, যে-ভারতীযগণ ব্যাকবণে সূক্ষ্ম নিপুণতা অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে লিপির জন্য ফিনিসীয়া বা সেমিটিক অক্ষরের পথ চাহিয়া থাকিবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। কানিংহাম ও টমাস উভয়েই মনে করেন, ভারতের আদিতম লিপি ব্রাহ্মী অক্ষর ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, বাহির হইতে আনীত হয় নাই। কানিংহামের মতে, প্রাচীন মিশরীয়গণ যেমন 'হায়াবোগ্লিপিক' বা চিত্রলিপির সাহায্যে অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিল, শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভারতীয়গণও ঠিক সেই ভাবেই চিত্রলিপি হইতে ব্রাহ্মী অক্ষর উদ্ভাবন করিয়া থাকিবেন। কানিংহামের এই মত সংশয়াতীত না হইলেও তাঁহার একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভারতীয়দের

* হরপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম সম্ভার

পক্ষে মৌলিক লিপির উদ্ভাবন এমন কোন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

কাহারও কাহারও অনুমান—অশোক-অনুশাসনে যে সুগঠিত ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন দেখা যায়, তাহার পূর্ববর্তী কোন অপরিণত-গঠন লিপির আভাস পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাহ্মী অক্ষরের মতো সুগঠিত লিপিসৃষ্টির পূর্বে নিশ্চয় অনেকগুলি পরিবর্তনের স্তরপরম্পরা বহিয়া গিয়াছিল; যদি ব্রাহ্মী লিপি এদেশেই জন্মলাভ করিত, তাহা হইলে তাহার বিকাশের পারম্পর্য দেখা যাইত, একেবারে সুগঠিত অক্ষর পাইতাম না। সুতরাং এইরূপ পূর্ণাঙ্গ ব্রাহ্মী লিপি নিশ্চয় বহির্ভারতীয় কোন লিপির আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছিল— ব্যুলারের এই মত যুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী একপ্রকার অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মত যে তর্কাতীত নহে, তাহা কয়েকটি তথ্য আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অশোক-অনুশাসনের পূর্ববর্তী কোন অপরিণতগঠন লিপি পাওয়া যায় নাই বলিয়া ব্রাহ্মী লিপিকে সেমিটিক বা ফিনিসীয়ের নিকট অধমর্ণত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ কালক্রমে অনেক প্রাচীন লিপিই লুপ্ত হইয়াছে; অশোক-অনুশাসনগুলির পশ্চাতে রাজকীয় নিদেশ ছিল; উপরন্তু সেগুলি সর্বভারতব্যাপী ধর্মগোষ্ঠীর প্রভাবাধীনে আসিয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোক অনুশাসন-গুলি কোনও প্রকারে কালের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, পাণিনি, উপনিষদে অক্ষর-সংক্রান্ত এত উল্লেখ আছে যে, ভারতীয় লিপি বহির্ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। শতপথ ব্রাহ্মণে এক দিবসকে মোট ৭৫৯,৩৭৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ জটিল অঙ্কবিদ্যা বিনা অঙ্কপাতে কি করিয়া সম্পাদিত হইতে পারে? ভারতীয় অঙ্কগণনার রাশিপাত যদি মৌলিক হয়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপিকেও ভারতীয়দের মৌলিক সৃষ্টি কেন বলা হইবে না? ঋগ্বেদে লিপি ও অক্ষরের প্রচুর উল্লেখ আছে। সুতরাং ভারতের আদিতম লিপি ব্রাহ্মী অক্ষর; ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন অশোক অনুশাসন। ইহা বহির্ভারতীয় নহে, ভারতের মৃত্তিকা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্রাহ্মী লিপি ও ভারতীয় অক্ষরমালা॥ ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি এবং ভারতীয় লিপিসমূহ এই ব্রাহ্মী অক্ষর হইতেই জন্মলাভ

করিয়াছে। শুধু ভারতীয় লিপি নহে,—সিংহলী, ব্রহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতী লিপিও ব্রাহ্মী অক্ষর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মী লিপির সমকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরেকটি লিপি ব্যবহৃত হইত; ইহার নাম খরোষ্ঠী লিপি। এই খরোষ্ঠী অক্ষর সেমীয় লিপির মত দক্ষিণ হইতে বাম দিকে লেখা হইত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব পর্যন্ত খরোষ্ঠী লিপির প্রভাব ছিল; মধ্য-ও পূর্ব-ভারতে ইহা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। অতি অল্পকালের মধ্যেই খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার লোপ পাইয়া যায় এবং ব্রাহ্মী লিপি খরোষ্ঠীর স্থান অধিকার করে। মাত্র দুইখানি অশোক অনুশাসন (সাহাবাজ-গড়্হি ও মান্সেরা অনুশাসন) খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, এই দুইটি বাদ দিলে আর সমস্ত অশোক-অনুশাসন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ।

অশোক-লিপিতে ব্রাহ্মী অক্ষরের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাহা সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত; কিন্তু তাহার পূর্বেও ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে পিপ্রাওয়া (Piprawa) স্তূপে কারুকার্য-সমন্বিত যে পাত্র পাওয়া গিযাছে, তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অশোক অনুশাসনেরও পূর্ববর্তী কালের (খ্রীঃ পূঃ ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দী) হওয়া সম্ভব। সুতরাং ব্রাহ্মী লিপি যে অশোকের অনেক পূর্ব হইতেই বিকাশের স্তর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল এবং অশোকের সময়ে একটা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা এই পিপ্রাওয়া লিপি হইতে বুঝা যাইতেছে।

ব্রাহ্মী লিপি ভারতীয় লিপিসমূহের জননী স্থানীয়। গৌরীশঙ্কর ওঝা তাঁহার প্রাচীন লিপিমালাবিষয়ক গ্রন্থে ভারতীয় লিপি-বিকাশের চিত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৭ সালের সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় 'বাংলার পুরাণ অক্ষর' নামক প্রবন্ধে সেই চিত্রটি পুনর্মুদ্রিত করিয়া-ছিলেন। ঐ চিত্রের দ্বারা ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি ক্রম-বিবর্তন প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ তালিকায় দেখা যায়, ব্রাহ্মী অক্ষর চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়া পঞ্চম স্তরে আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এই চারিটি পর্যায়ের মধ্যে চারি যুগের অক্ষর পরিবর্তনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রথম স্তরের অক্ষরগুলি অশোক-অনুশাসনের ব্রাহ্মী অক্ষর—ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি। দ্বিতীয় স্তরের অক্ষরগুলি কুষাণযুগের নিদর্শন—অশোকের চারি শত বৎসর পরে। অশোকের ব্রাহ্মী অক্ষর এই চারিশত

বৎসরের মধ্যেই বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হইয়াছে। তৃতীয় স্তরে গুপ্ত-রাজদের অক্ষর—কুষাণযুগের তিন-চারি শত বৎসর পরে। তৃতীয় স্তরের অক্ষরগুলি প্রথম স্তর অপেক্ষা যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। এই তৃতীয় স্তরের কয়েকটি অক্ষরে প্রাচীন বাংলা লিপির কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যাইতেছে। চতুর্থ স্তরের অক্ষর গুপ্ত সম্রাটদের তিন-চারি শত বৎসরের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। এই যুগের অক্ষর দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই স্তর হইতেই প্রাচীন বাংলা লিপির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মী অক্ষর খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া খ্রীষ্টীয় ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংলা অক্ষরের জন্মদান করিয়াছে। দেবনাগরী অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির আরেকটি রূপান্তর মাত্র। দেবনাগরী অক্ষর হইতে বাংলা লিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নাগরী অক্ষরের আদিম রূপ দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উত্তর-ভারতে প্রভুত্বস্থাপনের পূর্বেই বাংলা লিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ॥ খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে উদ্ভূত অন্ততঃ তিনটি লিপির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি। ইহার মধ্যে মধ্যভারতীয় ও পূর্বী লিপি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হইতে জন্ম-লাভ করে, আর দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উত্থিত হয় দক্ষিণী-ব্রাহ্মী অক্ষর হইতে। দক্ষিণ-পশ্চিমের এই নাগরী লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে অনেক পরে—১০ম শতাব্দীর পূর্বে নহে। হর্ণলি ও ব্যুলার সাহেবের মতামত বিচার করিয়া অনুমান হইতেছে, খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে প্রধানতঃ দুই প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিমা লিপি হইতে কাশ্মীরের প্রাচীন অক্ষর শারদা লিপি ও পশ্চিম-পাঞ্জাবের লণ্ড লিপি জন্ম লাভ করে এবং উত্তর-পূর্বী অক্ষর হইতে আবির্ভূত হয় মৈথিলী, বাংলা, ওড়িয়া, কায়েথী প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের লিপিমালা।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের লিপি খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতক হইতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লিপিকে স্থানচ্যুত করিতে আরম্ভ করে। ৫৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই এই বিতাড়ন-কার্য সমাপ্ত হয় এবং ৬ষ্ঠ শতকের শেষের দিকে উত্তর-পূর্বের লিপি উত্তর-

বাংলা লিপির বিবর্তন

পশ্চিমের লিপির নিকট সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করে। অবশ্য ৬ষ্ঠ শতকের লিপিলেখনেও পূর্বী লিপির প্রভাব অব্যাহত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহালিপিতেও পূর্বী অক্ষরের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পূর্বী লিপির প্রভাব নষ্ট হইয়া গেল। ৪৭৭ খ্রীঃ অব্দে লক্ষ্মণের পালি শাসনে পূর্বী লিপির চিহ্নমাত্র নাই।

আধুনিক লিপিবিশারদগণ নানা উপাদান বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: ৫ম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতে পশ্চিমা লিপি পূর্বী লিপিকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে; স্কন্দগুপ্তের সময়ে অধিকাংশ লিপিলেখনে পশ্চিমা লিপির প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। ৫ম শতাব্দীর শেষের দিকে এই পরিবর্তন প্রায় চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ৬ষ্ঠ শতকের আরম্ভের পূর্বেই পূর্ব-ভারতের সমতল ভূমি হইতে পূর্বী লিপির ব্যবহার একেবারে লোপ পাইয়া গেল এবং পশ্চিমা লিপি প্রায় রাজকীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হইল।

পশ্চিমা লিপির এই দস্যুবৃত্তি পূর্ব-ভারত দীর্ঘকাল সহ্য করে নাই। পশ্চিমা লিপির দুই শতাব্দীব্যাপী আধিপত্যের পর ৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পূর্ব-ভারতের লিপিলেখনে একটা বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়। শাহাপুরে প্রাপ্ত একটি দেবমূর্তিতে খোদিত লিপি (৬১৭ খ্রীঃ অঃ) এবং ঐ একই কালের সন তারিখ-হীন আর-একটি লিপিতে আবার পূর্বী লিপির প্রভাব দেখা যায়। ৭ম শতাব্দীর সূচনা হইতেই বোধহয় উত্তর-পূর্ব ভারতে পূর্বী লিপি আপন স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়া পায়। ইহার পর এই অঞ্চলে পশ্চিমা লিপি আর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই।

পূর্ব-ভারতে গুর্জর-প্রতীহারদের প্রাধান্যের যুগে পশ্চিমা লিপি এই অঞ্চলে আর-একবার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ইহার আর-একটি শাখার নাম ছিল নাগরী লিপি। এই নাগরী লিপি গুর্জর-প্রতীহারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব-ভারতে কিছুকাল প্রাধান্য বজায় রাখে এবং পূর্বী লিপিকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে পূর্বী লিপির পশ্চিম সীমা নাগরী লিপির সহিত মিশিয়া যায় এবং পূর্ব-ভারতের পশ্চিমে নাগরী লিপির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু খাস পূর্ব-ভারতে পূর্বী লিপি অক্ষত থাকে এবং ১১শ-১২শ শতকের মধ্যেই এই পূর্বী লিপি হইতে বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি হয়।

মহীপালের বাণগড়লিপিতে (১০ম শতক) সর্বপ্রথম বাংলা লিপির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইহার এক শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা লিপির প্রায় পূর্ণ রূপ গড়িয়া ওঠে, এবং ১২শ শতকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। এইরূপে উত্তর-পূর্ব ভারতের পশ্চিমে নাগরী লিপি এবং পূর্বে বাংলা লিপির আধিপত্য স্থাপিত হয়। বারাণসী হইতে পশ্চিম ভারতের সমস্ত ভূভাগ নাগরী লিপির সীমা এবং গয়া হইতে পূর্ব-ভারতের সমস্ত অঞ্চল বাংলা লিপির অধিকারভুক্ত। নাগরী অক্ষর গযার পূর্বাঞ্চলে আর কখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

সেনযুগে বাংলা অক্ষরের আকার গঠিত হইলেও ঋ, চ, ছ, ট, ণ, ভ, শ এবং হ তখনও বেশ পরিণত রূপ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমান যুগে এই অক্ষরগুলি পূর্ণ আকার লাভ করে। ঢাকায় প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের এক প্রাচীন মূর্তিতে (১১২২ খ্রীঃ অঃ) বাংলা অক্ষরের পূর্ণ আকার প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল। হরপ্রসাদ তাঁহার 'বাংলার পুরাণ অক্ষর' নামক প্রবন্ধে ১১শ-১২শ শতকের মধ্যে রচিত বা লিপিকৃত অভয়াকর গুপ্তের "বজ্রাবলী-নাম মণ্ডলোপযিকা" এবং ১০৪৭ শকাব্দে (১১২৫ খ্রীঃ অঃ) লিপিকৃত "কালচক্রাবতার", ১১৯৮ খ্রীঃ অব্দে রচিত "হেবজ্রতন্ত্রটীকা" প্রভৃতির যে লিপিচিত্র দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি বাংলা অক্ষরই পূর্ণ আকার লাভ করিয়াছিল। তবে ১৫শ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির অক্ষরকেই পুরাপুরি বাংলা লিপি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরেও বাংলা অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা অক্ষর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবের ফলে বাংলা অক্ষরের আর-কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নাই।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বেও উত্তর-বিহার হইতে আসাম পর্যন্ত বাংলা অক্ষরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল; বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড়িয়া লিপিও বাংলা লিপি হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। প্রাচীনকালে উড়িষ্যার জনসাধারণ তালপত্রের উপর 'খুন্তি' নামক লোহার সূচীমুখ লেখনীর সাহায্যে অক্ষর লিখিতেন, 'সিদ্ধমাতৃকা' (অর্থাৎ সোজা সরল রেখার অনুরূপ মাত্রা) লিখিতে গেলে

তালপাতা ছিঁড়িয়া যাইত। তাই তাঁহারা 'বৃত্তমাত্রা' দিতেন; বৃত্তাকারে লেখার জন্য বাংলা অক্ষরের কোণগুলি ঢাকিয়া গিয়াছে। তাই বাহ্যতঃ ওড়িয়া অক্ষরকে বাংলা অক্ষর অপেক্ষা পৃথক্ মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ বাংলা অক্ষরের সহিত আধুনিক ওড়িয়া অক্ষরেরও গভীর সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন মৈথিলী পুঁথির অক্ষরের সহিত প্রাচীন বাংলা অক্ষরের কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না। পরে নাগরী অক্ষরের প্রবল প্রভাবে মৈথিলী অক্ষরের মধ্যে কিছু কিছু নাগরী-ছাপ পড়িয়াছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও মৈথিলী ভাষাভাষীরা যে অক্ষর ব্যবহার করিতেন, তাহাতে যুগপৎ বাংলা ও নাগরী অক্ষরের সংমিশ্রণ দেখা যাইত। কিন্তু অধুনা হিন্দীভাষা ও নাগরী অক্ষরের প্রচারের ফলে মৈথিলী অক্ষর লোপ পাইয়াছে।

গুটিকয়েক অক্ষর ভিন্ন সমস্ত বাংলা অক্ষরই আসামী ভাষায় রক্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, আসামী ভাষাকেও যেমন বাংলা ভিন্ন পৃথক্ কোন ভাষা বলিয়া গণ্য করা যায় না, সেইরূপ আসামী লিপিরও পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই। পূর্বী লিপির একমাত্র বংশধর বাংলা লিপি এখনও কখনও প্রত্যক্ষ-ভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে বাঙলার পূর্বে, পশ্চিম ও দক্ষিণে স্বীয় প্রভাব অব্যাহত রাখিয়াছে; কিন্তু একমাত্র আসাম ভিন্ন বাংলার বাহিরে আর কোথাও বাংলা লিপির প্রভাব নাই। রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হইলেও এখনও দুই বঙ্গে বাংলা লিপির অসপত্ন অধিকার।

॥ ২ ॥

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রায় সহস্রাব্দের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাষার মতো একটা সর্বাবয়বযুক্ত সর্ববিধ ভাবপ্রকাশক্ষম আধুনিক ভাষা বিশ্ববাণীর খাস-দরবারে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছে। এই হাজার বৎসরের মধ্য দিয়া নদীপ্রবাহের মতো প্রবাহিত হইয়া বাংলা ভাষা যে কিরূপ পরিবর্তনের শৈলমূলে আহত হইয়াছে, আবার দ্বিগুণ গতিবেগ লাভ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার পরিচয় বাংলা ভাষার গঠন প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে।

বাঙলা দেশের রাষ্ট্রিক সীমা কখনও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, কখনও-বা আততায়ীর উৎপাতে বারবার পরিবর্তিত হইলেও বাংলা ভাষার ভৌগোলিক

সীমা খুব বেশি পরিবর্তিত হয় নাই। খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশের অঞ্চলতল ত্যাগ করিয়া বাঙলার পশ্চিমে মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া, দক্ষিণে ওড়িয়া এবং উত্তর-পূর্বে অসমীয়া ভাষা স্বতন্ত্র প্রাদেশিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙলার বাহিরে, বিশেষতঃ প্রান্তীয় অঞ্চলে, সাহিত্যে না হইলেও, অন্ততঃ লোকজীবনে বাংলা ভাষার বিপুল প্রভাব ও প্রসার ছিল। আধুনিক কালে রাষ্ট্র-বিধাতাদের অমোঘ নির্দেশে বাঙলা দেশের মাটি দ্বিখণ্ডিত হইলেও বাংলা ভাষা এখনও এক এবং অবিভাজ্য। ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন স্বাদেশিক চেতনার প্রতি আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তখন হইতেই স্ব স্ব প্রদেশ ও ভাষার প্রতি নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল; ফলে, বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলে এবং বাঙলার রাজ্যসীমার বাহিরে বাংলা ভাষার বাচনিক প্রভাব ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বাঙলার পশ্চিম সীমায় সিংভূম মানভূম এবং উত্তর-পূর্ব সীমায় কাছাড়-গোয়ালপাড়া-শ্রীহট্টে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক অধিকার অব্যাহত আছে। আজ বাংলা ভাষার সীমা প্রধানতঃ বাঙলার রাষ্ট্রিক সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছে। বাঙলার বাহিরে যাহারা ঘরে-বাহিরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে রাষ্ট্রিক নির্দেশে বাহিরে অন্য ভাষা ব্যবহার করিতে হইতেছে। কালক্রমে তাহাদের ঘরের ভাষাও বদলাইয়া যাইবে এবং ঐ অঞ্চলে লোকজীবনে বাংলা ভাষার আর-কোন প্রভাব থাকিবে না। এখন বাংলা ভাষার সীমা সাধারণতঃ বিহার-বাঙলার সীমান্ত হইতে আসাম-পূর্ব-পাকিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং আধুনিক কবির ভাষায়—

দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই—

ইহা যেমন বাঙলা দেশের ভৌগোলিক সীমা, তেমনি বাংলা ভাষারও সীমা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন ॥ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে সর্বাগ্রে ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহার কারণ ভারতের প্রায় তাবৎ আধুনিক ভাষাসমূহ একই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। বাংলা ভাষার উৎসমূল খুঁজিতে গেলে

আমাদিগকে গহন-গভীর ভাষাতত্ত্বের জটিল আবর্তে বিমূঢ় হইয়া পড়িতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া (অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর) ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহের বিবর্তন চলিয়াছে; সেই বিবর্তন সম্বন্ধে 'নানা মুনির নানা মত'। ফলে, বাংলা ভাষা ও তাহার উৎসমূলের অভ্রান্ত সন্ধান হয়তো সব সময়ে নির্দেশ করা যায় না। তথাপি ভাষাতাত্ত্বিকগণের নানা যুক্তি মিলাইয়া বাংলা ভাষার উৎপত্তি রহস্যটিকে কথঞ্চিৎ সরল করা যাইতে পারে।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহকে একটি উৎসমূল হইতে উত্থিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ আধিপত্য করিতেছিল, কিন্তু সুগঠিত আর্যজাতির অনুপ্রবেশের ফলে দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিকভাষী নরগোষ্ঠীসমূহ কোথাও দুর্গম অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিল, কোথাও-বা আর্যজাতি ও আর্যভাষার সহিত মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিল। অবশ্য অস্তিত্ব যে একেবারে হারাইয়া যায় নাই, তাহার প্রমাণ—দ্রাবিড়গোষ্ঠীর তামিল, তেলুগু, মালায়ালী, কানাড়ী, ব্রাহুই এবং অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ডারী, ওরাঁও প্রভৃতি ভাষা এখনও জীবিত। তন্মধ্যে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষা শুধু জীবিত নহে, আর্যভাষার সমকক্ষ। অবশ্য সভ্যতায় পশ্চাদপদ অষ্ট্রিক জাতি যেমন ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ কোল, ভিল ভাষাসমূহেরও অগ্রগতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতগণের অনুমান আর্যগণ খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে প্রবেশ করেন। অবশ্য এই তারিখ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। বেদের টীকাকার যাস্কের 'নিরুক্তে'র আনুমানিক রচনাকাল ধরিলে আর্যজাতির ভারতে আগমন যে আরও বহুদূরবর্তী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকগণের মতটি এখানে উপস্থাপিত করিলাম। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টের জন্মের দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্বেই বোধহয় মধ্য য়ুরোপে আর্যজাতির আদিম শাখা বাস করিত। ভাষাতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞানে তাহারা ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতি নামে পরিচিত। ইহাদের এক শাখা য়ুরোপে, আর এক শাখা প্রথমে ইরাণে, পরে ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। আর্যভাষার বিভিন্ন শাখা—কেলতিক, ইতালিক, জার্মাণিক, গ্রীক,

বাল্‌তোস্লাভিক, আলবানীয়, আরমানীয়, হিট্টটী ও তুখারীয় এবং ইন্দো-ইরাণীয় ভাষা নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে হিট্টটী ও তুখারীয় ভাষা বহু পূর্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর্যভাষার অপর শাখা প্রথমে ইরাণে এবং পরে ভারতে প্রবেশ করে। ইহাই ভারতীয় আর্যভাষা এবং এই ভারতীয় আর্যভাষা হইতে ভারতের প্রায় অধিকাংশ ভাষা জন্ম লাভ করিয়াছে।

খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে এই আর্যজাতি পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয় এবং এক সহস্র বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতে (অন্ততঃ বিদেহ পর্যন্ত) প্রসৃত হয়। গোষ্ঠীবদ্ধ আর্যজাতির নিকট যেমন সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি হঠিয়া গিয়া দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আর্যভাষার বিপুল শক্তির নিকট দ্রাবিড় ও কোলগোষ্ঠীর ভাষাগুলিও কোথাও নতি স্বীকার করিয়া, কোথাও-বা দূরে দুর্গমে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল। অতঃপর দ্রাবিড়গোষ্ঠীর তামিল, তেলুগু, মালায়ালী ও কানাড়ী ভাষা যেমন দাক্ষিণাত্যে আপনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল, তেমনি উত্তরাপথে আর্যভাষা স্থানীয় ভাষারীতিকে গ্রাস করিয়া বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল।

বাংলা ভাষার ভূমিকাস্বরূপ ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। উত্তরাপথের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাকে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে ইন্দো-য়ুরোপীয় আর্যভাষা বলা হয়। খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে বা তাহার পূর্বে আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করিলে তাহাদের সহিত আর্যভাষাও প্রবেশ করিল এবং নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল। ইহার তিনটি স্তর—প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক-সংস্কৃতের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ), মধ্যভারতীয় আর্য্য-ভাষা বা প্রাকৃত অপভ্রংশের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ ১০০০ অব্দ) এবং নব্য ভারতীয় আর্যভাষা বা প্রাদেশিক ভাষার যুগ (খ্রীঃ ১০০০ অব্দের পর হইতে আধুনিক কাল)।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ॥ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলিতে বৈদিক বা ছান্দস্‌ ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা—উভয়কেই নির্দেশ করা হয়। বৈদিক ভাষা তৎকালীন আর্যদের ব্যবহৃত ভাষার একটা সাহিত্যিক রূপ

বলিয়া পরিগণিত। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ এবং পরবর্তী কালের বৈদিক সাহিত্য এই বৈদিক বা ছান্দস্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতের ব্যাকরণ অপেক্ষা ভিন্নতর, স্থানে স্থানে অতিশয় জটিল। আর্যগণ ইরাণ ত্যাগ করিয়া যখন ভারতে উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহারা ইরাণীয় আর্যভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারেন নাই। তাই ঋক্‌সংহিতার কোন কোন অংশের সহিত প্রাচীন ইরাণী ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

আর্যগণ যজ্ঞীয় কার্য ও মন্ত্রাদিতে ছান্দস্ ভাষা ব্যবহার করিলেও লৌকিক কাব্য কাহিনীতে এই পবিত্র ভাষা ব্যবহার করিতেন না। গল্প, আখ্যান, কাব্যচর্চা প্রভৃতির জন্য আর-একটি ভাষা ব্যবহৃত হইত, ইহাই সংস্কৃত ভাষা। পরবর্তী কালের কাব্য-মহাকাব্য, নাটক, গদ্যকাব্য, পুরাণ, স্মৃতি-সংহিতা, দর্শন-তর্কবিদ্যা প্রভৃতিতে এই ভাষারই একচ্ছত্র আধিপত্য। খ্রীঃ পূঃ ৭ম-৬ষ্ঠ শতকে (আনুমানিক) পাণিনি এই ভাষারই মার্জিত অর্থাৎ সংস্কৃত-রূপ নির্মাণ করেন এবং এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে 'সংস্কৃত ভাষা' বা purified speech। প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া পাণিনি আট অধ্যায়ে বিভক্ত যে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহার বিধিবিধান অদ্যাপি শিষ্টসমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় নানা আঞ্চলিক ভাষারও প্রভাব পড়িয়াছে।

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা শিষ্টসমাজে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আরও একটি 'অসংস্কৃত' আর্যভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। প্রকৃতি অর্থাৎ সাধারণ মানুষ বৈদিক ভাষা বা সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিন নিগড় মানিতে চাহিত না। তাহারা অবৈয়াকরণ ভাষায় গল্পগাথা পাঠ বা রচনা করিত। এই ভাষাটি প্রায় মৌখিক ভাষার পাশাপাশি চলিত। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ আচার্যগণ এই অসংস্কৃত ও ব্যাকরণদুষ্ট ভাষায় ধর্মোপদেশ দান করিতেন। ইহাকে 'গাথার ভাষা' বা 'বৌদ্ধসংস্কৃত' বলা হইত। পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বিবর্তনে এই গাথার ভাষার প্রভাব পড়িয়াছিল।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা॥ খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের দিকে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং জনসাধারণের মুখের

ভাষা ক্রমেই সাহিত্যের পংক্তিভোজে আহূত হইল। এই সময় হইতে আর্যভাষা দ্বিতীয় স্তর বা পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের পর্যায়ে উপনীত হইল। এই মধ্যস্তর (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীষ্টীয় ১০ ০ অব্দ) সাধারণতঃ 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হইলেও, এই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আদিভারতীয় আর্যভাষার যে কী বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা এই স্তরপরম্পরাগুলি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে অন্ততঃ চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

এই চারিটি স্তরের নির্দেশ: পালি (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ২০০), খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাকৃত লিপিলেখ (খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীষ্টীয় ২০০), নাটক ও কাব্যের প্রাকৃত (খ্রীঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০) এবং অপভ্রংশ (খ্রীঃ ৬০০—১০০০ অব্দ)।

পালি বলিতে অশোক-অনুশাসন ও বুদ্ধদেবের উপদেশ-সম্বলিত বিপুল পালি সাহিত্যকেই নির্দেশ করা হইয়া থাকে। পালিভাষা ঠিক জনসাধারণের মুখের ভাষা নহে। শৌরসেনী ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া এই সাহিত্যিক পালিভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও উচ্চারণের জটিলতা জনসাধারণের মুখে পড়িয়া বিকৃত হইতে আরম্ভ করে, এই বিকৃতির অর্থ—ভাষার সরলতা। জনসাধারণের বিকৃত ভাষাকে যথাসম্ভব ব্যাকরণের নিয়মে বাঁধিয়া পালিভাষার জন্ম হইল। সুতরাং পালিভাষা কেন, মধ্যস্তরের কোন পর্যায়ের ভাষাকেই (পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ) কথ্যভাষা বলা যায় না; সবগুলিই সাহিত্যে ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা।

পালি ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী আর-একটি স্তর (খ্রীঃ পূঃ ২০০—খ্রীঃ ২০০) পরিকল্পিত হইয়াছে। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ এই ভাষায় রচিত কতকগুলি পুরাতন প্রাকৃত লিপিলেখ পাওয়া গিয়াছে। এই স্তরের বিশেষ কোন সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত নাই, ধ্বনিতত্ত্বগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন ইহাতে পালি অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোন মৌলিক পরিবর্তনও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই স্তরকে তাই অন্তর্বর্তিকালীন স্তর (Transitional stage) অর্থাৎ পালি ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী স্তর বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

মধ্যস্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, বিপুলপ্রসারী ও সাহিত্য-গুণান্বিত পর্যায় হইল প্রাকৃত ভাষা (খ্রীঃ ২০০—খ্রীঃ ৬০০)। প্রাকৃত বলিতে

অবশ্য পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ—এই তিনটি স্তরকেই বুঝাইয়া থাকে; তবু 'প্রাকৃত' শব্দটি সঙ্কুচিত হইয়া কেবল সাহিত্যে (কাব্য, নাট্য) ব্যবহৃত প্রাকৃতকেই নির্দেশ করিয়া থাকে। সংস্কৃত নাটকে কোন কোন চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। কোন্ শ্রেণীর চরিত্র কিরূপ প্রাকৃত ব্যবহার করিবে নাট্যশাস্ত্রে তাহার নির্দেশ আছে। নাটক ছাড়াও পুরাপুরি প্রাকৃতে রচিত অনেক কাব্য এবং প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ একদা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণগণ অঞ্চলভেদে এই ভাষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন: মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও অর্ধ-মাগধী। ইহা ছাড়াও পৈশাচী প্রাকৃতের কথা শুনা যায়; গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' নাকি পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। 'বৃহৎকথা' পাওয়া যায় নাই বলিয়া পৈশাচী প্রকৃতের স্বরূপও জানা যায় না। এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের মধ্যে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতকেই মূল প্রাকৃত বলিয়া ব্যাকরণকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রাকৃত বোধহয় কাব্যকবিতাতেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইত। গাথাসপ্তশতী, সেতুবন্ধ বা রাবণবধ, গৌড়বহো প্রভৃতি—সমস্ত প্রাকৃতকাব্য ও প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ সুমধুর মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। আধুনিক মারাঠী ভাষা এই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের বংশধর।

শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের উপভাষার উপর ভিত্তি করিয়া যে প্রাকৃত ভাষাটি পরিকল্পিত হইযাছে, তাহাই শৌরসেনী প্রাকৃত। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত যেমন কোন কোন দিক দিয়া বৈদিক ভাষার অনুগামী, শৌরসেনী প্রাকৃতও ঠিক তেমনি সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠতর সূত্রে সম্পৃক্ত। সংস্কৃত নাটকে উচ্চ শ্রেণীর মহিলারা শৌরসেনী ব্যবহার করিতেন। আধুনিক হিন্দুস্থানী বা পশ্চিমা হিন্দী ও মথুরা অঞ্চলের 'ব্রজ্‌ভাখা' এই শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে অপভ্রংশের পর্যায় পার হইয়া নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

মগধ অর্থাং প্রাচ্য ভারতের কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপের নাম মাগধী প্রাকৃত। প্রাকৃতসমূহের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতই অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত; সংস্কৃত নাটকে ইতর শ্রেণীর চরিত্র মাগধী প্রকৃত ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। এই অঞ্চলের প্রতি উন্নাসিক মনোভাবের জন্য প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ এবং সংস্কৃত নাট্যকারগণ মাগধী প্রাকৃতকে কিছু হীনচক্ষে দেখিতেন; ফলে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত সামান্য অংশ ভিন্ন মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ

কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। পূর্বাঞ্চলের কথিত ভাষাসমূহের (বাংলা, আসামী, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া) আকর হইল এই মাগধী প্রাকৃত।

অর্ধ-মাগধী জৈনদের শাস্ত্রগ্রন্থ ও কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই ইহাকে জৈন-মাগধীও বলা হইয়া থাকে। পূর্বী হিন্দী বা 'আওধি' (<অবধী) এই জৈন-মাগধী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' এই অর্ধ-মাগধীর আধুনিক রূপ 'আওধি' ভাষায় অর্থাৎ পূর্বী হিন্দিতে রচিত। বহু জৈন কবি এই অর্ধ মাগধী ভাষায় অনেক কাব্যকবিতা রচনা করিযা-ছিলেন ; তবে তাহাতে শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রীর প্রভাব অধিক মাত্রায় দেখা যায়। তাই ইহাকে জৈন শৌরসেনী ও জৈন মাহারাষ্ট্রী বলা হয়।

পালি অপেক্ষা প্রাকৃতে ব্যাকরণ ও উচ্চারণের নিয়ম আরও সরল হইল বটে, কিন্তু এই স্থলেই পরিবর্তনের স্রোত থামিয়া রহিল না, সরলী-করণের প্রবাহ প্রাকৃত পর্যায় ত্যাগ করিয়া অপভ্রংশ পর্যায়ে (খ্রীঃ ৬০০—১০০০ অব্দ) উপনীত হইল। এই অপভ্রংশ পর্যায়ে ভাষার নিয়ম আরও শিথিল হইয়া পড়িল, জনসাধারণের মুখের ভাষা প্রাকৃতকে আরও সরল করিয়া ফেলিল ; ফলে প্রাকৃতের স্তর ভেদ করিয়া অপভ্রংশের সৃষ্টি হইল। এই অপভ্রংশ হইতেই আধুনিক বা নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হইল। ভাষাচার্যগণ অনুমান করেন যে, বিভিন্ন প্রাকৃত হইতে বিভিন্ন অপভ্রংশের আবির্ভাব হয়। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত হইতে মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ, শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে শৌর-সেনী অপভ্রংশ এবং মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের জন্ম হইয়াছে। অপভ্রংশ স্তরে ভাষা-পরিবর্তন আরও অগ্রসর হইয়া নব্যভারতীয় ভাষা-সমূহের নীড় রচনা করিল। অবশ্য একমাত্র শৌরসেনী অপভ্রংশ ভিন্ন অন্য কোন অপভ্রংশে রচিত বিপুলায়তন কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। শৌরসেনী প্রাকৃত একদা ভারতবর্ষের শিষ্টজনের সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং অপভ্রংশের যুগে কেবল শৌরসেনীরই বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল এবং ইহারই যা-কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই স্তরে সব সময়ে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের সীমারেখা রক্ষিত হয় নাই, অপভ্রংশে রচিত অনেক শ্লোকের মধ্যে প্রাকৃত স্তরেরও কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায়। নব্যভারতীয় আর্যভাষার যুগেও শৌরসেনী অপভ্রংশের একটি

বিকৃত রূপ বিহার অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, ইহার নাম 'অবহট্ট'। এই অবহট্ট ভাষাতেই বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' রচনা করিয়াছিলেন। অপভ্রংশ যুগের (খ্রীঃ ৬০০—১০০০) শেষ দিকে অপভ্রংশের নির্মোক হইতে নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম হইল। নব্য ভারতীয় ভাষার আদিম স্তরেও অপভ্রংশের প্রচুর প্রভাব বর্তমান ছিল, তারপর নব্যভারতীয় ভাষাসমূহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইলে অপভ্রংশের ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নগুলি কোথাও পরিবর্তিত হইয়া নব্যভারতীয় আর্যভাষার সহিত মিশিয়া গেল, কোথাও বা লোপ পাইল।

কেমন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা আলোচনা করিলেই এই ক্রমিক পরিবর্তনের ধারা উপলব্ধি করা যাইবে। অবশ্য ভাষাতাত্ত্বিকগণ পরিবর্তনের পুরাপুরি ইতিহাস এখনও উদ্ধার করিতে পারেন নাই, ভাষা-বিবর্তনের অনেকটা এখনও ভাষাতাত্ত্বিককে কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ পর্যায়ে একটি আধুনিক বাংলা ছত্রের কি রূপ হইতে পারিত, তাহার আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রয়োজনের জন্য একটি সুপরিচিত আধুনিক পংক্তিকে ("গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে॥") তিনি ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক নিয়মাবলী প্রয়োগে ইহার এইরূপ পরিবর্তন কল্পনা করিয়াছেন :

১। গান গেয়ে না' বেয়ে কে আসে পারে।
দেখে যেন মনে হয় চিনি ওরে॥ (আধুনিক বাংলা)

২। গান গায়্যা নাও বায়্যা কে আস্থে পারে।
দেখ্যা জেন্অ মনে গোএ চিনী ওআরে॥
(মধ্যযুগের বাংলা—আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ অঃ)

৩। গান গাহিআ নাব বাহিতা কে আহশই পারহি।
দেখিআ জৈহণ মনে হোই চিণ্হিঅই ওহারহি॥
(প্রাচীন বাংলা—আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ অঃ)

৪। গাণ' গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ কই আবিশই পারহি।
দেক্‌খিঅ জইহণ' মণহি হোই, চিন্‌হিঅই ওহরহি ॥
(মগধী অপভ্রংশ—আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ অঃ)

৫। গাণং গাধিঅ নাবং বাহিঅ কগে আবিশদি পালধি।
দেক্‌খিঅ গাদিশণং মনধি হোদি চিণ্‌হিঅদি অমুশ্‌শ কলধি ॥
(মাগধী প্রাকৃত—আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ অঃ)

৬। গানং গাথেত্বা নাবং বাহেত্বা ককে আবিশতি পালধি।
দেকখিত্বা যাদিশং মনধি হোতি চিন্‌হিয়তি অমুশ্‌শ কতে ॥
(আদিযুগের প্রাচ্য প্রাকৃত—আঃ ৫০০ খ্রীঃ পূঃ)

৭। গানং গাথয়িত্বা নাবং বাহয়িত্বা ককঃ আবিশতি পারধি।
দৃক্ষিত্বা যাদৃশম্, মনোধি ভবতি চিহ্ন্যতে অমুষ্য কৃতে ॥
(বৈদিক—আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ পূ.)

বলা বাহুল্য, এই রূপ-পরিকল্পনা ভাষাতাত্ত্বিকের কল্পনাপ্রসূত, অবশ্য ইহার পশ্চাতে ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। ইহার দ্বারা কল্পনা করা যায় যে, কীভাবে বৈদিকভাষা ক্রমিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরের পরিবর্তনের পর আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বাংলা ভাষার পরিবর্তন ॥ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে (আঃ ৯৫০ খ্রীঃ অঃ) হইতে নব্যভারতীয় আর্য-ভাষাসমূহ অপভ্রংশের ছায়াতল ত্যাগ করিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে পশ্চিমা হিন্দী (ইহার উপভাষা 'ব্রজ ভাখা'), মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ হইতে মারাঠী এবং মাগধী অপভ্রংশ হইতে পূর্ব-ভারতের ভাষাসমূহ (বাংলা, আসামী, ওড়িয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া) জন্মলাভ করিয়াছে। অবশ্য মাহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশের বিশেষ কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তথাপি শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে পশ্চিমা হিন্দীর বিবর্তনের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে মাহারাষ্ট্রী ও মাগধী অপভ্রংশ হইতে ঐ অঞ্চলের নব্য ভাষাসমূহের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। অনুমান ১০ম শতাব্দীর পূর্বে উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতে কোন প্রাদেশিক ভাষার আবির্ভাব হয় নাই।

বাংলা ভাষার বিবর্তন আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা নানা

পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার বিপুল পুঁথিসাহিত্য হইতে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারা বেশ লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যন্ত ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন বাংলা পুঁথি পাওয়া যা' নাই। তথাপি চর্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পংক্তির উদাহরণ দিয়া বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস নির্দেশ করা যাইতেছে :

১। অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ আপনা ॥
অম্ভে ন জাণঁহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসন হোই ॥

(চর্যাগীতিকা—১০ম ১২শ শতাব্দী)

২। এ ধন যৌবন বড়াযি সবঈ আসার ॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাযিবোঁ [মো]যে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—১৪শ-১৫শ শতাব্দী)

৩। হাসিয়া চলিলা রাম কমললোচন।
মাএর অন্তপুরে গিযা দিলা দরশন ॥
রামদরশনে রাণি মনে বড় শুখি।
রাণি বলে বাপু আজি বড় হাসি দেখি ॥ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ,
১৭শ শতকের পুঁথি, ক. বি পুঁথি সংখ্যা—২৪৯৬)

৪। জাদব কহেন সুন আমার বচন
প্রহার করিবে মোরে কিসের কারণ ॥
দূত কহে সুন যাদব কহিএ তোমারে।
ঠাকুর লোচন কহি ছাড্যাছে তোমারে ॥ (উদ্ধব দাসের ব্রজমঙ্গল, ১৮শ
শতাব্দীর পুঁথি, ক. বি পুঁথি সংখ্যা—১০২২)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টিমুহূর্তে বাংলা ভাষা অপভ্রংশের নিকটবর্তী ছিল বলিয়া উহাতে এ অঞ্চলের ভাষাব সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। ক্রমে যতই কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, ততই অপভ্রংশের প্রভাব লোপ পাইয়া বাংলা ভাষার স্বরূপ-লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চযাপদের ভাষা আধুনিক পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দুর্বোধ্য না হইলেও একটু অপরিচিত। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৭শ শতকেব

পুঁথি) এবং উদ্ধব দাসের ব্রজমঙ্গলের (১৮শ শতকের পুঁথি) ভাষা আধুনিক পাঠকের নিকটেও অতিশয় সুবোধ্য।

ভাষার বিকাশ হিসাবে বাংলা ভাষাকে প্রধানতঃ চারিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : প্রাচীন যুগ (খ্রীঃ ১০০০—১৩০০ অব্দ), মধ্যযুগের প্রথম পর্ব (১০ম-১৫শ শতাব্দী), মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব (১৬শ—১৮শ শতাব্দী) এবং আধুনিক যুগ (১৯শ শতাব্দী—বর্তমান যুগ)।

প্রাচীন বাংলা ভাষা ॥ প্রাচীন বাংলা ভাষার মৌলিক নিদর্শন খুব বেশি নাই। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ১২শ শতাব্দীর শেষভাগের মধ্যে নিঃসংশয়রূপে বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে একমাত্র চর্যাগীতিকা ; এতদ্ব্যতিরিক্ত ঐ যুগে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার লিখিত রূপের যৎসামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে অনেকগুলি দেশীয় স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে; ঐ নামগুলিতে প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন আছে। অবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্থানীয় নামগুলিকে যথাসাধ্য সংস্কৃতায়িত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি যে প্রাচীন বাংলা শব্দ তাহাতে সন্দেহ নাই। বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দ ১১৫৯ খ্রীঃ অব্দে অমরকোষের 'টীকাসর্বস্ব' নামক যে-টীকা রচনা করেন তাহাতে তিন শত দেশী শব্দের উদাহরণ আছে। এই তিন শত শব্দের অধিকাংশই বিশুদ্ধ বাংলা, অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক বৌদ্ধ-সহজিয়া পদাবলীর ভাষাতে প্রাচীন তথা আদিযুগের বাংলা ভাষার যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিতগণের অনুমান, চর্যাপদগুলি খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে, কাহারও-বা মতে ইহার রচনাকাল ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত পিছাইয়া যাইতে পারে। সে যাহা হউক, চর্যার মধ্যে যে প্রাচীনতম বাংলা—শুধু বাংলা নহে, প্রাচীনতম প্রাদেশিক ভাষা-বিবর্তনের প্রথম স্তর পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।[১] ভাষাতে অপভ্রংশ, এমন কি প্রাকৃতের চিহ্ন বর্তমান থাকিলেও বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র মর্যাদার প্রথম প্রকাশ হইয়াছে চর্যাপদে। অবশ্য ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশের ছাপ আছে, দুই-চারিটি মৈথিলী-ওড়িয়া শব্দও আছে, তথাপি ইহার মূল কাঠামো ও

[১] চর্যাপদের রচনাকাল ও ভাষা লইয়া পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

শব্দসম্ভার—সমস্তই বাংলা ভাষার প্রাথমিক যুগের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করিতেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা ॥ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার সীমা। এই ছয় শত বৎসর ধরিয়া চর্যাপদের আদিম বাংলা ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ভারতচন্দ্রের মধ্যে মার্জিত, সুবিহিত, পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের শেষ লেখক ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে বাংলা ভাষার মধ্যযুগীয় রূপের চূড়ান্ত বিবর্তন হইয়াছে। এই বিবর্তনের মূলে নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও বা প্রকাশ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বজ্রযান ও সহজযান বৌদ্ধ আচার্যগণ দেবভাষা ত্যাগ করিয়া অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় সাধনভজন ও দর্শনগ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত-প্রাকৃতের ভস্মস্তূপ হইতে বাংলা ভাষাকে নূতনরূপে সৃষ্টি করেন। তাহার পর হইতে আধুনিক ভাষায় রচনাকার্য আরম্ভ হইল এবং দেবভাষা ক্রমে ক্রমে দেবলোক লাভ করিল।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বিবর্তন-ইতিহাস আলোচনা করিলে তিনটি স্পষ্টতর রূপ লক্ষ্য করা যাইবে। অন্তর্বর্তী যুগ (খ্রীঃ ১২০০-১৩০০ অব্দ), মধ্যযুগের আদিপর্যায় (১৪শ-১৫শ শতাব্দী) এবং অন্ত্যপর্যায় (১৬শ—১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)।

যদিও ১৪শ বা ১৫শ শতকের একেবারে প্রারম্ভে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, তথাপি চর্যাপদ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার পূর্ব পর্যন্ত (১৩শ-১৪শ শতাব্দী) বাংলা ভাষা নিশ্চয় স্থবির হইয়া ছিল না, এবং চর্যাপদ হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছিল। কারণ চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী আরও একটি ভাষা-স্তর ছিল, যাহার কোন সাহিত্যিক বা ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা শুধু এই একখানা সঙ্কলনগ্রন্থে বন্দী হইয়া থাকিল, তাহার আর বিকাশ হইল না—ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে

পারে যে, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী স্তবেও বাংলা ভাষা পরিবর্তনেব মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল—শুধু তাহার কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা যায় নাই। তুর্কী আক্রমণের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্যই বোধহয় এই দেড়শত বৎসরের বাংলা ভাষার কোন লিখিত রূপেব সন্ধান পাওযা যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, নাথ সাহিত্যেব অন্তর্ভুক্ত গোপীচন্দ্রের গল্পকাহিনী, নাথগুরু গোরক্ষনাথের অলৌকিক আখ্যান, মঙ্গলকাব্যের আদিম স্তব অর্থাৎ চণ্ডী, মনসা ধর্মমঙ্গলেব পাঁচালী আকারের অপবিণত রূপ প্রভৃতি এই কালে রচিত হইয়া থাকিবে। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন শূন্যপুবাণ, নাথসাহিত্য, ডাক ও খনার বচনকে ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে স্থান দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত কাহিনী এবং লোকমুখে শ্রুত আখ্যানগুলিকে আধুনিক যুগে যে আকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই প্রাচীন বলা যায় না। একথা অবশ্য স্বীকার্য, এই অন্তর্বর্তিকালেও অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কিন্তু কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই যুগেব বাংলা ভাষাব কোন প্রমাণ দেওযা সম্ভব নহে।

মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার আদি স্তবের (খ্রীঃ ১৩০০-১৪০০ অব্দ) সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গিযাছে বলিয়া এই যুগে বাংলা ভাষার ক্রমিক বিবর্তনের ধাবা অনুসরণ কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। বড়ু চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মালাধব বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কৃত্তিবাসেব বামায়ণ পাঁচালী, কবীন্দ্রপবমেশ্বর-শ্রীকবনন্দীর মহাভারত পাঁচালী, নারায়ণদেব বিপ্রদাস বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলকাব্য, মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি এই স্তবেব রচনা।[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ভাষাই এই স্তবেব আদিম নিদর্শন। ইহা ১৪শ শতাব্দীতে বচিত হওয়াও অসম্ভব নহে; কাবণ ইহাব ভাষার মধ্যে চর্যার যুগেবও কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়াছে। শব্দযোজনা ও ব্যাকবণেব অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ধবিয়া ইহাব প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পুঁথিগুলিব ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, ভাষার প্রাচীন লক্ষণও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। এই যুগের ভাষা দেখিয়া

২ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের পুঁথিগুলি অনেক পরবর্তিকালের বলিয় প্রাপ্ত পুঁথির ভাষাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

মনে হয় যে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের উপভাষাই সাহিত্যে স্থান পাইতেছিল। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বাহুল্য এই যুগের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরের (১৬শ-১৮শ শতাব্দী) ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় বিচিত্র। এই যুগে ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন আরও অগ্রসর হইয়াছে; চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা ভাষার প্রাণৈশ্বর্য ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল, এবং এই দুই শত বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার পূর্ণরূপ সুপরিস্ফুট হইল। প্রচুর তৎসম শব্দপ্রয়োগে লৌকিক বাংলা ভাষার মধ্যে একটা ক্লাসিক গৌরব আরোপিত হইল এবং ভাষার মূল কাঠামো পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইল। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের পুঁথিতে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব থাকিলেও তাহার পদান্বয়, শব্দভাণ্ডার ও বাচনভঙ্গিমা পশ্চিম-বঙ্গীয় রীতিকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে বাংলা ভাষার উপর আরবী ও ফারসীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৭শ শতাব্দী হইতেই আরবী-ফারসী শব্দসম্ভার শাসনকার্য, সমাজজীবন ও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে ব্রজবুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে।[৩] খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর দৌত্যে ব্রজবুলি বৈষ্ণবসমাজে একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষারূপে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুধু বাঙলা দেশেই নহে, উড়িষ্যা ও আসামেও ব্রজবুলি বৈষ্ণবপদের ভাষা হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে মৈথিলী ও বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এই কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হয়। ১৯শ শতকেও আধুনিক শিক্ষাভিমানী বাঙালী লেখক রুচির বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে ব্রজবুলিতে সামান্য কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গোস্বামীদের দ্বারা বৃন্দাবনের সহিত বাঙালীর পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া এই যুগের ভাষায় অল্পস্বল্প পশ্চিমা হিন্দী (অর্থাৎ 'ব্রজ্‌ভাখা' বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের উপভাষা) শব্দের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজ মিসনারীরা রোমান হরফে বাংলা গদ্যপুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহার কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিতে থাকে। কতকগুলি পর্তুগীজ শব্দ আবার আকার-আয়তন পাল্টাইয়া বাংলা ভাষার সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পিতৃপরিচয় আজ খুঁজিয়া

৩ বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

পাওয়া দুষ্কর। ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে কিছু কিছু ইংরাজী শব্দও শাসনকার্য ও বাণিজ্যাদির জন্য বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করিতেছিল। স্বয়ং রামপ্রসাদ তাঁহার শাক্তগীতে আইন ও মামলা-সংক্রান্ত কয়েকটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অন্তিমে রাজকার্যাদিতে বাংলা গদ্যের কুণ্ঠিত প্রবেশ লক্ষণীয়। অবশ্য ১৬শ শতাব্দী হইতেই চিঠিপত্র, দলিল, দস্তাবেজ প্রভৃতিতে বাংলা গদ্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সঙ্কেতপূর্ণ সাধনপ্রণালী-বিষয়ক 'কড়চা' গ্রন্থগুলিতে বাংলা গদ্যই ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন বাংলা গদ্যের ছাঁদটি আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রায় অনুরূপ ; প্রধানতঃ শাসনকার্য ও চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহাতে ফারসী শব্দের কিছু বাহুল্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু পদান্বয়ের দিক দিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা গদ্য ১৯শ শতকের বাংলা গদ্যের অনাত্মীয় নহে।

আধুনিক বাংলা ভাষা ॥ ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের সূচনা এবং এখনও পর্যন্ত এ ভাষা অল্পাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা ভাষাব একটা স্থায়িরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহাতেও অল্প-স্বল্প পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর বাংলা ভাষার মৌলিক বৈশিষ্ট্য—বাংলা গদ্যের বিপুল প্রসার। এই বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে কিছু ইসলামী প্রভাব, কিছু সংস্কৃত প্রভাবের জড়তা ছিল। বিশেষতঃ ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে পুরাতন ধরণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হইত। পদান্বয়ের মধ্যেও সংস্কৃত বাক্যবিন্যাস ও সমাস-সন্ধির গুরুভার সহজেই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এইজাতীয় সংস্কৃত প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা গদ্যের একটা স্থায়িরূপ দাঁড়াইয়া যায়। কলিকাতা অঞ্চলের চলতি বুলিও সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করে। বলা বাহুল্য, এই যুগে সাহিত্যের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইত। এখনও শুধু সাহিত্যের ভাষায় নহে, দৈনন্দিন আলাপা-দিতেও ইংরাজী শব্দ কোথাও অবিকৃতরূপে, কোথাও বা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার বিবর্তন যে

সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যে-কোন প্রাণবান্ ভাষার কখনও একটা অপরিবর্তিত স্থায়িরূপ থাকে না, নানা কারণে নিয়তই তাহার কিছু না-কিছু পরিবর্তন হইতেছে। যে ভাষার এইরূপ পরিবর্তন হয় না, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এখনও বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার ও বাক্যবিন্যাস-পদ্ধতিতে নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক সাহিত্যের মারফতে এবং সংবাদ-পত্রের সাহায্যে হিন্দী ও উর্দু ভাষার কোন কোন শব্দ এখন আমাদের ঘরের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায়, যে-পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার উপর আধুনিক সাহিত্যিক বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা, তাহাতেও কিছু কিছু পূর্ববঙ্গীয় বাগ্‌ধারা ও ভাষা-প্রয়োগরীতি প্রবেশ করিতেছে। পূব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষাতে উর্দু-ফার্সীর অত্যধিক প্রভাবে অল্পকালের মধ্যেই আসামী ভাষার ন্যায় ইস্‌লামী-প্রভাবান্বিত আর-একপ্রকার বাংলা ভাষা গড়িয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অনুমান হইতেছে আগামী বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা 'পাক-বাংলা ভাষা' নাম লইয়া কোন কোন দিক দিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলাভাষা হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। পাক-বাংলা ভাষায় ইসলামী 'তমদ্দুন'-সংক্রান্ত শব্দাবলী অনেক পূর্ব হইতেই প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমে দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার ভাষাতেও ফার্সী-উর্দু ভাষা অত্যধিক পরিমাণে প্রবেশ করিবে। অবশ্য এখন পাকিস্তানের বাংলা-ভাষানুরাগী সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

সাধু, চলিত ও উপভাষা॥ অঞ্চলভেদে এবং ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য অনুসারে বাঙলা দেশে অন্ততঃ চারিটি উপভাষা আছে—রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ (পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ) এবং কামরূপ (উত্তর-পূর্ববঙ্গ)। এই চারিটি অঞ্চলের উপভাষা যদিও মূল বাংলা ভাষা হইতে উত্থিত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে শব্দসম্ভার, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবং বাক্যগঠনে রীতিমত পার্থক্য আছে। রাঢ়ের একজন কৃষক বঙ্গের (ত্রিপুরা, নোয়াখালী চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরবর্তী পূর্বাঞ্চলের) কৃষকের কথা বুঝিবে না। এই যে পার্থক্য, ইহার প্রধান কারণ শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব নহে, ইহার মূল নিহিত রহিয়াছে উভয় শ্রেণীর পৃথক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। রাঢ়ভূমির অন্তর্গত মানভূমের

কৃষক প্রধানতঃ কোলগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত, এবং মৈমনসিংহের কৃষক 'বোডো' গোষ্ঠী (তিব্বত-ব্রহ্মী) হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।[৪] নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যের জন্য ভাষার মধ্যেও পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। চারিটি উপভাষার মধ্যে 'বঙ্গে'র (পূর্ববঙ্গ) কথ্যভাষাই নানা দিক দিয়া অন্য তিনটি উপভাষা হইতে বিশেষ পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে।

উপভাষাগুলির আবির্ভাবের মূলে আরও কারণ বর্তমান। বাঙলা দেশে বৃত্তি হিসাবে নানা শ্রেণী আছে; প্রত্যেক বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ভাষা-ভঙ্গিমা রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কৈবর্ত বা ধীবরেরও একটা পৃথক্ ভাষারীতি আছে। উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণও আরও একটু মার্জিত ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। প্রাচীনকাল্ হইতে সারা বাঙলা দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর জনসমষ্টি জীবিকার তাড়নায় এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে গতায়াত করিত। জীবিকার প্রয়োজনে বা অন্য কারণে শিক্ষিত সমাজ পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গে, এবং পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে গমনাগমন করিত। কাজেই এক উপভাষায় অন্য উপভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। যে অঞ্চলগুলি একাধিক উপভাষার সীমান্তে অবস্থিত, সেখানে নানা ধরণের উপভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। পশ্চিম-যশোহর, দক্ষিণ-ফরিদপুর, পূর্ব-নদীয়া, পশ্চিম-খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে রাঢ় ও বঙ্গ উভয় অঞ্চলের উপভাষার যুগপৎ ছায়া পড়িয়াছে। ক্রমে নিম্নবঙ্গের পশ্চিম ভাগ এবং পূর্বরাঢ়ের শিষ্টজনের উপভাষার উপর ভিত্তি করিয়া সাহিত্যিক ভাষা প্রাধান্য পাইয়াছে এবং নদীয়া হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত উপভাষাই শিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই সমস্ত উপভাষায় একদা নিশ্চয়ই সাহিত্য রচিত হইয়াছিল; পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায় রচিত কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন ও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উপভাষার পৃথক্ সত্তা সত্ত্বেও সমগ্র বাঙলা দেশে বহু পর্ব হইতে একটা সর্বজন-ব্যবহার্য সাহিত্যিক ভাষা চলিয়া আসিতেছে এবং ইংরাজ আমলে মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সেই সাহিত্যিক ভাষাটি যে-কোন উপভাষা-অঞ্চলে সমান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই উপভাষাগুলিতে কিছু কিছু ছড়াপাঁচালী জাতীয় লোকসাহিত্য ছাড়া অন্য কোন সাহিত্যিক নিদর্শন

৪ পৃথক জাতি ও জীবনধারণ-প্রণালীর পার্থক্যের জন্য ভাষারীতির মধ্যেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আসিতে পারে।

পাওয়া যায় না, সাহিত্যকর্মে অনুশীলিতও হয় না। উপন্যাস নাটকে বাস্তবতা-সঞ্চার এবং স্থানীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আঞ্চলিক ভাষার সামান্য প্রয়োগ আছে মাত্র। কিন্তু পুরাপুরি উপভাষায় পূর্ণাঙ্গ রচনায় কেহই উৎসাহ বোধ করেন না।

বাঙলায় অন্ততঃ চারিটি উপভাষা থাকিলেও সাহিত্যের ভাষা প্রধানতঃ দুইটি—সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা। অতি প্রাচীনকাল হইতে মূলতঃ গৌড়ীয় ভাষার (অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের) উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাহিত্যিক ভাষা সেকালের কবিদের মধ্যে একপ্রকার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। কেমন করিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা সেই গৌরব অর্জন করিল, তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের জন্যই বোধহয় এই অঞ্চলের ভাষা সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করিয়া থাকিবে। এমন কি পূর্ববঙ্গের কবিগণও কাব্যরচনাকালে (নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, মাধব আচার্য, দ্বিজরামদেব,[৫] দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি), কিছু কিছু স্থানীয় শব্দ গ্রহণ করিলেও মূল কাঠামোটি পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিক ভাষার উপর উপস্থাপনা করিয়াছিলেন। প্রাগ্‌ ব্রিটিশ যুগে যে কয়খানি গদ্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতি লক্ষ্য করা যায়। মানোএল দা-আসসুম্প-সাঁও-প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং দোম আন্তোনিও-রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থ দুইটি ঢাকা অঞ্চলে বসিয়া লিখিত; ইহাতে, বিশেষতঃ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' কিছু কিছু পূর্ববঙ্গীয় শব্দ থাকিলেও মূল ভাষাটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গদ্যের পুঁথির ভাষার অনুরূপ। 'ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদে' পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে।[৬] পরবর্তী কালে সারা বাঙলা দেশে যে সাহিত্যিক ভাষা একমাত্র ব্যবহার্য ভাষা হইয়াছে, তাহাই সাধু ভাষা নামে পরিচিত। সাধু অর্থাৎ শিষ্টজনের সাহিত্যিক ভাষা। সাধু ভাষা প্রধানতঃ অনুগঙ্গ প্রদেশের কথিত ভাষার বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত; ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দ্বারা অনুশীলিত হইত বলিয়া ইহার শব্দ ও ব্যাকরণে কিছু কিছু সংস্কৃত প্রভাব পড়িয়াছে, অন্বয়ও একটু গুরুগম্ভীর, ক্রিয়া সর্বনাম কিছু বর্ধিতায়তন, মুখের ভাষায় মত সঙ্কুচিত নহে। গদ্যের এই সাধুরূপ

৫ ডঃ আশুতোষ দাস-আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলের কিছু কিছু পূর্ববঙ্গীয় শব্দ থাকিলেও রচনারীতি পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষার অনুরূপ।

৬ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য দ্রষ্টব্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া সমগ্র বাঙলা দেশে একমাত্র সাহিত্যিক সাধু ভাষা হিসাবেই চলিয়া আসিতেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ ইহাকেই কিঞ্চিৎ জটিল করিয়া তুলিযাছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রাধান্য বর্ধিত হইলে সাধু ভাষা আরও ব্যাপকভাবেবাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা ভাষার সাহিত্যিক রূপ লইয়া অনেক পরীক্ষা হইয়াছে, পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু মূল কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এখনও পর্যন্ত বাঙলাব অন্যান্য উপভাষার অঞ্চলে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই সাধু ভাষাই সাহিত্যিক ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন; বরং কলিকাতায় চলিত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি উপভাষা-ভাষী অঞ্চলে কিছু অসুবিধারই সৃষ্টি কবিযা থাকে।

সম্প্রতি চলিত ভাষা সাধু ভাষাব প্রতিস্পর্ধী রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে কলিকাতা অঞ্চল বাণিজ্য ও সংস্কৃতিব কেন্দ্ররূপে প্রাধান্য লাভ করে এবং কৃষ্ণনগর, শান্তিপুব, নবদ্বীপেব ভাষা ও সংস্কৃতি কলিকাতাকে প্রভাবিত করিতে থাকে। কলিকাতায যাঁহারা বাস স্থাপন করিতে আসেন, তাঁহারা প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, গুপ্তিপাডা, কালনা, হুগলী, ফবাসডাঙা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেই আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বাহিত 'নদে-শান্তিপুবে'র ভাষাভঙ্গিমা কলিকাতার ভদ্রসমাজে প্রচলিত হয়। কলিকাতার এই শিষ্ট ভাষাই ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় কলিকাতার চলিত কথাবার্তাকে হুবহু গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে এই চলিত ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল, কথ্য ভাষাব প্রভাবে ক্রিয়া-সর্বনাম সঙ্কুচিত হইয়া পডিল এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য শব্দ ও মৌখিক বাক্‌রীতি ইহাকে লঘুভার করিয়া ফেলিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে চলিত ভাষা সাধুভাষার পাশে পাশেই চলিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই চলিত ভাষা সাধু ভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিপুলপ্রসার দেখিয়া মনে হইতেছে হয়তো আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পডিবে এবং চলিত ভাষাই সাহিত্যিক ভাষার একমাত্র বাহন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

চর্যাগীতিকা

ইতিপূর্বে আমরা বাঙালী-রচিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, উত্তর-ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি বঙ্গ-বঙ্গাল-সুহ্ম-সমতটের আদিম জনপদবাসিগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। খ্রীঃ ৯ম-১০ম হইতে ১২শ শতকের মধ্যে লিপিলেখন ও গ্রন্থরচনায় বাঙালী-জীবনের যে বিচিত্র চিত্ররূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলা সাহিত্য আলোচনার পূর্বসূত্ররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্য বাঙালীর রচিত বলিয়াই যে আলোচনায় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে; পরবর্তী কালে বা সমকালে বাঙালী দেব-ভাষায় যে সাহিত্যচর্চা করিয়াছে, পরের যুগের বাংলা সাহিত্যের সহিত তাহার কোনরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্যই প্রাক্-মুসলমান যুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে সমসাময়িক সংস্কৃত-প্রাকৃত রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় লওয়া হইয়াছে। এইবার বাংলা সাহিত্যের যথার্থ আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অপভ্রংশ দোহাবলী ও চর্যাগীতিকা আবিষ্কার করিয়া প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন। শুধু বাংলা ভাষা নহে, মাগধী গোষ্ঠীর সমস্ত ভাষার আদিম সূত্র সন্ধান করিতে হইলে হরপ্রসাদের এই আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার এই আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন মাগধী ভাষার বিবর্তন-ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তেমনি তৎকালীন জনজীবনের ধর্মাচার ও অধিমানসের রহস্যও বহুলাংশে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। খ্রীঃ ৯ম-১০ম হইতে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব-ভারতবর্ষের ভৌমজীবন ও অন্তর্জীবনে গ্রহণবর্জন-নীতি চলিতেছিল; এক দিকে মহাযান শাখা হইতে উদ্ভূত এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবে পরিপুষ্ট বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান,—অপর দিকে কৌলধর্ম ও নাথধর্মের প্রসার,—আর সর্বোপরি উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম; এই সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণে বাঙলা মগধ,

উড়িষ্যা, কামরূপের জনজীবন কতকগুলি বিশেষ চর্যা বা ধর্মকৃত্য গ্রহণ করিয়াছিল। হরপ্রসাদের উক্ত আবিষ্কারের ফলে এতদঞ্চলের জনজীবন এবং জনসাধারণের ভাবজীবনের একটা সুপরিস্ফুট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলির সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, তৎকালীন বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও মানস-জীবনের মূল্যবান দলিল হিসাবে সরহ, কাহ্ন ও তিল্লোপাদের দোহা এবং নানা সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাগীতিকার ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক বিবর্তনের ফলে হীনযান, মহাযান এবং মহাযান হইতে যে সমস্ত উপযানের উৎপত্তি হইয়াছে, সর্বাগ্রে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় লওয়া যাক।

॥ ১ ॥

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের বিবর্তন

বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্বধর্ম বলা যাইতে পারে। একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় জন্ম হইলেও অন্তর্নিহিত বিশ্বতোমুখী অনুপ্রেরণার জন্য ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম সিংহল-ব্রহ্ম শ্যাম কম্বোজ, তিব্বত চীন জাপানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্দেশীয় ধর্মমতকে কখনও গ্রাস করিয়া কখনও বা তদ্‌ভাবে রূপান্তরিত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষের ধর্মচর্যা, তত্ত্বদর্শন এবং জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতিকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চালনা করিয়াছে। তথাগতের মৈত্রী-করুণার আশ্বাসবাণী কোন বিশেষ জনপদের ধর্ম নহে, বৌদ্ধধর্মের নীতি বা শীলসদাচারেরও বিশেষ কোন দেশকালের সীমাবন্ধন নাই। ইহার তত্ত্ববাদ বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মানুষের চিত্তের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে সমর্থ। অতএব ভাষা, ধর্ম ও জীবনের বহির্বঙ্গে যতই পার্থক্য থাক না কেন, আন্তরধর্মে মানুষের দেশকালের ব্যবধান নিতান্তই তুচ্ছ—বৌদ্ধ ধর্মের নানা দিগ্‌দেশে অভিযানদৃষ্টে সেই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মের পটভূমিকা ॥ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কোন অলৌকিক ঘটনা নহে, একটা সামাজিক প্রয়োজনের সহিত তাঁহাকে মিলাইয়া লওয়া যায়। বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতা

না হইলেও, উদাসীনতা সঞ্চারিত হইতেছিল। উপনিষদ বহুস্থলে বৈদিক কর্মকাণ্ডের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, কোথাও-বা রূপকচ্ছলে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতে ভারতবাসীর মনে প্রথাগত ধর্মচর্যা ও কৃত্যের প্রতি সংশয় জাগিয়াছিল। উপনিষদ সেই সংশয়ের মধ্য হইতে মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিল। বুদ্ধের সময়েও কয়েকজন সংশয়ী দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ এইরূপ ছয় জন 'তীর্থিকে'র নাম করিয়াছেন: (১) রাজা পায়াসি, (২) অজিতকেশ-কম্বলিন, (৩) গোসাল, (৪) পুরণ কস্সপ, (৫) সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্ত ও (৬) পকুধ কচ্চায়ন। ইহাদের কেহ জড়বাদী, কেহ উচ্ছেদবাদী, কেহ 'অধিচ্চ সমুপ্পাদ' বাদী (Believers in chance-causality) কেহ-বা ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন। বুদ্ধের সমকালে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আরও অনেকে প্রচলিত সংস্কার সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন; মিথিলায় উপনিষদের আবির্ভাব ও অনুশীলনের মূলেও বৈদিক কর্মকাণ্ডের একনিষ্ঠ আনুগত্য ছিল না। উল্লিখিত 'তীর্থিক'-গণের অনেকেই সদ্বস্তু সম্বন্ধে সংশয়ী ছিলেন। যে মিথিলা জ্ঞানাত্মক উপনিষদ চর্চার কেন্দ্র, তাহার অনতিদূরে মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা সংশয়াত্মক মনোভাব বোধহয় বিদেহ অঞ্চলেই প্রথম আবির্ভূত হয়। এই অঞ্চলটি আর্যসীমার উপান্তবর্তী, ইহার পর আর্যেতর বা ব্রাত্যসীমার আরম্ভ। কাজেই এই অঞ্চল হইতে জ্ঞানবাদী উপনিষদ, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হইবে—ইহাই স্বাভাবিক।

বৌদ্ধতত্ত্বের মূলকথা॥ বুদ্ধদেব জীবৎকালে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই। তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁহার উপদেশাবলী পালিভাষায় 'সূত্র' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। সেই সূত্রগুলিকে বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত উক্তি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল। এই উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্মমতে বাস্তব জীবনসমস্যার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অবিদ্যাজনিত জরামরণাদি প্রভৃতি আত্যন্তিক দুঃখ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্যই তিনি সংবোধি লাভ করেন। প্রথমে নিজ জীবনে গ্রহণ করিয়া পরে সমগ্র জীবলোকের জন্য তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করেন। বৃথা দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা তাঁহার কদাচ কাম্য ছিল না; তাই তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা সযত্নে পরিহার করিয়াছিলেন। মানুষের

দুঃখবিনাশের পথপ্রদর্শনই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। চারিটি 'আর্যসত্য', 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' (কার্যকারণতত্ত্ব) এবং 'পঞ্চস্কন্ধ'—প্রধানতঃ এই তিনটি মৌলিক তত্ত্বের উপর তিনি মানবদুঃখের হেতুবাদ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

জীবসত্তা প্রধানতঃ পঞ্চধর্ম দ্বারা গঠিত। এই 'ধর্মে'র অর্থ শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সমবায়। ইহাই স্কন্ধ। পাঁচটি স্কন্ধের দ্বারা 'ধর্ম' নিয়ন্ত্রিত হয়। ১। রূপ (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়), ২। বেদনা (সুখ, দুঃখ এবং সুখদুঃখাতীত অনুভূতি), ৩। সংজ্ঞা (ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান), ৪। সংস্কার (মানসিক, ইন্দ্রিয়জ ও চিত্তধর্মের সংমিশ্রণজাত চেতনা), ৫। বিজ্ঞান (চৈতন্য)। পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা বুদ্ধদেব স্বীকার করেন নাই। তাই বৌদ্ধদর্শন মূলতঃ অনাত্মবাদী। পঞ্চস্কন্ধাত্মক দেহের উৎপত্তি 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বা দ্বাদশ নিদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বারটি 'সন্ততি'র (Series) মধ্য দিয়া 'প্রতীত্যসমুৎপাদ', বা কার্যকারণতত্ত্বের বিকাশ। ১। অবিদ্যা (অজ্ঞানতা), ২। সংস্কার, ৩। বিজ্ঞান (চৈতন্য), ৪। নামরূপ (স্থূলায়তন), ৫। ষড়ায়তন (ষড়েন্দ্রিয়) ৬। স্পর্শ (চিত্তবৃত্তির সহিত বস্তুর সংস্পর্শ), ৭। বেদনা (অনুভূতি), ৮। তৃষ্ণা, ৯। উপাদান (সংসক্তি), ১০। ভব (অস্তিত্ব), ১১। জাতি (জন্ম) ১২। জরা-মরণ। এই বারটি তত্ত্ব পরস্পরের সহিত কার্যকারণসূত্রে বিধৃত। একটি হইতে অপরটির আবির্ভাব, অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান—এইরূপে একটি হইতে অপরটির আবির্ভাব এবং পরিশেষে ভব, জাতি ও জরামরণ—জীবের জন্মজরাচক্রের বিষাক্ত পরিক্রমণ।[১] অনন্ত জন্মপরিক্রমা ও অনন্ত দুঃখেই জীবের নিয়তি। সেই দুঃখতত্ত্বই বুদ্ধদেবের মৌলিক তত্ত্ব। 'চত্বারি আর্যসত্যানি'—চারিটি পরম মূল্যবান সত্য। ১। দুঃখ (দুঃখের অস্তিত্ব), ২। সমুদয় (দুঃখের কারণ), ৩। নিরোধ (দুঃখনিরোধ সম্ভব) ও ৪। মার্গ (দুঃখনিরোধের পন্থা)। এই চতুর্বিধ প্রকরণ হইল দুঃখনিদানের আর্যসত্য। দুঃখের অস্তিত্ব এবং দুঃখ হইতে পরিত্রাণ, ইহার প্রচারই বুদ্ধদেবের সাধনা এবং এই দুঃখবাদ হইতে উত্থিত মুক্তির বাণীই মানবসভ্যতায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। সুতরাং তাঁহাকে নৈরাশ্যবাদী বা Pessimist বলা

১ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'কে ঠিক কার্যকারণতত্ত্ববাদ বলা যায় না। একটি হইলে অপরটি হয়—ইহাই ইহার সরলার্থ। কার্য ও কারণের অবশ্যম্ভাবিতা উহার মূল লক্ষ্য নহে।

যায় না। মানবদুঃখ-পরিত্রাণের পথদ্রষ্টারূপেই তিনি চিরদিন পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বৌদ্ধসঙ্ঘে মতান্তর॥ পরলোক ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেব প্রায়ই তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন। শিষ্যেরা ঐরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তিনি সরাসরি তাহার কোন জবাব দিতেন না। 'তাহার জীবৎকালে বোধহয় তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে আদর্শঘটিত কোনপ্রকার মতভেদ হয় নাই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তত্ত্ব লইয়া নিশ্চয় কিছু কিছু মতান্তর হইয়াছিল।) অন্ততঃ তাঁহার শিষ্যদের প্রশ্ন হইতে অনুমিত হইতেছে যে, বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন হয়তো তাহারা তৎপ্রদর্শিত দুঃখতাড়নের পন্থা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু মননশীল মানুষ শুধু ঐ স্থানেই থামিতে পারে না, তাহার জ্ঞান প্রয়োজন ছাড়াইয়া অপ্রয়োজনের দিকেও প্রধাবিত হয়। বুদ্ধদেব শিষ্যদের মৌলিক প্রশ্নকে এড়াইয়া গেলেও (তাহার তিরোধানের পরই বৌদ্ধধর্ম অন্ততঃ আঠারটি উপশাখায় বিভক্ত হইয়া যায়) এবং তথাগতের লীলা সংবরণের একশত বৎসর মধ্যে বৌদ্ধ সঙ্ঘে মতভেদ এত উৎকট আকার ধারণ করে যে, 'স্থবিরগণ' (প্রাচীন আচার্য) ৪৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে কাশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ অধিবেশন আহ্বান করেন। ইহার নাম 'সঙ্গীতি'। ৩৮৩ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় অধিবেশন আহূত হয়। তৎপরে ২৪৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে অশোক পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন। সর্বশেষ অর্থাৎ চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহূত হয় মহারাজ কণিষ্কের সময় (খ্রীঃ ১ম শতক)। 'চতুর্থ সঙ্গীতির পর বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে হীনযান-ও মহাযান—দুই চূড়ান্ত বিভাগ হইয়া গেল।' অবশ্য ইহার অনেক পূর্ব হইতেই মতান্তরের সূচনা হইয়াছিল। 'কথাবত্থু' নামক প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাসে আছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের মধ্যেই বৌদ্ধসঙ্ঘে রীতিমত মতভেদ হইয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে বৈশালীতে যে অধিবেশন আহূত হয়, তাহাতে 'স্থবিরগণ' ১০,০০০ 'বর্জন' ভিক্ষুকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এই বিতাড়িত ভিক্ষুগণ পরে 'মহাসঙ্ঘিক' স্থাপন করেন। ইঁহারাই মহাযান মতের পত্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক স্থবিরবাদী বা থেরবাদী (অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী) বৌদ্ধগণ আর প্রভাব রক্ষা করিতে পারিলেন না; মহাসঙ্ঘিকের ন্যায় স্থবিরবাদী হইতে সর্বাস্তিবাদী ও সম্মিতীয় সম্প্রদায়ও

বাহির হইয়া গেল। এইরূপে বুদ্ধের অবসানের শতবর্ষের মধ্যে দর্শন, আদর্শ ও চর্যা লইয়া বৌদ্ধধর্ম অসংখ্য উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়। অবশেষে চতুর্থ সঙ্গীতির পর হীনযান ও মহাযানের দর্শন ও আদর্শগত চূড়ান্ত বিভেদ হইয়া গেল। এই গৃহভেদের পূর্বেই বৌদ্ধসঙ্ঘ যথাক্রমে চারিটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল—স্থবিরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় এবং মহাসঙ্ঘিক। প্রথমে স্থবিরবাদ অথবা থেরবাদ সর্বপ্রধান হইয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির পর ইহারা অন্তরালে চলিয়া গেল এবং পরে ভারত হইতে পলাইয়া গিয়া সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদা সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ও প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। কাশ্মীর ও গান্ধারেই ইহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না'ই। ইহারা 'পুদ্গল' বা আত্মা মানিত। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদিগকে অবিশ্বাসী (Heretic) বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। মহাসঙ্ঘিক হইতেই মহাযানের উৎপত্তি হয়।

হীনযান ও মহাযান॥ বৌদ্ধধর্মের নানা দলভেদ সত্ত্বেও দুইটি প্রধান সম্প্রদায় দীর্ঘ দিন প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। হীনযান বা শ্রাবকযান-প্রত্যেকবুদ্ধযান এবং মহাযান। বলা বাহুল্য যে, হীনযান নামটি মহাযান মতাবলম্বীদের পরিকল্পিত এবং তাঁহাদের সময়েই প্রথম ব্যবহৃত। অনুমান খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে মহাযান হীনযানের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে এবং ফলে নবধর্মের অভ্যুত্থানে হীনযান ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যায়।

স্থবিরগণ দীর্ঘ দিন যে মতবাদ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাই পরবর্তী কালে হীনযান নামে আখ্যাত হইয়াছে। সাধারণতঃ পূর্বে যাহাকে 'থেরবাদ' বলা হইত, মহাযান সম্প্রদায় প্রাধান্য অর্জন করিয়া সেই থেরবাদকেই 'হীনযান' অপনাম প্রদান করে। আদর্শ ও চর্যার দিক হইতে হীনযান ও মহাযানের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে এবং সে পার্থক্য মহাযানের জন্ম হইবার পূর্ব হইতেই থেরবাদী বৌদ্ধসঙ্ঘে ধূমায়িত হইতেছিল। এই দ্বন্দ্ব—প্রবীণের সহিত নবীনের, প্রথার সহিত মুক্তবুদ্ধির, লোকচর্যার সহিত দার্শনিক প্রত্যয়ের, স্বার্থের সহিত পরার্থের। বলা বাহুল্য প্রথমটি হীনযানের লক্ষণ, দ্বিতীয়টি মহাযানের বৈশিষ্ট্য।

হীনযান প্রধানতঃ বাহ্যবস্তুর বস্তুসত্তায় বিশ্বাসী, আত্মনির্বাণই ইহাদের একমাত্র কাম্য। সংসারের মধ্য দিয়া নির্বাণলাভই ইহাদের যুক্তিক্রম।

ইঁহারা মনে করিতেন, সুকঠোর 'বিনয়ে'র অনুস্মৃতি দ্বারা নির্বাণলাভ করিতে হইবে। এই নির্বাণের অর্থ চৈতন্যের মূলোচ্ছেদ। নির্বাণোত্তর চিত্ত-স্বরূপের কোন ইঙ্গিত হীনযান শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। হীনযানে যাঁহারা অর্হত্ব লাভ করেন, তাঁহারা বুদ্ধ হইতে পারেন কি না, সে বিষয়ে কোন সুনিশ্চয় প্রমাণ নাই। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে হীনযান মতকে বিশেষ সঙ্কীর্ণ মনে হয়। বুদ্ধদেব জীবে করুণা করিয়া যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, হীনযান মতের উপাসকগণ সেই বিশ্বকরুণা ত্যাগ করিয়া কেবল স্ব স্ব নির্বাণের কথা ভাবিয়াছিলেন; সর্বোপরি ইঁহারা গৃহধর্মকে ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া জীবনকে একটা প্রকাণ্ড নেতিবাদী অসম্পূর্ণতার দিকে ঠেলিয়া দিতেছিলেন। ফলে ইঁহাদের মধ্য হইতে মহা-সঙ্ঘিকগণ বাহির হইয়া গিয়া 'মহাসঙ্গীতি' নামক বিরাট অধিবেশনের আয়োজন করেন এবং হীনযান অর্থাৎ থেরবাদের প্রতিস্পর্ধী মত সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান—এই প্রয়াসেরই ফল পরবর্তী কালে মহাযানে রূপান্তরিত হয়।

হীনযান ইহার নানা শাখাপ্রশাখাসহ (থেরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসঙ্ঘিক) ধীরে ধীরে জন্মভূমি হইতে দূরে সরিয়া গেল ও প্রধানতঃ দক্ষিণে সিংহল এবং ব্রহ্ম ও শ্যাম-কম্বোজে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সেইজন্য হীনযানকে দক্ষিণীয় বৌদ্ধধর্ম বলা হইয়া থাকে।

দার্শনিক মতবিচারে হীনযানের মধ্যে দুইটি উপবিভাগ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়: (১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক। থেরবাদিগণের (হীনযান) মধ্যে যাঁহারা 'বিভাষা'কে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা হইলেন 'বৈভাষিক'। কণিষ্কের সময় (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী ?) জালন্ধরে বৌদ্ধদের চতুর্থ অধিবেশন আহূত হয়। তাহাতে বৌদ্ধশাস্ত্র সংশোধিত হয় এবং 'অভিধর্মে'র একটা বিরাট টীকা রচিত হয়। এই টীকার নাম 'বিভাষা'। থেরবাদিগণের মধ্যে যাঁহারা অভিধর্মের টীকা বা 'বিভাষা'য় বিশ্বাস করিতেন তাঁহারাই হইলেন বৈভাষিক। কিন্তু সৌত্রান্তিকগণ বিভাষা বা ব্যাখ্যা অপেক্ষা বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রচারিত 'সূত্র'কেই অধিকতর মান্য করিতেন। তাই তাঁহারা হইলেন সৌত্রান্তিক। বৈভাষিকেরা বস্তুর ত্রিবিধ সত্তায় (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ দার্শনিক বিচারে তাঁহারা ছিলেন Realist; বস্তুর সর্বসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা

'সর্বাস্তিবাদী' নামে পরিচিত। তাঁহারা মনে করিতেন যে, বস্তুর অনুভূতি-বেদ্য রূপকল্পনা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই মতে বেদনা বা অনুভূতির সাহায্যে বস্তুস্বরূপের ধারণা করা যায়। অপর দিকে সৌত্রান্তিকেরা (যাঁহারা কেবল 'সূত্রে' বিশ্বাস করিতেন) বস্তুসত্তা অপেক্ষা চিৎসত্তার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন; বিজ্ঞানের (চৈতন্য) বাহিরে পঞ্চ স্কন্ধের (aggregate) কোন অস্তিত্ব নাই। অর্থাৎ ইঁহারা কিয়ৎপরিমাণে ভাববাদী (Idealist)। বৈভাষিকের নির্বাণ অস্তিবাদী, আনন্দময় ও ভাবস্বভাব বা positive; অপর দিকে সৌত্রান্তিকের নির্বাণ অবস্তুক (unreal), অভাবস্বভাব (negative) এবং আনন্দ নিরানন্দ বোধরহিত। ইঁহাদের যাবতীয় গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত।

আদর্শের দিক হইতেও হীনযান (১) শ্রাবকযান ও (২) প্রত্যেক-বুদ্ধযান—এই দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা শুধু বুদ্ধপ্রদর্শিত সন্মার্গ অবলম্বনে সন্তুষ্ট থাকিতেন, বুদ্ধ হইবার দুরাশা পোষণ করিতেন না, তাহারা হইলেন 'শ্রাবকযানে'র অন্তর্ভুক্ত; যাঁহারা শুধু নিজেদের বুদ্ধত্বলাভের জন্য সচেষ্ট হইতেন, বিশ্বের কথা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না, তাঁহারা 'প্রত্যেক বুদ্ধযানে'র শ্রেণীভুক্ত।

মহাযান-আদর্শ হীনযানের প্রতিস্পর্ধিরূপে আবির্ভূত হয় বুদ্ধদেবের তিরোধানের অনেক পরে, বোধহয় চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতির পর হইতেই হীনযান অর্থাৎ সর্ব্বাস্তিবাদীদের সহিত মহাযানের মৌলিক পার্থক্য সূচিত হইল। ধর্মাদর্শ ও দর্শন উভয় দিক হইতেই মহাযানপন্থা হীনযান হইতে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নতা অবলম্বন করিল। মহাযান-মত শুধু আপনার নির্বাণলাভের জন্যই প্রয়াস করিত না; বুদ্ধদেব যেমন সমগ্র বিশ্বের দুঃখহত মানুষের কল্যাণের কথাই সর্বাধিক চিন্তা করিয়াছিলেন, তেমনি মহাযান-মতে বিশ্বাসী বৌদ্ধগণ নিজ চিন্তা ত্যাগ করিয়া করুণার বশে জীবজগতের মুক্তির কথাই চিন্তা করিয়াছেন। এই করুণা হইতে জগতের প্রতি মৈত্রীবোধ জাগ্রত হইল, এবং মহাযান-মতে বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন মৈত্রেয়। আমাদের অনুমান, বুদ্ধের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্মমতে দুইটি ভাবধারা কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-বা অগোচরে প্রবাহিত হইত। একটি ধর্মচর্যার ধারা, শীলসদাচারের কৃত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর-একটি তত্ত্বদর্শনের ধারা, যাহা প্রধানতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য দার্শনিকতার দ্বারা প্রভাবিত।

মহাযানের মধ্যে এই তত্ত্বদর্শনই প্রধান হইয়া ওঠে। সর্বাস্তিবাদ ও মহাযানের মধ্যবর্তী আর-একটি মতবাদ 'তথতাবাদ' (খ্রীঃ পূঃ ২০০) নামে কিছুকাল প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছিল। ইহার প্রচারক অশ্বঘোষ। কালক্রমে এই তথতাবাদ লুপ্ত হইয়া যায়।

বুদ্ধদেব জগৎকল্যাণের জন্য বহু জন্মান্তর পরিক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অবস্থাগুলিকে বোধিসত্ত্ব' অবস্থা বলা হয়। মহাযানপন্থিগণ এই পরমকল্যাণব্রতী বোধিসত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিলেন। মহাযানের প্রথম আচার্যেরা মনে করিতেন যে, কতকগুলি বিশেষ 'পারমিতা'র (করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি) সাহায্যে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করা যায়। ইঁহাদের নিকট জগৎ শূন্যস্বভাব, তাই ইহারা 'শূন্যবাদী' বলিয়াও পরিচিত।

দার্শনিক মতের পার্থক্য হিসাবে মহাযান মতও দুই ভাগে বিভক্ত—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার। মাধ্যমিক দল প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মতের একটা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা মাধ্যমিক। এই মতের প্রবর্তক নাগার্জুনের মতে, বস্তুর উৎপাদও নাই, স্থিতিও নাই, কারকও নাই, কর্মও নাই, গ্রাহকও নাই, গ্রাহ্যত্বও নাই। ব্যবহারিক দিক হইতে জগতের একটা প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু পারমার্থিক বিচারে সবই শূন্যস্বভাব, ইহাই নির্বাণ। এইজন্য 'সংসারে' ও 'নির্বাণে' ভেদ নাই। তাহার মতে বস্তু ও চৈতন্য, কোনটারই পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই।

খ্রী. ৪র্থ ৫ম অব্দে মহাযানের দ্বিতীয় দার্শনিক মত যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর নেতৃত্বে বিশিষ্ট দার্শনিক মত রূপে গড়িয়া ওঠে। অসঙ্গ ইহার নাম দেন 'যোগাচার', কিন্তু বসুবন্ধু এই মতকে 'বিজ্ঞানবাদ' বা 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ' নামে অভিহিত করেন। অসঙ্গ এই মতের সাধন দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং বসুবন্ধু ইহার দার্শনিক মতটিকেই প্রধান করিয়া তোলেন। ইহাদের মতে মাধ্যমিক দর্শন কিয়দংশে গ্রাহ্য বটে, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুপ্রবাহ শূন্যস্বভাব, কিন্তু বস্তুরও একটা বিজ্ঞানময় রূপ অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা চৈতন্যরূপ আছে। ইঁহারা বস্তুসত্তাকে চিৎসত্তায় পরিণত করিয়া চৈতন্যরূপী জ্ঞানের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে বিধৃত করিয়াছেন। যোগাচারের শেষকথা, "সর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ।" মাধ্যমিক মত সাধারণতঃ 'শূন্যবাদ' এবং যোগাচার মত 'বিজ্ঞানবাদ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মাধ্যমিক মতে বস্তু ও চৈতন্য—কোনটারই পারমার্থিক সত্তা নাই, সবই শূন্যস্বভাব; কিন্তু বিজ্ঞানবাদে বস্তুর চৈতন্যসত্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন সত্তা নাই; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা চেতনাই বস্তুর ভাবাধার। সুতরাং বিজ্ঞানবাদে সব কিছুই শূন্য হইয়া যায় না, বস্তু শূন্যস্বভাব হইলেও চিত্তধাতুর সংস্পর্শে চেতনার মধ্যে ইহা ভাবরূপে বর্তমান থাকে।

মন্ত্রযান॥ মহাযানের এই দ্বিশাখাতেই বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন-ইতিহাস স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতে মাধ্যমিক ও যোগাচার অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের ফলে এক দিকে যেমন অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হইল, পৌরাণিক হিন্দুধর্মাচার আবার ফিরিয়া আসিল, ঠিক তেমনি আবার অন্য দিকে বৌদ্ধমতও ধীরে ধীরে পর্যুদস্ত হইতে লাগিল। শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্বের নিকট মহাযান শাখাভুক্ত বৌদ্ধ আচাযগণের মাধ্যমিক ও যোগাচার উভয় তত্ত্বই কথঞ্চিৎ দুর্বল হইয়া পড়িল। ফলে এই মহাযানে এক দিকে যেমন হিন্দুপুরাণের দেবদেবীর অনুরূপ সহসা নানা বৌদ্ধ দেবদেবী আবির্ভূত হইলেন, অপর দিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক রহস্যাচার ও তত্ত্বদর্শন মহাযান বৌদ্ধমতকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। হিন্দুতন্ত্র, কৌলধর্ম ও শৈব নাথধর্ম এই যুগের বৌদ্ধধর্মে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর দিকে ভগবান তথাগতের ধর্ম অতি দ্রুতবেগে তন্ত্রমন্ত্রের কবলীভূত হইল এবং আবির্ভূত হইল মন্ত্রযান অর্থাৎ কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে য়ুয়ানচুয়াং যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাচার দর্শন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন বোধহয় এই মন্ত্রযান মহাযান-মতকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রধান প্রধান বিদ্যায়তনে বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার-আচরণ, ধর্মচর্যা ও তত্ত্বদর্শন গড়িয়া উঠিল। খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর পরে আরও অন্ততঃ চারি শত বৎসর এই মন্ত্রযান (অর্থাৎ কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান) সমগ্র পূর্ব-ভারতকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল।

এই জাতীয় রহস্যবাদী আধিদৈহিক চর্যা এবং সেই দুর্জ্ঞেয় কৃত্যের উপর নির্ভরশীল দার্শনিক মতবাদ সাধারণভাবে মন্ত্রযান নামে পরিচিত, এবং এই মন্ত্রযান প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মকৃত্য ও তত্ত্ব—উভয়ের দ্বারাই বিপুলভাবে

প্রভাবান্বিত। 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহে' মহাযানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) 'পারমিতানয়' ও (২) 'মন্ত্রনয়'। মহাযানের বিশুদ্ধ দার্শনিকতাকে 'পারমিতানয়' বলা হইত। 'মন্ত্রনয়ে'র মধ্যে কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযানকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই 'মন্ত্রনয়'ই পরিবর্তী কালে 'মন্ত্রযান' নামে সাধারণভাবে পরিচিত হয়। এই তিনটি যানের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস রহস্যাচ্ছন্ন, একের সহিত অপরের যোগাযোগ-সূত্রটিও সর্বদা পবিদৃশ্যমান নহে। মনে হয় এই তিনটি যানের মধ্যে কালচক্রযানই আদিতম। অবশ্য কালচক্রযান ও বজ্রযানের মধ্যে স্পষ্টতর ব্যবধানের রেখা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ 'কালচক্র' শব্দটিকে রূপকার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই চারিটি অক্ষরের গূঢ়রহস্য আছে। 'কা' অর্থে কারণ, 'ল' অর্থে লয়, 'চ' অর্থে চঞ্চল চিত্ত এবং 'ক্র' অর্থে ক্রমবন্ধন বা সন্ততি (Series)। এই মতে 'কাল' ও 'চক্র' শব্দ দুইটির সমবায়ী অর্থ হইল 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়ে'ব সংশ্লেষণজনিত অদ্বয় শূন্যতাবোধ। বজ্রযানের বজ্রসত্ত্ব ও কালচক্রযানের কালচক্র প্রায় অভিন্ন। আবার অন্য মতে কালের ভেদজ্ঞান লোপ পাইলে যে অদ্বয়-শূন্যতা উপলব্ধ হয়, তাহাই কালচক্রেব উদ্দেশ্য। আবার আর এক মতে বুদ্ধদেবের 'ত্রিকায়' কল্পিত হইযাছে; একরূপে তিনি 'নির্মাণকায়ে'র অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ এইরূপে তিনি সকলকে তত্ত্বোপদেশ দান করেন। 'সম্ভোগ-কায়ে' বুদ্ধদেবের আর-এক রূপ। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বদের নিকট তিনি যখন ধর্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি 'সম্ভোগকাযে'র অন্তর্ভুক্ত। আবার যখন তিনি পারমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন, তখন তিনি 'ধর্মকায়ে'ব অন্তর্ভুক্ত। কালচক্রে সাধকের এই 'ত্রিকায়ে'র পার্থক্য দূর হইলে অদ্বয় সত্যের আবির্ভাব হয়।

বজ্রযান ও কালচক্রযানে তত্ত্বগত বিশেষ পার্থক্য নাই। 'বজ্র' শব্দের বৌদ্ধ-তান্ত্রিক অর্থ হইল শূন্যতা; বজ্রযানে সমস্তই বজ্রলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শূন্যস্বভাব। এইভাবে বজ্রদেবতা, বজ্রমন্ত্র, বজ্রগুরু, বজ্রোপাসক নামক পারিভাষিক শব্দ-গুলির উদ্ভব হইয়াছে। এই মতে অনেক দেবদেবীরও পরিকল্পনা হইয়াছে। বজ্রেশ্বরী বা বজ্রবারাহী বা বজ্রধাত্বেশ্বরী হইলেন প্রধান দেবী; ইহা ছাড়াও বজ্রনামাঙ্কিত আরও অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর উল্লেখ বজ্রযানে পাওয়া যায়। এই মতের উপাসকগণ 'মন্ত্র', 'মুদ্রা' ও মণ্ডলে'র সাহায্যে বজ্রদেব-

দেবীকে উপলব্ধি করিতেন। মন্ত্র অর্থাৎ শব্দের দ্বারা দেবদেবীকে মূর্ত করা হইত এবং তখন দেবদেবীগণ বিশেষ বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া সাধকের দিব্যনেত্রে আবির্ভূত হইতেন। দেবদেবীগণ মণ্ডলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলে সাধক বিভিন্ন মুদ্রা বা করন্যাসের সাহায্যে বজ্রসত্ত্ব উপলব্ধি করিতেন। বজ্রধর সাধকের গুণ অনুসারে পাঁচটি কুল বা ধর্ম পরিকল্পিত হইয়াছে—বজ্র, পদ্ম, কর্ম, তথাগত ও রত্ন। এইগুলি আবার যথাক্রমে ডোম্বী, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী এবং চণ্ডালী—এই পঞ্চ বিকল্প নামেও অভিহিত হয়। বজ্রযান ও সহজযানে এই শেষোক্ত নামগুলি অধিকতর পরিচিত। বজ্রযানী সাধক শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে এক-একটি কুল অনুসরণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হন। তাই তাঁহারা 'কুলীন' নামে পরিচিত।

বজ্রযানেরই শেষ পরিণতি সহজযান। অবশ্য কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযানের এই ক্রমিক বিবর্তনের কোন ঐতিহাসিক কালপর্যায় নাই। শুধু অনুমান করা হয় যে, বজ্রযানের শেষ স্তর এই সহজযান। বজ্রযান যেমন বজ্র-স্বভাব শূন্যতত্ত্বের প্রয়াসী, সহজযান সেইরূপ বজ্রশূন্যের স্থলে মহাসুখকে স্থাপন করিয়াছে। সহজযানের পরম লক্ষ্য—অদ্বয় মহাসুখ উপলব্ধি। এই মতে নির্বাণের অর্থ মহাসুখ। এই সুখতত্ত্বের চারিটি স্তর—প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সহজানন্দই হইল চিত্তের তুরীয় অবস্থা এবং ইহাই মহাসুখ। এই মহাসুখলাভের জন্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-পরিকল্পিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শারীরিক চর্যা বা সাধনপ্রক্রিয়া আছে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই মতের একটা স্থুল পরিচয় লাভ করা যায়। তিব্বতে যাঁহারা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত, তাঁহারাই বিশেষভাবে সহজযানের প্রচারক। খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে এই সহজযান মগধ, উড়িষ্যা, বাঙলা ও কামরূপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহা প্রধানতঃ একটা দৈহিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল বলিয়া তন্ত্র, নাথধর্ম এবং আরও অনেক লৌকিক আচার-আচরণ ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। আবিষ্কৃত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রধানতঃ সহজিয়া মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান আক্রমণের ফলে নির্জিত হিন্দুজাতি পরাজয়ের বেদনা ভুলিতে গিয়া পৌরাণিক শাস্ত্রচর্চার অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছিল; কাজেই এই সমস্ত রহস্যচারী মন্ত্রযান সমাজের অন্তেবাসীদের মধ্যে শেষ আশ্রয় লয়।

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের দুইখানি পৃষ্ঠা

পরবর্তী কালে তাহাই বৈষ্ণব সহজিয়া, আউলবাউল, সাঁইগুরু, মুর্শিদা, সুফী মারফতি—প্রভৃতি লোকধর্ম ও আচার-আচরণকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

বাঙলা দেশে প্রধানতঃ পালযুগেই মন্ত্রযান ধর্মশাখা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও আদিতম বাংলা ভাষায় এই মতের বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য রচিত হয়। বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তের প্রায় সমগ্র অংশটাই এই মন্ত্রযান মতের অন্তর্ভুক্ত।

॥ ২ ॥

চর্যাপদ-পরিচয়

পুঁথির কথা ॥ ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের বিচিত্র রূপ সুধীজনের নিকট উদ্ঘাটিত করেন। তিনি নেপাল ভ্রমণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই শ্রেণীর বহু পুঁথি উদ্ধার করেন এবং *Sanskrit Buddhist Literature in Nepal* (1882) নামক তাহার একটি তালিকাও প্রকাশ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর সরকার কর্তৃক পুঁথি অনুসন্ধানের ভার পড়ে। রাজেন্দ্রলালের তালিকা পাঠ করিয়া হরপ্রসাদের একটা ধারণা জন্মিয়া গেল যে, নেপালের নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত আরও অনেক পুঁথিপত্র অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইতিমধ্যে তিনি বাঙলা দেশ হইতেও অনেক বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিলেন। সেই সমস্ত পুঁথি দৃষ্টে তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, বাঙলা দেশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে পুঁথিপত্র ও প্রত্নশিল্পে বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব হইতেই পৌরাণিক ও বৈদান্তিক হিন্দু-ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে কিছু কিছু বৌদ্ধ তাঁহাদের গ্রন্থ ও শিষ্যাদিসহ বাঙলার বাহিরে নেপাল-ভুটান-তিব্বতে চলিয়া যান,—বাঙলায় মুসলমান আক্রমণের পর এ ব্যাপার দ্রুততর হইতে আরম্ভ করে। এই সিদ্ধান্তের বশবর্তী হইয়া হরপ্রসাদ একাধিকবার নেপাল ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং প্রথমবার নেপালে গিয়া এই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম আশ্রয়স্থল স্বচক্ষে দেখিয়া

আসিয়া বুঝিতে পারেন যে, বাঙলার ধর্মঠাকুরের পুঁথিপত্রে যে বৌদ্ধ ধর্মের আভাস রহিয়াছে, নেপালে-প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য তাহারই বর্ধিত ও সুসংবদ্ধ সংস্করণ। এই সময় তিনি *Discovery of Living Buddhism in Bengal* নামক পুস্তিকা রচনা করিয়া বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচ্ছন্ন নিদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান আনুমানিক তত্ত্ব ঘোষণা করেন। অবশ্য ঐ পুস্তিকায় প্রকাশিত তাঁহার মতামত সর্বাংশে সত্য নহে, পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণার ফলে এবং মধ্যযুগীয় বাংলা পুঁথি সাহিত্যের আবিষ্কার ও প্রকাশনায় সাহায্যে বাঙলার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের একটা স্থূল রূপ নির্দেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক অনুমান ও সিদ্ধান্ত হয়তো পরবর্তী কালের অনুসন্ধানের ফলে খণ্ডিত হইয়াছে; কিন্তু তিনিই প্রথম বাঙলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৯৭-৯৮ সালে তিনি দুইবার নেপালে যান এবং নেপাল দরবার লাইব্রেরী হইতে অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। এই পুঁথিগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং প্রায়ই পুরাতন নেওয়ারী (নেপালী) অক্ষরে লিখিত। 'ডাকার্ণব', 'সুভাষিতসংগ্রহ', 'দোহাকোষপঞ্জিকা' প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত।[২] ১৯০৭ সালে তিনি তৃতীয় বার নেপালে যাত্রা করেন এবং এইবার এমন কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আনেন, যে বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে যাহার মূল্য অপরিমেয়। পুরাতন বাংলা ভাষায় রচিত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক একখানি পদসংগ্রহ, সরহপাদের দোহা ও অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃতে রচিত 'সহজাম্নায় পঞ্জিকা' নামক টীকা এবং কৃষ্ণাচার্যের (কাহ্নপাদ) দোহা ও আচার্যপাদের সংস্কৃতে রচিত 'মেখলা' নামক টীকা—এই পুঁথিগুলিকে তিনি প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং পূর্ব-আবিষ্কৃত 'ডাকার্ণব' পুঁথিটিকেও ইহার সহিত গ্রহণ করিয়া বাংলা ১৩২৩ সনের (১৯১৬ খ্রীঃ) শ্রাবণ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রকাশ করেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা (তৎসহ টীকা) এবং ডাকার্ণব—মোট চারিখানি পুঁথি একত্রে এই নামে মুদ্রিত হইলে

* পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক—সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন ইহার প্রকাশনায় এক দিকে যেমন বাংলা ভাষার আদিম রূপের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতির কুহেলিকাচ্ছন্ন ইতিবৃত্তটিও কথঞ্চিৎ স্পষ্ট হইল, পালযুগের বাঙালীজীবন সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘটিত হইল।) পরে অবশ্য অনেকেই ইহার সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শুধু বাঙালী নহে অবাঙালী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণও এই ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহলী হইয়া আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

'বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশিত হইলে ভাষাতাত্ত্বিকগণ স্থির করিলেন যে, উক্ত সংগ্রহের প্রথম মুদ্রিত পুঁথিটি (চর্যা) সৃজ্যমান বা আদিম বাংলা ভাষায় লিখিত। অন্য তিনখানি শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশে লিখিত, তাহার সহিত বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ নাই,—যদিও চর্যাগীতিকাতেও অনেক পশ্চিমা অপভ্রংশ শব্দ আছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহার *The History of Bengali Language* (1920) নামক বক্তৃতামালায় (১৩শ বক্তৃতা) এই পুঁথিটির ভাষা লইয়া আলোচনা করিলেও, ১৯২৬ সালে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-ই এই গ্রন্থগুলির ভাষাতাত্ত্বিক স্বরূপ পূর্ণাকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ধর্মতত্ত্ব লইয়া সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁহার *Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha* (1927) নামক গবেষণাগ্রন্থে। তাহার পরে ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় *Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature* (১৯৪০ সালে লিখিত, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থে সহজযানপ্রসঙ্গে চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত *Journal of the Department of Letters* (২৮শ খণ্ড)-এ 'দোহাকোষ' প্রকাশ করিয়া চর্যার কয়েকজন কবি ও দোহাকোষের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পরে ১৯৩৮ সালে ডক্টর বাগচী ঐ জার্নালের ৩০শ খণ্ডে *Materials for a Critical Edition of the old Bengali Charyapadas* নামক সঙ্কলনে চর্যাপদগুলিকে বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত করেন, তাহার সংস্কৃত অনুবাদ দেন এবং তৎসহ তিব্বতী অনুবাদেরও

উল্লেখ করেন।(মূল চর্যাপদের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং মূল পুঁথিতে একটি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া নেপালের পুঁথি-লেখক সেটির উল্লেখ করেন নাই। ডক্টর বাগচী তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে সেই হারান পদগুলির সংস্কৃত ছায়ানুবাদ দিবার প্রয়াস পান। পরবর্তী কালে একাধিক পণ্ডিতব্যক্তি চর্যাপদের নানা আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কিছুদিন ধরিয়া নানা স্থানে দোহাকোষ ও চর্যাগীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিতেছেন।) 'হিন্দী কাব্যধারা', 'তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম', 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী' প্রভৃতি প্রবন্ধপুস্তকে এবং 'গঙ্গা' নামক হিন্দী সাময়িক পত্রে রাহুলজী সিদ্ধাচার্য, বৌদ্ধ সহজযান ও চর্যাগীতিকা লইয়া প্রচুর গবেষণা করেন। তাঁহার সেই গবেষণার কিয়দংশ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৯৩৪ সালের *Journal Asiatique*-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকাশের কিছুকাল পর হইতেই চর্যাগীতিকা বাঙলা ও বাঙলার বাহিরে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিতেছিল।

এই সমস্ত আলোচনা-গবেষণার মধ্যে ডাঃ বাগচীর তিব্বতী অনুবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ডাঃ বাগচীরও পূর্বে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ সালে এই মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন করেন যে, চর্যাগীতির তিব্বতী অনুবাদ আছে এবং তিনিই P. Cordier-এর *Catalogue du Fonds Tibetain de la Libliotheque Nationale*-এ উদ্ধৃত তথ্যাদি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বজ্রযান-সহজযানের অন্তর্ভুক্ত অনেক সংস্কৃত অপভ্রংশ-বাংলা পুঁথির তিব্বতী অনুবাদ তিব্বতে রক্ষিত আছে।[৩] তৎপরে(ডাঃ বাগচী ১৯৩৫ সালে দোহাকোষের সঙ্কলন এবং ১৯৩৮ সালে চর্যাপদের পাঠ নির্দেশ করিয়া চর্যাগীতিকার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতেও তিনি তিব্বতী অনুবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; বিশেষতঃ চর্যাপদের পাঠ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি নেপালে-প্রাপ্ত পুঁথি ও তাহার সংস্কৃত টীকা অপেক্ষা তিব্বতী অনুবাদের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব

৩ তিনি একটি চর্যার তিব্বতী অনুবাদও আবিষ্কার করেন। (History of Bengal, D U., Vol. I,

আরোপ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের *Buddhist Mystic Songs* (Dacca University Studies), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিত তাঁহার প্রবন্ধ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের *Indian Linguistics* পত্রে লিখিত *Index Verborum of the Old Bengali Charya Songs and Fragments* (Indian Linguistics, Vol. IX), *Old Bengali Texts or Charyagitikosa* (Indian Linguistics, Vol. X) এবং চর্যাগীতিপদাবলী'তে চর্যাগীতিকার পাঠসংস্কার এবং অর্থ-নির্দেশের বহুবিধ চেষ্টা করিযাছেন। হিন্দীভাষীরাও চর্যাপদকে পূর্বীহিন্দীতে রচিত বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন চর্যা, দোহা ও চৌরাশী সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া এই যুগের সাহিত্য, জীবন ও ধর্ম-সংক্রান্ত বহু নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

প্রথমে এই পদসংগ্রহের আখ্যা বিচার করা যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ হইতে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'য় চর্যাগীতিকার যে সঙ্কলন প্রকাশ করেন, তাহাতে উহার নাম দিয়াছিলেন, 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। এই নাম নেপালে-প্রাপ্ত পুঁথিতেই ছিল। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশের পর অনেকেই এই আখ্যায় সন্দেহ করিতে লাগিলেন। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী *Indian Historical Quarterly* পত্রের ১৯২৮ সালের ৪র্থ খণ্ডে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, চর্যাগীতিকার সংস্কৃত টীকার প্রথমেই বলা হইয়াছে,

শ্রীল্ যীচরণাদিসিদ্ধরচিতেঽপ্যাশ্চযচর্যাচয়ে।
সদ্বর্ত্মাবগমায় নির্ম্মল গিরাং টীকাং বিধাস্যে স্ফুটনম্ ॥

এই স্থলে 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দগুলি পাওয়া যাইতেছে—যাহার অর্থ আশ্চর্য চর্যাসমূহের সঙ্কলন। নেপালী লিপিকার, যিনি নেওয়ারী অক্ষরে এই পুঁথিটি নকল করিয়াছিলেন, তিনি হয়তো ভুল করিয়া 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' লিখিয়া থাকিবেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহার নাম দেওয়া উচিত—'আশ্চর্যচর্যাচয়'। কিন্তু গ্রন্থটির আখ্যা, যে 'আশ্চর্যচর্যাচয়'—উক্ত শ্লোক হইতে

তাহা নিঃসংশয়রূপে মনে হইতেছে না। উহার সরলার্থ—অদ্ভুত চর্যাসমূহের প্রবেশের সম্বন্ধে নির্দেশ করিবার জন্য তিনি 'নির্মল গিরা' নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। "অদ্ভুত চর্যাসমূহ"কে সঙ্কলনটির আখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী *Calcutta Oriental Journal* (Vol. I)-এ 'Some Aspects of Buddhist Mysticism' নামক প্রবন্ধে চর্যাগীতিকার নাম দিয়াছেন 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। নেপালী পুঁথিতে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়' রহিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উক্ত পুঁথির প্রথম পত্রে প্রথম গীতিকার টীকায় উল্লিখিত 'আশ্চর্যচর্যাচয়' শব্দগুলির অংশকে মিলাইয়া ('চর্যা'+'আশ্চর্য') ডঃ বাগচী একটি নূতন নামকরণ করিয়াছেন—'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'। আমাদের মনে হয়, 'আশ্চর্য' শব্দটি চর্যাগীতির বিশেষণ হিসাবে ধরিয়া 'আশ্চর্যচর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এইরূপ কোন একটি আখ্যা নির্ধারণের পক্ষে যুক্তি আছে। কিন্তু নেপালী পুথি—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া চর্যাগীতিকার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে 'চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়ই আছে। বিধুশেখর শাস্ত্রীর 'আশ্চর্যচর্যাচয়' এবং ডঃ বাগচীর 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়'—উভয়ই পরিকল্পিত বা পরিশোধিত আখ্যা। মূল পুঁথিতে কোন্ আখ্যা ছিল জানা যাইতেছে না। নেপালী পুঁথিটি মূলপুঁথির নকলমাত্র। তিব্বতী অনুবাদেও চর্যার নাম পাওয়া যাইতেছে না। তেঙ্গুর গ্রন্থমালা দৃষ্টে মনে হয় যে, মূল চর্যাগীতিসংগ্রহের আখ্যা ছিল বোধহয় 'চর্যাগীতিকোষ'। তেঙ্গুরে এইরূপ আরও অনেক চর্যাগীতিকার উল্লেখ আছে—কিলপাদের 'দোহাচর্যাগীতিকাদৃষ্টি', দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের 'চর্যাগীতি', শান্তিদেবের 'সহজগীতিকা', তিল্লোপার 'দোহাকোষ নাম চর্যাগীতি' প্রভৃতি গীতিসংগ্রহগুলি বাংলা, প্রাকৃত, অপভ্রংশ—যে ভাষাতেই রচিত হউক না কেন, এগুলি এই শ্রেণীরই বজ্র ও সহজ মতের গীতিসংগ্রহ। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'—অর্থাৎ নেপালী পুঁথিতে যে নামটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া এক-কথায় পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার একটা অর্থও করা যাইতে পারে—যে গ্রন্থ আচরণীয় ও অনাচরণীয় তত্ত্বসমূহকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়া দেয়—তাহাই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। 'আশ্চর্যচর্যাচয়' নামটিও অযুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এবং 'আশ্চর্যচর্যাচয়'—উভয়কে মিলাইয়া 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' নামটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত। যত দিন চর্যাগীতিকোষের

অন্য কোন পুঁথি না পাওয়া যাইতেছে, ততদিন 'আশ্চর্যচর্যাচয়' ও 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' উভয় আখ্যাকেই বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে।)

(আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, মূল পুঁথিটির নাম ছিল, 'চর্যাগীতিকোষ'; এবং ইহার সংস্কৃত টীকাব নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। নেপালী পুঁথিটি প্রধানতঃ টীকা বা বৃত্তি। লিপিকর বৃত্তির সহিত চর্যাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই সঙ্কলনটির যথার্থ নাম হওয়া উচিত 'চর্যাগীতিকোষ'। বোধহয় টীকাকারের টীকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল; টীকা ব্যতিরেকে পদগুলিব অর্থ উদ্ধার করা যাইত না বলিয়া নেপালী লিপিকার সমগ্র গ্রন্থটিকে বৃত্তিব নামে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' রাখিয়াছিলেন। আপাততঃ আমবা নেপালের পুঁথিতে প্রাপ্ত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামটিই গ্রহণ করিব। পরবর্তী আলোচনায় এই নামেই পুঁথিটির উল্লেখ করা হইবে।

নেপালী পুঁথির শেষে কয়েকখানা পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া টীকাকারের নাম পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদে তাঁহার নাম মুনিদত্ত। মুনিদত্ত সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বজ্রযান ও সহজযানে তাঁহার যে বিশেষ অধিকাব ছিল তাহা এই সংস্কৃত টীকা হইতেই বুঝা যাইতেছে। তিনি চযাব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধতান্ত্রিক পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব সরলার্থ করিযাছেন এবং বজ্রযান ও সহজযানের অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতেও অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, 'পরদর্শন' অর্থাৎ সহজিযা মত ভিন্ন অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের (শৈব নাথসম্প্রদায়) দার্শনিক মত প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। আমবা যদি মুনিদত্তের টীকা না পাইয়া শুধু 'চর্যাচয়' এবং তিব্বতী অনুবাদ পাইতাম, তাহা হইলে চযাপদের দার্শনিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা সুকঠিন হইত। কারণ তিব্বতী অনুবাদ প্রধানতঃ আক্ষরিক, তদ্দ্বারা বজ্রযান ও সহজযানের সূক্ষ্ম তত্ত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইত।) মুনিদত্তের 'সহজধর্মে' কতটুকু অধিকার ছিল, সে বিষয়েও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত টীকাটির যাথার্থ্য সম্বন্ধেও প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু মুনিদত্তের টীকায় উদ্‌ঘাটিত তত্ত্ব সংস্কৃত ও অপভ্রংশে রচিত মন্ত্রযানবিষয়ক নানা গ্রন্থে বর্ণিত দার্শনিক মতের বিরোধী নহে, এবং মুনিদত্ত স্বমত প্রমাণ করিতে গিয়া বহু সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব

তাঁহার টীকাকে অযথার্থ বলিয়া ত্যাগ করা উচিত হইবে না। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী *The Calcutta Oriental Journal*-এ (Vol. 1., No. 2) 'Some Technical Terms of Tantras' নামক প্রবন্ধেও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'হেবজ্রতন্ত্র' ও 'হেরুকতন্ত্র' নামক বজ্রযান গ্রন্থে বর্ণিত চর্যা ও দর্শন সম্বন্ধে যে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, মুনিদত্তের টীকায় তাহার পূর্ণ প্রতিফলন হইযাছে। সুতরাং মুনিদত্তের টীকা অপেক্ষা তিব্বতী অনুবাদের প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কথা উঠিতে পারে, ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত চর্যাগীতির সংস্কৃত টীকা রচিত হইয়াছে অন্ততঃ ১৪শ শতাব্দীতে। সঙ্কলনের দুই শত বৎসর পরে যে টীকা রচিত হয়, সেই টীকাকারের ঐ দুরূহ তত্ত্বে কিরূপ অধিকার ছিল, তাহাও সংশয়স্থল। তদুত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, তিব্বতী অনুবাদও মূল সঙ্কলনের কত দিন পরে রচিত হইয়াছিল, তাহারও তো কোন স্থিরতা নাই। উপরন্তু মুনিদত্তের নাম তো তিব্বতী অনুবাদ হইতেই জানা যাইতেছে। যাহা হউক, মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা না পাওয়া গেলে চর্যাগীতি এবং সহজযান ধর্মের মূল তত্ত্বগুলিকে রহস্যজাল ছিন্ন করিয়া উদ্ধার করা যাইত না।

নেপালে প্রাপ্ত পুঁথিটি অন্য কোন পুঁথির অনুকরণ। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুঁথিতে যে পদনিচয় ও বৃত্তি রহিয়াছে তাহা কোন একখানি পুঁথি হইতে গৃহীত হয় নাই। বোধহয় নেপালের লিপিকার দুইখানি পৃথক পুঁথি হইতে ইহার মূল পদ ও সংস্কৃত টীকা নকল করিয়াছিলেন। মূল পুঁথিতে অন্ততঃ ৫১টি চর্যা ছিল। তন্মধ্যে একটি চর্যার (১১ সংখ্যক) বৃত্তি মুনিদত্ত কর্তৃক রচিত হয় নাই। অর্থাৎ নেপালী লেখক যে পুঁথি দেখিয়া নকল করিয়াছিলেন, তাহাতে ৫১টি চর্যাই ছিল, কিন্তু ১০ সংখ্যক চর্যার পরে ১১ সংখ্যক চর্যা থাকিলেও ব্যাখ্যা ছিল না; মুনিদত্ত কেন ঐ চর্যার ব্যাখ্যা করেন নাই তাহা জানা যাইতেছে না। এই পদকর্তার নাম 'লাড়ীডোম্বীপাদ'। নেপালী লিপিকার নকলের সময় ঐ পদটির ব্যাখ্যা নাই দেখিয়া নকল-করা পুঁথিতেও ঐ পদটিকে বাদ দিয়াছিলেন। তিব্বতী অনুবাদ ঐ মূলপুঁথি হইতেই গৃহীত; তিব্বতী অনুবাদকও ব্যাখ্যা নাই দেখিয়া উহার তিব্বতী অনুবাদ করেন নাই। সুতরাং এখানে এমন একটা সূত্র পাওয়া গেল, যাহার দ্বারা তিব্বতী অনুবাদ অপেক্ষা টীকার মূল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে

হইতেছে।) তিব্বতী অনুবাদকও মুনিদত্তের টীকার উপর কতটা নির্ভর করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে। (নেপালী পুঁথিতে ঐ পদটি থ'কাব কথা নহে; তিনি দশম সংখ্যার পরে "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি চর্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি" বলিয়া পরের পদটিকে ১১ সংখ্যা গণনা করিয়া অগ্রসব হইযাছেন। অর্থাৎ মূল পুঁথিতে যেটির ১২শ সংখ্যা ছিল, সেইটিকে নেপালী লিপিকার ১১শ সংখ্যা গণনা করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি মোট ৫০টি পদ এবং তাহাব টীকা নকল করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথিব কয়েকখানি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিযা তিনটি পুরা পদ (২৪, ২৫, ৪৮) এবং একটি পদের (২৩) শেষেব অংশ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং মোট ৫০টি পদেব মধ্যে সাড়ে তিনটি পদই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হরপ্রসাদ এই সাড়ে তিনটি পদ বাদ দিয়াই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ ও মুনিদত্ত-প্রণীত সংস্কৃত টীকা উক্ত 'হাজার বছরের পুবাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় প্রকাশ করেন। তৎপরে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সমগ্র চর্যার তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কাব করেন। এই তিব্বতী অনুবাদের প্রথম ইঙ্গিত দিয়াছিলেন ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার *The Origin and Development of Bengali Language* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। অবশ্য তাঁহার পূর্বে পি. কোর্ডিয়ার সাহেব 'তেঙ্গুর' নামক বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রবিষয়ক তিব্বতী গ্রন্থতালিকার যে ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহাতে সর্বপ্রথম এই তিব্বতী অনুবাদের আভাস পাওয়া যায়। (ডঃ বাগচী যে তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন, তাহাতে বিনষ্ট সাড়ে তিনটি চর্যার তিব্বতী ভাষান্তর পাওয়া গিয়াছে। ২৩ সংখ্যক পদটির শেষ ছয় পংক্তি নেপালী পুঁথিতে ছিল; প্রথম পংক্তিকয়টির বিষয়বস্তু তিব্বতী অনুবাদ দৃষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে। অনুমান এই পদটির রচনাকার ছিলেন ভুসুকুপাদ। বিনষ্টিপ্রাপ্ত ২৪, ২৫ এবং ৪৮ সংখ্যক পদগুলিরও তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। উহার রচনাকার হইতেছেন যথাক্রমে কাহ্নপাদ, তান্তীপাদ এবং কুক্কুরীপাদ। ডঃ বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত *Journal of the Department of Letters* (1938)-এ চর্যাব যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি ঐ সাড়ে তিনটি পদের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে উহাদের সংস্কৃত ভাষান্তরেব চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত অনুবাদ অবলম্বনে ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার

সেন *Indian Linguistics*-এর দশম সংখ্যায় 'Old Bengali Texts or Charyagitikosa'-এ তাহার আনুমানিক বাংলা রূপান্তর প্রকাশ করিয়াছেন এবং তৎসম্পাদিত 'চর্যাগীতিপদাবলী'তেও সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে চর্যার সমধর্মী আরও কয়েকটি পদ বা পদাংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। মুনিদত্ত সংস্কৃত টীকা করিবার সময় প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত একই ভাবের অন্য পদ বা পদাংশ মাঝে মাঝে উল্লেখ করিয়াছেন। ডঃ সেন সেই বিচ্ছিন্ন পংক্তিগুলি এবং কালচক্রযানের গ্রন্থ 'সেকোদ্দেশটীকা'য় উদ্ধৃত অনুরূপ পংক্তিগুলিকেও তাঁহার প্রস্তুত 'চর্যাগীতি-কোষে' স্থান দিয়াছেন।

১ চর্যাগীতিকার যে পুঁথিটি হরপ্রসাদ নেপাল দরবার লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ করিযাছিলেন, তাহা ১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে, বরং পরবর্তী হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। কারণ চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত ১৪শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথির অক্ষরগুলিকে ১২শ শতকের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়াছেন।[৪] অক্ষর গঠন বাংলা নহে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। নেপালের নেওয়ারী লিপিকর ইহা নকল করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রাচীন মৈথিলী অক্ষরেরও কিছু কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চর্যার পুঁথির লিপিকে সুপ্রাচীন বলিতে সম্মত নহেন। তাঁহার মতে চর্যাসমূহের অক্ষরগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির অক্ষর অপেক্ষা প্রাচীন নহে।[৫] সে যাহা হউক, অক্ষর গঠন দেখিয়া প্রাপ্ত পুঁথিটিকে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইতেছে না।

রচনাকাল॥ চর্যাসমূহের রচনাকাল লইয়া কিছু কিছু মতভেদ রহিয়াছে। ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন, এই চর্যাগুলি খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে দোহা ও চর্যাসমূহের রচনাকালকে আরও দুই শত বৎসর পিছাইয়া দিয়া ৮ম-১২শ শতকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। রাহুলজী 'পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী' (হিন্দী) নামক গ্রন্থে এবং

৪ হরপ্রসাদ রচনাবলী—প্রথম সম্ভার, 'বাংলার পুরাণ অক্ষর'

৫ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভূমিকা'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ

Journal Asiatique-এ (Nov.-Dec. 1934) দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, লুইপাদ এবং সরহপাদ দুই জন প্রাচীন সিদ্ধাচার্য ধর্মপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন (৭৬৯—৮০৯ খ্রীঃ অঃ)। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩২৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯) ভুসুকু ও কানুপাদকে ৮ম শতাব্দীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সুনীতিকুমার (*ODBL—I*) এবং প্রবোধচন্দ্র (*Dohakosa*) চর্যাসমূহের রচনাকালের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন—১০ম-১২শ শতাব্দী। ঐ সঙ্কলনের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, লুইপাদের 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থরচনায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন (১০৩৮ খ্রীঃ অঃ)। তাহা হইলে লুইপাদও ১০ম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। লুইপাদ তিব্বতী কিংবদন্তী মতে সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু। সুতরাং এই সূত্র অনুসারে চর্যা রচনার প্রাচীনতম সীমাকে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত টানিয়া লওয়া যায়।

সুনীতিকুমার চর্যার ভাষা এবং কাহ্নপাদ-গোরক্ষনাথের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ধরিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই চর্যাগুলি ৯৫০ হইতে ১২০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত—১৪শ শতকের শেষভাগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চর্যার ভাষা তাহা অপেক্ষা দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। অর্থাৎ ভাষাতত্ত্বের বিচারেও ইহার অনেকগুলি পদকে ১২শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে হয়। কাহ্নপাদ ও গোরক্ষনাথের আবির্ভাবের আনুমানিক কাল ধরিয়া চর্যার রচনাকালের সীমা নির্ধারণ করা অসম্ভব নহে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ-রচিত 'হেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা' নামক একখানি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ আছে। ইহা পালবংশের শেষ রাজা গোবিন্দপালের সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞের মতে তিব্বতে একাধিক কাহ্নপাদের উল্লেখ থাকিলেও চর্যার কাহ্নপাদ এবং এই বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থের পণ্ডিতাচার্য শ্রীকৃষ্ণপাদ একই ব্যক্তি। চর্যার একস্থলে কাহ্নপাদকে 'পণ্ডিআচায়ে' অর্থাৎ পণ্ডিতাচার্য বলা হইয়াছে। কাহ্নপাদের কোন কোন চর্যার টীকায় 'কৃষ্ণাচার্য' বলা হইয়াছে। নাথসাহিত্য ও

নাথধর্মে দেখা যায় যে, গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা এবং তাঁহার শিষ্য কানুপা বা কাহ্নপাদ। মারাঠী গ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী' (আঃ ১২৯০ খ্রীঃ অঃ) হইতে মনে হয়, উক্ত গ্রন্থের লেখক জ্ঞানদেব তাঁহার অগ্রজ নিবৃত্তিনাথের নিকট দীক্ষালাভ করেন (১২৭৩ খ্রীঃ অঃ); নিবৃত্তি নাথের গুরু ছিলেন গেইনীনাথ বা গোয়নীনাথ (জ্ঞানীনাথ?); এই গেইনীনাথ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন গোরক্ষনাথের নিকট। গোরক্ষনাথের অপর শিষ্য জালন্ধরিপাদ, তৎশিষ্য কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নপাদ। অতএব অনুমান হয় যে, কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্য ১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমস্ত প্রমাণদৃষ্টে চর্যাপদের রচনাকালকে স্থূলতঃ ১০ম—১২শ শতাব্দীর মধ্যে স্থাপন করা যাইতে পারে

কবিপরিচয় ॥ চর্যাসমূহের পদকর্তাগণ এদেশে এবং তিব্বতে সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত; বজ্রযান ও সহজযান আচার্যগণ সাধারণতঃ এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহারাই "চৌরাশি সিদ্ধা" নামে বিখ্যাত হইয়া তিব্বতী ও ভারতীয় কিংবদন্তীতে ভক্তিশ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের সংখ্যা 'চৌরাশি'টি অনেকটা তান্ত্রিক রহস্যপূর্ণ সংখ্যার (mystic number) মতো। এই সংখ্যাটি নানা কিংবদন্তীতে ঠিক থাকিলেও চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্যের নাম, গুরুপরম্পরা ও অন্যান্য পরিচয় সম্বন্ধে তিব্বতী গ্রন্থাদি, নাথসাহিত্য ও কৌলশাস্ত্রে অনেক মতভেদ দেখা যায়। ১৪শ শতকের মৈথিলী লেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর 'বর্ণনরত্নাকরে' চৌরাশি সিদ্ধার মধ্যে মোট ৭৬টি নাম উল্লেখ করিয়াছেন। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে' যে গুরুপরম্পরার তালিকা আছে, তাহাকেও সব নামগুলির ধারাবাহিক পারম্পর্য রক্ষিত হয় নাই। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন স্বয়ং তিব্বতে গিয়া এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন। 'গঙ্গা' নামক হিন্দী মাসিকপত্রে (পুরাতত্ত্বাঙ্ক) এ বিষয়ে তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরে সেই সমস্ত প্রবন্ধ তাঁহার 'পুরাতাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী' নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। তাহাতে তিনি নানা তিব্বতী গ্রন্থের সাহায্যে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের নামধাম ও কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রবন্ধ আবার প্যারিস হইতে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত *Journal Asiatique*-এ (Octo.-December,

1934) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। (তিনি প্রধানতঃ তিব্বতী উপাদানের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন ; এইজন্যই তাঁহার সমস্ত মতামত নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না। তৎপ্রদত্ত চৌরাশি সিদ্ধার তালিকাটি এই স্থানে উল্লিখিত হইল :)

লুহিপা, লিলাপা, বিরূপা, ডোম্বীপা, শবরপা, সরহপা, কম্পলিপা, মীনপা, গোরক্ষপা, চৌরঙ্গিপা, বীণাপা, শান্তিপা, তান্তিপা, চমরিপা, খড্গপা, নাগার্জুন, কাহ্নপা, কর্ণরিপা, থগনপা, নারোপা, সলিপা, তিলোপা, ছত্রপা, ভদ্রপা, দোখন্ধিপা, অযোগীপা, কলিপা, ঢোম্ভিপা, কংকণপা, কমরিপা, ডেংগিপা, ভদেপা, তন্ধে (তান্তি) পা, কুক্কুরিপা, কুচি (কুস্থলি) পা, ধর্মপা, মহিপা, অচিন্তিপা, ভলহপা, নলিনপা, ভুসুকুপা, ইন্দ্রভূতি, মেকোপা, কুঠলিপা, কর্মারপা, জালন্ধরপা, রাহুলপা ঘরবরিপা, ঢোকরিপা, মেদিনীপা, পঙ্কজপা, বজ্রঘণ্টপা, যোগীপা, চেলুকপা, গুণ্ডরীপা, লুচিকপা, নির্গুণপা, জয়ান্তপা, চর্পটিপা, চম্পকপা, ভিখনপা, ভলিপা, কুমরীপা, জবরীপা, মণিভদ্র, মেখলা, কংখলা, কংকণপা, কণ্টলীপা, ধহুলিপা, উধলিপা, কপালীপা, কিলপা, সাগরপা, সর্বভক্ষপা, নাগবোধিপা, দ্বারিকপা, পুটুলিপা, পনহপা, কোকলিপা, অনঙ্গপা, লক্ষ্মীকরা, সমুদপা, ব্যলিপা।

(রাহুল সাংকৃত্যায়ন এই চৌরাশি সিদ্ধাচার্যদিগকে বিহারী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহার দাবী যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ নহে ; কোন কোন সিদ্ধাচার্য মগধ, বিক্রমশিলা, নালন্দা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, কপিলবস্তু, আধুনিক ভাগলপুর, চম্পারণ, কাঞ্চী, উড়িষ্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; আবার কেহ-বা কামরূপ, গৌড়, বঙ্গাল, বরেন্দ্র, ঢেকর (ধর্মমঙ্গলের ঢেকুরগড় ?) জাহোর (যশোহর ?) প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের নগরজনপদেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের প্রত্যেকেই বিহারী ছিলেন না।)

এই সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের নানা শ্রেণীর মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়স্থ, কেহ বণিক,—কেহ-বা শূদ্রবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৫ জন সিদ্ধাচার্য ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন। (কেহ কেহ হীন অন্ত্যজ শ্রেণী হইতেও আসিয়াছিলেন ; যেমন—শবরপা, চমরপা, থগনপা, তান্তিপা প্রভৃতি।) অবশ্য নাম দেখিয়া জাতি স্থির করা যায় না ; কারণ প্রায়শঃই অনেক

নাম ছদ্মনাম মাত্র; সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা সম্ভবতঃ গার্হস্থ্য আশ্রমের সহিত পিতৃদত্ত নামও ত্যাগ করিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্যদের জাতির তালিকা হইতে মনে হইতেছে যে, ইঁহাদের সহজিয়া ধর্মমত শুধু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীতেই নহে—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সমাজেও নিশ্চয় প্রবেশ করিয়াছিল। আচার্যদের মধ্যে কেহ কেহ রাজবংশসম্ভূতও ছিলেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন-সঙ্কলিত তালিকায় যে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যের নাম আছে, চর্যাগীতিকার প্রায় পদকারই সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মোট ৫০টি চর্যার ২৪ জন আচার্যের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে:

লুই, কুক্কুরীপা, বিরুআ, গুণ্ডরী, চাটিল, ভুসুকু, কাহ্ন (নানা পদে নানা রূপে বানান করা হইয়াছে), কামলি, ডোম্বী, শান্তি মহিত্তা, বীণা, সরহ, সবর, আজদেব, ঢেণ্ঢণপা, দারিক, ভাদে, তাডক, কঙ্কণ, জঅনন্দি, ধাম, তন্ত্রীপাদ, লাড়ীডোম্বী।

ইহার মধ্যে লাড়ীডোম্বীপাদের পদ পাওয়া যায় নাই। ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক চর্যা তিনটি হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত পুঁথিতে না থাকিলেও ডঃ প্রবোধ-চন্দ্র বাগচীর আবিষ্কৃত তিব্বতী অনুবাদে ইঁহাদের নাম পাওয়া যাইতেছে—যথাক্রমে কাহ্ন, তান্তি ও কুক্কুরীপা। মুনিদত্ত যে পদটির ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এই নামগুলির কয়েকটি ছদ্ম নাম বলিয়া মনে হইতেছে। যথা—কুক্কুরীপা, ডোম্বীপা, শবরীপা, তাডক, কঙ্কণ, তন্ত্রীপাদ, লাড়ীডোম্বী। কেহ কেহ মনে করেন যে, যে-পদের ভণিতার শেষে গৌরববাচক 'পা' উপাধি আছে, সেগুলি উক্ত পদকর্তাদের ভক্তের রচনা; কবি আপনাকে সম্ভ্রমবাচক 'পা' ভণিতা দিবেন, তাহা মনে হয় না। তাডক কঙ্কণ —প্রভৃতি নামগুলি যে ছদ্মনাম তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। ডোম্বী, তান্ত্রী, তিল্লো, শবর প্রভৃতি নামগুলি জাতিবাচক হইতে পারে—কিন্তু অনুমান মাত্র। কারণ তিব্বতে প্রচলিত চৌরাশি সিদ্ধার তালিকায় ডোম্বীপা ডোম নহেন, তিল্লোপা তৈলিক নহেন—উভয়েই ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিব্বতী কিংবদন্তী ও 'তেঙ্গুর' গ্রন্থতালিকা অনুসারে এই সিদ্ধাচার্যদের রচিত অন্যান্য গ্রন্থাদি ও চর্যাগীতিকা, বজ্রগীতিকা ও দোহাকোষের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। প্রাপ্ত চর্যাগীতির মতো আরও নানা চর্যাগীতিকা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

পঞ্চাশটি চর্যার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত আচার্যগণ ব্যতীত অন্য চর্যাকারদের প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ চর্যাগীতিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে :

লুইপাদ—দুইটি পদ, ভুসুকুপাদ—আটটি পদ, কাহ্নপাদ—তেরটি পদ, সরহ পাদ—চারটি পদ এবং শান্তি ও শবর পাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া চর্যা সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা প্রধানতঃ এই সিদ্ধাচার্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

লুইপাদ—সাধারণতঃ লুইপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন কিন্তু সরহপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তেঙ্গুরের বর্ণনা অনুসারে লুইপাদকে বাঙালী বলিয়াই অনুমিত হয়। সাধারণভাবে তাঁহাকে মগধের অধিবাসী বলা হইয়াছে। এখনও রাঢ়ে ধর্মপূজায় তাঁহাকে ভক্তি করা হয়। ময়ূরভঞ্জেও তাঁহার পূজা প্রচলিত আছে। লুইপাদ 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁহাকে সেই গ্রন্থবিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিব্বতী অনুবাদে লুয়ের আরও দুইখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যাইতেছে, 'শ্রীভগবদভিসময়' ও 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষ গীতিকাদৃষ্টিনাম'। রাহুল সাংকৃত্যায়ন যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে লুইকে রামপালের কায়স্থ (করাণক) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি শবরপাদের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার প্রধান শিষ্য দারিকপা ও ডেংগীপা। 'অভিসময়বিভঙ্গ' গ্রন্থে লুইপাদ দীপঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং লুইপাদ ১০ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। রাহুলজীর মতে লুই রামপালের সময়ে (১১শ শতাব্দী) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিব্বতে তাঁহাকে আদি সিদ্ধা বলা হইলেও ভারতে মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথকেই সেই স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ লুইকে ওড়িয়া বলিতে চাহেন। সুম্পা (Sumpa-Mkhan-Po) ও তারনাথ তাঁহাকে উড্ডীয়ান বা উড্যানের অধিবাসী বলিয়াছেন। উড্ডীয়ান বা উড্যান উড়িষ্যা হওয়া সম্ভব। লুইপাদ বাঙলা বা উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ম শতাব্দীর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন, শুধু এইটুকু অনুমান করা যায়।

ভুসুকু—ভুসুক নামটি যে ছদ্মবেশ, তাহা নানা কিংবদন্তী হইতে বুঝা যাইতেছে। এসিয়াটিক সোসাইটিতে শান্তিদেবের একখানি জীবনী আছে।

তাহাতে দেখা যায় যে, শান্তি ছিলেন সৌরাষ্ট্রের এক রাজপুত্র ; কিছুকাল মগধে 'রাউতের' (সেনাপতি) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শেষ জীবনে নালন্দায় বৌদ্ধ-ভিক্ষু হইয়া বাস করেন। ভোজনে, শয়নে এবং কুটীতে শান্তভাবে থাকিতেন বলিয়া তিনি 'ভুসুক' নামে অভিহিত হন, এবং তাঁহার পুরা নাম হয় 'রাউত ভুসুক'। এই শান্তিদেব-ভুসুক ছিলেন মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত—'শিক্ষাসমুচ্চয়' ও 'বোধিচর্যাবতার' ইঁহারই রচিত। কিন্তু যে-ভুসুকু চর্যা রচনা করিয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ অপর কোন ব্যক্তি। কারণ মহাযান ভুসুকু ৭ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিক ভুসুকু ১২শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন, লুয়ের পরবর্তী তো বটেই। ভুসুকু 'চতুরাভরণ' নামক একখানি বজ্রযান গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এই পুঁথিটি ১২৯৫ খ্রীঃ অব্দে লিপিকৃত হইয়াছিল। তাহা হইলে চর্যাকার ভুসুকু নিশ্চয় ১৩শ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে বর্তমান ছিলেন। ইঁহাকে কেহ কেহ চর্যার শান্তিপাদের সহিত অভিন্ন মনে করেন। যাহা হউক 'ভুসুকু' নামটি লইয়া কিছু কিছু সংশয় আছে। মহাযান মতের আচার্য প্রাচীনতর শান্তিদেব কোন কোন পুঁথিতে রাউত ভুসুকু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন ; চর্যার ভুসুকু এত প্রাচীন হইতে পারেন না। অথচ চর্যাতেও "রাউত্ত ভণই কট, ভুসুকু ভণই কট" পংক্তিতে 'রাউত ভুসুকে'র উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু স্বীকার্য যে. চর্যার ভুসুকু বাঙালী ছিলেন।

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥

এই উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভুসুকুকে বাঙালী বলা চলে। অবশ্য এখানে 'বঙ্গালী' শব্দটি সহজিয়া সাধনার অবধূতি, চণ্ডালী, ডোম্বী, বঙ্গালী মতের সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলেও 'বঙ্গালী' শব্দটির বাহ্য অর্থ দেশজ্ঞাপক। রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'বঙ্গালী' শব্দটিকে পুরাপুরি সাধনতত্ত্ব অর্থে ধরিয়া ভুসুকুর বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন ('ঐতিহাসিক নিবন্ধাবলী')। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, রূপক-সঙ্কেতের বাহ্য অর্থটিকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বরং অদীক্ষিতের নিকট ঐ বাহ্য অর্থই (অর্থাৎ ভুসুকু বাঙালী) প্রধান হইয়াছিল।

কাহ্নুপাদ—চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে কাহ্নুপাদের সর্বাধিক পদ (মোট তেরটি) গৃহীত হইয়াছে। নিঃসন্দেহে তাঁহাকে কবি ও সাধকদের মধ্যে সর্বজন-বন্দনীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্বে দোহাকোষ আলোচনাপ্রসঙ্গে কাহ্নুপাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।*

সরহপাদ—এই সঙ্কলনে সরহপাদের চারিটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সরহও একজন বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য ছিলেন। তিব্বতী তেঙ্গুর গ্রন্থমালার তালিকায় সরহের নামে অনেক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধেও দোহাকোষ আলোচনাকালে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।*

শবরীপাদ—চর্যাকার শবরীপাদ ও শান্তিপাদের দুইটি করিয়া চর্যা এই চর্যাগীতিসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। শবরীপাদের নামে নানা স্থানে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক শবরীপাদ বজ্রযান বিষয়ে সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; তেঙ্গুর তালিকায় এইরূপ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'বজ্রযোগিনী সাধনা' 'মহামুদ্রাবজ্রগীতি' 'চিত্তগুহ্য গম্ভীরার্থগীতি' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। 'সাধনমালা'য় 'সিতকুরুকুল্লা সাধন' নামক আর-একখানি পুস্তকে শবরপার ভণিতা আছে। এই 'সাধনামালা'য় 'বজ্রযোগিনী-আরাধনাবিধি' নামক আর একখানি গ্রন্থেও শবরপাদের নাম রহিয়াছে। সুম্‌পা-ম্‌খান-পোর (Sumpa-Mkhan-Po) মতে শবরপা বাঙলা দেশের কোন এক পাহাড়ী শিকারী জাতির (শবর) মধ্যে আবির্ভূত হন। তারনাথ তাঁহাকে 'শবরী' বলিয়াছেন। জনশ্রুতিতে শবরপার দুই পত্নী—লোকি ও গুণি। নাগার্জুন নাকি তাঁহাকে বজ্রযান ধর্মে দীক্ষিত করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে শবরপরা সরহের শিষ্য এবং লুইপাদের গুরু। তেঙ্গুর তালিকায় শবরীশ্বর নামক যে আচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি বজ্রযোগিনী সাধনাবিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি এবং রাজভগিনী লক্ষ্মীঙ্কর নাকি এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। আচার্য শবরীশ্বর এবং পদকর্তা শবরীপাদ একই ব্যক্তি হওয়া সম্ভব।

শান্তিপাদ—শান্তিপাদের দুইটি চর্যা এই সঙ্কলনে গৃহীত হইয়াছে। শান্তি নামধারী একাধিক তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচাযের নাম পাওয়া যাইতেছে। শান্ত-

* প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রক্ষিত ও রত্নাকরশান্তি সম্ভবতঃ প্রাচীনতর আচার্য; পদকর্তা শান্তিপাদ ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। রাহুলের মতে শান্তিপা মগধে জন্মগ্রহণ করেন এবং উদ্দন্তপুরী বিহারে সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া তিনি কিছুকাল সোমপুরী বিহারের (বাঙলা) 'স্থবির' হইয়াছিলেন। শান্তিপাদ সাত বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচার করেন। ইহার নামে অন্ততঃ নব্বই খানা গ্রন্থ পাওয়া যায়। কিন্তু যে শান্তিপাদ চর্যাকার, তিনি সম্ভবতঃ ভুসুকুর শিষ্য এবং অনেক পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

এখানে প্রধান চর্যাকারদের পরিচয় দেওয়া হইল। অন্যান্য সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে তিব্বতে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে; তাহা অবলম্বনে রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী' গ্রন্থের "বজ্রযান ঔর চৌরাসী সিদ্ধ" নামক প্রবন্ধে এবং 'হিন্দী কাব্যধারা' নামক সঙ্কলনে এই সিদ্ধাচার্যদের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য কোর্ডিয়ার সাহেবের তেঙ্গুর তালিকা (*Catalogue du fonde Tibetain de la Bibliotheque Nationale*) এবং *Repertoire du Janjur D' Apres Le Catalogue de P. Cordier*, Sumpa-Mkhan-Po-র *Pag Sam Jon Zang* (শরৎচন্দ্র দাস সম্পাদিত), L' Waddell সাহেবের *The Buddhism of Tibet*, তারনাথের *Geschichte des Buddhisms in Indien* (Schiefner-এর তারনাথ অনুবাদ), Bendall-এর 'সুভাষিতসংগ্রহ', Grunwedel-এর তারনাথ সম্পর্কিত *Edelsteinmine*, L. de la Vall'ee Poussin সাহেবের *Encyclopaedia of Religion and Ethics*-এ লিখিত Tantrism নামক প্রবন্ধ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর শহীদুল্লাহ্, ডক্টর শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীতে চৌরাশি সিদ্ধাচার্যদের সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী ও তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত উপাদান হইতে অনেক সময় প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা কিছু দুরূহ। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো একটিমাত্র উৎসকে (তিব্বতী) একমাত্র উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিলে মতামতগুলি কিছু একদেশদর্শী হইতে বাধ্য। অবশ্য একথাও সত্য যে তিব্বতী ও ভারতীয় কিংবদন্তীকে মিলাইয়া চর্যার সিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও প্রায় অসম্ভব।

বজ্রযান গ্রন্থকারদের বিবৃতি নানা অধ্যাত্ম রহস্যাচারে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কোন একটি উৎস হইতে এই আচার্যদের সত্যকারের জীবনী উদ্ধার করা দুরূহ। ইঁহাদের অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন, 'তেঙ্গুর' তালিকা ভিন্ন অন্য কোথাও ইঁহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নাই। ফলে নানা মুনির নানা মতের মধ্য হইতে সত্য উদ্‌ঘাটন করা রীতিমত কঠিন।

॥ ৩ ॥

ভাষা ও ছন্দ

ভাষা ॥ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রকাশিত হইবার পর ইহার ভাষা লইয়া প্রচুর মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সে মতভেদ যে এখন একেবারে নিরসন হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ১৯১৬ সালে শাস্ত্রী মহাশয় যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশ করেন, তখন তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঐ সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণাচার্যের দোহা এবং ডাকার্ণব—সব কয়টিই প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাস পরেই ১৯১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বড়ু চণ্ডীদাসরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় হরপ্রসাদের উক্ত সঙ্কলনের সমস্ত গ্রন্থগুলিকেই প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বলিয়া গ্রহণ করেন এবং প্রায় হরপ্রসাদের মতের প্রতিধ্বনি করেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গবাণী' নামক মাসিক-পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধে এই মতের প্রতিবাদ আরম্ভ করেন এবং ১৯২০ সালে তাঁহার *The History of the Bengali Language* নামক বক্তৃতামালার ১৩শ বক্তৃতায় স্পষ্টতঃ ঘোষণা করেন যে, চর্যাসমূহ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত নহে। তিনি 'ডাকার্ণব'কে সরাসরি আলোচনা হইতে বাতিল করিয়া দেন, কারণ তাঁহার মতে ডাকার্ণব সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রিত ভাষায় রচিত—বাংলা কেন, কোন প্রাদেশিক ভাষাতেই রচিত নহে। তাঁহার মতে ডাকার্ণব

ব্যতীত অন্য গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ হিন্দী ভাষাতেই রচিত, ওড়িয়া ভাষারও প্রচুর প্রভাব রহিযাছে। অবশ্য ইহাতে কিছু কিছু বাংলা শব্দও যে রহিয়াছে, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। তবে তিনি চর্যাগীতিকে পৃথক করিয়া আলোচনা করেন নাই, দোহাকোষ শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনখানি গ্রন্থের (চর্যা, সরহের দোহা ও কাহ্নের দোহা) একসঙ্গে ভাষা বিচার করেন এবং তিনখানিকেই হিন্দী ভাষায় রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার ছয় বৎসর পরে ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে *The Origin and Development of B'ngali Language* নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আকারে চর্যাগীতি ও দোহাকোষের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করেন। তিনি ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), রূপতত্ত্ব (Morphology) ও ছন্দ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, কেবল চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামক পদসঙ্কলনটি আদিতম বাংলা ভাষায় রচিত ; দোহা ও ডাকার্ণব পশ্চিমা অপভ্রংশ অর্থাৎ শৌরসেনী অপ-ভ্রংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অবশ্য চর্যা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইলেও ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ এবং দুই-চারিটা ওড়িযা মৈথিলী শব্দও আছে। পরবর্তী কালে প্রায় তাবৎ ভাষাতাত্ত্বিকগণ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত স্বীকার কবিয়া লইয়াছেন। সুনীতিকুমারের এই গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক এক বৎসর পবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ১৯২৭ সালে প্যারিস হইতে *Les Chants Mystique de Saraha et de Kanha* নামে যে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও সুনীতিকুমারেব ভাষাতাত্ত্বিক মত গৃহীত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে জেকবি সাহেব *Sanatkumar Caritam* (1921) গ্রন্থের ভূমিকায় চর্যাব ভাষাকে 'Alt Bengalisch' বা প্রাচীন বাংলা বলিয়াছেন। কিন্তু অবাঙালী সুধীসমাজে কেহ কেহ চর্যাপদকে পূরবীয়া হিন্দী ভাষায় রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে আবস্ত কবিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়ন ('পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী', 'তিব্বত মেঁ বৌদ্ধধর্ম') এবং ডক্টর জয়কান্ত মিশ্রের (*History of Maithili Literature*) নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালে বরোদায় অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference এর ৭ম অধিবেশনে রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিন্দী শাখার সভাপতির অভিভাষণে চর্যাপদকে বিহারী ভাষায় লিখিত এবং চৌরাশি সিদ্ধাচার্য বিশেষতঃ চর্যার কবিগণকে মাগধী বা বিহারী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন।

ঐ সম্মেলনে তাঁহার মতের প্রতিধ্বনি করিয়া অনুষ্ঠান-সভাপতি ডক্টর কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালও বলেন যে, চর্যার কবিগণ সকলেই বিহারী এবং ইহার ভাষা প্রধানতঃ পাটনা ও গয়ার প্রাচীন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাহুলজী 'হিন্দী কাব্যধারা'তে প্রাচীন হিন্দী কবিদের যে সঙ্কলন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি চর্যাপদকে হিন্দী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী'র অন্তর্গত "চৌবাশী সিদ্ধা" নামক প্রবন্ধে এবং 'তিব্বত মেঁ বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে চর্যার আচার্যগণকে বিহারী বলিয়া গ্রহণ তো করিযাছেনই, বাঙালীরা চর্যাপদ এবং চর্যার কবিদিগকে বাঙলা দেশজাত বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন বলিয়া তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ করিয়াছেন। কিন্তু রাহুলজী ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে প্রশ্নটি গভীরভাবে অনুশীলন করেন নাই বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এ বিষয়ে সুনীতিকুমার বিস্তৃত গবেষণার সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা অবশ্যস্বীকার্য। ডক্টর জয়কান্ত মিশ্র তাঁহার *History of Maithili Literature* গ্রন্থে মৈথিলী সাহিত্যের আদিপর্ব আলোচনা করিতে গিয়া চর্যাপদকে ঐ পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু যথোচিত কারণ প্রদর্শন করেন নাই।*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সরহ-কাহ্নের দোহা ও ডাকার্ণবতন্ত্রের ভাষাকে প্রাচীন বাংলা বলিয়া স্বীকার করিলেও, কেবল চর্যাগীতিকার ভাষাই বাংলা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। দোহাগুলি ও ডাকার্ণবতন্ত্র শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর দিকে যখন বাংলা ভাষা মাগধী অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তখন পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে শৌরসেনী প্রাকৃত-অপভ্রংশই ছিল শিষ্ট ভাষা। পূর্ব-ভারতের নানা অঞ্চলে অবশ্য মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত বাংলা, মৈথিলী, আসামী, ওড়িয়া প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাসমূহ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছিল। এই সময়ে বাঙালী লেখকগণ নবসৃষ্ট বাংলা ভাষা ও শিষ্ট ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশে যুগপৎ পদ ও গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাই সরহ, তিল্লো, কাহ্ন—যাঁহারা বাংলায়

* বিহার প্রদেশসরকারের প্রবর্তনায় এবং দিবাকরের সম্পাদনায় প্রকাশিত *Bihar through the Ages* নামক গ্রন্থেও (p. 352) চর্যার ভাষাকে "a sample of Old Maithili" বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার শৌরসেনী অপভ্রংশেও দোহা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চর্যাপদের ভাষা যে সৃজ্যমান বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার রূপতত্ত্বে বাংলা ভাষার পূর্ণপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টাকারে ধরা পড়ে। সম্বন্ধ পদে -অর বিভক্তি, সম্প্রদানে -কে, সম্প্রদানবাচক অনুসর্গ-অন্তরে (মধ্যযুগীয় ও আধুনিক রূপ -তরে), অধিকরণে -অন্ত, ত, অধিকরণবাচক অনুসর্গ -মাঝে, অতীত ক্রিয়ায় ইল, এবং ভবিষ্যতে -ইব ইত্যাদি লক্ষণগুলি বিচার করিলে চর্যার ভাষাকে বাংলা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা যে ওড়িয়া, পূর্বী হিন্দী বা মৈথিলা ভাষায় রচিত নহে, এইগুলি তাহার প্রধান প্রমাণ। মৈথিলী বা পূরবীয়া হিন্দীতে রচিত হইলে অতীত ক্রিয়ার ইল এবং ভবিষ্যতের -ইব যথাক্রমে -অল এবং -অব হইত। বাগ্‌ভঙ্গিমা ও শব্দযোজনাও সম্পূর্ণরূপে বাংলা ভাষার পরবর্তী যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। গুণিয়া লেহু, দিল ভণিআ, সড়ি পড়িআঁ, উঠি গেল, আখি বুঝিঅ, ধবণ ন জাঅ, কহন না জাই, পার করেই, নিদ গেল, আপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী, হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ইত্যাদি প্রয়োগগুলি পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার বাগর্থের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে বেশ কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ শব্দ আছে। -জসু, -তসু, -অইসন, জৈসন, -জিস, -তিস, -জইসোঁ, -বাঁহি, -পীবমি, -পুছমি, -তোড়িউ প্রভৃতি পশ্চিমা অপভ্রংশের বহু শব্দ চর্যায় স্থান পাইয়াছে। ইহার কারণ শৌরসেনী তদানীন্তন কালে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে একমাত্র শিষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। বাঙলা দেশেও শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভূত আধিপত্য ছিল। চর্যাকারগণ সম্ভবতঃ পশ্চিমা ভাষায় রচনা করিতে অধিকতর অভ্যস্ত ছিলেন। এই সমস্ত কারণে ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চর্যার ভাষাকে যেভাবে হিন্দীর কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে দুই-চারিটি ওড়িয়া ও মৈথিলী শব্দ আছে। তাহার কারণ—কোন কোন পদকর্তা উড্ডীয়ান অর্থাৎ উড়িষ্যা এবং মগধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং দুই-একটি ওড়িয়া বা হিন্দী শব্দ থাকা বিচিত্র নহে। সঙ্কলনটি নেপালে পাওয়া গিয়াছে, উত্তর-বিহার ও নেপালের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব নাই। কাজেই ইহাতে একটি

দুইটি মৈথিলী শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হইলে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু পদান্বয়, শব্দযোজনা ও ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে চর্যার ভাষাকে বাংলা ভাষার আদিম রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

চর্যা রাঢ় অথবা বঙ্গাল, কোন্ ভাষায় রচিত হইয়াছে, সে বিষয়েও কেহ কেহ সন্দিহান হইয়াছেন। নাসিক্যধ্বনির প্রাধান্যের জন্য ইহাকে 'বঙ্গালবাণী' বলিয়া মনে হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে আরও অনেক ভাষা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা মূলতঃ রাঢ় অঞ্চলের ভাষারীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সম্প্রদানে -ক এবং -সাথ, -লাগ- -লগ এর স্থানে -সঙ্গে -সম অনুসর্গের ব্যবহারের দ্বারা এই অনুমান দৃঢ় হইতেছে। চর্যাকারগণ কামরূপ, সোমপুরী, বিক্রমপুর—যেখান হইতেই আবির্ভূত হউন না কেন, সকলেই প্রায় রাঢ় অঞ্চলের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আদর্শ দীর্ঘ সহস্র বৎসরের মধ্যেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চর্যাপদের পরবর্তী যুগেও পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বাংলা ভাষায় প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষাই সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বাহন,—ইহা কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষণীয়।

এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাভাষা' (সন্ধাভাষা) শব্দটির গূঢ়ার্থ আলোচনা করা যাইতে ..রে। বজ্রযান গ্রন্থে 'সন্ধ্যাভাষা' শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন পারিভাষিক, দুরূহ, গুহ্য তত্ত্বকে বজ্রযান ও সহজযান লেখকেরা 'সন্ধ্যাভাষয়া বোদ্ধব্যম্' বলিয়া একটা রহস্যময় ইঙ্গিত করিযাছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যা-ভাষার অর্থ করিয়াছিলেন, "আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায না……। যাঁহারা সাধনভজন করেন, তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই।" অবশ্য এখানে হরপ্রসাদ 'কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না'—বাক্যাংশের দ্বারা অদীক্ষিতকে বুঝাইয়াছেন ; দীক্ষিত ও তত্ত্বজ্ঞের কাছে উহা আর 'আলো আঁধারি ভাষা' নহে—তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে অনুমিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী সন্-ধা ধাতু হইতে 'সন্ধা' পদ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ – অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট, আভিপ্রায়িক বচন (intentional speech)। তাঁহার মতে 'সন্ধ্যা' শব্দটি লিপিকরপ্রমাদ। ১৯২৪ সালে *Visvabharati Quarterly*-তে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে,

'সন্ধ্যাভাষা'র অর্থ—'সন্ধ্যা' দেশের ভাষা। সন্ধ্যা—অর্থাৎ আর্যাবর্ত এবং পূর্ব-ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। দক্ষিণপূর্ব ভাগলপুর অর্থাৎ বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমাংশের নাম 'সন্ধ্যা' দেশ। এই অঞ্চলের ভাষার সহিত নাকি চর্যাপদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। বুর্ণফ সাহেব (Burnof) 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে'র যে ফরাসী অনুবাদ (*Le Lotus de la Bonne Loi*, Paris, 1852) প্রকাশ করেন, তাহাতে সন্ধ্যাভাষাকে প্রহেলিকাময় ভাষা ('le language enigmatique') বলিয়াছেন। তিব্বতী ভাষায় সন্ধ্যাভাষার অর্থ "ldoni por dgons te bsad pa ni" অর্থাৎ প্রহেলিকাচ্ছলে-উক্ত দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা। ম্যাকস-ম্যুলার 'সন্ধ্যা' শব্দটিকে 'প্রচ্ছন্ন' অর্থে ('hidden saying') গ্রহণ করিয়াছেন। বিধুশেখরের 'সন্ধা'ই হউক অথবা হরপ্রসাদের 'আলো-আঁধারিপূর্ণ সন্ধ্যা'ই হউক, ইহার সহিত একটা রহস্য বা দুজ্ঞেয়তার ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে। শুধু 'অভিপ্রেত' বা 'আভিপ্রায়িক বচন' বলিলে ইহার সম্যক তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। যাহাতে অদীক্ষিত বা অন্যধর্মাবলম্বীরা সহজিয়া সাধনার গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারে, এইজন্য চর্যাকারগণ বাহ্যতঃ স্থূল অর্থযুক্ত প্রতীক-কল্প ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন—শুণ্ডিনী, যোগিনী, শবরী, ডোম্বী, কমল-কুলিশ, আলিকালি, এবং গঙ্গাযমুনা, সূর্যচন্দ্র, ললনা-রসনা, বামদক্ষিণ, হরিণ-হরিণী, সোনারূপা, শাশুড়ী-ননদী, গজবর, নাদবিন্দু প্রভৃতি। এই শব্দগুলির সাধনগত কতকগুলি গূঢ়রহস্য-পূর্ণ ইঙ্গিত আছে যাহা শুধু পথের পথিকগণই বুঝিতে পারিবেন। টীকাকার মুনিদত্ত ঐ সন্ধ্যাভাষার সহজ অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তির দিক দিয়া বিধুশেখর ও প্রবোধচন্দ্রের 'সন্ধা' শব্দ গ্রহণ করা চলিতে পারে। কিন্তু অনেক পুঁথিতেই 'সন্ধ্যা'ই আছে, 'সন্ধা' নহে। 'শ্রীনাডপাদ বিরচিতা সেকোদ্দেশ টীকা' নামক কালচক্রযানের সাধনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে (*Gaekwad's Oriental Series*, No. XC) "সেবাকালে মহোষ্ণীশবিম্বং বিভাব্য যত্নতঃ" বাক্যাংশের 'উষ্ণীশবিম্ব'-কে সন্ধ্যাভাষা বলা হইয়াছে। এই সন্ধ্যাভাষার সরলার্থ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "অত্র সন্ধ্যাভাষান্তরেণোষ্ণীশবিম্বং বুদ্ধবিম্বং ত্রৈধাতুকমশেষতঃ।" সুতরাং অনেক প্রাচীন পুথিতে 'সন্ধ্যাভাষা'ই পাওয়া যায়; সবগুলিই যে লিপিকরপ্রমাদ, তাহা মনে হয় না। শুধু চর্যাকারগণই নহে, যে সমস্ত লোক-ধর্মে দেহঘটিত সাধন-ভজন স্বীকৃত হইয়াছে (নাথপন্থ, কৌলধর্ম, বাউল, বৈষ্ণব সহজিয়া) সেখানেই কোন একটা স্থূল বা পরিচিত শব্দের দ্বারা মূল অর্থকে প্রচ্ছন্নাবস্থায় রাখা হইয়াছে; এই তত্ত্ব এবং অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বকে

ঐরূপ সন্ধ্যাভাষার প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। মধ্যযুগীয় মরমী সাধকগণও আত্মজ্ঞান বা অনুরূপ দার্শনিক তত্ত্বের নির্দেশ দিতে গিয়া সন্ধ্যা বচনের সাহায্য লইয়াছেন। চর্যার বহুস্থলে মুনিদত্ত সন্ধ্যাভাষার সরলার্থ করিয়াছেন। তাহার ফলে চর্যার তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অদীক্ষিত ব্যক্তিও কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

ছন্দ। চর্যাপদের ছন্দ লইয়াও কিছু কিছু গবেষণা হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের ছন্দ পরবর্তী কালে বাংলা পয়ার-ত্রিপদীকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চর্যার রচনাকাল গীতগোবিন্দ অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া বাংলা ছন্দের বিবর্তনে চর্যাগীতির ছন্দ বিশেষ মূল্যবান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কেহ কেহ চর্যার ছন্দে অপভ্রংশ অবহট্টের প্রাধান্য দেখিয়াছেন, কেহ-বা ইহাতে পাদাকুলকের সুর শুনিয়াছেন, যাহা পরবর্তী কালে বাংলা পয়ার ছন্দকে নবজন্ম দান করিয়াছে। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, চর্যার মাত্রাসমকতা লইয়া কিছু বৈষম্য থাকিলেও ইহাতে প্রধানতঃ পয়ার ও ত্রিপদীর সুরই ধ্বনিত হইয়াছে।

কাআ তরুবর / পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চাএ / পইঠো কাল ॥

এবং

গঙ্গা জউনা মাঝে রে বহই নাঈ ॥
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ
লীলে পার করেই ॥

প্রভৃতি ছত্রে যথাক্রমে পয়ার ও ত্রিপদীর অভাস পাওয়া যাইতেছে।

বৈদিকভাষা প্রধানতঃ অক্ষরমাত্রিক, অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং স্বরের উত্থানপতন ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিত। এই লঘুগুরু স্বরবিন্যাসের কিছু স্বাধীনতাও ছিল। কিন্তু বাঁধাবাঁধি নিয়মের ফলে সংস্কৃত স্বরের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা স্থায়িরূপ লাভ করিল এবং অক্ষরসংখ্যা নির্দিষ্ট হইল। ইহাই জাতিচ্ছন্দ। কিন্তু প্রাকৃতের মাত্রাবিশিষ্ট ছন্দে অক্ষরের নির্দিষ্টতা হ্রাস পাইল, বরং অক্ষরের উপর যতিপাতই (মাত্রা) ছন্দের জাতি নির্ণয় করিতে লাগিল। ইহাই মাত্রাচ্ছন্দ। অবশ্য প্রাকৃতের প্রভাব সংস্কৃত ছন্দেও প্রচুর অনুকৃত হইয়াছে। অপভ্রংশে মাত্রাচ্ছন্দ আরও একটু অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ মাত্রাসমকতা সৃষ্টি হইল, অর্থাৎ প্রত্যেক

চরণে মাত্রাসাম্য রহিল, এবং প্রচুর পরিমাণে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহৃত হইতে লাগিল। অন্ত্যানুপ্রাস সংস্কৃতে কদাচিৎ ব্যবহৃত হইলেও প্রাকৃত স্তর হইতেই ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং অপভ্রংশে ইহার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী তাবৎ প্রাদেশিক ভাষায় অপভ্রংশের এই প্রধান বৈশিষ্ট্যটি গৃহীত হইয়াছে।

চর্যাপদে মাত্রাচ্ছন্দের প্রভাব আছে। ইহাতে বিশেষভাবে ষোড়শমাত্রিক পাদাকুলকচ্ছন্দ অনুসৃত হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও মতে এই পাদাকুলক হইতে হিন্দী চৌপাঈ এবং বাংলা পয়ার ছন্দের উৎপত্তি। চর্যার পাদাকুলক ছন্দ প্রধানতঃ মাত্রামূলক, কিন্তু প্রাদেশিক ভাষায় ঐ জাতীয় ছন্দ (যথা—বাংলা পয়ার) অক্ষরমূলক। চর্যার অধিকাংশ ছত্রে দুই পর্ব, এবং প্রতি পর্বে আট মাত্রা—প্রতি চরণে মোট ষোড়শ মাত্রা পাদাকুলক ছন্দকে সূচিত করিতেছে অবশ্য সর্বত্র এই মাত্রার নির্দিষ্ট রীতি রক্ষিত হয় নাই, কোথাও বাড়াইয়া. কোথাও কমাইয়া লইতে হয়।

২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১
কা আ ত রু ব র। পন্ চ বি ড ল
২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২ ২ ১
চন চ ল চাঁ এ। প ই ঠো কা ল॥

এখানে দেখা যাইতেছে, প্রতি চরণের প্রথম পর্বে আট মাত্রা থাকিলেও দ্বিতীয় চরণে আট মাত্রার স্থলে সাত মাত্রা রহিয়াছে। এই পংক্তি দুইটি ঠিক পাদাকুলক ছন্দ না হইয়া বরং চতুর্দশমাত্রিক পয়ারের দিকেই যেন একটু বেশি অগ্রসর হইয়াছে। চর্যার প্রায় অধিকাংশ ছন্দ এই রীতিতেই রচিত। কোন ছন্দ আবার পাদাকুলকের মাত্রা এবং পয়ারের অক্ষর—উভয় রীতিতে পড়া যায়—

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
জা ম ম র ণ ভ ব। ক ই স ন হো ই (পাদাকুলক)

অথবা

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
জা ম ম র ণ ভ ব। ক ই স ন হো ই (পয়ার)

এইভাবেও পাঠ করা যায়। তবে যে দিক দিয়াই পড়া যাক না কেন, দুই-এক স্থলে মাত্রাবৈষম্য থাকিতেছে। পাদাকুলক অনুসারে পড়িলে দ্বিতীয় পর্বটিতে একমাত্রা কম হয়, আবার পয়ার রীতিতে পড়িলে প্রথম পর্বের একমাত্রা কম হয়, এইজন্য পয়ারের 'জাম'-এর 'জা'-কে দীর্ঘ ধরিয়া দুই মাত্রা করা হয়,

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সেই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া 'হোই'-এর 'হো'-কে দুই মাত্রা ধরিলে ছন্দের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এই রূপ দুই-একটি অক্ষরের ক্রটি প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হইবে। কেহ বলিয়াছেন, অপভ্রংশ ও বাংলার মধ্যবর্তী ছন্দ বলিয়া চর্যার ছন্দে নিখুঁত পারিপাট্য বা নিয়মাবলী নিপুণভাবে অনুসৃত হয় নাই। কেহ বলিতেছেন, প্রথম যুগের ছন্দ বলিয়া এইরূপ ক্রটি অবশ্যম্ভাবী। তবে আমাদের মনে হয়, মধ্যযুগীয় বাঙলার প্রায় সমস্ত কাব্যেই ছন্দোগত এই ক্রটি দেখা যায়। পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের পয়ার লাচাড়ীর মধ্যে কোন কোন স্থলে মাত্রার মিল নাই, এক পংক্তির সঙ্গে অপর পংক্তির মাত্রাগত কিছু গরমিল থাকিবেই। ইহার কারণ চর্যা হইতে শুরু করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত কাব্যই ছিল গীতিমূলক, এবং যেখানে বিশুদ্ধ গীতিমূলক নহে সেখানে পাঁচালী জাতীয়। রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য-পদাবলী—সবই গীত হইত, কদাচিৎ পাঁচালীর মত এক বা একাধিক জনে সুর করিয়া আবৃত্তি করিত। গানের সুরের মধ্যে ছন্দের এক-আধটা অক্ষরের হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ অনুভূত হইত না। চর্যাপদও কীর্তনপদাবলীর মতো গীত হইত—যেমন হইত বজ্রযান মতের বজ্রগীতি। ফলে পদকারগণ অক্ষরের নিয়ম রক্ষার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই, সে রীতিও প্রচলিত ছিল না। উপরন্তু চর্যায় সন্ধ্যাভাষার সাহায্যে প্রহেলিকার মধ্য দিয়া কখনও গভীর তত্ত্বরস, কখনও-বা সুগোপন আধিদৈহিক প্রক্রিয়া আকারে-ইঙ্গিতে আভাসিত হইয়াছে। সিদ্ধাচার্যদের প্রধান লক্ষ্যটি এই দিকে নিবদ্ধ ছিল; কাজেই ছন্দরচনায় সচেতন কারুকলার দিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হন নাই। শেষদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ লেখকগণও সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী গ্রাহ্য করিতেন না, এবং তাহার জন্য বিশেষ লজ্জিতও হইতেন না। তাঁহারা অবহেলা বশে ভুল সংস্কৃতে নানা তত্ত্ব লিখিয়া যাইতেন। চর্যার রচনাকারগণ দুরূহ তত্ত্বকথা আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই দিকটার দিকে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে একথা সত্য যে, চর্যাগীতিকায়ই সর্বপ্রথম পয়ার ত্রিপদীর আদি সুর শ্রুত হইল, সংস্কৃত গীতগোবিন্দও এই প্রভাব অস্বীকার করিতে পারে নাই।

॥ ৪ ॥

চর্যার বিষয়বস্তু ও তত্ত্বদর্শন

চর্যার বিষয়বস্তুর দুইটি রূপ : একদিকে বহিরঙ্গসংবদ্ধ স্থূল চিত্রকল্প, আর-একদিকে গুহাচারী, ব্যাখ্যাতীত গুরুবাদী তত্ত্বকথা। সিদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের গোপন গূঢ় তত্ত্বদর্শন ও ধর্মচর্যাকে কতকগুলি বাহ্যিক প্রতীকের মোড়কে বিবৃত করিয়াছেন। যে-কোন গূঢ়ার্থ-চর্যার ইহাই বৈশিষ্ট্য। বেদ উপনিষদের যুগ হইতে এই জাতীয় আভিপ্রায়িক অর্থযুক্ত বাহ্যিক প্রতীকের ইঙ্গিত (ঋগ্বেদের 'ভেকসূক্ত' স্মরণীয়) চলিয়া আসিতেছে। মহাযান ও তাহার নানা শাখাপ্রশাখা কৌলশাস্ত্র, নাথপন্থ, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র—সর্বত্র সাধ্যসাধনকে সুগোপন শব্দসঙ্কেতের সাহায্যে আবৃত করা হইয়াছে। প্রধানতঃ এই জাতীয় রহস্যবাদী ধর্মচর্যা প্রায়শঃই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। প্রত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের চিত্তভাবনা ও চর্যার প্রতীক-প্রকরণ সম্পূর্ণ পৃথক্—অবশ্য মূলতঃ একের সহিত অপরের তত্ত্বগত গভীর সাদৃশ্য আছে। অন্য সম্প্রদায়, বা অদীক্ষিতগণের অনাবশ্যক কৌতূহলের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাধকগণ নিজ নিজ তত্ত্বসাধনাকে 'মাতৃজারবৎ' গোপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, এইজাতীয় রহস্যবাদী সম্প্রদায় যেমন সূক্ষ্মতত্ত্বের গহনগভীরে ডুবিয়া যাইবার সাধনা করিতেন, তেমনি আবার একটি স্থূল দেহমার্গীয় চর্যাও গোপনে অনুশীলিত হইত। তাহা হইল 'কায়াসাধনা'র একটি বুদ্ধিগম্য দেহায়তন উপলব্ধি। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহজিয়া, আউল বাউল প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়—সর্বত্র এইজাতীয় একটা 'কায়াতত্ত্বে'র অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে—যাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আধুনিক পাঠকের রুচিকর হইবে না। তাহা যে একটা স্থূলধরণের যৌনাচার—তাহা অবশ্য সকলেই জ্ঞাত আছেন।

চর্যায় ঐরূপ কায়াতত্ত্বের উল্লেখ থাকিলেও নানা ইন্দ্রিয়গোচর প্রতীকের সাহায্যে যে তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা মূলতঃ নির্বিকল্প চিত্তধর্মের অকায়-উপলব্ধি। মুমুক্ষু সাধক নানা 'ধর্মের' প্রতিভাসকে ছেদন করিয়া চিত্তধাতুকে অচিত্ততায় লীন করিয়া নিরুপাধিক অদ্বয়তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন—তাহাই পঞ্চস্কন্ধের পরামুক্তি। পঞ্চস্কন্ধাত্মক কায়াতরুবরের শাখাপ্রশাখা ছিন্ন করিয়া তারপর তাঁহারা তাহার মূলোৎপাটন করিয়াছেন—ভাবস্বভাবের

দ্বৈতসত্তা চিরতরে নিঃস্বভাবীকৃত হইয়াছে। এই তত্ত্বকথাই প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া (৮ম—১৫শ শতক) মহাযানের নানা শাখাপ্রশাখায় নানা আকারে, তত্ত্বে, উপমারূপকে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। সেই তত্ত্বই পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। মহাযানের শাখাভুক্ত বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান (যাহা সাধারণতঃ মন্ত্রযান নামে পরিচিত) সম্পর্কিত সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত পদ রচিত হইয়াছে, তাহাতেও এই মতের সূক্ষ্ম দার্শনিকতা এবং স্থূল কায়াচর্যার গূঢ় আকার-ইঙ্গিত রহিয়াছে। সরহ, তিল্লো ও কাহ্নপাদের দোহা এবং চর্যাগীতিকার পদগুলি অবলম্বন করিয়া এই বৌদ্ধ সহজিয়া মতের একটা বাহ্যতত্ত্ব আবিষ্কার করা একান্ত দুরূহ নহে।

মহাযান প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতর স্বার্থচেতনা ত্যাগ করিয়া মানবের বৃহৎ কল্যাণে দার্শনিক তত্ত্বকে নিযোগ করিলেও ইহাতে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার লোকধর্মের প্রভাব পড়িতে লাগিল। ফলে অচিরেই মহাযান দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গেল—'পারমিতানয়' এবং 'মন্ত্রনয়'। পারমিতানয়-পন্থীরা 'পারমিতা' বা উচ্চতর জ্ঞানমার্গের দ্বারা ঊর্ধ্ব সত্তা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মন্ত্রনয়-পন্থীরা 'পারমিতা'কে ততটা প্রাধান্য না দিয়া বরং মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ইহাই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম—বজ্রযান। ইতিপূর্বে মহাযানের মধ্যে হিন্দুপুরাণের অনুরূপ নানা দেবীর পরিকল্পনা প্রবেশ করিয়াছিল, বজ্রযানে আরও নূতন নূতন দেবদেবী এবং মন্ত্রতন্ত্র ও রহস্যাচার প্রবেশ করিল এবং ক্রমে সূক্ষ্ম দার্শনিকতা কতকগুলি রহস্যময় গুহ্যসাধনায় পর্যবসিত হইল। এই মতের নিকট শূন্যতা বজ্রলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বজ্রবৎ সুদৃঢ়। শূন্যের লক্ষণ 'বজ্র' শব্দটি ক্রমে ক্রমে প্রধান হইয়া রূঢ়ি শব্দে পরিণত হইল। বজ্রগুরু, বজ্রধর, বজ্রদেবদেবী—প্রভৃতি শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহার হইতে লাগিল। এই বজ্রযানের সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক পুঁথিপত্র আছে। কালচক্রযানেরও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ আছে। কিন্তু সহজযানের পদ পাওয়া গেলেও সংস্কৃতে লিখিত কোন দার্শনিক আলোচনা বা তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কোন বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে নানা 'যানের' উল্লেখ থাকিলেও 'সহজযানের' কথা নাই। অনুমান পরবর্তী কালে বজ্রযানের সাধকগণের কেহ কেহ কেহ উচ্চতর বা ভিন্নতর পন্থা ধরিয়া সহজযান শব্দটি সৃষ্টি করিয়াছেন। 'বজ্র' শব্দটিতে যে সুদৃঢ়তার

ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, 'সহজ'-শব্দটি ঠিক যেন তাহার বিপরীত—যাহা একান্তই সহজ, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধাতুধর্ম—তাহাই 'সহজ'-শব্দে দ্যোতিত হইয়াছে। বোধহয় কোন কোন বজ্রযানপন্থী সাধক সাধনমার্গে আরও অগ্রসর হইয়া সহজ যান সৃষ্টি করিযাছিলেন।

চর্যাগীতিকা প্রধানতঃ সহজিয়া মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে হীনযান, মহাযান, কালচক্রযান, বজ্রযান, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও নাথধর্মের নানা প্রভাব রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সহজিয়া মত ও চর্যাগীতি পালযুগেই গড়িয়া উঠে। পালযুগে একটা ধর্মসমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওযা যাইতেছে। চর্যাপদেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাযের প্রভাব রহিযাছে। একই আচায কখনও বজ্রযান কখনও-বা সহজযান মতের চযাগীতিকা লিখিযাছেন। টীকাকাব মুনিদত্ত ভিন্নপন্থার কবি মীননাথকেও (নাথপন্থ) স্বীকার করিযাছেন এবং "তথাতি পরদর্শনে মীননাথঃ" বলিয়া মীননাথের রচিত একটি দোহার উল্লেখ করিযাছেন। কাহ্নপাদ সহজিয়া মতের হইযাও নাথপন্থের জালন্ধরিপাদকেও গুরু বলিযা স্বীকার করিযাছেন। কিন্তু ঠিক ধর্মসমন্বয বলিতে যাহা বুঝায তাহা প্রাচীন বাঙলায কদাপি হইযাছিল কিনা সন্দেহস্থল। ধর্মসমন্বয অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যাপার। একাধিক ধর্মমতের যৌক্তিকতা অনুসারে এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সামান্য লক্ষণ থাকিলে তাহা অবলম্বনে উদারতর পটভূমিকায় ধর্মসমন্বয় হইতে পারে। কিন্তু চর্যাপদের পটভূমিকা বিচার করিলে দেখা যাইবে, সিদ্ধাচাযগণ সম-মতানুবর্তী 'পরদর্শন'কে কিয়দংশে স্বীকার করিলেও ঠিক ধর্মসমন্বয়ের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হন নাই। তাঁহাদেব একটা নিজস্ব মত ছিল; তাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের ঐ একই প্রকার মত কিছু কিছু স্বীকৃত হইয়াছে। নিজেদের তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা কবিতে গিয়া তাঁহারা যোগ ও তন্ত্র হইতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূলতঃ তাঁহারা ছিলেন অদ্বৈতবাদী, অন্য কোন মত স্বীকার করিতে উন্মুখ হন নাই। যেটুকুর সাহায্যে বক্তব্যকে অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশ করা যায, তাঁহারা শুধু সেইটুকু—তা সে যেখান হইতেই হউক না কেন, গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

চর্যাকারগণ লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, সেখানে কোন সংশয় নাই। নৈরাত্মার অভিষঙ্গ হইতে মহাসুখলাভই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব চর্যার মহাসুখতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। এই মহাসুখের

স্বরূপ এবং লাভ করিবার পন্থা এই চর্যাগুলিতে কখনও প্রহেলিকা ভাষায়, কখনও দার্শনিক ভাষায়, কখনও যোগসাধনের পরিভাষায়, কখনও-বা তান্ত্রিক 'কায়সাধনে'র গূঢ় সঙ্কেতের সাহায্যে ব্যক্ত হইয়াছে। মহাসুখ লাভ করিবার জন্য তাঁহারা পথের অন্তরায়কে অনেক সময় কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। বেদ পড়িয়া মুক্তি হয় না, কর্মকাণ্ড-অনুমোদিত যজ্ঞধূমে চক্ষু অন্ধ হইয়া গেলেও মুক্তি আসে না, মহাযানী গুরু, তৈর্থিক বা ক্ষপণক—কেহই মুক্তির সন্ধান জানে না। মুক্তির পথ সহজ পথ—'উজুবাট' (ঋজুবর্ত্ম) ; সেই 'উজুবাট' হইল সহজানন্দ বা মহাসুখ। কিন্তু এই মহাসুখ নেতিবাদী নহে, ইহা পরম অস্তিবাদী ভাবস্বভাব। এই মহাসুখ প্রধানতঃ চিত্ততলেই আত্মপ্রকাশ করে—সে চিত্ত ভববিকল্পের অতীত নির্বিকল্প বোধিচিত্ত। বোধিচিত্তই মহাসুখরূপিণী নৈরাত্মাদেবীর মুখ চুম্বন করিয়া তাহার আসঙ্গ উপলব্ধি করিয়া, অচিত্ততায় লীন হইয়া "মরুমরীচি গন্ধর্বনগরী দাপণ পড়িবিম্ব. বালুআ তেল, সসরসিংগ, আকাশফুলিলা"র (মরুমরীচি, গন্ধর্বনগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব, বালুকাতৈল, শশশৃঙ্গ, আকাশফুল) ন্যায় নঙর্থক 'ধর্ম'কে শূন্য স্বভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে উপলব্ধির তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করে। তখন যদি পঞ্চস্কন্ধাত্মক প্রাতিভাসিক ধর্মধাতু লুপ্ত হইয়া যায়, তাহাতেও সাধকের ক্ষোভ নাই। তখন সাধক একটা বাক্‌পথাতীত ভববিকল্প-পরিচ্ছিন্ন শাশ্বত আনন্দসরোবরে পদ্মের মতোই বিরাজ করেন। এই যে দার্শনিক অনুভূতি ইহা চর্যায় নানা রূপক-প্রতীকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

মহাযান বৌদ্ধমতে নির্বাণ শূন্য ও করুণাস্বভাব। তখনই চিত্ত অচিত্ততায় লীন হইয়া বোধিচিত্তের স্বরূপ লাভ করে যখন সাধকচিত্তে শূন্য ও করুণা জাগ্রত হয়। সমস্ত 'ধর্ম' বা চিদাত্মক প্রতিভাস পারমার্থিক সত্তাবর্জিত, সুতরাং শূন্যস্বভাব। সাধক যখন জগৎ-প্রপঞ্চকে শূন্যস্বভাব বলিয়া অনুভব করিবেন তখন তাঁহার সীমাবদ্ধ ও স্বার্থপরিকীর্ণ সত্তার বিলোপ সাধন ঘটিবে এবং তিনি তখন সমুদ্রবারিতে লবণখণ্ডের মতো আপনাকে হারাইয়া ফেলিবেন। তখনই বিশ্বের প্রতি তাঁহার করুণা জাগিবে। কিন্তু বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযানে প্রধানতঃ ব্যক্তিচিত্তের মুমুক্ষাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে ; তাঁহারা শূন্য ও করুণার সঙ্গে মহাসুখ বা আনন্দের সংযোগ করিয়াছেন। সহজিয়া সাধকের নির্বাণ ত্রিস্বভাব—শূন্য, করুণা ও মহাসুখ। বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ত্ব চর্যার মহাসুখতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। এই মহাসুখের

বলা বাহুল্য, প্রথম দুইটি তৃতীয়টিকে অবতারিত করে এবং ত্রিবিধ সত্তার সংমিশ্রণে অদ্বয় আনন্দানুভূতি জাগ্রত হয়।

চর্যায় সাধকগণ শূন্য, করুণা ও মহাসুখ—এই তিনটি সত্তাকে কখনও পৃথকভাবে, কখনও বা যৌথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রায়ই নানাপ্রকার প্রতীক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বাতায়নে দাঁড়াইয়া অদ্বয় মহাসুখতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। এই মহাসুখকে চর্যাকারগণ ডোম্বী, শবরী, হরিণী, নৈরামণি, নৈরাত্মাবধূতিকা প্রভৃতি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। সাধক স্থূল দেহতন্মাত্রিক অনুভূতির অনঙ্গরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নৈরাত্মার সহিত আসঙ্গরসের পরম উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ মর্ত্যবাসনার দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ মুহূর্তগুলিকে তত্ত্বের প্রতীকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। মহাযানের নিকট যাহা বিশুদ্ধ তত্ত্বমাত্র, চযাকারগণ সেই চিত্তগহনবাসী তত্ত্বকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দীপাধারে আসক্তির আলোক জ্বালাইয়া আরতি করিয়াছেন।

যদিও চর্যার ধর্মাদর্শ প্রধানতঃ মহাযান বৌদ্ধমতের নানা শাখা-উপশাখার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে বিভিন্ন মতেরও প্রভাব মিলিতেছে। হীনযানের নীতিমার্গ, মহাযানের শূন্য করুণা, কালচক্রযানের 'কাল'তত্ত্ব, বজ্রযানের 'বজ্রস্বরূপ' শূন্যতত্ত্ব, সহজযানের সহজিয়া সুখতত্ত্ব, তন্ত্রের বিবিধ দেহাশ্রিত ক্রিয়ানুশীলন, যোগের চিত্তবৃত্তিনিরোধের নির্দেশ—এক কথায় ১০ম-১২শ শতাব্দীর পূর্ব-ভারতীয় যাবতীয় দর্শন, লোকধর্ম এবং তন্ত্রধর্ম চর্যার দার্শনিক তত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করিযাছিল। চর্যাকারগণ এক দিকে যেমন বিশুদ্ধ চৈতন্যমার্গ অবলম্বন করিয়া বাক্‌পথাতীত নিরালম্ব অধিমানস আশ্রয় করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে যে তত্ত্ব ব্যাখানে 'গুরু বোব সে সিস কাল' (গুরু বোবা ও শিষ্য কালা), তাহাকেই যোগের দ্বারা কূটস্থ করিয়াছেন এবং তন্ত্রের দ্বারা স্থূল ষড়ায়তনের মধ্যেই মহাসুখকে উপলব্ধি করিয়াছেন। চর্যার একদিকে যেমন শূন্য, করুণা ও মহাসুখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বালোচনা আছে, তেমনি আবার ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সাধনকৃত্যগত পরিভাষা পুরাপুরি স্বীকার করিয়া সিদ্ধাচার্যগণ ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। তাই চর্যার একদিকে তুরীয় মার্গের কথা, আর-একদিকে পরিদৃশ্যমান বিকল্পাত্মক দেহচেতনাকেই আশ্রয় করিয়া শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'নিয়ড়ি বোহি' (নিকটেই বোধি) এই তত্ত্বোপলব্ধির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাই কোন চর্যায় বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের

ইঙ্গিত, কোনটাতে বা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের নানা পারিভাষিক দেহাচারের প্রচ্ছন্ন বর্ণনা। ১০ম-১২শ শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে লোকচেতনার মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ উভয় প্রকার গুরুমুখী অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভাব বিস্তার করিতেছিল; চর্যার মধ্যে সেই বিচিত্র সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

চর্যার প্রধান তত্ত্ব মহাসুখরূপ নির্বাণলাভ; সমস্ত পদকার এ বিষয়ে দ্বিমত নহেন; কিন্তু সামান্য লক্ষণ ভিন্ন অন্য নানা বিষয়ে ভিন্ন জনে ভিন্ন কথা বলিয়াছেন। একদল একনিষ্ঠ গুরুবাদী। গুরূপদেশ ভিন্ন সংবৃতবোধিচিত্ত কিছুতেই নৈরাত্মাবধূতিকার অভিষঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না। গুরুর উপদেশ-রূপ ভেলায় চড়িয়া অবিদ্যাসমুদ্র পার হইতে হইবে। আবার কোন কোন পদে গুরু, তন্ত্র, মন্ত্রকে একেবারে অস্বীকার করা হইয়াছে। চর্যায় এইরূপ দুই প্রকার চিত্তবৃত্তির প্রভাব দেখা যায়। একদল বলিয়াছেন, 'গুরু-পুচ্ছিঅ জাণ', গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান, 'সদ্‌গুরুবোহেঁ জিতেল-ভববল', সদ্‌গুরুর জ্ঞানের দ্বারা ভব-বল জিতিলাম—অপরদল বলিয়াছেন,—

জাহের বাণচিহ্ন রূব না জানি।
সো কইসে আগম বেএঁ বখাণী॥

যাহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ জানা যায় না, আগম ও বেদ সেই তত্ত্বকে কিরূপে ব্যাখ্যা করিবে? 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ'—নিজ মনদ্বারা তুমি আপনি আপনাকে বুঝ।

আলে গুরু উএসই সীস।
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস॥ (ধ্রু)
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরু বোব সে সীসা কাল॥
ভণই কাহ্ন জিণ-রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥ (চর্যা-৪০)

অনু: বৃথাই গুরু উপদেশ দেয় শিষ্যকে,
বাক্‌পথের অতীত (বস্তু) কিসে কহা যায়।
যতই চলা যায় ততই ভুল হয়।
গুরু বোবা আর শিষ্য কালা।
ভণে কাহ্ন—জিনরত্নটি কেমন,
যেমন কালা বুঝায় বোবাকে।
(ডাঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত 'চর্যাগীতি পদাবলী'তে ধৃত অনুবাদ)

এমন কি একই আচার্য কোন পদে গুরুবাদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন (যেমন কাহ্নপাদের ৩৬শ সংখ্যক পদে গুরু জালন্ধরীপাদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে), কাহ্নপাদের আর-এক পদে (৪৫শ সংখ্যক) 'বর গুরু বঅণে'র (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ গুরু বচনের) ইঙ্গিত, আবার অপর পদে গুরুবাদের প্রতিকূল মন্তব্য আছে (পদসংখ্যা—৪০)। যে পদগুলিতে তান্ত্রিক কৃত্যের ইঙ্গিত আছে, সেখানেই যেন গুরুর অস্তিত্ব বেশি করিয়া অনুভূত হইয়াছে। যেখানে বিশুদ্ধ তত্ত্বমার্গের কথা আছে, সেখানে সাধক 'অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ'—এই তত্ত্বটি যেন অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

চর্যার ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে তিনটি রীতি লক্ষ্য করা যাইবে। কোন কোন আচার্য শুধু তত্ত্বদর্শনটিকে পারিভাষিক বা সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্য ব্যতিরেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন লুইপাদের প্রথম চর্যা, ২৯শ সংখ্যক চর্যা, সরহপাদের ২২শ সংখ্যক চর্যা, ভাদেপাদের ৩৫শ সংখ্যক চর্যা। এখানে পারিভাষিক শব্দ বা আদিরসাত্মক প্রতীক ত্যাগ করিয়া ভব-বিকল্প ও শূন্য-মহাসুখকে দর্শনের দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কতকগুলি পদে আবার তন্ত্রমন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের নানা পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য রহিয়াছে। কাহ্নপাদের ১১শ সংখ্যক পদে 'নাড়িশক্তি', 'ববিশশী', 'আলিকালি' প্রভৃতি যোগশাস্ত্র-সংক্রান্ত নানা ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। কাহ্নপাদের ৭ম সংখ্যক পদেও ঠিক ঐরূপ 'আলিকালি'র উল্লেখ আছে। ভুসুকুপাদের ২৭শ সংখ্যক পদে 'উষ্ণীষ-কমল', 'বত্রিশযোগিনী' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে। টীকাকার মুনিদত্ত ঐ পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব সরলার্থ করিয়া দিয়াছেন। আবার কতক-গুলি পদে কয়েকটি বাস্তব প্রতীকের সাহায্যে মহাসুখতত্ত্ব ও শূন্যবাদের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কায়াতরু (চর্যা—১), শাশুড়ী-বহুড়ী (২) শুণ্ডিনী (৩), যোগিনী (৪), হরিণ-হরিণী (৬), 'সোণে ভরিতী করুণানাবী' (৮), ডোম্বী-কপালী (১০), শাশুড়ী-ননদী (১১), দাবাখেলা (১২), বুদ্ধনাটক (১৭), কাহ্ন ডোম্বীর বিবাহ (১৯), যৌবনবতী রমণী (২০), চঞ্চলমূষিক (২১), তুলা ধোনা (২৬), শবর-শবরী (২৮), শবর-শবরীর আসবমত্ততা (৫০), ভুসুকুর চণ্ডালী বিবাহ করিয়া বাঙাল হইয়া যাওয়া (৪৯) প্রভৃতি রূপকের ছলে স্থূল চিত্রকল্পের সাহায্যে সূক্ষ্ম সাধন-তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। চর্যায় পারিভাষিক শব্দ ও প্রতীকদ্যোতনা পরবর্তী কালের নাথধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া ও আউল-বাউলদের গোপনচারী তত্ত্বদর্শনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

চর্যার এই দর্শন—যাহা বিচিত্র ও বি-সম মতের সমন্বয়ে সৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহা মুনিদত্তের টীকা ও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্য সত্ত্বেও এখনও দুর্জ্ঞেয় রহস্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাহা যে শুধু সমাজের অন্তেবাসীদের জন্য রচিত হইযাছিল, তাহা মনে হয় না। যে পদগুলি স্থূল প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, জনচিত্তে তাহার একটা সাধারণ আবেদন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যে তত্ত্বগুলি পারিভাষিক শব্দকণ্টকিত এবং যাহা নির্বস্তুক ও তত্ত্বপ্রধান, —তাহাও যে কেবল জনসাধারণের জন্য রচিত হইযাছিল এ কথা পুরাপুরি গ্রহণ করিতে দ্বিধা হয। চর্যায বর্ণিত ধর্মতত্ত্ব বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে নিশ্চযই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিযাছিল ; কিন্তু ইহার প্রধান তত্ত্ববাদ যে 'দীক্ষিত' জনের প্রতি উদ্দিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই দীক্ষিত জন যে একটা মানসিক চর্যা বা মননের উচ্চ মার্গ অবলম্বন করিযাছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কাজেই চর্যার ধর্মতত্ত্বকে বিশুদ্ধ লোকধর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা যায় না।

॥ ৫ ॥

চর্যায় কাব্যরস

প্রাচীনতম বাংলা পদসঙ্কলন চর্যাগীতিকা প্রধানতঃ তত্ত্ববাদের বাহন, গৌণতঃ কবিতা—ইহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যাহা মূলতঃ তত্ত্বদর্শনের মধ্য বিধৃত এবং মুমুক্ষু চিত্তের নিকট যাহা অধ্যাত্ম আশ্বাসের বাণী বহিয়া আনে, তাহা বিশুদ্ধ কাব্য নহে, বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে বিচার্যও নহে। ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করিয়া সর্বযুগে সর্বদেশেই কাব্যকবিতা রচিত হইয়াছে ; সেই ধর্মসাহিত্য কখনও তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত, কখনও-বা কাব্যের রসলোকে উন্নীত। ঋগ্বেদ, উপনিষদ, গীতা, *Old Testament*, সুফী-সম্প্রদায়ের ভজনগীতি, আলোয়ার সম্প্রদায়ের পদাবলী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমহাজন-পদাবলী—এ সমস্তই ধর্মসাহিত্য সন্দেহ নাই। কোনটি একটি বিশেষ জাতি ও সমাজের ধর্মচেতনাকে রূপান্তরিত করে, কোনটি-বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত বহন করে। উহাদের ধর্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, থাকিলেও তাহার মূল্য ধর্মের আদর্শেই বিচার্য। রচনাকারগণ ঐ সমস্ত রচনায় প্রধানতঃ একটি গোষ্ঠীর

অনুভূতি অথবা তাঁহার ব্যক্তিচেতনাজাত অধ্যাত্ম-অনুভূতিকেই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। তবু মাঝে মাঝে আরও একটা ধর্মনিরপেক্ষ অনুভূতি, উপলব্ধির আনন্দরস ও প্রকাশভঙ্গিমার চারুত্ব ও বক্রোক্তি ধর্মসাহিত্যকে শুধু সাধনমার্গে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারে না, কোন কোন সাধক কোন একটি দিব্য মুহূর্তে নিবিড় রসচেতনা এবং সেই চেতনাপ্রকাশের জন্য সৌন্দর্যাশ্রয়ী বাঙ্‌ময় আত্মসম্বিৎ লাভ করেন। উপনিষদের শ্লোকে, বৈষ্ণবপদাবলীতে, জলালুদ্দিন রুমির রুবাইতে, বাইবেলের *The Song of Solomon*-এ একটি ব্যাকুল মানবজীবনের আর্তি ধ্বনিত হইয়াছে। তাহা কখনও প্রসন্ন আস্তিক্য পথের দিব্যযাত্রী, কখনও-বা অশ্রুভারাতুর মানবরসে কম্পমান।

চর্যাগীতিকা মূলতঃ একটি বিশেষ রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভজনাবলী হইলেও ইহার মধ্যে স্বতোস্ফূর্ত রসের আবেদন এবং বাক্‌নির্মিতির শিল্পকৌশল লক্ষিত হয়। অবশ্য প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—যাহা প্রধানতঃ বুদ্ধিকেন্দ্রিক ও তত্ত্ববহ, তাহা আদৌ কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে কি? একথা অবশ্যই সত্য, "The poet is not a mystic ; contemplation of the mystery is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creator." অর্থাৎ তত্ত্বভূয়িষ্ঠ মনন কাব্যে রূপায়িত হইতে পারে না ; জগৎ ও জীবনের পরম বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করিয়া কবি নূতন সৃষ্টি করিবেন। অধ্যাত্ম চেতনার কৈবল্য তত্ত্ব নহে—জীবনচেতনার পরম বৈচিত্র্যই কবিকে মুগ্ধ করে। কিন্তু আধুনিক যুগের একজন মনীষীর কথাটিও চিন্তার যোগ্য : "The future poetry should partake of the nature of the Mantra, that rhythmic speech, which as the Veda puts it rises at once from the heart of the seer and from the distant home of the truth, 'ঋতস্য সদনাৎ গুহ্যম্' " (Sri Aurobindo). সুতরাং ভবিষ্যতের কবিতা যে বিশুদ্ধ দিব্য ভাবকেই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিবে না, তাই বা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, আমাদের প্রধান প্রশ্ন—চর্যা তত্ত্বকেন্দ্রিক হইয়াও কবিতা হইতে পারিয়াছে কি না।

কেহ কেহ কাব্যবিচারের পারিভাষিক রীতি অর্থাৎ আলঙ্কারিক বিচার-পদ্ধতির সাহায্যে চর্যার ছন্দ, অলঙ্কার, বক্রোক্তি, ধ্বনি ও রসবিশ্লেষণ করিয়া ইহার কাব্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। এই রীতির কাব্যবিচার নিতান্তই বাহ্য বিশ্লেষণ মাত্র। যে-কোন কবিতায় ছন্দ, অলঙ্কার, রস

(পারিভাষিক অর্থে) থাকিয়াও তাহা কবিতা নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ দার্শনিক বা তাত্ত্বিক কবিতাবিচারের ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া সিদ্ধাচার্যদিগকে সিদ্ধ কবি বলা যায় কি-না তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

চর্যাকারগণ সচেতনভাবে কাব্যরচনার প্রয়াস পান নাই, তাঁহা বলাই বাহুল্য।* তাঁহারা একটি বিশেষ ধরণের তত্ত্ববাদ ও গুহ্য সাধনাকে প্রাকৃত অপভ্রংশের প্রকীর্ণ কবিতার মতো স্বল্পতম আয়তনের মধ্যে নানা সঙ্কেতের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই চর্যাগীতিকার পুরা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পরে কেহ প্রধান প্রধান আচার্যের কিছু কিছু পদ লইয়া এই সঙ্কলনগ্রন্থ নির্মাণ করেন। তাঁহাদের এই পদগুলি অধ্যাত্ম সাধনসম্পৃক্ত বলিয়া ইহাতে নানা পরিভাষা ও সঙ্কেতের বাহুল্য দৃষ্টিগোচর হইবে এবং 'সমভিপ্রায়ী' ভিন্ন অন্য কেহ ইহার আক্ষরিক অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। বাহ্যিক অর্থ বুঝিলেও ইহার তত্ত্বগহনে প্রবেশ করা কাব্যরসিক 'অদীক্ষিতে'র পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আচার্যগণ চর্যাগুলিতে তত্ত্বকথাকে কী ভাবে এবং কত দূর সার্থকতার সহিত বলিতে পারিযাছেন, তাহা আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রধান সমস্যা নহে। আমাদের দেখিতে হইবে, সিদ্ধাচার্যগণ সমগ্র তত্ত্বটির একটি রসমূর্তি নির্মাণ করিতে পারিয়াছেন কি-না। যখন তাঁহারা পরম গাম্ভীর্যের সহিত তত্ত্বকথা শুনাইয়া যান—'আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা' (আলিকালিতে পথ রুদ্ধ করিল), 'সঅসম্বেঅণ সরুঅ বিআরেতেঁ অলক্‌খ লক্‌খণ ন জাই' (স্বসংবেদন স্বরূপ-বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ হয না),—তখন বুঝিতে পারা যায, সাধক কতকগুলি দার্শনিক প্রত্যয় ও সাধনমার্গের সাধনাকে কখনও দার্শনিক পরিভাষা, কখনও-বা তন্ত্রের বিশেষ শব্দের সাহায্যে আভাসে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন। চর্যাব সমস্ত কবিতা নিছক তত্ত্বরূপ গ্রহণ করিলে ইহার সাহিত্যবিচার নিষ্ফল হইয়া যাইত। কিন্তু তত্ত্বদর্শনের প্রতি সাধকগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলেও কেহ কেহ তত্ত্বকথাকে নানা রূপকপ্রতীকের সাহায্যে বলিতে গিয়া বাচ্যার্থ বা উদ্দিষ্টার্থকে চিত্রকল্পের সাহায্যে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন।

* কোন কোন সমালোচক চর্যাপদে কবিত্ব খুঁজিয়া পান না। কবিত্ব বলিতে যে গতানুগতিক 'কনভেনশন' গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বুঝিলে অবশ্য চর্যায় কবিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে না। কিন্তু কনভেনশনের চশমা খুলিয়া সহজ প্রতীতির দৃষ্টিতে দেখিলে চর্যার অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক পদেও চিত্রসৃষ্টি, প্রতীকদ্যোতনা, শব্দচয়নকৌশল ও আবেগের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ইহাকেই কবিত্ব বলে।

এই চিত্র-প্রতীকগুলি একদিকে যেমন উদ্দিষ্ট অর্থকে সংহত আকারে পরিবেশন করিয়াছে, তেমনি চিত্রধর্ম ও রূপকল্পকেও আবার অজ্ঞাতসারে একটা শিল্পমর্যাদা দিয়াছে। অনেক সময় রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে দুরূহ তত্ত্বকে স্পষ্টতর করা হইয়াছে। কায়বৃক্ষ (১), ভবনদী পারাপার (৫, হরিণ শিকার (৬), ডোম্বী ও শবরীর অভিষঙ্গ (১০, ২৮), শবর-শবরীর মদমত্ত উল্লাস (৫০), দরিদ্রা গর্ভিণী রমণীর মনোবেদনা (২০), গৃহদাহ (৭৭), জলদস্যুর আক্রমণ (৪৯), প্রভৃতি বাহ্যরূপকের সাহায্যে আচাযগণ চযার গূঢ় রহস্য অদীক্ষিতের নিকট সংবৃত করিলেও, দীক্ষিতের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোথাও চিত্রকল্প, সৌন্দর্যানুভূতি, কোথাও বা লোকজীবনের প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়িয়াছে। যখন চারিদিক বেড়িয়া হাঁক পড়ে, মাংসলোলুপ শিকারীর দল হরিণকে তাড়াইয়া লইয়া যায়—হরিণের আপন মাংসই যে তাহার বৈরী হয়, তখন আর্ত হরিণ আশ্রয় খুঁজিয়া পায় না—'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জানী' (হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না)। তবু হরিণী আসিয়া নিজেই পথ দেখাইয়া দেয়। হরিণ মৃত্যুমারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সে বন ছাড়িয়া অন্য বনে ছুটিয়া যায় (৬ষ্ঠ সংখ্যক পদ)। ইহার অর্থ "মূঢা হিঅহি ণ পইসঈ" (মূঢের হৃদয়ে পশে না)—নাই-বা পশিল! ইহার মধ্যে যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মূল্য কে অস্বীকার করিবে? দ্রুতধাবমান হরিণের আত্মত্রাণের জন্য উদ্দাম পলায়নের চিত্ররূপটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

কাহ্নপাদ ডোম্বীকে বিবাহ করিবার জন্য পটহ মাদল বাজাইয়া যাত্রা করিলেন, বিবাহান্তে যৌতুক লাভ করিলেন—'অনুত্তর ধর্ম'। সারারাত্রি অনঙ্গরঙ্গে কাটিয়া গেল। ইহার নিহিতার্থ যাহাই হউক না কেন, উহার মধ্য দিয়া দেহাসক্তিপূর্ণ প্রেমের উল্লাসই উপলব্ধি করা যায় (পদ—১৯)। পর্বত-শীর্ষে যে শবরকন্যা গলায় গুঞ্জাফলের মালা পরিয়া, শিরে শিখিপাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়া আচার্য শবরপাদ সব ভুলিয়া যান, নিজ স্ত্রীকেই পরস্ত্রী মনে করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন; শবরী বোধকরি স্বামীর এই পরনারী-আসক্তিকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করে। কিন্তু পত্রেপুষ্পে গাছগুলি যে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন খাট পাতিয়া শয্যা রচিত হইল, কর্পূরযুক্ত তাম্বুল সেবা করিয়া উভয়েই রাগরক্তিম হইয়া উঠিলেন। নিবিড় আসঙ্গরভসের মধ্যে সমস্ত রাত্রি পোহাইয়া গেল।—'সুন নৈরামণি কণ্ঠে লই মহাসুহে রাতি পোহাই' (পদ—২৮)। শবরপাদের এই চর্যার মূল রহস্য মুনিদত্ত বেশ সহজ করিয়া টীকায়

বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই যে পর্বতবাসিনী শবরকন্যা ও উন্মত্ত শবরের দেহাসক্তি—ইহার মধ্যে দুইটি নরনারীর তীব্র আসক্তিপূর্ণ জীবনলীলা স্বল্পতর পরিবেশে চমৎকার ফুটিয়াছে। চর্যাগীতিকার সর্বশেষ পদটি (৫০শ সংখ্যক) এইরূপ চিত্রসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে। শবরের বাড়ীর চারিদিকে কার্পাস ফুল ফুটিয়াছে, রাত্রির আকাশে জ্যোৎস্না নামিয়াছে, কাঁকনি দানা পাকিয়াছে। শবর-শবরী কাঁকনি দানা হইতে প্রস্তুত আসবপানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরা শবরী মাতেলা।
অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥

অনু: ওরে কাঁকনি দানা পাকিয়া উঠিল, (তাহা খাইয়া) শবর ও শবরী মাতিয়া উঠিল। অনুদিন শবর কোন কিছুতেই জাগ্রত হয় না, সে মহাসুখে বিভোর হইয়া গেল।

একটি গৃহস্থবধূ টিলার উপরে বাস করে, পাড়াপড়শী নাই, নিরন্ন সংসার, তবু অতিথি আসিয়া ভিড় করে। ভেকের সংসারের মতো বহু অপত্যবিশিষ্ট দুঃখের জীবন (পদ—৩৩)। ইহার তাৎপর্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর নিকট গভীর অর্থবহ সন্দেহ নাই; কিন্তু দারিদ্র্যক্লিষ্ট গৃহিণীর বিড়ম্বিত জীবনটি স্বল্পতম রেখার সাহায্যে ছোট গল্পের উপাদানে পরিণত হইয়াছে। কাহ্নপাদ আচার্যের মহিমা বিলাইয়া দিয়া ডোমযুবতীকে 'সাঙা' করিবার জন্য ব্যাকুল হইযা পড়েন। 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ' (ওরে ডোম্বি, তোকে আমি সাঙা করিব)। ডোমনীর প্রেমে মজিয়া কাহ্নপাদ কাপালী-যোগীর নগ্ন বেশ ধারণ করেন। যোগীরা নটপেটিকায় পোষাক লইয়া 'নাটুয়া' হইয়া বেড়ায়; কাহ্ন নটের পেটিকা ত্যাগ করিয়া পরিলেন হাড়ের মালা। নীচজাতীয়া রমণীর প্রেমে মত্ত হইয়া আচার্য কাহ্নপাদ জাতিপাঁতির আভিজাত্য বিলাইয়া দিলেন (পদ—১০)। এই সমস্ত পদে তত্ত্বরসের অতিরিক্ত একটা আখ্যানের ইঙ্গিতও আছে। কোথাও কোথাও পদকর্তা অতি সহজেই দুই-চারিটি রেখার সাহায্যে পূর্ণতর চিত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। রাত্রিতে বধূ ঘুমাইয়া আছে। চোর সেই অবসরে বধূর কর্ণাভরণ চুরি করিয়া পলাইল। শ্বশুর নিদ্রিত, বধূটি জাগিয়াছে। কোথায় গিয়া সে কানের অপহৃত অলঙ্কার খুঁজিবে? (পদ—২) কিংবা শুঁড়িনী মেয়েটি চিকণ বাকলে মদ বাঁধিয়া রাখে। দুয়ারে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখিয়া মদ্যপায়ীর দল আপনিই আসিয়া হাজির হয়, সারি সারি চৌষট্টি ঘড়ায় সুরা ভরা রহিয়াছে, ক্রেতা দোকানে ঢুকিয়া মদ খাইতে শুরু করে; আর

বাহির হইতে চায় না, ছোট একটা ঘড়ায় সরু নল দিয়া মনের সাধে মদ গিলিয়া চলে (পদ—৩)। এখানেও লক্ষণীয় কত সহজে স্বল্পতম বর্ণনায় শুঁড়িবাড়ী ও মদ্যপায়ীদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শুধু চিত্রধর্মই নহে, গোটাকয়েক প্রহেলিকাজাতীয় চর্যার রচনা-কৌশলও প্রশংসনীয়। কাছিম দুহিয়া পাত্রে ধরিতেছে না, গাছের তেঁতুল কুমীরে খাইয়া ফেলে, উঠানকেই ঘরের মত ব্যবহার করে (পদ—২)। কিংবা শাশুড়ী-ননদ-শালীকে মারিয়া, মাকে আঘাত করিয়া কাহ্নপাদ কাপালিক হইলেন (পদ—১১); বলদ বিয়াইল, গাই রহিল বন্ধ্যা, তিন সন্ধ্যা পাত্র ভরিয়া তাহাকেই দোয়া হয়। যে বুদ্ধিমান, সেই বুদ্ধিহীন; যে চোর, সেই সাধু, রোজই শিয়ালে সিংহের সহিত যুঝে—এই রহস্যসঙ্কেত করিয়া চর্যাকার ঢেণ্ঢণপাদ বলিতেছেন, "ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ"—তাঁহার গান কম লোকেই বুঝিতে পারে (চর্যা—৩৩)। অথবা, ডোম্বীর ঘরে আগুন লাগিয়াছে, চন্দ্রের দ্বারা জল সেচা হইতেছে। আগুনের শিখাও দেখা যায় না, ধোঁয়াও নাই। হরি হর ব্রহ্মা—তিন জনেই পুড়িতেছেন (চর্যা—৪৭)। এই সমস্ত প্রহেলিকা পদগুলিও গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাদের বাহ্যিক অর্থের সহিত উদ্দিষ্ট অর্থের কোন মিল নাই। এই প্রহেলিকাগুলি বাহ্যতঃ স্ববিরোধী, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই, কিন্তু অন্তরে রহিয়াছে গভীরতর সঙ্গতি।

চর্যাকারগণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় চেতনার বশে এই পদগুলি রচনা করিলেও তাঁহাদের অনেকেরই রীতিমতো কবিত্বশক্তি ছিল। প্রতীকরূপকের সাহায্যে চিত্রসৃষ্টি, আখ্যানের ইঙ্গিত, মানবচরিত্রের মধ্যে সুখদুঃখ-বিরহমিলনের দৈনন্দিন জীবনচিত্র চর্যার দর্শন ও তত্ত্বের নিষ্প্রাণতাকে কাব্যরসের স্পর্শে সজীব করিয়াছে। প্রাচীন যুগের বাঙালী সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ মূলতঃ সাধক হইলেও কবিত্বশক্তিতেও যে ন্যূন নহেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

॥ ৬ ॥

বাঙালী ও চর্যাগীতিকা

চর্যাগীতিকার আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' প্রকাশিত

হইবার পর বহু বাঙালী ভাষাতাত্ত্বিক, সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি চর্যা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। এই সম্মিলিত গবেষণার ফলে চর্যাগীতিকার স্বরূপ অনেকাংশে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; ইহার দুর্বোধ্যতা সত্ত্বেও অনেকেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহা প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় রচিত—যখন মাগধী অপভ্রংশের অঞ্চলতল ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষা সবেমাত্র পথে বাহির হইয়াছে; উপরন্তু ইহাতে সাধন-ভজন-সংক্রান্ত এমন সমস্ত গুহ্য ইঙ্গিত ও প্রতীকের আভাস আছে যে, আধুনিক যুগের পাঠক ইহার মর্মার্থ সহজে বুঝিতে পারে না। তবু ইহা বাংলাই। চসারের *Canterbury Tales*-এর ইংরাজী ভাষার সহিত ১৯শ শতাব্দীর ইংরাজী ভাষার যে সম্পর্ক, চর্যার ভাষার সহিত পরবর্তী কালের বাংলা ভাষার সম্পর্ক তদপেক্ষা দূরতর নহে।

চর্যাগুলির অধিকাংশই যে বাঙালীর রচিত, এবং বাঙলা দেশই যে ইহার পটভূমি, তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। অবশ্য বাঙলার সন্নিহিত প্রদেশ হইতেও দাবীদারগণ অনুরূপ দাবী-দাওয়া লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশের শব্দ আছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত কবিতে চাহেন। ইহার মধ্যে দুই-একটি মৈথিলী ও ওড়িয়া শব্দ আছে, তজ্জন্য মিথিলা ও উড়িষ্যাবাসীরা চর্যাগীতিকাকে তাঁহাদেরই দেশের সাহিত্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। চর্যার পটভূমিকার ভৌগোলিক সংস্থান ঠিক অধুনাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিতেছে না বলিয়াই চর্যার স্বরূপ লক্ষণ লইয়া কিছু কিছু মতভেদ হইয়াছে। উত্তর-বিহার, কলিঙ্গ, বাঙলা ও কামরূপ —প্রধানতঃ এই অঞ্চলসমূহ চর্যার পটভূমিকারূপে পরিগণিত হইতে পারে। খ্রীঃ ১০ম—১২শ শতকে মগধ হইতে কামরূপ পর্যন্ত অঞ্চল পালবংশের শাসনাধীনে ছিল। সেনবংশের আমলে সে সীমা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া মিথিলায় লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত ছিল। সুতরাং প্রাচীন বাঙলার সীমা যে তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং তাহার ফলে সেই সমস্ত প্রান্তীয় অঞ্চলে বাংলা ভাষার আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম, মেদিনীপুরের কাছাকাছি উড়িষ্যার কিয়দংশ এবং আসামের বহুলাংশের বাংলা ভাষার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। নৌবাহনের নানা দৃষ্টান্ত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক স্তরবিন্যাস, প্রবচন-সূক্তির ব্যবহার, পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় চর্যার বাক্যাংশের আকস্মিক প্রতিধ্বনি, ইত্যাদি বিচার করিয়া চর্যাগীতিকার মূল

উৎস যে প্রাচীন বঙ্গ-সুহ্ম সমতট-কামরূপ প্রভৃতি ভৌগোলিক অঞ্চলেই নিহিত ছিল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

প্রথমেই গীতিকারগণের কৌলিক ও ভৌগোলিক পরিচয় লওয়া যাক। তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় চৌরাশি সিদ্ধার স্থানকাল সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে; সেই সমস্ত তথ্যকে অবশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। তবে একথা সত্য যে, চৌরাশি সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাঁহারা চর্যা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বাঙলা দেশের সন্তান ছিলেন। লুই বাঙালী ছিলেন। ভুসুকুও বাঙালী ছিলেন, তাঁহার পদেই ('আজি ভসুকু বঙ্গালী ভইলী') তাহার প্রমাণ আছে। কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদ বাঙালী ছিলেন কি-না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় তাঁহাকে বহু স্থলে ভারতবাসী বলা হইয়াছে। আর-একস্থলে তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ বলা হইযাছে। একাধিক কৃষ্ণচার্য বিভিন্ন সময়ে বর্তমান ছিলেন। চর্যাকার কৃষ্ণাচার্য কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিব্বতী জনশ্রুতি অনুসারে কৃষ্ণাচার্য সোমপুরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই সঙ্ঘারামে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। তাঁহার যে কয়টি পদ চর্যাগীতিতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বহু বাংলা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বাঙলা দেশে প্রচলিত নাথধর্মের গল্পকাহিনীতে জালন্ধরিপাদের শিষ্য কানুপা এবং চর্যার কাহ্নপাদ একই ব্যক্তি। সুতরাং এই সমস্ত অনুমানের বলে কৃষ্ণাচার্য বা কাহ্নপাদকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" সরহপাদ সম্বন্ধেও নানা মতভেদ আছে। সুম্পা-মখন্-পে'-র (Sumpa Mkhan Po) মতে সরহ পূর্বদেশে এক ব্রাহ্মণের ঔরসে ডাকিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই পূর্বদেশ কামরূপ হওয়া সম্ভব। তিনি নাকি কিছুকাল উড়িষ্যাতেও বাস করিয়াছিলেন। তিব্বতী গ্রন্থে একাধিক সরহের উল্লেখ আছে বলিযা কোন্ সরহ বাঙালী ছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অন্যান্য চর্যাকারগণ বঙ্গ-সুহ্মের অধিবাসী ছিলেন কি-না সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই। উড়িষ্যা, মিথিলা, মগধ, বঙ্গ-সুহ্ম-সমতট, কামরূপ—প্রধানতঃ এই অঞ্চল হইতেই তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। যে অঞ্চল হইতেই তাঁহারা উদ্ভূত হউন না কেন, পদ রচনা করিবার সময় তাঁহারা প্রত্যেকে মাগধী বংশসম্ভূত 'বঙ্গাল-বাণী'কেই কাব্যভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্য অঞ্চলে

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই চর্যার ভাষায় অন্যান্য অঞ্চলের দুই-একটি শব্দের প্রভাব দেখা যায়।

চর্যাপদাবলী পাঠ করিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে যে, কবিগণ বোধহয় সমাজজীবনের উচ্চস্তরের অধিবাসী ছিলেন না, এবং যাহাদের জন্য এই পদ রচিত হইয়াছিল তাহারাও সমাজের পঙ্কস্তরেই বাস করিত। কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, চর্যাকারগণের অনেকেই ছিলেন সমাজের অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ রাজপুরুষ, কেহ রাজপুত্র, কেহ-বা কায়স্থ বা রাজকরণিক। তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় সরহপাদকে মহাব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, কুক্কুরীপাদও ছিলেন বাঙলার ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। বিরূপাকে তেঙ্গুর তালিকায় যেভাবে 'আচার্য-মহাচার্য' 'মহাযোগী যোগীশ্বর' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে উচ্চ বংশজাত বলিয়াই অনুমিত হয়। ইনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন। তিল্লোপা চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কাহ্নপা সম্ভবতঃ কায়স্থসন্তান ছিলেন। বীণাপাব জন্ম হয় গৌড়ের ক্ষত্রিয়-বংশে। লুইপা কায়স্থ, ডোম্বীপা ক্ষত্রিয়, নাড়োপা ও ভদ্রপা ব্রাহ্মণ, ছিলেন ভুসুকু রাজবংশজাত—ইঁহারা সকলেই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। অল্প কয়েকজন নিম্নবর্ণ হইতেও আসিয়াছিলেন। শবরীপা, তান্ত্রীপা, কঙ্কণপা—ইঁহারা শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চর্যাকারগণের অনেকেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিছু কিছু শূদ্র বা নীচ শ্রেণীর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেই নামগুলি অধিকাংশ ছদ্মনাম বলিয়াই বোধ হয়।

চর্যার মধ্যে যে শ্রেণীর সমাজজীবনের প্রতিফলন হইয়াছে, তাহাতে উহাকে অন্ত্যজশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ—ইঁহাদের জীবনধারার উল্লেখ ইহাতে প্রায়ই অনুপস্থিত। যেখানে ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, সেখানেই তাহা ব্যঙ্গচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে ('ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া' অর্থাৎ নেড়া ব্রাহ্মণ)। 'মতিএ ঠাকুরক পরিনিবিতা' (১২ সং)—এই পদে দাবা-খেলার ছলে রাজা ও মন্ত্রীর উল্লেখ আছে। ৮ম সংখ্যক পদে সোনারূপার বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে। ৪৮শ সংখ্যক চর্যায় রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে। ৪৯শ সংখ্যক চর্যায় নির্দয় দস্যু কর্তৃক দেশলুণ্ঠনের চিত্র আছে। মাত্র এই কয়টি পদে উচ্চ বংশ, বর্ণশ্রেণী ও রাজা-রাজবংশ, দেশজয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে বটে। কিন্তু দুই-চারিটি পদ ছাড়িয়া দিলে আর সমস্ত পদে কখনও নীচ অন্ত্যজ জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কখনও-বা দরিদ্র জীবনের বেদনাপূর্ণ চিত্রকল্প ব্যবহৃত

হইয়াছে। এই যে ব্যাধ, শবর, তাঁতি, শুঁড়ি, মাহুত, কাপালিক, নট-নটী প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে, কেবল এইগুলিতেই বাঙালী সমাজের নিম্ন স্তরের উজ্জ্বল চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। শুঁড়ির দোকানে মদ্যপান (৩য়সংখ্যক চর্যা), হরিণশিকার (৬), মদমত্ত মাতঙ্গ ধরার বর্ণনা (৯), ডোম-ডোমনীর প্রেমাসক্তি (১৮), মাতঙ্গী ডোম্বী কর্তৃক নৌকাবাহন (১৪), ডোমনী-আসঙ্গ (১৮), ডোমনীর বিবাহ ও রসরঙ্গ (৯), শিকারীদের চিত্র (২০), তাঁতিদের বয়নকৌশল (২৫), তুলাধুনার চিত্র (২৬), পর্বতচূড়ায় শবরকন্যার চিত্র (২৮) এবং কাঁকনি দানার নির্যাস পান করিয়া মত্ত শবরজীবনের যে আলেখ্য গুলি (৫০) রূপকাকারে ব্যবহৃত হইযাছে, তাহা সমস্তই বর্ণাশ্রমধর্মের বহির্ভূত সমাজের চিত্র। শবর, ডোম, শুঁড়ি, তাঁতি, শিকারী—ইহাদের জীবন ও জীবিকার যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, এই চিত্রকল্পগুলি প্রধানতঃ নীচ সমাজ হইতে গৃহীত, এবং তাহাদেব প্রতি উদ্দিষ্ট। ইহাতে আসঙ্গলিপ্সার উদ্দাম বাসনা, যৌনশিথিলতার একাধিক ইঙ্গিত, পরস্ত্রী-আসক্তির স্পষ্ট উল্লেখ, মদ্যপান এবং আসবমত্ততার যে সহজ বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে – এই সমাজে বর্ণাশ্রম সমাজবহির্ভূত অসৎশূদ্র ও জল-অনাচরণীয় শ্রেণীর কথাই অধিকতর স্থান পাইয়াছে। কিছু কিছু দারিদ্র্য-জীবনের চিত্রও আছে। যে ডোম্বী খেয়া পারাপার করে, সে 'কবড়ী ন লেই, বোড়ী ন লেই, সুছড়ে পার করেই' (কড়ি নেয় না, বুড়ি নেয় না, নির্বিরোধে পার করিয়া দেয়) – ইহাতেই পদকর্তা উল্লসিত হইযাছেন। দরিদ্রা গর্ভিণীর উক্তি, 'হাঁউ নিরাসী খমণ ভতারে' (আমি আশাহীন, স্বামী ক্ষপণক), টিলায় যাহার ঘর সেই দরিদ্রার বাড়ীতে নিত্য অতিথি আসে, নির্দয় দস্যু সব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, 'সোণা রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ' (সোনারূপা মোর কিছুই থাকিল না) বলিয়া পদকর্তার দুঃখপ্রকাশ – ইত্যাদি বর্ণনায় দারিদ্র্য-জীবনের কিছু কিছু চিত্র আছে। এ সমস্ত চিত্রই বাঙলা দেশের পরিচিত চিত্র। তবে দারিদ্র্যেব চিত্র অপেক্ষা শবর-শবরীর আদিম মত্তলীলা অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে। কবিগণ যেখানে নরনারীর মিথুনলীলাকে রূপক রূপে ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের তত্ত্বকথাও আদিরসের মত্ততায় একট রসরূপ লাভ করিয়াছে। সে যাহা হউক, এই পদগুলিতে গুহাহিত তত্ত্বকথাকে যে রূপকের মধ্যে গোপন করা হইয়াছে, তাহা যে নিতান্তই সাধারণ মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করিয়াছে, ইহাই লক্ষণীয়।

এই চর্যাসংগ্রহের পটভূমিতে বাঙলা দেশেরই ভৌগোলিক পরিচয় বিরাজ করিতেছে। যাঁহারা চর্যাপদ ও চর্যাকারগণকে মগধ ও উড়িষ্যার মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করেন, তাঁহারা বোধহয় চর্যার এই উৎপত্তিরহস্য বিচার করিয়া দেখেন নাই।

চর্যার পটভূমি হইল নদীমাতৃক বাঙলা দেশ. নদনদী, নৌযাত্রা, নৌকাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারিভাষিক নাম, নৌবাণিজ্য, জলদস্যুদের হানা, পথে বাট-পাড়ের ভয় – এ সমস্তই বাঙলা দেশের চিত্র।) ৫ম সংখ্যক পদে নদী ও সাঁকো, ৮ম সংখ্যক পদে নৌবাণিজ্য (এই পদে নৌকার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব নাম—খুঁটি, কাছি, কেড়ুয়াল প্রভৃতির উল্লেখ আছে), ১৩শ সংখ্যক পদে নৌকার বিস্তারিত বর্ণনা (ত্রিশরণ নৌকা, আটটি কামরা, পঞ্চ কেড়ুয়াল, চিত্তকর্ণধার, গলুই), ১৭শ সংখ্যক চর্যায গঙ্গাযমুনার মাঝে ডোম্বীর নৌকাবাহন, সেই নৌকাব পাঁচ বৈঠা, গলুযে কাছি বাঁধা, জল সেঁচিবার সেঁউতি, মাস্তুল প্রভৃতিব উল্লেখ রহিযাছে। ডোম্বী আবার বিনা কড়ি-বুড়িতে পার করিয়া দেয বলিযা পদকর্তা আনন্দিত হইযাছেন। ১৫শ সংখ্যক চর্যাযও নৌকাভেলাব চিত্র আছে। ৩৮শ সংখ্যক চর্যায নৌকা, কেড়ুয়াল, পতবাল, নাভি, গুণটানা, কূল ধরিযা খরস্রোতে উজানে অতিবাহন প্রভৃতির নৌজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা নদীমাতৃক বাঙলা দেশকেই স্মরণ করাইয়া দেয। বিহার ও উড়িষ্যা প্রধানতঃ নদীমাতৃক দেশ নহে এবং এই চযাসমূহ কেবল ঐ অঞ্চলে অথবা ঐ জনপদের অধিবাসীদের দ্বারা বচিত হইলে ইহাতে নদনদী, নৌকা, সেতুরচনা, নৌকাব দ্বারা পারাপাব করাব এতগুলি পদ কখনও স্থান পাইত না। অবশ্য শুঁড়ি, তাঁতি, ধুনুরী, প্রভৃতির চিত্রগুলি শুধু বাঙলা দেশেব সহিত সম্পৃক্ত নহে, উড়িষ্যা ও বিহার অঞ্চলেও ঐ বৃত্তিধারী জনসাধারণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কোন কোন পদে (৪৫শ সংখ্যক) ছুতার শ্রেণীর ('জো তরু ছেব ভেবউ না জানই'—অর্থাৎ যে গাছকে ছেদ ও ভেদ করিতে জানে না) উল্লেখ আছে। আমাদের মনে হয, যে সমস্ত চর্যায় নদনদী, নৌবাহন ও ধীবব শ্রেণীর উল্লেখ আছে, সেগুলিকে বিশেষভাবে বাঙলা দেশের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে। কযেকটি পদে মত্তহস্তী, হাতী ধরিবার রীতিব উল্লেখ আছে। কামরূপ অঞ্চলের কোন সিদ্ধাচার্য হয়তো এই পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্ব-ভারতে বহু পূর্ব হইতেই হস্তিপালন ও হাতী-ধরা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল। হস্তিচিকিৎসক ঋষি পালকপ্য এই অঞ্চলেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া বসবাস

করিয়াছিলেন। যে সমস্ত পদে হস্তীর উল্লেখ আছে, সেগুলি বাঙলার পূর্বসীমা ও কামরূপে রচিত হওয়া সম্ভব। সরহপাদের 'বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে ভাগেল তোহর বিণাণা' (বঙ্গে জায়া নিয়াছে, পরে ভাগিল তোমার বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি), অথবা ভুসুকুপাদের 'আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥' (আজ ভুসুকু বাঙ্গাল হইলি, তুই নিজ গৃহিণীকে চণ্ডালী লইলি) প্রভৃতি পদে 'বঙ্গাল' শব্দটি বৌদ্ধসহজিয়া মতের গূঢ়ার্থবাচী পারিভাষিক হইলেও ইহার দেশবাচক বাহ্যার্থ অস্বীকার করা যায় না।

বঙ্গদেশবাচক চিত্রকল্প ছাড়িয়া দিলেও চর্যাগীতিকায় মাঝে মাঝে এমন সমস্ত বাগ ভঙ্গিমা ও শব্দযোজনা কৌশল রহিয়াছে যাহা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' (আপনার মাংসই হরিণের শত্রু), 'হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ', (হাতে কাঁকণ থাকিতে দর্পণ নিও না), 'বর সুণ গোহালী কিমো দুঠ্ঠ বলন্দেঁ' (বরং শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট বলদে কি হইবে?) ইত্যাদি বাগ্ধারা পরবর্তী কালে বাঙলা দেশের বাক্‌রীতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী'—এই বাক্‌রীতিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীমঙ্গলে (মুকুন্দরাম) ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য চর্যাগীতিকায় ব্যবহৃত এই বাগ্ধারা যে পরবর্তী কালের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, অর্থাৎ ঐ বাক্‌রীতি পরবর্তী বাংলা ভাষায় অনুসৃত হইয়াছে, তাহা না বলিয়া বরং বলা যাইতে পারে, বাঙলা দেশে লোকজীবনে যে সমস্ত প্রবচন ও বাগ্ধারা প্রচলিত ছিল, তাহাই চর্যাপদে গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই একই উৎস হইতে মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাগ্‌বৈশিষ্ট্যগুলি প্রবেশ করিয়াছে।

চর্যায় যে পানভোজন, নৃত্যগীতাদি ও দৈনিক জীবনের বর্ণনা আছে, তাহাকে কেহ কেহ বিশুদ্ধ বাঙালী-জীবনচিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চান। আসবমত্ত শবরশবরী, দরিদ্র শবরের জীবনযাত্রা, ডোম-ডোমনীর বিবাহ, 'সাঙ্গা', বুদ্ধনাটকাভিনয়, নটপেটিকাধারী কাপালিকের নৃত্যগীত, ডোম রমণীর চাঙাড়ী বিক্রয়, শাশুড়ী, বহুড়ী, ননদী প্রভৃতির যে সমস্ত রূপকচিত্র আছে, তাহা বাঙলা দেশের হইতে পারে, বাঙলা দেশের বাহিরের হইতেও বাধা নাই। অর্থাৎ এই সমস্ত সমাজচিত্র ও গার্হস্থ্যচিত্রকে বিশেষভাবে বাঙালীর জীবনচিত্র বলিয়া দাবী করা যুক্তিসঙ্গত নহে। মগধ, উড়িষ্যা, বাঙলা ও

কামরূপ—চর্যায় এই সুবিস্তৃত পটভূমিকায় ঐরূপ সমাজজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবনের রেখাচিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন আচার্য মগধ, কলিঙ্গ, উড্ডীয়ান প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন বাংলা ভাষাকে বাহন হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের স্ব স্ব অঞ্চলের জীবনধারার দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন—তাহাই স্বাভাবিক। তাই উল্লিখিত চিত্রগুলিকে শুধু বাঙলা দেশের চিত্র বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না। তবে একথা সত্য যে, চর্যার অধিকাংশ রূপক ও চিত্র বাঙলা দেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, কিন্তু কিছু কিছু চিত্রকল্প বাঙলার সন্নিহিত অঞ্চলের হওয়াও অসম্ভব নহে।

ইহাতে যে সমাজজীবন ও গার্হস্থ্যজীবনের রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা অবলম্বনে তৎকালীন ভদ্রেতর সমাজেব একটা ছাযারূপ অবধারণ করা যায়। সে সমাজ ঈষৎ হীন অন্ত্যজের সমাজ, সেখানে যৌনজীবন কিছু শিথিল, অসংযমত্তা নিন্দনীয় নহে, দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদী-বহুড়ী পরিবৃত বৃহৎ সংসার, হীনবৃত্তিজীবী অষ্ট্রিক কৌমের জনসাধারণের জীবনায়ন, জলদস্যুদের উৎপাত, পথে বাটপাড়ের ভয। তাঁতি, শুঁড়ি, ধুনুরী, কৃষাণ, কৈবর্ত্ত ডোম-শবরী প্রভৃতি নিম্নস্তরের মানুষ ও জীবনের যে প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার দ্বারা খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের ভদ্রেতর সমাজের একটা স্থূল চিত্ররূপ লাভ করা যায়। পদকাবগণ ইহাতে শুধু ভদ্রেতর চিত্রকেই বিশেষভাবে ব্যবহার কবিযাছেন। হযতো 'সন্ধ্যা' ভাষার ইঙ্গিতে এইরূপ স্থূল চিত্রকল্পের উদ্দিষ্ট অর্থ সুগোপন করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অথবা হয়তো সমাজে ব্রাহ্মণ্যশাসিত ও পুরাণপ্রভাবান্বিত উচ্চবর্ণেবা পালযুগেও স্ব স্ব আচারবিচার লইয়া মত্ত হইয়াছিলেন, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার্যগণ হীন সমাজের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টের প্রভাবে হিন্দুসমাজের পুনর্জাগৃতি আবস্ত হইলে বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্যগণ শিষ্য ও গ্রন্থ লইযা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা এদেশ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা কখনও ছদ্মবেশের অন্তরালে, কখনও হীন ও অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া, ঐ শ্রেণীর বোধগম্য স্থূল রূপকের সাহায্যে স্বীয় ধর্মমতকে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৪শ শতাব্দীতে যখন মুনিদত্ত চর্যাগীতিকার সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তখন ইহা আর শুধু অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে সংগুপ্ত হইয়া ছিল না। ব্রাহ্মণসমাজের কৌতূহলী দৃষ্টি

ইহার প্রতি আকৃষ্ট না হইলে মুনিদত্ত ইহার সংস্কৃত টীকা করার কথা চিন্তাও করিতেন না।/ এইজাতীয় 'কাযাসাধনা' ব্রাহ্মণসমাজেও অজ্ঞাত ছিল না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেও তাহার প্রচুর আভাস-ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইসব কারণে চর্যাগীতিকা হযতো ১৪শ শতাব্দীর দিকে কেবলমাত্র গুহ্য তান্ত্রিকবৌদ্ধদের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল না। পরবর্তী কালে নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে অনুসৃত হইয়াছিল। সুতরাং চর্যাপদের সহিত বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্যের কৌলীন্য-বন্ধন রহিয়াছে—তাহা যে-কোন পাঠক স্বীকার করিবেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে ইহার দাবীদারগণ উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের যুক্তি যথেষ্ট সারবান্ নহে বলিয়া তাহা কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সদ্য নির্মীযমান বাংলা ভাষায় যাঁহারা দুরূহ তত্ত্বকে সহজবোধ্য রূপকের সাহায্যে প্রকাশ কবিতে চাহিযাছিলেন তাঁহাবা প্রধানতঃ ধর্মসাধনাব আচায হইলেও অনেকেই কবিত্বশক্তিবর্জিত ছিলেন না। তাই চর্যাগীতিকার বহু স্থলে কবিত্বের বিস্ময়কর ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। শুধু কবিত্বই নহে, চযাপদ আবিষ্কৃত না হইলে যেমন বাংলা ভাষার আদিম স্তরের লক্ষণ ধরা পডিত না, তেমনি পালযুগের সাধারণ বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির কোন পরিচয়ই পাওযা যাইত না। সেইজন্য চযাগীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের আদিম স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন বলিযা বিবেচিত হওয়াতে প্রাচীন বাঙালীর জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে অনেক রহস্যের সমাধান হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

প্রথম পর্বের উপসংহার

॥ ১ ॥

প্রাচীন যুগে রচিত বলিয়া পরিচিত গ্রন্থাদি

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব আলোচনাপ্রসঙ্গে চর্যাগীতির কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু অনুমান করিয়াছেন যে, ৮ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশে নাথসাহিত্য, কথাসাহিত্য (রূপকথা), শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন ছিল। আমাদের মনে হয়, লিখিত প্রমাণ ব্যতিরেকে জনশ্রুতিলব্ধ প্রমাণকে সাহিত্যের ইতিহাসে সাবধানে গ্রহণ করা কর্তব্য। একদা সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর দিকে শৈব নাথধর্ম প্রবল হইয়াছিল। হিন্দুতন্ত্র শৈবমত, হটযোগ, বৌদ্ধতন্ত্র ইত্যাদির সমবায়ে এবং 'সিদ্ধ' দর্শনের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ একপ্রকার ধর্মীয় সাধনা বাঙলা দেশেও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই শৈব নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলা দেশে ও বাঙলার বাহিরে ১০ম-১২শ শতাব্দীতে অনেক গল্প ও পাঁচালী প্রচলিত ছিল। তবে ঐ আখ্যানগুলি ঐ সময়ে লোকমুখ ত্যাগ করিয়া সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল কি-না সন্দেহ। ঐজাতীয় কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাপ্ত পুঁথির কোনখানি ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে নাথধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে না। অবশ্য প্রাচীন যুগে নাথধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সেই ছড়া-পাঁচালীগুলি লিখিত আকার গ্রহণ করিয়াছে অনেক পরে—১৮শ শতাব্দীর পূর্বে নহে। অতএব ১৮শ শতাব্দীর সাহিত্যালোচনা-প্রসঙ্গে শৈব নাথ-সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ অধিকতর সমীচীন হইবে।

কথাসাহিত্য, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচন—ইহাও প্রাচীনকালের রচনা নহে। কথাসাহিত্য অর্থাৎ রূপকথার কোন ঐতিহাসিক রূপ নাই, দীর্ঘকাল ধরিয়া মুখে মুখে এই সমস্ত কাহিনী চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রূপকথা পুঁথির বন্ধন স্বীকার করে নাই। ফলে

ইহাদিগকে ঐতিহাসিক পর্যায়ে ফেলিয়া আলোচনা করা দুষ্কর। অন্ততঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর রচনা বলিয়া এগুলিকে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ই সর্বপ্রথম এই সমস্ত রূপকথাকে রেখার বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে এই রূপকথার স্থান অতিশয় সঙ্কুচিত।

শূন্যপুরাণের রচনাকালও ১০ম ১২শ শতাব্দীতে পৌঁছাইতে পারে না। যে আকারে এই বিচিত্র গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না, বরং পরবর্তীকালে রচিত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। এই সব কারণে আলোচ্য পর্বে শূন্যপুরাণের মতো সংশয়পূর্ণ গ্রন্থকে আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

ডাক ও খনার বচন প্রথমতঃ সাহিত্য নহে, দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনের কোন লিখিত প্রমাণ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী বহু অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা এই ছড়-প্রবচনে ধরা পড়িয়াছে। ডাক ও খনার নামে এইসমস্ত সূক্তি চলিয়া আসিতেছে। এই সংশয়পূর্ণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবচনগুলির ঐতিহাসিক উদ্ভবকাল আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে। যে আকারে এগুলি আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার ভাষা অতিশয় আধুনিক; দুই-চারিটি পারিভাষিক শব্দ সত্ত্বেও ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রচলিত ছড়া-প্রবচনগুলিকে কিছুতেই প্রাচীন বলা যায় না। খনার—

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত।
তার ভাগ্যে হা-ভাত॥

অথবা ডাকের

গাছ রুইলে বড় কর্ম,
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম;
যে দেয় ভাত শালা পানী শালী।
সে না যায় যমের বাড়ী॥
স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান।
বলে ডাক স্বর্গে যান॥

এই উক্তিগুলির ঐতিহাসিক প্রাচীনতা লইয়া আলোচনা করা নিষ্ফল

পণ্ডশ্রম মাত্র। চর্যা ও দোঁহার সহিত মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে যে, ডাক ও খনার বচন লইয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ নাই।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থকেই প্রাচীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তখন অপভ্রংশের প্রভাব ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষা কেবল স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছিল। এই আদি যুগের ভাষার অন্যান্য সামান্য নিদর্শন পাওয়া গেলেও (যেমন অমরকোষের টীকাকার বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দের 'টীকা-সর্বস্ব' উল্লিখিত অনেকগুলি দেশী শব্দ), সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে কেবলমাত্র সিদ্ধাচার্যগণের রচিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের পদসঙ্কলন চর্যাগীতিকাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়।

॥ ২ ॥

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা

বাঙালীর প্রাচীন পর্বের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে তদানীন্তন জীবন ও সংস্কৃতির একটা মূল পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। পালযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা, কৌলমার্গ, নাথপন্থ, হিন্দুতান্ত্রিকতা ইত্যাদির মধ্যে একটা সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তখন সমাজের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যস্তরে নূতন করিয়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণের প্রভাব স্থাপিত হইতেছিল। কারণ প্রায় এই একই সময়ে শঙ্করাচার্য ও কুমারিল ভট্টের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ষে আবার পৌরাণিক হিন্দুধর্ম শাস্ত্রসংহিতার অনুশাসন শিরে ধারণ করিয়া হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিল। পালবংশীয়েরা মহাযান মতাশ্রয়ী হইলেও ব্রাহ্মণ্য মতের প্রতি কখনও প্রতিকূল ছিলেন না। বরং তাঁহাদের কেহ কেহ এবং তাঁহাদের মহিষীরা হিন্দুর পুরাণসাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে তখন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আপন আসন অধিকার করিয়াছে; কিন্তু ভদ্রেতর সমাজে কিছু কিছু রহস্যবাদী 'কায়াসাধন' প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন সম্ভবতঃ গোপনে অনুশীলিত হইতেছিল। দোঁহা ও চর্যাগীতিকায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বলিতে গেলে, পালযুগেই অপভ্রংশ ও দেশীয়

ভাষায় রচিত দোঁহা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি অভিজাত সমাজ পুরাণ ও স্মৃতিসংহিতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও সমাজের ভিত্তি-মূলে যে অন্য ভাবধারা বহিতেছিল, বজ্রযান, সহজযান, কুলাচার, নাথধর্ম – প্রভৃতি অর্ধরহস্যবাদী অর্ধদেহবাদী গুহ্যতান্ত্রিক মত দ্রুতবেগে জনচিত্ত গ্রাস করিতেছিল, তাহা বোধহয় সে যুগের উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের অনুমান, পালযুগেই এই সমস্ত দোহা ও চর্যাগীতি ভদ্রেতর চিত্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

পালযুগের ঈষৎ পরবর্তী কালে সেনবর্মণ রাষ্ট্রের প্রভাবে আসিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম বলিয়া গৃহীত হইলে অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষার মূলে সংস্কৃত ভাষা আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাকে কেন্দ্র করিয়া যে সংস্কৃত সাহিত্য অভিজাত মহলে জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ আদিরসাত্মক এবং তাহাতে ভক্তিরসেরও সংমিশ্রণ ছিল। অবশ্য 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' দৈনন্দিন জীবনবিষয়ক কোন কোন বিচ্ছিন্ন পদ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তিম পর্বকে নানা দিক দিয়া বিশেষত্বমণ্ডিত করিয়াছে। লিপিলেখনে মাঝে মাঝে গৌড়ী রীতির ভাবাদর্শ অনুসারে অলঙ্কারবহুল বাক্‌রীতি অনুসৃত হইলেও লক্ষ্মণ সেনের সভাতলে যে বিচ্ছিন্ন পদাবলী ও আখ্যানকাব্যের চর্চা হইত, তাহার রচনারীতি গৌড়ী রীতির অনুরূপ নহে, বরং নানা দিক দিয়া এই ভাবাপদ্ধতিকে বেশ সরল বলিয়াই মনে হয়। যমকশ্লেষের কিছু কিছু অতিরেক সত্ত্বেও ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' প্রভৃতির কাব্যগুণ নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। সর্বোপরি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'। এই গীতগোবিন্দ পরবর্তী আট শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভক্ত সমাজকে আধ্যাত্মিক খাদ্য পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে।

এই যুগসাহিত্য বিচার করিলে তিনটি পৃথক ধারার স্পষ্ট অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে; এই তিনটি ধারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার আদর্শ পরবর্তী কালে নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলসঙ্গীতের মধ্য দিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। এই জাতীয় রচনাবলী প্রধানতঃ ধর্মচর্যা, গৌণতঃ সাহিত্য। দেহকে অবলম্বন করিয়া যে বৈদেহী সাধনা খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী হইতে পূর্ব-ভারতে ভদ্র ও ভদ্রেতর সমাজে গোপনে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী কালে আপনার অস্তিত্ব একেবারে

হারাইয়া ফেলে নাই, জনসাধারণের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের জনজীবন বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥

এই বর্ণনায় এই জাতীয় ধর্মচর্যার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। এই ধারা আরও স্ফীতকায় হইয়া উঠিল, যখন নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) পতিত বৌদ্ধ সহজিয়াগণকে বৈষ্ণবধর্মমণ্ডলে স্থান দান করিলেন। এই জাতীয় দেহকেন্দ্রিক রহস্যাচার সমাজের গোপন সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিত হইত। ভদ্রশ্রেণী ও বর্ণসমাজে এইজাতীয় কায়াসাধনা সম্ভবতঃ সাগ্রহ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যে সংস্কৃত রচনাবলী শুধু লক্ষ্মণ সেনের সভার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাহাই ঈষৎ পরবর্তী কালে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে জীবনরসে পূর্ণ করিয়াছে, তুচ্ছ বাক্‌রীতিকে একটা অননুভূতপূর্ব শিল্পরূপ দান করিয়াছে এবং একটা লৌকিক জীবনধারাকে মহত্তর চিত্তসমুৎকর্ষের শীর্ষমণ্ডলে উন্নীত করিয়াছে। তাই গীতিগোবিন্দকারকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আধ্যাত্মিক জনক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মধ্যযুগীয় বিপুলায়তন সাহিত্যধারা প্রায়ই তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে বাঙালীর ভাব ও ভাবনা একটা বিস্ময়কর রস-সমুন্নতি লাভ করিয়াছে, যাহা শুধু বাঙলা দেশ নহে, বিশ্বের যে-কোন মধ্যযুগীয় সাহিত্যের তুলনায় বিশেষ গৌরব দাবী করিতে পারে। বাংলা সাহিত্যের অন্তস্তল দিয়া একটা গুরুমুখী ও গুহাহিত সাধনচর্যার ধারা বহিয়া গেলেও সমাজের উপর দিয়া বৈষ্ণব রসসাধনা, শিল্পপ্রকরণ ও মানবীয় মহিমার যে তরঙ্গলীলা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার উৎসমূল লক্ষ্মণ সেনের সভাতলে নিহিত।

মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশে ও সমাজে আরও একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। তাহা হইতেছে পৌরাণিক সংস্কৃতির প্রভাব; হিন্দুধর্মের নবজাগরণের মুহূর্তে পুরাণকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও স্মৃতিসংহিতার সমাজরীতি বাঙলা দেশকে বর্মের মতো রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের পর বাঙালী আত্মরক্ষার্থ শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া, আপনাকে বহির্জীবন হইতে সঙ্কুচিত করিয়া আত্মস্থ হইয়াছিল। সেই নিরাপদ আশ্রয় হইল উত্তর-ভারত হইতে অর্জিত পৌরাণিক সংস্কার। এই পৌরাণিক সংস্কৃতি, অনুবাদ-সাহিত্য, পুরাণের অনুকরণ, পুরাণ- প্রভাবান্বিত

মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির সহায়তায় বাঙালী তাহার ঐতিহ্যকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করিয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভাতল এবং সমগ্র সেনবংশের শাসনকাল বাঙলা দেশের লোকসংস্কৃতিকে প্রবলতর পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সেই বিচিত্র সংস্কৃতি-সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। আমরা পরবর্তী পর্বের যথাস্থানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কবিব।

লৌকিক সাহিত্যের ধারা অর্থাৎ নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য বা ঐ ধরণের পাঁচালী, ব্যালাড (Ballad) বা আখ্যান বাংলা সাহিত্যের একটা বড অংশ অধিকার করিয়া আছে। এইজাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে গ্রামীণ বাঙালীর আরও একটা চিত্তপ্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। পৌবাণিক সংস্কৃতি সেন-বর্মণ বংশের শাসনকালে বাঙলা দেশকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙালীব দেহের অন্তস্তল দিযা যে অস্ট্রিক শোণিতধারা বহমান, যে মনঃপ্রকর্ষ দীর্ঘকাল ধরিযা নানা 'টোটেম' ও 'ট্যাবু' (Totem-Taboo) প্রতীকের সাহায্যে জীবনকে নিযন্ত্রিত কবিয়া আসিতেছে, তাহা উত্তর-ভারতীয পৌরাণিক সংস্কৃতির আঘাতে সহজে মুছিযা যায় নাই—মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, ছড়া-পাঁচালী প্রভৃতির মধ্য দিযা আত্মরক্ষা কবিয়াছে। অবশ্য এইজাতীয় লৌকিক সাহিত্য পৌরাণিক স্পর্শ বাঁচাইয়া বিশুদ্ধ লৌকিকতাকে দীর্ঘ দিন রক্ষা করিতে পারে নাই। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর পর হইতে প্রবলতর পুরাণীকরণের প্রভাবে লোকসাহিত্য বলিয়া পরিচিত মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে আর্যসংস্কার, পুরাণকাহিনী, নীতিকথা, সংস্কৃত শব্দভাণ্ডাব ও বাগ্‌ভঙ্গিমার সুদৃঢ় প্রতিচ্ছায়া মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সেই লোকজীবন ও পৌরাণিক সংস্কৃতির জীবন লৌকিক ধর্মচর্যা ও ভাগবতধর্মের পাবনী ধারা, বাঙলার নিজস্ব ঋকৃথ এবং উত্তর-ভারতীয় নব্যহিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রবল অভিঘাত বাঙলাকে একটা সমন্বয়মূলক বিচিত্র সাহিত্য দান করিয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করা হইবে। এই সমন্বয়ের দৃষ্টান্তে কেহ কেহ বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বকে 'হিন্দুবৌদ্ধযুগ' আখ্যা দিয়াছেন। নাথ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও সহজিয়া পদ অনুসারে আদি পর্বকে সমন্বয়মূলক হিন্দুবৌদ্ধযুগ বলা যাইতে পারে। পালগণ মহাযানী মতাবলম্বী হইলেও হিন্দুমতাদর্শের বিরোধী ছিলেন না। কাজেই ৮ম-১২শ শতাব্দীর গৌড়দেশে হিন্দুবৌদ্ধ-সংক্রান্ত সমন্বয়ধারা স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু

চর্যাপদে তাহার প্রকৃষ্ট ছাপ নাই। চর্যা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে নস্যাৎ করিয়া সহজিয়া ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণদের নিন্দাই করিয়াছে। নাথ-সাহিত্যের উপাদান পাওয়া গেলে এই সমন্বয়ের সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইত।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য

আদিপর্বেব বাংলা সাহিত্যের সহিত অন্যান্য সাহিত্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিকাশধারা ও বিচিত্র জীবনকল্লোলের সহিত সিদ্ধাচার্যগণের সাধনভজন-সংক্রান্ত রূপকধর্মী চযাগুলিব কোন দিক দিয়াই বিশেষ সাদৃশ্য নাই, কোনরূপ কৌলিক যোগসূত্রও নাই। তথাপি কৌতূহলী মন বিদেশী ও স্বদেশীয় প্রাদেশিক সাহিত্যেব বিকাশধাবার সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের স্তবপরম্পবা আলোচনা করিতে সমুৎসুক হইতে পারে।

আদিযুগেব ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। খ্রীঃ ৬৫০ হইতে খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দ পর্যন্ত হইল এ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্যেব যুগ। ভাষার দিক হইতে পরবর্তী কালের ইংবাজী ভাষার সহিত ৭ম-১১শ শতকেব এ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্যের কোন যোগই নাই। তথাপি ইংরাজ জাতির উদয়প্রত্যূষের সাহিত্য বলিয়া এই চারিশত বৎসরের অপরিণতগঠন সাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এই যুগের সাহিত্য যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, ইহার একাংশ অ-খ্রীষ্টান পেগান ধর্মকেন্দ্রিক, আর-একাংশ খ্রীষ্টান ধর্মকেন্দ্রিক; একদিকে ধর্মপ্রচার-সংক্রান্ত নানা কাব্য-কাহিনী, আর-একদিকে বীরত্ব ও দুঃসাহসের নানা কথা দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার বিপুল বিস্তারের সহিত প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই সাদৃশ্য নাই। এই যুগে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—আলফ্রেডের ইংরাজী গদ্যে বাইবেল অনুবাদ। বাংলা সাহিত্যে গদ্য আসিয়াছে অনেক পরে। মৈথিলী ভাষায় গদ্যের নমুনা পাওয়া যাইতেছে খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণন রত্নাকবে'।

নর্মাণ বিজয় (খ্রীঃ ১০৬৬) হইতে চসার (খ্রীঃ ১৩৫০) পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব বিস্তৃত। নর্মাণ বিজয়ের ফলে এ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে ফরাসী জাতির প্রাণরসের অজস্র ঐশ্বর্য নূতন ভাবাবেগ ও শিল্পবৈচিত্র্য বহিয়া আনিল। জীবনের আলোকোজ্জ্বল হাসিকান্নার বিচিত্র বর্ণসমারোহ নর্মাণ প্রভাবের ফলে ইংরাজী সাহিত্যে সম্প্রসারিত হইল। ধর্ম হোক, আর ধর্মবিরহিত সাধারণ জীবনই হোক— নর্মাণ প্রভাবের ফলে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য নাগরিক সাহিত্যের নর্মরূপ লাভ করিল। কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব সম্বন্ধে সেরূপ কোন ইঙ্গিতই দেওয়া যায় না। এই যুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে তবু কিছু বৈচিত্র্য, কিছু অভিনবত্ব আছে, যাহা বহুলাংশে এ্যাংলো-স্যাকশন সাহিত্য ও নর্মাণ বিজয়োত্তর ইংরাজী সাহিত্যের সমতুল্য কিন্তু নবসৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মারকচিহ্ন চর্যাগীতির সহিত বিপুলপ্রসারী ইংরাজী সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলনা চলিতে পারে না। চর্যার বিশিষ্ট ধর্মীয় সাধনা ও রীতিপ্রকরণের সহিত এ্যাংলো-স্যাকশন ও নর্মাণ-প্রভাবোত্তর ইংরাজী সাহিত্যে প্রকাশিত খ্রীষ্টানধর্মাদর্শের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। চর্যা প্রধানতঃ আচরণীয়; ইংরাজী সাহিত্যের আদিপর্বের খ্রীষ্টানী ধর্মসাহিত্য একটা ভাবাদর্শের প্রতীক। এই স্থলেই উভয়ের দুস্তর পার্থক্য।

প্রাচীন ফরাসী ও জার্মাণ সাহিত্যের সহিত আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের তুলনা করিলে এই দুস্তর ব্যবধান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। চর্যাপদের সহিত আদিযুগের ফরাসী সাহিত্যের কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতেই যথার্থতঃ ফরাসী সাহিত্যের সূচনা। লাতিন হইতে ফরাসী ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল; এই উৎপত্তির ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পূর্বে রোমে একপ্রকার চল্‌তি লাতিন জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই চল্‌তি লাতিন পরে য়ুরোপের যেখানে রোম-আধিপত্য ছিল সেখানে ছড়াইয়া পড়ে; এই সময় এই ভাষার নাম হয় রোমান্‌স্ ভাষা (Romance Language)। স্থানীয় উপভাষার সহিত রোমান্‌স্ ভাষার মিলনের ফলে ইতালী, ফরাসী, প্রভেন্সাল, স্পেনীয়, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়। এই রোমানস্ ভাষা হইতে জাত দুইটি উপভাষা ফরাসী সাহিত্যের বাহন হইয়াছিল। (১) উত্তরের ভাষা বা *Language d'oil* এবং (২) দক্ষিণের ভাষা বা *Language d'oc*। এই উত্তরের

ভাষাতেই ফরাসী সাহিত্যের অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। দক্ষিণের ভাষা প্রভেন্স্ প্রদেশের নামানুসারে প্রভেন্সাল ভাষা নামে পরিচিত হইয়াছিল; ইহাতে লাতিনের অধিক প্রভাব দেখা যায়। 'ক্রবেত্বর'দের কবিতা প্রভেন্সাল ভাষার প্রধান সম্পদ। রাজনৈতিক কারণে উত্তরের উপভাষাই (*Languane d'oil*) ফরাসী সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়াছে।

দ্বাদশ শতক হইতে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়। এই সময় ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহাদি অবলম্বন করিয়া একপ্রকার কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল; ইহাব নাম *Chansons de geste*; ইহাকে আদিম ধরণের মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। শার্লামেন প্রভৃতি বীরপুরুষের কাহিনী ইহাব মূল বক্তব্য। এইজাতীয় রচনাব মধ্যে *Chansons de Roland* বিখ্যাত। এই সময়ে ইতিহাসকে বাদ দিয়াও একপ্রকার কল্পনা-প্রধান আখ্যানের জনপ্রিয়তা দেখা গিয়াছিল। এই শ্রেণীর প্রধান লেখক Chretien de Troyes। পূর্ববর্তী *Chansons de geste* অপেক্ষা এই রোমান্সের ভাবাভঙ্গিমা অনেক মার্জিত এবং শিল্পগুণান্বিত। তৃতীয় শাখার রচনা *Fab'iaux* বা উপকথা নামে পরিচিত। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপস্ ফেবল্সের সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে—অবশ্য জীবজন্তুবিষয়ক এই আখ্যানগুলি কবিতাতেই রচিত হইযাছিল। ১৩শ শতাব্দীর শেষে প্রসিদ্ধ উপকথা লেখক Rutobouf-এর আবির্ভাব হয। ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে ফরাসীদেশের দক্ষিণের প্রভেন্সাল ভাষায় (*language d'oc*) 'ক্রবেত্বর'দের গীতি-কবিতা এবং খ্রীষ্টান সাধুসন্তদের জীবনী অবলম্বনে রচিত নাটযাত্রা বিশেষ জনপ্রিয় হইযাছিল।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের (১০ম-১২শ শতাব্দী) সহিত ফরাসী সাহিত্যের কোন তুলনা চলিতে পারে কি? খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দীর মধ্যেই ফরাসী ভাষায় আখ্যান কাব্য, ব্যালাড শ্রেণীর মহাকাব্য, গীতিকবিতা, জীবজন্তু-সংক্রান্ত উপকথা, ধর্মকেন্দ্রিক নাটযাত্রা প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ১০ম-১২শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র চর্যাপদ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বিশাল ফরাসী সাহিত্যের বিচিত্র প্রাণরসের সহিত সিদ্ধাচার্যদের ভজনগীতির সাদৃশ্য নাই বলিলেই চলে।

প্রাচীন জার্মাণ জাতি বহু পূর্বে আর্যভাষা হইতে জাত অনেকগুলি

উপভাষা ব্যবহার করিত। কালক্রমে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান ভাষান্তর দেখা যায়। একটির নাম *Hoch Deutsch* (*High German*) অর্থাৎ দক্ষিণ জার্মানীর শিষ্টভাষা এবং অপরটি হইল *Platt Deutsch* (Low German) অর্থাৎ উত্তর-জার্মানীর লোকভাষা। প্রথমে জার্মানীতে নানা উপভাষার প্রাধান্য ছিল, কিন্তু মার্টিন ল্যুথার *Hoch Deutsch*এ অর্থাৎ দক্ষিণ জার্মানীর উপভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিবার পর এই ভাষাই জার্মান-সাহিত্যের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন জার্মান জাতি বীরত্বের আখ্যান এবং জীবজন্তু সংক্রান্ত উপকথা (*Tierepos*) রচনা করিয়াছিল। উক্ত বীরত্বের আখ্যানগুলিতে চরিত্রের কঠোরতা ও বীভৎসতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কিছু পরে ফরাসী 'ত্রুবেদুর' সঙ্গীতের প্রভাবে জার্মানীতেও একদল *Minnesinger* অর্থাৎ প্রেমের কবিতাকারের আবির্ভাব হয়। ইহারা গ্রাম নগর ঘুরিয়া প্রেমের আখ্যান গাহিয়া বেড়াইতেন, যুবতিগণের কাহিনীও আবৃত্তি করিতেন। অনেক অভিজাতবংশীয় নাইটরাও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাজসভাতে ইহাদের অবাধ গতিবিধি ছিল, ফলে মহাকাব্যের অনুরূপ একপ্রকার বিপুলায়তন কাব্যসৃষ্টি ইহাদের প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এইজাতীয় বিখ্যাত কাব্যের নাম *Nibelungenlied*।

পুরাতন জার্মান ভাষায় কিছু কিছু ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টের জীবন অবলম্বনে মহাকাব্যশ্রেণীর একখানি গ্রন্থ (*Heliand*) সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তবে ফরাসী অপেক্ষা আদি জার্মান ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম ও ভক্তিমূলক কবিতার সংখ্যা কিছু অধিক। মহাকাব্য, সাধুসন্তদের জীবনকাব্য, গীতিকবিতা, জীবজন্তুর গল্প—এই সমস্ত বিচিত্র বিষয় লইয়া ৮ম ১২শ শতাব্দীর প্রাচীন জার্মান সাহিত্য গঠিত হইয়াছিল। একটি শক্তিশালী জাতির জীবনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ-পরিচয় আদি জার্মান সাহিত্যে স্পষ্ট স্বাক্ষর আঁকিয়া দিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের সঙ্কুচিত সীমায় তাহার কোন আভাস পাওয়া যাইবে না। প্রাচীন জার্মান সাহিত্যে ধর্মচেতনা লইয়া কিছু কিছু কাব্য কবিতা রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রহস্যবাদী বৌদ্ধযোগীদের সহিত তাহার সাদৃশ্য অতি অল্প। মধ্যযুগে লাতিন ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া ইতালীয় ভাষার জন্ম হইলেও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও লাতিন ভাষার প্রচণ্ড আধিপত্যের ফলে মধ্যযুগীয় ইতালীয় সাহিত্যের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া

যায় না। ১২শ-১৩শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী ইতালীয় সাহিত্যিকগণ লাতিন ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করিতেন। গুইনিচেল্লি, কোলোন্না, আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস—প্রভৃতি কবিগণ ১৩শ শতাব্দীতে ইতালীয় ভাষায় কিছু কিছু গীতিকবিতা লিখিলেও দান্তের (দান্তে অলিঘিয়েরি) পূর্বে ইতালীয় ভাষা বিশেষ কোন মর্যাদালাভ করিতে পারে নাই। মহাকবি দান্তেই তাঁহার *Vita Nuova*, *Divina Commedia* রচনা করিয়া ইতালীয় সাহিত্যকে সর্বপ্রথম বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরেন।

১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে যখন ফ্রান্স ও জার্মাণীতে নবজীবনের বান ডাকিয়াছিল, মধ্যযামিনী ক্রমেই হ্রস্ব হইয়া আসিতেছিল, লাতিন ভাষাকে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় যুদ্ধ বীরত্ব প্রেম খ্রীষ্টধর্ম সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ-নাটগীতি—সাহিত্যের নানা শাখাপ্রশাখা সুবিস্তার লাভ করিতেছিল, তখন সিদ্ধাচার্যগণ সঙ্ঘারামের কোণে বসিয়া স্বল্প কয়েকজন ‘ধর্মভিক্ষার্থীর সঙ্গে চর্যা পাঠ করিয়া এবং বজ্রগান গীত গাহিয়া, নানারূপ আধিদৈহিক আচার-আচরণের দ্বারা অধরা মহাসুখ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

॥ ৪ ॥

অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য

এইবার ভারতীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সমস্ত প্রায় একই সময়ে অপভ্রংশের প্রভাব ত্যাগ করিয়া স্বকীয় মর্যাদা লাভ করে। অবশ্য কোন কোন জনপদের সাহিত্য বেশ কিছুকাল পরে ১৭শ শতাব্দীর দিকে প্রাথমিক আকার লাভ করে—যেমন অসমিয়া সাহিত্য।

হিন্দী সাহিত্যের আদিপর্বের সহিত বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের তুলনা চলিতে পারে। সাধারণতঃ প্রাচীন মধ্যদেশ বলিতে যে অঞ্চলকে নির্দেশ করা হইত সেই অঞ্চলের সাহিত্যিক সাধুভাষা ‘হিন্দী’ নামে পরিচিত। পঞ্জাবের পশ্চিমসীমা হইতে বিহারের পূর্বাঞ্চল এবং নেপালের সীমান্ত হইতে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত আধুনিক হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সীমা। হিন্দীভাষায় ‘খাড়ীবোলী’ (দিল্লী-মীরাট অঞ্চলের ভাষা) হইল শিষ্টভাষা, কিন্তু ইহা নিতান্তই অর্বাচীন। হিন্দীর উপভাষাসমূহ (অন্ততঃ বারোটি উপভাষা) দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যিক

আদর্শ বহন করিয়াছে। ব্রজভাখা ও অবধীতে ধর্মসংক্রান্ত ভক্তিমূলক কবিতা সংরক্ষিত হইয়াছে। তুলসীদাস, কবীর, দাদূ—ইহারা হিন্দীর উপভাষায় ভক্তিমূলক কাব্যকবিতা লিখিয়া অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন। হিন্দীর অন্ততঃ পাঁচটি উপভাষা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে—ডিংগল বা পুরাতন মাড়োয়ারী, ব্রজভাখা, খাড়ীবোলী আওধী (অবধী) ও মৈথিলী। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম পর্ব ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। আদি-হিন্দীর বহুলাংশ পশ্চিম অপভ্রংশের ছায়াতলে বর্ধিত। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক খ্রীঃ ৮ম বা ১০ম শতাব্দীকেই হিন্দী সাহিত্যের জন্ম মুহূর্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন দোহাকোষ ও চর্যাগীতিকা। তাঁহারা এই গ্রন্থগুলিকে প্রাচীনতম হিন্দীর নিদর্শন বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। দোঁহাগুলিকে তাহারা দাবী করিতে পারেন। কারণ সরহ, কৃষ্ণাচার্য ও তিল্লোপাদের দোঁহা পশ্চিমা অপভ্রংশে রচিত, যাহা হইতে হিন্দীর প্রধান প্রধান উপভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু চর্যাপদকে তাঁহারা যেভাবে দাবী করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের দুইটি ধারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। একটি নাথসাহিত্য, অপরটি হইল চারণসাহিত্য। বাংলা দেশের নাথসাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে ১০ম শতাব্দীর দিকে নাথসাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহার সহিত চারণসাহিত্যের উল্লেখ করা কর্তব্য। ১২শ শতাব্দীর দিকে মধ্যদেশের রাজবংশের কীর্তিকাহিনীর সহিত চারণকবিদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কনৌজে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হইত, তেমনি হইত হিন্দী ভাষায় চারণকাব্যের অনুশীলন। মুসলমান আক্রমণে কনৌজ ধ্বংস হইলে স্থানীয় চারণসাহিত্যও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১২শ শতাব্দীর নিকটবর্তী কালে অন্যান্য অঞ্চলেও চারণসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। আজমীড়ের শেষ চৌহান নৃপতি বিশালদেবের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ১১১৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে নরপতি নল্‌হা নামক এক কবি 'বিশালদেব রসো' রচনা করেন। চাঁদ কবির 'পৃথ্বীরাজ রসো' প্রায় সমসাময়িক কালের চারণকাব্য। ১২শ শতাব্দীর পরে এই সমস্ত রাজবংশের পতন হইলে হিন্দী সাহিত্যও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছিল। একমাত্র আমীর খুসরো-র কিছু কিছু কবিতা ভিন্ন খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দী সাহিত্যের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৫শ শতাব্দীর

প্রারম্ভ হইতে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ অর্থাৎ ভক্তি সাহিত্যের শুভারম্ভ সূচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের তুলনায় হিন্দী সাহিত্যের আদি পর্বকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ও বিপুলপ্রসারী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। চারণগীতি বা 'রসো' কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। চারণ-কবিগণ যেসমস্ত রাজবংশের ছত্রছায়াতলে বাস করিতেন, তাহাদের লইয়া বীররসাত্মক 'রসো' কাব্য রচনা করিতেন; তাহার কাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহ, বীররস প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় সাহিত্য ও জনচিত্তে জীবনাদর্শ সঞ্চারিত করে। একদিকে যেমন গোরক্ষবাণী ও জীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে নানা আখ্যান আখ্যায়িকা রচিত হয়, তেমনি অপর দিকে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনাকে বাদ দিয়া রাজন্যবর্গের বীররসাত্মক বাস্তবধর্মী কাহিনী খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে এই 'রসো' শ্রেণীর চারণকাব্য কিন্তু বাঙালী কবির কল্পনায় ঠাঁই পায় নাই। বাঙালী কবিরাও অনেক রাজা, সামন্ত, সুলতানেব আনুকূল্য লাভ করিযাছিলেন বাঙলা দেশে যুদ্ধবিগ্রহও কম ঘটে নাই, কিন্তু কোন সামন্ত বা সুলতানের সভাকবি আপন আপন পৃষ্ঠপোষকের সত্য অথবা কাল্পনিক বীর্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দী 'রসো' কাব্যের অনুরূপ কোন বীররসোজ্জ্বল ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করেন নাই। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম সংস্কৃতে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এবং ধোয়ীর 'পবনদূত'। অবশ্য সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্ব্যর্থবোধক কাব্যে অনেক ঐতিহাসিক উপাদান ও যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী থাকিলেও 'পবনদূতে'র কাহিনী সম্পূর্ণরূপে কবিকল্পিত এবং লক্ষ্মণ সেন ইহাব নাযক হইলেও ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহের বিশেষ কোন বর্ণনা নাই; রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীই ইহার প্রধান উপাদান। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব হিন্দী সাহিত্যের তুলনায় অগভীর, বৈচিত্র্যহীন ও গোষ্ঠীজীবী সাধনভজনের সন্ধ্যাসঙ্কেত মাত্র।

সমকালীন গুজরাটী ও মারাঠী সাহিত্যের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিবে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে পশ্চিম ভারতের গুজরাটী ও মারাঠী সাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান রহিয়াছে। প্রাচীন গুজরাটী সাহিত্য প্রায় বাংলার মতোই প্রাচীন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর বৈচিত্র্যমণ্ডিত। প্রায় ১২০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে গৌর্জর অপভ্রংশের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া গুজরাটি ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। অবশ্য ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে 'গুজরাটী' এই বিশিষ্ট নামটি

ব্যবহৃত হইত না, কারণ ১৭শ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চল গুজরাট নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং 'লাটী' রীতির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুর্জর অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। ১২৯৯ খ্রীঃ অব্দে গুজরাট হীনবল হইয়া পড়িলে ঐ দেশের বিদ্যাসমাজ গ্রামের দিকে সম্প্রসারিত হইল এবং এই সময়ে পৃষ্ঠপোষকহীন গুজরাটী সাহিত্যিকগণ সংস্কৃত-প্রাকৃত ত্যাগ করিয়া দেশভাষার দিকে আকৃষ্ট হইলেন; অনুমান ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যথাযথভাবে গুজরাটী সাহিত্যের আবির্ভাব সূচিত হয়। অবশ্য গুজরাটী সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতেই এই সাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল। তবে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বিশেষ কোন গুজরাটী সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। গুজরাটী ভাষায় রচিত 'রস' বা দীর্ঘ আখ্যান কাব্য এবং গদ্য অথবা পদ্যে রচিত 'কথা' বা আখ্যায়িকার উল্লেখ প্রয়োজন। এই 'কথা' বা গল্পে বীরত্ব, দুঃসাহসিক অভিযান ও রোমান্টিক প্রণয়ের যে চিত্র আছে, প্রাচীন এমন কি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'ফাগু' গান, 'বারমাসি' (বাংলার 'বারমাস্যার' অনুরূপ) এবং নারীসমাজে প্রচলিত 'রসক' বা 'গর্বা' গান গুজরাটী সাহিত্যের উদ্ভবকালে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং এই বিচিত্র রচনা লইয়াই গুজরাটী সাহিত্যের সূচনা। এই দিক দিয়া গুজরাটী সাহিত্য ভাগ্যবান। ১৩শ শতকের মধ্যে গুজরাটী সাহিত্য নানা শাখায় আপনাকে বিকশিত করিতে থাকে এবং গদ্যও অনুশীলিত হইতে আরম্ভ করে। 'কথা' সাহিত্যের মধ্যে গুর্জর অঞ্চলের সমগ্র জনচেতনার যে বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে তাহার অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিরল। অবশ্য মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতিতে কিছু কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু গুজরাটী সাহিত্যের আদিপর্বের সহিত বাংলা সাহিত্যের দীনদুর্বল আদিপর্বের তুলনাই চলে না।

মারাঠী সাহিত্যের আদিপর্বের সহিত বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বের কোন কোন দিক দিয়া বিশেষ সাদৃশ্য আছে। খ্রীঃ ১২শ শতকের কাছাকাছি সময়ে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্য মারাঠী অপভ্রংশের প্রভাব কাটাইয়া উঠিয়া স্বকীয়তা লাভ করে। আদিপর্বের মারাঠী সাহিত্যের প্রধান সুর—ধর্ম ও ভক্তিবাদ। মারাঠী সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাহ্মণ ও শিষ্ট সমাজে সংস্কৃত ছিল চিত্তবিনোদনের

ভাষা। কিন্তু খ্রীঃ ১২শ শতকের দিকে মহারাষ্ট্রে একটা প্রবল ধর্মচেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যাহার ফলে দীনদরিদ্র ও সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসীরা মারাঠী ভাষার সাহায্যে নব ভক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইলেন। নাথপন্থী মুকুন্দরাজের 'বিবেকসিন্ধু' ও সন্ত জ্ঞানেশ্বরের গীতার টীকা 'জ্ঞানেশ্বরী' এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে মহরাষ্ট্রে যে ধর্মান্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে দুইটি মতের প্রাধান্য দেখা যায়—'মহানুভব' এবং 'বরকরী' সম্প্রদায়। ইঁহারা মহারাষ্ট্রী ভাষার সাহায্যে সমাজের নিম্নতম স্তরে আপনাদের বিশাল ভ্রাতৃত্বের বাণী সম্প্রসারিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহিত চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্যদের তুলনা চলিতে পারে। মহারাষ্ট্রের অনেক কবি সমাজের নিম্নস্তর হইতেই আসিয়াছিলেন। সীবনকর্ম ছিল কবি নামদেবের উপজীবিকা, গোরা কুম্ভকার জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, জোগ পরমানন্দ তেলীবংশে আবির্ভূত হন। জ্ঞানেশ্বরের সমসাময়িক 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা একজন গুজরাটী সন্ত, নাম চক্রধর। ইঁহারা কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। ইহাদের সাধনাপ্রণালী এমন একটি রহস্যময় ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল যে, এখনও অনেক মারাঠী গবেষক এই মহানুভব' সম্প্রদায়ের সাধনভজন ও কৃষ্ণোপাসনার সম্যক মর্ম অনুধাবন করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের সম্প্রদায়ে মহাদম্বা নাম্নী একজন মহিলা কবিও ছিলেন। ইঁহারা কৃষ্ণের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সাঙ্কেতিক ভাষায় অনেক কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। ১২শ-১৩শ শতাব্দীর পর তিন শত বৎসরের মধ্যে মারাঠী সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ১৬শ শতাব্দী হইতে মারাঠী সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়।

বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণোপাসনা এবং চর্যার গুহ্য তান্ত্রিকতা—উভয়েরই সহিত মারাঠী সাহিত্যের আদিপর্বের বেশ সাদৃশ্য আছে। অবশ্য 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের রহস্যাচ্ছাদিত কৃষ্ণোপাসনার সহিত বাঙলা দেশের মধ্যযুগীয় কৃষ্ণোপাসনার নিবিড় সাদৃশ্য না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্য আছে। গুজরাটী বা হিন্দী সাহিত্যের আদিপর্বে নাথপন্থের কিছু প্রাধান্য থাকিলেও ঐতিহাসিক বীররসাত্মক কাহিনী এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মারাঠী ও বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে মর্ত্যজীবনের বিশেষ কোন প্রসঙ্গ নাই, উভয় সাহিত্যের প্রধান সুর ধর্মসাধনা এবং সে ধর্মসাধনা সাঙ্কেতিক রহস্যে পরিপূর্ণ।

এবার আমরা বাংলার ভগিনীস্থানীয় আসামী, ওড়িয়া ও মৈথিলী সাহিত্যের আদিপর্বের সহিত বাংলা সাহিত্যের ঐ পর্বের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করিব। মৈথিলী, আসামী, ওড়িয়া—সমস্তই মাগধী অপভ্রংশের আত্মজ, কাজেই ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এই তিনটি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মত প্রাচীন নহে, আসামী ভাষা তো একদা বাংলা সাহিত্যের উপভাষা রূপে পরিগণিত হইত। মৈথিলী সাহিত্য ১৭শ শতাব্দী হইতেই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিযাছিল। মৈথিলী সাহিত্যের আদিলেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ১৪শ শতাব্দীতে 'বর্ণনরত্নাকর' নামক মৈথিলী ভাষায় একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন; উহাতে সর্বপ্রথম মৈথিলীগদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মৈথিল কোকিল' বিদ্যাপতি মৈথিলী সাহিত্যের যাবতীয় গৌরব একা আত্মসাৎ কবিয়াছেন। অবশ্য বিদ্যাপতি বাঙলা দেশেই অধিকতর জনপ্রিয। প্রাচীনযুগে মিথিলায অবহট্ট ভাষার (শৌবসেনী অপভ্রংশেব অর্বাচীন রূপ) বেশ অনুশীলন হইত। পবে মৈথিলী ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওযা যায় না।

ওডিযা সাহিত্যও বাংলা অপেক্ষা বযঃকনিষ্ঠ, কিন্তু মূল আদর্শের দিক দিযাও বাংলার সমধর্মী। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—প্রধানতঃ এই চারিটি ধর্ম-শাখাকে কেন্দ্র করিযা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয ওড়িযা সাহিত্য বিকাশ লাভ করিযাছে। ১৪শ শতাব্দীর সাবল দাসেব মহাভাবতের পূর্বে ওড়িযা সাহিত্যের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্য ওডিযা সাহিত্যেব ঐতিহাসিকগণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাচর্যবিনিশ্চযকে ওডিযা ভাষায রচিত বলিয়া দাবী করিযাছেন, এবং চর্যাপদের কাল ধবিয়া তাঁহারা অনুমান করিযাছেন যে, ওডিযা সাহিত্য ১০ম শতাব্দাতে জন্মলাভ কবিয়াছিল। চর্যাপদে দুই-একটি ওড়িয়া শব্দ আছে; দুই-একজন চর্যাকার উডিষ্যার অধিবাসীও ছিলেন, কোন কোন চর্যাকার উড়িষ্যায় গিযা সাধনভজন করিয়াছিলেন; কিন্তু চর্যাপদকে কোন দিক দিয়াই ওড়িযা ভাষায় রচিত বলা যায় না। সে যাহা হউক, খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে প্রাচীন ওডিয়া ভাষায় কিছু কিছু ব্যঙ্গরচনা ও লোক-সঙ্গীতের সামান্য নিদর্শন পাওযা যাইতেছে যাহার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। ওড়িয়া সাহিত্য প্রারম্ভ হইতেই গণসাহিত্য; আদিযুগের ওডিয়া সাহিত্যিকের ভাগ্যে রাজসভা বা সামন্তপ্রধানের কৃপাকটাক্ষ লাভ ঘটে নাই।

ফলে প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য একান্তরূপে গ্রামীণ। এই স্থলে বাংলা সাহিত্যের সহিত ওড়িয়া সাহিত্যের প্রধান পার্থক্য। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্য সুলতান ও সামন্তবর্গের পক্ষপুটে বহুলভাবে বিকাশ লাভ করে, কাজেই এই সাহিত্যের মধ্যে যে একটা নাগরিক মনোভাব ও সংস্কৃত শব্দ ঝঙ্কারের ঐশ্বর্য দেখা যায়, তাহা প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। সারল দাসের মহাভারত (১৪শ শতাব্দী) হইতেই ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা এবং এই যুগ হইতে অনুবাদ সাহিত্যের মারফতে ওড়িয়া সাহিত্যের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু কালপর্যায়ের দিক দিয়া প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।

আসামী সাহিত্য একদা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গীভূত ছিল। এখনও আসামী ভাষা ও আসামী বর্ণমালার সহিত বাংলা ভাষা ও বর্ণের গভীর সাদৃশ্য আছে। আসামী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ যথারীতি বৌদ্ধগান ও দোঁহাকে আসামী ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১০ম শতাব্দীতে আসামী ভাষার উদ্ভব কল্পনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ১৪শ শতাব্দীতে মাধব কন্দলীর রামায়ণের (পাঁচ কাণ্ড) অনুবাদই নিঃসন্দেহে আসামী সাহিত্যের প্রথম সূচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ডাকের বচন, লোকসঙ্গীত—সমস্তই ঐতিহাসিক কালবিচারে প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। হেম সরস্বতী, হরিহর বিপ্র, কবিরত্ন সরস্বতী—ইঁহারা 'প্রহ্লাদ চরিত', 'লুবকুসর যুদ্ধ', 'বব্রুবাহনর যুদ্ধ', 'জয়দ্রথ বধ' প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনাকে আসামী সাহিত্যের অতিশয় প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা হইলেও এই সমস্ত গ্রন্থের ভাষা তাদৃশ প্রাচীন নহে। আমাদের অনুমান ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বলিয়া আসামী সাহিত্যের যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করা যায় না। তাহা হইলেও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মনসার গীত—ইহারা মধ্যযুগীয় আসামী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, এবং এই দিক দিয়া আসামী সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্‌চৈতন্য যুগ

খ্রীঃ ১৩শ—১৪৯৩ অব্দ

ষষ্ঠ অধ্যায়

পটভূমিকা

সূচনা॥ (বাঙলা দেশে ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের মধ্যযুগ পরিকল্পিত হইলেও ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা হয় নাই। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১৩শ শতাব্দীর ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য।)

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ স্থূলভাবে ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্প্রসারিত। বাঙলা দেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাস পাঠান শাসনকাল হইতে শুরু হইয়া মুঘল শাসনের অন্তিম মুহূর্তের (১৭৫৭) কিছুকাল পরেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা বিচারে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে পাঠান ও মুঘল এই দুই রাষ্ট্রশক্তির শাসনকালে বিকশিত হইতে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মুসলমান আমলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সূচনা এবং ইংরাজ আমলের অব্যবহিত পূর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশের মধ্যযুগীয় জীবন ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং আধুনিক যুগের আভাস দেখা দিল। বাঙলা দেশের মধ্যযুগ এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ প্রায় সমান্তরাল রেখায় বহিয়া গিয়াছে।

(এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের য়ুরোপীয় জীবনসাধনার সহিত বঙ্গসংস্কৃতির মধ্য-যুগের একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইবে। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে শুরু করিয়া ১৫০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত য়ুরোপীয় মধ্যযুগ বিস্তৃত। খ্রীঃ ২৩৬ অব্দ হইতে ফ্রাঙ্ক, আলমন্নি, গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর ও অর্ধবর্বর জাতির আক্রমণের ফলে রোমের হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রাণরস ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া আসিল। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে এই বর্বরজাতিসমূহ রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দক্ষিণ-য়ুরোপ ও উত্তর-আফ্রিকায় দুর্মদ শক্তির আধিপত্য স্থাপন করে। ইহার পর হইতেই য়ুরোপে মধ্যযুগের আরম্ভ। এই মধ্যযুগের আদিপর্ব 'তামসযুগ' (The Dark Age) নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে—

তখন হেলেনীয় সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হইয়াছে, মানুষের চিত্ত ও সাধনা ধর্মীয় অনুশাসন ও রাজন্যতন্ত্রের বিধিনিষেধের নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি স্থিতধী হইল, ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও স্বাধীন চিত্তবৃত্তি দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও সংস্কৃতির অপঘাতকে জয় করিল। মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বে রেনেসাঁসের আবির্ভাব—প্রাক্তন হেলেনীয় সংস্কৃতি নব-পটভূমিকায় বিচিত্র ঐশ্বর্য লইয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। তাই য়ুরোপীয় মধ্যযুগের আদিপর্বে অন্ধ তামসিকতার প্রাধান্য, অন্ত্যপর্বে জ্ঞান ও চিন্তা ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাহাকে কেহ কেহ 'The Age of Faith' বা বিশ্বাসের যুগ বলিতে চাহেন। এই পর্বে রেনেসাঁস বা প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সূচনা।

বাঙলা দেশে পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর (৮ম-১২শ শতাব্দী) ধরিয়া বঙ্গসংস্কৃতি নানা বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সমন্বয় লাভ করিতেছিল সেনবংশের প্রভাবে আসিয়া গ্রামীণ বাঙালীর চেতনায় উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক সংস্কৃতি অভিনব প্রভাব বিস্তার করে; অবশ্য এই প্রভাব সমাজের নিম্নস্তরে ততটা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। এই সময়ে, যখন লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের নূতন নূতন পরীক্ষা চলিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তাতার-তুর্কী-খোরাসানের মরু-পর্বতবাসী ইসলামধর্মাবলম্বী একদল অশ্বারোহী বিদ্যুৎগতিতে বাঙলা দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। তারপরে শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা বাঙলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইস্‌লামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা প্রোথিত হইল। খ্রীঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া এই অমানুষিক বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল, এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ, য়ুরোপের মধ্যযুগীয় 'The Dark Age'-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলা দেশের রাষ্ট্র হইতে এই তামসিক যুগের অবসান হইল—১৪৯৩ খ্রীঃ অব্দে হোসেন শাহ্ বাঙলার সুলতানপদে অভিষিক্ত হইলেন। তাহার সিংহাসনলাভের আট বৎসর পূর্বে ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্য-আবির্ভাব ও হোসেনশাহী আমলের সূচনার দ্বারা তামসিক মধ্যযুগে নবজীবনের আলোকরেখা দেখা দিল—চৈতন্য-প্রভাবান্বিত বাংলা সাহিত্য যদিও মধ্যযুগীয় সংস্কারদ্বারা লালিত, তবু তাহাতেই য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের অনুরূপ বাঙালী-জীবনের অভিনবত্ব সূচিত হইয়াছে। কারণ চৈতন্যপ্রভাবে বাঙালীর প্রাক্তন সংস্কার ও মানস-ঐতিহ্য নবরূপ লাভ

করিয়াছে। সুতরাং খ্রীঃ ১৪শ শতক হইতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যুগকে মধ্যযুগের প্রথম পর্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায়। মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব চৈতন্য-জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের ৪৮ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে শেষ ২৪ বৎসর অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে মধ্যযুগের দ্বিতীয় স্তর বা চৈতন্যযুগ বলা যাইতে পারে। এ যুগে মধ্যযুগীয় রেনেসাঁসের যথার্থ সূচনা। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত (অর্থাৎ সমগ্র ১৬শ শতাব্দী) এই চৈতন্য-রেনেসাঁস বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বিকশিত করিয়াছে।* মধ্যযুগের তৃতীয় স্তর ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন চৈতন্যপ্রভাবের বিপুল ঐশ্বর্য হ্রাস পাইয়া মধ্যযুগের আয়ুষ্কালের প্রহর গণনা শুরু হইয়া গিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মধ্যযুগের অবসান ঘনাইয়া আসিল। মধ্যযুগের এই তিনটি পর্যায়কে যথাক্রমে আদিপর্যায় বা প্রাক্-চৈতন্য যুগ, মধ্যপর্যায় বা চৈতন্যযুগ এবং অন্ত্যপর্যায় বা উত্তর-চৈতন্যযুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায়। উত্তর-চৈতন্যযুগের অবসান হইল ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে; তারপর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ বণিকের লোভলোলুপতা সমগ্র বাঙলা দেশ ও সংস্কৃতিকে এমন একটা বিপর্যয়ের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল যে, পূর্বতন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ভাঙিয়া পড়িল বটে, কিন্তু কোন নূতন উষালোকও প্রত্যক্ষ হইল না। পাঠান শাসনের প্রথম দেড়শত বৎসরে যেমন তামসিক যুগের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাঙলা দেশে অনুরূপ একটা তামসিক মনোভাব চারিদিকে অশুচি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্যপ্রভাবের ফলে খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের সূচনা হইল, আর ১৯শ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভ হইতে যুরোপীয় জীবনধারা ও বিশ্বতোমুখী সংস্কৃতি বাঙালী-জীবনের মধ্যযুগীয় সংস্কারকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে আধুনিক জীবনের রণরঙ্গমুখের রাজপথে স্থাপিত করিল।

* এবিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

॥ ১ ॥

ইতিহাসের সঙ্কেত (১২০৩-১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ)

খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বিন বক্তিয়ার খিল্‌জী যখন 'নুদিয়া' জয় করিলেন, তখন হইতেই সমগ্র বাঙলা দেশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব বর্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙলার রাষ্ট্রিক ইতিহাস কখনও পাঠান-তাতার-তুর্কী আমীর-ওমরাহ, কখনও দিল্লীর সুলতানের প্রেরিত রাজপ্রতিভূর অধীনে, কখনও-বা হাবসী খোজার দৌরাত্ম্যে বিব্রত বিপর্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল; ১৬শ শতকে মুঘল শাসন স্থাপিত হইবার পর বাঙলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণে হতবল হইবার ফলে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল রাজশক্তির অবসানের পর ইংরাজ প্রভাব বাঙলার সেই মূর্চ্ছাভঙ্গের ইতিহাস সূচিত করিল।

প্রাক্-মুঘল যুগের পাঠান শাসকদের ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার মতে, "ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নহে।" বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অন্ততঃ বাঙলার পাঠান রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে নিতান্ত অযথার্থ নহে। এ পর্যন্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ (তবকৎ-ই-নাসিরী, রিয়াজ-উস-সালাতিন, তবকৎ-ই-আকবরী, আইন-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিস্তা প্রভৃতির লেখকগণ) এই যুগ সম্বন্ধে যে সমস্ত বৃত্তান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অপদার্থ পাঠান শাসকগণের "খিচুড়ী ভোজনের" (বঙ্কিমচন্দ্র) ইতিহাস মাত্র। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত হইতে তদানীন্তন ইতিহাসের একটা সত্যরূপ নির্ধারণ করা সহজ নহে। মনে হয়, পাঠান রাজত্বের সহিত বাঙালী-জীবনের কোন সংযোগই ছিল না। বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালী চৈতন্য হারাইয়াছিল। পাঠান, খিলজী, বলবন, মামলুক, হাবসী সুলতানদের চণ্ডনীতি, ইসলামী ধর্মান্ধতা ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালী হিন্দুসম্প্রদায় কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইযাছিল। সেইজন্য গৌড-লখনৌতি-তাণ্ডা-দেবকোট-পাণ্ডুয়ায় কে সিংহাসন অধিকার করিল, কে-বা তখ্‌ত হারাইল তাহাতে বাঙালী উৎসাহী হইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

কিন্তু যে রাষ্ট্রিক শাসন নির্মমভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির বক্ষে জগদ্দল শিলার মত চাপিয়া বসিয়াছিল, তাহা যে বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত করে নাই, তাহা স্বীকার্য নহে। সে প্রভাব প্রতিকূল হইতে পারে, সে সম্পর্ক শত্রুতার সম্পর্ক হইতে পারে,—তথাপি তাহার প্রভাব বাঙালীর জীবনে অগোচরেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। সুতরাং বাঙলার পাঠানযুগের ইতিহাস বাহিরের দিক হইতে বাঙালীর নিকট যতই অর্থহীন ও দুঃস্বপ্নময় বলিয়া মনে হউক না কেন, জাতির অন্তর্জীবন ও সাহিত্যবিচারে এই শাসনকাল ও শাসকসম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা কর্তব্য।

আলোচ্য পর্বে আমরা বাঙলায় পাঠান শাসনের সমগ্র যুগটি গ্রহণ করিব না, প্রধানতঃ বক্তিয়ার খিলজীর অবসানের (১২০৬ খ্রীঃ অঃ) পর হইতে হোসেন শাহের সিংহাসনলাভের পূর্ব (১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত মোট দুই শত অষ্টআশি বৎসরের ইতিহাসের সঙ্কেত নির্দেশ করা যাইতেছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই দুই শত অষ্টআশি বৎসরের পাঠান শাসনকালকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করিতে পারি :—

(ক) খিল্‌জী আমীর-ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬-১২২৭ খ্রীঃ অঃ)
(খ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাঙলা (১২২৭-১৩৩১ খ্রীঃ অঃ)
(গ) ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৩২-১৪১৩ খ্রীঃ অঃ)
(ঘ) গণেশ-জলালুদ্দীনের অধীনে বাঙলা (১৪১৪-১৪৪১ খ্রীঃ অঃ)
(ঙ) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ)
(চ) হাবসী খোজাদের শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ)

(ক) খিল্‌জী আমীর-ওমরাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬-১২২৭ খ্রীঃ অঃ)॥ ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে আলিমর্দান নামক এক দুর্দান্ত বিশ্বাসঘাতক ওমরাহ্‌ রোগপীড়িত ইখ্‌তিয়ারউদ্দিন বিন্‌ বক্তিয়ারকে হত্যা করিলে তাহার পর প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে খিল্‌জীবংশীয় ওমরাহ্‌গণের বাদবিসম্বাদপূর্ণ কলহদ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। এই খিল্‌জীগণ ইখ্‌তিয়ারকে মান্য করিতেন এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা ইখ্‌তিয়ারের সমকালেই পশ্চিম ও উত্তর-বাঙলায় একপ্রকার ইস্‌লামী অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহারাই সামন্ততান্ত্রিক শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়া স্বেচ্ছামত

আমীর-ওমরাহকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং নামাইয়াছেন। ইখ্‌তিয়ারের মৃত্যুর পর ইহারা অতিশয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলিমর্দান ইহাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত। আলিমর্দান ইখ্‌তিয়ারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলে ইখ্‌তিয়ারের গুণমুগ্ধ আর-এক খিল্‌জী সামন্ত মুহম্মদ শিরাণ খিল্‌জী প্রভুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আলিমর্দানকে বন্দী করেন। খিল্‌জী আমীরগণ তাঁহাকে লখনৌতির (গৌড়) সিংহাসনে নির্বাচিত করিলেন, এবং তিনি মালিক ইজ্জদ্দিন মুহম্মদ শিরাণ খিল্‌জী নাম লইয়া বাঙলার সুলতান হইলেন। কিন্তু তাঁহার শান্তিপূর্ণ শাসনকাল দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। সুচতুর আলিমর্দান বন্দিদশা হইতে পলায়ন কবিযা দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনেব আশ্রযগ্রহণ কবিযা তাঁহাব অনুগ্রহে এবং অযোধ্যার শাসনকর্তার সাহায্যে শিবাণকে দেবকোট হইতে বিতাডিত করিতে সমর্থ হন। নানা ভাগ্যবিপর্যযের পব আলিমর্দান অবশেষে বাঙলার সুলতান হইলেন এবং লাহোর হইতে আনীত বিদেশী সৈন্যেব সাহায্যে খিল্‌জী ওকরাহ্‌গণকে দমন করিয়া রাখিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইযা আলিমর্দান আপনাকে সুলতান আলাউদ্দিন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রভূত শক্তিসামর্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করিয়া অতিশয় উদ্ধত হইযা উঠিলেন, তিনি তাঁহাব পুরাতন শত্রু খিল্‌জী ওমবাহ্‌গণের উপর ভযানকভাবে উৎপীডন কবিতে লাগিলেন। অত্যাচার অসহ্য হইলে খিল্‌জী সামন্তগণ তাঁহাদেব আব-এক নেতা হুসামউদ্দীন ইওয়াজেব সহিত ষডযন্ত্রেব ফাঁদ পাতিলেন। হুসামউদ্দীন উদ্ধতস্বভাব রক্তপিপাসু সুলতান আলাউদ্দীন আলিমদান খিলজীকে হত্যা করিলেন। আমীরগণ নিশ্চিন্ত হইয়া হুসামউদ্দীনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (১২১৩ খ্রীঃ অঃ)।

হুসামউদ্দীন 'গিযাসউদ্দীন ইয়াজ খিলজী' (১২১৩-১২২৭ খ্রীঃ অঃ) নাম লইয়া বাঙলার সুলতান হইলেন। তাঁহাকে বোধহয় প্রথম দুই-এক বৎসর আলিমদানের বিদেশী সেনাবাহিনীকে বশীভূত করিতে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই অবকাশে উডিষ্যার গঙ্গবংশের রাজা তৃতীয অনঙ্গ-ভীমদেবের মন্ত্রী বিষ্ণু উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ের উপর কিছুকাল আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার সহিত গিয়াসউদ্দীনকে দীর্ঘ দিন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য গিয়াসুদ্দীন রাঢ় হইতে উড়িষ্যার প্রভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুনা যায় ত্রিহুত, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের রাজারা তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। সমগ্র বাঙলার উপর প্রাধান্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে সুলতান দেবকোট হইতে রাজধানী সরাইয়া আনিয়া ঐতিহাসিক নগর গৌড়-লখ্নৌতিতে নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। নদনদী-সংস্কার, প্রজাপালন, সুবিচার ইত্যাদি বিষয়ে গিয়াসুদ্দীন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শক্তিলাভে উদ্ধত হইয়া তিনি টাঁকশালে নিজ নামে মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিলেন এবং স্বনামে 'খোৎবা' পাঠ করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যাপারে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস শঙ্কিত হইয়া বাঙলা আক্রমণ করিতে আসিলেন। প্রবল যুদ্ধের পর বাঙলার সুলতান ও দিল্লীর সুলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। গিয়াসুদ্দীনকে বাধ্য হইয়া জরিমানাস্বরূপ আশি লক্ষ টাকা ও আটত্রিশটি হস্তী দান করিয়া দিল্লীর সুলতানকে প্রভু বলিযা স্বীকার করিতে হইল। বাঙলার টাঁকশালে দিল্লীশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং মসজিদ-মিনারে দিল্লীশ্বরের নামে 'খোৎবা' পঠিত হইল। সুলতান দিল্লীর দিকে প্রস্থান করিতেই গিয়াসুদ্দীন আবার নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতানের পুত্র নাসিরুদ্দীন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন। অন্যান্য খিল্‌জী ওমরাহের সহিত তাঁহারও শিরশ্ছেদ করা হইল (১২৮৭ খ্রীঃ অঃ)। খিল্‌জী ওমরাহ্‌দের প্রাধান্যের যুগে একমাত্র গিযাসুদ্দীনই দীর্ঘকাল শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি যদি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া নিজ নামে 'খোৎবা' পাঠ না করাইতেন, তাহা হইলে হয়তো তাঁহার উপর দিল্লীশ্বরের কোপদৃষ্টি পড়িত না। তাঁহার অবসানের সহিত খিল্‌জী অভিজাততন্ত্র বাঙলা দেশে হীনবল হইয়া পড়িল।

(খ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাঙলা (১২২৭-১৩৪১ খ্রীঃ অঃ)॥ গিয়াসুদ্দীনের অবসানের পর বাঙলা দেশে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া দিল্লীশ্বর সুলতানদের অব্যাহত আধিপত্য ছিল। তাঁহারাই দিল্লী হইতে বাঙলা দেশে শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন; কিন্তু এই শাসকগণ মাঝে মাঝে দিল্লীর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া, নিজনামে 'খোৎবা' পাঠ করাইয়া স্বাধীন সুলতান হইয়া বসিতেন, কেহ-বা দিল্লীর সুলতানের আক্রমণে প্রাণ দিতেন। এই যুগের বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; গৌড়ে মুসলমানশক্তির দুর্বলতার সুযোগে উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ আবার কিছুদিন রাঢ় ও বরেন্দ্রে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

দিল্লীর প্রভাবাধীন বাঙলার শতবর্ষের এই ইতিহাসকে প্রধানতঃ দুইটি উপশাখায় বিভক্ত করা যায়ঃ মামলুক শাসন (১২২৭-১২৮৭ খ্রীঃ অঃ) এবং বলবন শাসন (১২৬৮-১৩৪০ খ্রীঃ অঃ)। দিল্লীশ্বরের বিশ্বাসভাজন মামলুক সর্দারগণ কিছুকাল লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। এই মামলুকগণ মধ্য এশিয়া, খিতাই তুর্কী, কিপচেক, উজবেগ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ক্রীতদাসরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। পরে নিজ নিজ অধ্যবসায়ের দ্বারা সুলতানদের বিশ্বাস অর্জন করিয়া উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১২২৭-১২৮৭ খ্রীঃ অব্দ—অর্থাৎ ষাট বৎসরের মধ্যে দিল্লী হইতে বাঙলা দেশে প্রায় দশ জন মামলুক শাসনকর্তা প্রেরিত হইয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীনের হত্যার পর রাজকুমার নাসিরুদ্দীন কিছুকাল গৌড়ে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যু হইলে মালিক ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন বল্‌কা খিল্‌জী নামক এক খিল্‌জী ওমারহ্‌ কিছুকাল বাঙলার সুলতান হইয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস সদলে আসিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিয়া শিরশ্ছেদ করেন। সুলতান মালিক সৈফুদ্দীন আইবেক নামক এক মামলুক দলপতি বাঙলার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১২২৬ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সুলতানের মৃত্যু হইলে যেমন সমগ্র হিন্দুস্থানে বিশৃঙ্খলা শুরু হইল, তেমনি বাঙলা দেশেও বিভিন্ন মামলুক নেতৃগণের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিল। এই তরল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইলেন বিহারের শাসনকর্তা তুঘরল তুঘান খাঁ। 'কারাখিটাই' তুর্কী মামলুক বংশীয় এই তুঘরল তুঘান খাঁ বেশ কিছু দিন বাঙলার সুলতান হইয়া বসিয়াছিলেন (১২৩৬-১২৪৫ খ্রীঃ অঃ)। ক্রমে ক্ষমতালাভে উদ্ধত হইয়া এবং দিল্লীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দৃষ্টে উল্লাস বোধ করিয়া তুঘান খাঁ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সুলতান হইবার ইচ্ছায় এলাহাবাদ পর্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। বাঙলায় তাঁহার অনুপস্থিতির ফলে উড়িষ্যারাজ প্রথম নরসিংহদেব লখ্‌নৌতি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান হিন্দুরাজা নরসিংহদেবের অতর্কিত আক্রমণে তুঘান খাঁ শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। যাহা হউক, অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তমর খাঁ তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাঁহাকেই বিতাড়িত করিয়া দিলেন। তুঘান খাঁ দিল্লীতে গিয়া এই বিষয়ে অনুযোগ করিলে সুলতান নাসিরুদ্দীন তাঁহাকে মালিক তমরের অধীন অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব দান করেন। তুঘান খাঁ যে দিন অযোধ্যায় প্রবেশ করেন সেই দিন রাত্রেই প্রাণত্যাগ করেন, এবং ঐ একই দিনে বাঙলায় তমর খাঁও

লোকান্তরিত হন। তাহার পর সুলতান মুঘিসুদ্দীন উজবক কিছুকাল গৌড়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি দিল্লীশ্বরের প্রাধান্য সগর্বে অস্বীকার করিয়া স্বীয় নামে 'খোৎবা' পাঠ করাইতে আরম্ভ করেন। যদিও তিনি উড়িষ্যার গঙ্গবংশের হস্তে বেশ কিছু নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যারাজকে মান্দারণ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। পরে কামরূপ জয় করিতে গিয়া তিনি পরাভূত হন এবং বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পরে ১২৫৭-১২৭২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে উজবকবংশীয় একাধিক শাসনকর্তা দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া গৌড়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পরে বাঙলা দেশ দিল্লীর বলবন বংশের প্রত্যক্ষ অধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন মুঘিসুদ্দীন তুঘরলকে বাঙলা দেশের 'নায়েব' বা সহকারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেন, প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন আমীন খাঁ। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘিসুদ্দীনই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। ৬৬৭ হিজরায় বাঙলা দেশ দিল্লীশ্বরের অন্যতম প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হয়। মুঘিসুদ্দীন নিজ শক্তিবলে আমিন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া বাঙলার সুলতান হন এবং পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেন। কেবল সোনার গাঁয়ের অধিপতি দনৌজা মাধবকে তিনি নতি স্বীকার করাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পূর্বতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া মুঘিসুদ্দীন স্বাধীন সুলতান হইয়া বসিলেন, নিজ নামে 'খোৎবা' পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং টাঁকশাল হইতে স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচারিত করিলেন, শুধু তাহাই নহে,—তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বিহার পর্যন্ত ধাবিত হইলেন। দিল্লীর সেনাবাহিনী ও সেনাপতিরা তুঘান খাঁয়ের সহিত শক্তির পরীক্ষায় পরাভূত হইলেন। তখন দিল্লীর সুলতান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বাঘরা খাঁকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তুঘরল উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সাঁতার দিয়া নদী পার হইবার সময় আক্রান্ত হইয়া বাঙলার সুলতানী লীলার মাশুল দিয়া জীবনরঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বলবন বিজয়গর্বে লখ্‌নৌতিতে প্রবেশ করিলেন এবং যথারীতি বহুলোকের প্রাণ বিনাশ করিলেন, পরে কনিষ্ঠ পুত্র বাঘরা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (১২৮২ খ্রীঃ অঃ)। বাঘরা খাঁ পরে পিতৃদ্রোহী হন। বলবনের মৃত্যুর পর বাঘরা খাঁ 'নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ বাঘরা খান' নাম লইয়া বাঙলার সুলতান হইয়া বসেন এবং তিনিই বাঙলায় বলবন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দিল্লীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় আমীর-ওমরাহ্‌দের কয়েকজন বাঘরা খাঁয়ের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। নানা কারণে দিল্লীশ্বর এবং বাঙলার সুলতানের (পুত্র ও পিতা) মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং উভয়েই সৈন্য লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হন। অবশ্য পিতাপুত্রের বিরোধ মিটিয়া যায়। পিতা নাসিরুদ্দীন বাঘরা খাঁ বাঙলা দেশ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র কায়কোবাদও প্রসন্নচিত্তে দিল্লী প্রস্থান করিলেন। ইহার পরে রুকনুদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১-১৩০১ খ্রীঃ অঃ)* কিছুকাল বাঙলার সুলতান হইয়াছিলেন। কায়কোয়াসের মৃত্যুর পর বাঙলা দেশ হইতে বলবন বংশের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইল। সুলতান বলবনের ক্রীতদাস ফিরুজ পরে 'সুলতান সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহ্' নাম লইয়া দীর্ঘকাল (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ অঃ) বাঙলা দেশ শাসন করেন। তাঁহার শাসনকালে ময়মনসিংহ, সোনার গাঁ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ জীবনে পুত্রের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার একপুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্ পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে লইয়া লখ্‌নৌতি অধিকার করিয়াছিলেন। এই বাহাদুর শাহের সহিত দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল। গিয়াসুদ্দীনের উত্তরাধিকারী সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের উন্মত্ত শাসনের কোন উত্তাপ বাঙলা দেশে সঞ্চারিত হয় নাই এবং ৭৪০ আ. হি. সনের (১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ অঃ) পর বারো বৎসর পর্যন্ত বাঙলা দেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিযাছিল।

মামলুক সর্দারগণের দ্বারা বাঙলা দেশ যে প্রায় ষাট বৎসরকাল অধিকৃত হইয়াছিল, তাহাতে মামলুক বংশ এবং সুলতানী বংশ, উভযেরই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তবে এই কয় বৎসরে বাঙলা দেশ দিল্লীর সুলতানের অঙ্গুলিসঙ্কেতের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দিল্লী হইতে প্রেরিত শাসনকর্তৃগণ স্বাধীন হইয়া বসিলেও তাঁহারা এই স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সময় সোনার গাঁয়ের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য যেমন বিনষ্ট হইল, তেমনি আবার রাঢ়ে-উড়িষ্যায় গঙ্গরাজগণের অধিকার শিথিল হইয়া পড়িল।

* বোধহয় নাসিরুদ্দীনের পুত্র।

(গ) ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১৩ খ্রীঃ অঃ)॥ ১৩৪২ খ্রীঃ অব্দে ইলিয়াস শাহ্ 'সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্' নাম গ্রহণ করিয়া লখ্‌নৌতির সিংহাসনে আরোহণ করিলে বাঙলার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হইল। সামসুদ্দীনই ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশ প্রথম পর্যায়ে (১৩৪২-১৪১৩ খ্রীঃ অঃ) একাত্তর বৎসর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) পঁয়তাল্লিশ বৎসর বাঙলা দেশে রাজত্ব করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজে একটা শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপনের গৌরবজনক ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা করিয়াছিল। ইলিয়াস শাহ্ নেপাল ও উড়িষ্যাতেও বীরত্বের দুঃসাহসিক চিহ্ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এতদিন ধরিয়া উড়িষ্যারাজ রাঢ়-বরেন্দ্রে মুসলমান সুলতানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ তাঁহাকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি শুনিয়া বাঙলা আক্রমণ করেন এবং পরিশেষে বাঙলার সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের নিকট পরাজিত হন। ইহার পর দিল্লীর সহিত তাঁহার আর কোন মতান্তর হয় নাই। অনুমান ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাঙলা দেশকে একটা সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়া সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সর্বপ্রথম বাঙলার শিথিল রাজনৈতিক জীবনে সুদৃঢ় স্থায়িত্ব আনয়ন করেন। তাঁহার পুত্র সিকন্দার শাহও (১৩৫৭ ৮৯ খ্রীঃ অঃ) পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ্ তুঘলক সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌কে পরাজিত করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। সিকান্দার শাহ্ বাঙলার সুলতান হইলে তুঘলক বাঙলা আক্রমণের সুযোগ পাইলেন। ১৩৫৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি একডালা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারেও আশাহত হইলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সিকান্দারের সহিত সন্ধি করিতে হইল। ইহার পরে প্রায় দুই শতাব্দী দিল্লী হইতে বাঙলা দেশে বিশেষ কোন অভিযান প্রেরিত হয় নাই। সিকান্দারের শেষজীবন পুত্রদের বিদ্রোহ ও কলহে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহী পুত্রের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়, এই যুদ্ধেই পাণ্ডুয়ার নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পর ইলিয়াসশাহী বংশধরদের রাজ্যকাল আর কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্রগণ অতিশয় অপদার্থ ও সুখান্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল। সিকান্দারের পর আরও চার জন

ইলিয়াসশাহী বংশধর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা ইতিহাসের পটে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন। ইহার পর দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে বাঙলার মসনদে হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

(ঘ) গণেশ-জলালুদ্দীনের অধীনে বাঙলা (১৪১৪-১৪৩১ খ্রীঃ অঃ)॥ ইলিযাসশাহী বংশের অধঃপতনের সুযোগে দিনাজপুরেব ভাতুড়িয়া পরগণার প্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ ইলিযাসশাহী যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিযাছিলেন। ফারসী গ্রন্থে ভ্রমক্রমে তাঁহাকে 'কান্‌স্' বলা হইয়াছে এবং ইহা হইতে কংস নামক আর এক হিন্দু রাজাব কথা কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিযাছেন, কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায না। আমাদেব অনুমান, এই কংসই হইলেন গণেশ। তিনি বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অথবা কাযস্থ—যাহাই হউন না কেন, তিনি যে একজন অসাধাবণ মানুষ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান যুগে মুসলমান পবিবেষ্টিত হইয়া দিল্লীব বোষ শিরে ধারণ কবিযা যে হিন্দুবাজা স্বাধীন হিন্দুবাজ্য প্রতিষ্ঠিত কবিযাছিলেন, তাঁহাব মনোবল ও কর্মনৈপুণ্য অবশ্য প্রশংসনীয। ইলিযাস শাহী বংশধব আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ্ বাজপ্রাসাদেব ষড়যন্ত্রে নিহত হইলে বিশেষ প্রতিভাশালী বাজা গণেশ ১৪১৬ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ বযসে গৌড়েব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই ব্যাপাবে বাঙলা ও চতুষ্পার্শ্বেব ধর্মান্ধ মুসলমানসম্প্রদায ক্ষিপ্ত হইযা উঠিল; একজন কাফের বাঙলাব সুলতান হইয়া বসিবে, ইহা মুসলমান সম্প্রদায় সহ্য কবিতে পাবিল না। একদিকে জৌনপুবেব শাসনকর্তা এবং অপর দিকে বাঙলাব পীব-ফকিব-গাজীবা গণেশের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা কবিলেন। জৌনপুবেব সেনাবাহিনীব সহিত যুদ্ধে বাঙালী সৈন্যেরা পরাজিত হইল; অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল। গণেশ অর্থদণ্ড দিয়া এবং জ্যেষ্টপুত্র যদু বা জিৎমলকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবিবার অঙ্গীকার করিযা মুক্তি পাইলেন। স্থিব হইল যদু মুসলমান হইলে তবে গৌড়ের সুলতান হইবেন। জৌনপুরের শাসনকর্তা চলিযা গেলে গণেশ বারো বৎসরের বালক যদুকে অন্তঃপুরে নজরবন্দী কবিযা রাখিয়া নিজে দেশ শাসন কবিতে লাগিলেন। তিনি সগর্ব "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" দনুজমর্দনদেব উপাধি ধারণ করিযা স্বাধীন নরপতির পদমর্যাদা গ্রহণ করিলেন। গোলাম হুসেন 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এ গণেশকে মুসলমান-বিদ্বেষী রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। ইহা কিন্তু ঠিক নহে; গণেশ কখনও

মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি মুসলমান পীর-ফকির-গাজীর অপ্রতিহত শক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করিয়াছিলেন; এইজন্য মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন।

গণেশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইযা 'সুবর্ণ ধেনু' প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পুত্র যদুকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিতে প্রযাস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সমাজ তাহা গ্রহণ করে নাই। যদুকে এই সময় বোধহয় বিশেষ অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছিল। তাঁহাব নিকট হিন্দু সমাজের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না, মুসলমান সমাজও তাঁহাকে সহৃদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করে নাই; এই সমস্ত কারণে তিনি হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও ভণ্ডামির প্রতি অতিশয ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইসলামের উদারতর ভ্রাতৃত্বের আহ্বান স্বীকার করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কবিতে না দিলে তিনি গৌড়ের মসনদে বসিবেন না, একথা স্পষ্টই জানাইয়া দিযাছিলেন। এই সময়ে গৌড়ে হিন্দু অভিজাত ও মুসলমান ওমরাহ্‌দের মধ্যে নিশ্চয় একটা ধূমায়িত অন্তর্বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। হিন্দু অভিজাতগণ যদুব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন, অপর দিকে মুসলমান ওমরাহ্‌গণ যদুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যদু দ্বিতীয় বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং জলালুদ্দীন নাম লইযা গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকট তিনি নিগৃহীত হইযাছিলেন, উপরন্তু হিন্দু অভিজাত জমিদাবগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপনের ষড়যন্ত্র করিযাছিলেন। এই কারণেই তিনি সুলতান হইযা হিন্দুদের উপর অতিশয উৎপীড়ন চালাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য করিয়াছিলেন। হিন্দু-উৎপীড়নের দোষ ছাড়িয়া দিলে জলালুদ্দীন শান্তির সহিত রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন; তাহার শাসনাধীনে দেশের সুখৈশ্বর্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৪৩১ খ্রীঃ অব্দে জলালুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপদার্থ পুত্র সামসুদ্দীন আহ্‌মদ কিছুকাল গৌড়ের সুলতান হইয়াছিলেন। তাঁহার অবিচার অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া গৌড়ের অভিজাতসম্প্রদায় সাদিখান নামক এক ক্রীতদাসের দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করাইযাছিলেন (১৪৪২ খ্রীঃ অঃ)। তাঁহার অবসানের সহিত রাজা গণেশের বংশধারা লুপ্ত হইল। লুপ্ত হইয়া গেলেও গণেশ বাঙলার মুসলমানযুগের ইতিহাসে 'একশ্চন্দ্রে'র মতো বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিজে রাজনীতির কূটবর্ত্মে চলিযা অতিশয বুদ্ধিমানের মতো কখনও 'বৈতসী' বৃত্তি

কখনও-বা 'সামদানভেদ' নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। জলালুদ্দীন ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হইলে হয়তো গৌড়ে আরও কিছুকাল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বজায় থাকিত। অবশ্য মুসলমান আমীর-ওমরাহ্‌গণের ষড়যন্ত্রে ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতিকূলতায় এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য কিছুতেই দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিত না। যাহা হউক, চারিদিকে মুসলমান আমীর-ওমরাহ্, পীর-ফকির-গাজী প্রভৃতি ধর্মান্ধ মুসলমানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও তিনি যে বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিচক্ষণতা ও রাজকীয় গুণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

(ঙ) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ)॥ গণেশ-জলালুদ্দীনের ধারা লুপ্ত হইলে গৌড়ে কিছুকাল ধরিয়া অরাজকতা, হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের চণ্ডলীলা বহিয়াছিল। এই অব্যবস্থায় উৎপীড়িত হইয়া আমীর-ওমরাহ্‌গণ পূর্বতন ইলিয়াসশাহী বংশধরদিগকে আবার গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন যে ইলিয়াসশাহী বংশধরটি অখ্যাত অবজ্ঞাত অবস্থায় কৃষিকার্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁহার নাম মাহ্‌মুদ। তাঁহাকেই গৌড়ের সুলতান নির্বাচিত করা হইল। তিনি 'নাসিরুদ্দীন আবুল মজফ্‌ফর মাহ্‌মুদ' (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীঃ অঃ) নাম গ্রহণ করিয়া হলচালনা ত্যাগপূর্বক রাজদণ্ড ধারণ করিয়া গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার শোণিতে রাজবংশধারা বহিতেছিল, কাজেই অল্পকালের মধ্যেই গৌড়কে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইতেই ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর রুকনুদ্দীন বরবক (১৪৫৬-১৪৭৪ খ্রীঃ অঃ) গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনিও অতিশয় বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। কামরূপরাজের বিরুদ্ধে বরবক অভিযান করেন এবং তাঁহাকে বোধহয় পরাভূতও করেন। যদিও বরবক শাহ্ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন*, তথাপি একটি বিষয়ে তিনি যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্যই ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারার সমাধি রচিত হয়।

গৌড়ে আমীর-ওমরাহ্‌গণ অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহারাই ইচ্ছামত

* ভাগবতের অনুবাদক বর্ধমানের কুলীনগ্রামনিবাসী মালাধর বসুকে তিনি 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দান করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে।

সুলতান নির্বাচিত করিতেন। বরবক প্রথমে তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যে যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমীরদিগের প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য তিনি আবিসিনিয়া হইতে আট হাজার হাবসী খোজা ক্রীতদাস আনাইয়া তাহাদিগকে প্রাসাদরক্ষায় নিযোগ করেন। পরে তাহাদের কাহাকে কাহাকে উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বববক নিজ বংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। দেহে-মনে বিকলাঙ্গ এই নপুংসকের দল বাঙলার সুলতানকে ঘেরিয়া রহিল, পুরাতন ওমরাহ্‌বংশের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হইল এবং হাবসী খোজার দল সুলতানের কৃপায় রাতারাতি ওমরাহ্ বনিযা গেল। বরবক বোধহয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, হাবসী খোজার দল প্রাধান্য পাইলে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ওমরাহগণ ষড়যন্ত্র করিবার আর অবকাশ পাইবেন না, তাঁহার অনিষ্ট করিতেও সক্ষম হইবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র সামসুদ্দীন য়ুসুফ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রীঃ অঃ) বাঙলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার মতো শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর সিকান্দার নামক একজন রাজবংশীয় মাত্র তিন দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ইনি সামসুদ্দীনেরই পুত্র; মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জলালুদ্দিন ফতেশাহ্ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) নামক য়ুসুফের আর-এক পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। তিনি সুবিচারক ও সুশাসক হইলেও তাঁহার শাসনকালে হাবসী-দৌরাত্ম্য মারাত্মক আকার ধারণ করিল। মালিক আন্দিল নামক এক খোজা তাঁহার অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিলেন। আন্দিলের রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির সুযোগ হইয়া প্রাসাদরক্ষী 'খোজা সেরা' বা প্রধান খোজা সুলতান শাহ্‌জাদা অন্যান্য প্রাসাদরক্ষীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ফতেকে হত্যা করিল। জলালুদ্দীন ফতে খোজা কর্তৃক নিহত হইলে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারাও লুপ্ত হইয়া গেল। বাঙলা দেশ, বঙ্গসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের সহিত এই বংশের কেবল যোগস্থাপন শুরু হইয়াছিল। দেশে শ্রী-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল; দিল্লীর সুলতান বাঙলা দেশে বহুকাল আর দৌরাত্ম্য করেন নাই। কিন্তু রুকনুদ্দীন বরবক হাবসী খোজা-ক্রীতদাস পুষিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ বংশধর জলালুদ্দীন ফতেকে প্রাণ দিয়া সেই ভুলের মাশুল দিতে হইল। তাহার পর শুরু হইল আবিসিনীয় হাবসী খোজাদের রক্তাক্ত ইতিহাস।

(চ) হাবসী শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ)॥ ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা বিলুপ্ত হইবার পূর্বেই হাবসী খোজার দল* অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। ইলিয়াসশাহী ধারা অদৃশ্য হইবার সময়েই এই হাবসী ও খোজার দল প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাইয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই সময়ে দেশের প্রজাশক্তি ও অভিজাত ওমরাহ্‌সম্প্রদায় কত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। সুলতান শাহ্‌জাদা নামক এক প্রধান খোজা জলালুদ্দীন ফতেকে হত্যা করিয়া হিন্দু পাইক ও মুসলমান খোজাদের সাহায্যে ছয় মাসের জন্য সিংহাসনে বসিলেন এবং বরবক শাহ্‌ নাম গ্রহণ করিলেন। অত্যাচারী ও হীনচরিত্রের শাহ্‌জাদা নগরের অভিজাত-সম্প্রদায়কে বিতাড়িত বা বিনষ্ট করিয়া খোজাদিগকে প্রধান করিয়া তুলিলেন। মালিক আন্দিল নামক পূর্বতন রাজভক্ত খোজা ছিলেন সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। শাহ্‌জাদা তাঁহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যত দিন তিনি (শাহ্‌জাদা) সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, তত দিন আন্দিল তাঁহার কোন অনিষ্ট করিবেন না। প্রভুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আন্দিল অতিশয় ব্যগ্র হইলেন এবং প্রাসাদের পাইকদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে শাহ্‌জাদা মদ্যপানে হতচেতন হইয়া সিংহাসনের উপরই নিদ্রিত হইয়াছিলেন। বিকৃত কামনাতুর শাহ্‌জাদা তখন রমণীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, অলঙ্কার ধারণ করিয়া, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ মাথায় রাখিয়া পরম নির্ভয়ে সিংহাসনের উপর নিদ্রা যাইতেছিলেন। আন্দিল এই অবসরে সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শাহ্‌জাদা সিংহাসনের উপর নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া আন্দিল পূর্ব-প্রতিজ্ঞামত তাঁহাকে আঘাত করিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে মাদকসেবী শাহ্‌জাদা নেশার ঝোঁকে সিংহাসন হইতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন, আন্দিলও পূর্ব প্রতিজ্ঞা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া বহু আয়াসে বিরাটদেহী শাহ্‌জাদাকে হত্যা করিলেন। প্রভুভক্ত আন্দিল জলালুদ্দীন ফতের বালকপুত্রকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। কিন্তু প্রভুর বিধবাপত্নীর অনুরোধে এবং ওমরাহ্‌দের ইচ্ছায় সৈফুদ্দিন ফিরুজ (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রীঃ অঃ) নাম লইয়া তিনি নিজেই গৌড়ের সিংহাসনে বসিলেন। শাহ্‌জাদার অত্যাচারের পর

* অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল' নামক গ্রন্থে নানা তথ্যাদি অবলম্বনে হাবসী শাসন সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার নিরসন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, হাবসী শাসনকে ঐতিহাসিকগণ অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

আব্দিলের সুশাসনে বাঙালী হিন্দু কিছুকাল নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। তিনি মাত্র তিন বৎসরের জন্য সুলতান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে হিন্দু পাইকগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে, তাহারাই তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার পরে সুলতান হইলেন দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মামুদ (১৪৯০-৯১ খ্রীঃ অঃ)। কাহারও মতে ইনি ফতে শাহের পুত্র, কাহারও বা মতে ফিরুজ শাহের পুত্র।* সে যাহা হউক, এই বালকের শিক্ষাদাতা সিদিবদর বা দিওয়ানা নামক আর-এক হাবসী পাইকদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই বালককে সরাইয়া ফেলেন এবং রাতারাতি সুলতান হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরদিন প্রভাতে সভাসদগণ এই 'দিওয়ানা'-কে সুলতানরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন, কিন্তু কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি পর্যন্ত করিলেন না। এই সিদিবদর দিওয়ানা সুলতান মুজাফ্‌ফর (১৪৯১ ১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) নাম লইলেন। ইঁহার মত নীচচরিত্র, রক্তপিপাসু, অমানুষ সুলতান বাংলার ইতিহাসে একান্ত দুর্লভ। ইনি সুলতান হইয়াই ওমরাহ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সর্বাগ্রে বিনাশ করিলেন, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত-বংশীয়দিগকে নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিলেন, অত্যধিক চড়া হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেনাবাহিনীর বেতন কমাইয়া দিলেন। ফলে সেনাবাহিনী তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। অতিশয় অত্যাচারে বিপর্যস্ত হইয়া জনসাধারণ ও আমীর-ওমরাহ্‌গণ তাঁহার বিরুদ্ধে একসঙ্গে উত্থিত হইলেন। মুজফ্‌ফর ভয় পাইয়া এক দুর্গে আশ্রয় হইলেন, অনেক দিন ধরিয়া উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিল। বোধহয় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন, অথবা তাঁহার মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন পাইকদের সাহায্যে তাঁহাকে হত্যা করিয়া হাবসী শাসনের তামসিক দুর্ভাগ্য হইতে বাঙলা দেশকে রক্ষা করেন।† ইহার পর হুসেন শাহ বাঙলা দেশে নূতন করিয়া রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। প্রধানতঃ এই রাষ্ট্রিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ প্রাক্‌চৈতন্য যুগের সাহিত্য বিকশিত হইয়াছিল।

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহাকে খোজা সৈফুদ্দিন ফিরুজ শাহের পুত্র বলিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য—অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়—'বাংলার ইতিহাসের দু শো বছর', পৃ ১৬৬—১৬৯।

† অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থে (পৃ ১৬৮—১৭২) মুজঃফর-শাহের চরিত্রের কলঙ্ক অবলোপের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু 'তবকাৎ ই-আকবরী', 'মাসিরী-ই-রহিমী', 'তারিখ ই ফেরিস্‌তা' এবং 'রিয়াজ-উস-সালাতিনের' বিবরণ এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

॥ ২ ॥

সমাজ, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন

সমাজ

পাঠানযুগে বাঙলার সমাজ বিজাতীয় আক্রমণে ও দূষিত জীবনাদর্শের প্রভাবে নানা দিক দিয়া বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল। তুর্কী রাজত্বের আশি বৎসরের মধ্যে বাঙলার হিন্দুসমাজে প্রাণহীন অখণ্ড জড়তা ও নাম-পরিচয়হীন সন্ত্রাস বিরাজ করিতেছিল। ভিন্নধর্মাবলম্বী, অন্য ভাষাভাষী ও সংস্কৃতিতে অনগ্রসর তুর্কী ঘোড়সওয়ারের চকিত তরবারিক্ষেপণে তদানীন্তন বাঙালী হিন্দুর নয়ন ধাঁধিয়া গিয়াছিল। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরে তরল রাষ্ট্রবিন্যাস কিয়দংশে স্থায়িত্ব লাভ করিলেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে নাই। শাসক-জাতির প্রতি হিন্দুসমাজের অশ্রদ্ধা, ভীতি ও সহানুভূতিহীন দূরত্বের কারণ—সেমীয় জাতির মজ্জাগত জাতিবিদ্বেষণা ও ধর্মীয় অনুদারতা। খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর শেষাঙ্ক হইতে সমগ্র পূর্ব-ভারতে মুসলমান অভিযান শুরু হয়; ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙলা দেশ মুসলমান শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও পীর-ফকির-গাজীর উৎপাতে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। শাসনকর্তৃগণ পরাভূত হিন্দুকে কখনও নির্বিচারে হত্যা করিয়া, কখনও বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা নিজ নিজ শাসনসীমার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, বল ও কৌশলের সাহায্য লইতেন। হিন্দুকে হয় স্বধর্ম ত্যাগ, না হয় প্রাণত্যাগ, ইহার যে-কোন একটি বাছিয়া লইতে হইত। ইখ্‌তিয়ার হইতে শুরু করিয়া হুসেনশাহী আমলের[১] পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান শাসকগণ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা আবশ্যিক পবিত্রকর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

১ হুসেন শাহ্‌ও সুলতান হইয়া বেগমের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার পূর্বতন প্রভু ব্রাহ্মণ সুবুদ্ধি রায়কে জাতিচ্যুত করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি রায় এইভাবে নির্যাতিত হইয়া প্রথমে কাশীতে, পরে চৈতন্যদেবের নির্দেশে শেষজীবন বৃন্দাবনে গিয়া অতিবাহিত করেন।

যুদ্ধজয়ের পর যেমন নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চলিত, তেমনি শান্তির সময় ধর্মান্তরীকরণের চণ্ডনীতিও চলিত অব্যাহতভাবে। গণেশের মতো অতিশয় সুচতুর বুদ্ধিমান ভূস্বামীও স্বীয় পুত্রকে নামতঃ মুসলমান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক দিকে যেমন ধর্মান্তরীকরণ চলিতেছিল, তেমনি আবার অপর দিকে হিন্দুর মন্দির ও বৌদ্ধের সঙ্ঘারাম চূর্ণ করিয়া, কখনও-বা বিধ্বস্ত মন্দিরের মালমসলা ও দেবদেবীর মূর্তি লইয়া মসজিদ নির্মিত হইত।[২] সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রীঃ অঃ) এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করাইয়া তাহার ধ্বংসাবশেষের দ্বারা মসজিদ-নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার হিন্দুদের সূর্যমন্দির ও নারায়ণমন্দিরকে যথাক্রমে মসজিদ ও মিনারে পরিবর্তিত করা হয়।[৩]

ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে রোমক সভ্যতার ধ্বংসের মতো মুসলমান শাসক ও আমীর-ওমরাহেরা হিন্দুর উপর ব্যাপক উৎপীডন চালাইতে পারেন নাই। আসলে বাঙলার সমাজে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে শুধু শাসকদের অত্যাচারকেই দায়ী করা যায় না। ইহার অন্য কারণও আছে। মুসলমান-যুগের প্রারম্ভ হইতেই বাঙলা দেশে পীর, ফকির, মুরশিদ, গাজী প্রভৃতি মুসলমান ধর্মগুরুদের আগমন হইতে থাকে। গিয়াসুদ্দীনের সময়ে এদেশে মুসলমান পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইতেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ সৈয়দ ও সুফীদিগকে গৌড়ে সাদরে স্থান দিতেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁহার সময়ে বাঙলা দেশে বহু সুফীমতাবলম্বী মুসলমান বাস করিতেন। কিন্তু এই ইসলামী দার্শনিক ও তাত্ত্বিকগণ হিন্দু জনসাধারণের উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইসলামের ঈষৎ সঙ্কীর্ণ ভাবাদর্শ এবং অ-ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি নিতান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতি নিম্নবর্ণ বা উচ্চবর্ণ হিন্দু-

২ প্রাচীন গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় যে সমস্ত দরগা ও মসজিদ আছে, তাহা হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাংশের দ্বারা নির্মিত; এখনও ঐ মসজিদসমূহে হিন্দু-দেবদেবীর চিহ্ন রহিয়াছে।

৩ অবশ্য খ্রীষ্টানজগতেও এইরূপ পীড়নের বহু দৃষ্টান্ত আছে। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে ইতালীর অনেক পেগান অট্টালিকা, শিল্পকৃতি মূর্তি, দেবদেবীর স্মৃতিমন্দির ভাঙিয়া তদ্দ্বারা গির্জা নির্মিত হয়। পোপ পঞ্চম নিকোলাস (১৪৪৭-৫৫ খ্রীঃ অঃ) কলোসিয়াম, সারকাস ম্যাক্সিমাস প্রভৃতি প্রাচীন পেগান শিল্পনিদর্শন ও অট্টালিকা ভাঙিয়া তাহার দ্বারা রোমের প্রাসাদ ও গির্জা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।—Will Durant's *The Story of Civilisation*, Vol. V, p. 376.

কেহই আকৃষ্ট হন নাই। আমীর-ওমরাহ্ ও সুলতানের দরবারে প্রতিপত্তি অর্জন করিবার জন্য কোন কোন হিন্দু যৎসামান্য ইসলামী আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র গণেশের পুত্র যদু ভিন্ন অন্য কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

নিম্নবর্ণের সমাজে কিন্তু হিন্দুর সমাজাদর্শ সুদৃঢ় অবরোধ রচনা করিতে পারে নাই। বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজে নিগৃহীত হইতেন। ফলে সমাজের এই অন্ধকার প্রদেশে ইসলামের বাণীপ্রচার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল এবং শুধু অত্যাচার নহে—পীরফকির, আউলিয়া, মুরশিদ প্রভৃতি ইসলাম-ধর্মাবলম্বী প্রচারকগণ নানাপ্রকার কৌশল, 'কেরামত' ও বলপ্রয়োগের দ্বারা সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা এক দিকে যেমন ইসলাম ধর্মের ভাবাদর্শকে হিন্দুর আদর্শ ও মানসিক গঠনের অনুকূল কবিয়া দরগা-খান্‌কা স্থাপন করিতেন, আবার অপর দিকে তেমনি মুসলমান শাসকশক্তির সহিত যোগ দিয়া হিন্দু-দলন কার্যে অবতীর্ণ হইতেন। ইঁহাদেব অনেকে ধর্মজগতের অধিবাসী হইলেও শাণিত তরবারি লইয়া অবিশ্বাসী ভূস্বামী বা জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। শাসকশক্তির বেশ খানিকটা অংশ এই ফকির সম্প্রদায় অধিকার করিয়াছিলেন; সাধারণ মুসলমানসমাজ ও শাসকদের উপর তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।[৪] ইঁহারা কখনও ছলচাতুরি, কখনও বা চণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া গাজী বনিয়া যাইতেন। পীব-ফকির ও হিন্দু ভূস্বামীদের দ্বন্দ্বকলহ লইয়া বাঙলা দেশে বহু লোকসাহিত্য ও কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার মখদুম পীর (মখদুম শাহ জালালুদ্দীন তবরোজী), পীর নেপীর (আখি সিরাজুদ্দীন), সেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক, সেখ নুরুদ্দীন নুর কুতব আলম[৫], বাবা আদম, ত্রিবেণীর জাফরখাঁ গাজী ও বড়খাঁ গাজী—ইঁহারা সকলেই মুসলমান ভক্তসমাজে অতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ এই ফকির-মুরশিদ-

৪ এই পীর-ফকিরসম্প্রদায় এমন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, সুলতান ফকিরুদ্দীন 'সৈদা' নামক এক ফকিরকে গ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই ফকির পরে ক্ষমতালাভে উদ্ধত হইয়া সুলতানের পুত্রকেই হত্যা করিয়া ফেলেন। ফলে অতিশয় পীরভক্ত ফকিরুদ্দীনও এই সৈদার মস্তকচ্ছেদন করেন।

৫ ইঁহার নিকট গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়া কখনও ধর্মত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইতেন, কখনও-বা ধর্মরক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দিতেন।

এই গাজীদের মধ্যে শ্রীহট্টের শাহজালালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, শাহজালাল পীর ৩৬০ জন দরবেশ সেনা লইয়া শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন। ইব্রাহিম মালিক বাজু নামক এক ফকির সুকৌশলে বোটাসগড়ের রাজকুমার হংসকুমারকে বিপদে ফেলিযাছিলেন। অবশ্য যুদ্ধে উভয়েই নিহত হন। মুকুটরায় নামক এক জমিদার মুসলমান-ধর্মান্তরীকরণে বাধা দিতে গিয়া নিহত হন (প্রদীপ, আশ্বিন, ১৩১১)। হামিজুদ্দীন নামক আর এক গাজী বীরভূমের বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তুরুকের অত্যাচার সম্পর্কে বিদ্যাপতিও 'কীর্তিলতা'য বলিযাছেন :

কতহুঁ তুরুক বরকর। বাট জাইতেঁ বেগার ধর॥
ধরি আনএ বাঁভন-বটুআ। মথা চড়াবএ গাইক চড়ুআঁ॥
ফোট চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়॥
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ। দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ॥
গোরি গোমঠ পূরলি মহী। পত্রহু দেবাক ধাম নহী॥
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার। ছোটেও তুরুকা ভভকী মার॥

অনু: কত তুরুক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণবটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাঙ্। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোযা উড়িধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে, দূর নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়।—অনুবাদক : ডঃ সুকুমার সেন ('মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী')।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বিদ্যাপতির সময়ে তুরুক ও হিন্দুর মধ্যে কিরূপ উৎকট জাতিবিদ্বেষ দেখা দিযাছিল। অবশ্য কালক্রমে এই পীরগাজীরা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছেন। হিন্দু কবিগণ মঙ্গলকাব্যের প্রারম্ভে দেবদেবী ও দিগবন্দনা করিতে গিয়া পীরবন্দনাও সারিয়া লইতেন।[৬] সুতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব-ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূলে শুধু শাসক-সম্প্রদায়ের বলপ্রয়োগই প্রধানভাবে কার্যকরী হয় নাই, কিয়ৎপরিমাণে সামরিক

৬ সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্য স্মরণীয় :

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে......বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পালে।......দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে। জোড় হাথে বন্দিব পাঁড়ুয়ার সূফী খাঞে।"......ইত্যাদি

শক্তিসম্পন্ন পীরফকিরগণ দরবেশসম্প্রদায়ের সহায়তায় হিন্দু ভূস্বামীদিগকে ছলে-বলে ধ্বংস অথবা ধর্মান্তরিত করিয়া মুসলমান ধর্মপ্রচারের মহিমা বৃদ্ধি করিতেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের অনুপ্রবেশ আরও সূক্ষ্ম, সেখানে বলপ্রয়োগ অপেক্ষা তাঁহারা একটা কৌশল অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা প্রায়শঃই হিন্দু ও বৌদ্ধের মঠ-মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করিতেন, অথবা মঠ মন্দিরের পাশেই পীরের দরগা-খানকা নির্মাণ করিয়া নানাপ্রকার তুকতাক চালাইতেন। নিম্নশ্রেণীর সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুগণ সংস্কারবশে এই পীরের দরগা ও মসজিদে শীর্ণি দিতে আসিত, কারণ যাহা পূর্বে দেবমন্দির ছিল, তাহা পরে ইসলামের মসজিদে রূপান্তরিত হইলেও হিন্দুগণ পূর্বতন সংস্কার ও আচারবিচার ভুলিতে পারিত না, এবং এইভাবে তাহারা ধীরে ধীরে পীরের দরগা ও মুসলমান সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইত। এই ফকিরগণ হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম ও গল্পকাহিনীকে ইসলামী মন্ত্রের দ্বারা পবিশুদ্ধ করিয়া লইতেন, বুদ্ধ ও দেবদত্তবিষয়ক গল্প কাহিনীকে 'মকদুম সাহেবের গল্প' বলিয়া চালাইতে ইহারা কিছুমা' দ্বিধা বোধ করিতেন না। ইহারা চট্টগ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মগী মন্দিরের নিকটেই শ্রদ্ধার্হ মুসলমানের কাল্পনিক সমাধিস্থান আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিতেন যে, সেই স্থলে বায়োজিদ বস্তামি, আবদুল কাদির জিলানি প্রভৃতি মুসলমান মহাপুরুষগণ সমাহিত হইয়াছেন—যাহা একেবারেই অসম্ভব – কারণ ইহারা কেহই ভারতীয় ছিলেন না, অথবা ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। এইরূপে হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসী অপাংক্তেয়গণ ধীরে ধীরে পীর ফকির-মুরশিদ-আউলিয়া-গাজীর প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে।

খ্রীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর বাঙলার হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অল্প তথ্যই জানা যায়, কারণ যে উপাদানের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনার মূলসূত্র অনুসৃত হইয়া থাকে, এই যুগে তাহার একান্ত অভাব। কখনও রাজশক্তি, কখনও-বা পীরফকিরের অলৌকিক কাহিনীর দ্বারা, কদাচিৎ ইসলামের প্রবল ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যাদর্শের ফলে হিন্দুসমাজের অবজ্ঞেয় জনসাধারণের একটা বড় অংশ অতি দ্রুত মুসলমান হইয়া যায়। প্রথমতঃ, তাহারা স্মার্ত হিন্দুসমাজের নিকট মনুষ্যত্বের সামান্যতম অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইতিপূর্বেই হিন্দুসমাজে যাহারা, 'অধম সঙ্কর' বলিয়া নিন্দিত ছিল—অর্থাৎ চাঁড়াল, বারুই, চামার, ডুলে, মালো প্রভৃতি অন্ত্যজগণ—বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। তাই ইহাদের পক্ষে ইসলামের নব-মানবতার বাণী উপেক্ষা করা

সহজ ছিল না। উপরন্তু হিন্দুসমাজে অশ্রদ্ধেয় 'পাষণ্ডী' বৌদ্ধগণও নানা দিক দিয়া এমনভাবে নিপীড়িত হইতেছিলেন যে, বাঙলায় কেবলমাত্র ইসলাম কেন, যে-কোন হিন্দুবিরোধী রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হইলেই এই নিম্নশ্রেণীর জনসমূহ তাহাকে বরণ করিয়া লইত। 'শূন্যপুরাণে' "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক যে কৌতূহলোদ্দীপক পদটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে,* তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও অযথার্থ নহে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে 'সদ্ধর্মিগণ' ধর্মনিরঞ্জনের নিকট সকাতরে আত্মত্রাণ প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ং যাজপুরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরকে মুসলমানের বেশে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুসলমানরূপী দেবগণ বৈদিক ব্রাহ্মণদেব দেউলদেহারা ভাঙিয়া উচিত শাস্তি দিলেন। ইহার পশ্চাতে যে একটা অতি স্পষ্ট সাম্প্রদায়িক দ্বেষণা লুকাইয়া আছে, তাহা সকলেই বুঝিবেন। এক দিকে কৌলীন্যশাসিত ও স্মার্ত বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থার দ্বারা খণ্ডীকৃত হিন্দুসমাজ 'অধম-সঙ্কর'-দেব বাহিবে ঠেলিয়া দিতেছিল, আবার অপর দিকে বৌদ্ধদিগেব প্রতিও সুবিচার করে নাই। পাশ্চাত্ত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ববেন্দবাসী রামচন্দ্র কবিভারতী (১৩শ শতকের মধ্য ভাগ) বৌদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুসমাজেব উৎপীডনে তাঁহাকে দেশ ত্যাগ কবিয়া সিংহল যাত্রা করিতে হইয়াছিল। গণেশের পুত্র যদু প্রথম বার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পব পিতা তাঁহাকে হিন্দুসমাজে পুনরায় গ্রহণ করিবাব জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা 'সুবর্ণ ধেনু' নামক প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন , তথাপি যদু (জলালুদ্দীন) হিন্দুসমাজে গৃহীত হন নাই। ইহার জন্যই তিনি পীর-ফকিরদেব প্ররোচনায় হিন্দুর উপর নির্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের কাহিনী গল্প হইলেও ইহার পশ্চাতে হিন্দুসমাজের অন্ধ সঙ্কীর্ণতাব ঐতিহাসিক চিত্রই প্রকটিত হইয়াছে। অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অপ্রীতির সম্বন্ধটাই আর সব কিছুকে ছাপাইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানেব বিজাতীয় সম্পর্ক হ্রাস পাইল এবং হুসেন শাহের সময়ে এই সম্বন্ধটা পুরাপুরি প্রীতির সম্পর্কে পরিণত না হইলেও প্রতিকূলতার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়া যায়। মামলুকবংশের সুলতানী লীলার সময়ে বিজয়ী ও বিজিতের বিরোধের সম্পর্ক শিথিল হইয়া একের প্রতি অপরের ঘৃণাবিদ্বেষ কিয়দংশে হ্রাস পায়। ইতিপূর্বে খিলজীবংশীয় ওমরাহদের কলহদ্বন্দ্বের ফলে উচ্চবর্ণের অনেক হিন্দু মুসলমান-প্রভাবান্বিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মিথিলা, উড়িষ্যা, নেপাল, ঝাড়খণ্ড ও কামরূপের

* এই গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরাপদ হিন্দু-অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙলা দেশে মামলুকগণ সুলতান হইবার পর হইতে রাষ্ট্রিক শান্তি ফিরিয়া আসিল, হিন্দুদের মানসিক শঙ্কা কিয়দংশে অপনীত হইল। মুসলমানের রাজসভায় হিন্দু অভিজাতশ্রেণী আবার সম্মানিত স্থান পাইলেন। যখন উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ রাঢ় ও বরেন্দ্র আক্রমণ করিয়া পাঠান সুলতানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন, তখনও বরেন্দ্রের হিন্দুসমাজ মামলুকদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বধর্মী উড়িষ্যারাজের সহিত যোগদান করেন নাই। অবশ্য ইহার দ্বারা বাঙলার হিন্দুজাতির জড়তা প্রমাণিত হইতেছে কিনা, তাহা সমাজতাত্ত্বিকগণ বিচার করিবেন। যাহা হউক, মুসলমান সুলতানগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দুর প্রতি প্রতিকূল ভাব ত্যাগ করিলেন। সুলতান ফকিরুদ্দীন শ্রীহর্ষসেন নামক এক বৈদ্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার জমিদারি দিয়া রাজা উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ ও আলিমুরাক হিন্দুদের সাহায্যেই পূর্ব-বঙ্গ অধিকার করেন। দিল্লীর সুলতানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ হিন্দুদের নিকট প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হন এবং বিপদ কাটিয়া গেলে স্বপক্ষীয় হিন্দুদিগকে অতিশয় সম্মানিত করেন। তাঁহার নিকট চট্টবংশীয় দুর্যোধন 'বঙ্গভূষণ' এবং পূতিতুণ্ডবংশীয় চক্রপাণি 'রাজজয়ী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।* জলালুদ্দীন প্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহস্পতিকে 'আচার্যকবিচক্রবর্তী', 'পণ্ডিতসার্বভৌম' 'কবিপণ্ডিতচূড়ামণি' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। জলালুদ্দীনের প্রধান অমাত্য ছিলেন একজন হিন্দু। রুকনুদ্দীন বরবক শাহ্ কর্তৃক মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দানও এই যুগে মুসলমান শাসক ও শাসিত হিন্দুর মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই নির্দেশ করিতেছে।† উপরন্তু হিন্দুগণও স্বচ্ছন্দে সুলতানদের বন্দনা করিয়াছেন। বৃহস্পতি জলালুদ্দিনকে 'গৌড়াবনী-বাসব' বলিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

মুসলমান শাসকগণ রাজকার্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া হিন্দু অভিজাতসম্প্রদায় ও শাসনকর্মে দক্ষ হিন্দু কর্মচারীর সংস্পর্শে আসিতেন এবং এইরূপেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইত। সমাজের উচ্চস্তরে যেমন হিন্দুগণ রাজ্যশাসন-ব্যাপারে মুসলমান সুলতানের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি ভদ্রেতর হিন্দুগণও পীরগাজীর প্রভাবে পড়িয়া, কখনও ভয়ে, কখনও-বা

* ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশ'

† এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

ভক্তিতে মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, যদিও অপাংক্তেয় হিন্দুগণের একটা অংশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, তথাপি ব্যাপক ধর্মান্তরীকরণ প্রবল হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিতে পারে নাই। হিন্দুর পৌরাণিক ও স্মার্তসংস্কৃতি ইসলামের প্রবল প্রতিক্রিয়া-মূলক আক্রমণ হইতে তাহাকে বর্মের মতো রক্ষা করিয়াছে। যদি সেনবর্মণ যুগে উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক ও স্মার্ত নিয়মাবলী বাঙালীর উপর না চাপাইয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে বজ্রযান ও সহজযান-বাঙালীসমাজ বৌদ্ধদের মতোই সহজে ইসলামকে বরণ করিয়া লইত এবং বাঙলার প্রায় সমস্ত হিন্দুই মুসলমান হইয়া যাইত। বাঙলা দেশের কিছু কিছু জল-অচল নীচজাতি মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, কারণ তাহারা নামেমাত্র হিন্দু থাকিলেও হিন্দু সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইসলামকে বরণ করিয়া লওয়া এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। কিন্তু সমাজের উচ্চবর্ণেরা রাজকার্যাদির অনুরোধে কিছু কিছু দরবারী পোষাক-পরিচ্ছদ আদবকায়দা গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের চিত্তের গভীর স্তরে আগন্তুক ইসলাম বিশেষ কোন শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতূহল জাগাইতে পারে নাই। তাঁহাদের মনের চারিদিকে সুদৃঢ় পৌরাণিক সংস্কৃতির বেষ্টনী তখনও অটুট ছিল; তাহা ভেদ করিয়া ইসলাম ধর্ম বাঙালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পার নাই।

এই প্রসঙ্গে 'সেকশুভোদয়া' সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। এই বিচিত্র গ্রন্থটি ১৩৩৪ সালে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর শেষ দশকে মালদহের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রাচীন গৌড়ের বাইশ হাজারী মসজিদ হইতে প্রাচীন কাগজে লিখিত এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সেবক হরিদাস পালিত বটব্যাল মহাশয়কে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। পুঁথিটি মসজিদের মুসলমান মাতোয়ালীর হেফাজতে ছিল, (আপদ বিপদে সেই পুঁথিটি বাহিরে আনিয়া পরম ভক্তিভরে পড়া হইত, হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাহা শুনিত।) সংস্কৃতে লিখিত এই অদ্ভুত পুঁথিটির একটি নকল করা হইয়াছিল। পুঁথি ও পুঁথির নকল বটব্যাল মহাশয়ের নিকটে ছিল। হরিদাস পালিত মহাশয় উহার আর একখানি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে বটব্যাল মহাশয়ের লোকান্তরের পর মূল পুঁথি ও তাঁহার নকলের আর কোন সন্ধান মিলিল না। পালিত মহাশয়ের নকল অবলম্বনে ডঃ সুকুমার সেন

'সেকশুভোদয়া' ছাপিয়াছেন। ভুল সংস্কৃতে লিখিত এই পুঁথিটির লেখক নিশ্চয়ই কোন মুসলমান। কিন্তু তাঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। (ইহাতে জলালুদ্দীন তাব্রিজি নামক (অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক শেখের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা করিতেছেন স্বয়ং হলায়ুধ মিশ্র। এই শেখ নাকি লক্ষ্মণ সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; লক্ষ্মণ সেন তাঁহার কেরামতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। ইহাতে লক্ষ্মণ সেন, উমাপতি ধর, হলায়ুধ মিশ্র, গোবর্ধনাচার্য, জয়দেব প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নানা গালগল্প আছে। শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। তাই লক্ষ্মণ সেনের সভায় এই মুসলমান সাধকের উপস্থিতির কাল্পনিক গল্প বিবৃত হইয়াছে। ইহা একখানি জালগ্রন্থ, কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ (যৎসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ) মুসলমান কল্পিত কোন এক শেখ জলালুদ্দীন তাব্রিজের গৌরব ঘোষণার জন্য এই পুস্তিকাটি রচনা করিয়াছিলেন এবং হলায়ুধ মিশ্রের নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন। (ইহার সংস্কৃত অধিকাংশ স্থলে হাস্যকর ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ, তবে গদ্যটি প্রায় বাংলা বলিয়া মনে হয়। ডঃ সেনের অনুমান এ গ্রন্থ ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে যাইতে পরে না।) ১৬শ শতাব্দীতে টোডর মল্ল যখন বাঙলাদেশে জমি জরিপ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন মসজিদের কর্তৃপক্ষ নিজেদের জমিজমা ও মসজিদের সম্পত্তির উপর দখলী স্বত্ব দেখাইতে গিয়া বোধহয় এই পুস্তিকাটি রচনা করিরা টোডর মল্লের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। পুঁথিটি ১৬শ শতাব্দীর দিকে জমিজমা সংক্রান্ত প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল; মসজিদের কর্তৃপক্ষ যে লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত জমিজমা ভোগ করিতেছেন তাহা দেখাইবার জন্যই বোধহয় তাঁহারা এই পুঁথিটি কোন অল্প সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমানকে দিয়া লেখাইয়া লন। মূল পুঁথিটি অদৃশ্য হইয়াছে, কাজে কাজেই এসম্বন্ধে গবেষণা নিষ্ফল। তবে ১৬শ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক জানিতে হইলে এই পুঁথি হইতে অনেক উপাদান পাওয়া যাইতে পারে।)

(এবার আর্থিক অবস্থার কথা। বিদেশী ভ্রমণকারীদের কিছু কিছু বর্ণনা হইতে স্থূলভাবে জানা যায় যে, খ্রীঃ ১৩শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ বাঙালীর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত দুর্বল ছিল না। দেশ ছিল কৃষিজীবী, ফলে এদেশে প্রচুর পরিমাণে আহার্য উৎপন্ন হইত এবং সে আহার্য কোন কারণেই দেশের বাহিরে যাইত না। সাধারণ মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাবিতেই হইত না। দেশের শাসকশক্তি প্রধানতঃ বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের

অনুরূপ ছিল ; ফলে শাসন ও শোষণ চণ্ডরূপ ধারণ করিতে পারে নাই। আমীর-ওমরাহদের কলহ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। কে সুলতান হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য প্রায়শঃই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। উড়িষ্যার গঙ্গরাজগণ দীর্ঘকাল রাঢ় ও বরেন্দ্র অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন, কখনও কখনও দিল্লীর সুলতানের সহিত বাঙলার শাসনকর্তার সংঘর্ষও চলিত। আবার কোন কোন সময়ে বাঙলার সুলতান বশ্যতা স্বীকার করিয়া দিল্লীর সুলতানকে হয-হস্তী-মুদ্রা উপঢৌকন পাঠাইতেন। কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতেন। দেশের মুদ্রা প্রায়ই দেশের মধ্যে থাকিত। উপরন্তু বাঙলা দেশে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যেরও বিদেশে বিশেষ চাহিদা ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলো বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি এই অঞ্চলে রেশমী কাপড, বন্দুক, কাগজ ও অন্যান্য কারু-শিল্পের প্রাচুর্য দেখিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা দেশে নিম্নবৃত্তিজীবিগণ কিছু আর্থিক আনুকূল্য লাভ করিত। এইজন্যই বোধ করি দেশে রৌপ্যমুদ্রা ও কড়ি—উভয় প্রকার মুদ্রামান প্রচলিত ছিল। রৌপ্যমুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের মুদ্রামান ও অন্যান্য রাজকাযে ব্যবহৃত হইত। কড়ির ব্যবহারের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণ নিম্নতম মুদ্রামানের সাহায্যে জীবনের প্রধান প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। অতএব সাধারণ লোকের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত সুসহ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩২৫-৫৩ সালের মধ্যে ইবনে বতুতা বাঙলা দেশের কোন কোন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিযাছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এদেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহা কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে অলীক কল্পনা নহে। তাঁহার হিসাবমতে সাত টাকায় প্রায় ৯ মণ চাউল, সাড়ে তিন টাকায় ১৪ সের ঘৃত, সাত টাকায় ২৮ মণ ধান, সাডে তিন টাকায় ১৪ সের চিনি, পৌনে দুই টাকায় একটি হৃষ্টপুষ্ট মেষ, একুশ টাকায় একটি দুগ্ধবতী গাভী এবং সত্তর টাকায় একটি সুশ্রী ক্রীতদাসী মিলিত। সাত টাকা হইলেই তিন জনের সারা বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করা যাইত। সুতরাং বাঙলা দেশ পাঠানযুগে দরিদ্র ছিল না। কিন্তু এ দেশের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের প্রতি বিদেশী মুসলমানের প্রলোভন থাকিলেও বোধহয় এই অঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু তাতার-তুর্কী-খোরাসানী

মুসলমান সহিতে পারিত না। তাই তাহারা বাংলার নামকরণ করিয়াছিল, 'দোজক-ই-পুবনিয়ামং' অর্থাৎ মঙ্গলময় নরক!

পাঠানযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মুঘলশাসনের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। ইংরাজ আমলে যেমন নানা খাতে দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইত, ঠিক সেইরূপ মুঘলযুগেও বাঙলার ঐশ্বর্যের অনেকটা রাজস্ব, যুদ্ধব্যয় ইত্যাদি আরও নানা খাতে রাজধানী দিল্লী চলিয়া যাইত। তাই মুঘলশাসনে বাঙালীর অর্থনৈতিক শোষণের আরম্ভ, ইংরাজ আমলে তাহার চূড়ান্ত পরিণতি। কিন্তু পাঠানযুগে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত, বরং শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির ফলে বাহির হইতেও কিছু কিছু স্বর্ণ-রৌপ্য বাঙলা দেশে প্রেরিত হইত এবং প্রায়শঃই নিম্নবৃত্তিজীবী ও শিল্পীরা কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে তাহা বণ্টন করিয়া লইত; পাঠানযুগে বাঙালীর অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে নাই, বরং কোন কোন দিক দিয়া অধিকতর শক্তি অর্জন করিয়াছিল।

সংস্কৃতি

বাঙলা দেশের জনজীবনধারা ও ঐতিহ্যের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, খ্রীঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দী, মোট তিন শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পাঠান আক্রমণের প্রভাবে এই সংস্কৃতির বিশেষ রূপান্তর হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আগন্তুক উপদ্রবকারিগণ সংস্কৃতির এমন কোন উল্লেখযোগ্য বাণী বহন করিয়া আনে নাই, যাহা বাঙালীর মানসনয়নে নব-জীবনবোধের দিব্যচ্ছটা হানিবে। মুসলমান আমীর-ওমরাহগণ অতিশয় শিথিল জীবন যাপন করিতেন; ঐহিক ঋদ্ধির অলস-বিলাস, রক্তাক্ত রাজনৈতিক কলহদ্বন্দ্ব এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্তরীকরণের সমস্ত নীতি—ইহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ঘটনা। সুতরাং বাঙালী হিন্দু ইহাদের দ্বারা লাভবান হওয়া দূরে থাক, বরং নানা দিক দিয়া অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। প্রধান ক্ষতি—ধর্ম হারাইবার আশঙ্কা। তখন বাঙলার হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইতে বসিয়াছিল। বৌদ্ধ-সম্প্রদায় সমাজে 'নাস্তিক' বলিয়া নিন্দিত হইতেছিল, বল্লাল-লক্ষ্মণ সেনের সভাকে ঘেরিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ স্মার্ত আচারবিচারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনায়

বৃথা কালক্ষেপ করিতেছিলেন। বল্লালী কৌলীন্য প্রথা হিন্দু-সমাজের উচ্চ-বর্ণদিগকেও অনৈক্যের বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তদুপরি সমাজ-শাস্ত্রীদের সৃষ্ট সংশূদ্র-অসংশূদ্র, উত্তমসঙ্কর-মধ্যমসঙ্কর-অধমসঙ্কর প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ শ্রেণী-বিভাজন এবং তজ্জাত শ্রেণীবিদ্বেষ ছিলই। বাঙলার এই সামাজিক উৎক্রান্তির মুখেই ইসলামের আবির্ভাব। সুতরাং বাঙলার স্থূল সামাজিক দেহটাতেই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল; বাঙালীর যে সংস্কৃতি প্রায় গুপ্তযুগ হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, এই সামাজিক উপপ্লবের সময়েও তাহা বিশেষ ক্ষুণ্ন হয় নাই।

পাঠানযুগে বাঙালীর সামাজিক জীবনে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে, যাহা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছে। হিন্দুযুগে বাঙলার সংস্কৃতি প্রধানতঃ ছিল গ্রামীণ; দেশের রাজধানীতে রাজা ও সামন্তবর্গ জাঁকাইয়া 'বার' দিয়া বসিলেও দেশের প্রাণশক্তি গ্রামেই নিহিত ছিল। কিন্তু ইসলামের ভূমিচারী জীবনাদর্শ, ওমরাহদের ভোগসুখেব উদ্দামতা—ইত্যাদির ফলে বাঙালীর শান্তস্নেহচ্ছায়া-শীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইল। গৌড়লক্ষ্মণাবতী, তাণ্ডা, দেবকোট, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি নগরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া একটা নাগরিক সভ্যতার সূচনা হইল; রাজকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সমস্ত রাজধানী বা প্রধান নগরীতে সমবেত হইতে লাগিল। ইরাণ-তুরাণ হইতে বণিক, ধর্মযাজক, পণ্ডিত, সুফী—সকলেই এই অপার ঐশ্বর্যের লীলাভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই যাতায়াতের ফলে বাঙালীর সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকটা হ্রাস পাইল, বিচিত্র জীবন ও সাধনার স্পর্শে তাহার মানসিক জগতেরও কিছু পরিবর্তন দেখা দিল এবং বহির্বাণিজ্যের ফলে একদিকে যেমন বাঙালীর আর্থিক সুবিধা ঘটিল, তেমনি আবার বাণিজ্যের কৃপাতেই নগরগুলিও অতি দ্রুত প্রসারলাভ করিতে লাগিল। ফেরিয়া-ই-সুজা নামক এক পর্তুগীজ ভ্রমণকারীর বর্ণনানুসারে দেখা যায় যে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ের লোকসংখ্যা ছিল বার লক্ষ। ইহা অতিরঞ্জিত হইলেও পাঠানযুগে বাঙালীর সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবন যে ধীরে ধীরে নাগরিকতার অভিমুখে যাইতেছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রাচীনযুগে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়িয়া উঠিত। বাঙলা

দেশে আলোচ্যপর্বে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই ধর্মবোধের কয়েকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। সাধারণ হিন্দু পঞ্চোপাসক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। লক্ষ্মণ সেনের সময় হইতে বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপ্রভাব সূচিত হইতেছিল। পাঠানযুগের অব্যবহিত পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের রামানুজ-নিম্বার্কের আবির্ভাবের ফলে জনসাধারণের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। বাঙলা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-গোপীলীলার অনেক চিত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধবেন্দ্রপুরীর দ্বারা বাঙলা দেশে ভাগবত ও ভাগবতের আদর্শ প্রচারিত হয়, তিনি এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ এদেশে গোপালমূর্তি পূজাও জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। উচ্চবংশীয় হিন্দুদের অনেকেই বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। জলালুদ্দীনের সমসাময়িক 'রায়মুকুট' উপাধিধারী বৃহস্পতি ধর্মমতে অতিশয় উদার ছিলেন। তাঁহার কৃত টীকা-টিপ্পনীতে বৌদ্ধ ব্যাকরণ হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে পুরাপুরি বিষ্ণু-উপাসক ছিলেন। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারম্ভে আছে, "ভগবতী মম বিষ্ণুভক্তিঃ"। কিন্তু আবার কোন কোন গ্রন্থে "পুরুষং স পরঃ", "জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ভবাদি সেব্যম্" প্রভৃতি উক্তি দৃষ্টে মনে হয় তিনি হয়তো শেষ জীবনে অদ্বৈততত্ত্বের উপাসক হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সমাজে বৈষ্ণব মতের প্রাধান্য না থাকিলে পাঠানযুগের শেষ ভাগে রামকেলি গ্রামে কর্ণাটদেশীয় রূপসনাতন বৈষ্ণবকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিতেন না। লোকজীবনেও কৃষ্ণলীলার বিশেষ প্রভাব ছিল। চৈতন্যদেব প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রার সময় রামকেলির অদূরে 'কানাই নাটশালা' গ্রামে কৃষ্ণলীলার চিত্র ও মূর্তি দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের পূর্ব হইতে বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীলা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

'চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য' রাজা দনুজমর্দন দেব প্রধানতঃ শক্তির উপাসক ছিলেন। প্রাচীন যুগ হইতে বাঙলা দেশে চণ্ডীর উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে' চণ্ডীপূজার কথা বলিয়াছেন। ১৩শ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই দশভুজা বা অষ্টভুজার মূর্তি নির্মাণ করাইয়া বাঙালী চণ্ডীদুর্গার উপাসনা করিত। ইহা ছাড়াও লোকজীবনে বিষহরি, বাসুলী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর বিশেষ প্রভাব ছিল – ইহা হইতেই পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্য

নামক একপ্রকার পুরাণশ্রেণীর সাহিত্য জন্মলাভ করে। সমাজে তখনও বৌদ্ধগণ কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিল।

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে নবদ্বীপ-শান্তিপুরকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নূতন আশ্রয় খুঁজিতেছিল। মুসলমান পাঠানের রাজসভায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ মাঝে মাঝে শ্রদ্ধাসম্মান লাভ করিলেও, তাঁহারা ভিন্নধর্মী পাঠান নৃপতিদের যতটা ভয় করিতেন, ঠিক ততটা বিশ্বাস করিতেন না। তাই ১৪শ শতাব্দী হইতেই নবদ্বীপ-শান্তিপুরের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যাতায়াত শুরু হইয়াছিল, এবং মহাপ্রভুর পূর্বেই এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যশাসিত বিদ্যাসমাজ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। যদিও পাঠান সুলতানদের রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া একটা নাগরিক সংস্কৃতি ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, তথাপি ঠিক যাহার সহিত বাঙালীজীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক, সেই মানসিক ঐতিহ্যের কেন্দ্র পাঠান নৃপতিদের ছত্রচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলেই বাস্তু স্থাপন করিয়াছিল। ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত এই নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরই বাঙালীর মানসিক জীবন ও সংস্কৃতিকে পরিচালিত করিয়াছে।

খ্রীঃ ১৩শ-১৫শ শতাব্দীর বাঙালা দেশের মানসিক ঐতিহ্যের পরিচয় লইতে হইলে সর্বপ্রথম সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান করিতে হইবে, কারণ বাংলা ভাষা ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর মানস-রস-বাহী হইতে পারে নাই। বোধহয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগ অথবা ১৫শ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভকাল হইতে সমগ্র বাঙালীজাতির প্রাণস্পন্দন প্রথম অনুভূত হইল বীরভূমের বড়ু চণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, কুলীনগ্রামের মালাধর বসু এবং ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের রচনায়। এই সময় হইতে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের বিদ্যাসমাজ সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেও গ্রামীণ বাঙলা নবসৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আপনাকে আবিষ্কার করিল।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুশীলন

আমরা প্রাক্-মুসলমান যুগের ঐতিহ্য বিচারপ্রসঙ্গে দেখিয়াছি, অতি প্রাচীন-কাল হইতেই গৌড়ে সংস্কৃতানুশীলন চলিয়া আসিলেও যাহাকে বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য (কাব্যনাট্যাদি) বলে, তাহা বাঙলা দেশে তখনও বিশেষ রচিত হয় নাই। স্মৃতি, মীমাংসা, বেদের টীকা-টিপ্পনী, বেদান্তের টীকাভাষ্য—এইজাতীয়

সংস্কৃতগ্রন্থ পালযুগ হইতেই বাঙলা দেশে প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছে। কেবল লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যকারের বিশুদ্ধ সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছিল। (১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে অন্ততঃ দেড় শতাব্দীকাল বাঙলা দেশ মূর্চ্ছাতুর হইয়াছিল। ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বাংলা গ্রন্থ তো দূরের কথা, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বা মূলের টীকা-টিপ্পনীও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার লিখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসব ধরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বেড়াইযাছেন, বহু পুঁথি সংগ্রহও করিযাছেন, কিন্তু তিনিও ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান পান নাই, কেবল দুই-একখানি নকল করা পুঁথি দেখিয়াছিলেন মাত্র।[৮] ইহাতে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন—তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালী ধর্ম, সমাজ ও ঘর সামলাইতে এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িযাছিল যে, সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মুহূর্তে সে মৌলিক গ্রন্থ রচনার অবকাশ পায় নাই।) তাহার এই অনুমান মিথ্যা নহে। বাস্তবিক ১২শ শতাব্দীর জয়দেবগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল পরে ১৬শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-গোস্বামী প্রভুরাই সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন করিযা দর্শন ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র ও সুদূরপ্রসারী তথ্য উদ্ধার ও প্রচার করেন। (সুতরাং ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীরচিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ কোন গ্রন্থ এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রূপসনাতনের আবির্ভাবের পূর্বে রাজা গণেশের সময়ে খ্রীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে বাঙালী যে দুই-চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিযাছিল, তাহার অধিকাংশই স্মৃতিমীমাংসাবিষয়ক।[৯] এই স্মৃতিকারের মধ্যে শূলপাণি (১৫শ শতকের প্রথমভাগ), শ্রীকর আচার্য (১৫শ শতকের চতুর্থ দর্শক) এবং তাঁহাব পুত্র শ্রীনাথ আচাযচূড়ামণির (১৫শ শতকের শেষ দর্শক) নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা স্মৃতির বাঁধ বাঁধিয়া বিধ্বস্তপ্রায় হিন্দুসমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন।) তন্মধ্যে শূলপাণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্মার্ত হইলেও বৈষ্ণবধর্ম ও আচার-আচরণের প্রতিই অধিকতর নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি স্মৃতিগ্রন্থ কৃষ্ণলীলাকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত; যথা—একাদশী বিবেক,

৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৮

৯ Manomohan Chakraborty—*The History of Smriti in Bengal & Mithila* (J. A. S. B. 1915)

দোলযাত্রা বিবেক, রাসযাত্রা বিবেক ইত্যাদি।) জীমূতবাহনের পর বাঙলার সমাজগঠনে শূলপাণির প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকার্য। বৌদ্ধপ্রভাব ও ইসলামের আক্রমণে বাঙালীর সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছিল; (শূলপাণি নানা প্রকার স্মৃতিমীমাংসা অবলম্বনে স্মার্ত বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলিয়া সেই সমস্ত ভাঙনের হাত হইতে বাঙালা জাতিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।)

কিন্তু স্মৃতিমীমাংসা ছাড়িয়া দিলেও সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা-অনুশীলন এদেশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনাথ তর্ক-বাগীশ ভট্টাচার্যের 'সাংখ্যতত্ত্ববিলাস' (১৪৪৮ খ্রীঃ অঃ) দৃষ্টে মনে হয়, ১৫শ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে তার্কিকতার সহিত কিছু পরিমাণে তত্ত্ববাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অবশ্য এই জাতীয় গ্রন্থের প্রচার পণ্ডিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বই বিদ্বজ্জনের মধ্যে সমধিক প্রচারিত হইয়াছিল। স্বয়ং বাসুদেব সার্বভৌম এবং অদ্বৈত আচার্য প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। সুতরাং মনে হইতেছে যে, গৌড়পাদের 'কারিকা' হইতে আরম্ভ করিয়া চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অদ্বৈততত্ত্ব এ দেশের বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণসমাজে সুপরিচিত ছিল।

(কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পাঠানযুগে মধ্বাচার্যের (১২শ শতক) দ্বৈত মতবাদ বাঙলা দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—পরে এই মত হইতে মাধবেন্দ্রপুরীর আবির্ভাব হয়—যিনি গৌড়মণ্ডলে সর্বপ্রথম ভাগবত আদর্শ ও কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করেন। ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে ভাগবতাশ্রিত ভক্তিবাদ বাঙলা দেশের বিদ্বজ্জনসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।) কারণ সর্বানন্দের অমরকোষের টীকায় নানা পুরাণ-উপপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি থাকিলেও ভাগবত হইতে কোন শব্দ বা শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই। রাজা গণেশ ও জলালুদ্দীনের সমসাময়িক 'রায়মুকুট' বৃহস্পতি তাঁহার বহু টীকা-টিপ্পনীতে কোথাও ভাগবতের উল্লেখ করেন নাই—যদিও তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

(বাঙলা দেশে ১৩শ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে মৌলিক কাব্য বা নাটকের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই; কেবল রামচন্দ্র কবিভারতীর (১২৪৫ খ্রীঃ অঃ) 'ভক্তিশতক', 'বৃত্তমালা' এবং চতুর্ভুজের 'হরিচরিত' (১৪১৫ শক—১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখযোগ্য। এই 'হরিচরিত' ১৪শ সর্গে রচিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক

এক বিরাট মহাকাব্য। রূপগোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী' অনেক পরে সংগৃহীত হইলেও ইহাতে এমন অনেক কবির কবিতা গৃহীত হইয়াছে, যাঁহারা সম্ভবতঃ রূপগোস্বামীর পূর্বে অর্থাৎ ১৩শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। অবশ্য এই দুই শত বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক কাব্য-নাট্য লিখিত না হইলেও নানা কাব্যের টীকা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'রায়মুকুট' বৃহস্পতি শুধু 'স্মৃতিরত্নহার' নামক স্মৃতির টীকা লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি' নামক 'শিশুপালবধে'র টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সমাজে এই সমস্ত কাব্যের অনুশীলন না থাকিলে স্মার্ত-বৃহস্পতি উহার টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার দুই পুত্র বিশ্রাম ও রাম সম্ভবতঃ কবিশক্তির অধিকারী ছিলেন; কারণ পিতা আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক শ্লোকে নিজ পুত্রদ্বয়কে 'কবীন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[১০] ১৫শ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে রাজা গণেশের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত বিদ্যার কিছু অনুশীলন হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অল্প পরে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি নগরকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতাশ্রিত ভক্তিধর্মের বিশেষ প্রচার হইতে আরম্ভ করে। সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি, সনাতন, রূপ প্রভৃতি ভক্ত ও পণ্ডিতগণ এই গ্রামেই বাস করিতেন।

বাঙলা দেশের মধ্যযুগে গোস্বামীদের ভক্তিরসাশ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যরচনা বাদ দিলে একমাত্র নব্যন্যায় ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে বাঙালী বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। অবশ্য ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে বা ১৫শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও নব্যন্যায়ের প্রধান আচার্য নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির 'অনুমান দীধিতি' রচিত হইলে নৈয়ায়িক বাঙালীর সারস্বত প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষেই বিস্তার লাভ করে এবং নব্যন্যায় অধ্যয়নের জন্য ভারতের নানা স্থান হইতে নবদ্বীপে পাঠার্থী আসিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বিদ্বজ্জনের মধ্যে নব্যন্যায়ের বিশেষ চর্চা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে রঘুনাথের পূর্ববর্তী কয়েকজন নৈয়ায়িক, স্মার্ত ও বৈদান্তিক বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে রঘুনাথের গুরু বাসুদেব সার্বভৌমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি 'তত্ত্বচিন্তামণি' নামক ন্যায়ের টীকা এবং 'বেদান্তপ্রকরণ' ('অদ্বৈত মকরন্দে'র টীকা) প্রণয়ন করেন। সার্বভৌম প্রথম জীবনে ন্যায় ও বেদান্তের

১০ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও শেষজীবনে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া চৈতন্যদেবের ভক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার অন্তরে পূর্ব হইতেই ভক্তিবাদের আভাস সংগুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল। ন্যায়ের টীকার প্রারম্ভেই তিনি "ঘনশ্যামমহং ভজে" বলিয়া ঘনশ্যামকে বন্দনা করিয়াছেন। বাসুদেব সার্বভৌম এবং তাঁহার শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি—উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলা দেশে কোন কোন পণ্ডিত ন্যায়, কাব্যালঙ্কার ইত্যাদির টীকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের 'কলাপ দীপিকা' নামক ভট্টিকাব্যের টীকা একদা বাঙলা দেশে অতিশয় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশ' টীকাতে অলঙ্কারতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নব্যন্যায়েও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

খ্রীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে বাঙালীর সারস্বত অবদান কিছু খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল—রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাই তাহার প্রধান কারণ কিনা তাহা সমাজতাত্ত্বিকগণ আলোচনা করিবেন। কিন্তু ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারার বিলুপ্তির পর রাজা গণেশ ক্ষণকালের জন্য গৌড়েশ্বর হইলে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) গৌড়ে সংস্কৃত স্মৃতিমীমাংসা ও ন্যায়চর্চার সুযোগ দেখা দিল। বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত বিদ্যাসমাজ প্রায় এই সময় হইতেই প্রাধান্য পাইতে থাকে এবং ১৬শ শতাব্দী হইতে একদিকে যেমন মহাপ্রভুর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নূতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হইল, ঠিক তেমনি আবার বুদ্ধিবিলাসী বাঙালী সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ ন্যায়শাস্ত্র লইয়া মত্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বাঙালীর চিত্তলোকে দুইটি ধারা বহিতেছিল; একটি নব্যন্যায়ের বুদ্ধিমার্গ, আর-একটি গৌড়ের অদূরে রামকেলি গ্রামে ক্ষীণধারায় বহমান প্রেম ও ভক্তিরস। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রামকেলি গ্রাম হইতে প্রবাহিত এবং রূপসনাতন-পরিকল্পিত প্রেমমার্গীয় রসতত্ত্ব ও নিঃশ্রেয়স্ ভক্তিধর্মের কূলপ্লাবী ধারা নবদ্বীপের চৈতন্যধারার সহিত মিলিত হইয়া বাঙালীর স্মৃতি-মীমাংসা, 'অনুমান-দীধিতি', 'তত্ত্বচিন্তামণি-প্রকাশ' (পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের ন্যায়গ্রন্থ), 'তত্ত্বচিন্তামণি-বিবেচন' (কাশীনাথ বিদ্যানিবাসের নব্যন্যায় গ্রন্থ) প্রভৃতিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল—বাঙালী-মানসের নবজাগৃতি হইল। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদিপর্ব ধরিয়া তাহারই প্রস্তুতি চলিয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়

বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা

॥ ১ ॥

বেদে-উপনিষদে বিষ্ণু

বিষ্ণু-কৃষ্ণ-বাসুদেব-আশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম কত প্রাচীন, তাহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই, মতভেদেরও সীমা-সংখ্যা নাই। রসিক ভক্ত বলিবেন, শুষ্ক জ্ঞানমার্গের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণবধর্ম বিচার করিতে হইলে এইরূপ মতানৈক্যের বিড়ম্বনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণভক্তি আধুনিক কালের সামগ্রী নহে, গৌড়ীয় গোস্বামী প্রভুদের সৃষ্টি নহে, রামানুজ সম্প্রদায়েরও ধ্যানলব্ধ বস্তু নহে,—এমন কি দক্ষিণ ভারতের 'আলোয়ার'গণের আবেগনম্র তামিল ভাষায় রচিত কৃষ্ণগীতিকাতেই ইহার প্রথম পদপাত নহে। ভারতবর্ষে আদ্যন্তকাল হইতে ভগবান বিষ্ণুর 'পরমপদ' এবং কৃষ্ণবাসুদেবের পরমকরুণা তৃষ্ণার্ত ভক্তের অন্তরে বর্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তত্ত্বালোচনায় তথ্যবিবৃতির প্রয়োজন; তাত্ত্বিকগণ সেই তথ্যের পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন পুরাতত্ত্বে বিষ্ণু, বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণ বাসুদেব উপাসনার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারা সন্ধান করিয়াছেন; তাহার ফলে বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস ও বিকাশধারা অনুসরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ভক্তি-ধর্মের তথা ভক্তিবাদের কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রধানতঃ বিষ্ণু ও বিষ্ণু-অবতার কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিমার্গ ভারতবর্ষে একটা সুবিপুল ঐতিহ্য ও মানস-সাধনারূপে পরিগণিত হইলেও অপেক্ষা-কৃত পরবর্তী যুগে শিব ও শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াও ভক্তিশাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এমন কি ২য় খ্রীঃ পূর্বাব্দে বৈষ্ণব 'ভাগবত' সম্প্রদায়ের অনুকরণে একদল শৈবভক্ত 'ভাগবত' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।[১] সম্ভবতঃ বৈষ্ণব

[১] J E Carpenter—*Theism in Medieval India*

ভাগবত ধর্মের প্রভাবে শৈবভক্তগণ আপনাদিগকে 'শৈব ভাগবত' আখ্যা দিয়াছিলেন।

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ এবং আরণ্যক-ব্রাহ্মণের বহু স্থলে বিষ্ণু ও ভক্তিরসের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির কথা আছে বটে, কিন্তু সে ভক্তি বিষ্ণুর প্রতি উদ্দিষ্ট নহে। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ বরুণকে সখা বলিয়া ভালবাসিয়াছেন (৭, ৮৮, ৩।৭, ৮৬, ৪); ইন্দ্রকে মাতাপিতা বলা হইয়াছে (৩, ১, ৬)। কোন এক ঋক্-রচয়িতা ইন্দ্রের বন্ধুত্বকে 'স্বাদু' বলিয়াছেন। অগ্নিকেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও ইন্দ্রোপাসকের মধ্যে কান্তাপ্রেমের আভাসও পাওয়া যাইতেছে। একটি সূক্তে (১০, ৪, ৩) কবি বলিতেছেন, স্ত্রী যেমন স্বামীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ তিনিও ইন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আর-একটি সূক্তে (১০, ৪০. ২) অশ্বিনীকুমারকে আদিরসাত্মক ভক্তির ভাষায় সাভিমানে ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, "বিধবা যেমন দেবরকে শয্যায় আহ্বান করে, স্ত্রীলোক যেমন পুরুষকে কামনা করে, সেইরূপ কে তোমাকে তাহার নিলয়ে ডাকিয়া লইয়াছে?" এখানে কি বিপ্রলব্ধা রাধার অভিমানই স্ফুরিত হইতেছে না? বরুণসূক্তে স্পষ্টভাবেই ভক্তি-করুণার আভাস পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য ভক্তির প্রচলিত অর্থ বেদে নাই, বরং উপনিষদে devotion অর্থে 'ভক্তি' শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের নানা সূক্তে উপাস্যকে মানবীয় সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেমের দৃষ্টিতে উপলব্ধি করার দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং মানবীয় সম্বন্ধমূলক দেবভক্তিবাদ ঋক্‌সূক্তেও রহিয়াছে।

পূর্বাঞ্চলে ক্ষত্রিয় সমাজে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জ্ঞানমার্গ হইতেই উপনিষদের আবির্ভাব হয়। সুতরাং জ্ঞানকেন্দ্রিক শান্ত ভক্তিই ইহার মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু উপনিষদেরও বহু স্থলে রাগমার্গীয় ভক্তির ইঙ্গিত আছে। ব্রহ্ম ও জীবের মিলনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, "প্রেমিকাপত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মানুষ যেমন আপনপর ভুলিয়া যায়", সেইরূপ ব্রহ্মজীবের মিলন। ইহাতেও আদিরসাত্মক ভক্তি প্রবেশ করিয়াছে। বৃহদারণ্যকে (৩, ৭) ব্রহ্মকে 'অন্তর্যামী' বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'ভক্তি' শব্দটি প্রথম যথাযথ অর্থে পাওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যকের অনেক স্থলে ভক্তির সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, বেদ ও আরণ্যক-উপনিষদে ভক্তির পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকিলেও বিষ্ণুর সহিত সেই ভক্তির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

ঋগ্বেদেও বিষ্ণু নামক দেবতার উল্লেখ আছে। অবশ্য বৈদিক বিষ্ণু এবং কৃষ্ণবাসুদেব একব্যক্তি নহেন বলিয়াই অনুমিত হয়। ঋগ্বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের বন্ধু, সৌরদেবতা, যুদ্ধের নেতা—কোথাও বা মহদ্দেবতা বলিয়া পূজিত। কিন্তু তিনি সর্বপ্রধান দেবতা নহেন। পরবর্তী কালে বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বিষ্ণু প্রধান দেবতা বলিয়া পূজিত হইলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৫, ১১)। কঠোপনিষদেও (১, ৩, ৮-৯) বিষ্ণুর স্থান সর্বোচ্চে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ঋকের পরবর্তী বেদসমূহে বিষ্ণু যজ্ঞীয় দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। যজুর্বেদের বহু স্থলে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। অধ্বর্যু পুরোহিতগণ যজ্ঞকার্যে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণ (১, ২, ৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা (১, ৭, ৫, ৪) বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতিতে 'বৈষ্ণব' শব্দটি আছে বটে, কিন্তু তাহাব অর্থ বিষ্ণুভক্ত নহে,—বিষ্ণু যাহার অধিকারী, ইহাই ঐ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য। অবশ্য ঋক্ ও আবণ্যক-ব্রাহ্মণে বিষ্ণু সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে পরবর্তী কালে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তিধর্মের উৎপত্তি হয়, তাহার বীজ নিহিত ছিল। ঋকের 'বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে' বা 'ত্বং বিষ্ণো সুমতিং' প্রভৃতিতেও বিষ্ণু-আরাধনার কথা আছে বটে, কিন্তু ঋকে ভক্ত যে ভক্তির দৃষ্টিদ্বারা ইন্দ্রবরুণকে আরাধনা কবিয়াছেন, বিষ্ণুকে ঠিক সেই ভক্তিরসাপ্লুত দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করেন নাই। তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট 'পরমপদ', অভীষ্ট ধন, বহুজনের প্রীতিপ্রদ অশ্বাদি ও ঐশ্বর্য কামনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত উল্লেখে ঠিক ভক্তির সুর ধ্বনিত হইতেছে না। বরং পরবর্তী উপনিষদে বিষ্ণু যখন প্রধান দেবতা হইলেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ধীরে ধীরে ভক্তিরস সঞ্চারিত হইল।

॥ ২ ॥

প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন গ্রন্থে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-বাসুদেব

পতঞ্জলি পাণিনিসূত্র ব্যাখ্যায় বাসুদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিতেও বাসুদেবের ভক্ত 'বাসুদেবক' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং পাণিনির (আনুঃ ৬০০ খ্রীঃ পূঃ) পূর্ব হইতেই বাসুদেবকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবত-ধর্মের বিকাশ হইয়াছিল। পতঞ্জলি অবশ্য দেবকীপুত্র বাসুদেব এবং বৃষ্ণি-বংশোদ্ভূত

বাসুদেবকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াছেন। ১ম শতকের প্রস্তব লিপিতে বৃষ্ণি-বংশোদ্ভূত বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তৈত্তিরীয় আবণ্যকে বাসুদেবেব নাম পাওযা যাইতেছে। সেখানে বিষ্ণুই বাসুদেব। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে (খ্রীঃ পূঃ ৪০০)[২] হেবাকলস ('Herakles') বলিয়া যাঁহাদেব নির্দেশ কবিযাছেন, তাঁহারা বোধহয কৃষ্ণ-বাসুদেবেব উপাসক।

ঘোষাণ্ডী (বাজপুতানা) শিলালেখে (খ্রীঃ পূঃ ২০০) সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবেব উল্লেখ আছে। নানাঘাট গুহাব অভ্যন্তবে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও (খ্রীঃ পূঃ ২০০) সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবেব নাম পাওযা যাইতেছে। তক্ষশীলাবাসী গ্রীকভক্ত হেলিওডোবাস (খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দ) ভগবান বাসুদেবেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেব জন্য গরুডধ্বজ প্রতিষ্ঠা কবেন। এই বিদেশী আপনাকে 'ভাগবত' অর্থাৎ বাসুদেবেব উপাসক বলিযা উল্লেখ কবিযাছিলেন। গুপ্তবাজগণেব অনেকেই আপনাদিগকে 'পবমভাগবত' (দ্বিতীয চন্দ্রগুপ্ত, কুমাবগুপ্ত এবং স্কন্ধগুপ্ত, খ্রীঃ ৪০০-৪৬৭) আখ্যা দিযা বিষ্ণুভক্তিব নিদর্শন বাখিযা গিযাছেন। 'বাল চবিতমে' (কৃষ্ণেব বাল্যলীলা) ভাস, 'মেঘদূতে' কালিদাস ("গোপবেশী বিষ্ণোঃ") এবং বাণভট্ট ভাগবত ও 'পাঞ্চবাত্র'[৩] সম্প্রদাযেব উল্লেখ কবিযাছেন। সুতবাং দেখা যাইতেছে, উপনিষদেব শেষ দিকে বিষ্ণু প্রধান দেবতা হইযা পডিযাছিলেন, এবং ঈষৎ পববর্তী কাল হইতেই ভাবতবর্ষে বিষ্ণু ও বাসুদেবকে কেন্দ্র কবিয়া ভক্তসম্প্রদায গডিযা উঠিযাছিল। 'বাসুদেব 'ভাগবত', 'পাঞ্চবাত্র', 'সাত্বত', প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিষ্ণুভক্তগণ অভিহিত হইতেন। মহাভাবতে বসুদেব-দেবকীনন্দন কৃষ্ণই প্রধান, তিনি বিষ্ণুব অবতাব। মহাভাবতেব 'নাবাযণীয' অংশে তাঁহাব ভক্তিশাখাব বর্ণনা আছে। ঘোষাণ্ডী ও বেসনগবের শিলালিপি দৃষ্টে প্রমাণিত হইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দেই ভাবতে ও ভাবতেব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসুদেবেব ভাগবতধর্ম ছডাইয়া পডিযাছিল। তখনও তাহা 'বৈষ্ণব' নামে আখ্যাত হয নাই। বোধহয মহাভাবতেই ধর্মগোষ্ঠী অর্থে 'বৈষ্ণব' শব্দটিব প্রত্যক্ষ উল্লেখ দেখা যায। গীতাতেও এ শব্দ নাই।

মহাভাবতে কৃষ্ণ ও বাসুদেব একই ব্যক্তি—যিনি যদুবংশেব সাত্বতকুলে আবির্ভূত হন। তিনি বসুদেব ও দেবকীব পুত্র, যোদ্ধা, নীতিপ্রবক্তা ও

২ মেগাস্থিনিসের এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালে গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে 'ইণ্ডিকা' হইতে তথ্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল; তাহাই অবলম্বনে এই গ্রন্থের স্থূল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

৩ 'পাঞ্চরাত্র' সম্প্রদায়ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

ধর্মপ্রচারক। ভীষ্ম তাঁহাকেই অবতার বলিযা গ্রহণ করিয়াছেন। গীতাতেও নারায়ণ ও কৃষ্ণ এক হইযা গিযাছেন। মহাভারত ও গীতায যে ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা শান্ত সাত্ত্বিক ভক্তি। মহাভারতে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে 'গোপীজন-প্রিয' বলিযাছেন বটে, কিন্তু ইহাতে বৃন্দাবনলীলা বা গোপবংশের কোন উল্লেখ নাই। বেদের বিষ্ণু, পরবর্তী কালের দেবকীপুত্র বাসুদেব, ঘোর অঙ্গিরসের শিষ্য কৃষ্ণ, সাত্বতকুলে উৎপন্ন বাসুদেব, এবং নারায়ণ কেমন করিযা যে এক হইয়া গেলেন, তাহা জানা যায না। ইঁহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহা লইযা প্রচুর মতভেদ সৃষ্টি হইযাছে। ভক্তিধর্মের বাসুদেব এবং মহাভারত গীতা-ভাগবতের বাসুদেব একব্যক্তি, না পৃথক ব্যক্তি, সে বিষযে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায নাই। বৈদিক বিষ্ণু সম্ভবতঃ ভিন্ন দেবতা এবং বিষ্ণু-নারাযণ পৌরাণিক ত্রিমূর্তির (ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর) অন্যতম। মহাভারত ও গীতায কৃষ্ণ (নামান্তরে বাসুদেব) বিষ্ণুর অংশাবতার (কোথাও-বিষ্ণু স্বযং), মানবগৃহে মানবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, বৃষ্ণিবংশে তিনি আবির্ভূত। ক্রমে এই মানব কৃষ্ণ-বাসুদেবই বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইযা গিযা প্রেমের দেবতায পরিণত হইযাছেন। পরবর্তী কালে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং মহাভারতীয কৃষ্ণলীলায বৃন্দাবনলীলা যুক্ত হইলে ভাগবতধর্ম বৈষ্ণবধর্মের আকারে বিরাট ব্যাপ্তি লাভ করিল।

এখন দেখা যাক কৃষ্ণ বাসুদেবের ভাগবতধর্ম ভারতবর্ষে কীভাবে বিস্তার লাভ করিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিষ্ণু বা বাসুদেবের উল্লেখ থাকিলেও খ্রীঃ ২য-৩য শতকের পূর্বে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায না। অনুমান মথুরা অঞ্চলে এই ভাগবতধর্মের প্রাধান্য ছিল, অন্ততঃ মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে সেইরূপ ইঙ্গিতই আছে। পরবর্তী কালের পুরাণাদিতে কৃষ্ণলীল র প্রধান কেন্দ্ররূপে মথুরা বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, ভাগবত সম্প্রদায মথুরা অঞ্চলেই প্রাধান্য লাভ করিযাছিল। শক ও কুষাণ যুগে (খ্রীঃ পূঃ ১০৯- খ্রীঃ ৩০০ অব্দ) ভাগবতধর্ম মথুরা অঞ্চলে হীনবল হইযা পড়ে; কারণ শক-কুষাণগণ ভাগবতধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। ইঁহারা ভারতে আসিযা হয শৈব, আর না-হয বৌদ্ধ হইযা গিযাছিলেন। গুপ্তযুগেই ভাগবত-ধর্ম পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যভারত ও মগধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মগধের কোন কোন গুপ্তসম্রাট 'পরমভাগবত' আখ্যা ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই ভাগবতধর্ম সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়াইয়া পড়ে। গুপ্তসাম্রাজ্যের

পতনের পর উত্তর-ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য কিছু খর্ব হইয়া পড়ে। পরবর্তী কালে উত্তরাপথের অধিকারী হূণ-নেতা মিহিরগুল এবং ভারতবর্ষের যশোধর্মন, হর্ব—ইহারা কেহই ভাগবতপন্থী ছিলেন না। ভাগবতধর্ম উত্তরাপথে হীনবল হইয়া পড়িলেও দক্ষিণ-ভারতে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে। আলোয়ার সম্প্রদায়, রামানুজ, নিম্বার্ক, নাথমুনি—ভক্তিবাদের প্রধান আচার্যগণ, সকলেই দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। অবশ্য এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে বৈষ্ণবধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই। তখনও ভাগবতধর্ম ও 'পাঞ্চরাত্রে'র উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। স্বয়ং শঙ্করাচার্য ভাগবতধর্ম ও 'পাঞ্চরাত্রে'র বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। 'পাঞ্চরাত্র'ও ভাগবতধর্মের অন্তর্গত। শাণ্ডিল্য ঋষি সম্ভবতঃ পাঞ্চরাত্র মতকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। নারদের 'ভক্তিসূত্রে' এবং শাণ্ডিল্য ঋষির নামে প্রচারিত 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' প্রেম ও অনুরাগমূলক বৈষ্ণবধর্মের স্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। নারদের 'ভক্তিসূত্রে' নিম্নোদ্ধৃত উল্লেখগুলিতে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরভক্তির স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে:

(ক) 'সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা।' (এই ভক্তি হইল তাঁহার প্রতি পরম প্রেম।)

(খ) 'অমৃত স্বরূপা চ।' (এই ভক্তি অমৃতস্বরূপ)।

(গ) 'যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।' (যাহা লাভ করিয়া মানুষ সিদ্ধকাম হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়।)

(ঘ) 'যজ্জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি ভবত্যাত্মারামো।' (যাহা লাভ করিয়া মানুষ মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হয়।)

নারদ এই 'ভক্তিসূত্রে' বলিয়াছেন, "যথা ব্রজগোপিকানাম্—" অর্থাৎ ব্রজগোপীদের অনুরূপ ভাবে কৃষ্ণকে সমস্ত কিছু অর্পণ করিতে হইবে, পরম ব্যাকুলতা জাগিলেই ভক্তির আবির্ভাব হয়। এই ঈশ্বর-আসক্তিকে নারদ একাদশ পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন—গুণমাহাত্ম্যশক্তি, রূপাসক্তি পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি, সখ্যাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়াসক্তি এবং পরম বিরহাসক্তি (ভক্তিসূত্র—৮২ শ্লোক)।

'শাণ্ডিল্যসূত্র' সম্ভবতঃ নারদের 'ভক্তিসূত্রে'র পূর্বে রচিত। ইহাতে সংক্ষেপে এবং আরও স্পষ্টভাবে সূত্রাকারে বিষ্ণুভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্রের 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (ঈশ্বরে পরানুরাগই ভক্তি) এবং 'অতএব তদভাবাদ্ বল্লবীনাম্' (সুতরাং তাহার অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব হইলে বল্লবীযুবতীরা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল) বাক্যদ্বয় প্রণিধান-যোগ্য। 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' পুনঃ

পুনঃ গীতার উল্লেখ আছে। শাণ্ডিল্য এবং নারদ উভয়েই বল্লবীযুবতী অর্থাৎ ব্রজ-গোপিকাদের ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়াছেন। তাই এই সূত্রগুলি পরবর্তী কালে রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন পুরাণ-গুলিতে যখন কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তখন কৃষ্ণ মানবত্ব ত্যাগ করিয়া দেবমহিমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তখন বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব—সকলে মিলিয়া মিশিয়া গোপীজনবল্লভ নন্দসুতের মধ্যে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন।

॥ ৩ ॥

দক্ষিণ-ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়

ভারতে বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের বিস্তার ও বিকাশের কথা আলোচনা করিতে হইলে দক্ষিণ-ভারতের তামিলভাষী আলোয়ার সম্প্রদায়ের জীবন ও সাধনার পরিচয় লইতে হইবে। উত্তরাপথে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংস্কৃত ভাষায় বাসুদেবকে কেন্দ্র করিয়া নানা গ্রন্থ, সূত্র, পুরাণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, কিন্তু এই আলোয়ার ভক্তগণ দেশীয় ভাষায় কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিবাদের একটি নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। বাংলা দেশের ভক্তিবাদের সহিত দক্ষিণ-ভারতের সাদৃশ্য রহিয়াছে। চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করিয়া 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ দুইটি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিনত চিত্ত এই গ্রন্থ দুইটি হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাণের খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিল। চৈতন্যভক্ত রায় রামানন্দ, প্রবোধানন্দ সরস্বতী ও গোপালভট্ট—দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। সনাতন ও রূপ, যাঁহারা রামকেলি গ্রামকে বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত করেন, তাঁহারাও দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যে সেনবংশের শাসনকালে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম প্রাধান্য পাইতেছিল, তাঁহারা কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ, বৃত্তিতে ক্ষত্রিয়। ভক্তিধর্মের উপনিষদ স্বরূপ ভাগবত পুরাণ দক্ষিণ-ভারতের দান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; এইজন্য এক শ্লোকে ভক্তিধর্মের উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

> **ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাষ্ট্রে দ্রাবিড়েষু চ ভূরিশঃ।**
> **তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥**

কাবেরী চ মহাভাগা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজাধিপ।
প্রায়ো ভক্তা ভবিষ্যন্তি বাসুদেবে হমলাশয়াঃ।।

অনু: মহারাষ্ট্র প্রদেশে কোথাও কোথা ? এবং দ্রাবিড় দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা কাবেরী মহানদী প্রভৃতি পুণ্যসলিলা নদীতীরবর্তী প্রদেশে প্রায়শঃ বাসুদেব-পরায়ণ ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন। পূর্বোক্ত নদীর পবিত্র জল পান করিয়া সেই দেশবাসী ভক্তি লাভ করিবে।[৪]

দক্ষিণ-ভারত বহু পূর্ব হইতেই ভক্তিধর্মেব কেন্দ্রে পরিণত হইযাছিল, বোধহয দ্রাবিড় জাতি ইন্দো-যুবোপীয জাতি অপেক্ষা আবেগপ্রবণ বলিয়া এই অঞ্চলে ভক্তিমার্গেব প্রাধান্য দেখা দিযাছিল। বাঙলা দেশের বৈষ্ণব-সংস্কৃতি দক্ষিণ ভাবতের ভক্তিবাদের দ্বাবা যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই প্রভাবের আদি উৎস হইল আলোযার সম্প্রদায়।

দক্ষিণ-ভারতের এই ঈশ্বরপ্রেমিক সম্প্রদায বিশেষ কোন দর্শন সৃষ্টি করিযা যান নাই, কৃষ্ণেব প্রতি আত্যন্তিক ভক্তিবশতঃ তাঁহাবা তামিল ভাষায কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক অনেক গান লিখিযাছিলেন. তাহা তামিল সাহিত্যে 'দিব্য প্ররন্ধম' বা 'নালাযির প্রবন্ধম্' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিযাছে। ইঁহারাই বোধহয আদি-কৃষ্ণভক্ত। খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতেই আলোযার-গণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এই সম্প্রদাযে নীচ জাতিও শ্রদ্ধার আসন লাভ কবিযাছিল, স্ত্রীলোকেবও প্রবেশাধিকার ছিল। অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোযার মহিলাকবি অণ্ডাল বা গোদা কৃষ্ণকে প্রেমিকভাবে ভজনা কবিযাছিলেন। প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আলোযারের নামোল্লেখ করা যাইতেছে:

তামিল নাম	সংস্কৃত নাম
পোযগৈ	সরোযোগী
ভূতত্তার	ভূতযোগী
পেয় আলোয়ার	মহদ্‌যোগী বা ভ্রান্তযোগী
তিরুমলিসৈ	ভক্তিসার
নর্ম	শঠকোপ বা শঠারি

৪ প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী-রচিত 'ভক্তচরিত্র' গ্রন্থে প্রদত্ত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।

তামিল নাম	সংস্কৃত নাম
মথুর কবি	মধুর কবি
কুলশেখর	কুলশেখর
পিরিয়	বিষ্ণুচিত্ত
অণ্ডাল	গোদা
তোণ্ডরদিপ্পোদি	ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু
তিরুপ্পান	যোগিবাহন
তিরুমঙ্গৈ	পরকাল

এই দ্বাদশ জনেব মধ্যে প্রথম চারি জন অতিশয প্রাচীন, ইহাদের আবির্ভাব-কাল লইয়া তামিল পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু পরবর্তী আট জনের আবির্ভাবকাল দুর্জ্ঞেয় নহে।

আলোযার শব্দেব অর্থ—ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা। সম্প্রদায়ের নামেই ইঁহাদের সাধনপ্রণালী বুঝা যাইতেছে। খ্রীঃ ১ম শতক হইতেই আলোযারগণ প্রেমের মধ্য দিযা কৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। ইহাদের নামে প্রায চারি হাজার 'প্রবন্ধম্' বা তামিল ভাষায় বচিত সাধনপদ পাওযা গিয়াছে। ১১শ শতকে নাথমুনি এই 'প্রবন্ধম্'গুলিকে সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন। আলোয়ারগণ নামতত্ত্বে বিশ্বাসী বৈষ্ণবভক্ত; কবি শঠকোপ কৃষ্ণকে প্রেমিক বা নাযক রূপে ভজনা করেন। অণ্ডাল বা গোদাব কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইনি কৃষ্ণকে প্রাণেশ এবং নিজকে প্রেমিকারূপে ভজনা করেন।[৫] প্রায সমকালে দক্ষিণ-ভারতে আর-একদল ভক্তের আবিভাব হয। তাঁহারা 'আচার্য' নামে পরিচিত। এই আচার্যগণ আলোযারদের ভক্তির উচ্ছ্বাসকে দার্শনিক নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিযাছিলেন। 'শ্রীসম্প্রদাযেব' রামানুজও আলোয়ার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসকে দার্শনিক মননের মধ্যে বিধৃত করিয়াছিলেন। আলোয়ারদেব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্রমিডোপনিষৎ' বা 'দ্রাবিডাম্নায়ে' সখীসাধনার বর্ণনা আছে, ব্রজযুবতীর কথা আছে, বিষ্ণু-লক্ষ্মীরও প্রসঙ্গ আছে। ইহাদের কবিতাগুলি বাস্তবিক বৈষ্ণবরসসাধনার সোপান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অণ্ডাল এবং অন্যান্য আলোয়ারদের কোন কোন

৫ রোমে সেন্ট ক্যাথারিনও খ্রীষ্টকে পতিভাবে ভজনা করেন। তাঁহাকে বলা হইত Sposa di Cristo অর্থাৎ খ্রীষ্টের বধূ। অবশ্য অণ্ডাল ৮ম শতাব্দীতে এবং ক্যাথারিন ১৩শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

কবিতা অবিকল বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ। নিম্নে ঐ কবিতা হইতে কয়েক ছত্রের বাংলা অনুবাদ উল্লিখিত হইতেছে ঃ

আমার অন্তরতম সত্তা অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় দ্রবীভূত তোল।
বাসনায় আর্ত আমি।
দুকূল ভাসিয়ে প্রেমের বারিধারা বয়ে গেল।
তাঁকে ঘিরেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়েছে।
আমি তাঁকে ডাকি, "ওগো আমার প্রভু",
কথা যায় থেমে, সমস্ত দেহ ওঠে কেঁপে,
ফুলের মত বিকশিত হয় আমার হৃদয়।

(ইংরাজী হইতে লেখককৃত অনুবাদ)

শুনা যায়, চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙলা দেশে গোপীভাবের সাধনা আনয়ন করেন, এই সাধনার মূলে আলোয়ারগণের প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। বাঙলার বৈষ্ণব কবিতা ও আলোয়ারদের 'প্রবন্ধম্' মিলাইয়া পড়িলেই উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাইবে।

॥ ৪ ॥

দ্বৈতবাদী দর্শনে ভক্তিবাদ

বৈদিক যুগ হইতে খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর মধ্যে ভক্তিবাদ নানা আকারে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। শিব, শক্তি ও রামকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিশাখার উদ্ভব হইলেও প্রধানতঃ কৃষ্ণ-বাসুদেবই ভক্তিবাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু ১১শ শতাব্দীর পূর্বে স্বতোস্ফূর্ত ও আবেগবহুল কৃষ্ণভক্তিকে মননশীল দার্শনিক প্রত্যয়ের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয় নাই। গীতা, পাঞ্চরাত্র, নারদ ও শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র, মহাভারতে 'নারায়ণীয়' অংশ এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণাদিতে ভক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা থাকিলেও তখনও তাহা কোন একটা দার্শনিক ভূমি অধিকার করিতে পারে নাই। রামানুজের পূর্বে ভক্তিমার্গ দার্শনিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই।

ভক্তিমার্গের মননশীল সাধকগণ ভক্তিতত্ত্বকে দার্শনিক তত্ত্ববাদে পরিণত

করিতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই বেদান্তসূত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য আছে। বিভিন্ন দার্শনিক ও তাত্ত্বিকের নিকট বেদান্তসূত্র বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিযাছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্যের 'শারীরক ভাষ্য' ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীকে নূতন পথে প্রেরণ করিযাছে। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সকল পদার্থকে মিথ্যা ও ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া প্রমাণ করিযাছেন। শঙ্করের মতে বাস্তব জগৎ পরমার্থতঃ মাযাকল্পিত, মাযা উপাধি ভিন্ন জীবে-ব্রহ্মে ভেদ নাই। শঙ্করেব মতে ব্রহ্মকৈবল্য লাভই জীবমোক্ষ। ভক্ত-দার্শনিকগণ বেদান্তসূত্র স্বীকার কবিযাও শঙ্কবাচার্যের মাযাবাদ অস্বীকার করিযাছেন এবং তাঁহার 'শারীরক ভাষ্য' একেবারে উডাইযা দিযাছেন। ইঁহারা সাধারণতঃ দ্বৈতবাদী ভক্ত-দার্শনিক নামে পবিচিত।

দ্বৈতবাদী ভক্ত-দার্শনিকগণ প্রধানতঃ চাবি শাখায় বিভক্তঃ (ক) বামানুজ প্রভাবান্বিত 'শ্রীসম্প্রদায়'ভুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (খ) মধ্ব-প্রভাবান্বিত 'ব্রহ্মসম্প্রদায'ভুক্ত দ্বৈতবাদ (গ) বিষ্ণুস্বামি-বল্লভাচার্য-প্রভাবান্বিত 'রুদ্রসম্প্রদায'-ভুক্ত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও (খ) নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনকাদি সম্প্রদাযভুক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

এই চারি সম্প্রদাযভুক্ত ভক্ত-দার্শনিকগণ বেদান্তসূত্রেব ভক্তিমার্গেব অনুকূল চাবি প্রকার ব্যাখ্যা কবিযাছেন—রামানুজের 'শ্রীভাষ্য', মধ্বাচাযের 'দ্বৈতভাষ্য', নিম্বার্কের 'বেদান্তপারিজাত সৌবভ' এবং বল্লভাচাযেব 'অণুভাষ্য'। ইহারা সকলেই শঙ্করবিবোধী। অবশ্য তাঁহাদেব পরস্পরের মধ্যেও মতের বিশেষ পার্থক্য আছে। তবে এক বিষযে তাঁহারা পরস্পরের আত্মীয। তাঁহারা সকলেই নিঃশ্রেয়স্ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ কবিতে চাহিযাছেন। তাঁহাদের ঈশ্বর শঙ্করাচার্যের নির্গুণ নির্বিকল্প ব্রহ্ম নহেন। দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের কেহ ব্রহ্মকে বিষ্ণু, কেহ হরি, কেহ-বা কৃষ্ণ বলিযা সগুণ আধারে গ্রহণ করিযা ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি অন্তরশায়ী আবেগমাত্র নহে, তাহাকে তাঁহারা তত্ত্ব, যুক্তি ও দার্শনিকতার দ্বারা একটা মননশীল চর্যায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাদের আলোচনায় ভক্তি কেবলমাত্র 'সাধ্যসাধনা'র ব্যাপার হইয়া পডে নাই, তাহার মধ্যে তত্ত্বপ্রধান মননশীলতাই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামানুজ ॥ দ্বৈতমার্গের প্রথম প্রচারক রামানুজ খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবগোষ্ঠীর শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বেদান্তভাষ্য 'শ্রীভাষ্য' এবং দার্শনিক মত 'বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। রামানুজের পূর্বেও বোধায়ন, দ্রবিড়, টঙ্ক, গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি, যমুনাচার্য প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের আরও অনেক ভক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজই সর্বপ্রথম এই মতবাদকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কারণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও নানা দিক দিয়া ইহার কিছু বিশিষ্টতা আছে। শঙ্কর শুধু ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আর সমস্তই ভ্রান্তি মাত্র। রামানুজও স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ পদার্থ; কিন্তু তিনি নির্গুণ নহেন, গুণদ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত বা বিশিষ্ট করা যায়। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, আবার জীব ও জগৎ-ই ব্রহ্ম নহে। অগ্নি আর অগ্নির উত্তাপ, সূর্য ও সূর্যকিরণের যে সম্পর্ক, ব্রহ্ম ও জীবে সেই সম্পর্ক। সূর্যের কিরণ সূর্য নহে, সূর্য হইতে পৃথকও নহে, বরং কিরণকে সূর্যের গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেইরূপ জীব ব্রহ্ম নহে, আবার ব্রহ্ম হইতে পৃথকও নহে; জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের গুণ বলা যাইতে পারে। রামানুজ ব্রহ্মকে করুণাময় এবং ভক্ত-বৎসল বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এবং বিষ্ণুপুরাণকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—ভাগবতকে নহে। রামানুজ শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে কিয়দংশে পরিবর্তিত করেন বটে, কিন্তু একেবারে নস্যাৎ করেন নাই।

নিম্বার্ক ॥ রামানুজের ঈষৎ পরে ১১শ-১২শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের তেলুগু ব্রাহ্মণবংশে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যের জন্ম হয়। ইনিও রামানুজের মতো ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহার দার্শনিক মত 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বা 'ভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত। ইঁহার মতেও ব্রহ্ম ও বিষ্ণু একই। পরবর্তী-কালে এই সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন। নিম্বার্ক মনে করিতেন যে, জীবজগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে অংশ-অংশীর সম্পর্ক, রামানুজের অগ্নি ও অগ্নিতাপের সম্পর্ক নহে। সুবর্ণ পিণ্ড এবং তাহা হইতে নির্মিত অলঙ্কারের যে সম্বন্ধ, নিম্বার্কের মতবাদ তদনুরূপ। সুবর্ণপিণ্ড ও অলঙ্কারের মধ্যে সুবর্ণ হইল অংশী, অলঙ্কার হইল অংশ। অলঙ্কার-সুবর্ণপিণ্ড হইতে

পৃথক বটে, আবাব একও বটে। ভেদের মধ্যেও অভেদ রহিয়াছে। জীবজগৎ ও ব্রহ্মেব সম্বন্ধও ঐরূপ। জীবজগতের ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক সত্তা আছে, আবার জীবজগতেব মূল কারণ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত আব কিছু নহে; ব্রহ্মই এই দিক দিয়া একমাত্র সত্তা। সুতবাং জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত এবং অদ্বৈত—দুই ই। তাই নিম্বার্কেব মতো দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদতত্ত্ব নামে পরিচিত। এখানে লক্ষ্য করা যাইবে, নিম্বার্কেব তত্ত্ববাদে শঙ্করেব প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পাইযাছে; কাবণ এখানে জীবজগৎ ও ব্রহ্মেব দ্বৈতসত্তা আংশিকভাবে স্বীকৃত হইযাছে।

মধ্বাচার্য ॥ খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে মধ্বাচাব ভক্তিদর্শনের তৃতীয় মত প্রচাব কবেন। ইহাই 'দ্বৈতবাদ' বা 'ভেদবাদ'। দক্ষিণ-ভাবতেই মধ্বাচার্যেব আবির্ভাব এবং এই অঞ্চলেই এই মতেব প্রাধান্য। নিম্বার্ক অপেক্ষা মধ্ব আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দেখাইযাছেন যে, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভযেই সত্য এবং উভয়ই স্বতন্ত্র। এই মতে ব্রহ্মসত্তা ও জগৎসত্তা উভযই স্বীকৃত বলিয়া ইহা দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হইযাছে। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ আছে, এই মত এই দর্শনে স্বীকৃত বলিয়া ইহা ভেদবাদ নামেও পবিচিত। ব্রহ্ম জ্ঞানী ও করুণাময়; হরি, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবগণ তাঁহাব করুণা পাইলেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গৌডীয বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মধ্বমতেব বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই মতে ভক্তিব দ্বারা ব্রহ্ম ভজনীয় হইলেন, দর্শনমার্গ ও ভক্তিমার্গ যেন এক সূত্রে মিলিত হইল।

বল্লভাচার্য ॥ এই ত্রিবিধ ভক্তিদর্শনেব দীর্ঘকাল পরে খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীব মধ্যে বল্লভাচার্য ভক্তিকেন্দ্রিক আর-একটি দর্শনশাখা প্রচাব করেন। ইহাই 'বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ'। রুদ্র হইতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ইহা 'রুদ্রসম্প্রদায়' নামেও পবিচিত। এই মতের প্রথম আচার্য বিষ্ণুস্বামী; তাই ইহাকে 'বিষ্ণুস্বামিবল্লভ'ও বলা হয। কখনও কখনও বল্লভাচার্যকে প্রাধান্য দিবাব জন্য এই মত 'বল্লভাচাবী' নামেও অভিহিত হয়। চৈতন্যদেবের সমকালে বা কিছুপূর্বে বল্লভেব আবির্ভাব হইযাছিল। বল্লভাচার্য বিশুদ্ধাদ্বৈত স্থাপক বেদান্তসূত্রেব যে ভাষ্য কবেন, তাহা 'অণুভাষ্য' নামে পরিচিত হইযাছে। ইঁহার মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, কেহই মায়া নহে, আবার জীবজগৎ ব্রহ্মময। ব্রহ্ম সত্য, জীবজগৎও সত্য। বল্লভাচার্য শঙ্করের

কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসন কবিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ স্থাপন কবেন। তাঁহার মতে সমস্তই সত্য, সমস্তই ব্রহ্মময়। এইস্থলে তিনি শঙ্করের মায়াবাদকে একেবারে নস্যাৎ কবিয়াছেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বল্লভের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদে জগৎ সত্য ও নিত্য। তাঁহার মতে ভগবান হইলেন গোকুলেব শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎলাভই ভক্তিসাধনার চূড়ান্ত পবিণতি। রামানুজ ব্রহ্মকে বিষ্ণুব সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন, বল্লভাচার্যেব মতে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণই সেই ব্রহ্ম। এই সময়ে এক দিকে অদ্বৈতবাদ, আর-একদিকে কৃষ্ণকেন্দ্রিক ভক্তিবাদের প্রভাবে বল্লভের মতবাদ এইভাবে বিবর্তিত হইয়াছে।

১৬শ শতাব্দীব পবে রূপসনাতন, জীবগোস্বামী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ চৈতন্যতত্ত্বেব পটভূমিকায় বেদান্তসূত্রেব ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যা প্রদান কবেন। চৈতন্যসম্প্রদাযের দার্শনিক মত কিযদংশে মধ্ব সম্প্রদাযের অনুরূপ হইলেও উভয়েব মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' নামে পবিচিত।

উল্লিখিত চাবি জন আচায বেদান্তসূত্রেব যে ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রদান কবিযাছেন, তাহা শুধু নিছক তত্ত্বালোচনা নহে। ইঁহাবা আবাব বিষ্ণু কৃষ্ণকে হৃদয়েব ভক্তিও নিবেদন কবিযাছেন। ইঁহাদেব এই ভক্তিই মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশে ও বাংলা সাহিত্যে নানা পাবিবর্তনেব মধ্য দিযা নূতন বৈচিত্র্য সৃষ্টি কবে। মহাপ্রভু ও তাঁহাব পবিকবগণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে ভক্তি-মার্গেব অভিনব স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কবিলেন। এই মত ও আদর্শ কোন কোন দিক দিযা পূর্ববর্তী আচাযদেব মতেব অনুরূপ, কোথাও-বা কিছু ভিন্নতর।

॥ ৫ ॥

বাঙলায় প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম

ইতিপূর্বে আমরা দেখিযাছি যে, কীভাবে ভক্তিমার্গ ও বৈষ্ণবধর্ম ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ কবে এবং কীভাবেই বা আবেগমূলক ভক্তি ধীরে ধীরে বেদান্ত-সূত্রেব দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা অবলম্বন কবিয়া দার্শনিক মননে পবিণত হয়। এখন বাঙলাদেশের পূর্বচৈতন্যযুগেব বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ আলোচনা করা যাক। কারণ পূর্বচৈতন্য ও উত্তবচৈতন্য যুগে বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য ভারতীয়

ভক্তিমার্গের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোন কোন দিক দিয়া ইহার স্থান-কালগত বিশেষত্ব আছে।

প্রথমেই দেখা যাক, বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, লিপিলেখন ও প্রত্ন-নিদর্শনে বৈষ্ণবধর্ম-সংক্রান্ত কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা আভাস পাওয়া যায় কিনা। শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) পর্বতগাত্রে চক্রস্বামীর সেবক পুষ্কর্ণার (আধুনিক পোক্‌খরণা গ্রাম) অধিপতি চন্দ্রবর্মার (৪র্থ শতক) উল্লেখ আছে। ইহাই বাঙলাদেশে চক্রস্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর আদিতম নিদর্শন। ৫ম শতাব্দীর প্রথম দিকে বগুড়া জেলায় গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই শতকের শেষে উত্তরবঙ্গে হিমাচলের পাদদেশে শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামীর দুইটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে ত্রিপুরায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ৭ম শতাব্দীতেও বাঙলার পূর্ব-সীমান্তে ভগবান অনন্তনারায়ণের উপাসনার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটদের সময়ে বাঙলাদেশে বিষ্ণু-উপাসনা জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই উল্লেখগুলিতে সমস্ত মূর্তি বা নিদর্শন বিষ্ণুকেন্দ্রিক। অনুমান ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম কৃষ্ণের আখ্যায়িকা জনপ্রিয় হইয়াছিল। পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়তর হইয়াছে। পাহাড়পুরেই ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। যদিও মাধবেন্দ্রপুরী খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বে এই অঞ্চলে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটিতে কৃষ্ণ ও একটি রমণীর মূর্তি আছে। কেহ কেহ এই যুগলমূর্তিকে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। কেহ-বা কৃষ্ণের সঙ্গিনীকে সত্যভামা বা রুক্মিণী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। এই রমণীমূর্তিটি রাধাও হইতে পারে, কারণ বহু পূর্বে 'গাথাসপ্তশতী'তে রাধাকৃষ্ণের মিলনসংক্রান্ত আদিরসাত্মক শ্লোক গৃহীত হইয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যেও রাধাকৃষ্ণের নানা লৌকিক কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। যাহা হউক, খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী হইতে বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীলা বিশেষ প্রাধান্য পাইতেছিল, ইহা একপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ৮ম শতাব্দী হইতে লিপিলেখনে বিষ্ণু ও কৃষ্ণের প্রচুর উল্লেখ দেখা যাইতেছে। পালবংশীয়গণ মহাযান-মতাশ্রয়ী হইলেও বিষ্ণু-নারায়ণকেও শ্রদ্ধা করিতেন। ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে নন্ন-নারায়ণের 'দেবকুল' (>দেউল) অর্থাৎ মন্দিরের

উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সমসাময়িক লিপিতে দামোদরের নামও পাওয়া যাইতেছে।

সেনবংশীয়েরা শৈব ও বৈষ্ণব ছিলেন। বিজয় সেন প্রদ্যুম্নেশ্বরেব মন্দির নির্মা কবাইযাছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তো পবমবৈষ্ণব ছিলেন। পাল ও সেন যুগে বাঙলার নানা স্থানে বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিযাছে। বাঙলা দেশে গুপ্তযুগে বিষ্ণু-উপাসনাব সূত্রপাত হয এবং পালযুগে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ কবে। এই সমযেই জনসাধাবণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয হইযাছিল। পাহাড়পুবেব কৃষ্ণলীলাবিষযক মূর্তিগুলি তাহার প্রধান সাক্ষ্য বহন কবিতেছে। বোধহয় ক্রমে ক্রমে উত্তব-ভাবতীয বিষ্ণু-উপাসনা বাঙলায অপ্রধান ব৷ অপ্রচলিত হইযা পড়ে এবং জনসাধারণেব মধ্যে প্রচারিত রাধাকৃষ্ণকাহিনী, শুধু জনচিত্তে নহে, উচ্চশ্রেণীতেও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার কবে,—জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাহাব বড প্রমাণ। ১২শ শতাব্দীব বেলাব-লেখনে কৃষ্ণকে "গোপীশতকেলিকাবক" বলা হইযাছে, অবশ্য জয়দেবের পূর্বে বাঙলাদেশে কোন লিপিলেখনে রাধাব উল্লেখ নাই। এই সমস্ত লেখমালা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেব দ্বাবা এইটুকু অনুধাবন কবা যাইতেছে যে, বাঙলা-দেশে খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী (পাহাড়পুব) হইতে পবাণে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা বিশেষ জনপ্রিয হইতেছিল। পববর্তী কালে এই অঞ্চলে বিষ্ণু-উপাসনা একেবারে লোপ পাইযা যায এবং তাহাব স্থলে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য লাভ করে। ১২শ শতাব্দীব পর মুসলমান যুগে কৃষ্ণলীলা বা বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ বা বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাইতেছে না। 'বাযমুকুট' বৃহস্পতি ও বাসুদেব সার্বভৌম বিশেষভাবে বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। মালাধব ভাগবতেব ১০ম-১২শ স্কন্ধ অনুবাদ কবিযা ('শ্রীকৃষ্ণবিজয') রুকনুদ্দীন ববরক শাহেব নিকট 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ কবিযাছিলেন।* বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস—উভযের পদে ও কাব্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই বর্ণিত হইযাছে এবং উভয লীলার প্রধান চবিত্র—শ্রীবাধা। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব হইতে বাংলা ভাষায় রাধাকৃষ্ণকাহিনী কাব্যরূপ লাভ কবিতে আবম্ভ করে, মিথিলায বিদ্যাপতির পদ ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব-চৈতন্যযুগের কৃষ্ণরাধা বা শুধু কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থাদি ও বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় লইযা দেখা যাক, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা দেশে বৈষ্ণবধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল।

* ইহা অনুমান মাত্র।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসজীবনে যে যে গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সাধারণতঃ সেইগুলিকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের গ্রন্থ এবং তাহাতে প্রকাশিত মতবাদকে প্রাক্-চৈতন্য পর্বের বৈষ্ণবধর্ম বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এই গ্রন্থগুলির কোন কোনটি চৈতন্যদেবের পূর্বে বাঙলাদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা বাঙলাদেশে চৈতন্যের পূর্বে ভাবাদর্শ ও গ্রন্থের সাহায্যে বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন নিম্নে তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে :

(ক) জয়দেবের গীতগোবিন্দ
(খ) বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) কৃষ্ণকর্ণামৃত
(গ) ব্রহ্মসংহিতা
(ঘ) বোপদেবের মুক্তাফল
(ঙ) বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী
(চ) লক্ষ্মীধরের ভগবন্নামকৌমুদী
(ছ) শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা
(জ) ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত

চৈতন্যদেবের পূর্বে বাঙলাদেশের বিদ্বজ্জনসমাজে অদ্বৈতমতের সমধিক প্রসার হইয়াছিল। বিদ্যাসমাজের নেতৃগণ স্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন-মূলক ভক্তিবাদকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। চৈতন্যযুগের প্রারম্ভেও নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজ নবজাত ভক্তিবাদকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেন। চৈতন্যপূর্বযুগের অনেক বৈষ্ণবভক্ত মূলতঃ অদ্বৈতপন্থী ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি দার্শনিক ভক্তগণ অদ্বৈতপন্থা ও ভক্তিপন্থার মিল ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। চৈতন্যভক্ত অদ্বৈতপ্রভুও প্রথম জীবনে মায়াবাদী ছিলেন, এবং শেষ জীবনে চৈতন্যপ্রভাবে ভক্তিবাদী হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি অদ্বৈতপন্থা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদা গৌরাঙ্গদেব অদ্বৈতনিবাসে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, অদ্বৈতপ্রভু ছাত্রদিগকে অদ্বৈতবেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন ; ইহাতে চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া—

পিঁড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায়ে প্রভু উঠানে পড়িয়া ॥

(চৈতন্যভাগবত, ১৯ অধ্যায়)

স্বয়ং চৈতন্যদেবও প্রথম জীবনে মায়াবাদী 'দশনামী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, তখন দেশের শিষ্টসমাজে অদ্বৈততত্ত্বের প্রাধান্য থাকিলেও ধীরে

ধীরে ভক্তিমত প্রসারলাভ করিতেছিল, তাহা পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির উদাহরণ-দৃষ্টে মনে হইবে।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রাক্-চৈতন্যযুগে বাঙলা দেশে বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া এই দুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ভক্তিরস-সমন্বিত অন্যান্য গ্রন্থের সহিত লীলাশুকের 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে'র রসও দিবারাত্র আস্বাদন করিতেন। কিন্তু ইতিপূর্বে জয়দেবপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, জয়দেবের সমকালে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বাঙলাদেশে একেবারে অপরিচিত ছিল না। কারণ জয়দেবের সমকালীন শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রাক্-চৈতন্যযুগে যে অভাবনীয় প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জয়দেবপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য পরবর্তী কালে গোস্বামীপ্রভুরা তাঁহাকে যেভাবে ভক্তরসিকরূপে গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন, জয়দেব ঠিক সেই জাতীয় বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তিনি যে কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহাতে সংশয়ের কারণ নাই।

বৈয়াকরণ বোপদেবের (১৩শ শতাব্দী) 'মুক্তাফল' নামক ভাগবতের শ্লোকসঙ্কলন (৮০০ নির্বাচিত শ্লোক) ও তাহার সংস্কৃত টীকা চৈতন্যদেবের পূর্বে বাঙলা দেশের ভক্তসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ ঈষৎ পরবর্তী কালে সনাতনগোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী' ও 'হরিভক্তিবিলাসে' 'মুক্তাফলে'র টীকা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মিথিলার বিষ্ণুপুরীর ভাগবতের শ্লোকসংগ্রহ ও টীকা ('কান্তিমালা') হইতে পরবর্তীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে অনেক উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে (যথা—'গৌর-গণোদ্দেশদীপিকা' ও 'তত্ত্বসন্দর্ভ')। শ্রীধরস্বামীর গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর 'শ্রীভগবন্নামকৌমুদী' নামক তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে প্রধানতঃ নামতত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইনিও চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী। পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এই গ্রন্থ হইতে বহু উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধবেন্দ্রের শিষ্য এবং চৈতন্যের গুরু-স্থানীয় ঈশ্বরপুরী প্রাক্-চৈতন্যযুগে খ্রীঃ ১৫শ শতকের প্রথম দিকে, বাঙলার মুষ্টিমেয় ভক্তসমাজে কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবেন। ইতিপূর্বে যাঁহাদের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র

জয়দেব ব্যতীত আর কেহই বাঙালী কিনা তাহাতে সংশয় আছে। ঈশ্বরপুরী বিদ্যামদোদ্ধত চৈতন্যকে ভক্তিধর্মে দীক্ষা দেন এবং গয়াধামে মহাপ্রভু তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্রপুরী পূর্বভারতে ভাগবতাশ্রিত যে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরীও সেই পথের পথিক ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে তিনি নৈহাটির নিকট রাঢী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে রূপ গোস্বামী ঈশ্বরপুরীর 'রুক্মিণী-স্বয়ংবর' হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' ও 'রুক্মিণী-স্বয়ংবর' একই গ্রন্থ হইতে পারে। অনুমান 'রুক্মিণী-স্বয়ংবরে' কৃষ্ণের উত্তরজীবনের দ্বারকাকাহিনী বর্ণিত হইয়া থাকিবে। 'কৃষ্ণলীলামৃত' পৃথক গ্রন্থ হইলে ইহাতে কৃষ্ণগোপীলীলার বর্ণনা থাকা সম্ভব। যাহা হউক, ঈশ্বরপুরী চৈতন্যের পূর্বেই বৈষ্ণবভক্ত বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

সর্বশেষে মাধবেন্দ্রপুরীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইনি বাঙলা দেশের ভক্তিধর্মের উদ্‌গাতা, ভাগবতের প্রচারক, ঈশ্বরপুরীর গুরু এবং নৈষ্ঠিক ভক্ত বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধার্হ। অনুমান ১৪শ শতকে মাধবেন্দ্রপুরী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর বাল্যকালেই তিরোহিত হন। ইনি বোধহয় শঙ্করপন্থী হইয়াও ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে মাধবেন্দ্র-পুরীকেই বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের আদি প্রবক্তা বলা হইয়াছে। সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে তাঁহাকে বলিয়াছেন, "লোকেষঙ্কুরিতো যেন কৃষ্ণভক্তি রসাঙ্ঘ্রিপঃ"—যিনি ত্রিলোক কৃষ্ণভক্তিরূপ কল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ। 'চৈতন্য-ভাগবতে' তাঁহাকে ভক্তিরসের 'আদি সূত্রধার', 'চৈতন্যচরিতামৃতে 'ভক্তি-কল্পতরুর অঙ্কুর' এবং 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বলা হইয়াছে—মাধবেন্দ্রপুরী প্রীতি, প্রেয়, বৎসল ও উজ্জ্বল রসের উৎসারের মূলে ছিলেন। পুরীতে চৈতন্য-দেব ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে মাধবেন্দ্র-রচিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ" (পদ্যাবলী, ৩৩০ শ্লোক) কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এই সমস্ত প্রমাণদৃষ্টে অনুমিত হয় যে, মাধবেন্দ্র শঙ্করপন্থীই হউন বা মধ্ব-মতাশ্রয়ী হউন,—মূলতঃ তিনি ভাগবতোক্ত আদিরসাত্মক ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন, চৈতন্যের পূর্বে তিনি বাঙলার বৈষ্ণবসমাজে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা 'ভাবার্থদীপিকা'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই টীকাটি বাঙলার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর দার্শনিক মত সংস্থাপনে বিশেষ

সাহায্য করিয়াছিল। জীব গোস্বামীও 'ভগবতসন্দর্ভ', 'পরমাত্মসন্দর্ভ' এবং 'ভক্তিসন্দর্ভে' বহুবার শ্রীধরের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবও এই ভাষ্যকে অতিশয় মান্য করিতেন। বল্লভভট্ট নামক এক ভাষ্যকার শ্রীধর-স্বামিকৃত ভাষ্য ত্যাগ করিয়া নূতন ভাষ্য রচনা করিলে মহাপ্রভু "স্বামি-পরিত্যাগিনী ব্যাখ্যা" শুনিতে চাহেন নাই। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাকে অতিশয় মান্য করিতেন এবং স্বামীকে গুরু বলিয়া মানিতেন। (চৈ, চ, অন্ত্য—৭)। শ্রীধরস্বামী এই টীকায় ভক্ত, ভক্তি, শাস্ত্র, জীবের নিত্যতা, জগৎসত্যতা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'কে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণের যে টীকা রচনা করেন, তাহাতেও কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। তিনি যে একজন ভক্তিমার্গের পথিক ছিলেন, এবং ঐ মনোভাবদ্যোতক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ—রূপগোস্বামী-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে তাঁহার তিনটি কবিতা ঠাঁই পাইয়াছে। কোন কোন মতে শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতপন্থী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাদকে ভক্তির দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য—সকলেই বোধহয় এই একই পথের পথিক ছিলেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগে অদ্বৈততত্ত্বই ছিল শিষ্ট জনের অনুশীলনের বস্তু; ভক্তিমার্গের আবেগোচ্ছ্বাসকে বিদ্বজ্জন বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না। তাই ভক্তিভাবের প্রধান নেতৃগণও প্রথম জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ভক্তিই হইল তাঁহাদের 'সাধনা', রাসরসশেখর বল্লবীনাথ শ্রীকৃষ্ণই হইলেন তাঁহাদের 'সাধ্য'।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে 'গীতগোবিন্দ', ভাগবত এবং শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতের টীকা ভক্তজনের অন্তরে নূতন আশার বাণী সঞ্চার করিয়াছিল। বিদ্বজ্জন তখন নব্যন্যায়, স্মৃতিমীমাংসা এবং অদ্বৈততত্ত্ব লইয়া বিদ্যারসে মাতিয়াছিলেন। কেহ-বা তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদের সাহায্যে শিবশক্তির সামরস্য-সম্ভূত নির্বাণানন্দে সমাহিত হইতেছিলেন। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করিতেছিল; চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে তাহাই প্রবল স্রোতস্বিনীর বাধাহীন প্রবাহের বেগে সমগ্র পূর্বভারতকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

অষ্টম অধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

॥ ১ ॥

ভূমিকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার ও প্রকাশের পর নিস্তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল এবং মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতের মতো সাহিত্যিক ও সমালোচকদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখনও মলিন হইয়া যায় নাই।[1] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পুরাতন ফাইল দেখিলেই তাহার পরিমাণ বুঝা যাইবে। অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সংক্রান্ত মতভেদ দূরীভূত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যামোদী, বৈষ্ণবভক্ত এবং আধুনিক পাঠক এই নবাবিষ্কৃত কাব্য লইয়া যে বিষম বিব্রত হইবেন, তাহা ইহার বিষয়বস্তু, প্রকাশরীতি এবং কবির মানস-প্রকরণের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। গ্রন্থটি যে বিচিত্র ধরণের, তাহার প্রমাণ—বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচকের মানসিক প্রবণতা অনুসারে ইহার নানা ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বোধ করি ইহার দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ পুঁথি আবিষ্কৃত না হইলে এই মতান্তর ও সংশয়ের নিরসন হইবে না। একদল সমালোচক বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যকে প্রামাণিক ও প্রাচীন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; ইঁহারা এই কবিকে চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে পদাবলীর চণ্ডীদাস (দীন, দ্বিজ—যিনিই হউন না কেন) চৈতন্যাবির্ভাবের পরবর্তী যুগে বর্তমান ছিলেন। এইরূপে তাঁহারা চণ্ডীদাসের পদাবলী ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যকে দুই যুগে স্থাপন করিয়া সমস্যার সহজ মীমাংসায় তৎপর হইয়াছেন।[2] অপর দলের স্থির বিশ্বাস, এই কাব্য অর্বাচীন যুগে রচিত, স্থূলরুচির দ্বারা লালিত গ্রাম্য ঝুমুরজাতীয় লোকসাহিত্যের অন্তর্গত; চৈতন্যদেব এই জুগুপ্সাব্যঞ্জক কাব্য কদাচ পাঠ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের মতে—চণ্ডীদাস দ্বিজ, দীন, বড়ু

যাহাই হউন না কেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। চণ্ডীদাস বাসলীসেবক, রামী-রামমণির সাধনসঙ্গী, নবরসিকের অন্যতম, বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যমণি; প্রাক্-চৈতন্য যুগ হইতে শুরু করিয়া অদ্যাপি তাঁহার 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদগুণেতে ভরা' (কানুদাস) পদাবলীর অমৃতনিঃস্যন্দী ধারা বহিয়া চলিয়াছে। তৃতীয় দল এই দুইটি বিরোধী মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা দুই মতের মধ্যে আপস রফা করিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বনের নিরাপদ নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবির প্রথম যৌবনের রচনা বলিয়া কিঞ্চিৎ রিরংসাতপ্ত। পরিপক্ব প্রবীণ জীবনের পরিণত সৃষ্টি—পদাবলী।* ইঁহারা সমস্যাবিচারে অল্পাধিক অদ্বৈতবাদী।

এ পর্যন্ত চণ্ডীদাস-সংক্রান্ত যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বনে এই জটিল সমস্যার যে আশু সমাধান সম্ভব নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহা হইলেও এই বিষয়ে বিচারবিতর্কে অগ্রসর হইলে, সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব না হইলেও, অন্ততঃ তাহার স্বরূপ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজে চণ্ডীদাসের নাম ও পদাবলী বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, চণ্ডীদাস ও রামীকে কেন্দ্র করিয়া নানা গল্প-কাহিনীও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ুচণ্ডীদাসের উল্লেখ একমাত্র সনাতন গোস্বামীর ভাগবতের টীকা 'বৈষ্ণবতোষণী' (তাহাও সন্দেহাতীত নহে) ভিন্ন অন্য কোথাও নিঃসংশয়রূপে পাওয়া যায় না। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকা ('বৈষ্ণবতোষণী') করিতে গিয়া 'কাব্য'-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য তাঁহার পরবর্তী কালে বহু স্থলেই চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাপ্রভু গীতগোবিন্দ-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, ও রায়রামানন্দের নাটকাবলীর রস আস্বাদন করিতেন। এই চণ্ডীদাস বড়ুচণ্ডীদাস হওয়াই সম্ভব। চৈতন্যতিরোধানের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। এই চণ্ডীদাস কোন্ চণ্ডীদাস, তাহা আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোকপাতের চেষ্টা করিব।* উপস্থিত

[১] পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

* চণ্ডীদাস সমস্যা-সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, চৈতন্য-তিরোধানের পর যেখানে চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানেই পদাবলীর চণ্ডীদাসকে নির্দেশ করা হইয়াছে খ্রীঃ ১৬শ শতকের পর চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-সংগৃহীত প্রাচীনতম বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগ্রন্থ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'তে নানা জনের পদ থাকিলেও পদাবলীর চণ্ডীদাসের কোন পদ সঙ্কলিত হয় নাই। ইহার পর রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্রে' চণ্ডীদাসের কিছু পদ থাকিলেও তাহার সংখ্যা স্বল্পতর, মাত্র ৯টি। বরং বিদ্যাপতির পদসংখ্যাই অধিক। বৈষ্ণব পদসংগ্রহের বৃহত্তম গ্রন্থ বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু'র সমগ্র পদসংখ্যা (৩১০১ পদ) বিচার করিলে ইহাতে চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত পদসংখ্যা (১১৮টি) প্রায় নগণ্য বলিয়া মনে হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্য-তিরোধানের পর চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব-সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহে তাঁহার স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে যতই কাল যাইতে লাগিল, ততই চণ্ডীদাসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল। তাই পরবর্তী পদসঙ্কলনে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়া থাকে—পদসঙ্কলনগুলি যেরূপ পর্যায়-অনুসারে সজ্জিত, চণ্ডীদাসের পদগুলি ঠিক সেই পর্যায়ের নহে বলিয়া সঙ্কলকগণ চণ্ডীদাসের পদ ইচ্ছা করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পদাবলীর চণ্ডীদাসপ্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।*

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর, কানুদাস প্রভৃতির পদে চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু আধুনিক কালে, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজে, বিশেষতঃ আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিতসমাজে চণ্ডীদাসের কোন প্রসঙ্গ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পর প্রাচীন বাংলাগ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে মঙ্গলকাব্য (চণ্ডী-মনসা) এবং অনুবাদ-সাহিত্যই (রামায়ণ-মহাভারত) প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতা হইতে প্রাচীন বাংলা

* দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যবিষয়ক যত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চণ্ডীদাস কেন, কোন বৈষ্ণবপদকর্তার নাম উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন সাহিত্যালোচনার পথিকৃৎ ঈশ্বর গুপ্ত 'ব্রজবুলি'-শব্দ ব্যবহার করিলেও চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি কবিওয়ালা, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস বা তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র কৌতূহলী হন নাই। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে 'লিটারারি গেজেট' নামক ইংরাজী সাময়িকপত্রে ইংরাজীতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও চণ্ডীদাসের কোন প্রসঙ্গ নাই। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রস্তাবে' কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্রের উল্লেখ ও প্রশংসা থাকিলেও চণ্ডীদাসের নামগন্ধ নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৭৮০ শক) শিক্ষিতসম্প্রদায় সর্ব-প্রথম চণ্ডীদাসের নাম এবং পদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটি রাজেন্দ্রলালেরই রচিত বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব বংশে তাহার জন্ম, তাঁহার পিতা ও পিতামহ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং রাজেন্দ্রলালের পক্ষে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহার পরেও বাংলা সাহিত্যবিষয়ে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে চণ্ডীদাস ও রামী-সংক্রান্ত কাহিনী সঙ্কলিত হইয়াছিল। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১৮৬৯ খ্রীঃ অঃ) মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১ খ্রীঃ অঃ), মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলা সাহিত্যসংগ্রহ' (প্রথম ভাগ, ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ), প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকায় চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে, কিছু কিছু পদও উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ বা রামীঘটিত কিংবদন্তীগুলিকে বিস্তারিত আকারে বিবৃত করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৭১ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার আলোচনা আছে। তিনি কিন্তু রামীর প্রসঙ্গ আদৌ উল্লেখ করেন নাই * এবং চণ্ডীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির কবিত্বশক্তির অধিকতর প্রশংসা করিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব পদশাখার প্রতি বঙ্গীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, কেহ কেহ বৈষ্ণব পদসঙ্কলন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'মহাজন পদাবলী, প্রথম ভাগ (১৮৭৪ খ্রীঃ অঃ) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭৫, খ্রীঃ অঃ, ইহাতে চণ্ডীদাসের পদ সঙ্কলিত), 'গৌরপদতরঙ্গিণী', অক্ষয়চন্দ্র

* পরবর্তী সংস্করণে রজকিনী রামীর প্রসঙ্গ সংযোজিত হইয়াছিল।

সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ', ১ম খণ্ড (১২৮৫ বঙ্গাব্দ, চণ্ডীদাসের পদ) ও ২য় খণ্ড (১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ, বিদ্যাপতির পদ) এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহ-যোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদরত্নাবলী' (১২৯২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত বাঙালী চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হইল। চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত এবং কীর্তনীয়াদের নিকট সংরক্ষিত বহু পদ আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। সহজিয়াদেব পুস্তক-পুস্তিকায় চণ্ডীদাস-রামীসংক্রান্ত সহজিয়া সাধনবিষযক যে গল্প বিবৃত হইয়াছিল, ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালীসমাজ তাহাই অমৃতবৎ পান করিয়াছে।

বসন্তরঞ্জন রায বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বাঙালী পাঠক চণ্ডীদাসকে এক এবং অভিন্ন জানিলেও, তাঁহার নামে এমন সমস্ত অপদার্থ পদ পাওয়া গিয়াছে যে, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই এক চণ্ডীদাসের কিনা, তাহা লইযা কাহারও কাহারও সন্দেহ জাগ্রত হইল। ১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন মুখোপাধ্যায চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাসলীলা'র যে পদগুলি প্রকাশ করিযাছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র কবিত্বের পরিচয ছিল না ; যে চণ্ডীদাসের মধুব পদাবলী বাঙালীকে মুগ্ধ করিযাছে, এই পদগুলি যে তাঁহাবই বচনা, তাহাতে নীলবতনবাবুবও সংশয উপস্থিত হয়। কিন্তু ঐ পদ প্রকাশিত হইলেও, তাহা লইযা তখনও পাঠকমহলে কোন বাদবিসংবাদ উপস্থিত হয় নাই। বর্তমান শতাব্দীতে বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে বমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস-সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত ৩০১টি, দ্বিতীয সংস্কবণে ৩৪০টি এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায-সঙ্কলিত 'চণ্ডীদাসে' মোট ৮৪৭টি পদ (তন্মধ্যে বমণীমোহনেব পূর্বতন ৩৪০টি পদও ছিল) স্থান পাইয়াছিল। ইহাই চণ্ডীদাসের পদাবলীর বৃহত্তম সঙ্কলন। রমণীমোহন পদসঙ্কলনে ব্রতী হইযা 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু', 'পদকল্পলতিকা' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদসঙ্কলন হইতে পদসংগ্রহ করিযা মুদ্রিত করেন। নীলরতন মুখোপাধ্যায় শুধু সঙ্কলনগ্রন্থগুলির উপর নির্ভর না করিয়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত নানা পালাগানের পুঁথি এবং কীর্তনীয়াদের নিকট রক্ষিত চণ্ডীদাসের অনেক অপ্রকাশিত নূতন পদ (সংখ্যায প্রায পাঁচ শত) স্বীয় সঙ্কলনগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। বলা বাহুল্য এই দুইটি সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের নামে যে সমস্ত পদ গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিষযবস্তু ও রচনারীতির মধ্যে মাঝে মাঝে এমন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় যে, একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা অপরিহার্য হইয়া

পড়ে। কিন্তু তখনও বঙ্গীয় সাহিত্যামোদী ও চণ্ডীদাস-প্রেমিক সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহ জাগ্রত হয় নাই। যখন নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত চণ্ডীদাসের মুদ্রণকার্য চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৩২১ সালে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত দুইখানি কৃষ্ণলীলার পালাগানের পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। —(ক) ব্যোমকেশ মুস্তফী-আবিষ্কৃত 'জর্মলীলা' এবং (খ) মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-আবিষ্কৃত 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন'। দুইখানি পুথিই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বয়ং আবিষ্কর্তা মুস্তফী মহাশয় এই 'জর্মলীলা' এবং ইহার কবি চণ্ডীদাসের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, পদাবলীর চণ্ডীদাস এবং 'জর্মলীলা' ও 'রাধার কলঙ্কভঞ্জন' পুঁথিদ্বয়ের চণ্ডীদাস—তিন জন পৃথক কবি। কিন্তু এই সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত কোন তথ্য পরিবেশন করেন নাই, সিদ্ধান্তেও পৌছান নাই—শুধু সংশয়টুকু বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পূর্বে আরও একটা নবাবিষ্কৃত পুঁথি প্রচলিত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমস্ত সিদ্ধান্ত আমূল পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা তখনও কেহ জানিতে পারেন নাই। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৩১৬ সালে বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যাগ্রাম-নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাসলীসেবক বড়ুচণ্ডীদাস (অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস?) রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এক বৃহৎ কাব্য আবিষ্কার করেন। ১৩১৮ সালে ঐ পুথি বসন্তবাবু কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগৃহীত হয়। ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বসন্তরঞ্জন ঐ কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যামোদী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু গ্রন্থটি মুদ্রিত না হওয়ায় অনেকেই ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। ১৩২২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন এবং লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দুই জনে মিলিয়া প্রাপ্ত পুঁথির লিপি বিচার করিয়া ইহাকে অতিশয় প্রাচীনকাব্য এবং ইহার কবি বড়ুচণ্ডীদাসকে আদিতম চণ্ডীদাস বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার কয়েক মাস পরে ১৩২৩ সালে (ইং ১৯১৬ সন) বসন্তরঞ্জনের সুযোগ্য সম্পাদনায় এই কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম লইয়া প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই চণ্ডীদাস-সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করে। শেকস্‌পীয়রের ব্যক্তিত্ব লইয়া পশ্চিম-বিশ্বে মাঝে মাঝে যেরূপ সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে, বড়ু-

চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে কেন্দ্র করিয়া এখানেও তদপেক্ষা প্রবলতর মতান্তরের সংশয়-ঝটিকা উত্থিত হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্য ও কবিকে এত 'সওয়াল-জবাব' এবং 'পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষে'র যুক্তিজালে নিপীড়িত হইতে হয় নাই। এখনও পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস-সমস্যার নির্ভরযোগ্য কোন মীমাংসা হয় নাই, নূতন উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার সম্ভাবনাও নাই।

॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ও কবি

বসন্তরঞ্জন কর্তৃক আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একখানি খণ্ডিত পুঁথি ব্যতীত উক্ত কাব্যের আর কোন দ্বিতীয় অনুলেখন পাওয়া যায় নাই; বহু অনুসন্ধানের পর অনুরূপ রচনার স্বল্পতম অংশের সন্ধান পাওয়া গেলেও* শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি এক এবং অদ্বিতীয়। পুঁথিটি প্রাচীন বাঙলার তুলোট কাগজে লিখিত অতিশয় প্রাচীন ধরণের। ইহার আদ্যন্ত খণ্ডিত, ভিতরেও কয়েকখানি পৃষ্ঠা হারাইয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রচনাকারের ভণিতা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; পুঁথির আখ্যাপত্র এবং পুষ্পিকা নষ্ট হওয়ায় ইহার নাম, রচনাকাল, পুঁথি নকলের সন, তারিখ কিছুই জানা যায় নাই। সম্পাদক বসন্তরঞ্জন নামকরণ-সম্পর্কে ভূমিকায় বলিয়াছেন, "দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাসবিরচিত 'কৃষ্ণকীর্তন'-এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম। এতদিনে তাহার সমাধান হইয়া গেল। আমাদের ধারণা, আলোচ্য পুথিই 'কৃষ্ণকীর্তন', এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হইল।" সম্পাদকের এই নব-নামকরণ এ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং 'শূন্যপুরাণে'র মতো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক-প্রদত্ত নামই বাংলা সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাবধানী সমালোচক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। চণ্ডীদাস (পদাবলীর কবি) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামক কোন পালাগান লিখিয়াছিলেন বলিয়া এখনও কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সনাতনগোস্বামী

* তালশিখিবার একখানি পুঁথিতে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইখানি পৃষ্ঠা

'বৈষ্ণবতোষণী'তে 'শ্রীচণ্ডীদাসে'র দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিলেও তাঁহার রচিত কোন আখ্যানকাব্যের উল্লেখ করেন নাই। উক্ত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড 'শ্রীচণ্ডীদাসে'র পৃথক দুইটি পালা, অথবা কোন আখ্যান-কাব্যের অন্তর্গত দুইটি অংশ—তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতকার তিন স্থলে (মধ্য, ২য়, মধ্য, ১০ম, অন্ত্য, ১৭শ) অন্যান্য কবিদের সহিত চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ হইতে চণ্ডীদাসকে গীতিকার বলিয়াই মনে হয়। জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥

এখানে জয়দেবকে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে গ্রহণ করা চলে বটে, কিন্তু জয়ানন্দের সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ পালাকারে প্রচলিত হয় নাই, বিচ্ছিন্ন পদ হিসাবেই জনসমাজে প্রচলিত ছিল। নরহরিদাস এক পদে চণ্ডীদাসের বন্দনা করিতে গিয়া "শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস যে বর্ণিল বিবিধ মতে" (পদকল্প, ১ম শাখা, ১ম পল্লব) বলিয়াছেন। এখানে 'শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাস' কোন গ্রন্থের নাম নহে, চণ্ডীদাস-অবলম্বিত পদের বিষয়বস্তুর পরিচয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র আরম্ভ-শ্লোকে "রাধামাধবয়োঃ বহঃ কেলয়ঃ"-র জয়ধ্বনি করা হইয়াছে; ইহাও কাব্যের নাম নহে,—বিষয়বস্তুর নাম বা উহার সংক্ষিপ্তপরিচয় জ্ঞাপক নির্দেশ। 'পদকল্পতরু'-র সঙ্কলক বৈষ্ণবদাস "চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবন অনুপাম" (পদকল্প, ১ম শাখা, ১ম পল্লব) বলিয়া কবি চণ্ডীদাসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তিনি চণ্ডীদাস-বিরচিত "মধুর রস নিরমল পদ্যগদ্যময় গীত"-এর উল্লেখ করিলেও চণ্ডীদাসের কোন পালাগান বা পুরা আখ্যানের উল্লেখ করেন নাই। কানুদাসও চণ্ডীদাসের "সরলতরল রচনা প্রাঞ্জল" পদের প্রশংসা করিলেও তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় অনুমানের বশবর্তী হইয়া প্রাপ্ত পুথির 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। অবশ্য অন্য কোন আখ্যা পাওয়া না গেলে পুঁথিটিকে বিশেষিত করিবার জন্য ঐরূপ যে-কোন একটা নাম দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঐ পুঁথির আখ্যা অনুমানের বিষয় নহে; পুথির মধ্যেই পুঁথির আখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। ইহা যে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভের মতো সূক্ষ্মদর্শী সম্পাদকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

আলোচ্য পুঁথিটি আড়াই শত বৎসর পূর্বে বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে ('গাঁথাঘরে') রক্ষিত ছিল। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বনবিষ্ণুপুর রাজপরিবারে অনুরূপ বহু বৈষ্ণবপুঁথি স্থান পাইয়াছিল। কাঁকিল্যা গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশধর ইহার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। বনবিষ্ণুপুরের রাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশের সহিত বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবারই কথা। আবিষ্কৃত পুঁথিটির মধ্যে একখানি পাত্‌ড়া বা টুকরা তুলোট কাগজ পাওয়া গিয়াছে।* তাহাতে পুরাতন অক্ষরে লিখিত আছে :

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব্বের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একশত দশ পত্র পর্যন্ত একুনে ১৬ শোল পত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীমহারাজার হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন—

সন ১০৮৯
২৬ আসীন

সন ১০৮৯
তাং ২১ অগ্রহায়ণ
শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন কৃষ্ণসন্দর্ব্ব ।।
১৬ পত্র দাখিল হইল—

এই মূল্যবান চিরকুট হইতে প্রাপ্ত পুথির আখ্যা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। এই পুথিটি বনবিষ্ণুপুর 'গাঁথাঘরে' (গ্রন্থাগারে) ১০৮৯ সনেও (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) রক্ষিত ছিল এবং কোন এক শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন এই পুঁথির পঁচানব্বই হইতে একশত দশ পত্র—মোট ষোলখানি পত্র ২৬এ আশ্বিন (১০৮৯ সন) লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থাগারের কোন কর্মচারী তাহা এই চিরকুটে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ঐ ১০৮৯ সনের ২১এ অগ্রহায়ণ ঐ পত্রগুলি আবার গ্রন্থাগারে ফেরত দেওয়া হয়। উক্ত চিরকুটের প্রথমেই 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' এই আখ্যা রহিয়াছে। ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ঐ পুঁথিটি রাজগ্রন্থাগারে ছিল, তখন নিশ্চয় উহার আখ্যাপত্র বা পুষ্পিকা নষ্ট হইয়া যায় নাই, এবং যে কর্মচারী উক্ত রসিদ লিখিয়াছিলেন তিনি বোধহয় বড়ু চণ্ডীদাসের ঐ কাব্যের নাম জানিতেন। রসিদে লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'ই আধুনিক কালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। অবশ্য

* মুদ্রিত প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত একখানি রসিদ

ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। যাহা হউক, যত দিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হইতেছে তত দিন ইহাকে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' বলিয়াই গ্রহণ কবিতে হইবে। আজ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি সাধারণ্যে এমনভাবে প্রচারিত হইয়া খ্যাতি-অখ্যাতির শিরোপা লাভ করিয়াছে যে, হয়তো নূতন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি গ্রহণ করিতে অনেকেই বিশেষ উৎসাহবোধ করিবেন না। তবে যুক্তির নীতি মানিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাম পরিবর্তিত করিয়া লওয়া আশু কর্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি যে বিশেষ প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার মধ্যে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) লিখিত। আলোচ্য পুঁথিটি নিশ্চয় ঐ চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতর। ১৭শ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে এই পুঁথিটি অনুলিখিত হইয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইলে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই কাব্যের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দেহ করিয়া ১৩২৬ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে সংশয়' নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পুঁথিটির কাগজ-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকোচিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত চিরকুটের তারিখ সত্য হইলে পুঁথিটিকে অর্বাচীন বলিবার উপায় নাই। ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর পরে যে পুঁথিটি অনুলিখিত হয় নাই, উক্ত রসিদটিই তাহার বড় প্রমাণ।

(পুঁথিটির দ্বিতীয় কোন অনুলিখন না পাওয়াতেই অনেকে ইহার প্রমাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি মাত্র পুঁথি অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকে এতটা গুরুত্ব দিতে অনেকেই সম্মত হন নাই। কিন্তু এই কাব্য প্রকাশের কিছুকাল পরে দুইখানি ক্ষুদ্র পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকতা আরও একটু দৃঢ় হইয়াছে। ১৩৩৯ সালে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা হইতে দুইখানি তুলোট কাগজের পুঁথি আবিষ্কার করেন। প্রথম পুঁথিটিতে ১৩ খানি পৃষ্ঠা আছে, মাঝের একখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় পুঁথিখানি প্রথম পুথিটির নকল বলিয়া অনুমিত হইতেছে।) ইহাতে রাগরাগিণী ও সুরতালের ব্যাখ্যা এবং দৃষ্টান্ত আছে। তালের দৃষ্টান্ত বুঝাইতে গিয়া পুঁথিলেখক ১৬টি পদের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৪টি অক্ষত। এই ১৬টি পদের মধ্যে ১০টি পদই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে গৃহীত। প্রথম পুঁথিটি ঈষৎ প্রাচীনতর, কিন্তু সনতারিখ

নাই। দ্বিতীয় পুঁথির অনুলিখনের কাল ১২২৭ সাল (১৮২০ খ্রীঃ অঃ)। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শতাধিক বর্ষ পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপ্রচলিত হইয়া যায় নাই, সঙ্গীত-শিল্পীরা ইহার অনেক পদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাপ্ত পুঁথিটিতে কিছু কিছু পাঠবিকৃতি আছে, মূলের সহিত অল্পাধিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যাইবে। পুঁথি দুইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন ভাষা ইহাতে অল্প পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কারের ফলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে অর্বাচীন কালের নহে—তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৪১৫টি পদের মধ্যে (খণ্ডিত পদসহ) বড়ুচণ্ডীদাসের ভণিতা আছে তেতাল্লিশ বার। ভণিতাগুলি নিম্নরূপ: (১) বাসলীর বন্দনাসহ 'বড়ুচণ্ডীদাস', (২) বাসলীর বন্দনাসহ 'চণ্ডীদাস', (৩) বড়ুচণ্ডীদাস, (৪) চণ্ডীদাস এবং (৫) অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস। কাহারও মতে কবির পুরানাম 'অনন্ত বড়ুচণ্ডীদাস'—যদিও মাত্র সাত স্থলে এই ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতার সংখ্যাই সর্বাধিক। কেহ বলেন, তাঁহার নাম অনন্ত, চণ্ডীদাস উপাধি, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসুর 'গুণরাজ খান' উপাধি অনুরূপ একাধিক কবি 'চণ্ডীদাস' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডীদাসের নাম লইয়া এত সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমাদের বক্তব্য: কবির আসল নাম 'অনন্ত' হইলে তিনি কোন-না-কোন স্থলে শুধু 'অনন্ত'ই ব্যবহার করিতেন। অথচ ভণিতায় কেবল 'অনন্ত' একবারও পাওয়া যায় নাই, যতবার 'অনন্ত' পাওয়া গিয়াছে, ততবারই তাহার সহিত 'বড়ুচণ্ডীদাস' জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং 'বড়ুচণ্ডীদাস'-ই তাহার যথার্থ নাম। 'অনন্ত' তাহার আর-একটা অপ্রচলিত নাম হইতে পারে, বা কোন গায়েনের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে পদাবলী বা অন্যান্য স্থানে যেখানেই চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, সেখানে দীন, দ্বিজ, বড়ু বা শুধু চণ্ডীদাসই রহিয়াছে, কোথাও চণ্ডীদাসের সহিত 'অনন্ত' ব্যবহৃত হয় নাই। এমনও হইতে পারে, পরবর্তী কালে যখন দুই বা তিন চণ্ডীদাস লইয়া সমস্যা দেখা দিল, তখন হয়তো পালাগায়কেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ুচণ্ডীদাসকে পদাবলীর চণ্ডীদাস হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বড়ুচণ্ডীদাসকে 'অনন্ত' আখ্যা দিয়া থাকবেন। সে যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ুচণ্ডীদাস নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি বাসলীসেবক বা 'বাসলীর গণ' ছিলেন—এতদ্ব্যতিরিক্ত

আর-কোন সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে পাওয়া যায় না। 'বজ্রেশ্বরী' বা 'বাগীশ্বরী'—যে শব্দ হইতেই 'বাসলী'-শব্দ নিষ্পন্ন হউক না কেন, বাসলী-চণ্ডীদাস-রামীঘটিত কাহিনী পরবর্তী কালের সৃষ্টি। বড়ুচণ্ডীদাসের সহিত বাসলীর সম্পর্ক থাকিলেও তাঁহার উপ' রামী বা সহজিয়া সাধনার কোন প্রসঙ্গই আরোপ করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একস্থলে ('রাধাবিরহ') কৃষ্ণ যোগধ্যানের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সহজিয়া সাধনার কোন ইঙ্গিত এই কাব্যে পাওয়া যায় না। কবি কাব্যের কোথাও নিজ পরিচয় দেন নাই, ইহাও কম বিস্ময়ের কথা নহে। সেই যুগে তাবৎ কবি সনতারিখ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও কাব্যের মধ্যে নিজ বিস্তারিত পরিচয় উল্লেখ করিতেন। (জয়দেব, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস রচনার একাধিক স্থলে কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বড়ুচণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিজপরিচয় সম্বন্ধে একেবারে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ভাষাদৃষ্টে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, তিনি মানভূম হইতে বীরভূম পর্যন্ত কোন-এক অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মূলপুঁথি ও মৃদঙ্গের তাল শিখিবার দুইখানি পুঁথিও এই অঞ্চলের নিকটেই আবিষ্কৃত হইযাছে।

(চণ্ডীদাসের আবির্ভাবস্থান বীরভূমের নান্নুর, না বাঁকুড়ার ছাতনা, তাহা লইয়াও বিরোধ সৃষ্টি কম হয় নাই) উভয় পক্ষই নানা প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন) (নানা প্রবাদ, সহজিয়া গ্রন্থ প্রভৃতিতে বীরভূমের নান্নুর গ্রামই বাসলীর পীঠস্থান ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাব-ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। আবার বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামে বাসলীর মন্দির আছে, চণ্ডীদাসের ভিটা আছে—এই সংক্রান্ত নানা প্রবাদও আছে। কৃষ্ণপ্রসাদ সেন-বিরচিত ও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সম্পাদিত 'চণ্ডীদাসচরিত' ('চণ্ডীদাস ও রামী') গ্রন্থে ছাতনার দাবী প্রবলভাবে উত্থাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পদাবলীর চণ্ডীদাসপ্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইবে।* উপস্থিত ক্ষেত্রে কেবল একটি অনুমানের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ুচণ্ডীদাসের ছাতনায় আবির্ভূত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রাচীন পদে ও বৈষ্ণব সহজিয়া গ্রন্থে রামী-চণ্ডীদাসের সাধনতীর্থ হিসাবে বীরভূমের নান্নুর গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। সুতরাং এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে,

---

* বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

হয়তো পদাবলীর চণ্ডীদাস নান্নুরে আবির্ভূত হইযাছিলেন। অতএব বড়ু-চণ্ডীদাসকে ছাতনায স্থাপন করা অনুমানসিদ্ধ। তবে স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সম্পাদিত 'চণ্ডীদাস চরিতে' ছাতনাতেও পদাবলীর চণ্ডীদাসের যাবতীয় তথ্যের পরিচয পাওয়া যাইতেছে। অতএব পদাবলীর চণ্ডীদাসকে নান্নুরে স্থাপনের বিরুদ্ধেও যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে। তবে মনে হয়, পরবর্তী কালে রামী-চণ্ডীদাসঘটিত আখ্যান এমন জনপ্রিযতা লাভ করে যে, বড়ু যদিও-বা ছাতনাতে আবির্ভূত হইযা থাকেন, তাহা হইলে পরবর্তী যুগে রামী-চণ্ডীদাস ও সহজিয়া মতের প্রভাবে তিনি ছাতনা হইতে স্থানচ্যুত হইযা পড়েন, এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিযা ঐ স্থানে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত হয।

কেহ কেহ মনে করেন, একই চণ্ডীদাস যৌবনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখিযাছিলেন এবং উত্তরযৌবনে পদাবলী রচনা করিযাছিলেন, পদাবলী তাঁহার পরিপক্ক বয়সের রচনা। কেহ-বা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিযা বহিয়া আসিযা পদাবলীতে পরিণত হইযাছে। পদসংগ্রহেও বড়ুচণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অনেক পদ গৃহীত হইযাছে। অবশ্য এই যুক্তি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাব, ভাষা ও আদর্শের মধ্যে এমন 'আসমান জমিন ফারাক' যে, একের সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইটি পদ ('দেঁখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী' এবং 'কালকোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে') চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীতে মিলিতেছে। একটিতে বড়ুচণ্ডীদাসের ভণিতা অপরটিতে দ্বিজচণ্ডীদাসের ভণিতা।[২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন অংশ এত জনপ্রিয হইযাছিল যে, দুই-একটি পদ ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতার সহিত মিশিযা গিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগ্রন্থে এবং কীর্তনীযাদের সংরক্ষিত পদে যেখানেই 'বড়ু' ভণিতা দেখা যাইবে, সেইখানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ুচণ্ডীদাসের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাও ঠিক নহে। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ১৩৪১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে প্রথম খণ্ড প্রকাশ

২ ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলী, প্রথম খণ্ড

করেন, তাহাতে তাঁহারা নানা পুঁথি ও পদসঙ্কলন বিচার করিয়া বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে চণ্ডীদাসের প্রকৃত পাঠনির্ধারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সঙ্কলনে 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' এবং পরিশিষ্টে 'বড়ু চণ্ডীদাসের পদ' বলিয়া যে পদগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে "একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'কালকোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে') এবং "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী') পদ দুইটিকে বাদ দিলে আর কোন পদ বড়ুচণ্ডীদাসের রচিত হইতে পারে কিনা সংশয় স্থল। সেইজন্য এই প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ১৩৪৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 'বড়ুচণ্ডীদাসের পদ' নামক প্রবন্ধে সুনীতিকুমার ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত চণ্ডী-দাসের পদসংগ্রহে বড়ুচণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির ভণিতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বড়ুচণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি; পদাবলীর চণ্ডীদাসের পদকে 'বড়ু' ভণিতার দ্বারা বিশেষিত করা ঠিক নহে। যুক্তির দিক দিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবিকে বড়ুচণ্ডীদাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। তিনি পরম্পরাযুক্ত পালাগান অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) রচনা করিয়াছিলেন, কোন বিচ্ছিন্ন পদ রচনা করেন নাই। তবে তাঁহার দুই-একটি পদ প্রচলিত চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে; তাই বড়ুচণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদাবলীকে বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য।

যাহা হউক, নূতন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা, বাসলীসেবক বড়ুচণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা বিচার

প্রাপ্ত উপকরণের স্বল্পতার জন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতার সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর যুক্তিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই চূড়ান্ত প্রমাণ দাখিল করিতে পারেন নাই বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিতর্ক চলিতে থাকিবে।

যাঁহারা চৈতন্যতত্ত্ব-ভাবরসে পরিপুষ্ট এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের রসে আকণ্ঠমগ্ন, তাঁহারা বড়ুচণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত কাব্যে জুগুপ্সা বোধ করিয়াছেন এবং জুগুপ্সার বশেই তাঁহারা প্রাপ্ত পুঁথির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসকেই এক, অদ্বিতীয় ও প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অপর দিকে কেহ কেহ বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সংস্কার বাদ দিয়া শুধু সাহিত্য ও ইতিহাসের নিঃস্পৃহ দৃষ্টির দ্বারা বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-কাব্যকে আদিতম চণ্ডীদাস অর্থাৎ বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা বলিযা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের যুক্তির ধারা অনুসরণ করিয়া নিম্নে চণ্ডীদাস সমস্যায় আলোকপাতের চেষ্টা করা যাইতেছে।

পুঁথির বয়স ।। পুঁথিটি যে অন্ততঃ ১৭শ শতাব্দীর পরবর্তী নহে, তাহার প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে যে রসিদখানা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১০৮৯ সালের উল্লেখ রহিযাছে। ইহা মল্লাব্দ নহে; কারণ স্পষ্টতঃ কোন বিশেষ ধরণের সনের উল্লেখ নাই। প্রাচীন বাঙলায় যেখানে মল্লাব্দ, লক্ষ্মণসংবত, বিক্রমসংবত বা শকাব্দ ব্যবহৃত হইত, সেখানে, তাহা কোন্ সন, তাহা স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইত (যথা—মল্ল, লসং, বিক্রমসং, শাকে)। শুধু বাংলা সনের কোন নির্দেশ থাকিত না, কেবল 'সন' বা 'সাল' বলা হইত। অতএব ১০৮৯ সালকে বঙ্গাব্দ বলিযা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পুথিটি ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে (১০৮৯ সাল) বনবিষ্ণুপুরের রাজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। অতএব প্রাপ্ত পুঁথিটি ১৭শ শতাব্দীর সমকালীন বা কিছু পূর্ববর্তী হইতে পারে এবং কবি তাহারও অপেক্ষা কিছু প্রাচীন হইবেন এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিমহাশয প্রথমে পুঁথির কাগজ ও অন্যান্য উপাদান বিচার করিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিলেও (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬)* পরে ১৩৪২ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 'চণ্ডীদাস'

* সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র নবসংস্করণে পুঁথির কাগজ ও কালি সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—"কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ারি, ঠিক যেন মিলের কাগজ। এরকম কাগজে লেখা পুঁথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দের আগে দেখি নাই, উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি। কালিতেও প্রাচীন পুঁথির কালির মত গাঢ় উজ্জ্বলতার চিহ্নমাত্র নাই। পুঁথিটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার লিখিত অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধ।" ডঃ সেন তাঁহার গ্রন্থের নানা সংস্করণে সনতারিখ এত বার বদলাইয়া ফেলেন যে, তাঁহার কোন মতকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রবন্ধে পূর্ব বিরূপতা ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতানুসারে এই পুঁথি অর্বাচীন কালের নহে। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, এই পুঁথিটি ১৭শ শতাব্দীর পরবর্তী কালের হইতেই পারে না। সুতরাং যাঁহারা পুঁথিটিকে অর্বাচীন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা পুনরায় বিচারবিশ্লেষণ করিবার অবকাশ পাইবেন।

পুঁথির লিপি ॥ লিপিবিশারদ এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথিসম্পাদক বসন্তরঞ্জনের অনুরোধে পুথিতে ব্যবহৃত লিপি-বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত তালপত্রে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার জন্য যে প্রত্নলিপির (Paleography) সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, রাখালদাসও সেই আদর্শ অনুসরণ কবিয়াছিলেন। তিনি ১৩১৮ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি পরীক্ষা করেন এবং ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৩২২ সালে রাখালদাস ও বসন্তরঞ্জনের যুগ্মনামে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল' নামক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহাতে তাঁহাবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালীন প্রাচীন পুঁথির অক্ষর গঠন বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৫শ শতাব্দীর অন্তে বা উহার নিকটবর্তী সময়ে অনুলিখিত হইয়া থাকিবে। বাংলা অক্ষরে এবং বাংলা ভাষায় রচিত প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম। রাখালদাসের সেই প্রবন্ধ ঈষৎ মার্জিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মুদ্রিত হইলে তাহার ভূমিকায় সংযোজিত হয়।

রাখালদাসের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর আছে—প্রাচীন হস্তাক্ষর, প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। এই পুঁথিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর কেন রহিয়াছে, সে বিষয়ে লেখক কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্তমান অথবা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন; অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্তমান আকারের ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।" তাঁহার এই উক্তিও একেবারে সংশয়াতীত নহে। তিনি 'বোধিচর্যাবতার' (১৪৯১ বিক্রমাব্দ; ১৪৩৬-৩৭

খ্রীঃ অঃ), 'শূদ্রপদ্ধতি' (১৪৪২ বিক্রমাব্দ; ১৩৮৫-৮৬ খ্রীঃ অঃ), ও 'ধর্মরত্ন' (১৪১৭ শকাব্দ, ১৪৯৫ খ্রীঃ অঃ)—মোট তিনখানি প্রাচীন পুঁথির অক্ষরেব সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালার স্বব ও ব্যঞ্জনবর্ণের তুলনামূলক আলোচনা কবেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—"১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা 'কৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীন অক্ষবসমূহ প্রাচীনতব।...অতএব ইহা স্থিব সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বায বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'কৃষ্ণকীর্তনের' যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দেব পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইযাছিল।"

বাখালদাসেব মতে, প্রাচীন পুঁথিসমূহে কিছু প্রাচীন অক্ষব, কিছু-বা আধুনিক অক্ষব দেখা যায। উহাব একমাত্র কারণ, কালক্রমে কিছু কিছু অক্ষবেব পবিবর্তন হইযাছে, আবাব কোন কোন অক্ষর পুবাতন ছাঁদ দীর্ঘকাল বজায বাখিযাছে। উদাহবণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব মুদ্রিত সংস্কবণে প্রাচীন লিপির যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইযাছে, তাহার উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। উহাতে ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত 'শূদ্রপদ্ধতি' এবং ১৪৬৫ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত 'হবিবংশে'ব দুইখানি পৃষ্ঠাব আলোকচিত্র মুদ্রিত হইযাছে। এই পত্র দুই-খানিতে কিছু কিছু প্রাচীন অক্ষব থাকিলেও কোন কোন অক্ষব ঠিক আধুনিক অক্ষবেব অনুরূপ। যেমন 'শূদ্রপদ্ধতি'র অ, প, স, ক, র্ম, বঁ, ধ, জ প্রভৃতি। এগুলি অবিকল আধুনিক অক্ষবেব মতো। 'হবিবংশে'র যে পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র মুদ্রিত হইযাছে, তাহাতেও ন, ব, ল, স প্রভৃতিব সহিত আধুনিক অক্ষবেব বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহাব আনুমানিক কাবণ, কতকগুলি অক্ষর কালেব পবিবর্তন সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয় নাই। সেই অক্ষব-গুলি প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত একই আকারে অনুশীলিত হইয়াছে। তাই ঐ অক্ষবগুলিকে আধুনিক বলিযা ভ্রান্তি জন্মে। আসলে ঐগুলি আধুনিক নহে, ববং প্রাচীনতব। যেগুলি পবিবর্তিত হইয়াছে, সেইগুলি বরং পুবাতন অক্ষরেব আধুনিক বংশধর; তাহারা কালক্রমে রূপান্তব লাভ কবিযাছে, পূর্ববর্তী ধাবাব সহিত তাহাদেব পরবর্তী আকারের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা অন্যান্য পুঁথিতে প্রাচীন ও আধুনিক অক্ষব একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিযা চিন্তিত ও সংশয়ান্বিত হইবার কারণ নাই। আধুনিক অক্ষরগুলি আধুনিক কালের নহে, অতি পুরাতন। এগুলি

প্রাচীন যুগে যে-আকারে ব্যবহৃত হইত, এখনও সেই আকারে লিখিত হয়, অথবা ইহার অল্পস্বল্প পরিবর্তন হইয়াছে, এই মাত্র। সেইজন্য আধুনিক অক্ষরের সহিত ঐ অক্ষরগুলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। পুরাতন অক্ষরের সহিত আধুনিক অক্ষরের যেখানে পার্থক্য দেখা যাইবে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, ঐ আধুনিক অক্ষরগুলি বিশেষ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক আকার লাভ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক অক্ষর ব্যবহারের ইহাই যুক্তিসঙ্গত কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে বিষ্ণুপুরাণের উল্লেখ করিযাছেন তাহা ১৪৩৬ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত। তিনিও উহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি মিলাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরমালা ঐ বিষ্ণুপুরাণের অক্ষর অপেক্ষাও প্রাচীন। ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাকও বৈজ্ঞানিক লিপিতত্ত্বের সাহায্যে ঐ বিষ্ণুপুরাণের পুঁথির অক্ষরের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর মিলাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৪৫০-১৫০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে অনুলিখিত হইয়া থাকিবে। ইঁহারা রাখালদাস অপেক্ষা একশত বৎসর আগাইয়া আসিয়াছেন। রাখালদাসের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে অনুলিখিত হইয়া থাকিবে, ইঁহাদের মতে, ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা তাহার ঈষৎ পূর্ববর্তী কালে এই পুঁথি অনুলিখিত হইতে পারে। রাখালদাসের সিদ্ধান্তের কালপরিমাণ কিছু কমাইয়া দিলেও পুঁথির লিপি যে অতিশয় প্রাচীন—চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে যাইতে পারে, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া অযৌক্তিক নহে।

কেহ কেহ পুঁথিটিকে এত প্রাচীন বলিতে চাহেন না। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ১৫৪৪ শকাব্দে (১৬২২-২৩ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত 'গীতগোবিন্দে'র যে পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ। সুতরাং ডক্টর সেনের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৬০০ খ্রীঃ অব্দের দিকে অনুলিখিত হইয়াছিল।[৩] যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পুঁথিটি বিশেষভাবে পরীক্ষা

---

[৩] ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (২য় সং)। ডঃ সেন তৃতীয় সংস্করণে এ মতও পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির অক্ষরকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে টানিয়া নামাইয়াছেন। পরবর্তী সংস্করণে উহা আরও নামিয়া আসিলে আমরা বিস্মিত হইব না।

করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথিটি ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দের দিকে লিখিত হইয়া থাকিবে।

পুঁথিতে তিনপ্রকার হস্তাক্ষর (পুরাতন, পুরাতনের অনুকরণ ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন) কেন, সে সম্বন্ধেও নানাপ্রকার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। যোগেশচন্দ্র লিপিরহস্যের সমাধানে পৌঁছাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক,—সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার মতে প্রাচীন অক্ষরগুলি সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুররাজের কোন ব্রাহ্মণ মুন্‌শীর কৃত। ব্রাহ্মণ মুন্‌শীগণ একটু রক্ষণশীল স্বভাবের হইতেন। সুতরাং তিনি হয়তো পুরাতন ছাঁদে কিয়দংশ লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অক্ষর অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী বা পুরাতন বর্ণের অনুকরণ—ইহা হয়তো ব্রাহ্মণ মুন্‌শীর কোন সহকারী কর্মচারীর, যিনি প্রথম ধরণের লিপির যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়াছিলেন, তৃতীয় লিপি কোন সাধারণ কর্মচারীর—যাহা অনেকটা আধুনিক ধরণের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তিন প্রকার লিপির কারণ নির্দেশ করিতে হইলে যোগেশচন্দ্রের এই অনুমান গ্রহণ করিতে হইবে।[৪] অবশ্য যাঁহারা এই যুক্তিকে নিতান্ত পক্ষসমর্থনের অজুহাত বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা সহজ হইবে না। তাহারা বলিবেন যে, পুঁথিতে এই প্রকার একাধিক কালের বর্ণমালা এবং পুরাতন ও অর্বাচীন হস্তাক্ষর থাকে, শুধু লিপিদৃষ্টেই তাহাকে প্রাচীনতর বলিবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ নাই। এসম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন সবার্সবি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির প্রাচীনত্বের উপরই কাব্যটির প্রাচীনত্ব নির্ভর করিতেছে, এ ধারণার বশে রহিয়াই আমরা ভুল পথে চলিয়াছি" (বাং. সা. ইতি ১ম, পূর্বার্ধ)।

রাখালদাস পুঁথিটিকে ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন। আমাদের অনুমান, প্রাপ্ত পুঁথিটিকে এত দূর পিছাইয়া লওয়া উচিত হইবে না। কারণ তুলোট কাগজ, ডঃ সেনের মতে—"ঠিক যেন মিলের কাগজ"। লেখা পুঁথিটি যে আকারে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে পাঁচ-ছয় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পুঁথি রাজগ্রন্থাগারে ছিল, লোকে মৃদঙ্গের তাল শিখিবার জন্য পুঁথিটিকে ব্যবহার করিত। কারণ পুঁথির মধ্যে যে রসিদখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন নামক কোন এক ব্যক্তি ইহার কয়েকখানা পাতা লইয়া গিয়াছিলেন এবং পরে তাহা

[৪] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪২

ফেরত দিয়াছিলেন—বোধহয় সঙ্গীতাদির অভিপ্রায়েই লইয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু-আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসহ তাল শিখিবার দুইটি পুঁথি দৃষ্টেও এই অনুমান দৃঢ়তর হইতেছে। পুঁথিটি নানা জনের হাতে পড়িয়াছিল ; ইহার কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইলেও তুলোট কাগজের এই পুঁথিকে বাহ্যিক আকারে পাঁচ শত বৎসর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পুঁথির লিপি, কাগজ, অক্ষরগঠন, পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত ১০৮৯ সনে (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) লিখিত রসিদ, মণীন্দ্রমোহন-আবিষ্কৃত দুইখানি পুঁথি, যোগেশচন্দ্রের অনুমান প্রভৃতি মিলাইয়া মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে—১৬শ শতাব্দীর দিকে অনুলিখিত হইয়াছিল। পুঁথির প্রাচীনতা অনুসারে মূলকাব্যটির রচনাকাল-নির্ধারণেও কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পাবে, এইজন্যই প্রাপ্ত পুঁথিটির গুরুত্ব এত বেশি।*

ভাষা ॥ ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল্য অসাধারণ ; তাঁহাদের মতে চর্যাগীতিকার পর এই কাব্য অপেক্ষা আর-কোন প্রাচীনতর বাংলা কাব্য আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা ঈষৎ পরবর্তী কালে রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি কাব্যের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই ; ইহাদের ভাষা নানা পরিবর্তনের ফলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি ; পরবর্তী বৈষ্ণবভাবধারা ও রসপর্যায়ের সহিত ইহার আদর্শগত বিরোধ আছে বলিয়া ইহা লোকসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। এই সমস্ত কারণে ইহাতে নানা যুগের নানা জনের হস্তক্ষেপের ফলে ভাষার আধুনিকতা ঘটিতে পাবে নাই। অতএব ইহাতে পশ্চিমবঙ্গীয় আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যযুগীয় আদিপর্বের মূল লক্ষণগুলি পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গিয়াছে।

* সম্প্রতি কেহ কেহ ('অমৃত', ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গায়েনের প্রক্ষেপের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে গায়েনগণ পরবর্তী কালের গানের সময়ে মূল রচনায় কিছু কিছু অংশ যোগ করিয়া দিতেন। উহা অসম্ভব নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে অংশগুলি প্রধানতঃ গীত হইত, তাহাতে গায়েনের কিছু কিছু হস্তক্ষেপ ও সংযোজনা থাকাই স্বাভাবিক। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কতটা বড়ুর রচনা এবং কতটা গায়েনের প্রক্ষেপ, সে-বিষয়ে এখনও বিস্তারিত গবেষণা হয় নাই।

বসন্তরঞ্জন প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রথম সংস্করণেই ইহার ভূমিকায় 'ভাষা' নামক পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্টে 'ভাষা সর্বস্বটীকা' নামক শব্দসূচীতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দসমূহের বিকাশধারা বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেন। তিনি অভিধানপ্পদীপিকা, কর্পূরমঞ্জরিকা, কুমার-পালচরিত, গাথাসপ্তশতী, গউড়বহো, প্রাকৃতপৈঙ্গল, প্রাকৃতপ্রকাশ, প্রাকৃত-সর্বস্ব, ভবিসয়ত্তকহা মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি প্রাকৃত-অপভ্রংশ কাব্যব্যাকবণ-নাটকের শব্দরূপাবলি ও ব্যাকরণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখান যে, কীভাবে মূল তৎসম শব্দ ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তদ্ভব শব্দে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্বানুসারে গৃহীত; সুতরাং ইহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত প্রাচীনতা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইহার উৎকট অভিনবত্ব ও রসের বৈলক্ষণ্য বঙ্গীয় সাহিত্যিক, সমালোচক ও রসিক ব্যক্তিকে এমন বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল যে, কেহই ইহার ভাষাতত্ত্বের কথা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। কেহ কেহ ইহার অনভ্যস্ত শব্দে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, ইহার প্রাচীনতা নির্ণয়ে কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন জয়দেবেরও পূর্ববর্তী রচনা, তাঁহার মতে জয়দেব গীতগোবিন্দ-রচনায় এই কাব্য হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৫] ইহা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহা শাস্ত্রীমহাশয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র অন্তর্ভুক্ত "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে"র ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীনতম পুঁথি হইলেও ইহার রচনাকাল ১৫শ শতাব্দীর অধিক পূর্ববর্তী হইতে পারে না। চর্যায় ব্যবহৃত শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আসিয়া যেরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চর্যা অপেক্ষা অন্ততঃ দুই শত বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ চর্যার রচনাকাল যদি খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল ১৪শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী তো নহেই, বরং কিছু পরবর্তী হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চর্যাপদ অপেক্ষা

৫ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৯, ৪র্থ সংখ্যা

অধিকতর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন (phonetic changes) লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ১৩শ বা ১৩শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ এই যুগে রচিত কোন গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগের প্রারম্ভ কালের (১৫শ শতক) অল্প পরে বা ১৫শ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যেই তাহার ইঙ্গিত আছে। সেই ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণপঞ্জীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বিকাশপরম্পরার সংযোগসূত্রটি আবিষ্কার করেন ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত তাঁহার '*The Origin and Development of Bengali Language*' নামক দুই খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার ঈষৎ পূর্বে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং পুঁথিসম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ইহার ভাষাগত প্রাচীনত্ব প্রমাণের সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সংশয়' (১৩২২) নামক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতিবাদে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত বহু প্রাচীন শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'চণ্ডী-দাসের পদাবলী'র পাঠভেদ আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতা আলোচনা করিয়াছিলেন। ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

সুনীতিকুমারের অবলম্বিত রীতিই অবশ্য সকলে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি *The Origin and Development of Bengali Language*-এর প্রথম খণ্ডে বাংলা ভাষাকে কালানুযায়ী প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) সৃজ্যমান যুগ বা প্রাচীন বাংলা ভাষা (আঃ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ অঃ)। চর্যাপদকে এই যুগে স্থাপন করা হইয়াছে। (২) মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (১২০০-১৮০০ খ্রীঃ অঃ)। এই যুগকে আবার তিনটি উপ-বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(ক) মধ্যযুগের অন্তর্বর্তিকালীন পর্ব ১২০০-১৩০০ খ্রীঃ অঃ), (খ) মধ্যযুগের আদিপর্ব (১৩০০-১৫০০ খ্রীঃ অঃ),

(গ) মধ্যযুগের অন্ত্যপর্ব (১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ অঃ)। বাংলা ভাষার তৃতীয় যুগ হইল আধুনিক পর্ব—১৮শ শতাব্দীর পর যাহার আরম্ভ। ডঃ চট্টোপাধ্যায় চর্যা হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব (Phonology and Morphology) আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাংলা ভাষার আদিযুগে পূর্বাঞ্চলের ভাষা অপভ্রংশের অঞ্চল ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিতেছিল—চযাপদই তাহার প্রমাণ। অবশ্য চর্যাসমূহে তখনও অপভ্রংশের প্রচুর প্রভাব ছিল। কিন্তু ইহার দুই শত-আড়াই শত বৎসর পরে রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষায় বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। বাংলা ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাব একপ্রকার হ্রাস পাইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহু শব্দে পুরাতন ধ্বনি ও রূপ তখন 'যাই যাই' করিয়াও রহিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শব্দাবলীতে মধ্যযুগের পদধ্বনি শুরু হইয়াছিল। তাই ডক্টর চট্টোপাধ্যায শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির ভাষাকে ১৫শ শতাব্দীর কিছু পূর্ববর্তী অর্থাৎ চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন।

তাঁহাব এই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা গ্রীযার্সন প্রভৃতি পরিকল্পিত এমন একটি বৈজ্ঞানিক রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ঐ নীতিটির যৌক্তিকতা স্বীকার করিলে সুনীতিকুমারের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে —অবশ্য ইহার বিরুদ্ধেও অল্পস্বল্প প্রতিবাদ উঠিযাছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র ১৩২২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্ত্বিক প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি তুলিযাছিলেন। ইদানীং ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনও * এই ভাষাকে ১৬০০ খ্রীঃ অব্দের পিছনে লইয়া যাইতে চাহেন না। তাঁহাব মতে মালাধর বসু, কৃত্তিবাস প্রভৃতির ভাষার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে এতটা প্রাচীন বলা যায না। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয, রামায়ণ বা চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থসমূহ এত অধিক জনপ্রিয় হইযাছিল যে, ইহার নানা অনুলিখন দেশের সর্বত্র প্রচলিত

* ডঃ সেন সম্প্রতি তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের হতিহাসে' (প্রথম, পূর্বার্ধ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাকেও প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। যাঁহারা এ কাব্যের ভাষাকে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ভাষা বলিতে চাহিযাছেন, ডঃ সেন তাঁহাদের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কিন্তু এ ভাষা যথার্থ কোন্ শতাব্দীর হওযা সম্ভব, সে বিষয়ে তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এ ভাষাকে তিনি "মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষা" বলিলেও আনুমানিক শতাব্দী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। দ্রষ্টব্য—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম, পূর্বার্ধ, পৃ. ১৩১ ১৩২

ছিল। পুনঃপুনঃ লিপিকরণের ফলে এবং লিপিকার, পাঠকসমাজ ও কালের পরিবর্তন অনুসারে ঐ সমস্ত কাব্যের পুরাতন ভাষা পরবর্তী কালের পুঁথিতে প্রায় কোথাও রক্ষিত হয় নাই। অপরদিকে যে-কোন কারণেই হোক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি চৈতন্যযুগে এবং তাহার পরবর্তী কালে জনপ্রিয়তা হারাইয়া লোকস্মৃতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাপ্ত পুথিতে প্রাচীন লক্ষণ অনেকটা বজায় আছে। উপরন্তু ইহাতে কয়েকটি ইসলামী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছেঃ কামান, মজুরী, মজুরিয়া, খরমুজা, কুতোঘাট প্রভৃতি। পুঁথির ভাষায় যখন ইসলামী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইহাকে ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া চলে কি?'

এই যুক্তি দুইটি প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক কৃত্তিবাস, মালাধর বসু প্রভৃতি কবির প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেলে তাহার ভাষাতত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ প্রাচীনতর ভাষার নিদর্শন মিলিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই কবিদের গ্রন্থগুলির মত পুনঃপুনঃ লিপিকৃত হইলে বা জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় প্রচার লাভ করিলে উহার ভাষাও রামায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মতো আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়িত। তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাদৃষ্টে ইহাকে এত পুরাতন বলা যাইত কি?

কথাটা অসম্ভব না হইলেও, কি হইলে কি হইতে পারিত, ভাষাতত্ত্ব তাহা লইয়া চিন্তিত নহে, প্রাপ্ত উপকরণ লইয়াই তাহার বিচার-বিশ্লেষণ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মালাধরী শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীন পুঁথি যখন পাওয়া যায় নাই, তখন ঐ পুঁথি পাওয়া গেলে তাহাতে কিরূপ ভাষা থাকিতে পারিত, তাহার আনুমানিক আলোচনার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার যুগ নিদেশ করার প্রয়োজন নাই। ইহাতে আহ্মি, তুহ্মি, মোক, তোহ্মি, করিছলি—এইরূপ অসংখ্য প্রাচীন শব্দের এত বাহুল্য রহিয়াছে যে, ইহার ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না—অবশ্য কিছু কিছু পরবর্তী কালের ভাষা চিহ্নও আছে। চর্যাপদকে বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির মতো প্রাচীন ভাষা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কুত্রাপি পাওয়া যায় নাই। এই দিক দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীনতা দাবী করিতে পারে।

ইহাতে ব্যবহৃত দুই-চারিটি মুসলমানী শব্দের জন্য কেহ কেহ ইহার প্রাচীনত্বসম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন।* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি ১৪শ-১৫শ

---

* যেমন—মজুরিয়া, খরমুজা, মিনতি, গুলাল ইত্যাদি। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের উল্লিখিত গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীর রচনা হয়, তাহা হইলে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে মুসলমানী শব্দ স্থান পাইল? ১৩শ-১৫শ শতাব্দী—মোট দুই শত বৎসরের মধ্যে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কিছু কিছু ইসলামী শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থান করিয়া লইযাছিল। কুতোঘাট, মজুরিয়া, কামান প্রভৃতি শব্দগুলি ইসলামী হইলেও দুই শত বৎসরের পাঠান-শাসনের ফলে বীরভূম অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে উহাদের অনুপ্রবেশ এমন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। ইংরাজ জয়ের অব্যবহিত পরে রামপ্রসাদ যদি গানে আইন-আদালত-সংক্রান্ত আধুনিক শব্দ ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ১৭শ-১৫শ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুই-চারিটি ইসলামী শব্দের ব্যবহার এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে, এবং তাহার দ্বারা পুঁথি বা ভাষার অর্বাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে না। যাহা হউক, ভাষাতাত্ত্বিকগণের মত অনুসরণ করিয়া এবং চর্যাগীতিকার ভাষা বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে ব্যবহৃত ভাষাকে সহজেই ১৫শ শতকের প্রথমার্ধে স্থাপন করিতে পারা যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাব প্রাচীনতার আরও একটি আনুমানিক প্রমাণ আছে। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিত্যালযের পুঁথিশালা হইতে তাল শিখিবার যে দুইখানি পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দশটি গান আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি পুঁথি ১৮শ শতাব্দীর; অপর পুঁথিটিতে তারিখ না থাকিলেও উহা অন্যটি অপেক্ষা অন্ততঃ আরও একশত বৎসরের পুরাতন বলিযা মনে হইতেছে। আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীতে অনুলিখিত এই পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে দশটি গান স্থান পাইয়াছে, তাহার ভাষায শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতা অনেকটা লোপ পাইয়া গিযাছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাল শিখিবার পুঁথিটির (১৭শ শতাব্দী) ভাষায যদি ঐরূপ আধুনিক পরিবর্তন প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির ভাষা আরও দুই শতাব্দী পিছাইয়া যাইবে অর্থাৎ পুঁথিটি ১৫শ শতাব্দীর সমকালীন হইবে বলিযা অনুমান করা যাইতে পারে। সমস্ত উপাদান বিচার করিযা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে ব্যবহৃত ভাষা ১৫শ শতাব্দীর অধিক পববর্তী নহে।

সনাতনগোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী॥ সতীশচন্দ্র রায় ১৩৩৮ সালে শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ৫ম খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতাসম্পর্কে আরও একটি

নিঃসংশয় প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সনাতনগোস্বামী ১৫৫৪-৫৫ খ্রীঃ অব্দে ভাগবতের 'বৈষ্ণবতোষণী' নামক যে টীকা রচনা করেন, তাহাতে ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোক ("এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা"র রাসলীলার প্রসিদ্ধ শ্লোক) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'কাব্যকলা' শব্দের অর্থবিশ্লেষণ করিয়া বলেন, "কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং স্থচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি-প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ডনৌকা-খণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" অর্থাৎ "কাব্য শব্দের দ্বারা সেই কথাসমূহের পরমবিচিত্রতা এবং উহাদিগের গীতগোবিন্দাদিতে প্রসিদ্ধ, তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দ্বারা প্রদর্শিত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি প্রকার স্থচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।"* এই শ্রীচণ্ডীদাস নিশ্চয় বড়ুচণ্ডীদাস, কারণ দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইটি প্রসিদ্ধ অংশ। অনুমান বড়ুচণ্ডীদাসই বাংলা ভাষায় দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের আদিকবি। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসমাজে দান ও নৌকালীলা বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। স্বয়ং মহাপ্রভু দানের ঘটনা অভিনয় করিতেন। চৈতন্যসমসাময়িক বাসুদেব ঘোষের পদে চৈতন্য-অনুষ্ঠিত দানলীলার বিস্তারিত উল্লেখ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত (আদি—১১শ), হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, ভবানন্দের হরিবংশ, জীবন চক্রবর্তীর ভাগবত, শঙ্কর কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের দানলীলা, ও নৌকালীলায় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অর্বাচীন পুঁথিতেও দান ও নৌকালীলার প্রসঙ্গ আছে। এই দানলীলা সংস্কৃতজ্ঞ কবিগণকেও যে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ—রূপগোস্বামীর 'দানকেলি কৌমুদী' ও গোপাল ভট্টের 'প্রেমামৃত' নামক সংস্কৃত চম্পূকাব্যেও দান-

* শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ৫ম খণ্ডে সতীশচন্দ্র রায় অনূদিত। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত 'জাল বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক পুস্তিকায় সনাতন গোস্বামীর এই উক্তিকে উড়াইয়া দিয়া লিখিয়াছেন: "সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এই মিথ্যাকথাটি কোন্ ভাগবতের টীকায় লেখা হয়েছে? মিথ্যা একবার চলিলে এই দেশে কে তারে রোধ করে! সনাতন গোস্বামীর নামে যে নিজের মত চালায় তাহার অপরাধের সীমা নাই। বর্তমানকালে নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্ম শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায়ও ভেজাল দেওয়া হইতেছে।" (ঐ পুস্তিকা. পৃ ৪৬) অধুনা সর্বত্রই যখন ভেজাল চলিতেছে, তখন টীকাতেও ভেজাল চলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু মুদ্রিত বৈষ্ণবতোষণীতে এ শ্লোক আছে। দাশগুপ্ত মহাশয় তাহা বিশ্বাস না করিলে আমরা নাচার।

নৌকালীলার প্রসঙ্গ আছে। রূপগোস্বামি-সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তেও অন্যান্য সংস্কৃত কবির দান ও নৌকালীলা-সংক্রান্ত অনেক শ্লোক আছে। সনাতন-গোস্বামী 'শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বোধহয় বলিতে চাহিয়াছেন যে, বড়ুচণ্ডীদাসই দান ও নৌকালীলা রচনার আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পরবর্তী কবি অল্পাধিক সেই আদর্শ অনুসরণ করেন। যুগভেদে রুচির পরিবর্তন হয়। অধুনা হয়তো রসিক পাঠকের নিকট বড়ুচণ্ডীদাস ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর দানলীলা ও নৌকালীলার পদ রীতিমত ক্লান্তিকর মনে হইবে। সে যাহা হউক, রাধার নিকট যৌবনের দান গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া কৃষ্ণের 'রঙ্গঢামালি' আধুনিক পাঠকের নিকট যতই বিস্বাদ ও বিরক্তিকর মনে হউক না কেন, মধ্যযুগীয় বাঙালী এই পর্যায়ের পদগুলিকে, অতিশয় শ্লাঘনীয় মনে করিত।

বাঙলার লোকসাহিত্যে এই বড়াই ও রাধাকৃষ্ণঘটিত দানলীলা একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার অনেক নিদর্শন এই যুগের সাহিত্য ও শিল্পকলায় রহিয়া গিয়াছে। তাই ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সনাতনগোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে 'কাব্য' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন (ক)। সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ দেখিয়া মনে হইতেছে আলোচ্য কাব্যটি সনাতনের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত হইয়াছিল।

তবু সন্দেহ উঠিয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতার বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা বলেন যে, সনাতনগোস্বামীর 'শ্রীচণ্ডীদাস' অন্য কোন চণ্ডীদাস, যিনি হয়তো সংস্কৃতে দানলীলা ও নৌকালীলার পৃথক কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে একজন (আলঙ্কারিক) চণ্ডীদাসের* নাম পাওয়া যাইতেছে।

* Eggling-সম্পাদিত *Catalogue of Sanskrit Mss. in India Office Library* (Vol III)-এ এই চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। প্যারিস হইতে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হরিচাঁদ শাস্ত্রীর *Kalidasa et L' Art Poetique l' Inde*—গ্রন্থে ভ্রমক্রমে এই আলঙ্কারিক চণ্ডীদাসের সহিত বাঙলার কবি চণ্ডীদাসের গোলমাল করিয়া ফেলা হইয়াছে।

(ক) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন বৈষ্ণবতোষণীতে এই উক্তি দেখিতে পান নাই। তিনি "৮০ টাকা খরচ করিয়া একখানা প্রসিদ্ধ টীকাসহ পুরাতন শ্রীমদ্ভাগবত খরিদ করিয়া" তাহাতে উহা পান নাই বলিয়া সনাতনের উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ মত অতিশয় একদেশদর্শী।

তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'ধ্বনিসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' ও 'কাব্যপ্রকাশদীপিকা' প্রণয়ন করেন ('বিশ্বকোষ')। হয়তো এই চণ্ডীদাস সংস্কৃতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক দানলীলা ও নৌকালীলা অবলম্বনে কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য : অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যাইতেছে যে, বড়ুচণ্ডীদাস-রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দুইটি প্রসিদ্ধ খণ্ডের নাম—দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড; সুতরাং প্রত্যক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কল্পিত চণ্ডীদাসের অনুমান-সাপেক্ষ সংস্কৃতকাব্য লইয়া আলোচনা চালাইবার পক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রতিপক্ষ বলিবেন, চণ্ডীদাসের নামের পূর্বে 'শ্রী' যোগ করিয়াই সনাতন-গোস্বামী সংশয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বাঙলা দেশের চণ্ডীদাসগণ বড়ু, দ্বিজ, দীন নাম গ্রহণ করিলেও কেহ 'শ্রীচণ্ডীদাস' নামে পরিচিত ছিলেন না। আমাদের উত্তর—বৈষ্ণবোচিত ভক্তিপ্রদর্শনের জন্যই সনাতন-গোস্বামী 'শ্রীচণ্ডীদাস'—এইরূপ উল্লেখ করিযাছেন, ইহার পশ্চাতে অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই। বিপক্ষবাদিগণ আরও একটা আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সনাতনের উক্তি দেখিয়া মনে হয়, এখানে তথাকথিত চণ্ডীদাসের দুইটি পৃথক্ কাব্য দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুইটি পথক অধ্যায় হইল দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড। সুতরাং সনাতনের উদ্দিষ্ট 'শ্রীচণ্ডীদাস' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু-চণ্ডীদাস যে একই ব্যক্তি, তাহারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়? ইহার উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, সে যুগে দানলীলা ও নৌকালীলাই অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল; সনাতনও 'কাব্য' শব্দ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্য বাদ দিয়া শুধু গীতগোবিন্দ ও দানলীলা নৌকালীলার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য সম্বন্ধে নিশ্চয় অবহিত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যান্য খণ্ড বাদ দিয়া বা পুরা কাব্যের উল্লেখ না করিয়া, ইহার যে অংশগুলি অতিশয় প্রচলিত ছিল, শুধু সেই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সনাতনের শ্রীচণ্ডীদাস আর একজন পৃথক কবি, দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কোন সংস্কৃত কাব্য—এ সমস্ত অনুমানের পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নাই, স্পষ্ট কোন প্রমাণেরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধবাদিগণ যদি যুক্তিসঙ্গত কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই সনাতনগোস্বামীর 'বৈষ্ণবতোষণী'ধৃত "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড"

উক্তি অন্ততঃ বড়ুচণ্ডীদাসের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে না।* যত দিন তেমন কোন প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, তত দিন সনাতনেব শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ুচণ্ডীদাসকে এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রসের ধাবা ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাক্-চৈতন্য যুগে উপস্থাপনাব আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ—ইহাব বিষযবস্তুব অভিনবত্ব ও রসের ভিন্ন প্রকৃতি। এখানে 'রস' বলিতে আমবা অলঙ্কাবশাস্ত্রোক্ত রসের পাবিভাষিক অর্থ নিদেশ করিতেছি না। বড়ুচণ্ডীদাস যে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে রাধা-কৃষ্ণলীলা প্রত্যক্ষ কবিযাছেন এবং যে অভিনব ভাবমণ্ডলে তাঁহার কাব্যের নাযক-নাযিকাকে স্থাপন কবিযাছেন, আমবা আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহাকেই রস বলিতে চাহি। এই কাব্যেব অভিনব ভাবাদর্শেব জন্য ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলা দেশে এত মতান্তরের ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইযাছে। চৈতন্যভাবরসে নিমগ্ন বসিক পাঠক—বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব যাহাই হউন না কেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পাঠে সর্বাগ্রে একটা ক্লিন্ন জুগুপ্‌সা ও রুচিব অশুচি পীডন অনুভব করিবেন। পরে একটু স্থিতধী হইলে তিনি দেখিবেন যে, আমরা আজ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া চৈতন্যপ্রভাবে লালিত হইয়া রাধা-কৃষ্ণলীলাকথাকে যে ভাবাদর্শেব দিব্যলোক হইতে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, ইহাতে তাহা শতখণ্ডে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিষযবস্তু ও রসের আদর্শের দিক হইতে চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণকাহিনী ও বৈষ্ণব পদশাখার সহিত ইহার যেন কোথায বংশকৌলীন্যের ভেদ হইযা গিযাছে। নিত্যশুদ্ধ ও সাত্ত্বিক মহাজন-পদের তুলনায ইহাকে অতিশয় কুরুচিপূর্ণ, জাতিচ্যুত ও গ্রাম্য বলিয়া মনে হয়। পববর্তী কালেব বাধাকৃষ্ণলীলাব সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য

---

* ডঃ সুকুমার সেন বৈষ্ণবতোষণীধৃত শ্লোককে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযোগ করিতে চাহেন না। তিনি উক্ত বাক্যের অর্থ করিযাছেন, "জযদেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি দর্শিত এবং দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি লীলাপ্রকার জানিতে হইবে।" তাঁহার মতে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড কোন অর্বাচীন 'এরোটিক' রচনা। ইহার সঙ্গে জযদেব বা চণ্ডীদাসের কোন সম্পর্ক নাই। তিনি 'দর্শিত' কে কর্মধারয় সমাস না বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাস বলিযা গ্রহণ করিযাছেন। কারণ জয়দেবের কাব্যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ নাই, সুতরাং ইহা জয়দেবে আরোপিত হইতে পারে না। জযদেবকে ছাডিযা শুধু চণ্ডীদাসেই বা উহা কেন প্রয়োগ করা হইবে? ডঃ সেনের এ সংশয় নূতন প্রশ্নের উদ্রেক করিবে। কিন্তু ডঃ সেন উদ্ধৃত বৈষ্ণবতোষণীর উক্তির সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় উল্লিখিত উক্তির সাদৃশ্য নাই।

—রাধা ও চন্দ্রাবলী এই কাব্যে একই চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন।[৭] পরবর্তী কালে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। অবশ্য কোন কোন গ্রন্থে রাধা ও চন্দ্রাবলীকে অভিন্ন চরিত্র বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং পরবর্তী কালের কৃষ্ণলীলার মধ্যেও তাহার ইঙ্গিত আছে। শ্যামানন্দের 'গোবিন্দমঙ্গল' এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রাধাকেই চন্দ্রাবলী বলা হইয়াছে। রূপগোস্বামী-পরিকল্পিত রাধাকৃষ্ণকাহিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের প্রায় কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাধাচন্দ্রাবলী সাগরের ঘরে পদুমা-উদরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি রাজনন্দিনী বৃষভানু সুতা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বাধা ও কৃষ্ণের সখাসখীদের কোন নামগন্ধ নাই। পরবর্তী কালে তাহাদের নানা নামকরণ হইযাছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড, ৭০ অধ্যায) ও ভাগবতে বাধা ও কৃষ্ণের সখাসখীব নাম পাওযা যাইতেছে। পদ্মপুরাণে ললিতা. হবিপ্রিযা, শৈব্যা, ভদ্রা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতির রাধার সখী এবং শ্রীদামা, বসুদামা, সুদামা, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুভদ্র প্রভৃতি কৃষ্ণসখার বর্ণনা আছে। ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ, ২২ অধ্যায, ৩১ শ্লোক) দশজন কৃষ্ণসখাব নাম আছে—স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদাম, সুবল, অর্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন্, দেবপ্রস্থ ও বরূথপ। যাহা হউক ললিতা, বিশাখা, মধুমঙ্গল, সুবল প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের সখাসখীগণেব পবিকল্পনা পববর্তী কালে রূপগোস্বামিকৃত এবং চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদশাখার উল্লিখিত রাধাকৃষ্ণের সখাসখীগণের নাম এবং পদপর্যায়ের ক্রম সেই আদর্শ অনুসারেই পরিকল্পিত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাচন্দ্রাবলী, কৃষ্ণ ও বড়াই ভিন্ন অন্য কোন সখাসখীর নাম না থাকারই সম্ভাবনা, থাকিলেই বরং এই কাব্যকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা চলিত না। প্রাচীন কামশাস্ত্রাদিতে* বর্ণিত কুট্টিনী চরিত্রের আদর্শ এবং লোকজীবনের আদর্শ, উভয়কে মিলাইযা বডাই চরিত্র চিত্রিত হইযাছে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদশাখা এবং অন্যান্য কৃষ্ণায়নকাব্যে এই চরিত্রটির প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী কোন কাব্য-

৭ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকে কখনও শুধু রাধা, কখনও বাধাচন্দ্রাবলী, কখনও-বা চন্দ্রাবলী বলা হইয়াছে।

* দামোদরগুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্' নামক গণিকাতন্ত্রের গ্রন্থে বিকরলা নাম্নী বৃদ্ধা কুট্টিনীর বর্ণনার সহিত বড়াইয়ের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

আখ্যায়িকায় বড়াইয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং চরিত্র ও ঘটনার ক্রম বিচার করিলে ইহাকে চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে স্থাপন করিতে হইবে।

রসের পর্যায় ও ভাবাদর্শ বিচার করিলে বড়ুচণ্ডীদাসকে প্রাক্-চৈতন্যযুগে স্থাপন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ অস্বীকার করা যাইবে না। ইহাতে রাধার চরম বিরাগ ক্রমে ক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরম অনুরাগের একান্ত আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হইয়াছে। চৈতন্য-আবির্ভাবের পর রাধাকে জন্ম হইতেই কৃষ্ণময়ী ও মহাভাবস্বরূপিণী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথমেই কৃষ্ণের পূর্বরাগ (তাম্বুলখণ্ড) বর্ণিত হইয়াছে। রাধার পূর্বরাগ নৌকাখণ্ডের পূর্বে উপচিত হয় নাই। এই বৈশিষ্ট্যটি অভিনব সন্দেহ নাই। প্রাক্-চৈতন্যযুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যেও রাধাকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-গোপী সম্বন্ধে যেটুকু আখ্যানের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও রাধাকে প্রথম হইতে অনুরাগিণী করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। 'গাথাসপ্তশতী' ও ও 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' এবং 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয' 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'গীতগোবিন্দ' অথবা পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ, —যেখানেই কৃষ্ণ-বাধা বা কৃষ্ণ-গোপীর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে কোথাও কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রাথমিক বিতৃষ্ণার আভাসমাত্র নাই। সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে যেখানেই আদিরসাত্মক আখ্যান আছে, সেখানে নায়কের প্রতি নায়িকার প্রথমে অপরিচয়জনিত ঔদাসীন্য থাকিলেও বড়ুর রাধার মতো বিতৃষ্ণার কোন প্রসঙ্গ নাই। চৈতন্যযুগে রাধা যখন কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত হইলেন, তখন হইতেই এই বৈশিষ্ট্যটি বাঙলাব বৈষ্ণবপদশাখায় স্থাযী আসন লাভ করিল। রাধা-চরিত্রের এই অভিনবত্বের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতাই সূচিত হয়। যাঁহারা এই কাব্যে রাধার বিতৃষ্ণা এবং কৃষ্ণের রূঢ় দাম্ভিকতা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হন, তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিবেন, পরবর্তী কালের রাধাকৃষ্ণচরিত্র, কাহিনী ও তত্ত্ব প্রধানতঃ রূপসনাতন ও জীবের সংস্কৃত গ্রন্থ, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজন-পদাবলী হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং বড়ুচণ্ডীদাসের আখ্যান সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন॥ চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সহিত

পরিচিত ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব এক-প্রকার স্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য চৈতন্যদেব পাঠ না করিলেই ইহার অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। চৈতন্যজীবনী-গ্রন্থে এবং অন্যান্য পদশাখায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতা, বিল্ব-মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও রায়রামানন্দের নাটকসমূহ পাঠ করিয়া দিব্য অনু-ভূতি ও আনন্দ লাভ করিতেন। সর্বপ্রথম কবিরাজগোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃতের তিন স্থলে এই তথ্য বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তী কালে এই বিষয়ে যাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাই কবিরাজগোস্বামীর এই উল্লেখ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে কাছাকাছি সময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়। তাহারও অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে চণ্ডীদাসের কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিযা মনে হয়। কৃষ্ণদাস রঘুনাথ-গোস্বামীর নিকট চৈতন্যজীবনের উপকরণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাসের উক্তিটি প্রামাণিক বলিযা স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত মানিযা লইযা চণ্ডীদাসকে (বড়ু, দ্বিজ ও দীন—যিনিই হুউন না কেন) চৈতন্য-পূর্ব যুগে অথবা চৈতন্য-সমসাময়িক কালে স্থাপন করিলে ঐতিহাসিক সন-তারিখের বিশৃঙ্খলা ঘটে না। চৈতন্য-জীবৎকালে চণ্ডীদাসকে স্থাপন করিতে কেহ কেহ হয়তো আপত্তি করিবেন। জীবিত কবির কাব্য বা পদাবলী কি এতটা প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যে, মহাপ্রভু তাঁহার গীতাদি দিবারাত্র আস্বাদন করিতেন? কিন্তু কৃষ্ণদাসের নজির গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, মহাপ্রভু তাঁহার সমকালীন রায়রামানন্দের নাটকও পাঠ করিতেন। সুতরাং বড়ুচণ্ডীদাসকে চৈতন্যের সমকালে লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজের উল্লেখ অনুসারে, চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের গীতাদি (আখ্যানকাব্য?) দিবারাত্র আস্বাদন করিতেন।

কেহ কেহ মূলেই সংশয়ের কথা তুলিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থ মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে রচিত। এরূপ অবস্থায় কবিরাজ-গোস্বামীর সমস্ত উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? সতীশচন্দ্র রায় চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত গ্রন্থাদির পরিচয় লইতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবের মুখে এমন গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রচিত হইয়াছিল (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড)। স্বয়ং কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের কয়েক স্থলে (১৫শ, ১৬শ ও ১৯শ

অধ্যায়) উল্লেখ করিয়াছেন যে, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রভু 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্য হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে, উক্ত 'গোবিন্দলীলামৃত' স্বয়ং কবিরাজগোস্বামীর রচনা, চৈতন্যতিরোধানের অনেক পরে রচিত। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করেন। অদ্বৈতাচার্য মহানন্দে বিদ্যাপতির "কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর" গান গাহিয়া মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করেন। তখন চৈতন্যদেব ভাবমুগ্ধ চিত্তে—

হাহা প্রাণ প্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জ্বরে ॥

গানটি গাহিয়াছিলেন। ইহা কাহার রচনা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন 'বীরভূম বিবরণে' (৩য় খণ্ড, পৃ, ৬৬-৬৭) ইহা চণ্ডীদাসের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির প্রামাণিকতা সংশয়াতীত নহে। এই গানটি বাস্তবিক চৈতন্যদেব গাহিয়াছিলেন, অথবা কৃষ্ণদাস অনুরূপ ভাবের গান তাঁহার মুখে বসাইয়া দিয়াছিলেন—তাহাও বিবেচ্য। যাহা হউক, কৃষ্ণদাস কবিরাজকে একমাত্র প্রামাণিক ধরিলে চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ গান করিতেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

এখন দেখা যাক মহাপ্রভু কোন্ চণ্ডীদাসের কাব্য পাঠ করিয়া বা পদ আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইতেন। যাঁহারা বড়ুচণ্ডীদাসের বিরুদ্ধপন্থী, তাঁহারা বলিবেন যে, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত জুগুপ্সাব্যঞ্জক কুরুচিপূর্ণ কাব্য পাঠ করিতেন—ইহা কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই কাব্যে কৃষ্ণ অনিচ্ছুক বালিকা রাধার উপর বর্বরের মত শারীরিক বল প্রকাশ করিয়াছেন, কুত্রাপি অনুরাগ দেখান নাই, তাঁহাকে 'শ্যালিকা' সম্বোধন কবিয়াছেন, অগম্যাগমনও সমর্থন করিয়াছেন। রাধাও প্রথমে কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা বোধ করিয়াছেন, কৃষ্ণকে 'মাগু কিল' মারিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, যশোদার নিকট কৃষ্ণের কুকীর্তি বলিয়া দিয়া শ্রীগোবিন্দকে বিব্রত করিয়াছেন। এই রূপ কাব্যকাহিনী, মহাপ্রভু তো দূরের কথা, যে-কোন যুগের ভদ্ররুচির পাঠক পাঠ করিতে পীড়া বোধ করিবেন।

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিবেদিত হইল: শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধুনিক রুচির নিকট আপত্তিজনক কিছু কিছু বর্ণনা আছে; জয়দেব ও বিদ্যাপতির মিলনসম্ভোগ-বিষয়ক পদ, ভবানন্দের হরিবংশের কিয়দংশ এবং ভারতচন্দ্রের

বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি শ্লোক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীর নিকট ব্রীড়াজনক মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে—সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে আদিরস ও দেহজ প্রেমকে কখনও অশুচি মনে করা হয় নাই। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে যেখানে দৈহিক মিলনের উল্লাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এযুগে রুচিকর না হইলেও, তদানীন্তন পাঠকসমাজে অপাংক্তেয় ছিল না। চৈতন্যদেব ভক্তির তুঙ্গশীর্ষ হইতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেন; তাহা না হইলে পুরীমন্দিরের সেবিকার 'রতিসুখসারে গতমভিসারে' গান শুনিয়া তিনি গায়িকাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মত্তবৎ ছুটিতেন না বা ঈশ্বরপ্রেমকে পর-পুরুষের প্রতি আসক্ত কুলটা রমণীর প্রেমের সহিত তুলনা করিতেন না। কাজেই রাধার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রয়োগ, যাহা আমাদের চিত্তে বিরূপতা উৎপাদন করে, তাহা হয়তো চৈতন্যদেবের চিত্তে আত্মবিস্মৃত ভক্তের প্রতি ভগবানের আকর্ষণ সূচিত করিত। এসমস্ত অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও চৈতন্যদেব যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠ করিতেন, তাহা হইলে ইহার কোন অংশ তাঁহার মনে দিব্য আনন্দ দান করিত? কেহ কেহ বলিবেন, 'রাধা-বিরহে'র মধ্যে ধৃত রাধার আক্ষেপের মধ্যেই তিনি আপনার হৃদয়ের ছায়া দেখিতে পাইতেন। বস্তুতঃ এই অংশে রাধার চরিত্র ও মনোভাবের সহিত চৈতন্য-পরবর্তীযুগের বৈষ্ণবপদাবলীর কোন পার্থক্য নাই। চৈতন্যদেব দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড পাঠ করিতেন না, একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ তিনি একাধিক বার দানলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন। সেযুগে দান-লীলা ও নৌকালীলা অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। স্বয়ং সনাতনও চণ্ডীদাসের কাব্যের নজির তুলিতে গিয়া দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডেরই উল্লেখ করিয়াছেন—'রাধাবিরহ' বা 'বংশীখণ্ডে'র নহে। প্রাচীনতর সংস্কৃত গ্রন্থেও কৃষ্ণের দান ও নৌকালীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 'রাধাতন্ত্রে'র ২৩শ পটল ও ২৪শ-২৫শ পটলে নৌকা ও দানলীলার বর্ণনা আছে। 'হরিবংশে'র বিষ্ণুপর্বের অন্তর্গত ৮৮তম অধ্যায়ে কৃষ্ণের জলক্রীড়া ও নৌবিহারের উল্লেখ আছে। 'গর্গসংহিতা'য় (বৃন্দাবনখণ্ড, ২য় অধ্যায়) দানলীলার বর্ণনা আছে। সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্বেই কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলা সংস্কৃত কাব্যপুরাণাদিতে বিশেষ প্রাধান্য পাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুঁথি, ভবানন্দের হরিবংশ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী), অদ্বৈতমঙ্গল (হরিচরণদাস) প্রভৃতিতে এই আখ্যানের সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। বৈষ্ণবপদাবলীতেও ইহার

অপ্রতুলতা নাই। সুতরাং মহাপ্রভু শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ পাঠ করিতেন, তাহা নহে; সেযুগে বিশেষরূপে জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলার প্রতি তাঁহার যে আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সনাতনগোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে অন্য কাব্য বাদ দিয়া দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডেরই উল্লেখ করিয়াছেন বোধহয় এইজন্যই।

কেহ বলিবেন, মহাপ্রভু হয়তো বড়ুচণ্ডীদাসের কোন বিচ্ছিন্ন পদ পাঠ করিতেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাও হইতে পারে। প্রথমতঃ নিঃসংশয়রূপে বড়ু-চণ্ডীদাসের রচিত কোন বিচ্ছিন্ন পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবপদসঙ্কলনে বড়ুচণ্ডীদাসের ভণিতায় যে পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অন্য কোন চণ্ডীদাসের। নামসাদৃশ্যে ভণিতা সংমিশ্রিত হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নূতন নহে। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণচরিত্রপরিকল্পনায় এমন বিকট রসাভাসের পরিচয় আছে যে, মহাপ্রভু এ কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আদিরস বা অশ্লীলতার অভিযোগ ছাড়িয়া দিলেও কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনাতেই কবি-কল্পনা বিপর্যস্ত হইয়াছে, রসের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সঙ্গতির অভাব হইয়াছে। রাধা চরিত্রে কবি যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সেই রূপ কৃষ্ণচরিত্রে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই জন্য আমাদের এখন বিশ্বাস হইয়াছে, চৈতন্যদেব এ কাব্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তিনি কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করিতেন? এবিষয়ে অন্যত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি।* অবশ্য যত দিন না অন্য কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তত দিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রাক্-চৈতন্যযুগের প্রামাণিক কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। চৈতন্যদেব একাব্য আস্বাদন করুন আর নাই করুন, ইহা যে প্রাকচৈতন্যযুগের কাব্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

---

* লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপরিচয়

প্রকাশনার অব্যবহিত পর হইতেই বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব কাহিনী, কাব্যমূল্য ও কবির রুচি নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া তুলিযাছে। কেহ এই কাব্যকে শিল্পোৎকর্ষেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিযা গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ-বা ইহার গ্রাম্য বর্বরতার কুম্ভীপাকে হাঁপাইযা উঠিযাছেন। গ্রন্থটি যে একান্ত অভিনব, তাহা প্রথমেই স্বীকাব করিয়া লইতে হইবে। তাহা না হইলে আজ দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ধবিযা একখানি গ্রন্থ লইয়া এত মতান্তর সৃষ্টি হইত না। অতঃপর ইহাব কাব্যরূপ ও শিল্পমূল্য আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখা যাক, সত্যই বড়ুচণ্ডীদাস সত্যকাবের কবিত্বশক্তির অধিকাবী ছিলেন কিনা। প্রথমে ইহার কাহিনীব স্বরূপ আলোচনা কবা যাক।

॥ ১ ॥

কাহিনী

পুঁথিটির আদ্যন্ত এবং মধ্যের কিযদংশ খণ্ডিত হইলেও বর্ণিত ঘটনার ধাবা অনুসরণ কিছুমাত্র দুরূহ নহে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাই ইহার প্রধান উপজীব্য। কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ কবিয়া মথুবাগমন, মথুরা হইতে ক্ষণিকের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলনেব পব কৃষ্ণের কংস ধ্বংসের জন্য পুনরায় মথুরায় গমন ও রাধার বিলাপ—এইখানেই পুঁথি খণ্ডিত। মিলনরসে কাব্যের সমাপ্তি হইয়াছিল অথবা ব্যর্থ বিবহেই কবি কাব্য শেষ করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতেছে না। সাধাবণ রীতি ও অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধান অনুসারে কাব্যের মধ্যে করুণ-বিপ্রলম্ভ রস থাকিলেও, সর্বশেষে নায়ক-নায়িকার মিলন অত্যাবশ্যক। সেইজন্যই অনুমিত হইতেছে যে, হয়তো গ্রন্থশেষে রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন বর্ণিত হইয়াছিল। তবে বড়ুচণ্ডীদাস সর্বত্র প্রচলিত রীতি বা অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি শিষ্টাচার ও শোভনতার সীমা এমনভাবে লঙ্ঘন করিয়াছেন যে,

মনে হইয়াছে—এই বুঝি রসাভাস ঘটিল। কাজেই বিরহেই যে গ্রন্থ সমাপ্তি হয় নাই, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না।

কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূত্র ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোট ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত—জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়-দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। শেষ সর্গ বা 'রাধাবিরহে' 'খণ্ড' নাম যুক্ত হয় নাই। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এই শেষাংশ বোধহয় বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা নহে, তিনি রচনা করিলে ইহাকে 'খণ্ড' নামেই অভিহিত কবিতেন। উপরন্তু 'রাধাবিরহে'র বর্ণনা ও রচনারীতি এবং রসের ধারাও একটু অভিনব। জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনী বর্ণিত। বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হইয়া জন্ম, বৃন্দাবনে নন্দালয়ে স্থানান্তরিত। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবীর সাগর গোয়ালার ঘরে এবং তৎপত্নী পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম। তাম্বূলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বড়াইয়ের মারফতে কামাচার-আমন্ত্রণসূচক তাম্বূলাদি রাধাকে উপহার-প্রেরণ—ইহাই শ্রীকৃষ্ণেব পূর্বরাগ। স্বরূপবিস্মৃত রাধাচন্দ্রাবলী কর্তৃক তাহা সব্যঙ্গে প্রত্যাখ্যান এবং বড়াইকে অপমান। দানখণ্ডে কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের রাধালাভে ষড়যন্ত্র এবং দানী সাজিয়া কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধ বিনষ্ট, রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণের কাণ্ডারীবেশে গোপীগণকে যমুনা পারকরণ এবং নৌকা ডুবাইয়া দিয়া রাধাকৃষ্ণেব জলবিহার—রাধার প্রতিকূল বাম্যভাব পরিত্যাগ। ভারখণ্ডে ভারবাহিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দধিদুগ্ধপসরা বহন। ছত্রখণ্ডে বাধার আতপনিবারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ছত্রধারণ এবং রাধা কর্তৃক 'রতিদানের' আশ্বাসপ্রদান। বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও রাধাকৃষ্ণের মিলন—ইহাকে রাস বলা যাইতে পারে। যমুনাখণ্ডান্তর্গত অংশে কৃষ্ণের কালিয়দমন, যমুনাখণ্ডে গোপীগণসহ কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ। হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদাসমীপে কৃষ্ণের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ। বাণখণ্ডে ক্ষুব্ধ কৃষ্ণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধার প্রতি মদনবাণ-নিক্ষেপে, রাধার মূর্চ্ছা, কৃষ্ণের অনুতাপ, ক্ষুব্ধ বড়াই কর্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন, কৃষ্ণের সকাতর অনুনয়, বন্ধনমোচন,—পরে রাধার চৈতন্যসম্পাদন এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন। বংশীখণ্ডে

বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, বড়াইয়ের উপদেশে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের অনুনয়বিনয়ে রাধার বংশী-প্রত্যর্পণ। 'রাধাবিরহে' রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন, রাধার শ্রান্তিজনিত নিদ্রা, সেই অবকাশে কৃষ্ণের কংসবিনাশার্থ মথুরাযাত্রা।

এই কাহিনীর সূত্র অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঘটনাবিবৃতি, নাট্যরস ও গীতিরস—এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা কাব্যটি অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ঘটনা ও গীতিরস অপেক্ষা নাট্যরসের প্রাধান্যই সর্বাধিক। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াই—প্রধানতঃ এই তিন জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি ইহার প্রায় সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া আছে। কবি অতি অল্পস্থানে বিবৃতিকার-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। একের উক্তির সহিত অপরের সংযোগ-স্থল রক্ষা করিয়া কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই কবি যেন অজ্ঞাতসারেই নাট্যকাবসুলভ বস্তুপ্রধান ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া নিজ ব্যক্তিত্বকে কঠোরহস্তে অবদমিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই কাব্য-কাহিনী প্রধানতঃ নাট্যরসাশ্রয়ী বলিয়া গতিবেগবহুল হইয়া পড়িয়াছে। তাম্বূলখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনাস্থলে কৃষ্ণের উক্তিতে গীতিরসের ঈষৎ স্পর্শ লাগিয়াছে এবং বাণখণ্ডে মূর্চ্ছাতুর রাধার দুর্গতিদর্শনে কৃষ্ণের বিলাপের মধ্যেও কিছু কিছু গীতিরসের আভাস আছে; কিন্তু বংশীখণ্ডের দুই-এক স্থলে এবং রাধাবিরহের বহুস্থলে রাধার বিলাপের মধ্যে অশ্রুতপ্ত গীতিরসধারার সার্থক স্পর্শ পাওয়া যাইবে। অবশ্য 'রাধাবিরহ' অংশ বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনকে প্রধানতঃ নাট্যধর্মী আখ্যান বলিয়া মনে হইবে।[১]

আখ্যানটি সর্বত্র আধুনিক পাঠকের অভিনন্দন লাভ করিতে পারিবে না। ইহার বহুস্থলে অনাবশ্যক বাগ্‌বাহুল্য আছে। তাম্বূলখণ্ডে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণের মদনশরাহত অবস্থাবর্ণনা এবং দানখণ্ডে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির বহর অত্যন্ত ক্লান্তিকর—মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিকও বটে। বড়ু-চণ্ডীদাস প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাসূত্রের স্তরপরম্পরা বর্ণনা করিতে পারেন নাই; পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য বহুস্থলে পরিমাণসাম্য রক্ষিত হয় নাই। বংশীখণ্ডের দুই-একটি পদের গীতিরস ছাড়িয়া দিলে উহার কাব্যমূল্য প্রশ্নাধীন হইয়া পড়ে। নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়া ঘটনাবিবৃতি গীতিবহুল নাট্যরসের

১ এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কিত কাব্যকাহিনী রচিত হয় নাই। 'গীতগোবিন্দে'র মধ্যে কাহিনী যৎসামান্য। সেই দিক দিয়া বড়ুচণ্ডীদাস যেভাবে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মথুরাগমন পর্যন্ত দীর্ঘ কাহিনাটির ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন. তাহাতে তাঁহার রচনাকৌশল, বিশেষতঃ কাহিনী-বয়নকৌশল প্রশংসার যোগ্য।

এখন দেখা যাক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী কতটুকু কবির স্বকপোলকল্পিত, আর কতটুকুই-বা প্রাচীন অথবা অর্বাচীন পুরাণ হইতে গৃহীত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান কাহিনী ভাগবত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে কাব্যানুরোধে কবি কিছু কিছু পংক্তি ও কাব্যবস্তু গীতগোবিন্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাব্যের এক দিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিলব্ধ পৌরাণিকপ্রভাব রহিযাছে, তেমনি অপর দিকে একটি গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাবও দৃষ্টিগোচর হইবে। পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের জন্মকাহিনী এবং বাল্যলীলা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতার গ্রহণের জন্য যে কাবণ দর্শিত হইযাছে, কবি মোটামুটি সেই ধারারই অনুসরণ করিয়াছেন। জন্মখণ্ডে তিনি পুবাণের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন—এই অংশে ভাগবতের প্রভাবই সর্বাধিক। কিন্তু বসুমতীব গাভীরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট দুঃখনিবেদনেব যে কাহিনী ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, কবি তাহা গ্রহণ না করিযা অন্য পুবাণের আদর্শকেই অধিকতর অনুসবণ করিযাছেন। কবি পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণের সহিত পবিচিত ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। কাবণ পদ্মপুরাণে রাধাকে ভানুনন্দিনী বলা হইযাছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা সাগর গোপের কন্যা। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণের সখা ও রাধার সখীদের নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার সখীদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু কাহারও নাম নাই। কৃষ্ণ একবার বংশীখণ্ডে বলভদ্রের নাম করিযাছেন, কিন্তু সখাদের কোন আভাস নাই। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধাকে কৃষ্ণের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এই পুরাণমতে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। অবশ্য ইহাতে রাধাকে চন্দ্রাবলীও বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'রাধাচন্দ্রাবলী' নামটির মধ্যে এই পুরাণের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও কৃষ্ণ ও রাধার বিবাহের কথা নাই, বরং দানখণ্ডে রাধা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে

স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি কৃষ্ণের মাতুলানী। অপরদিকে 'রাধা-বিরহে' কৃষ্ণ সব্যঙ্গে বলিয়াছেন যে, কলিকালে রমণীরা আর সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ভাগিনা-জার কামনা করে। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে রাধার প্রসঙ্গ নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে ঐ প্রসঙ্গ আছে। বড়ুচণ্ডীদাস বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীও কৃষ্ণের সম্ভোগহেতু রাধারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার মধ্যে ভাগবতের কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, রাস (বৃন্দাবনখণ্ড)—শুধু এই লীলাগুলির প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। অবশ্য বৃন্দাবনখণ্ডটিকে কবি কোথাও রাস বলেন নাই, তবে বর্ণনার ধারা দেখিয়া ইহাকে রাস আখ্যা দেওয়া যায়। কবি বসন্তকালের দিবাভাগে গোপীকৃষ্ণের বসন্তবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন, ভাগবতের শারদোৎফুল্ল রজনীর রাস নহে। এবিষয়ে জয়দেবও বাসন্তী রজনীতে রাস উৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন। কৃষ্ণ মাঝে মাঝে বল বা প্রতাপ বুঝাইবার জন্য আপনার ঐশ্বর্যপ্রকাশক নানা লীলার কথা বলিলেও একমাত্র কালিয়দমন খণ্ডেই তাহার বীরত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলার পর্যায় রক্ষায় কবি ভাগবতাদিকে অনুসরণ করেন নাই। ভাগবতে কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা—এইভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডে রাস, তৎপরে যমুনাখণ্ডান্তর্গত কালিয়দমন এবং ঐ খণ্ডের শেষে বস্ত্রহরণপর্ব বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবি কৃষ্ণলীলা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাগবতে বর্ণিত ক্রমের বৈশিষ্ট্য সর্বত্র রক্ষা করেন নাই। আরও লক্ষ্য করা যাইবে যে, ইহাতে পুরাণোক্ত লীলা-বর্ণনা অপেক্ষা সম্ভবতঃ গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভাগবতে বা বিষ্ণুপুরাণে রাধাচরিত্র নাই, কৃষ্ণ-গোপীলীলা প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণিত হইলেও কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপ্রকাশক অন্য লীলাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাই প্রধান, অতএব কাহিনীটি সেইভাবে গ্রন্থিত হইয়াছে। তাম্বূলখণ্ডে কৃষ্ণের রাধাসঙ্গলাভের প্রস্তাব ও 'আইহনের রাণী' রাধাচন্দ্রাবলী কর্তৃক তাহা সব্যঙ্গে পরিহার, দানখণ্ডে কৃষ্ণের দানী সাজিয়া রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ, নৌকাখণ্ডে যমুনা-পার করাইবার সময় নৌকা ডুবাইয়া রাধাসঙ্গলাভ, ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণকে লোভ দেখাইয়া 'মজুরিয়া' সাজাইয়া স্বকার্যে নিয়োগ, যমুনাখণ্ডে

রাধাসহ কৃষ্ণের জলবিহার, হারখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার লুকাইয়া রাখা, তাহার জন্য যশোদার নিকট রাধার অভিযোগ এবং যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণ তর্জিত, প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে পুষ্পবাণে আহত করা, বংশীখণ্ডে রাধা কর্তৃক কৃষ্ণেব বাঁশী চুরি—প্রভৃতি ঘটনা ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ-বহির্ভূত। এই পালাগুলি কবির স্বকপোলকল্পিত কিনা নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে না। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তাঁহাব মৌলিক পবিকল্পনা হইতে পারে বটে, কাবণ সনাতনগোস্বামী তাঁহাব 'বৈষ্ণবতোষণী'তে "শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি"ব উল্লেখ কবিয়াছেন। এই উক্তি হইতে অনুমিত হইতেছে যে, শ্রীচণ্ডীদাসই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডেব পথ প্রদর্শন কবেন। অবশ্য 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'ব একস্থানে[২] কৃষ্ণেব নৌকালীলাব উল্লেখ আছে। আমাদেব অনুমান পৌবাণিক কৃষ্ণলীলাব পাশেই আব একটি গ্রামীণ কৃষ্ণকথা প্রচলিত ছিল, যাহাতে কৃষ্ণকে গ্রাম্য গোপনন্দন ও মাতুলানীব রূপমুগ্ধরূপে চিত্রিত কবা হইযাছে। বড়ুচণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, পৌরাণিক সংস্কৃতির সহিতও তাঁহার নিবিড় পবিচয ছিল, তাঁহার পুবাণজ্ঞানেব নানা পরিচয শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই নিহিত আছে। এই কাব্যে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোক-সংযোজনীগুলি তাঁহার বচিত হউক বা না হউক, তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন না, তাহাব কাব্যকেও গ্রামীণ তথা লৌকিক সাহিত্যেব পর্যায়ভুক্ত কবা যায় না। অথচ তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনাপ্রসঙ্গে পুরাণ-সংস্কৃতিকে নামমাত্র অনুসবণ কবিয়াছেন, কৃষ্ণের ঐশ্বরিক লীলা বর্ণনা করিবাব বাসনা থাকিলে তিনি বিষ্ণুপুবাণ বা ভাগবতকে রেখায় রেখায় অনুসরণ করিতে পাবিতেন। কিন্তু তিনি কৃষ্ণরাধার যে কাহিনী বর্ণনা করিযাছেন, তাহা প্রধানতঃ পুবাণবহির্ভূত। কৃষ্ণকথাব গ্রামীণ চিত্রই তাঁহার কাব্যের আদর্শ; অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণেব পাশে পাশে যে লোকায়ত রাধাকৃষ্ণকাহিনী প্রচলিত ছিল, প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যে যাহাব পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওযা যায়, —কাহিনীনির্বাচনে বড়ুচণ্ডীদাস তাহাই অনুসবণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার উপব বলপ্রকাশ করিয়া 'এগাব বরিষেব' বালিকাব দেহ মন্থন কবেন, কখনও বা

২ অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুই এথনই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি॥

অনুঃ ওরে রে কৃষ্ণ, (তুমি) নৌকা বাহিতেছ, ডগমগ (অর্থাৎ নৌকার টলমলানি) ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করিয়া দিয়া যা চাও তা লও। (ডাঃ সুকুমার সেন অনূদিত—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম)

অনিচ্ছুক রাধাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখান, কখনও-বা মাতুলানীগমনের নীতি সমর্থনে অগম্যাগমন সমর্থন করেন, কখনও রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য বলিয়া দেন এবং কৃষ্ণও রুষ্ট হইয়া রাধাকে বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা করেন, গ্রন্থের শেষে রাধার বিলাপে কিঞ্চিৎ অনুকূল হইযাও কৃষ্ণ অপমানজ্বালা ভুলিতে পারেন না—এসমস্ত পৌরাণিক আদর্শ নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীতে তাই বাহ্যতঃ পৌরাণিক ধারা অনুসৃত হইলেও ইহা মূলতঃ লোকজীবনাদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ অবশ্য সর্বদা আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং 'মুগুধা গোয়ালিনী'কে স্ব-স্বরূপ বুঝাইবার জন্য বল বা ছলের সাহায্য লইয়াছিলেন। তাই তাঁহার ব্যবহারে ও উক্তির মধ্যে ঠিক ভক্তিব আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যাঁহারা এই কাব্যের কাহিনীকে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক এবং কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার উপর বলপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রাম্য বর্বরতাকে ভক্তিরসের গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করিতে চাহেন, অথবা যাঁহারা রাধার কাহিনীকে মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা—অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নায়িকাপ্রকরণের সহিত মিলাইয়া লইতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শকে উত্তর-চৈতন্যযুগের ভাবাদর্শের পটভূমিকায় স্থাপন করিবার প্রয়াসী। আমাদের অনুমান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সংস্কৃতে প্রাজ্ঞ ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হইলেও কাহিনীনির্মাণে গ্রামীণ রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর আদর্শেব দ্বারাই অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতেব অনুবাদে এবং অন্যান্য কৃষ্ণায়ন কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর সহিত দানলীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক লীলা অনুপ্রবেশ করিযাছে। বাঙালীর মনে পৌবাণিক ও অপৌরাণিক—উভযবিধ কৃষ্ণলীলাই বর্তমান ছিল। তাহা না হইলে স্বয়ং মহাপ্রভু দানলীলার অভিনয় করিতে পারিতেন না, অথবা সনাতনগোস্বামীও ভাগবতের টীকায় ভাগবত বহির্ভূত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সপ্রশংস উক্তি করিতেন না। অবশ্য কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তথাকথিত গ্রামীণ আদর্শকে সংস্কৃতগ্রন্থে বর্ণিত আদর্শের সহিত মিলাইয়া লইতে চাহেন। 'প্রেমামৃত' কাব্যে বস্ত্রহরণ, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ডের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। 'রাধাতন্ত্রে' নৌকালীলা ও দানলীলার উল্লেখ আছে, 'হরিবংশে' শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। 'গর্গসংহিতা'য় দানখণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' ভারখণ্ডের বর্ণনা দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। যাহা হউক, বোধহয় এই

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকাল হইতে বাঙলার লোকজীবনে কৃষ্ণলীলার যে অপৌরাণিক আদর্শ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও তাহার অল্পাধিক প্রভাব পড়িয়াছে। বড়ুচণ্ডীদাস এই আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী পরিকল্পনা করিযাছেন।

॥ ২ ॥

চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চরিত্রগুলিও কম বৈচিত্র্যমণ্ডিত নহে, এবং ইহাদের মধ্যে যে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, তাহা লইযাও বহু বাগ্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইযাছে। পূর্বেই বলা হইযাছে যে, কাব্যটি আখ্যানকাব্য হইলেও মূলতঃ নাট্যরসাশ্রয়ী। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিযা নাটকেব চরিত্র বিবর্তিত হয, সর্বোপরি বিভিন্ন প্রবৃত্তিব দ্বন্দ্বসংঘাত নাটকীয চরিত্রকে নব নব পবিবর্তনের মধ্য দিয়া চূড়ান্ত পরিণতির অভিমুখে লইয়া যায়। এই কাব্যেব প্রধান চবিত্র তিনটি—বাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। অপ্রধান চরিত্র—যশোদা, বলভদ্র, আইহনের মাতা এবং আইহন। এই অপ্রধান চরিত্র কযটি চকিতের মতো কাহিনীর অনুরোধে ঘটনাসংবর্তে আবির্ভূত হইযাছে এবং ঘটনাব অবসানে অপসৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে আইহন ঘটনাসংস্থানে অনুপস্থিত থাকিয়াও কাহিনীর প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। কালিয়দমন অংশে কৃষ্ণ কালিয নাগের বিষে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইলে বলভদ্র তাঁহার স্বরূপ শুনাইয়া তাঁহার চেতনা জাগ্রত করিযাছেন। হাবখণ্ডে যশোদার নিকট রাধা কৃষ্ণের হার অপহরণ ও অন্যান্য কুকীর্তি বলিযা দেওয়ায় কৃষ্ণ বাধার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুষ্পবাণে আঘাত করেন। এই খণ্ডে এবং কালিয়দমন অংশে যশোদা প্রত্যক্ষতঃ উপস্থিত ছিলেন। ভারখণ্ডে রাধার শাশুড়ীর প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে মাত্র। ভারখণ্ডে বড়াইয়ের কৌশলে রাধার শাশুড়ী রাধাকে মথুরানগরে দধিদুগ্ধ বিক্রয়ে যাইতে বলেন। কাহিনীর সহিত তাঁহার শুধু এইটুকু যোগ।

রাধা ॥ রাধাচরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় লইলে তাঁহাকে সত্যই একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বলিয়া বুঝা যাইবে। রাধাপরিকল্পনা বড়ুর প্রধান কৃতিত্ব। এই

চরিত্রটি লইয়াও বিশেষ বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। রাধা যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তাহা তিনি মর্ত্যজীবনে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মাঝে মাঝে বলপ্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের মাতুলানী নপুংসক আইহনের পত্নী রাধা-চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের কামাচারকে ঘৃণা-পূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কামপ্রস্তাবের দূতী বৃদ্ধা বড়াইকেও যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু 'এগার বরিষের' গোপবালিকা পথিমধ্যে একাকিনী কৃষ্ণের হস্তে পড়িয়া চরম নিগ্রহ ভোগ করিলেন এবং বাধ্য হইয়া কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়াও তাঁহার মধ্যে অমর্ত্যচেতনার কিছুমাত্র জাগরণ হয় নাই; তিনি অবশ্য বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি অনুকূল হইয়া বলিয়াছেন,—

> তোহ্মার আহ্মার দুই মণে।
> এক করী গাঢ়িল মদনে ॥
>
> *　　*　　*
>
> বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
> একই পরাণ এক দেহে ॥

বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছেন, "আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী।" 'রাধাবিরহ' অংশে তিনি কৃষ্ণকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছেন, "আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী"—এবং

> না বোল মোরে নিরাস　　　　একবার নেহ পাশ
> তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।

কিন্তু রাধা যে লক্ষ্মী—একথা কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাধা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—ইহাতে মানবজীবনের আর্তি ও আনন্দ ধ্বনিত হইয়াছে—কোন বৈকুণ্ঠের ঈশ্বরী রাধাচরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

রাধাচরিত্রের প্রথমদিকে "বড়ার বহুয়ারী আহ্মে বড়ুয়ার ঝি"—পতিকুল ও পিতৃকুল সম্বন্ধে প্রচণ্ড দম্ভ ছিল; কৃষ্ণের কামাচারকে তিনি লাম্পট্য বলিয়াই ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দানখণ্ডে কৃষ্ণের পাশব বর্বরতায়

অভিভূত হইয়া তিনি নিশ্চয়ই ভয়ে ও ঘৃণায় কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নৌকাখণ্ডের জলবিহারের পর ধীরে ধীরে রাধা বাম্যভাব পরিত্যাগ করিলেন, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সা জাগ্রত হইল। পরবর্তী খণ্ডসমূহে সেই আসঙ্গ-আসক্তি ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনখণ্ডে তাহা গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে। কালিয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণ কালিয়-বিষে জর্জরিত হইলে 'পরাণপতী' কৃষ্ণের বিপদ স্মরণ করিয়া রাধার বিলাপোক্তি—

ধিকছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালী নাগে।
আহ্ম না দংশিল তোহ্মার আগে॥

রাধার করুণ আর্তিকেই প্রতিধ্বনিত করে। বাণখণ্ডের শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন-উল্লাসের উতরোল বর্ণনায় সেই পরম দেহাসক্তিই স্পষ্টতর হইয়াছে—যাহা কাম ও প্রেমকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

রাধাচরিত্রের প্রাথমিক প্রতিকূলতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গিয়া বংশীখণ্ডে তাহা একান্ত নৈষ্ঠিক আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হইয়াছে। এই কাব্যে রাধা প্রধানতঃ মানবী চরিত্র—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বা কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি নহেন। তাই একান্ত আত্মসমর্পণের সহিত মানবীয় গুণেরও যথেষ্ট সমাবেশ হইয়াছে। তাম্বূলখণ্ড ও দানখণ্ডে রাধার মনে প্রতিকূলতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও রাধার স্বাভাবিক চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কৃষ্ণকে রতির লোভ দেখাইয়া ভার বহাইয়াছেন, ছত্র ধরাইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ না করিয়া পরিহাস করিয়াছেন। কখনও-বা "মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলাযিবোঁ কাহাঞিঁ" বলিয়া কৃষ্ণকে প্রহারের ভয় দেখাইয়াছেন। বলাবাহুল্য এই 'মাগু কিল' রাধার শূন্য মুষ্টির বৃথা আস্ফালন মাত্র, পরিহাসমিশ্রিত তারল্যই ইহার মূল লক্ষ্য। কৃষ্ণ রাধার হার লুকাইয়া রাখিলে রাধা যশোদার নিকট শুধু কৃষ্ণ কর্তৃক হার অপহরণের অভিযোগ করেন নাই, তাঁহার অভিযোগ কিছু গুরুতর। যশোদার নিকট রাধা কৃষ্ণের কু-চরিত্রের কথা বলিয়া দিলেন—

বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে॥

ফলে কৃষ্ণ যশোদা কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া রাধার প্রতি বিষম রুষ্ট হইলেন এবং

বাণখণ্ডে পুষ্পবাণে রাধাকে আঘাত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশীর শব্দে ব্যাকুল হইয়া সেই বাঁশীটি কলসীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; কৃষ্ণ রাধার নিকট অপবাধ স্বীকার করিলে রাধা বাঁশী প্রত্যর্পণ করিয়া কৃষ্ণের দাসী হইলেন। এই পর্যন্ত রাধার মধ্যে মানসিক অনুভূতির বিচিত্র রস ও রহস্য উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণের প্রতি পরম বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে দৈহিক সম্পৃক্তি লাভ করিয়া আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং গোপনন্দিনী বাধা বংশীখণ্ড পর্যন্ত মানবীয় জীবনরসের দ্বারাই চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু 'রাধাবিবহ' অংশে রাধাচরিত্রটি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে পরিকল্পিত হইযাছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধাব যে আর্তি, কৃষ্ণসঙ্গলাভের জন্য বাধার যে বিলাপ তাহা যদিও দেহমুখী, কিন্তু বিবহবেদনার আতপ্ত স্পর্শে মানবী রাধা সহসা মহিমান্বিত লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বহু স্থলেই রাধার বিলাপ চৈতন্যোত্তর যুগের মাথুর বা ভাবসম্মেলনের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়—অবশ্য ভাষার সাদৃশ্য অপেক্ষা ভাবের ঐক্যই অধিকতর সুস্পষ্ট। বাধার চপলতা, পরিহাস, শাণিত ব্যঙ্গেব তীক্ষ্ণতা—সবই 'রাধাবিরহে' আসিযা একান্ত আত্মনিবেদনের অশ্রুভারাতুর আকাঙ্ক্ষায় থরথর করিয়া কম্পিত হইয়াছে। 'রাধাবিবহে' রাধা কৃষ্ণের আসঙ্গ লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আর 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'র উতল উতরোল নাই, দেহের আসক্তি আছে, কিন্তু লালসা নাই। বাণখণ্ডেব রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের সহিত 'বাধাবিরহ' অংশের মিলনলীলা মিলাইয়া পড়িলেই দেখা যাইবে, রাধা যেন দেহকামনা-জর্জর ভোগবতী পার হইযা একটা স্থির অতন্দ্র নৈষ্ঠিক রতি লাভ কবিতে পারিয়াছেন। 'রাধাবিরহে'র রাধা আর 'আইহনের রাণী' নহেন, 'বড়ার বহুআরী', 'বড়ুআর ঝী'-ও নহেন, —তিনি এখন রসিক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত চিরন্তনী নারীমূর্তি। পরবর্তী কালে যে রাধা ভক্তিরসের 'ভবনবলভী প্রৌঢ়-পারাবতী', বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চিত্রিত 'রাধাবিরহে'র রাধা তাহার নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ বাখিতে হইবে যে, 'রাধা-বিরহে' রাধা যে বিষ্ণুর লক্ষ্মী—এই বোধ তাঁহার মনে প্রত্যক্ষতঃ জাগ্রত হয় নাই। যে মুহূর্তে রাধা আপন স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন, সেই মুহূর্তে ইহার কাব্যমূল্য হ্রাস পাইত। রাধার বিলাপ তাহা হইলে এমন করিয়া আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিত না।

কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, 'রাধাবিরহ' আদৌ বড়ুর রচনা

কিনা সন্দেহ আছে। কারণ তাম্বুলখণ্ড হইতে বংশীখণ্ড পর্যন্ত রাধাচরিত্রের যে বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়, তাহাতে মানবধর্মেরই প্রাধান্য রহিয়াছে। কিন্তু 'রাধাবিরহে' রাধা যেন জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন। অবশ্য 'রাধাবিরহ' অংশটুকু যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত এবং বড়ুচণ্ডীদাসেরই রচনা, তাহার প্রধান প্রমাণ রাধা নহেন, কৃষ্ণচরিত্র। কৃষ্ণের আদ্যন্ত যে সঙ্গতি ও বৈশিষ্ট্য-ধারা লক্ষ্য করা যায়, 'রাধাবিরহে'ও তাহাব ব্যতিক্রম হয নাই। দাম্ভিকতা, ঐশ্বর্য সম্বন্ধে আত্মঘোষণা, রাধাকে তীব্র ব্যঙ্গ, ভয়প্রদর্শন, সহানুভূতিহীন নির্মমতা ইত্যাদি যাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রেব বৈশিষ্ট্য, তাহা 'রাধাবিরহে' বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রেও অবিকল অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং 'রাধাবিবহ' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত এবং বড়ুচণ্ডীদাসেরই রচনা।

কৃষ্ণ ॥ কোন কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে বক্রোক্তি কবিযা বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ নাই, কীর্তনও নাই। কেহ-বা রাধাচরিত্রকে সহ্য করিতে পাবিলেও কৃষ্ণচরিত্রকে তীব্র ভাষায আক্রমণ করিযাছেন। কেহ কৃষ্ণকে মহাকাব্যের ধীরোদাত্ত নাযক বলিযা উচ্চ প্রশংসা কবিযাছেন। এ পযন্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপব যত নিন্দাবাদ বর্ষিত হইযাছে, তাহাব প্রধান লক্ষ্যস্থল—কৃষ্ণ। [ভক্ত ও রসিক পাঠক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের মধ্যে বড জোর দেহেমনে স্বাস্থ্যবান্ গোপপল্লীর একটি দুর্ললিত কিশোবকে দেখিতে পাইবেন। কেহ বা কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার উপর বলপ্রকাশেব 'জুগুপ্সিত' ব্যাপারকে ভক্তের প্রতি ভগবানের আকর্ষণের রূপক বলিয়া পুলকিত হইতেও পারেন।] কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রামাণিক এবং মূল্যবান্ সাহিত্যগুণান্বিত কাব্য বলিযা মনে কবেন, তিনিও কৃষ্ণচরিত্রপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইযা পডিবেন।

কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, [বড়ুচণ্ডীদাস প্রধানতঃ পুরাণের পটভূমিকায় কৃষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা করিলেও ইহাতে পৌবাণিক এবং লৌকিকভাব এমনভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা যায় না। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, ভূভাব হরণের নিমিত্ত শ্রীহরি মর্ত্যলোকে কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন—বড়ুচণ্ডীদাসও এইভাবে কাহিনীর উপস্থাপনা করিয়াছেন। কাব্যের সর্বত্র কৃষ্ণ নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত; তিনি মূঢা গোপবালিকা রাধারূপিণী লক্ষ্মীকে পুনঃ পুনঃ বৈকুণ্ঠের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রাধা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণানুরাগিণী হইলেও তিনি যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তখনও এ বোধ তাঁহার জাগে নাই। তিনি মানবীয় আর্তি-বশতঃই কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বড়াই এবং আর সকলে, বিশেষতঃ বলভদ্র কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে অ'হিত ছিলেন।] তাই কালিয়দমন অংশে কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইলে বলভদ্র তাঁহার চরিত্র-কথা শুনাইয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট নিজ স্বরূপ ঘোষণার জন্য বিষ্ণুর অবতারতত্ত্বকে একাধিকবার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাঁহার বাল্যকালে অনুষ্ঠিত নানা দৈবীলীলার বর্ণনাও বাদ দেন নাই। অবশ্য স্বরূপবিস্মৃত রাধা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই, বরং গোপসুতের ছলনা মনে করিয়া তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিযাছেন। কবির প্রধান উদ্দেশ্য কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাব পূর্বস্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং বৈকুণ্ঠেশ্বর কর্তৃক বৈকুণ্ঠেশ্বরীর প্রেমলাভ। তাই কাব্যের আদ্যন্ত কৃষ্ণকে অবতাবরূপে অঙ্কনের চেষ্টা করা হইযাছে। [কবি যদিও কোথাও কৃষ্ণের চরণে নিজ প্রাণের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন নাই, তথাপি তিনি পুরাণাদি ও 'গীতগোবিন্দে'র প্রভাবে কৃষ্ণকে পুবাপুরি অবতার রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন।]

এই চরিত্রচিত্রণ কি পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহা এখন বিচার করিযা দেখা প্রয়োজন। [কেহ কেহ কৃষ্ণের আচার-আচরণের মধ্যে বাস্তবানুগামিতার প্রাধান্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবিগণ যে বিশিষ্ট ধর্মীয় বাতায়নের তলে বসিয়া কাব্য রচনা করিতেন, সেখানে কিছু কিছু দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছায়া ~~পড়িলেও বাস্তবানুগামিতার~~ সজ্ঞান প্রচেষ্টার অবকাশ ছিল না; সুতরাং এই কাব্যবিচারে বাস্তবরসের সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।] বড়ুচণ্ডীদাস রাধার সহিত অবতার কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণচরিত্র সেই দিক দিয়া সার্থক হইয়াছে কিনা দেখা যাক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণচরিত্রে আদ্যন্ত যে অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা একপ্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং এইজন্যই অনেকে বড়ুচণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি স্বীকার করিযাও কৃষ্ণচরিত্রের জন্য কবির প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণ রাধাকে স্ব-সম্বিতে আত্মস্থ করিতে গিয়া তাঁহার দেহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে রাধার প্রতিকূল মনোভাব, ভীতি ও সঙ্কোচ লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং পরিশেষে তিনি অনুকূল নায়িকায় পর্যবসিত

হইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের সেরূপ কোন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না—বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের কোনওপ্রকার বিকাশই নাই। [‘জন্মখণ্ড’ হইতে ‘রাধাবিরহ’ পর্যন্ত তাহা একসুরে বাঁধা। কৃষ্ণ তাম্বূলখণ্ডে বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়াই কামাবেগ বোধ করিলেন। কোনরূপ মানবিক অনুভূতি নহে, দৈবী প্রেম তো নহেই—নিছক দেহভোগের সুতীব্র রিরংসাপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইল।] রাধার দেহসম্ভোগ ব্যতীত তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহ, করুণা, প্রেম প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ ঘটিবার অবকাশই নাই। ছলেবলে, ভীতিপ্রদর্শন করিয়া পরদারগমনের শাস্ত্রীয় নজির তুলিয়া কৃষ্ণ সমগ্র কাব্য ব্যাপিয়া যে ভূমিকা অভিনয় করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ রসাভাস ঘটিয়াছে। ‘রসাভাস’ বলিতে আমরা আলঙ্কারিক অর্থ নির্দেশ করিতেছি না। যেখানে কাব্যপ্রতীতি ও শিল্পবোধ ক্ষুণ্ণ হয়, শিল্পকর্মগত সেইজাতীয় ত্রুটিকে আমরা সাধারণভাবে রসাভাস বলিতেছি। [রাধার প্রতি কৃষ্ণের কোনরূপ মানবিক চেতনা জাগ্রত হয় নাই বলিয়া কৃষ্ণচরিত্রে একটা বিষম অসঙ্গতি সৃষ্টি করে। রাধা আত্ম-সমর্পণ করিলেও কৃষ্ণ ‘জন্মখণ্ড’ এবং ‘রাধাবিরহে’র একস্থল ব্যতীত অন্য কোথাও রাধার নিকট মানবিক প্রেমে ধরা দেন নাই। ‘রাধাবিরহে’ রাধার বিলাপে এবং বড়ায়ির অনুরোধে কৃষ্ণ যেন অনিচ্ছাসহকারে রাধার কামনা পূরণ করিয়াছেন। রাধা শ্রমান্তে কৃষ্ণের ঊরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইলে কৃষ্ণ সেই অবকাশে মথুরায় প্রস্থান করিলেন।] যাইবার সময়ে বড়াইকে বলিয়া গেলেন—

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি
কৈলোঁ মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলো শুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞাঁ তোর করে।
তাক রাখিহ যতনে আপন আন্তরে ॥

এই স্থলে বড়ায়ির নিকট রাধাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবার অনুরোধ করায় কৃষ্ণের অন্তরশায়ী স্নেহের সামান্যতম স্পর্শ পাওয়া যায়। বাণখণ্ডে যখন কৃষ্ণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধাকে পুষ্পবাণে মূর্চ্ছিত করিলেন, তখনও তিনি রাধাকে মৃত মনে করিয়া বিলাপ করিয়াছেন; সেই স্থলে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত কৃষ্ণের বিলাপের মধ্যে কিছু আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। এইটুকু বাদ দিলে সমগ্র কাব্যের কোথাও রাধার প্রতি কৃষ্ণের আর্তি নাই, প্রেম নাই, স্নেহ নাই, করুণা নাই—কোনরূপ কোমলতর প্রবৃত্তির চিহ্ন মাত্র নাই।

এগার বৎসরের বালিকার দেহ মন্থন করিয়া অমৃতলাভের বর্বরতা এবং মাতুলানী রাধাকে 'শ্যালী' সম্বোধন আর যাহা হউক, কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয় নাই। বিদ্যাপতির পদেও প্রথম মিলনে রাধার অন্তরে একটা সাধ্বস ভীতি-মিশ্রিত কৌতূহল জাগিয়াছিল, কিন্তু সেখানে এরূপ বিডম্বনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের অন্যান্য খণ্ডে কৃষ্ণ নানা ছলে এবং বলপ্রকাশের ভয় দেখাইয়া রাধিকার সহিত একাধিকবার সঙ্গত হইয়াছেন, কিন্তু এই আচরণের পশ্চাতে দেহলোলুপ কামপিপাসা ব্যতীত কোনরূপ উচ্চতর প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কোন কোন স্থলে কৃষ্ণ রাধার প্রতি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, কোথাও 'মারিয়া ফেলিব' বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। 'বাণখণ্ডে'র পূর্বে যমুনখণ্ডান্তর্গত 'হারখণ্ডে' কৃষ্ণ রাধার হার লুকাইয়া রাখেন। নিরুপায় রাধা যশোদাকে কৃষ্ণের কুকীর্তি বলিয়া দিলে মাতা পুত্রকে ভৎর্সনা করেন। ইহার ফলে কৃষ্ণ রাধার প্রতি অতিশয় রুষ্ট হন এবং পথে একাকী পাইয়া পুষ্পবাণে রাধাকে আহত ও মূর্চ্ছিত করেন। পুষ্পবাণের আঘাত কাম-জাগরণের জন্য নহে, শুধু প্রতিশোধ-গ্রহণের নির্মমতাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ বড়াইকে বলিলেন,

বড়ায়ি ল।
আহ্মার করিল রাধা বড়ায়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ।

এবং

অতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞি
রাধা মারিবার আশে ॥

রাধার কাকুতিমিনতি উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণ 'রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান'। ইহা নিছক কৌতুক নহে, মাতার নিকট অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ-গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই কৃষ্ণের মনে রাধাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছে। কৃষ্ণকে রতিদানের লোভ দেখাইয়া রাধা তাঁহাকে মজুরিয়ার ন্যায় ভার বহাইয়াছেন, ছত্র ধরাইয়াছেন। রাধা না হয় কৌতুকপ্রবণতা বশতঃ প্রিয়জনকে কিঞ্চিৎ বিডম্বিত করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণের চরিত্রমাহাত্ম্য যে ইহাতে বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা স্বীকার্য। বালককে যেমন মোদকখণ্ডের লোভ দেখাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া হয়, কৃষ্ণ যেন সেইরূপ

বালোচিত মূঢতার পরিচয় দিয়াছেন।' বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী লুকাইয়া রাখিলে কৃষ্ণ দুঃখে 'হাপুসনয়নে' কাঁদিতে লাগিলেন—অনেকটা ক্রীড়াপুত্তলী হারাইয়া শিশুর ক্রন্দনের মতো! তিনি রাধাকে বহু স্থলে ইতর জনোচিত ভাষায় গালিগালাজ করিয়াছেন। কখনও 'শ্যালী' কখনও 'নটকী গোয়ালী ছিনারী পামরী' বলিয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিযাছেন এবং সরোষে ভয দেখাইয়া বলিয়াছেন,

যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনি পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে॥

শেষে বাঁশীর কোন সন্ধান না পাইযা,

মেঘ যেহ্ন আষাঢ শ্রাবণে।
ঝরে তার পানী নয়নে গো॥

কৃষ্ণের এই মলিন শ্রীহীন রূপ ভগবৎসত্তার বিরোধী। কৃষ্ণের একমাত্র মৌখিক আস্ফালন এবং কালিযাদমন ভিন্ন আর কোথায় প্রত্যক্ষতঃ শৌর্যবীর্য দেখাইবার অবকাশ ছিল না। অবশ্য তিনি নারীসমাজে প্রাযশঃই নিজ বীরত্ব ঘোষণা করিযা বলিযাছেন,

ছাওয়াল না দেখ মোরেঁ মাথে বেড়া চুলে।
মুণ্ডেঁ মুণ্ডেঁ ডুসাঅাঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে॥

যখন তিনি রাধা ও ষোল শ' সখীদের 'মাগু কিলের' ভয করেন নাই, তখন তাঁহাকে বীর বলিতে হইবে বৈকি!

রাধা যে কৃষ্ণের কামাচার স্বরূপ তাম্বূল ফেলিযা দিযাছিলেন, বড়াইর দূতীয়ালির জন্য ক্ষুব্ধ হইযা তাহাকে চপেটাঘাট করিযাছিলেন, কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ মাতুলানী-গমনের পাপ স্মরণ করাইযা দিযা ভয দেখাইয়াছিলেন, ছত্র ধরাইয়াছিলেন, যশোদাকে কৃষ্ণের হারচুরি ও অন্যান্য কুকীর্তির কথা বলিয়া দিযাছিলেন, কৃষ্ণের বাঁশী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—এ দুঃখ-অপমান কৃষ্ণ কিছুতেই ভুলিতে পারেন নাই। রাধা যথাসময়ে সমস্ত বিরূপতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণ লইলেও কৃষ্ণ কখনও তাঁহাকে সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও সপ্রণয় আবেগের দ্বারা গ্রহণ করেন নাই। সব সময়ে তিনি রাধাকে রূঢ ভর্ৎসনা করিযা বলিয়াছেন যে, একদা যেমন আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়াছিলে, আমার দূতী বড়াইকে অপমান করিয়াছিলে, আমিও সেইরূপ উচিত প্রতিশোধ লইব। 'রাধাবিরহে' যখন রাধা কৃষ্ণাশ্রয় লাভের জন্য

আকুল বিলাপ করিতেছেন, তখনও কৃষ্ণ কুটিল ভাষায় রাধাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন,

এবেসি জানিল ভৈল কলিঅবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার॥
* * *
এবে কেহ্ন গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন॥

পরিশেষে রাধার বিলাপের প্রতি কটূক্তি করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন,

যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।

অতঃপর বড়ায়ির সনির্বন্ধ অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষ্ণ রাধাকে মিলনানন্দ দান করিলেন এবং রাধা নিদ্রিত হইলে সেই অবকাশে তিনি মথুরায় প্রস্থান করিলেন। পরে রাধা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলে বড়াই মথুরায় গিয়া কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরিয়া রাধাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণের সেই এক দাম্ভিক রুষ্ট উক্তি,

শতকী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুনী তারে॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে॥

ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে। হয়তো অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশমতো ইহার পর রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল; কৃষ্ণ তখনও এই দাম্ভিকতা এবং অপমানজনিত রোষ ভুলিতে পারিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না।

কৃষ্ণচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে তাঁহার মধ্যে স্থূল দাম্ভিকতা, দেহলোলুপ রিরংসা এবং প্রতিশোধ-গ্রহণের কুটিল ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন সদ্গুণ বা কোমলতর মানবীয় প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ কাব্য মহাপ্রভু কর্তৃক কদাচ আস্বাদিত হইতে পারিত না। বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রে পূর্ণতা নাই, সঙ্গতি নাই,—কৃষ্ণের আচরণের বিরুদ্ধে রসগ্রাহী পাঠকচিত্তে শুধু একটা বিরক্তিকর বিরূপতা জাগিয়া ওঠে, যাহার ফলে মূল বক্তব্যটি বিপর্যস্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণচরিত্রে মানবিক গুণের অভাবের জন্যই রাধার ক্রমবিকাশ এবং বিরহ বিলাপ প্রায় একতরফা হইয়া গিয়াছে। বড়ু-চণ্ডীদাস এই কাব্যের বহু স্থলে গীতগোবিন্দের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু

কৃষ্ণচরিত্রাঙ্কনে জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদর্শ যে কিছুই রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার কবিত্বশক্তি, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা-সন্নিবেশ ও আলঙ্কারিক কারুকর্মের নিপুণতা বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও কৃষ্ণ-চরিত্রকে তিনি স্বখাতসলিলে নিমজ্জিত করিয়াছেন। পরবর্তী কালে জনরুচি হইতে এই কাব্যের বহিষ্কৃত হইবার প্রধান কারণ, আদিরসাত্মক স্থূলতা নহে—কৃষ্ণচরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একখানি অনন্যসাধারণ কাব্য হইলেও পাঠকচিত্তে তদনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যাঁহারা এ কাব্যের গোবিন্দকে 'গোঁয়ার গোবিন্দ' বলিয়া কবিসৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা নিতান্ত সহজ নহে।

বড়াই ॥ বড়াইচরিত্র-পরিকল্পনায় কবির কৃতিত্ব অবশ্য স্মরণীয়। হয়তো দামোদরগুপ্তের 'কুট্টনীমতম্', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বা জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকরে'র কুট্টনীচরিত্রের আদর্শে তিনি বড়াইচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু বড়াইকে শুধু কুট্টনী বলিয়া এককথায় চরিত্রালোচনা শেষ করা যায় না। তাহার বাহ্যিক আকারপ্রকার কামশাস্ত্রোক্ত দূতী বা কুট্টনীর অনুরূপ হইলেও, সে মানবসম্পর্কবর্জিত নহে, এবং সমগ্র কাব্যে তাহার মানবিক রূপটি আমাদিগকে অধিকতর মুগ্ধ করে। বড়াই রাধিকার মাতার পিসী, সুতরাং সে রাধার বড় আয়ি (বৃদ্ধা আর্যিকা?) বা মাতামহী, রাধা মথুরায় দধিদুগ্ধ বিক্রয় করিতে যান, তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য রাধার শাশুড়ী রাধার মাতার নিকট গিয়া তাহাকে চাহিয়া আনিল। বড়াই প্রতিদিন রাধা এবং অন্যান্য গোপীদিগকে সঙ্গে করিয়া মথুরার হাটে লইয়া যাইত। কৃষ্ণও তাহার দৌহিত্রস্থানীয়। কাজেই কৃষ্ণের কামাচারসূচক তাম্বূলপুষ্প আনিয়া রাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিল। রুষ্টা রাধা তাহাকে চপেটাঘাত করিলে সে ক্ষুব্ধ হইয়া কৃষ্ণের কাছে গিয়া সব কথা সবিস্তারে বিজ্ঞাপিত করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে বলিল। দানখণ্ডে তাহারই ষড়যন্ত্রে রাধা কৃষ্ণের কবলে পড়িয়াছেন। নৌকাখণ্ডেও বড়াইয়ের সুকৌশলে রাধাকে কৃষ্ণের কবলী-ভূত করিয়া দিয়াছে, বাণখণ্ডেও সে কৃষ্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাধাকে পুষ্পবাণে আহত করিতে উপদেশ দিয়াছে। বস্তুতঃ তাম্বূলখণ্ড হইতে বাণখণ্ডের প্রথমাংশ

পর্যন্ত বড়াই বরাবর কৃষ্ণের পক্ষ লইয়া রাধার সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছে, রাধার নিকট অপমানিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ-কামনায় কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়াছে। কিন্তু বাণখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের পুষ্পবাণে আহত হইলে বড়াইয়ের সহসা রূপান্তর হইয়াছে। সে-ই কৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তার পরে কৃষ্ণের অনুনয়বিনয়ে বন্ধন খুলিয়া দিয়াছে এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়া 'অতি দূরে গিআঁ রহিলা বড়ায়ি'। পরবর্তী বংশীখণ্ডে ও 'রাধাবিরহে' বড়াই প্রধানতঃ রাধার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণের বাঁশী অপহরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছে। কৃষ্ণ রাধার প্রতি বিশেষ অনুকূলতা প্রদর্শন না করিলেও শুধু বড়াইয়ের অনুরোধে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন। রাধার দুঃখে দুঃখিত হইযা বড়াই কৃষ্ণকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছে। বলিতে গেলে রাধা ও কৃষ্ণের ঘটনা বড়াইয়ের সাহায্য না পাইলে অগ্রসর হইতেই পারিত না। ইহার নাটকীয় অংশটুকু বড়াইয়ের দ্বারা সমাধা হইযাছে। এই 'বড়াইবুড়ী'র আদর্শ পরবর্তী কালেও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। যদিও রূপগোস্বামী তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধবে' 'পৌর্ণমাসী' চরিত্রাঙ্কন করিয়া প্রাকৃত বড়াইকে সংস্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি বাঙলার পদাবলী ও অন্যান্য লৌকিক কৃষ্ণায়নকাব্যে বড়াইচরিত্রটি দীর্ঘকাল অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতেও কৃষ্ণযাত্রাতে বড়াই-চরিত্র না থাকিলে চলিত না। নিছক দূতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেও সে প্রধানতঃ স্নেহের সম্পর্কেই রাধাকৃষ্ণের মিলন করাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ইহার পশ্চাদ্‌পটে কোন অসামাজিক দুর্নীতি নাই, কারণ বড়াই কৃষ্ণের ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিল। তাম্বূলখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের তাম্বূল ফেলিয়া দিলে সে কৃষ্ণের বিরাট স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে।

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিলে হএ মুকতী।
সে দেবসনে নেহা বাঢাইলে
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥

কিন্তু রাধা যে কৃষ্ণের লক্ষ্মী, তাহা বড়াই তখনও জানিতে পারে নাই। শুধু স্নেহের দাবিতেই সে কৃষ্ণকে রাধার সহিত মিলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং তাহাকে বাহ্যতঃ কামশাস্ত্রোক্ত দূতীর অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও, ঠিক পরিপূর্ণ দূতী সে নহে; রাধা ও কৃষ্ণ—উভয়ের সহিত তাহার আত্মীয়তা,

উভয়েরই প্রতি তাহার প্রীতি। তাম্বূলখণ্ডে রাধার চপেটাঘাতে সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃষ্ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে, ঠিক তেমনই বাণখণ্ডে কৃষ্ণের কামশরাঘাতে রাধা অচৈতন্য হইলে সে কৃষ্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছে এবং দামোদরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কৃষ্ণ রাধাকে চেতনা দান করিবার অঙ্গীকার করিলে তবে সে শ্রীগোবিন্দের বন্ধনমোচন করিয়াছে। (রাধা-কৃষ্ণের প্রথম প্রেমের আবির্ভাবকে সে 'ঠানদিদি' সুলভ পরিহাস করিয়াছে এবং স্নেহের বশেই অসামাজিক প্রেমকেও স্বীকৃতি দিয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণের বিরাট স্বরূপ সম্বন্ধে সে পরিপূর্ণভাবেই অবহিত ছিল। কাজেই তাহাকে ভারতচন্দ্রের হীরার সহিত তুলনা করা চলে না।)

(বড়ুচণ্ডীদাস এই কাব্যে চরিত্রপরিকল্পনায় যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন পরবর্তী কালে তাহার আদর্শ প্রায়শঃই অনুসৃত হয় নাই। চৈতন্য-দেবের প্রভাবে কৃষ্ণ ও রাধাচন্দ্রাবলীর চরিত্র প্রায় আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণায়ন কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বড়াইয়ের উল্লেখ আছে এবং ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত লোকসাহিত্যে বড়াইচরিত্র থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াইয়ের সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোপ পাইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়াই সগর্বে বলিয়াছে, "আযোড যোডন আহ্মে করিবাক পারী")। পরবর্তী কালে যাত্রাভিনয় ও পাঁচালীতে প্রথাপালনের জন্যই বড়াইয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার কারণ পরবর্তী পদসাহিত্যে রাধার প্রেম ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে নাই, নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া রাধার প্রতিকূল বাম্য অনুকূল আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হয় নাই। পদাবলীসাহিত্যের শ্রীরাধা প্রেমসরোবরের কমলিনী, কৃষ্ণবল্লভা, হ্লাদৈকময়ী—জন্ম হইতেই কৃষ্ণগতপ্রাণা। অপর দিকে বড়ুচণ্ডী-দাসের রাধা পূর্ণগঠিত চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার একটা পরিবর্তনগত বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পদাবলীসাহিত্যের রাধা চরিত্র নহেন, একটা বিশেষভাবের প্রতীক। সেই বিশেষভাব হইল মহাভাব, দেহকামনা-মন্থনলব্ধ বৈদেহী আত্মার রসবিলাস। সে যাহা হউক, বড়ুচণ্ডীদাস এই চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু কিছু 'মোটা হাতে'র পরিচয় দিলেও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির তুলনায় তাঁহার অভিনব চরিত্রগুলি কোন দিক দিয়াই প্রাণরসে অনুজ্জ্বল নহে। (গ্রামীণ জীবনের স্থূল পরিবেশে হয়তো কোন কোন চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে 'নাগর'-ভাব বর্জিত এবং ঈষৎ অশিষ্ট, তথাপি তাহারা যে ভাববৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকা

নহে, পরন্তু বিশেষ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শিল্পমূর্তি—বড়ুচণ্ডীদাসের ইহাই প্রশংসনীয় কৃতিত্ব ।।

॥ ৩ ॥

কাব্যস্বরূপ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইলে ইহার জাতিকুল নির্ণয় আবশ্যক। ইহা যে গীতগোবিন্দের অনুরূপ গীতি ও সংলাপবহুল নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত রচনা তাহা সকলে স্বীকার করিয়াছেন। সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণ রত্নকোষে, "ত্রিভিঃ পাত্রৈঃ প্রযোক্তব্যা"[১০], তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনেতব্য 'বীথী' নামক যে নাটকের উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহ্যলক্ষণ অনেকটা সেই প্রকার। রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—ইহাদের সংলাপগুলি (সুরে তালে গেয়) কাব্যের কাহিনীকে সংহত আকার দিয়াছে এবং সংলাপের মারফতেই ইহার নাট্যরস জমিয়া উঠিযাছে। কবিকে প্রায় কোথাও সাক্ষাৎভাবে নায়ক-নায়িকার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় নাই। কেহ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'জাগের গান'[১১], কেহ-বা বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত 'ঝুমুর গানে'র[১২] সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের আঙ্গিকের সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক লঘু সুরের আদিরসাত্মক 'ধামালি' গান প্রচলিত আছে। এই ধামালি সারারাত্রি জাগিয়া গীত হয় বলিয়া ইহাকে 'জাগের গান' বলে। এই পালাগানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'খণ্ড' আখ্যাত অধ্যায়গুলির অনুরূপ। 'জাগের গানে'র কয়েকটি পালা : 'রাধার শাক তোলা পালা', 'কৃষ্ণের মাছ ধরা পালা', 'বড়শীর সাহায্যে কৃষ্ণের মাছ ধরা পালা' 'রাসের পালা' ইত্যাদি। ইহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিভিন্ন 'খণ্ডে'র আংশিক সাদৃশ্য আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এক একটি খণ্ড এইভাবে একদা পশ্চিমবঙ্গে গীত হইত। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ঠিক ধামালির অন্তর্ভুক্ত করিয়া 'জাগের গানে'র সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, রাঢ়ে 'ঝুমুর', আসামে 'কুশল' এবং উত্তরবঙ্গের

১০ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম), দ্বিতীয় সংস্করণ

১১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৯

১২ ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৬৩

'জাগের গানে'র সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনা দেওয়া হইলেও 'ঝুমুরে'র সহিত ইহার আত্মীয়তা সুস্পষ্ট।[১৩] দামোদরগুপ্ত ঝুমুরের সংজ্ঞা দিয়াছেন—

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদু
একৈব ঝুমরীর্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্‌ঝিতা ॥

ঝুমরি বা ঝুমুরগানে প্রায় শৃঙ্গাররসের বাহুল্য থাকিবে; তাহা মধুজাত সুরার ন্যায় মধুর এবং মৃদু হইবে; তাহাতে বর্ণাদি অর্থাৎ ছন্দাদির বাঁধা নিয়ম থাকিবে না।

ঝুমুরগানের চারিটি অঙ্গ: (১) সখীসংবাদ বা ব্রজলীলা, (২) আগম বা ভবানীবিষয়ক, (৩) লহর বা শ্লেষব্যঙ্গ এবং (৪) খেউড় বা আদিরসাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তিসহ গীতাদি। কোন কোন অঞ্চলে খেউড় অংশ আরও তীব্র হইয়া 'কাঁচা খেউড়' এই অপনাম গ্রহণ করিয়াছে। ঝুমুর হইতেই কবিগানের উৎপত্তি, একথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ঝুমুর ও কবিগানের লক্ষণটি মোটামুটি একই প্রকার। ঝুমুরই ঈষৎ পরবর্তী কালে নাগরিক জীবনে কবি-গানের রূপ গ্রহণ করে। ঝুমুরগান গীতিবহুল লোকনাট্য-শ্রেণীর সাহিত্য। ঝুমুরে গায়কদল দুই বা ততোধিক দলে বিভক্ত হইয়া গিয়া এক-একজন এক-একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সুরে-তালে 'কাটান জবাব' ও 'চাপান উতোর' দিতে থাকে। কবিগানের সহিত ইহার এই দিক দিয়া বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অর্জুন-দুর্যোধন, রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ—এই ভাবে ঝুমুরদল পরস্পরে বিভক্ত হইয়া একে অপরের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া সংলাপময় গান আরম্ভ করে। অর্থাৎ একদল অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করে, অপর দল দুর্যোধনের পক্ষ লয় এবং পরস্পরে বাচনিক যুদ্ধে মত্ত হয়। দুইটি পৃথক দল না জুটিলে একটি দলই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরে উক্তি প্রত্যুক্তিময় গীতবাদ্যাদি আরম্ভ করে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝুমুরের বিশেষ লক্ষণ আছে। ইহাও শৃঙ্গাররসবহুল; যদিও কাব্যটি মূলতঃ পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং ইহাকে ঠিক 'বর্ণাদিনিয়মোজ্‌ঝিতা' অর্থাৎ ছন্দবন্ধনহীন বলা যায় না, তবু রচনার কোন কোন স্থলে ঝুমুর ধরণের শিথিল ও চটুল বাগ্‌বিন্যাস লক্ষ্য করা যাইবে। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বলিলেন যে, রাধা যদি অঙ্গের বসনভূষণ জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে কিছু ভার কমিবে এবং নৌকাও রক্ষা পাইবে। রাধা কৃষ্ণের নির্দেশমত বসনভূষণ পরিত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ

১৩ সা-প-প, ১৩৩৯

মহোৎসাহে নৌকা বাহিবার উপক্রম কবিলে কবি উৎসাহসূচক ধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন—

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।
হেহে লহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন বাহে নাএ
হেহে লহে লহে ॥

এইজাতীয় বাচনভঙ্গিমা ঝুমুবগানেব গ্রাম্য আদর্শকেই স্মবণ কবাইয়া দেয়। এই কাব্যে এমন অনেক ছত্র আছে যাহাতে ছন্দস্পন্দন (rhythm) থাকিলেও ছন্দেব বিশেষ কোন প্রকবণ (pattern) অনুসৃত হয নাই। রাধাচন্দ্রাবলী, কৃষ্ণ ও বডাইয়েব যাবতীয উক্তি ঝুমুবসঙ্গীতেব মত নাটকীয ভাবধারার অনুকূল, কখনও কখনও রাধা ও কৃষ্ণেব উক্তিতে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং স্থূল গ্রাম্য ইঙ্গিত লক্ষ্য কবা যায। এই প্রকাব শাণিত উক্তি এবং গ্রাম্য স্থূলতা— যাহা কিযদংশে অসংস্কৃত অনাগবিক রুচিব ধাব ঘেঁসিয়া গিযাছে, তাহা ঝুমুর-গানের ধাবায পবিপুষ্ট হইযাছে। ইহা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, একদা পশ্চিম ও উত্তব বাঙলাব গ্রামাঞ্চলে যে নাট্যবসবহুল ঝুমুবসঙ্গীত প্রচলিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব বাহ্যগঠন কতকটা তাহারই অনুরূপ। বোধহয ঝুমুব-পালাব গায়কদেব কোন দল রাধা, কেহ-বা কৃষ্ণ অথবা বডাইযেব ভূমিকা গ্রহণ কবিযা বড়ুব রচনাটিকে গীতে রূপায়িত কবিত। কাবণ প্রায় প্রত্যেক পদের শিরোদেশে নানাবিধ রাগবাগিণী ও তালেব উল্লেখ আছে। উপবন্তু অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পুঁথিশালা হইতে যে দুইখানি পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ১০টি গান আবিষ্কাব কবিযাছেন, তাহাও মৃদঙ্গের তাল শিখিবাব পুঁথি। সুতবাং একদা এই কাব্য গীতবাদ্যরসিকের নিকট আদরণীয় ছিল বলিযা অনুমিত হইতেছে। চৈতন্যোত্তর যুগে যখন বৈষ্ণবরসের নূতন ধারা প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভিন্নতব আদর্শ লোকরুচি হইতে অপসৃত হইলেও ঝুমুব ও অন্যান্য ধরণের লোকসঙ্গীতের মধ্যে দীর্ঘকাল বাঁচিযাছিল।

কিন্তু ঝুমুর, জাগেব গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীতেব আদর্শে ইহার পবিপূর্ণ সংজ্ঞানির্ণয় সম্ভব কি-না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কারণ ঝুমুরসঙ্গীতে সাধারণতঃ লোকসঙ্গীতেবই প্রাধান্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উচ্চ শ্রেণীর রাগ-রাগিণীর আদর্শ রহিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র ঝুমুরের আদর্শেই ইহা

বিচার্য নহে। ইহা গীত হইত সন্দেহ নাই,—প্রাচীন বাঙলার অধিকাংশ কাব্যই গীত হইত। কিন্তু দুই বা তিন দলে বিভক্ত হইয়া 'নাটগীতে'র মতো ইহা যুগপৎ গীত ও অভিনীত হইত কিনা সন্দেহ। কারণ দেখা গিয়াছে যে, কবি দুই জনের উক্তির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। এই সংস্কৃত উক্তিগুলি কবির নিজস্ব জবানি। কাহিনীর পৌর্বাপর্য বজায় রাখিবার জন্য পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া তিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলির সাহায্য লইয়াছেন। ইহা ঝুমুরশ্রেণীর কাব্য হইলে শুধু সংলাপই থাকিত, মাঝে মাঝে কবি নিজে ঘটনাসূত্র স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন না, বা সংস্কৃত শ্লোকের সাহায্যে কাহিনীর ক্রমগতি রক্ষা করিতেন না। সুতরাং স্থানে স্থানে ঝুমরগানের প্রভাব থাকিলেও ইহাকে পুরাপুরি ঝুমুরশ্রেণীর লোকসঙ্গীত বলা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রধানতঃ আখ্যানকাব্য, অবশ্য ইহাতে নাট্যরসের প্রচুর উপাদান আছে। গীতগোবিন্দে প্রচুর নাট্যলক্ষণ থাকিলেও যেমন তাহাকে আখ্যানমূলক খণ্ডকাব্য ব্যতীত অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাট্যরসাশ্রয়ী নানা ঘটনা ও সংলাপ থাকিলেও ইহা মূলতঃ বর্ণনামূলক কাব্য। কবি কোথাও নিজে কাহিনীর মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া পাত্রপাত্রীর উক্তির সহিত বর্ণনা যোগ করিয়া দিয়াছেন, কোথাও বা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা সংলাপের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, সংস্কৃত শ্লোকগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নহে। কারণ তিনি কাব্যের সর্বত্র 'আইহন' ব্যবহার করিলেও সংস্কৃত শ্লোকে 'অভিমন্যু' বলিয়াছেন। রূপগোস্বামীর পূর্বে আইহনকে কেহ 'অভিমন্যু' বলেন নাই। পদ্মপুরাণে 'রায়ান' আছে। সুতরাং যিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন, তিনি রূপগোস্বামীর পরবর্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব তিনি বড়ুচণ্ডীদাসের নিশ্চয়ই পরবর্তী। ইহা অবশ্য অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এই একটি প্রমাণ ব্যতিরেকে, এমন আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না যাহার দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, এই শ্লোকগুলি বড়ুর রচনা নহে। যাহা হউক, সমগ্র কাব্যটিকে নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া গীতিসংলাপমূলক আখ্যানকাব্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে মহাকাব্য আখ্যা দিতে চাহেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গার বীর, করুণ, শান্ত—ইহাদের যে-কোন একটি রস

মহাকাব্যের অঙ্গিরস বা প্রধান রস হইতে পারে। সেই দিক দিয়া আদিরসাত্মক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মহাকাব্য হইতে বাধা নাই। ধীরোদাত্ত কৃষ্ণচরিত্র মহাকাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত। শ্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' যদি স্বাদু মহাকাব্য হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেও আমরা অবলীলাক্রমে মহাকাব্য বলিতে পারি। কিন্তু বাহ্য গঠন বাদ দিলে দেখা যাইবে, ইহাতে কদাচিৎ মহাকাব্যোচিত বিশালতা সঞ্চারিত করিয়াছে। কোন কোন মঙ্গলকাব্যে তবুও একটা কাহিনীগত বিশালতা আছে; মঙ্গলকাব্য আকারে-প্রকারে অনেকটা পুরাণশ্রেণীর কাব্য হইলেও ইহার ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে বিস্তার উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব মধ্যে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রপরিকল্পনা প্রশংসনীয় হইলেও ইহাকে মহাকাব্য বলা যায় না, বরং আদিরসাত্মক পুরাণকেন্দ্রিক আখ্যানকাব্য হিসাবে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন।

চরিত্ররচনায় কবি যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কাব্যের রচনারীতি ও কাব্যকলাতেও যে তিনি অসাধারণ প্রাজ্ঞ ছিলেন তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গপরিহাসের বিশেষ প্রাচুর্য লক্ষিত হয় না। গীতিরসে এবং ধর্মচেতনায় আবদ্ধ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল তির্যক হাস্য-পরিহাস ও লবণাক্ত ব্যঙ্গবিদ্রূপের সামান্য পরিচয় একমাত্র মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রেই কিছু কিছু পাওয়া যায়। ব্যঙ্গবিদ্রূপ 'নাগরধর্মের' বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার মূলে থাকে অসঙ্গতিজনিত একপ্রকার বুদ্ধিবিলাস। অর্থাৎ ব্যঙ্গবিদ্রূপের জন্য একটি মার্জিত নাগরিক পরিবেশ ও রুচির প্রয়োজন। বড়ুর পরিবেশ গ্রামীণ; তিনি নিজে কৃতবিদ্য হইলেও অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য রুচির দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একটি তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের তির্যকতা প্রকাশ পাইয়াছে যাহা গতানুগতিক মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে স্বাদপরিবর্তন সূচিত করিতেছে। দানখণ্ডে রাধার নিকট কৃষ্ণ নিজ দর্প ও বলবীর্য প্রকাশ করিবার জন্য যখন বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনা করিলেন, তখন রাধার ব্যঙ্গোক্তি পরম উপভোগ্য—

বুঝিল কাহ্নাঞি তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥

এই সমস্ত উক্তির দ্বারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেব আর্দ্র জলাভূমিতে শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। কিংবা বিবহক্লিষ্ট রাধার প্রতি কৃষ্ণের সেই তীব্র নির্মম উক্তি, "পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন" – যতই হৃদযহীন হউক, ভাষার তির্যকতা লক্ষণীয়। দানখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বংশীখণ্ড প্রভৃতি অংশে এই জাতীয় তীব্র ব্যঙ্গপরিহাসেব এমন সমস্ত উক্তি আছে যাহাব তুলনা একমাত্র ভারতচন্দ্রেই পাওয়া যায।

কবিব বর্ণনাকৌশল, অলঙ্কাবসন্নিবেশ এবং শব্দযোজনা অতীব প্রশংসনীয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক বাধার রূপবর্ণনা,

নীল জলদসম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥

প্রভৃতি অসংখ্য কাব্যরসোচ্ছল উক্তি এই কাব্যেব যত্রতত্র ছডাইযা আছে। অলঙ্কাবসন্নিবেশে তিনি প্রাচীন অলঙ্কাবশাস্ত্রেব প্রথা গ্রহণ কবিযাছেন। 'লবলীদল কোমল', 'জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল' (জ্ববেব রোগীব যেমন অম্লে রুচি), 'শবত উদিত চান্দ বদনকমল', 'চবণ থলকমল মন্থব গমনে', 'অমব পুবত নাহিঁ হএ হেন বামা। বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা।' 'আপনাব মাসেঁ হবিণী জগত বৈবী' (আপনার মাংসের জন্যই হবিণ জগতেব বৈবী), 'খুদ বডসিএঁ রুহী বান্ধসী' (ক্ষুদ্র বঁডশিতে রুই মাছ ধবিতে চাহ), কৃষ্ণেব প্রতি নির্জিত কালিযনাগেব সকাতব উক্তি –

সাপেরে করিয়াঁ বিষদানে।
এবে কেহ্ন হরহ পরাণে ॥

রাধার বিরহ বিলাপ,

আষাঢ শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন ঝরএ নয়নের পানী ॥

কিংবা রাধাব প্রতি উদাসীন কৃষ্ণকে বডাইযেব ভর্ৎসনা—

ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি ॥
যে পুনি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥

প্রভৃতি বাক্য, বাক্যাংশ ও শব্দযোজনার মধ্যে যে অলঙ্কার ও মণ্ডনকলা প্রত্যক্ষ করা যায়, বড়ুচণ্ডীদাস কোন পূর্ববর্তী দেশীয় আদর্শ হইতে তাহা পান নাই, সংস্কৃত অলঙ্কাবশাস্ত্র ও কাব্যাদি হইতেই মণ্ডনশিল্পের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ

করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ।) রচনার কারুকৃতি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রে অধিকতর পরিমার্জনা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বড়ুর এই পরিপক্ক রচনা পূর্ববর্তী কোন বাংলা আদর্শ হইতে গৃহীত নহে বলিয়া বিশেষ প্রশংসনীয়।

(বড়ুচণ্ডীদাস যেমন কাহিনীনির্বাচনে নানা পুরাণ হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি বহু স্থলে কাব্যশরীরের মণ্ডনের জন্য জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতেও কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।) বৃন্দাবনখণ্ডে—

১। তোর রতি আশোয়াসে গেলা অভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
২। যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় অন্ধকার সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥

কালিয়দমনখণ্ডে আত্মবিস্মৃত কৃষ্ণের প্রতি বলভদ্রের উক্তি—

মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে।
কমঠ শরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ ॥
... ...
বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তলেঁ নিরঞ্জন।
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন ॥

রাধা বিরহের দুইটি পদে

১। তনের উপর হারে
আল
মানএ যেহ্নে ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
২। নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সবখনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥

জয়দেবের কাব্যপংক্তির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দৃষ্ট হইবে। জয়দেবের বাণীচাতুর্য অবশ্য বড়ুচণ্ডীদাসে আশা করা যায় না, তথাপি(তিনি জয়দেবের অনেক উক্তিকে যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করিয়াছেন) নিম্নে একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

গীতগোবিন্দ—অবিরল নিপতিত মদনশরাদিব ভবদাশয় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্মণি বর্ম করোতি সজলনলিনীদল জালম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—অহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥

এখানে বড়ুচণ্ডীদাস মূলের ভাবটি অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। অবশ্য 'সাপি তদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে' এবং 'বনের হরিণী যেন তরাসিলী মনে' কখনও একরূপ হইতে পারে না। সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং মঞ্জুস্নিগ্ধতা মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় কোথায় পাওয়া যাইবে? বড়ুচণ্ডীদাসের রচনায় আক্ষরিক অনুবাদ অপেক্ষা ভাবানুবাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ দেখা যায়। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ় না হইলে তিনি এই কাব্যের বহিরঙ্গ মণ্ডনে নিপুণ আলঙ্কারিকতার সাহায্য লইতে পারিতেন না। তাঁহার রুচিতে কিছু কিছু গ্রাম্যতা-দোষ থাকিলেও কাব্যশরীর-নির্মাণে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অলঙ্কারের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার ব্যবহৃত উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি মার্জিত এবং রসোচ্ছল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দবৈচিত্র্যও প্রশংসনীয়। ইতিপূর্বে চর্যাপদেও পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছিল; কিন্তু তখনও তাহাতে বিশেষ একটা নিয়মবন্ধন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই কাব্যে পয়ারত্রিপদীতে কোন কোন স্থলে মাত্রাসমকতা খর্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলতঃ পয়ারত্রিপদীর কাঠামোটি বজায় আছে। ইহাতে পয়ারের মোট সাত প্রকার প্রকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল—

১। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার : কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহি জান এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥

২। বিষমঅক্ষরী পয়ার : তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারেঁ। পরাণী ॥ বড়ায়ি ল।
দারুণ কুসুম শর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল।

৩। দশ অক্ষরের পয়ার : একদিনে মনের উল্লাসে।
সখিসমে রস পরিহাসে ॥

৪। এগার অক্ষরের পয়ার : আয়িলা দেবের সুমতি শুনী।
কংসের আগক নারদমুনী ॥

৫। লঘুত্রিপদী ঃ তোর মুখে সুনী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে॥

৬। দীর্ঘত্রিপদী ঃ সর্বাঙ্গে সুন্দরী তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবগণ
ইহে কিছু নাহিঁক সন্দেহা॥

৭। ভঙ্গত্রিপদী ঃ রামকাজে হনুমন্তা তেহেন আহ্মার দূতা
ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতী॥

এই সমস্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইবে যে, বড়ুচণ্ডীদাস কী পরিমাণে পয়ারজাতীয় ছন্দের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র কাব্যটি গীত হইত বলিয়া ইহাতে অক্ষর-সমকতা রক্ষার সজ্ঞান চেষ্টা নাই, মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের ছন্দে এই ত্রুটি ভূরিপরিমাণে দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রাচীন কবিগণ যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। পাঠ করিবার কালে ছন্দের যে ত্রুটি কর্ণপীড়াদায়ক হইয়া উঠে গীতে তাহা সুরের প্রবাহে আত্মগোপন করিতে পারে। এইজন্য চর্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রসারিত বিপুলায়তন বাংলা কাব্যের ছন্দে মাত্রাগত অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বড়ুর এই কাব্য নানা ছন্দবৈচিত্র্যসত্ত্বেও এই ত্রুটিবিমুক্ত নহে। কাব্যটির কোন কোন স্থলে একপ্রকার শিথিল, নিয়মহীন, চঞ্চল ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যাহা কবির ইচ্ছাকৃত কিনা বলা যায় না। যথা—

অতি দুখিনী বালী ল।
ভাল
নবলীদল কোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল॥
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ তোরে ল।
আল
তিন্নিবধ পাপ নাহিক ডর তোহ্মারে ল॥

আবেগপ্রকাশের স্থলে এইরূপ শিথিল ছন্দ লক্ষণীয়। তৎকালীন লোক-সঙ্গীতের (অর্থাৎ ঝুমুব) প্রভাবেও এইরূপ নৃত্যচপল ছন্দ পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে।

'কোন কোন স্থলে বড়ুচণ্ডীদাস দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দের মাত্রাগত খর্বতা পোষাইয়া লইতে চাহিযাছেন।' দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ বাঙালীর বসনা ও শ্রোত্রের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, সংস্কৃত-প্রভাবান্বিত মাত্রিক ছন্দে তবু তাহা কথঞ্চিৎ সহনীয়; কিন্তু পয়ারচ্ছন্দের তানপ্রবাহে দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক ধরিতে গেলেই পয়াবেব ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে। সেইরূপ কর্ণপীড়াকব ছন্দোবৈলক্ষণ্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রচুর আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আবেগ ও আবেগপ্রকাশের ছন্দ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ঐক্য-সূত্রে বিধৃত হয।

উপসংহার

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা প্রচুর হইলেও কাব্যধর্ম লইযা বিশেষ কোন প্রসঙ্গ এ পর্যন্ত রসজ্ঞমহলে দেখা যায নাই। ইহাব রসরুচি লইয়া প্রচুর বিরোধ ও মতামতের ঝড়তুফান উঠিযাছিল। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পশ্চাতে একটা সমাজমানসেব প্রতিচ্ছবি আবিষ্কাবেব চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমাজে কৃষ্ণ মহাদানী সাজিয়া, 'ঘাটোয়াল' হইযা, 'কুতোঘাটে' লোক নিযুক্ত করিয়া কংসের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া নিজ বল-প্রতাপ প্রচারে ব্যস্ত, তাহা তো বাঙলা দেশেরই একযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের চিত্র। পাঠান আমলে বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলে মুসলমান-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্থানীয় ভূস্বামিগণ বাঙলার সুলতানের কর্তৃত্ব না মানিয়া কৃষ্ণেরই ন্যায় মহাদানী সাজিয়া বসিতেন।[১৪] দেশে, বিশেষতঃ রাজ্য-শাসনব্যাপাবে যে ইসলামী প্রভাব ক্রমেই সুদৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রমাণ—খ্রীঃ ১৫শ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে বড়ুচণ্ডীদাস কয়েকটি ইসলামী শব্দ ব্যবহার করিযাছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পশ্চাতে একটা তরল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আভাস আবিষ্কার করা এমন কিছু অভিনব ব্যাপাব নহে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজচেতনা বা পরিবেশচেতনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক কালের ব্যাপার। প্রাচীন ও

১৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইতিহাসের স্বাক্ষর—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, (ভারতবর্ষ শ্রাবণ, ১৩৬৩)

মধ্যযুগীয় কবিগণের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের অন্তরালে সমাজ, রাষ্ট্র ও ইতিহাস এমনভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল যে, মঙ্গলকাব্য বাদ দিলে, অন্যান্য কাব্যশাখার মধ্যে এইরূপ মর্ত্যচেতনার স্পষ্ট পরিচয় মিলে না। এরূপ স্থলে সমাজতত্ত্বে-বিশ্বাসী সমালোচককে বাধ্য হইয়াই স্বল্পতম উপাদানের সহিত কল্পনার খাদ মিশাইয়া উক্ত সাহিত্যে তৎকালীন সমাজজীবনের একটা সম্ভাব্য প্রভাব আবিষ্কার করিতে হয়।

কেহ-বা আবার রাধাকৃষ্ণের সংলাপ ও চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া তৎকালীন সমাজের শিথিলতব যৌনজীবনের উপরেও কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। কৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণ সমর্থন করিয়া এবং এগার বৎসরের বালিকার অনাঘ্রাত দেহমনকে বলপূর্বক সম্পীড়িত করিয়াছেন এবং রাধার কাকুতিমিনতি উপেক্ষা করিয়া অগম্যাগমনের পাপাচারকে কামাবেগের উত্তপ্ত নিশ্বাসে হেলাভরে উড়াইয়া দিয়াছেন। এইজাতীয় অসামাজিক অশুচি কর্মে উৎসাহ দিয়া এবং ষড়যন্ত্রের জাল পাতিয়া অবৈধ সম্ভোগের দূতিয়ালি করিয়াছে বড়াই—রাধা ও কৃষ্ণের 'বৃদ্ধা আর্যিকা'—মাতামহীস্থানীয়া। সামাজিক আদর্শ কতদূর নিন্দনীয় হইলে তবে এইরূপ দূষিত যৌনজীবন কাব্য-সাহিত্যে পরম শ্রদ্ধার সহিত চিত্রিত হইতে পারে—তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই কেহ কেহ ইহাকে আভীর পল্লীর গোষ্ঠীগীতিকা-জাতীয় লোক সঙ্গীত আখ্যা দিয়া বড়ুচণ্ডীদাসের কবিত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য হ্রাস করিতে চাহেন। অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রকাশ এবং রাধার দেহচেতনার জাগরণ হইলে তাঁহাকে ফেলিয়া কৃষ্ণের নির্মমভাবে মথুরায় পলায়ন—কেহ-বা ইহার মধ্যেও তৎকালীন সমাজ এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্বন্ধের এক উৎকট অসঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। সে যুগে প্রাপ্তবয়স্কের সহিত অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার বিবাহের ফলে কীভাবে বালিকাজীবন বিড়ম্বিত, বিপর্যস্ত হইত, দানখণ্ডে কামকলা-অনভিজ্ঞা রাধার কাকুতিমিনতিতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তার পরে বাণখণ্ডে কামশরাহত রাধার দেহমনে যখন আসঙ্গরসের জোয়ার বহিল, তখন "যৌবনে অধিক ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী" কৃষ্ণ রাধার প্রতি উদাসীন হইয়া রহিলেন। কেহ যদি বড়াইকে আধুনিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করিয়া তাহাকে 'দালাল' আখ্যা দিতে চাহেন,[১৫] তবে তাঁহাকেও নিরস্ত করা

১৫ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৬৪) ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সহজ হইবে না। যাহা হউক, আধুনিক সমাজতত্ত্বের পটভূমিকায় এই কাব্যের যে ধরণের সামাজিক উৎকট ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে, তাহা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না।

কোন কোন সমালোচক কৃষ্ণরাধার অনঙ্গরঙ্গ, স্থূল রসরুচি, গ্রাম্য গালি-গালাজ, প্রভৃতির দ্বারা বড়ুর মর্ত্যপ্রীতির সপ্রশংস পরিচয় পাইয়াছেন। দেহকে কেন্দ্র করিয়া দেহরসের এমন বাধাসঙ্কোচহীন বিষামৃত পরিবেশন বাংলা কাব্যে একপ্রকার দুর্লভ বলিলেই হয়। বড়ুর পরবর্তী কালে চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে বাঙলা দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে নবজীবনের সূত্রপাত হয়, তাহাব ভাবাঢ্য অভিনবত্ব মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যেরই একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাহাতে বিশুদ্ধ মর্ত্যপ্রীতি অপেক্ষা একটা ভক্তিভাববিমোহিত অমর্ত্য রসোল্লাসেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। বড়ুব মধ্যে যে তীব্র প্রাণরসের পবিচয় আছে, রুচি-অরুচির প্রশ্ন এড়াইয়া জীবনপিপাসার আকণ্ঠ আকুলতা অতৃপ্ত ভোগেব মধ্যে কম্পিত হইযাছে, তাহা সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই এক অনন্যসাধাবণ সৃষ্টি।

সমালোচকদের এই সমস্ত উক্তি কোন কোন দিক দিয়া যথার্থ মনে হয, বিভিন্ন রুচির নিকট এই কাব্য যে বিচিত্র অনুভূতি ও আস্বাদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহাব অভিনবত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মধ্যযুগীয় কোন কাব্যকেই নিছক সমাজচৈতন্যের বাতায়নতলে স্থাপন কবা যায় না। রাধাকৃষ্ণেব দেহকেন্দ্রিক লীলা এবং মাতুলানী-ভাগিনেয়ের অশুচি সম্পর্ককে এক যুগের বাঙলা দেশের সামাজিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ কবিলে ভুল কবা হইবে। প্রত্যেক সমাজে কতকগুলি প্রথাগত বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাঙলা দেশের লোক-সমাজে মাতুলানী-ভাগিনেয়কে কেন্দ্র করিয়া আদিরসাত্মক নানা হাস্যপরিহাস প্রচলিত আছে। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণেও একস্থলে মাতুলানী দেবী চণ্ডিকা ভাগিনা নারদের সহিত আদিরসাত্মক রসিকতা করিয়াছিলেন,

নারদে দেখিয়া চণ্ডী ঢাকিলা দুই স্তন।
বোল পরিহাস্য করিতে ভাগীনার গেল মন॥
বুঝিলাম ভাগিনা তোমার কামনা।
এহি বেলাত তিনবার করিলা আনাগোনা॥[১৬]

১৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ, পৃ, ১৪৮।

প্রাচীন কাব্যাদিতে দেবর-ভ্রাতৃবধূকে কেন্দ্র করিয়াও এইজাতীয় আদিরসাত্মক হাস্যপরিহাসের ধারা জনপ্রিয় হইয়াছিল। হালের 'গাথাসপ্তশতী'তে দেবর-ভ্রাতৃবধূর অবৈধ সম্পর্ক লইয়া কিছু কিছু প্রাকৃত কবিতা পাওয়া যায়। সুতরাং বড়ুচণ্ডীদাসের অগম্যাগমনের দৃষ্টান্তকে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাঙলা দেশের সামাজিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না।

কেহ-বা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারূপক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সংসার-মায়ামুগ্ধ জীব রাধার মতই 'বড়ুআর বহুআরী আহ্মে বড়ুআর ঝী' এই গর্বে উদ্ধত হইয়া শ্রীভগবানকে স্বীকার করিতে চাহে না। তখন স্বয়ং ভগবান আঘাত-সংঘাতে জর্জরিত করিয়া সংসারমুগ্ধ ভক্তের মর্ত্যপিপাসা দূর করেন—সেই পর্যায়টি ভক্তের নিকট অতিশয় পীড়াদায়ক। ইহাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড। রাধার মর্ত্যবোধ ঘুচাইবার জন্যই কৃষ্ণের এই সুকঠোর প্রয়াস—যাহা বাহ্যতঃ বর্বরতা বলিয়া বোধ হইবে। তারপর রাধার অন্তরে কৃষ্ণপ্রীতি জাগ্রত হইলেও অহংবোধ মরিয়াও মরে না। তখনও তিনি গৃহবাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ব স্বরূপ ও কৃষ্ণস্বরূপ ভুলিয়া জগৎপ্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তখন কৃষ্ণ বাণখণ্ডে চূড়ান্ত আঘাত করিয়া রাধার মর্ম বিদীর্ণ করেন। সেই সময়ে রাধার বড় চিত্তসঙ্কট; একদিকে সমাজসংসার, আর-একদিকে দুর্নিবার কৃষ্ণের বাঁশী। 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে'—রাধা প্রশ্ন করেন। পরিশেষে রাধার বিরহ-হাহাকার—যে হাহাকারের মধ্য দিয়া তাঁহার যাবতীয় মর্ত্যবোধ স্খলিত হইয়া পড়িল—ইহাই ভক্তের আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ। এইভাবে ইহার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ অবশ্য প্রথম হইতে নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত, কেবল রাধাই মুগ্ধা। বড়াই একস্থলে (বাণখণ্ড) কৃষ্ণকে রাধাকে পঞ্চবাণের আঘাত করিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছে—

হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোয়ালিনী রাধার থাউক সব মায়া॥

এই স্থলে স্পষ্টতঃই সংসার-মায়ামুগ্ধ রাধাগোয়ালিনীর মায়ামোচনের জন্যই কৃষ্ণের কৃতকর্মকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটিকে এখানে রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে। কিন্তু এই ভক্তিতত্ত্বের চারিদিকে যে মর্ত্যবোধের স্থূল আবরণ রহিয়াছে, তাহা এই জাতীয় নৈষ্ঠিক রতিমূলক ভক্তিভাবের অনুকূল নহে। তবে কবি

যে কেবলমাত্র ঝুমুরগান রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। ইহার আদ্যন্ত একটা বিশিষ্ট ধর্মীয় চেতনাপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ লক্ষ্মীর অবতার রাধার সংসারচৈতন্য বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন—ইহাই এই কাব্যের ব্যঞ্জিতার্থ। একদা এই অর্থটি তদানীন্তন সমাজে সুপরিচিত ছিল; তাহা না হইলে সনাতনগোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে ইহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কালের ব্যবধানে তৎকালীন সমাজপরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। আজিকার সমাজজীবনে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মনেপ্রাণে গ্রহণ করা দুরূহ। বরং ইহার মর্ত্যরসই আমাদের কাছে অভিনব এবং লোভনীয় মনে হয়। "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের মাঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ুচণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তাহার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন" (রামেন্দ্রসুন্দর)-সমালোচকের এই উচ্ছ্বাস নিশ্চয় বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তাঁহার এই উক্তিটি, "সেই বাঁশীর স্বরের নিকট সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়"—অতিশয় যুক্তিসঙ্গত এবং রসজ্ঞের উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিক মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উষারুণ-প্রত্যূষে বড়ুচণ্ডীদাসের আবির্ভাব নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য শুধু মধ্যযুগে নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা কাব্যরসিকগণ স্বীকার করিবেন। একদা ইহার স্থূল বর্ণনার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম অধ্যাত্মব্যঞ্জনা নিশ্চয়ই সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। কিন্তু আধুনিক কালের পাঠকের নিকট ইহার প্রত্যক্ষ মানব-রস অধিকতর উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়

কবি বিদ্যাপতি

॥ ১ ॥

ভূমিকা

'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি বাঙলা দেশেব কবি না হইয়াও বাঙালীর অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়াছেন বিশ্বের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদ বাঙলাদেশেই সংরক্ষিত হইযাছে, চৈতন্য মহাপ্রভু হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলাব মহামানবগণ বিদ্যাপতিকে অন্তরের আত্মীয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজন পদাবলী-সঙ্কলনে বিদ্যাপতিব পদ সংগৃহীত না হইলে তাঁহাব বিচিত্র ও বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার স্বরূপটি কখনই আলোকিত হইত না। খাস মিথিলায় তাঁহার নামে প্রচারিত হরগৌরীবিষযক পদই অধিকতর প্রচলিত। অধুনা মৈথিলী ও হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিদ্যাপতিকে শৈব প্রমাণের জন্য তাঁহার ভণিতাযুক্ত হরগৌরীবিষযক দ্বিতীয় শ্রেণীর পদগুলিকেই শ্রেষ্ঠতর আসন দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের এই মতামত কী পরিমাণে যুক্তিসহ, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি। উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, হরগৌরীবিষযক পদই যদি বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভাব একমাত্র প্রমাণ হইত, তবে তাঁহাকে পূর্বভারতের 'কবিসার্বভৌম' নামক যে শ্লাঘনীয় 'বিরুদ' দান করা হইয়াছে, তাহা কি সম্ভব হইত? বিদ্যাপতির অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থে তাঁহার কবিপ্রতিভার উৎকৃষ্ট ও মৌলিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে তাঁহাকে বড় জোর একজন স্মার্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা'য় সদম্ভে বলিয়াছেন,

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাসা।
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা ॥
ও পরমেসর হরশির সোহই।
ঈ নিশ্চই নাঅর—মন মোহই ॥

অনু: বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা এ দুয়ের কোনটিতে দুর্জনের উপহাস লাগিবে না। যেহেতু চন্দ্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর, বিদ্যাপতির ভাষা নাগরজনের মনোমোহন করে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনূদিত ও সম্পাদিত 'কীর্তিলতা' হইতে উদ্ধৃত)।

ঐ 'কীর্তিলতা'র একস্থলে কবি স্বয়ং কামনা করিয়াছেন,

মাধুর্যপ্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তারশিক্ষাসখী।
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী ॥)

অনু: মাধুর্যের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষাসখীসদৃশ "খেলন কবি" বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক (অনুবাদ—ঐ)।

যদি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক মৈথিলী পদ আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে এই 'খেলন কবির' আত্মপ্রশংসা ও দম্ভ বালসুলভ শূন্যগর্ভ আস্ফালনেই পর্যবসিত হইত, বাঙালীই বিদ্যাপতিকে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব দান করিয়াছে। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হইয়াও বাঙালীর জীবন ও সাধনার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন। বাঙলার কবি জয়দেব যেমন বাঙালী হইযাও সমগ্র ভাবতবর্ষেই শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছেন, ঠিক তেমনি(বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হইযাও বাঙলা দেশে খ্রীঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ কবিযা আধুনিক কাল পযন্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবসমাজে কবি ও সাধক রূপে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পাইযাছেন।) ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তমহাজন এবং ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সহজিযাগণ তাঁহাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধক এবং 'নবরসিকে'ব অন্যতম বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু বিদ্যাপতিব কবিখ্যাতিকে বাঙালীই পবিত্র হোমাগ্নির মতো রক্ষা করিযাছে। (চৈতন্যদেব দিবারাত্র বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেব পদ আস্বাদন কবিতেন; ফলে পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজ, কীর্তনীয়া-সম্প্রদায়ের পদসংগ্রহে বিদ্যাপতিব বহু পদ গৃহীত হইয়াছিল,) বৈষ্ণবসমাজেব বাহিরেও ভক্তির গান হিসাবে এই পদগুলি বাঙলা দেশেব শিষ্টসমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙালীব জাতিগত ধাতুধর্ম অবশ্য মূল মৈথিলী পদগুলিকে বাংলা ভাষাব প্রভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে বিদ্যাপতির পদের বিশুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইলেও মহিমার খর্ব হয় নাই।) অধুনা রামবৃক্ষ বেনীপুরী, ডঃ উমেশ মিশ্র, ডঃ জয়কান্ত মিশ্র, শিবনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি মৈথিলী ও হিন্দীভাষী পণ্ডিত-গবেষকগণ বিদ্যাপতির পদাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থসম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন; ইহার জন্য তাঁহারা নিশ্চয় বাঙলা দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। (বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির এত খ্যাতি না থাকিলে এখন হয়তো তিনি বিস্মৃতির অগম-পারে নির্বাসিত হইতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। অদ্বৈতাচায যে পদ পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবকে

অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বিদ্যাপতিরই পদাংশ—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"—এবং "দারুণ বসন্ত যত দুঃখ দেল। হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল॥"[১] এতদ্ব্যতীত নরহরিদাস ('জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ। রসিক সভাভূষণ সুখকন্দ॥') বৈষ্ণবদাস ('জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসধাম'), গোবিন্দদাস (কবিপতি বিদ্যাপতি অতিমানে। যাক গীত জগতচিত রোয়ায়ল গোবিন্দগৌরী সরসরস গানে॥') প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ নানা স্থানে বিদ্যাপতির বন্দনা গাহিয়াছেন। স্বয়ং গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির অনেক অসমাপ্ত পদাংশ তিনি নিজেই পূরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মিথিলার রাজা শিবসিংহের অন্যতমা পত্নী লছিমাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া বাঙলা দেশে চণ্ডীদাস-রামীর মতো কিংবদন্তী সৃষ্টি হইয়াছিল। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণবপদসংগ্রহে বিদ্যাপতির বহু পদ ঠাঁই পাইয়াছে। এমনি করিয়া প্রায় ১৫শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলী বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে যথেষ্ট প্রচারলাভ করিয়াছিল। অবশ্য বিদ্যাপতি যে মিথিলার কবি, বাঙালী নহেন,—তাহা ক্রমে ক্রমে বাঙালী ভুলিয়াই গিয়াছিল।

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শিক্ষিত বাঙালী অনাধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে আরম্ভ করে। বিপুলায়তন পুঁথিসাহিত্যের প্রায় কিছুই তখন ইংরাজীশিক্ষিত ভদ্রজনের নিকট পৌঁছায় নাই। দীর্ঘকালাশ্রিত অনুশীলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজীশিক্ষিত-সমাজে কৃত্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের নামগুলি স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইলেও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ভারতচন্দ্র তো তখনও স্বমহিমায় বিরাজ করিতেছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে বৈষ্ণবসমাজের জন্য কিছু কিছু বৈষ্ণবগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত 'বাবু'সম্প্রদায় তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই সর্বপ্রথম শিক্ষিত-সমাজের পক্ষ হইতে ১৮৫৮-৫৯ সালে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' "বঙ্গভাষার উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিদের পরিচয় প্রদান করেন এবং বিদ্যাপতির পদ উদ্ধৃত করেন। বৈষ্ণববংশের সন্তান রাজেন্দ্র-

১ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থের ৬১ সংখ্যক পদ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'-র ৩১০ সংখ্যক পদ।

লাল আবাল্য যে সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন তাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি তাঁহার অন্তরে শ্রদ্ধাই সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের চৌদ্দ বৎসর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতিসম্বন্ধে বিশেষ নূতন তথ্য পরিবেশন করিতে না পারিলেও কবির সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দিয়া রক্ষণশীল সাহিত্যরসিকের দৃষ্টিতে কবি বিদ্যাপতির কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ-নির্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ এবং রামগতি ন্যায়রত্নের গ্রন্থ ছাড়াও আরও কিছু কিছু পুস্তক-পুস্তিকা বাহির হইয়াছিল যাহাতে বিদ্যাপতির পদ বা লছিমা-সংক্রান্ত গল্পকাহিনী স্থান পাইয়াছিল। (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ ভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গালা সাহিত্য সংগ্রহ' (১৮৭২) নামক কাব্যসঙ্কলনে বিদ্যাপতির পদাবলী ও জীবনী উদ্ধৃত হইয়াছিল; অবশ্য সে জীবনী তথ্যমূলক তো নহেই, তাহা সম্পূর্ণরূপ জনশ্রুতিনির্ভর।) বিদ্যাপতি যে অবাঙালী কবি, ইঁহারা কেহই তাহা জানিতেন না, অথবা উল্লেখ করেন নাই। ইহার কিছু পরেই ১৮৭৩-৭৪ সাল হইতে এক দিকে যেমন শিক্ষিত বাঙালীর রসদৃষ্টি বিদ্যাপতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল, ঠিক তেমনি আবার অপর দিকে বিদ্যাপতির জীবনেতিহাস সম্পর্কেও কৌতূহল জাগ্রত হইল। (১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে পুরাতত্ত্ববিৎ জন বীম্‌স্ *Indian Antiquary* পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 'The Early Vaishnava Poets of Bengal' নাম দিয়া যে প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন, নানা ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও, তাহাতে বিদ্যাপতির ভাষা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়।) তিনি এই কার্যে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন; এইজন্য এই তথ্যসমূহে নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বীম্‌স্ বিদ্যাপতিসংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিতে গিয়া পণ্ডিতদের উপর অধিকতর নির্ভর করার ফলে কয়েকটি ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে, বিদ্যাপতি ভবানন্দরায়ের পুত্র, যশোহরের বারনাটোর (Barnator, বড় নাটোর?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আসল নাম বসন্তরায়। বীম্‌স্ এই তথ্য কোথা হইতে পাইলেন জানা যায় না। তবে এইরূপ জনশ্রুতি বাঙলা দেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; 'পদকল্পতরু'তে বসন্তরায়ের ৫১টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। অনেকে হয়তো ইঁহার সহিত বিদ্যাপতিকে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। বীম্‌স্ সাহেব বিদ্যাপতি সম্পর্কে

আরও দুই-চারিটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; তিনিও শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গা অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বিদ্যাপতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ১২৮২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৭৫) 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিজ নাম গোপন করিয়া 'বিদ্যাপতি' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিদ্যাপতিসংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য রাজকৃষ্ণ কর্তৃক সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়। তিনি বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত যথাযথ ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন, মিথিলার মধুবনী পরগণার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন।) বীম্‌স্‌ সাহেব অতঃপর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ *Indian Antiquary* পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় 'On the Age and Country of Bidyapati' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধের ভুল সংশোধন করেন এবং রাজকৃষ্ণের দুই-একটি তথ্যের সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করিলেও তাঁহার আবিষ্কৃত বিদ্যাপতিসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় বৃত্তান্ত স্বীকার করেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ মুদ্রিত করিয়া তিনি রাজকৃষ্ণের আবিষ্কৃত তথ্যের প্রতি বিদ্বজ্জনের কৌতূহল আকর্ষণ করেন। (গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্মব্যপদেশে দ্বারভাঙ্গা পরিভ্রমণ করিয়া খাস মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির যে পদগুলি সংগ্রহ করেন, তাহাই ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar, containing a Grammar, Chrestomathy & Vocabulary* (Vol. II)[২] নামে প্রকাশ করেন।) *Indian Antiquary* পত্রিকার দুই সংখ্যায় (১৮৮৫, ১৮৯৯) বিদ্যাপতি বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীসমাজে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রচার লাভ করিতে লাগিল; মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিবার আর কোন উপায় রহিল না।)

১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে শুধু বিদ্যাপতির পদ লইয়া সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে কুমারখালি হইতে 'মহাজন পদাবলী' (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাতে শুধু বিদ্যাপতির পদ গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ) চণ্ডীদাসের পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র

ইহাতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত মোট ৮২টি পদ ছিল।

দ্বিতীয খণ্ডে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইযাছিল। সারদাচরণ মিত্রের ‘বিদ্যাপতির পদাবলী’ও (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহাতে সর্বাধিক পদ গৃহীত হইযাছিল। তাঁহার এই সংস্করণকে মার্জিত করিয়া এবং মিথিলা ও নেপাল হইতে অনেক পদ সংগ্রহ করিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর বৃহত্তম সংস্করণ (৮৪০টি পদ) প্রকাশ করেন। তাঁহার পরে ঐ সংস্করণটি আরও দুইটি পরিমার্জনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইযাছে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের যুগ্ম সম্পাদনায় এবং ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে এই সংস্করণটি বিস্তারিত ভূমিকা ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যসহ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশযদ্বযের পুনঃসম্পাদনায় প্রকাশিত হইযাছে। ইহাই বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সংস্করণ। হিন্দী ও মৈথিলীতেও বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদাবলী সংগ্রহ প্রকাশিত হইযাছে। ঐ সংস্করণসমূহের সম্পাদকগণ প্রধানতঃ নেপালী পুঁথি এবং মিথিলায প্রচলিত পদাবলীর উপর অধিকতর নির্ভর করিযাছেন, তাহারা বাংলা বৈষ্ণব-পদসংগ্রহে গৃহীত বিদ্যাপতির পদগুলির যথোচিত মর্যাদা দেন নাই। কারণ তাহাদের ধারণা, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষযক পদগুলি উৎকৃষ্ট নহে, নিছক শৃঙ্গাররসের কবিতারূপেই এগুলির যা কিছু মূল্য।* তাহাদের মতে হরগৌরীবিষযক পদই মিথিলায সবিশেষ আদৃত এবং তাহারাও এই শৈবপদের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিযাছেন।

জন বীম্স, গ্রীয়ার্সন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতীশচন্দ্র রায, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এবং ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিযাছেন। প্রসিদ্ধ মৈথিলী পণ্ডিত ডঃ উমেশ মিশ্র, তৎপুত্র ডঃ জযকান্ত মিশ্র, রামবৃক্ষ বেণীপুরী, ব্রজনন্দন সহায প্রভৃতি অবাঙালী পণ্ডিত-গণও মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির কুলপরিচয়, গ্রন্থ, পদাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিযাছেন। এই সমস্ত উপাদান বিচার করিয়া বিদ্যাপতির জীবনী ও কাব্য-বিষযে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

* এ বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

॥ ২ ॥

বিদ্যাপতির জীবনকথা

বিদ্যাপতি বাঙলা দেশে অন্ততঃ চারি শত বৎসর ধরিয়া অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও তিনি যে বাঙালী কবি নহেন, তাহা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বে কেহ জানিতেন না। জন বীম্‌স্‌ তাঁহার ভাষাকে মৈথিলী লক্ষণাক্রান্ত বলিলেও কবি যে মিথিলাবাসী, এমন কোন কথা তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ (*Indian Antiquary*-তে প্রকাশিত) পাঠে বুঝা যায় না। গ্রীয়ার্সন সাহেব রাজকার্যপ্রসঙ্গে মধুবনী মহকুমায় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই সুযোগে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নূতন তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়ার্সন যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহাই দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। পারস্পরিক মতবৈষম্য সত্ত্বেও বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য কবি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলিয়া যান নাই। কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত 'রাজপঞ্জী'-তে সন তারিখের বৈষম্য সত্ত্বেও, মিথিলার রাজবংশ ও ব্রাহ্মণসমাজ সম্বন্ধে, অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। বিদ্যাপতি দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত (অধুনা মধুবনী মহকুমার অন্তর্ভুক্ত) বিসফী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, তাঁহাদের কৌলিক উপাধি 'ঠক্কুর'। বাঙলা দেশে তাহা 'ঠাকুর' রূপান্তর লাভ করে। বিদ্যাপতির উর্ধ্বতন সাতপুরুষের তালিকা :—বিষ্ণুনাথ – হরাদিত্য – কর্মাদিত্য – দেবাদিত্য – ধীরেশ্বর – জয়দত্ত – গণপতি। ইঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুনাথ হইতে দেবাদিত্য পর্যন্ত সকলেই মিথিলারাজের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন; দেবাদিত্য মিথিলার 'সান্ধিবিগ্রহিকে'র গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্রের মধ্যে বীরেশ্বর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। দেবাদিত্যের অন্যান্য পুত্র রাজসভায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ধীরেশ্বর রাজকার্যে যোগ না দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতসুলভ যজনযাজন ও শাস্ত্রচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ধীরেশ্বর বিদ্যাপতির প্রপিতামহ। ইঁহার পুত্র অর্থাৎ বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া রাজকার্য ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চায় কালযাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির

পিতা গণপতি পূর্বপুরুষদের ন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিকারী ছিলেন না। অবশ্য মিথিলায় এই বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল; তাই বিদ্যাপতি বিত্তকৌলীন্য-হীন হইয়াও মিথিলা রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ শস্ত্র ও শাস্ত্রে, রাজ্যশাসন ও সংস্কৃত সাহিত্যে যুগপৎ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজজীবনকে স্মৃতিসংহিতার বিধানের দ্বারা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। স্মার্তসংস্কার এই বংশের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং বিদ্যাপতিও একাধিক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির জীবনকথা মিথিলার রাজবংশের ভাগ্যের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। নানা[illegible]লী পদে ও অবহট্ট ভাষায় লিখিত 'কীর্তিলতা' নামক চম্পু[illegible] যে সমস্ত রাজার উল্লেখ করিযাছেন তাহা অবলম্বনে তাঁহার [illegible] সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 'কীতিলতা'য় কবি তাঁহার [illegible]ষক 'ওইনীবার' রাজবংশের কীতি উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজবংশ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাহ্মণ। 'ওইনীবার' বংশের রাজা কামেশ্বর রায়; তাঁহার পুত্র ভোগীশ্বর বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তাহার পুত্র গএনেস (গণেশ, জ্ঞানেশ?)[৩] ২৫২ লক্ষ্মণ সংবতে (১৩৭২ খ্রীঃ অঃ) অস্লান (অর্স্লান) নামক এক মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হন। তাঁহার তিন পুত্র—বীরসিংহ, কীর্তিসিংহ ও রাজসিংহ। পিতা নিহত হইলে বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ দেশত্যাগ করিয়া জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় অসলানকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। কীর্তিসিংহ পরে সিংহাসন লাভ করেন। বিদ্যাপতি এই কীর্তিসিংহের (রাজত্বকাল—১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অঃ) কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করিয়া অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' রচনা করেন। এই কাব্যে কবি আপনাকে 'খেলনকবি' (অর্থাৎ বালক কবি) বলিয়াছেন। ঐ কাব্যের আর-এক স্থলে তিনি নিজ রচনাকে বালচন্দ্রের সহিত উপমিত করিয়াছেন। ওই সময়ে বোধহয় তাঁহার বয়স বিশ-বাইশের অধিক হয় নাই। প্রথম যৌবনের আত্মশ্লাঘাও তাই প্রায় স্থলেই প্রকাশিত হইয়াছে।

---

৩ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (*Journal of the Dept. of Letters*, C. U. 1927) গএনেস বা গঅনরায় শব্দটি গগনেশ, গগনেশ্বর অথবা গগনরায় হইতে আসিতে পারে, গণেশ বা গণেশ্বর হইতে কদাপি নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডক্টর উমেশ মিশ্র ও তৎপুত্র ডঃ জয়কান্ত মিশ্র মনে করেন যে, ইহা গণেশ্বরের অপভ্রংশ।

কীর্তিসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার খুল্লতাত দেবসিংহ কিছুকালের জন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার পর তিনি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শিবসিংহের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। শিবসিংহ মাত্র তিন বৎসর নয় মাস রাজত্ব করেন। আনুমানিক ১৪১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দে, হয় মুসলমানের সহিত যুদ্ধে নিহত হন, অথবা নিরুদ্দেশ হন। তৎপত্নী লছিমাদেবী বার বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বামীর কুশশ্রাদ্ধ করেন। শিবসিংহের অবসানের পর মিথিলায় বেশ কিছু দিন অরাজকতা চলিয়াছিল। শিবসিংহের পর বোধহয় তাঁহার ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হন। কিন্তু তাঁহার পত্নী বিশ্বাসদেবীই রাজকার্য পবিচালনা করিতেন। শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর বিদ্যাপতিরও ভাগ্যবিপর্যয় আরম্ভ হয়। তিনি মিথিলার কামেশ্বরবংশ ত্যাগ করিয়া (দ্রোণবারের বাজা পুরাদিত্যের) শরণ লইয়াছিলেন। এই সময়ে কাব্যরচনা ত্যাগ করিয়া বোধহয় জীবিকানির্বাহের জন্য (তাঁহাকে 'লিখনাবলী' অর্থাৎ চিঠি লিখিবার গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল)। পরে মিথিলার অবস্থা শান্ত হইলে শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ সিংহাসন লাভ করেন এবং কবিও আবার পুবাতন আশ্রয়ে ফিরিয়া আসেন। (পদ্মসিংহের পত্নী রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে তিনি 'শৈবসর্বস্বসার' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করেন) ইহার পবে তিনি ঐ বংশের রাজা নরসিংহ, বীরসিংহ ও ভৈববসিংহের নির্দেশেও একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কামেশ্বব বংশের কীতিসিংহ হইতে ভৈরবসিংহ (কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, বিশ্বাসদেবী, বীরসিংহ ও ভৈরবসিংহ) প্রায় ছয় জন রাজা ও একজন রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যু বা নিরুদ্দেশের পর ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তিনি কিছুকাল পুরাদিত্য নামক অন্য এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াচিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার আটশত পদের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশে কামেশ্বর রাজবংশের রাজা বা রাজবংশীয় ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শিবসিংহের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ২০১টি পদে। কোন্ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কি কি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে ঃ—

১। কীতিসিংহ—'কীর্তিলতা'
২। দেবসিংহ—'ভূপরিক্রমা'
৩। শিবসিংহ—'কীর্তিপতাকা', 'পুরুষপরীক্ষা'

৪। পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবী—'শৈবসর্বস্বসার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী'

৫। নরসিংহ ও ধীরমতী—'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী'

৬। পুরাদিত্য—'লিখনাবলী'

৭। ভৈরবসিংহ—'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'।

এতদ্ব্যতীত মৈথিলী পদেও দেবীসিংহ (কীর্তিসিংহের খুল্লতাত), হরিসিংহ (দেবসিংহের ভ্রাতা), শিবসিংহ (দেবসিংহের পুত্র), পদ্মসিংহ-বিশ্বাসদেবী, অর্জুন ও অমর (শিবসিংহের খুল্লতাত-ভ্রাতা) রাঘবসিংহ (শিবসিংহের খুল্লতাত-ভ্রাতা হরিসিংহের পুত্র), রুদ্রসিংহ (শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা), নরসিংহ-ধীরমতী, ভৈরবসিংহ (শিবসিংহের ভ্রাতুস্পুত্র) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা বা রাজবংশ ছাড়াও তিনি মন্ত্রীদেরও উল্লেখ করিয়াছেন—রেণুকাদেবীর স্বামী মহেশ্বর, জডমদেবীর স্বামী মহেশ্বর, রূপিণীদেবীর স্বামী রতিধর প্রভৃতি। কোন কোন পদে মালিক বহারদিন, গ্যাসদেব সুলতান (গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ্), নসরংশাহ্ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

। বিদ্যাপতি বিদগ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ পাণ্ডিত্য ও রাজকার্যাদি উভয় ব্যাপারেই পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ হইতে এই বংশেব গুরুত্ব কিছু হ্রাস পাইলেও তিনি অল্পবয়স হইতেই কামেশ্বর বংশের রাজসভায় যাতায়াত কবিতেন; ফলে নাগরিক জীবনের সহিত বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল।। তাই বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্রের মতো নাগরিক জীবনের কবি। তাঁহার কবিতায় যে মণ্ডনকলাসিদ্ধ সৌকুমার্য ও বাক্‌নির্মিতির বিস্ময়কর পরিমার্জনা লক্ষ্য করা যায়, তাহা সম্ভবতঃ রসজ্ঞ রাজন্যবর্গ ও রাজসেবক কর্মচারিগণের রসতৃষ্ণা মিটাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল।। অপরদিকে তিনি স্মার্তপণ্ডিত। মুসলমান আক্রমণে, বিশেষতঃ অসলানেব অত্যাচারে মিথিলার শিথিলীকৃত ব্রাহ্মণ-সমাজকে নূতন করিয়া নিয়মপাশে বদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণও বিশেষভাবে স্মার্ত ছিলেন। বিদ্যাপতিও স্মৃতিসংহিতার বিধি-নিষেধকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। একদিকে রাজমনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে মার্জিত পদাবলী রচনা ও রাজার কীর্তিকাহিনী-প্রচারক গ্রন্থে চিত্তসন্নিবেশ,—অপর দিকে স্মৃতিসংহিতার বেষ্টন দিয়া মিথিলার সমাজকে সংরক্ষণের চেষ্টা—তাঁহার চিত্তে এই দুই প্রকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। সুতরাং বিদ্যাপতি শুধু কবিই ছিলেন না; অনুশীলনমূলক পাণ্ডিত্য, রসচর্চা, স্মৃতিসংহিতার অনুশীলন, বিভিন্ন

রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতির দ্বারা এই ব্রাহ্মণকবি জীবিতকালে মিথিলায় বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহ তাঁহাকে গ্রাম দান করিয়া যে তাম্রপাত্র উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে, "সপ্রক্রিয়াভিনবজয়দেব পণ্ডিতঠক্কুর"। এই 'অভিনবজয়দেব শ্রীবিদ্যাপতি'কে রাজা শিবসিংহ জরইল পরগণার বিসপী গ্রাম দান করিয়াছিলেন।[৪] বিদ্যাপতি জীবিতকালেই 'অভিনবজয়দেব' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রাজা-প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই তিনি প্রচুর সম্মান পাইয়াছিলেন। কীর্তিসিংহ হইতে ভৈরবসিংহ পর্যন্ত মিথিলার কামেশ্বর রাজবংশের বহু রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া বিদ্যাপতি সে যুগে পণ্ডিত ও কবিরূপে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। কবি 'কীর্তিপতাকা'র পুষ্পিকায় সগর্বে বলিযাছেন,

এতৎকীর্তি (সুধাপ্রসাধিতরসা) বাণী চ বিদ্যাপতে—
রাচন্দ্রার্কমিয়ং বিরাজতু.মুখাম্ভোজেষু (ধন্যা) সদা ॥[৫]

অনু: রাজা শিবসিংহের এই কীর্তি এবং বিদ্যাপতির বাণী যাবচ্চন্দ্র দিবাকর লোকের মুখে মুখে বিরাজ করুক।

তৎকালীন সমাজে তাঁহাব প্রভাব বিচার করিলে এই উক্তিকে কবিসুলভ দম্ভোক্তি বলিয়া মনে হইবে না।

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কীর্তিসিংহ হইতে ভৈরবসিংহের শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া তিনি বহু দিন ধরিযা ত্রিহুত-নেপালের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানা তরঙ্গবিক্ষোভ দর্শন করিযাছিলেন। তাঁহার একটি পদে একমাত্র 'দুল্‌হি' নাম্নী এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাব ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এতদতিবিক্ত কোন তথ্য পাওয়া যায না। অবশ্য মিথিলায় এখনও বিদ্যাপতির জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহাকে সব সময়ে ঠিক ঐতিহাসিক তথ্যের মর্যাদা দেওযা যায় না। মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র ও ডঃ জয়কান্ত মিশ্র বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে মিথিলা হইতে জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়া কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন।

৪ এই দানপত্র লইয়া নানা সন্দেহ দেখা দিয়াছে। পরে 'বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল' শীর্ষক অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত 'দানপত্র'-সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫ বন্ধনীর মধ্যস্থিত শব্দগুলি ডঃ শ্রীসুকুমার সেন পরিকল্পিত। (বিদ্যাপতিগোষ্ঠী, পৃ. ১৫)

বিদ্যাপতি নাকি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের সতীর্থ ছিলেন। প্রবাদ অনুসারে বিদ্যাপতির দুই বিবাহ; প্রথম পক্ষের পুত্র হরপতি ও নরপতি এবং দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র বাচস্পতি ও কন্যা দুল্লহার নাম পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কোন এক পুত্রবধূ (চন্দ্রকলা) নাকি কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁহার এক পদে[৬] বলিযাছেন যে, শিবসিংহের মৃত্যুর (২৯৬ ল.সং—১৪১৫ খ্রীঃ অঃ) বত্রিশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি শিবসিংহেব শ্যামলমূর্তি স্বপ্ন দেখিযাছিলেন। ডঃ উমেশ মিশ্র শাস্ত্রীয় স্বপ্নফল ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্নদ্রষ্টারও মৃত্যু হয়। সুতরাং বিদ্যাপতি ১৪৪৭ খ্রীঃ অব্দে বা উহাব নিকটবর্তী কোন সমযে দেহত্যাগ করেন। বলা বাহুল্য ডঃ জযকান্ত মিশ্র ও উমেশ মিশ্রেব জনশ্রুতিমূলক এই অনুমান এবং স্বপ্নফলব্যাখ্যা ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ কবা যায় না। বাজপঞ্জী ও বিদ্যাপতির পদ বিচাব করিযা কোন তথ্যনির্ভব ইতিবৃত্তও পাওয়া যায় না। মিথিলায প্রচলিত জনশ্রুতিকে যেমন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য বলিযা গ্রহণ করা যায় না, ঠিক সেইরূপ বাঙলা দেশে সুপ্রচারিত বিদ্যাপতি-সংক্রান্ত গল্পকাহিনীকেও সত্য বলিযা স্বীকাব করা যায না। বাণী লছিমার সহিত তাঁহাব প্রণয়সংক্রান্ত কাহিনীটি বাঙলা দেশের বৈষ্ণব সহজিযাবাই বটাইযাছেন। তাঁহাবা জয়দেব-চৈতন্যপ্রভু হইতে আবম্ভ করিযা প্রত্যেক বৈষ্ণবধর্মগুরুব একটি কবিযা 'প্রকৃতি' আবিষ্কার কবিযা সহজিযা মতের 'কিশোরীভজন' ব্যাপারকে পাংক্তেয় করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদ্যাপতিব বহুপদে শিবসিংহেব রাণী লছিমাদেবীর সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে বলিযাই গল্পবুভুক্ষু জনচিত্ত তাহা হইতে অবৈধ প্রেমকাহিনীব উপকথা নির্মাণ করিয়াছে। বিদ্যাপতি নাকি চণ্ডীদাসেব কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া সুদূর মিথিলা হইতে বাঙলা দেশে আসিয়াছিলেন; গঙ্গার তীরে দুই মরমী-রসিকেব মধ্যে রসতত্ত্ব আলোচিত হয। এ সমস্ত কাহিনীর মূলেও বিশেষ কোন ঐতিহাসিক তথ্যসিদ্ধ প্রমাণ নাই। কাজেই ডঃ জয়কান্ত মিশ্র সংগৃহীত[৭] মিথিলায় প্রাপ্ত কাহিনী এবং বাঙলা দেশে প্রচলিত গল্পগুলিব যাথার্থ্য যে অতিশয সংশয়সঙ্কুল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

[৬] সপন দেখল হম সিবসিংঘ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥ পদসংখ্যা—৯১৪; মিত্র ও মজুমদারের সংস্করণ। এই পদটি কোণ প্রামাণিক সংগ্রহে পাওয়া যায় নাই।

[৭] Dr. Jaykanta Misra—*History* of *Maithili Literature.*

বিদ্যাপতির পদ বিচার করিয়া কেহ কেহ তাঁহার ব্যক্তিজীবন, বিশেষতঃ অন্তর্জীবনের পরিচয় উদ্ধার করিতে চাহেন। বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত অষ্টশতাধিক পদের মধ্যে যেগুলি শিবসিংহের রাজত্বকালে লিখিত তাহাতে যে-পরিমাণে 'বিলাস-কলাকুতূহলা', নর্মলীলার উল্লাস এবং আনন্দোজ্জ্বল জীবনের প্রাচুর্য দেখা যায়, তাহার পরবর্তী যুগে রচিত পদগুলিতে ঠিক সেইরূপ সূর্যকরস্নাত উন্মুক্ত জীবনের পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই। বিরহের পদে কেমন একটা বিষণ্ণতা ও বিলাপ এবং প্রার্থনাপর্যায়ের পদে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে।, ইহার কারণটি ঐতিহাসিক। বিদ্যাপতি শিবসিংহের সময়ে কবিরসিক ও স্মার্ত-পণ্ডিতরূপে রাজসভায় ও বিদ্বন্মণ্ডলীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শিবসিংহের নামযুক্ত পদগুলিতে তাই জীবনের দুঃখবেদনা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দিকটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। শিবসিংহের মৃত্যু বা নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে কবিব জীবনেও বিপর্যয় নামিয়া আসে। রাজসভাচ্যুত কবিকে কামেশ্বর রাজবংশের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রাজবনৌলিতে দ্রোণবারের অধিপতি পুবাদিত্যের শরণ লইতে হয়। এই দুঃখের দিনে প্রয়োজনের তাড়নায় বিদ্যাপতিকে 'লিখনাবলী' অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় পত্র লিখিবার গ্রন্থ লিখিতে হয়। এই যুগের অবসানে কবি আবার মিথিলার রাজবংশের স্নেহচ্ছায়া লাভ করিলেও পূর্বতন আনন্দপরিকীর্ণ জীবন হয়তো আর ফিরিয়া পান নাই। তাই ইহার পরের পদসমূহে ভোগবিলাসেব জীবন ও বৈচিত্র্য-মণ্ডিত চিত্র অপেক্ষা ব্যথা-বেদনার দিকটি বড হইয়া দেখা দিয়াছে, মিলনরঙ্গ অপেক্ষা মাথুরলীলার বিরহ-বিলাপ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার পদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া এইরূপ একটা মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নির্দেশের চেষ্টা প্রশংসীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে যথেষ্ট তথ্যসঙ্গত নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। সমালোচকগণ বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে যে দুইটি সুর আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র পদাবলীর সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে; শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের ধারা পরবর্তী কালের পদসমূহকেও বিষণ্ণ ও মলিন করিয়া দিয়াছিল —এ সিদ্ধান্ত সর্বথা তথ্যসঙ্গত নহে। কারণ শিবসিংহের সমকালে বা পূর্বকালে রচিত দেবসিংহ, হরিসিংহের নাম সংযুক্ত পদে জীবনের আনন্দোচ্ছলতার সহিত বিরহবেদনার চিত্রও যথেষ্ট আছে। ১০৬ সংখ্যক ('ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ বরসিয়ে দশদিশ নাহি পরকাসা') এবং ১৫০ সংখ্যক ('রোপঁই পহু পহু লতিকা

আনি')৮ পদগুলি শিবসিংহের রাজত্বকালে রচিত ; ইহাতে জীবনের বেদনাসিক্ত দিকটাই অধিকতর ফুটিয়াছে। আবার শিবসিংহের আশ্রয়চ্যুত হইয়া এবং পরে মিথিলার রাজবংশের আশ্রয় লাভ করিয়া তিনি এমন অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে বিলাসবিভ্রম ব্যতীত কোন বেদনাপীড়নের ছায়ামাত্র নাই।

কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতিকে মৌলিক কবিশিল্পিরূপে আর পাই না, পাই প্রধানতঃ স্মার্তপণ্ডিত মূর্তিতে।" ইহা অবশ্য কিয়দংশে যথার্থ। বিদ্যাপতির প্রধান প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ (শৈবসর্বস্বসার বা শৈবসর্বস্বহার, দানবাক্যাবলি, বিভাগসার, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, বর্ষকৃত্য ও গয়াপত্তন *) অবশ্য শিবসিংহের মৃত্যুর পরেই রচিত। কিন্তু এই যুগের পদে কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবনে পরিবেশের প্রভাব

প্রাপ্ত উপাদান হইতে কবি বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও সংস্কৃত ও অবহট্ট ভাষায় রচিত তাহার গ্রন্থাদি অবলম্বনে তৎকালীন দেশ ও সমাজজীবনের কোন্ কোন্ প্রভাব তাঁহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি নাগরিক মনোভাবের অধিকারী রাজসভার কবি, রসিকজনের মনোরঞ্জনের প্রতি তাঁহার অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ফলে তদানীন্তন রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সহিত তাহার সম্পর্কও ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। ১৪শ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ত্রিহুতে ইসলামের অভিযান শুরু হয়, খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ এবং পরে প্রায় বাংলা দেশের সবটাই ইসলামের অর্ধ-চন্দ্রলাঞ্ছিত

৮ এখানে মিত্র ও মজুমদারের সঙ্কলিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'ধৃত পদের সংখ্যা অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পরে যেখানে পদের সংখ্যার উল্লেখ থাকিবে, অন্য কোনরূপ নির্দেশ না থাকিলে সেগুলি এই সঙ্কলনের সংখ্যা বুঝিতে হইবে।

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বসু মহাশয় *New Indian Antiquary* (Vol VII, 3-4) পত্রে বিদ্যাপতি বিরচিত মনসা পূজা-সংক্রান্ত 'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণী' শীর্ষক একখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বিদ্যাপতির প্রকৃত রচনা হইলে মধ্যযুগে মিথিলাতেও মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।

পতাকার তলে নতি স্বীকার করে ; কিন্তু তখনও ত্রিহুত ও উড়িষ্যায় পাঠানশক্তি প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১৪শ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে ত্রিহুতের ভাগ্যাকাশে মেঘ জমিতে লাগিল। ১৩২৪ খ্রীঃ অব্দে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে দিল্লীর তুঘলকবংশের সম্রাট গিয়াসুদ্দিন মিথিলার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিবর্মাদেবকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া ত্রিহুতকে দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। ফলে ত্রিহুত মুসলমান সম্রাটের অধীনে করদ রাজ্যে পরিণত হইল ; এই অঞ্চলের নূতন নামকরণ হইল 'তুঘলকপুর উর্ফ ত্রিহুত'। হরিসিংহদেব নেপালে পলায়ন করিয়া সেখানে কিছুদিন রাজত্ব করেন। পরে তাঁহার গুরুবংশের ব্রাহ্মণ কামেশ্বরকে সামন্তরূপে ত্রিহুতের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ত্রিহুতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইহাই প্রথম মর্মান্তিক আঘাত। ত্রিহুতের নাম ইসলামী শব্দের দ্বারা রূপান্তরিত হইল, তুঘলক সাম্রাজ্যের একটি টাঁকশালও ত্রিহুতে স্থাপিত হইল, শাসনকর্তা কামেশ্বর মুসলমান সম্রাটের কৃপাপাত্রে পরিণত হইলেন। এতদিন ধরিয়া মিথিলায় যে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা বহিতেছিল, তাহাতে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। গিয়াসুদ্দিনের পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে শাসন-বিশৃঙ্খলার ফলে ভারতে রাজনৈতিক শিথিলতা দেখা দেয় এবং সেই সুযোগে অনেক সামন্ত-নৃপতি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। এই সময়ে কামেশ্বর হয়তো স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকিবেন। কারণ গৌড়ের সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ ১৩৪৫-৪৬ খ্রীঃ অব্দে ত্রিহুত জয় করেন এবং তাহার পর নেপাল অভিযানে প্রস্থান করেন। কামেশ্বর দিল্লীশ্বরের করদ সামন্তরূপে সন্তুষ্ট থাকিলে হয়তো সামসুদ্দিন তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন না। সামসুদ্দিনের আক্রমণের ফলে মিথিলার সমাজজীবনে কতখানি আঘাত লাগিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কামেশ্বরকে বাধ্য হইয়াই সামসুদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহার পরে ফিরোজ তুঘলক কামেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপুত্র ভোগীশ্বরকে সামন্তরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভোগীশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গএনেস উক্ত পদ লাভ করিলেন। কিন্তু অসলান (অর্সলান) নামক এক মুসলমান সামন্ত গএনেসকে হত্যা করিয়া (২৫২ ল সং—১৩৭১-৭২ খ্রীঃ অঃ) কিছুকাল ত্রিহুত অধিকার করিয়া রাখেন। এই সময়ে সমগ্র মিথিলায় হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত অধোগতি সূচিত হয়। ইতিপূর্বে কামেশ্বর মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলেও

মিথিলার সমাজজীবনে মুসলমানের প্রভাব সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় নাই। বিদ্যাপতি বাল্য ও কৈশোরে এই দুর্যোগের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাজবংশ ও রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর সঙ্কটের ছায়া আরও ঘনীভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অবহট্টভাষায় রচিত বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' নামক সমসাময়িক (১৩৭২-১৪০২ খ্রীঃ অঃ) ঐতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ কাব্যটিতে 'তুরুকের' অত্যাচারে বিপন্ন মিথিলাবাসীর শোচনীয় অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, গএনেসের পুত্র কীর্তিসিংহ জৌনপুরের নবাব ইব্রাহিমের আনুকূল্যে যুদ্ধে অসলানকে হত্যা করিয়া পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। এই সময় সমগ্র হিন্দুস্থানেই অরাজকতার মত্ততা চলিতেছিল। ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লীর সম্রাট মামুদের আধিপত্য খর্ব হইয়া পড়িল। তৈমুর পর বৎসর (১৩৯৯ খ্রীঃ) ভারত ত্যাগ করিলেও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্থানীয় সামন্তগণ ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। গুজরাট ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাফর খাঁ ও ওযাজিবুল মুল্‌ক্‌, মুলতান-সিন্ধুর কিয়দংশে মসনদ আলী খিজির খাঁ, মহোবা ও কলপি মামুদ খাঁ, কনৌজ-অযোধ্যা-আগ্রা-বিহার-জৌনপুরে খাজা জাহান, ধরে দিলওয়ার খাঁ, সমানায় খলিব খাঁ এবং বিয়ানা অঞ্চলে সামস খাঁ রাজদণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন। এইরূপ রাজনৈতিক অরাজকতার সময়ে যে অসলান নামক কোন মুসলমান-প্রধান গএনেসকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বেশ কিছুকাল ত্রিহুত অধিকার করিয়া রাখিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ত্রিহুতে মুসলমান শাসনের অবসান হয় এবং কীর্তিসিংহ সিংহাসন অধিকার করিয়া বিধ্বস্ত রাষ্ট্র ও সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই মিথিলায় স্মৃতিসংহিতার অনুশীলন প্রবল বেগে অগ্রসর হয়; কবি বিদ্যাপতিও এই সংস্কারের যুগে একাধিক স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়া সমাজজীবনকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

কীর্তিসিংহ জৌনপুরের নবাব ইব্রাহিম খাঁয়ের আনুকূল্যে পিতৃসিংহাসন ফিরিয়া পান, কিন্তু তাহার মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হয়। ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ত্রিহুত জৌনপুরের সামন্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে ১৪৮৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত জৌনপুরের নবাববংশ এত প্রবল হইয়াছিল যে, দিল্লীর সম্রাটগণও মাঝে

মাঝে ভীত হইয়া জৌনপুরের সামন্তরূপে দিল্লী শাসন করিতে সম্মত হইতেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ্আলম জৌনপুরের সুলতানের ভয়ে ভীত হইযা দিল্লী ত্যাগ করিয়া বদায়ুনে পলায়ন করেন। সুতরাং ত্রিহুতের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যে দীর্ঘ দিন জৌনপুরের অধীন সামন্ত হইয়া থাকিবে, তাহাতে আর সংশয় কি ?

১৪৬১ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরে ত্রিহুতে আবার রাষ্ট্রসঙ্কট ঘনাইয়া আসে। এই সময়ে জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন ত্রিহুত আক্রমণ করিযা লুণ্ঠন করেন এবং অনুমান করিতে বাধা নাই যে, অসলানের অত্যাচারের অর্ধশতাব্দীর মধ্যে (অসলান বোধহয় ১৪০২ খ্রীঃ অব্দে পরাজিত হন) আবার সুলতানী অত্যাচার আরম্ভ হয়। ১৪৮৩ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে ত্রিহুতের উপর জৌনপুরের প্রভাব হ্রাস পাইয়া যায়। যাহা হউক, বিদ্যাপতিকে অন্ততঃ তিনটি রাষ্ট্রসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ অসলানের অত্যাচার, দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের সহিত যুদ্ধে শিবসিংহের নিধন, তৃতীয়তঃ হুসেন কর্তৃক ত্রিহুত লুণ্ঠন। হয়তো তিনি এই সময়ে অতিবৃদ্ধাবস্থায় বেদনার সহিত এই ভয়াবহ রাজনৈতিক প্লাবন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে বাংলা দেশের উপর দিয়াও অনুরূপ অরাজকতার ঝড বহিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু একমাত্র মুকুন্দরাম ভিন্ন অন্য কোন কবি এই দুর্ঘটনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে জড়াইয়া পড়েন নাই।

বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবনে রাজ্যসঙ্কট, রাজসভা ও রাজবংশ নিশ্চয় একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার মার্জিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচালিত। অপর দিকে 'কীর্তিলতা' হইতে তাঁহার ইতিহাসানুগামী কালচেতনারও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায। অসলান কর্তৃক ত্রিহুত জযের পর মিথিলায় মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুসমাজ কীভাবে বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিল, বিদ্যাপতি 'কীর্তিলতা'য় তাহাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন। বোধহয সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিদ্যাপতি প্রথম পরিবেশ-সচেতন কবি। তাঁহাব পদাবলীতে এই সামাজিক প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অবশ্য সন্দেহের বিষয় ; কিন্তু 'কীর্তিলতা'য় তাঁহার ইতিহাসচেতনা ও সমাজ-চিত্রাঙ্কনশক্তি আশ্চর্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাপতি মিথিলায় স্মার্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রচারক। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ

যেমন রাজসভায় উচ্চতম পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ কেহ শাস্ত্র সংহিতায়ও বিশেষ অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন, যথা—গণেশ্বর, চণ্ডেশ্বর, গোবিন্দদত্ত প্রভৃতি। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর ও পিতামহ জয়দত্ত রাজসভা ও রাজকার্য ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রচর্চায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি কবিখ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের জন্য কামেশ্বরবংশীয় বিভিন্ন রাজাদের নিকট আদরণীয় হইয়াছিলেন, রাজা শিবসিংহ তাঁহাকে সুহৃদ্ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কীর্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া মিথিলার সমাজগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়া স্মার্ত সংস্কারের পুনঃপ্রচারের জন্য বোধহয় বিদ্যাপতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শিবসিংহের আশ্রয়চ্যুত হইয়া কবি যখন নেপালে বাস করিতেছিলেন, তখন সেই ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনে ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া তাঁহাকে মিথিলার সমাজগঠনের কথা অধিক পরিমাণে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রায় সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ শিবসিংহের পরবর্তী কালে রচিত। ইহাতে দেখা যাইতেছে তিনি প্রধানতঃ শাক্ত ও শৈব ধর্মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ 'শৈবসর্বস্বসার', 'গঙ্গাবাক্যাবলি', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী',—সমস্তই শাক্ত ও শৈব গ্রন্থ। কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন, নিজে ভাগবত নকল করিয়াছিলেন, অথচ কোন বৈষ্ণব পুরাণ বা স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, সে যুগে শাক্ত ও শৈবধর্মই মিথিলার গণধর্ম ছিল। একদিকে বিদ্যাপতি শাক্ত ও শৈবস্মৃতি লিখিয়া জনচিত্তে বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, আবার অপর দিকে 'বিভাগসার' 'দানবাক্যাবলি', 'বর্ষক্রিয়া' প্রভৃতি রচনা করিয়া বর্ণাশ্রমধর্মের সাহায্যে সমাজের বিশ্লিষ্ট বনিয়াদকে সুদৃঢ় করিতে চাহিয়াছিলেন। মুসলমান আক্রমণের ফলে মিথিলার সমাজ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণসমাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—

> খলে সজ্জন পরিভবিঅ কোই নহি হোই বিচারক।
> জাতি অজাতি বিবাহ, অধম উত্তম কাঁ পারক ॥
> অখ্খর-রস বুঝ্ঝ নিহার নহি,
> কই কল ভমি ভিখ্খারি ভঁউ। ইত্যাদি (কীর্তিলতা)

অনু: খল সজ্জনকে পরাভূত করিল, বিচারক কেহ থাকিল না, জাতি অজাতির মধ্যে বিবাহ হইল। অধম উত্তমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। বিদ্যারস বুঝিবার লোক দেখা গেল না। কুলীন ব্যক্তি ভিক্ষুকে পরিণত হইল।

মিথিলার সমাজসঙ্কট কী প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল তাহা এই উদ্ধৃতি

হইতেই বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক উৎপাত; কুলীন ব্যক্তি (অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীভুক্ত) ভিক্ষুক হইল। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যার অপহ্নব হইল। তৃতীয়তঃ, জাতি-অজাতির বিবাহের ফলে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে ভাঙন ধরিল। কীর্তিসিংহ বিদ্যাপতির সহায়তায় মিথিলাকে এই উপপ্লব হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পরে এবং শিবসিংহের মৃত্যুর পর বোধহয় আবার অনুরূপ রাষ্ট্রসঙ্কট ঘনাইয়া আসে; তখন বিদ্যাপতি স্বজন ও স্বসমাজচ্যুত হইয়া নেপালে বাস করিতেছিলেন। তিনি মিথিলায় ফিরিয়া আসিয়া নানা স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়া বিধ্বস্ত সমাজকে আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থ শুধু ত্রিহুতেই নহে, বাঙলা দেশেও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাকে অবশ্য শূলপাণি রঘুনন্দনের মত প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু সীমাবদ্ধক্ষেত্রে, ত্রিহুতের সমাজজীবনের পুনর্গঠনে তাঁহার স্মৃতি গ্রন্থগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

বিদ্যাপতির জীবনে তাই অন্ততঃ তিনটি প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে: প্রথমতঃ, তাঁহার ইতিহাস ও সমাজচেতনা। সে ইতিহাস ও সমাজচেতনা কিয়দংশে আত্মরক্ষামূলক—সেখানে মুসলমান প্রভাব হইতে ত্রিহুতকে মুক্ত করিবার চেষ্টাই তাহার মূল লক্ষ্য। কিন্তু খ্রীঃ ১৪শ ১৫শ শতকের এক ব্রাহ্মণ কবির নিকট হইতে 'কীর্তিলতা'র মতো একখানি ঐতিহাসিক ও সামাজিক-তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, ইহা বিস্ময়কর। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার নাগরিক মনোভাব। দীর্ঘকাল বিভিন্ন রাজপরিবারের সংস্পর্শে আসিয়া, রাজসভায় যাতায়াত করিয়া তাঁহার মনের চারিদিকে একটা দরবারী আদর্শের মার্জিত পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র—ইহারা প্রধানতঃ নাগরবৃত্তিচারী রাজসভার কবি। তিন জনের রচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে উপাদান হিসাবে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মনোভাব ও জীবন-প্রত্যয়ের দিক দিয়া খুব যে একটা বৈষম্য আছে, তাহা মনে হয় না। জীবনের বহিরঙ্গনেই তাঁহাদের অধিকতর বিহার; ভাষা-ভঙ্গিমাকে শাণ দিয়া, পালিশ করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া 'রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো' দ্যুতিময় করিয়া লওয়া তিনজনের বাক্‌রীতিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তৃতীয়তঃ, তাঁহার পদাবলীসাহিত্য—যাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই গভীর, যাহা একাধারে কৃত্রিম আলঙ্কারিক কৌশলের সার্থক দৃষ্টান্ত, আবার প্রাণের গভীর রসে দ্রবীভূত, যাহার প্রধান আবেদন রাজসভাজীবী বিদগ্ধজনের মার্জিত মনের নিকট, তাহার মধ্য দিয়া আবার

নিখিল মানবাত্মার ভক্তিরসার্দ্র ও আবেগাপ্লুত অনুভূতির নিরাবরণ প্রকাশ ঘটিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতির জীবনকথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপাদান সংগ্রহ করা না গেলেও তাঁহার রচনাবলি এবং মিথিলার রাজবংশের ইতিহাস হইতে তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া যায়।

॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল

বিদ্যাপতির জীবনকথা সম্বন্ধে যেমন স্পষ্টরূপে কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় না, সেইরূপ তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্পর্কেও কয়েকটি আনুমানিক তথ্য ভিন্ন নিঃসংশয় প্রমাণের বলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সহজ নহে। মিথিলার রাজপঞ্জী নামক ঘটনাবিবরণমূলক রাজবংশেতিহাসে ব্রাহ্মণবংশেরও বিবৃতি আছে। বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ মিথিলার রাজবংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; কাজেই এই রাজপঞ্জী[১] হইতে কাল নির্ণয় করিবার মতো অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও সনতারিখের নানা বৈষম্য ও ত্রুটি লক্ষ্য করা গিয়াছে: এইজন্য রাজপঞ্জীও ঐতিহাসিক প্রমাণ-রূপে সর্বথা গ্রহণযোগ্য নহে। 'বিদ্যাপতি তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া মৈথিলী ভাষায় কিছু পদ এবং অবহট্টভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বনে তাঁহার আবির্ভাবকাল বা আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে একটা আনুমানিক কালপরিমাণ স্থিরীকৃত হইতে পারে। সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাঁহার একাধিক গ্রন্থে নানা রাজবংশের উল্লেখ আছে, কখনও-বা সনতারিখ দেওয়া আছে—তাহাও বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারে। তাঁহার বৈষ্ণব ও শৈবপদাবলীতে মিথিলার রাজা-রাণী ও মন্ত্রীদের উল্লেখ আছে; তাহাতেও ঐ কালের একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়াও কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। দানপত্র, বিদ্যাপতির স্বহস্তে নকলকরা সনতারিখ-যুক্ত ভাগবতের পুঁথি প্রভৃতি এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে। এই সমস্ত উপাদান বিচারে বিদ্যাপতির অনুমানসাপেক্ষ আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল বাহির করা যাইতে পারে; কিন্তু এই প্রমাণাবলীর

১ এই রাজপঞ্জী ১২৪৮ শক (১৩২৬ খ্রীঃ) হইতে মিথিলাপতি হরিসিংহের রাজত্বকালে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানা প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

প্রামাণিকতা ও স্বরূপ সম্বন্ধে নানা দ্বিধা আছে বলিয়া যাঁহারা ইহা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মোটামুটি ঐকমত্য থাকিলেও বহু স্থলে বিরোধ আছে। নিম্নে বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) সারদাচরণ মিত্রের মতে—('বিদ্যাপতির পদাবলী', ১৮৭৮) "খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই তাঁহার পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল।"

(২) জর্জ গ্রীয়ার্সনের মতে—"Bidyapati flourished and was a celebrated author during at least the first half of the 15th century" ('পুরুষপরীক্ষা'র ভূমিকা, পৃ. ১১)।

(৩) নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে—বিদ্যাপতি ১৩৫৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, মৃত্যু হয় ১৪৪৮ খ্রীঃ অব্দে ('বিদ্যাপতি')।

(৪) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে—বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল—১৩৪৭-১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ('কীর্তিলতা'র ভূমিকা)।

(৫) 'বিদ্যাপতিকি পদাবলী'র সঙ্কলক কুমার গ' সিংহের (Kumar G. Sinha) মতে—১৩৫০ খ্রীঃ অঃ।

(৬) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—১৩৭২-১৪৪৮ খ্রীঃ অঃ (*Journal of the Dept. of Letters*, Vol. XVI)।

(৭) সতীশচন্দ্র রায়ের মতে—১৩৮০-১৪৮০ খ্রীঃ অঃ (পদকল্পতরু, ৫ম)।

(৮) ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে—১৩৯০-১৪৯০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই বিদ্যাপতির জীবন আবর্তিত হইয়া থাকিবে (*Indian Historical Quarterly*, Sept. 1944)।

(৯) মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র ও শিবনন্দন ঠাকুরের মতে—বিদ্যাপতির জন্ম—২৪১ ল. সং অর্থাৎ ১৩৬০ খ্রীঃ অব্দে, মৃত্যু—৩২৭ ল. সং অর্থাৎ ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে।

(১০) ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের মতে—২৪১ ল. সং অর্থাৎ ১৩৬০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতির জন্ম এবং ১৪৩৭ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যু (*History of Maithili Literature*)।

(১১) ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে—"১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম" এবং "১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে।" ইহার পর বিদ্যাপতি আর কত দিন জীবিত ছিলেন,

সে সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার আর কিছু উল্লেখ করেন নাই (মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী', পৃ. ৩৷৹-৩৷৵৹)।

(১২) দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—"সুতরাং যদি বলা যায়, কবি ১৩৫৮ কিংবা তদ্রূপ কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইতে বহু দূরবর্তী হইবে না" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')।

(১৩) অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে—"কবি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর নিকটবর্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন" (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী')।

(১৪) খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে—"বিদ্যাপতি চতুর্দশ শতকের শেষপাদে জন্মগ্রহণ করেন" ('পদামৃত মাধুরী' ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮)। মিত্রমহাশয় তাঁহার আর-এক গ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত আকারে বলেন, "বিদ্যাপতির জন্ম যদি ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে তাঁহার তরুণ বয়সে বিসপী প্রাপ্তি (২৯৩ ল. সং = ১৪১২ খ্রীঃ অঃ), ভাগবতের নকল ও পরিণত বয়সে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' লেখা—এই সকলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা সহজ হয়" ('বৈষ্ণব রসসাহিত্য')।

(১৫) ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—বিদ্যাপতি ১৪শ শতাব্দীর শেষে বা ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ("End of 14th —beginning of 15th century"—ODBL. Vol. I)।

(১৬) ডঃ শ্রীসুকুমার সেনের মতে—"১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশি দিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না" ('বিদ্যাপতিগোষ্ঠী', পৃ ২৩)।

উল্লিখিত সনতারিখগুলির হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপতির কালনির্ণয় সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে তথ্য লইয়া নানা মতবৈষম্য দেখা দিলেও তাঁহারা এ বিষয়ে একমত যে, বিদ্যাপতি ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধের কিছুকাল জীবিত ছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রত্যেকের অবলম্বিত তথ্য ও তৎসংক্রান্ত মতামতের যাথার্থ্য আলোচনার অবকাশ নাই বলিয়া আমরা প্রধানতঃ ডঃ শ্রীযুক্ত বিমান-বিহারী মজুমদার মহাশয়-সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে বিদ্যাপতির আবির্ভাব ও তিরোধানের কাল সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

১। পদে নসরৎশাহের উল্লেখ ॥

প্রথমেই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির জন্মকাল সম্বন্ধে

কোন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রমাণ আছে কি-না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত 'বিদ্যাপতি' গ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক (খগেন্দ্রনাথ ও বিমানবিহারীর সংস্করণের ৯৩২ সং. পদ) পদের ভণিতায় আছে :

কবিশেখর ভণ অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি ॥[১০]

এই রায় নসরৎ ১৩৯৪ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুর লাভ করেন এবং ১৩৯৯ খ্রীঃ অব্দে (ইব্রাহিমশাহের জৌনপুর সিংহাসন লাভের দুই বৎসর পূর্বে) লোকান্তরিত হন। সুতরাং বিদ্যাপতি নিশ্চয় ১৩৯৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দিকে বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং আয়ুষ্কাল যতই দীর্ঘ হউক না কেন, ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তাঁহার জন্মকাল টানিয়া লওয়া যায় না। গ্রীয়ার্সন, সারদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডঃ উমেশ মিশ্র – সকলেই ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যাপতির জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু তাহা হইলে বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দে সুস্থ শরীরে ছাত্র শ্রীরূপধরকে 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' পড়াইতেছিলেন – ইহার সহিত সামঞ্জস্য করা যায় কি করিয়া? একশত বৎসরের বৃদ্ধ সুস্থ শরীরে ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন, ইহা বিশ্বাস করা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং বিদ্যাপতি ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে।

২। কীর্তিলতা ॥

'কীর্তিলতা'র প্রমাণটিও এইসঙ্গে বিচার্য। গএনেসের পুত্র কীর্তিসিংহ অসলান নামক এক মুসলমান শাসকের কবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' রচনা করেন। কীর্তিসিংহ দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, ১৪০২ হইতে ১৪০৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সিংহাসন লাভ করিয়া ১৪১০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেই সম্ভবতঃ লোকান্তরিত হন। কারণ ১৪১০ খ্রীঃ অব্দে শ্রীধর-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ বিবেকে'র এক

১০ এই পদটিতে কবিশেখরের ভণিতা আছে বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কারণ মিথিলায় প্রাপ্ত লোচনকবি-কৃত 'রাগতরঙ্গিণী' নামক পদসঙ্কলনের ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় ইহা "ইতি বিদ্যাপতেঃ" অর্থাৎ বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এই পদটিকে (আনন লোলুঅ বচনে বোলএ হঁসি। অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিমা সসি ॥) বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

পুঁথিতে শিবসিংহকে "মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ শিবসিংহদেব সংভুজ্যমান তীরভুক্তৌ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীঃ অব্দে বা তাহার পূর্বে শিবসিংহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' তাহার পূর্বে ১৪০২-১৪০৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। অনুমান 'কীর্তিলতা' ১৪০২ খ্রীঃ অব্দের অল্প পরেই রচিত হইয়াছিল। কারণ কীর্তিসিংহ মুসলমানের কবল হইতে ত্রিহুত পুনরধিকার করেন বলিয়া কবি তাঁহার কীর্তিকে অভিনন্দিত করিয়াই 'কীর্তিলতা' রচনা করেন। সুতরাং কীর্তিসিংহের রাজ্য-কালের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বিদ্যাপতির বয়স কত ছিল? বিদ্যাপতি এই গ্রন্থের এক স্থলে আপনাকে 'খেলন কবি' বলিয়াছেন:

মাধুর্য প্রসবস্থলী গুরুবন্দোথযশোবিস্তার শিক্ষাসখী।
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী ॥

অনু: মাধুর্যের প্রসবস্থলীস্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষাসখীসদৃশ খেলনকবি বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

আবার তিনি ঐ কাব্যে নিজ কবিতাকে 'বালচন্দ্রের' সহিত তুলনা দিয়া সদম্ভে বলিয়াছেন,

বালচন্দ্র বিজ্জাবই ভাসা।
দুহু নহি লগ্‌গই দুজ্জন হাসা ॥

অনু: বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা—এ দুয়ের কোনটিতে দুর্জনের উপহাস লাগিবে না।

এখানে 'বালচন্দ্র' এবং 'খেলন' শব্দ দুইটির তাৎপর্য বোধহয় বিদ্যাপতির নবীন বয়স। 'খেলন কবি' ('খেলুড়ে কবি') বলিতে বিদ্যাপতি বোধহয় তরুণ বয়সের ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহার খেলিবার বয়স উত্তীর্ণ হয় নাই। বিদ্যাপতির ভাষাকে বালচন্দ্রের সহিত উপমিত করাতেও তাহাই অনুমিত হইতেছে। 'কীর্তিলতা'র রচনার সময় (১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অঃ) বিদ্যাপতির বয়স বিশ-বাইশের ঊর্ধ্বে যাইবে না বলিয়া মনে হয়। তিনি ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে বা ইহার সামান্য কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনার সহিত এই তারিখের কোন বিরোধ দেখা দিবে না। অবশ্য ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দও আমাদের অনুমান মাত্র, তবে এই অনুমান অযৌক্তিক নহে।

৩। বিদ্যাপতি-রচিত গ্রন্থের রচনাকাল ॥

পদাবলী ব্যতীত বিদ্যাপতি প্রায় বারখানি গ্রন্থ লিখিয়া মিথিলা ও বাঙলার বিদ্যাসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং স্মার্ত পণ্ডিতরূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পদাবলীর খোঁজ রাখিতেন না, তাঁহারা তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তাঁহার গ্রন্থে সনতারিখের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও যে রাজা বা রাজবংশের অধীনে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বা তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিযাছেন। সুতরাং মিথিলার রাজপঞ্জী এবং সমকালীন ত্রিহুত ও নেপালের ইতিহাস মিলাইয়া বিদ্যাপতির অবহট্ট ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সনতারিখের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওযা যায়। 'কীর্তিলতা'র রচনার কিছু পূর্বে (১৪০০ খ্রীঃ অঃ) যখন মিথিলায় অসলানের শাসন দৃঢ হইয়াছে, তখন কীর্তিসিংহের জ্ঞাতি-পিতৃব্য দেবসিংহ ত্রিহুত ত্যাগ করিয়া নেপালেব নৈমিযারণ্যে বাস করিতেছিলেন; বোধহয় বিদ্যাপতিও সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন—এই সময় অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে দেবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমা' রচনা করেন। ১৪১০ খ্রীঃ অব্দে শিবসিংহের সময়ে 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'কীর্তিপতাকা' রচিত হয। শিবসিংহের মৃত্যু বা অন্তর্ধানের পর বিদ্যাপতি দ্রোণবারের অধিপতি পুরাদিত্যেব আশ্রয গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দেশে ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে সংস্কৃতভাষায় 'লিখনাবলী' নামক পত্র লিখিবার গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৩০-৪০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে বিদ্যাপতি কর্তৃক 'শৈবসর্বস্বসার' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী' নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়। ১৪৭০-৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তিনি 'বিভাগসার' ও 'দানবাক্যাবলী' নামক দুইখানি স্মৃতি এবং 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামক দুর্গাপূজাবিষয়ক বিরাট নিবন্ধ রচনা করেন। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র পর তাঁহার আর কোন গ্রন্থ রচিত হইযাছিল বলিয়া মনে হয় না। কবি ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই সুবৃদ্ধ হইযা পডিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কত দিন জীবিত ছিলেন তাহা জানা যায না। জীবিত থাকিলেও মিথিলার সমাজ জীবনের সঙ্গে এই প্রাচীন কবির বিশেষ কোন যোগ ছিল না। 'ভূপরিক্রমা' (১৪০০ খ্রীঃ অঃ) হইতে শুরু করিয়া 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র রচনাকাল (আঃ ১৪৬০ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত—প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া কবি সাক্ষাৎভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া এবং অসংখ্য পদাবলী লিখিয়া মিথিলা ও মিথিলার বাহিরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে কবি টেনিসন এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত

এতকাল ধরিয়া সারস্বত প্রতিভার অটুট ঐশ্বর্য বহন করিবার মানসিক শক্তি খুব কম লেখকেরই দেখা গিয়াছে। মোট ষাট বৎসরকাল ধরিয়া তিনি গ্রন্থ ও পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং বিশ বৎসর বয়সের পূর্বে সম্ভবতঃ তিনি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হন নাই। অন্ততঃ ১৪০০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার বয়স বিশ বৎসরের কম হইলে দেবসিংহ নিশ্চয় তাঁহাকে 'ভূপরিক্রমা'র মত তথ্যবহুল Gazetteer ধরনের গ্রন্থ লিখিতে নির্দেশ দিতেন না। সুতরাং 'ভূপরিক্রমা' রচনার সময় তাঁহার বয়স অন্যূন বিশ বৎসর ধরিলে ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে বা তাহার নিকটবর্তী কোন সময়ে তাঁহার জন্ম হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার আনুমানিক জন্মসন (১৩৮০ খ্রীঃ অঃ) এবং তিরোধানসন (১৪৬০ খ্রীঃ অঃ) একেবারে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ না করা গেলেও, গবেষকগণ এই তারিখ দুইটির যৌক্তিকতা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

৪। 'কাব্যপ্রকাশবিবেক' ও ভাগবতের নকল ॥

শ্রীধরবিরচিত 'কাব্যপ্রকাশবিবেকে'র পুঁথিতে বিদ্যাপতিকে বলা হইয়াছে "সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতিনামাজ্ঞয়া" ইত্যাদি। বিদ্যাপতির আদেশে ১৪১০ খ্রীঃ অব্দে এই পুঁথি নকল করা হয়। ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতির জন্মকাল ধরিলে এই সময়ে তাঁহার বয়স হইবে ত্রিবিশ বৎসর। ত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে পাণ্ডিত্যের জন্য 'সদুপাধ্যায' বলিয়া প্রশংসা করা যাইতে পারে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন যে, ১৩৯০ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। ইহা সত্য হইলে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে (১৩৯০ খ্রীঃ অঃ জন্ম, ১৪১০ খ্রীঃ অঃ কাব্যপ্রকাশের পুঁথির নকল) 'উপাধ্যায' রূপে বিদ্যাপতি খ্যাত হইবেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? ১৪১০ খ্রীঃ অব্দ তাহার জন্মসন ধরিলে 'কাব্যপ্রকাশবিবেকে'র নকলে উল্লিখিত তারিখের সহিত কোন বিরোধ দেখা দিবে না।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের মৃত্যুর পর (আঃ ১৪১৪ খ্রীঃ অঃ) যখন কামেশ্বর বংশের আশ্রয়চ্যুত হইয়া রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়ে কাল যাপন করিতেছিলেন, তখন (১৪২৮ খ্রীঃ অঃ) তিনি ভাগবত নকল করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পুঁথিখানির পুষ্পিকায় আছে, "শুভমস্তু সর্বার্থগতা সংখ্যা ল.সং ৩০৯ শ্রাবণ শুদি ১৫ কুজে রাজবনৌলি গ্রামে শ্রীবিদ্যাপতের্লিপিরিয়মিতি।" কেহ কেহ ৩০৯ ল. সং-কে ভ্রমক্রমে ৩৪৯ ল সং ধরিয়াছেন (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়),

কেহ-বা উক্ত পুঁথিতে ৩৮৯ ল. সং. পাইয়াছেন (মহাঃ উমেশ মিশ্র)। কিন্তু ডঃ জয়কান্ত মিশ্র ও রমানাথ ঝা দুই জনে মিলিয়া দ্বারভাঙ্গা রাজ-লাইব্রেরীতে রক্ষিত এই পুঁথিটির পাঠ পরীক্ষা করিয়া ৩০৯ ল. সং. পাইয়াছেন।[১১] সুতরাং ৩০৯ ল. সং অর্থাৎ ১৪২৮ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতি রাজবনৌলি গ্রামে বসিয়া ভাগবত নকল করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। জীবনে নানা দুঃখকষ্টের আঘাত সহিয়া তিনি প্রায় প্রবীণ বয়সে ভাগবত নকলে অতিবাহিত করিবেন, তাহাই তো স্বাভাবিক।

৫। দানপত্র॥

শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করিয়া একখানি তাম্রপট্টে তাহা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। তাহা বিদ্যাপতির বংশধরগণ সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। ইংরাজ আমলে জমিজরিপের সময় তাঁহারা সেই তাম্রপত্রখানি সরকারী কর্মচারীর নিকট দলিল হিসাবে দাখিল করেন, কিন্তু সেই দানপত্রের প্রামাণিকতা ইংরাজ কর্মচারী স্বীকার করেন নাই। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সর্বপ্রথম সুধীসমাজে এই তাম্রপট্টের কথা বিজ্ঞাপিত করেন। রাজকৃষ্ণ 'বঙ্গদর্শনে' ইহার কিয়দংশ উল্লেখ করিয়া তৎসহ অনুবাদও দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে—

> "২৯৩ লক্ষ্মণসেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভ তিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজাপান দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহদেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সস রাবর বাঁসপী নামক গ্রাম সীমা পর্যন্ত শাসন স্বরূপ প্রদান করিলেন" (রাজকৃষ্ণ অনূদিত, বঙ্গদর্শন, ১২৮২, জ্যৈষ্ঠ)।

২৯৩ ল. সংবতে অর্থাৎ ১৪১২ খ্রীঃ অব্দে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে এই গ্রামটি দান করিয়াছিলেন। তারিখ হিসাবে ২৯৩ ল. সংবতে কোন বৈষম্য নাই। কারণ শিবসিংহ ১৪১০-১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এ কথা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন।[১২] সুতরাং ১৪১২ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতিকে গ্রাম দান করিয়া দানপত্রে উল্লেখ করা কোন দিক দিয়াই অসঙ্গত বা অপ্রামাণিক হয় নাই। অবশ্য মিথিলার রাজপঞ্জীতে শিবসিংহের

[১১] Dr. Jayakanta Misra—*History of Maithili Literature*, p. 185

[১২] মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র পৃ. ২১/০ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যপ্রাপ্তিকালের সহিত ঐ দানপত্রের তারিখের ঐকমত্য নাই। রাজপঞ্জী অনুসারে শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, অথচ ১৪১২ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীন রাজার মতো বিদ্যাপতিকে গ্রাম দান করিতেছেন, ইহা অসঙ্গত। কিন্তু মিথিলার রাজপঞ্জীকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, কারণ উহাতে সনতারিখের অনেক অসঙ্গতি আছে। সুতরাং রাজপঞ্জীর নজিরে উক্ত দানপত্রখানিকে বাতিল করা উচিত হইবে না। কিন্তু বাতিল করার পক্ষে অন্য গুরুতর কারণ আছে।

ভূমিদানপত্রে অতি সাবধানতার সহিত ল. সংবত (২৯৩), বিক্রমসংবত (১৪৫৫), শকাব্দ (১৩২১) এবং ফস্‌লী-হিজরী সনের (৮০৭) উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রপট্টে একসঙ্গে এতগুলি সনের উল্লেখ কোথাও প্রায় পাওয়া যায় না। ইহাতে সমস্ত সনের নিপুণ উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, কোন সময়ে ইহার প্রামাণিকতা লইয়া সন্দেহ উঠিতে পারে অনুমান করিয়াই যেন দানকর্তা তাম্রপত্রে সমস্ত সনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাই কাহারও কাহারও মনে এই তাম্রপত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিলে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গ্রীয়ার্সন ইহাকে জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিবসিংহ হয়তো বিদ্যাপতিকে কোন গ্রাম দান করিযা থাকিবেন; কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ প্রমাণ হিসাবে যে দানপত্রখানি দাখিল করিযাছেন, তাহা নিশ্চযই জাল—ঐ সনতারিখের মধ্যেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইহাতে উল্লিখিত 'ফস্‌লী-হিজরী' সন শিবসিংহের সময়ে প্রচলিতই হয় নাই; শিবসিংহেব অনেক পরে আকবরের সময়ে ইহা প্রচারিত হয। টোডবমল্লের সময়ে যখন নূতন করিযা জমি জরিপ হইতেছিল, তখন হযতো বিদ্যাপতির বংশধরগণ সমস্ত সন্দেহ নিরসন কবিবার জন্য তৎসমসাময়িক 'ফস্‌লী-হিজরী' সনেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো এই কৌশলে টোডরমল্লেব সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকের নিকট তাহার ফাঁকি ধরা পড়িয়াছে। অতএব দানপত্রের প্রামাণিকতা বিদ্যাপতির কালনির্ণয়প্রসঙ্গে স্বীকৃত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, দানপত্রটি জাল নহে, বিদ্যাপতির বংশধরগণ বোধহয় ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ টোডরমল্লের নিকট কোনরূপ দানপত্রের নজির দাখিল না করিতে পারিলে তাঁহারা গ্রামখানির অধিকার

হইতে বঞ্চিত হইতেন। এইজন্যই বোধহয় তাঁহারা একখানা নকল দানপত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহের দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়া সংশয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। উপরন্তু ঐ চার সনের (ল. সং, বিক্রম সং, শকাব্দ, ফসলী-হিজরী) মধ্যেও ঐকমত্য নাই, অর্থাৎ শকাব্দ বলিয়া যে সনের উল্লেখ করা হইয়াছে লক্ষ্মণসংবতের হিসাবে সেই সন প্াওয়া যায় না। সুতরাং মনে হয়, কার্যসিদ্ধির জন্য, এক সনের সহিত অপর সনের ঐকমত্য স্থির না করিয়াই নিতান্ত মূঢ়ের মতো সনগুলি উল্লিখিত হইয়াছে

৬। একটি পদ ॥

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ ১৩০৭ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির একটি পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম তিন ছত্র—

অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরবই সক সমুদ্দকর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পএ জাউলসী ॥
দেবসিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ অদ্ধাসন সুররাএ সরূ।

এবং শেষ দুই পংক্তি—

বিজ্জাবই কবিবর এহু গাবএ মানব মন আনন্দ ভএ।
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠ্ঠো উচ্ছবৈ বৈরস বিসরি গাএ ॥

অনু: ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে, ১৩২৪ শকে চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র মিলিত বৃহস্পতিবার দিবাবসানকালে দেবসিংহ (শিবসিংহের পিতা) পৃথিবী ছাড়িয়া সুররাজের অর্ধাসন পাইলেন।··· বিদ্যাপতি কবি এই গান করিতেছেন। লোকের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ সিংহাসনে বসিলেন। লোকেরা উৎসবে বিষাদ ভুলিয়া গেল।

অবহট্ট ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির এই পদে দেখা যাইতেছে যে, ২৯৩ ল. সংবতে বা ১৩২৪ শকে দেবসিংহের মৃত্যু হয়, এবং শিবসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ঐ দুই তারিখের কোন একটির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। কারণ ঐ দুই সনকে খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত করিলে (২৯৩ ল. সং—১৪১২ খ্রীঃ অঃ; ১৩২৪ শক = ১৪০২ খ্রীঃ অঃ) দুইটি পৃথক খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ঐ সন দুইটির কোন একটিতে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমাণ করিয়াছেন যে,

২৯৩ লক্ষ্মণাব্দের চৈত্রমাসে ১৩৩৪ শক হয়—১৩২৪ শক নহে। মনোমোহন চক্রবর্তীও জ্যোতিষগণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ১৩৩৩ শকের ঐ তারিখে বৃহস্পতিবার হইয়াছিল, ১৩২৪ শকের ঐ তারিখে বৃহস্পতিবার পড়ে নাই। সনতারিখের ঐ গোলমাল মিটাইবার জন্য কেহ কেহ প্রথম পংক্তির 'কর' শব্দটিকে 'পুব' করিয়া লইতে চাহেন ; তাহা হইলে ১৩২৪ শকের স্থলে ১৩৩৪ শক পাওয়া যায় এবং সনতারিখের অসামঞ্জস্যও দূর হয় এবং শিবসিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তির আরও একটা নির্ভরযোগ্য তারিখ (১৪১২-১৩ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। কিন্তু এইরূপ জোড়াতালি দিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত পদের দৃষ্টান্তে কোন একটি নূতন তথ্য আবিষ্কারও সম্ভব নহে।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত আরও একটি পদে ('সপন দেখল হম সিবসিংঘ ভূপ' ইত্যাদি) দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতি শিবসিংহের মৃত্যুর বত্রিশ বৎসর পরে মৃত সুহৃদকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যুর বত্রিশ বৎসর পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ১৪৪৭-৪৮ খ্রীঃ অব্দেও বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন। মহা মহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র মনে করেন যে, জ্যোতিষবচন অনুসারে ইহার পরেই বিদ্যাপতির মৃত্যু হয়। এ মত নিতান্ত ভ্রান্ত। জ্যোতিষ ও গ্রহাচার্যের বচন ঐতিহাসিক সনতারিখ নির্ণয়ে সর্বপ্রকারে পরিত্যাজ্য। উপরন্তু বিদ্যাপতি ঐ সনের পরেও (অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন। সুতরাং ঐ সংশয়যুক্ত পদটিকে বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে প্রযোগ না করাই উচিত।

ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশে' আছে যে, অদ্বৈতের সহিত নাকি বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহা জনশ্রুতিনির্ভর ও ঐতিহাসিক প্রমাণ সাপেক্ষ নহে। বিশেষতঃ 'অদ্বৈতপ্রকাশে'র সমস্ত তথ্যই পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। যেমন বাঙলাদেশে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কাল্পনিক সাক্ষাৎ-সংক্রান্ত বহু পদ রচিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি অনুমান ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া 'অদ্বৈত প্রকাশে' অদ্বৈত-বিদ্যাপতি সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে ইহাও কোন সাহায্য করে না।

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অবলম্বনে শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে, মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ঠক্কুর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে (আঃ ১৩৮০ খ্রীঃ অঃ) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেরও কিছু পরে (আঃ

১৪৬০ খ্রীঃ অঃ) জীবিত ছিলেন; তাঁহার বয়স অনুমান আশী বৎসর হইয়াছিল—ইহার কিছু অধিক হওয়াও অসম্ভব নহে। এতদতিরিক্ত অন্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাহার দ্বারা তাঁহার আয়ুষ্কালসম্পর্কে কোন সংশয়হীন তথ্যনির্ভর যুক্তি পরিবেশন করা যাইতে পারে।

॥ ৫ ॥

বিদ্যাপতির গ্রন্থাবলী

বাঙলাদেশে বিদ্যাপতি প্রধানতঃ পদকর্তারূপে পরিচিত হইলেও মিথিলায় তাঁহার গ্রন্থগুলি অধিকতর সুপরিচিত। অবশ্য দ্বারভাঙ্গায় বিদ্যাপতির হরগৌরীবিষয়ক পদসমূহ এখনও প্রচলিত আছে, এবং বিবাহাদি উপলক্ষে মহিলারা অদ্যাপি বিদ্যাপতিরচিত ঐ পদসমূহ গান করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির পদাবলী লুপ্ত হইলেও অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি তাহাকে বিস্মৃতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিত। স্মৃতি, মীমাংসা, ব্যবহারশাস্ত্র, পূজাপদ্ধতি, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থবর্ণনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি অশেষ কৌতূহল দেখাইয়াছেন। কোন কোন সমালোচক বিদ্যাপতির বিচিত্র প্রতিভার সহিত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর তুলনা দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার প্রতিভার সাধর্ম্য লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, "কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন কবির এরূপ বহুমুখী প্রতিভার কথা আমাদের জানা নাই।"[১৩] উল্লিখিত শিল্পিদ্বয় শিল্পী হইলেও পূর্তবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা ও দর্শনেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা তো বহুব্যাপ্ত ও দুরবগাহ। সেইরূপ বিদ্যাপতিও শুধু কবি নহেন—রাজনীতিক, স্মৃতিকার, ব্যবহারবিৎ, আখ্যানলেখক—বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি আপনার প্রতিভাকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিভাও দিগ্‌বিস্তারী ও বহুব্যাপক। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইলেই এ কথার সত্যতা বুঝা যাইবে।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'ভূপরিক্রমা' ১৪০০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে দেবসিংহের নির্দেশে রচিত হয়। যে-কোন কারণেই হউক, তখন দেবসিংহ

১৩ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী', ভূমিকা

মিথিলা ত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন। বিদ্যাপতিও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত যাবতীয় তীর্থের বর্ণনা দিয়াছেন।[1] তিনি নিশ্চয় এই সমস্ত তীর্থ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে ইহাতে এইরূপ ভৌগোলিক তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনা থাকিত না। এই সময়ের পূর্বেই মিথিলা অসলান কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতিও বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুর ধর্মসংস্কৃতিকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে তীর্থমাহাত্ম্য ধরনের গ্রন্থের একান্ত প্রয়োজন।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ ('কীর্তিলতা' অবহট্ট ভাষায় লিখিত।) মৃত গণেশ্বরের পুত্রদ্বয় বীরসিংহ ও কীর্তিসিংহ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহের আনুকূল্যে অসলানের কবল হইতে পিতৃরাজ্য ত্রিহুত পুনরধিকার করেন। যুদ্ধে বোধহয় বীরসিংহ নিহত হন। কীর্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং এবিষয়ে স্মার্ত বিদ্যাপতি তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। কবি বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা' কীর্তিসিংহের বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়া রচিত। কি করিয়া দুই ভাই জৌনপুরে গিয়া ইব্রাহিমের সাক্ষাৎলাভ করিলেন এবং অবশেষে আততায়ী অসলানকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে জৌনপুরের নাগরিক ঐশ্বর্যের বর্ণনাই অধিক। রাজসভাজীবী নাগরিক কবি জৌনপুরের বারাঙ্গনাসেবিত বিলাসবিভ্রম বর্ণনায় অধিকতর উল্লাস বোধ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ইহাতে 'তুরুক' ও হিন্দুর বিরোধের সম্পর্কটুকুও বাস্তবতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আততায়ী 'তুরুক' মিথিলায় কীভাবে ব্রাহ্মণসজ্জন ও জনসাধারণকে নিগৃহীত করিতেছিল, তাহার জীবন্ত বর্ণনা ইহার অন্যতম সম্পদ্। বিদ্যাপতি অবশ্য আততায়ী মুসলমানের পরধর্মদ্বেষী রূপটি অধিকতর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কাজেই অসলানের সেনাবাহিনীর সেই চণ্ড পরিচয় ইহাতে তীব্র ঘৃণা ও ব্যঙ্গের সহিত বিবৃত হইয়াছে। মধ্যযুগে এইরূপ একখানা সমাজসচেতন ঐতিহাসিক গ্রন্থ পূর্ব-ভারতে লিখিত হয় নাই। ত্রিহুতের সমকালীন ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থটি অবহট্ট ভাষায় গদ্যপদ্যে রচিত। (অবহট্ট হইল শৌরসেনী অপভ্রংশের একটি অপ্রচলিত অর্বাচীন রূপ।) খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর কাছাকাছি

সময়ে ইহা অন্যতম সাহিত্যিক সাধুভাষা হিসাবে স্বল্পপরিমাণে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে'র শ্লোকগুলি এই অবহট্টের লক্ষণাক্রান্ত। রাজপুতানার ভাটবন্দিগণ 'পিঙ্গল' নামক যে ভাষায় গাথা ও গান রচনা করিতেন, তাহা এই অবহট্টেরই অনুরূপ। প্রাদেশিক ভাষাসমূহ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও পশ্চিমা অপভ্রংশের গর্ভজাত এই অবহট্ট অনেক দিন কবিদের দ্বারা অনুশীলিত হইত। বিদ্যাপতি অবহট্টেও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার 'অনল বন্ধকর লখ্খন নরবএ সক সমুদ্দকর অগিনী সসী' এবং

'দূর দুগ্গম দমসি ভঞ্জেও
গাঢ় গঢ় গূঢীঅ গঞ্জেও
পাতিসাহ সসীম সীমা
সমর দরসেও রে—'

পদটি[১৪] অবহট্ট ভাষায় রচিত। (শিবসিংহের কীর্তি ও প্রণয়কে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাপতি অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিপতাকা' নামক আর-একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।) পুঁথিটি নেপাল রাজদরবারে রক্ষিত হইলেও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার যেটুকু লিখিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তদতিরিক্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র নাকি নেপাল হইতে ইহার এক নকল আনিয়াছেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র ডঃ জয়কান্ত মিশ্রের গ্রন্থে ইহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কীর্তিপতাকা'র প্রথম দিকে শিবসিংহের শৃঙ্গাররসবহুল লীলা বর্ণিত হইয়াছে, শেষাংশে তিনি কি করিয়া এক মুসলমান নরপতিকে (গৌড়ের সুলতান?) পরাভূত করিলেন তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

(এই দুইখানি গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলে তাঁহার আর সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে রচিত। সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই স্মৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধীয়। কেবল 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'লিখনাবলী' ধর্মীয় প্রেরণা হইতে রচিত নহে। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে (অর্থাৎ ১৪১০-১৪১৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) রচিত হইয়াছিল। ইহাতে অনেক ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প আছে। গ্রন্থটি পরবর্তী কালেও জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছিল। হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে লণ্ডন

১৪ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী', ৯ সংখ্যক পদ।

হইতেও ইহার এক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালেও এই 'পুরুষপরীক্ষা'র বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। 'লিখনাবলী' সংস্কৃতে পত্রলিখনপদ্ধতি শিখাইবার জন্য ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। কবি তখন শিবসিংহের আশ্রয়চ্যুত হইয়া দ্রোণবারের অধিপতি পুরাদিত্যের শরণ লইয়াছিলেন। পুরাদিত্যের নির্দেশে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি 'লিখনাবলী'র প্রারম্ভে বলিযাছেন যে, পুরাদিত্যের নির্দেশে তিনি স্বল্পবিদ্য জনসাধারণের জন্য এবং বিদ্বজ্জনের কৌতুকের জন্য এই 'লিখনাবলী' রচনা কবিয়াছেন।[১৫] বিদ্যাপতি এই পত্রগুলি অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীর ভাবসৌকর্যের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ১৫শ শতাব্দীর মিথিলার দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য শিক্ষার্থীকে পত্রলিখন শিখান ভিন্ন ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিতান্ত প্রযোজনের তাডনায কবি-মনীষী বিদ্যাপতিকে এই পুস্তকখানি রচনা করিতে হইয়াছিল।

ইহাব পব তাঁহার স্মৃতি ও ব্যবহার বিষযক গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। শিবসিংহের প্রিয় সুহৃদরূপে ত্রিহুত রাজসভায় অবস্থান করিযা কবি বিদ্যাপতি প্রচুর পদ রচনা করিয়াছিলেন। 'কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তাঁহাব কাব্য-উৎস কিছু পরিমাণে শুকাইয়া যায়।' বোধহয় ইহার পরেও তিনি পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৪৪২ খ্রীঃ অব্দের পর তাঁহার বিশেষ কোন পদ রচিত হয় নাই বলিয়া অনুমিত হইতেছে।[১৬] অবশ্য পরে মিথিলায় ফিরিয়া তিনি পদ্মসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দের পর তাঁহার লেখনী হইতে অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর পদ বাহির হয় নাই। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি স্মৃতিসংহিতা ও দেবদেবীপূজা বিষয়ক গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিশুদ্ধ ব্যবহারগ্রন্থের মধ্যে 'বিভাগসার' ও 'দানবাক্যাবলী'র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৪৪০-৬০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে "দর্পনারায়ণ" নরসিংহের নির্দেশে 'বিভাগসার' এবং তাঁহার পত্নী ধীরমতী দেবীর নির্দেশে 'দানবাক্যাবলী'

১৫ "অল্পশ্রুতোপদেশায় কৌতুকায় বহুশ্রুতাম্। বিদ্যাপতিস্ সতাং প্রীত্যৈ করোতি লিখনা-বলীম্"—'লিখনাবলীর' এই প্রথম শ্লোকটি ডঃ উমেশ মিশ্রের 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' নামক হিন্দী গবেষণা গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৬ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী'র ২৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য

রচিত হয়।) 'বিভাগসার' দায়ভাগশ্রেণীর গ্রন্থ; সম্পত্তিবণ্টন ও উত্তরাধিকার-তত্ত্বই ইহার মূল বক্তব্য। মোট ৫৮৫টি শ্লোকে সমাপ্ত এই গ্রন্থে দ্বাদশপুত্র-লক্ষণ-নিরূপণ, অপুত্রকের ধনাধিকারি-নিরূপণ, স্ত্রীধনবণ্টন, গুপ্তধনপ্রাপ্তি ও তাহার বিভাগবণ্টন, অসংস্কৃত সংস্কার ইত্যাদি ব্যবহারসম্পর্কীয় তথ্যাদি আলোচিত হইয়াছে। দর্পনারায়ণের পত্নী রাণী ধীরমতী দেবী পরম শ্রদ্ধার্হা দানশীলা মহিলা বলিয়া সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন। জলাশয়খনন, ধর্মশালানির্মাণ এবং ভিক্ষুকদিগকে অন্নপানাদি দান করিয়া যিনি জীবিত কালেই অশেষ দানকীর্তি লাভ কবিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশীলা ধীবমতী দেবী যে বিভিন্ন দানের শাস্ত্রীয তাৎপযনির্ণয়ের জন্য স্মার্ত বিদ্যাপতির দ্বাবা 'দানবাক্যাবলী' রচনা কবাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বাঙলার প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার রঘুনন্দনও 'বিবাহতত্ত্ব' নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির 'দানবাক্যাবলা হইতে প্রমাণবচন উদ্ধৃত করিযাছিলেন। 'বর্ষনির্ণয়' নামক গ্রন্থে বাবমাসের করণীয পুণ্যকর্ম এবং 'গয়াপত্তনে' গয়াধামের তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মসিংহের পত্নী বাণী বিশ্বাস দেবীর নির্দেশে কবি 'শম্ভুবাক্যাবলী' বা 'শৈবসর্বস্বসাব' (মতান্তরে 'শৈবসর্বস্বহাব'), 'শৈবসর্বস্বসার-প্রমাণভূত-পুরাণ-সংগ্রহ' এবং 'গঙ্গাবাক্যাবলী" রচনা করেন।[1] বাণী বিশ্বাস দেবীর যেটুকু পরিচয পাওয়া গিযাছে, তাহাতে তাঁহাকে পরম বিদুষী বলিযাই মনে হইতেছে। তিনি কিছুকাল মিথিলা শাসন করিয়াছিলেন। এই তিনখানি গ্রন্থে বিদ্যাপতি তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূযসী প্রশংসা করিয়াছেন; ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিশ্বাস দেবী সে যুগে একজন অসামান্যা মহিলা ছিলেন। 'গঙ্গাবাক্যাবলী' রচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি বলিযাছেন যে, স্বয়ং বিশ্বাস দেবীই ইহার বচয়িত্রী, বিদ্যাপতি শুধু প্রমাণশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। হয়তো ইহা আশ্রিতবৎসলার প্রতি আশ্রিতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। তবু এই অবিস্মরণীয় মহিলা যে একদা নারীত্বের আদর্শ-রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার স্বামী পদ্মসিংহ পত্নীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির ছায়ায় অদৃশ্য হইয়া গিযাছেন। ইতিহাস এই মহিলা সম্বন্ধে মিতবাক্; তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা গেল তাঁহাকে মধ্যযুগের মহিয়সী ভারতমহিলার পার্শ্বে পরম গৌরবে স্থাপন করা যাইত। হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাসাগর

পর্যন্ত গঙ্গার উপকূলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তীর্থে কি কি ক্রিয়া করিতে হইবে, 'গঙ্গাবাক্যাবলী'-তে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

'শৈবসর্বস্বসার' শৈবস্মৃতি গ্রন্থ। নানা স্মৃতিসংহিতা মন্থন করিয়া বিদ্যাপতি শিবোপাসনা সম্বন্ধে এই প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহাদের বংশ প্রধানতঃ শিবোপাসক, তাঁহারা অনেক শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাপতিও নাকি স্বগ্রাম বিসফীতে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হরগৌরীবিষয়ক অনেক মৈথিলী পদ এখনও ত্রিহুতে অতিশয় জনপ্রিয়। মিথিলাবাসিগণ বিদ্যাপতিকে শৈব বলিয়াই জানেন।[১৭] তাঁহার সুহৃদ রাজা শিবসিংহও 'ভব' অর্থাৎ শিবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতির চিত্ত শৈবধর্মের বাতাযনে লালিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং এইজন্যই হয়তো শিবোপাসনা বিষয়ে এই স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতির সর্বশেষ স্মৃতিগ্রন্থ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' "রূপনারায়ণ" ভৈরবসিংহ-দেবের নির্দেশে রচিত হয়। যদিও গ্রন্থটি ভৈরবসিংহদেবের নির্দেশে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন মিথিলার অধিপতি ছিলেন ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহদেব। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনাসমাপ্তির সময় বীরসিংহ অর্থাৎ নরসিংহদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই গ্রন্থে নরসিংহ-দেবের তিন পুত্র ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও চন্দ্রসিংহের জয়গান করা হইয়াছে; তবে নৃপতি ধীরসিংহের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা ও গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। *History of Tirhut* গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সিংহ মহাশয়ের মতে ধীরসিংহের রাজত্বকালে (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচিত হয়। ১৪৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন; সুতরাং এই গ্রন্থ এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব। সহস্রাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ দুর্গাপূজাসংক্রান্ত স্মৃতিনিবন্ধের অন্যতম প্রামাণিক নিবন্ধরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার পরবর্তী কালে যাঁহারা দুর্গাপূজাসংক্রান্ত আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শুনা যায়, বিদ্যাপতি নাকি 'গোরক্ষোপাখ্যান' নামক একখানি

১৭ পরবর্তী অধ্যায়ে 'বিদ্যাপতির ধর্ম' শীর্ষক অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

নাটক রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] কিন্তু এ বিষয়েও কোন তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা যায় নাই।/

বিদ্যাপতি-রচিত উল্লিখিত সংস্কৃত ও অবহট্ট ভাষার গ্রন্থগুলির পরিচয় লইলে তাঁহার প্রতিভাকে বিচিত্রমুখী ও বিপুলপ্রসারী মনে হইবে। (ঐতিহাসিক আখ্যান, স্মৃতিনিবন্ধ, রোমান্টিক গল্প, গেজেটিয়ার জাতীয় তীর্থবিবরণী, পত্রলিখনাদর্শ প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়া তিনি তীরভুক্তির এক বিস্ময়কর প্রতিভাদর্শরূপে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।) পুনঃ পুনঃ মুসলমান আক্রমণে ও প্রভাবে মিথিলার সমাজ ও সংস্কৃতি নানা দিক দিয়া বিপন্ন হইয়াছিল, তিনি নিজেও বহু দুর্যোগ সহ্য করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি কামেশ্বর বংশের রাজা ও রাজ্ঞীদের নির্দেশে নানা স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচনা ও শ্লোক সংগ্রহ করিয়া বিস্মৃতপ্রায় পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাই মিথিলার রাজগণ যখন বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজকে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা দৃঢ় করিতে চাহিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিদ্যাপতিকেই স্মরণ করিয়াছেন। সুতরাং মিথিলায় মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিগঠন ও সমন্বয়ে স্মার্ত বিদ্যাপতির দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার্য।

(এই স্মৃতিগ্রন্থগুলি হইতে আরও একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইল মিথিলাবাসীর সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত অবিরোধী মনোভাব। শৈব ও শাক্ত উভয় শ্রেণীর জন্যই স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া বিদ্যাপতি তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।) ভৈরবসিংহ ধর্মমতে বৈষ্ণব হইলেও মিথিলার রাজবংশ প্রধানতঃ শৈব ছিল। ভৈরবসিংহকে তাঁহার কোন এক সভাসদ "শ্রীবাসুদেবভক্তঃ শ্রীমানয়ঃ নরেন্দ্রঃ" বলিয়াছিলেন।[১৯] তাঁহার কয়েক জন সভাসদও তাঁহার প্রভাবে হয়তো বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন এক সভাসদ-বিরচিত 'দত্তবিবেক' নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে রাধিকা ও কৃষ্ণের বর্ণনা আছে। ভৈরবসিংহ ধর্মমতে বৈষ্ণব হউন, আর নাই হউন, বিদ্যাপতি তাঁহার 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে রাজকুমার ভৈরবসিংহের নামও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন; মনে হয়, পঞ্চোপাসক হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মমত মিথিলায় নিরুদ্বেগে পাশাপাশি বাস করিত।

কেহ কেহ বিচিত্রমুখী বিদ্যাপতি-প্রতিভার সহিত রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম

---

১৮ Dr. Jaykanta Misra—*History of Maithili Literature*'

১৯ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বিদ্যাপতিগোষ্ঠী

প্রতিভার সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এ সাদৃশ্য-প্রদর্শন অনেকটা কষ্টকল্পিত। বিদ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থগুলির দ্বারা একযুগের মিথিলার স্মার্তসমাজের বিপুল প্রভাব বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু 'পুরুষপরীক্ষা' নামক 'হিতোপদেশ' শ্রেণীর গ্রন্থটি বাদ দিলে 'ভূপবিক্রমা', 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী', 'গঙ্গাবাক্যাবলী', 'শৈবসর্বস্বসার', 'লিখনাবলী' 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'—ইহাদের কোন্‌খানির মধ্যে বিদ্যাপতির বিশ্বতোমুখী প্রতিভা নিহিত আছে, যাহার জন্য তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথ গ্যয়টের তুলনা চলিতে পারে? অনেকে উচ্ছ্বাসের বশে বলিয়া থাকেন, "যে গানে তাঁহার খ্যাতি, যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্বতোমুখী।[২০] কিন্তু এ কথা সর্বথা স্বীকার্য, বিদ্যাপতির খ্যাতি স্মৃতিনিবন্ধ-গুলির উপর নির্ভর করিয়া নাই, বিদ্যাপতি স্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহার পদাবলীর জন্য, আমরা পদাবলীর আলোকেই তাহার ভাণ্ডারের অন্যান্য রত্নের খোঁজ লইয়াছি। বিদ্যাপতি পদাবলী না লিখিয়া শুধু স্মৃতিনিবন্ধকার হইলে তিনি ত্রিহুতের সীমা ছাড়াইতে পারিতেন কিনা সন্দেহস্থল। বড় জোর বাঙলা-আসামের স্মৃতিনিবন্ধে তাহার কোন মত-সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিত মাত্র। তাই বলিয়া তাহাকে জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দনের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা চলিত কি? যাহা হউক সংস্কৃত অবহট্ট গ্রন্থগুলির দ্বারা তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা প্রমাণিত হইয়েছে, তদতিরিক্ত কিছু নহে। বিদ্যাপতি 'বিদ্যাপতি' হইয়াছেন তাঁহার পদাবলীর জন্য—স্মৃতিনিবন্ধের জন্য নহে

---

২০ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'কীর্তিলতা'র ভূমিকা

* বিদ্যাপতির নামে মনসাপূজা সংক্রান্ত 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী' নামক যে পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীগণেশচন্দ্র বসু মহাশয় *Indian Antiquary* (Vol VII, 3—4) পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহা যথার্থই কবি বিদ্যাপতির রচিত হইলে এই ব্রাহ্মণ স্মার্ত কবিও যে লৌকিক মনসাপূজাকে স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা সুপ্রমাণিত হইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিদ্যাপতির পদাবলী-পরিচয়

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, বিদ্যাপতি খাস মিথিলায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিজ্ঞানের জন্য যতই খ্যাতি লাভ করুন না কেন, তাঁহার প্রতিভার নিকষ পাথর হইতেছে পদাবলী। পদাবলীর দ্বারাই তাঁহার মানস-জীবন ও শিল্পসৌকুমার্যের অভূতপূর্ব পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হই। বিদ্যাপতি বাঙালী বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়, রসিক বাঙালীর শ্রদ্ধেয় কবি, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের নবরসিকের অন্যতম। তাঁহাকে ঘেরিয়া বাঙলা দেশে কত গল্প কাহিনী সৃষ্টি হইয়াছে। মিথিলা ও বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়—শুধু তাঁহার স্মৃতি ও অন্যান্য গ্রন্থের জন্য নহে। পদাবলীতেই বিদ্যাপতির প্রতিভা শ্রেষ্ঠ পথ পাইয়াছে। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর সমাদর দেখিয়া গত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া মিথিলাবাসীরা ত্রিহুত হইতে তাঁহার নামে প্রচলিত পদ সংগ্রহ করিতেছেন। অনেক মৈথিলী ও হিন্দী পণ্ডিত-গবেষক এই বিষয়ে বহু পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহারা বাঙলা দেশের নিকট ঋণী; ১৬শ শতাব্দী হইতে বিদ্যাপতির পদ বাঙলা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছে। মিথিলা ও বাঙলার মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য রহিয়াছে, উপরন্তু মিথিলার বিদ্যাসমাজের সহিত বাঙলায় সারস্বতসমাজের বিশেষ যোগাযোগ ছিল; এ দেশের ছাত্র ও দেশে অধ্যয়ন করিতে যাইত। কাজেই ১৬শ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব হইতেই দুই দেশের মধ্যে বেশ একটা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাইবে। এই সমস্ত কারণে এবং মহাপ্রভুর প্রভাবের ফলে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী বাঙলা দেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চৈতন্যদেব জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', লীলাশুকের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদ এবং রায় রামানন্দের নাটকাবলী পাঠ করিয়া দিব্যোন্মত্ত চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতেন। এইজন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণবসমাজ ও কীর্তনীয়াদের নিকটে বিদ্যাপতি অতিশয় শ্রদ্ধার্হ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদকে বাঙালী ভক্ত ও রসিকেরা আপনার করিয়া লইয়াছেন। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে কাব্যগুরুরূপে বরণ করিয়াছেন; ক্রমে বিদ্যাপতির

কবিখ্যাতি বৃদ্ধি পাইলে তাহার সহিত ধর্মীয় গল্পকথা মিশ্রিত হইয়া গিয়া তিনি মধ্যযুগের সাধুসন্তের পর্যায়ে উন্নীত হইলেন। ফলে বাঙলা দেশে নকল বিদ্যাপতি ও বাঙালী বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইল, অনেক নকল পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় চলিতে লাগিল। বিশুদ্ধ বাংলা পদেও বিদ্যাপতির ভণিতা ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বিদ্যাপতিকে খ্যাতির মাশুল গণিতে হইল, অনেকের শিল্প-গুণবর্জিত পদ তাঁহার ভণিতার ছদ্মবেশে অমরত্বের খেয়া পাড়ি দিল। ফলে খেয়া নৌকা ঝুটা মালে বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন আসল নকল চিনিয়া লওয়ার মত জহুরীও আর নাই। বিদ্যাপতির পদ নির্ধারণ করা এক দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইযাছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীতে আটশতেরও অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় অনেক গবেষণা করিয়া নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে সংশয়ের অবকাশ রাখিয়াও প্রায় ৯৩৩টি পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙালী-বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া যে পদগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা বিদ্যাপতির পদাবলীতে সংযোজিত হইলে মোট পদসংখ্যা দাঁড়াইবে ৯৬৫। এই বিপুল পদরাজির মধ্যে আসল-নকল ও বাঙালী-মৈথিলীর পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, সর্বপ্রথম এই পদাবলীর আকরস্থান স্থির করিয়া দেখা যাক।

॥ ১ ॥

পদাবলীর আকর

বিদ্যাপতি খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে বাঙলা দেশে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করিলেও ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশের পূর্বে কেবলমাত্র তাঁহার পদ লইয়া কোন সঙ্কলনগ্রন্থ বাঙলাদেশে ও বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত ছিল না। সেইজন্য কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালের 'পদামৃত-সমুদ্র', 'পদকল্পতরু', 'সঙ্কীর্তনামৃত', 'কীর্তনানন্দ' প্রভৃতি বিভিন্ন পদসঙ্কলনে অন্যান্য পদকর্তার সহিত বিদ্যাপতির অনেক পদ স্থান পাইয়াছে। বিদ্যাপতি কেন, মধ্যযুগে মাত্র একজন বৈষ্ণবমহাজনের পদাবলী লইয়া একখানি পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয় নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস,

বলরামদাস, রায়শেখর প্রভৃতি বিবিধ পদকর্তাদের নানা পদ লইয়াই এই সঙ্কলনগুলি বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রচলিত ছিল। (পরবর্তী কালে বাঙলার শিক্ষিত-সমাজ বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত পদগুলি এই সমস্ত পদসঙ্কলনগ্রন্থ হইতেই নির্বাচন করিয়া পৃথক পদাবলীরূপে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বোধহয় গ্রীয়ার্সনই সর্বপ্রথম খাস মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary* (Vol. II)তে প্রকাশ করেন।) (১৯শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে শুধু বিদ্যাপতির পদ লইয়া যে পদসংগ্রহ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার সমস্ত পদ পূর্বতন পদসংগ্রহ 'পদামৃতসমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'পদকল্পতরু' হইতেই সর্বাধিক পদ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ বৈষ্ণবপদ-সংগ্রহের বৃহত্তম সঙ্কলন এই গ্রন্থে বিদ্যাপতির সর্বাধিক পদ (১৬১টি) স্থান পাইয়াছে।) নিম্নে বিদ্যাপতির পদাবলীর আকরগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(ক) বাঙলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদাবলী ॥

প্রথমে বাঙলা দেশের সঙ্কলনগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বিদ্যাপতির পদের কথা ধরা যাক। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', 'পদামৃতসমুদ্র' ও পদকল্পতরু'—প্রধানতঃ এই তিনখানি সংগ্রহই প্রামাণিক। এতদ্ব্যতীত আরও দুইখানি ঈষৎ অর্বাচীনকালের সঙ্কলন 'সঙ্কীর্তনামৃত' (১৭১১ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত) ও 'কীর্তনানন্দ' (আরও আধুনিককালের হইতে পারে) নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের সংগ্রহে বিদ্যাপতির পদ গৃহীত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলিত হয়। ইহার মোট পদসংখ্যা—৩১৫। তন্মধ্যে ২১টি পদে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করিতে গিয়া 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত ৮টি পদ[১] এবং ভণিতাহীন আরও ৮টি পদ বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—যাহাকে যথেষ্ট প্রামাণিক বলা যায় না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি' হইতে এই ১৬টি পদ সহজেই বাদ দেওয়া চলিতে পারে। 'ক্ষণদা'র মধ্যে যে ২৩টি পদে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে, তাহার সবগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির পদ কি-না

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী নিজ পদে 'বল্লভ' ভণিতা ব্যবহার করিতেন।

তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 'না রহে গুরুজন মাঝে', 'শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ', 'রতিরসে চঞ্চল নাগর রাজ', 'সুন সুন এ সখি বচন-বিশেষ' প্রভৃতি পদে মৈথিলী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার বাগ্‌ভঙ্গিমার প্রভাব অধিকতর অনুসৃত হইয়াছে।

ইহার পরে পদসঙ্কলন হিসাবে শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র উল্লেখ করিতে হয়। মহারাজ নন্দকুমারের গুরু রাধামোহন ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐ সঙ্কলনটি প্রস্তুত করেন এবং ইহার সহিত স্বকৃত সংস্কৃত টীকাও দেন। মোট পদসংখ্যা – ৭৪৬। তন্মধ্যে তাঁহার নিজের পদই এক-তৃতীয়াংশের বেশি। পরমরসিক রাধামোহন বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ৬৫টি পদ এই সংগ্রহে স্থান দিযাছেন। তাঁহার মতো বসিক ও পণ্ডিত মানুষ পদনির্বাচনে যাথার্থ্যের দিকে যে প্রখর দৃষ্টি রাখিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি ইহাতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এমন কতকগুলি পদ আছে, যাহা মৈথিলী কবির রচনা হইতে পারে না – কোন বাঙালী কবির হওযাই সম্ভব। 'না রহে গুরুজন মাঝে', 'না জানিযে প্রেমরস নাহি বতিরঙ্গ', 'কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়', 'সই যমুনার কূলে গোপগোপী নাহি বুলে', 'সেখানে সতত বৈসে রসিক মুবারি', 'নহে দবশন বিহি কৈল বাদ', 'নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস', 'এমন পিয়াব কথা কি পুছসি এ সখি' প্রভৃতি পদে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলেও ইহাতে বাঙালীব অন্তরের সুরই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়াছে, 'মৈথিল-কোকিল' বিদ্যাপতি ইহার রচয়িতা হইতে পারেন না। তথাকথিত 'ছোট বিদ্যাপতি'র পদগুলি এমনভাবে আসল বিদ্যাপতির সহিত মিশিয়া গিযাছে যে, স্বযং রাধামোহন ঠাকুবেব মতো এমন একজন বিচক্ষণ বৈষ্ণবভক্ত আসল-নকলেব প্রভেদ বিচার করিতে সক্ষম হন নাই।

বৈষ্ণবপদেব বৃহত্তম সংগ্রহ 'পদকল্পতরু' গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণবদাস) কর্তৃক ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে সঙ্কলিত হয়। ইহার মোট পদসংখ্যা – ৩১০১। একশত তিরিশ জনেরও অধিক পদকর্তার পদে পরিপূর্ণ 'পদকল্পতরু' পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদের একমাত্র উৎস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বয়ং সঙ্কলক ইহাতে মাত্র ৩৬টি নিজ পদ (বৈষ্ণবদাস ভণিতাযুক্ত) ঠাঁই দিয়া বৈষ্ণব বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা মোট—১৬১। ইহার মধ্যে মাত্র ১৪টি পদ মিথিলা

ও নেপালের পুঁথিতেও পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ১৪৭টি পদ কেবল বাঙলা দেশেই মিলিয়াছে। মৈথিলী বন্ধুগণ বাঙলা দেশে প্রাপ্ত পদগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই পদগুলিতে বাঙালী-বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদ প্রবেশ করিয়াছে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী অপেক্ষা শৈব পদাবলী মিথিলায় অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। শৈব ও শাক্ত প্রাধান্যের যুগে আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ এবং রাধাকৃষ্ণবর্জিত মানবীয় রসের পদ মিথিলায় কিছু কিছু প্রচলিত হইয়া-ছিল। কারণ বিদ্যাপতির পরে বাঙলা হইতে ত্রিহুতে একাধিকবার মুসলমান অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্কটের যুগে আদিরসাত্মক পদাবলী বাদ দিয়া বরং যাহাতে শৈব ও শাক্তের স্মার্ত সংস্কার প্রবল হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির সেই প্রকার পদাবলী ও গ্রন্থ অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। শিব-সিংহের জীবৎকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তারপরে তাঁহার নাগরিক সংস্কার অপেক্ষা সমাজগঠনমূলক স্মার্ত সংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠে,—এবং আমাদের অনুমান, এই যুগে তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ও আদিরসাত্মক পদাবলীর কথঞ্চিৎ হতাদর হইয়াছিল। এখনও মৈথিলী লেখকগণ সে সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ধারণা, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদসমূহ নিতান্তই আদিরসাত্মক শ্লোক; তাঁহার কবিকৃতির যাহা কিছু উৎকর্ষ, তাহা নাকি শিবদুর্গাবিষয়ক পদেই অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে; আমরা তাঁহার পদাবলীর শিল্পমূল্য বিচারপ্রসঙ্গে এ কথার সম্যক্ আলোচনা করিব। এখন শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মিথিলা বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর বিশেষ সমাদর করে নাই, কিন্তু বাঙলা দেশ তাহাকে পবিত্র ন্যাসের মতো রক্ষা করিয়াছে, এবং করিয়াছে বলিয়াই মৈথিলী পণ্ডিত ও রসিকগণ বিদ্যাপতির গৌরবে এখনও পুলক অনুভব করিয়া থাকেন। সুতরাং 'পদকল্পতরু'তে ধৃত বিদ্যাপতির বহু পদই মিথিলা বা মিথিলায় প্রাপ্ত পুঁথিতে পাওয়া না গেলে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

(খ) মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পুঁথি ॥

ইহার পর উল্লেখ করিতে হইবে মিথিলায় প্রাপ্ত পদ ও পুঁথির। গ্রীয়ার্সন সাহেব রাজকার্যোপলক্ষে মধুবনী মহকুমায় কিছুকাল অবস্থান করিবার কালে

মৈথিল জনসাধারণের নিকট বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদ শুনিয়াছিলেন এবং সেগুলিকে লিখিয়া লইয়া টীকাটিপ্পনীসহ ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar containing a Grammar, Chrestomathy and Vocabulary* (Vol. II) প্রকাশ করেন। তাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত মোট ৮২টি পদ সংগৃহীত হইযাছিল। ইহার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণবিষযক। স্বয়ং গ্রীয়ার্সন খাস মিথিলা হইতে যে-সমস্ত পদ সংগ্রহ করিযাছিলেন, তাহার প্রায় সবটাই রাধাকৃষ্ণবিষযক—এ সংবাদও মূল্যবান্। মিথিলাবাসিগণ বলেন যে, মিথিলায় বিদ্যাপতির শৈব পদগুলিই অধিকতর জনপ্রিয়, আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ পদাবলী ততটা বিখ্যাত নহে। কিন্তু গ্রীযার্সনের এই সংগ্রহ তাহাকে মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে, কারণ ত্রিহুত অঞ্চলে বিদ্যাপতির শৈব-শাক্ত পদ অধিকতর জনপ্রিয় হইলে গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহের প্রায় সমস্ত পদই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক হইত না। এই ৮২টি পদের অল্প কয়েকটি (গ্রীয়ার্সন সংগ্রহের ২৮, ৩৩, ৩৭, সংখ্যক পদ) মাত্র বাঙলা দেশের বৈষ্ণব পদসংগ্রহে (ক্ষণদা, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু) পাওয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশই পদই 'রাগতরঙ্গিণী' নামক মিথিলার পদসঙ্কলনগ্রন্থ এবং নেপালী পুঁথিতে আছে।

এবার মৈথিলী ও নেপালী পুঁথিগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদ্যাপতির স্বদেশে কোন্ পদের প্রভাব অধিকতর হইয়াছিল, তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক। প্রথমে মিথিলার উৎস ও উপাদান আলোচনা করিতে হইবে। এই দিক দিযা মৈথিলী ব্রাহ্মণকবি লোচন-সঙ্কলিত 'রাগতরঙ্গিণী' নামক প্রাচীন পদসংগ্রহের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। মিথিলার প্রাচীন পদসংগ্রহ এই 'রাগতরঙ্গিণী' লোচন কর্তৃক ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সঙ্কলিত হয়। মিথিলায় এখনও এই পুঁথি একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যায় নাই। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করিতে গিযা মিথিলা হইতে প্রাপ্ত 'রাগতরঙ্গিণীর' পুঁথি হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদ উল্লেখ করেন। পরে ইহার দুইটি মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রিত 'রাগতরঙ্গিণী' দত্তাত্রেয় যোশী কর্তৃক ১৯১৮ সালে পুণা হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি সম্ভবতঃ এলাহাবাদ হইতে ইহার পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে বলদেব মিশ্র দ্বারভাঙ্গা হইতে ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অবশ্য দেবনাগরী হরফে-লেখা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের পুঁথি দেখিয়া এই

সংস্করণটি মুদ্রিত করিয়াছেন। 'রাগতরঙ্গিণী'তে বিদ্যাপতির মোট ৫১টি পদ আছে। তন্মধ্যে ৩৬টি পদে স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির ভণিতা আছে, তিনটিতে ভণিতা না থাকিলেও পদের শেষে সঙ্কলক লোচনদাস 'ইতি বিদ্যাপতেঃ' লিখিয়া, তাহা যে বিদ্যাপতির রচনা, তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। অপর দুইটি পদে 'কবিকণ্ঠহার' ভণিতা আছে। বিদ্যাপতি কোন কোন পদে 'কবি-কণ্ঠহার' ভণিতাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে আরও অনেক কবির (সিংহভূপতি, লছমিনারায়ণ, গজসিংহ, নৃপসিংহ, কবি রতনাই, প্রীতিনাথ, অমিঅকর, ভবানীনাথ, ধরণীধর, গোবিন্দদাস ও শ্রীনিবাস মল্ল) পদ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির ৫১টি পদের মধ্যে ২০টির অধিক পদে রাধাকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই; যাহাও আছে, তাহাতে কোথাও 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; 'মাধব', 'হরি', 'মুরারি' 'কাহ্নু', 'কালা'—কৃষ্ণ এই নামেই অভিহিত হইয়াছেন। যে পদে স্পষ্টতঃ রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, সেগুলিকে বিশুদ্ধ মর্ত্যরসের পদ হিসাব গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। এইগুলির কোন কোনটিতে রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবন-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত না থাকিলেও পদগুলির প্রসঙ্গ কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলাকেই নির্দেশ করিতেছে। অতএব উক্ত পদগুলিতে যেহেতু রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, সেই হেতু উহাদিগকে রাধাকৃষ্ণ-বিবর্জিত মর্ত্যরসের পদ বলা যায় না।

ইহার পর মিথিলায়-প্রাপ্ত 'রামভদ্রপুরের পুথি'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। পণ্ডিত বিষ্ণুলাল ঝা শাস্ত্রী দ্বারভাঙ্গা জিলার অন্তর্গত রামভদ্রপুর নামক গ্রাম হইতে বিদ্যাপতির এই প্রাচীন পদসঙ্কলনটি সংগ্রহ করেন। পণ্ডিত শিবনন্দন ঠাকুর এই পুঁথি অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে 'বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী' প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার 'মহাকবি বিদ্যাপতি' (হিন্দী) নামক গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ঐ পদগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এখন এই মূল পুঁথিটি পাটনা কলেজ আছে। তালপত্রে-লেখা এই পুঁথি দুই শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। পুঁথিটি অত্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উপস্থিত ইহাতে মোট ৯৩টি পদ আছে। অনুমান ইহাতে বিদ্যাপতির চারি শতেরও কিছু অধিক পদ ছিল। প্রাপ্ত ৯৩টি পদের মধ্যে ৬০টিতে বিদ্যাপতির এবং ২টিতে 'অমিঅকরে'র ভণিতা আছে। অবশিষ্ট ৩১টি পদে বিদ্যাপতির কোন উল্লেখ নাই। এই ৩১টির মধ্যে ৫টি যে বিদ্যাপতিরচিত, তাহা জানা যায় নেপাল পুঁথি ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত তালপত্রের পুঁথি

হইতে। অতএব রামভদ্রপুরের পুঁথিতে যে ৯৩টি পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অন্ততঃ ৬৫টি পদ বিদ্যাপতির রচিত, তাহা প্রমাণ করা যায়। যেগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই, অন্য কোন পুঁথিতেও পাওয়া যায় নাই, সেগুলিকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। ঐ ৯৩টি পদের মধ্যে ৩৯টিতে কৃষ্ণের (মাধব, হরি, কাহ্নু, মুরারি, কৃষ্ণ) উল্লেখ আছে।

মিথিলার তরৌণী গ্রাম হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর-একখানি তালপত্রের পুথি আবিষ্কার করেন। ইহাতেও বিদ্যাপতির বহু পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা 'তরৌণীপুঁথি' নামে বিদ্যাপতি গবেষকদের নিকট সুপরিচিত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিদ্যাপতি পদাবলী' সম্পাদনাকালে এই পুঁথি হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপরে ইহার আর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তিনি বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে যখন বিদ্যাপতির পদাবলীর আর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখনও ইহাকে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই পুঁথিসম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের উক্তিই একমাত্র প্রমাণ, কারণ ইদানীং তিনি ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যাপতি গবেষক এই পুঁথি দেখেন নাই। তাহার মতে তরৌণীর তালপত্রের পুঁথিতে ৩৫০টি পদ ছিল, তিনি তাহার মধ্য হইতে মোট ২৩৯টি পদ বিদ্যাপতির সঙ্কলনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ পুঁথির সমস্ত পদই বিদ্যাপতির রচিত। কিন্তু তিনি কেন ১১৭টি পদ বাদ দিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। আমাদের অনুমান, তথাকথিত তরৌণীপুঁথিতে শুধু বিদ্যাপতির নহে, অন্যান্য কবির পদও ছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে ২৩৯টি পদকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৩১টি পদে বিদ্যাপতির ভণিতা নাই। সুতরাং এই ৩১টি পদকে বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় কি? এতদ্ব্যতীত এখনও ত্রিহুত হইতে নিত্যই বিদ্যাপতির নূতন নূতন পদ আবিষ্কৃত হইতেছে। যাহারা বিদ্যাপতির উপর গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা মিথিলায় গিয়া জনসাধারণের মুখ হইতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ সংগ্রহ করিতেছেন তাহার প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নহে।

(গ) নেপালী উৎস ॥

পরিশেষে নেপালে-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পুঁথিগুলি বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। উত্তরবিহার অর্থাৎ ত্রিহুত এবং নেপালের ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য

উভয় অঞ্চলের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ত্রিহুত মুসলমান কর্তৃক উপদ্রুত হইলে বিদ্যাপতির মতো অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত নেপালে চলিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং নেপালে বিদ্যাপতির পদযুক্ত সঙ্কলন আবিষ্কার করা এমন কিছু বিস্ময়কর নহে।

নেপাল রাজদরবার-গ্রন্থাগারে বিদ্যাপতির পদযুক্ত একখানি পুঁথি আছে। এই পুঁথিটি পুরাতন মৈথিলী এবং প্রাচীন বাংলা অক্ষরের সংমিশ্রণে লিখিত। ইহার লিপি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে; আবার কেহ-বা ইহাকে প্রাচীনতর বলিতে চাহেন। পুঁথির উপরে কোন নাম নাই, ইদানীং হয়তো কোন 'হিন্দীপ্রেমিক' অতি উৎসাহবশতঃ ইহার উপরিভাগে দেবনাগরী হরফে "বিদ্যাপতিকা গীত" লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে শুধু বিদ্যাপতির পদ নাই, আরও ১৩ জন কবির পদ স্থান পাইয়াছে। ইহাতে সর্বসাকুল্যে মোট ২৮৭টি পদ আছে। কিন্তু কিছু কিছু পদ একাধিকবার পুনরুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে যথার্থতঃ ২৮৩টি পদ আছে; তন্মধ্যে ২৫৬টি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত। এই পদগুলির কিছু কিছু অন্যান্য পদসংগ্রহেও পাওয়া যায়। এই পুঁথির কোন কোন ভণিতায় বিদ্যাপতি আপনার নামের সহিত 'কবিকণ্ঠহার' শব্দটিও গৌরবস্বরূপ যোগ করিয়াছেন। ২৫৬টি পদের মধ্যে ১৩১টি পদেই কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের কোন প্রতিনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তই বর্তমানকালে বিদ্যাপতির পদসংক্রান্ত মৈথিলী, নেপালী ও বাংলা আকরগ্রন্থসমূহ হইতে তাঁহার 'বিদ্যাপতি' নামক পদসংগ্রহে বিদ্যাপতির সর্বাধিক পদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। মিথিলা এবং হিন্দীভাষী অঞ্চলের সঙ্কলকগণ বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করিতে গিয়া প্রায়শঃই বাঙলায় প্রাপ্ত কবির পদগুলিকে বাতিল করিয়া দেন। যে-বাঙলা দেশ বিদ্যাপতির পদ সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে ভেজাল ঢুকিয়াছে বলিয়া তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা ঠিক নহে। অপরদিকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই সঙ্কলনে অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক সঙ্কলনরীতি অনুসরণ না করিয়া স্বকপোলকল্পিত একটা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার সঙ্কলনেও অনেক ত্রুটি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়দ্বয় সম্প্রতি (১৩৫৯) বিদ্যাপতি পদাবলীর যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নেপাল-মিথিলার বিভিন্ন

পদসঙ্কলনগ্রন্থে উল্লিখিত এবং মিথিলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদগুলিকেও সাগ্রহে স্থান দিয়া গ্রন্থসঙ্কলনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।

॥ ২ ॥

পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ

বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ করা দুরূহ নহে; তবে ত্রিহুত ও বাঙলা দেশে তাঁহার বিভিন্নশ্রেণীর পদাবলী জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া এই শ্রেণীবিন্যাসে কিঞ্চিৎ দ্বিমতের অবকাশ আছে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, মিথিলাবাসী ও হিন্দীভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির শৈব ও শাক্ত পদগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আবোপ করিতে চাহেন। অপবদিকে বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির সমস্ত পদই বাধাকৃষ্ণবিষয়ক; কিছু কিছু প্রহেলিকাজাতীয় পদও আছে। মিথিলার অধিবাসীরা বিদ্যাপতির বাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদকে যৎসামান্য মর্যাদা দিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে, এইজাতীয় অধিকাংশ পদই রাধাকৃষ্ণ-সম্পর্কবর্জিত নিছক শৃঙ্গারমূলক মানবীয় রসের কবিতা মাত্র। সে যাহাই হউক, বিদ্যাপতির পদাবলীকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা যায়—(ক) রাধাকৃষ্ণবিষয়ক, (খ) হরগৌরী ও কালী বিষয়ক, (গ) গঙ্গাবিষয়ক, (ঘ) প্রহেলিকাজাতীয় এবং (ঙ) দেবতা-সম্পর্কবর্জিত বিভিন্ন ধরণের পদ। ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। বাঙলা দেশে-প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত পদই রাধাকৃষ্ণসংক্রান্ত। ইহাদের কোনটিতে রাধাকৃষ্ণের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে, কোনটিতে বা নাই। মিথিলা, নেপাল ও বাঙলা দেশের পদসঙ্কলনে উল্লিখিত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবন সংক্রান্ত উল্লেখ আছে, সেরূপ পদের অন্যূন সংখ্যা ৫০০।[২] বিদ্যাপতির ভণিতায়-প্রাপ্ত নয় শতেরও অধিক পদের অর্ধেকের বেশি পদেই বাধাকৃষ্ণ বা অনুরূপ কোন উল্লেখ আছে। বাকি অর্ধেক প্রত্যক্ষতঃ রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই বলিয়াই সেগুলিকে আদিরসাত্মক মানবপ্রেমের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

২ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থে প্রদত্ত হিসাব অনুসারে এই সংখ্যা নির্ধারিত হইয়াছে।

সহজ প্রসন মুখ দরস হৃদয় সুখ
লোচন তরল তরঙ্গ।
আকাশ পাতাল বস সেও বইসে ভেল অস
চাঁদ সরোরুহ সঙ্গ॥
বিধি নিরমলি রামা দোসর লছমি-সমা
ভল তুলাএল নিরমান।
(মিত্র ও মজুমদারের সংস্করণ—২৪ সংখ্যক পদ)

অনু: স্বভাবতঃই প্রসন্নমুখ, হৃদয়ে সুখ হয়, (নয়নের জ্যোতি যেন) তরল তরঙ্গ! চাঁদ আকাশে এবং কমল পাতালে থাকে, উভয়ের একসঙ্গে বাস কেমন করিয়া ঘটিল? বিধাতা দ্বিতীয় লক্ষ্মীর মত করিয়া রামাকে নির্মাণ করিল, নির্মাণকালে ভাল করিয়া তুলনা করিয়াছিল।

এই পদের কোনখানেই রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ বা উল্লেখ নাই, কিন্তু পদটিতে রাধার অপূর্ব রূপলাবণ্যের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—বলিয়া না দিলেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। বিদ্যাপতির যে-সমস্ত পদকে আদিরসাত্মক কবিতা বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি যে প্রচ্ছন্নভাবে রাধাকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিতেছে, তাহা তাহার প্রসঙ্গ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলেই বোধগম্য হইবে। অবশ্য রাজসভার কবি ও রাজসুহৃৎ বিদ্যাপতি অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য কোন কোন সময়ে রাধাকৃষ্ণকে বাদ দিয়া বিশুদ্ধ মর্ত্যকেন্দ্রিক আদিরসের পদও লিখিয়াছিলেন, তাহার নানা প্রমাণ রহিয়াছে

হমে ধনি কুটনি পরিণতি নারি।
বৈসহু বাস ন কহোঁ বিচারি॥ (৬ সংখ্যক পদ)

অনু: আমি পরিণত বয়স্কা কুটনি রমণী। বয়স ও বাসস্থান বিচার না করিয়া কথা বলি।

অথবা,

কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর
বিহগে গহল নিজ ধামে।
আর রে পথিকজন থির রে করিঅ মন
বড় পাঁতর দুর গামে॥

অনু: কমলের দল মুদিত হইল, অর্থাৎ সন্ধ্যা হইল, ভ্রমর ঘরে চলিল, পাখীরা নিজের নিজের জায়গায় গেল। হে পথিক, নিজের মন স্থির কর, গ্রাম বড় দূরে, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রান্তর।

এইরূপ বহু পদে রাধাকৃষ্ণ ও ভক্তিভাবের বাষ্পবিন্দুও নাই। ইহাতে আলঙ্কারিক অনুশীলন, উদ্ভট কবিতার প্রতি আসক্তি, রাজসভা মনোরঞ্জনের ইচ্ছা—সর্বোপরি বৈচিত্র্য সৃষ্টিপ্রয়াসী কবিমনের নর্মলীলাই প্রকট হইয়াছে। কিন্তু বাঙলা দেশের প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থে যত পদ পাওয়া গিযাছে, মূলে তাহার যেরূপ আকারই থাক না কেন, এ অঞ্চলে তাহা প্রধানতঃ বৈষ্ণবপদ রূপেই আস্বাদিত হইয়াছে। সব দিক দিযা বিচার করিলে বিদ্যাপতির প্রায় নয় শত পদের মধ্যে প্রায় পাঁচ শত পদে রাধাকৃষ্ণ ও তদনুষঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট সমস্ত পদই যে পার্থিব চেতনা হইতে উদ্ভূত, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায না। শৈব-শাক্ত পদ, প্রহেলিকা ও অল্পকিছু বাস্তব আদিরসের পদ বাদ দিলে অবশিষ্ট পদেও রাধাকৃষ্ণলীলার প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে। যাহা হউক, প্রথমে বিদ্যাপতির শৈব-শাক্ত ও বিবিধ বিষয়ক পদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কবা যাইতেছে।

॥ ৩ ॥

শাক্ত, শৈব ও বিবিধ পদাবলী

শুধু রাধাকৃষ্ণবিষযক পদ নহে, আদ্যাশক্তি ও হরগৌরী বিষযক অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতির ভণিতায আবিষ্কৃত হইযাছে। অবশ্য বাঙলা দেশের কোন সঙ্কলনগ্রন্থে বিদ্যাপতিব ভণিতায় শাক্ত বা হরগৌবী বিষযক পদ পাওযা যায নাই। ঐ পদগুলির অধিকাংশই 'রাগতরঙ্গিণী' (মৈথিলী পুঁথি), নেপালেপ্রাপ্ত পুঁথি এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত তালপাতার পুঁথি হইতে পাওযা গিয়াছে। এ পর্যন্ত দুর্গা, আদ্যাশক্তি ও কালিকা বিষয়ে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত চারিটি পদের সন্ধান মিলিযাছে। বিদ্যাপতির জন্ম শৈব বংশে, মিথিলার রাজবংশও প্রধানতঃ শৈব; তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহও পরম শৈব ছিলেন, একমাত্র ভৈরবসিংহ সম্ভবতঃ বিষ্ণুপদাশ্রয়ী ছিলেন। শৈব মতের সহিত শাক্ত মতবাদও সে যুগে মিথিলার সারস্বত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এখনও মিথিলায শাক্ত উপাসনার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয় নাই। স্বয়ং বিদ্যাপতি রাজা নরসিংহ ও তৎপত্নী ধীরমতী দেবীর অদেশে 'বিশ্বেষাং হিতকাম্যয়া', বিশ্বের হিতকামনায় শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতি অর্থাৎ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। ইহাই তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থ। কিন্তু প্রাচীন বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই প্রথম

যৌবনে তিনি শাক্তপদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম শাক্তপদ দেবসিংহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল; কারণ তাঁহার প্রসিদ্ধ শাক্তপদটির ('বিদিতা দেবী বিদিতা হো অবিরল কেস সোহন্তী') শেষে দেবসিংহের উল্লেখ আছে। দেবসিংহের রাজত্বকালে কবির বয়স তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। সেই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বয়সেও তিনি এই শাক্তপদটিতে যে কুশলতা, ভাষার দার্ঢ্য ও ভক্তির গাম্ভীর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তিকে প্রশংসা করিতে হইবে। আদ্যাশক্তির সেই বিশ্ববিস্তারী বিপুল রূপের বন্দনায় কবি বলিয়াছিলেন—

কজ্জলরূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ডা কহিঅএ গঙ্গা কহিএ পানী॥
ব্রহ্মাঘর ব্রহ্মাণী কহিএ হরঘর কহিঅএ গৌরী।
নারায়ণঘর কমলা কহিএ কে জাত উৎপতি তোরী॥ (পদ ১)

অনু: তুমি কজ্জলরূপে কালী নামে পরিচিতা, উজ্জ্বলরূপে বাণী বা সরস্বতী। সূর্যমণ্ডলে তোমাকে প্রচণ্ডা কহে, জলরূপে গঙ্গা বলে। ব্রহ্মার ঘরে তুমি ব্রহ্মাণী, হরের ঘরে গৌরী, নারায়ণের গৃহে কমলা। তোমার উৎপত্তি কে জানে?

এখানে তিনি কজ্জলরূপা কালিকার যে মূর্তি অঙ্কন করিয়াছেন, অন্য একটি পদে সেই ভৈরবীর ভীমকান্ত রূপের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন—

সামর বরণ নয়ন অনুরঞ্জিত
জলদ জোগ ফুল কোকা।
কটকট বিকট ওঠপুট পাঁডরি
লিধুর ফেন উঠ ফোকা॥

অনু: তোমার বর্ণশ্যামল, রক্তিম নয়ন, মেঘে কমল ফুটিয়াছে। তোমার পাণ্ডুর বর্ণ ওষ্ঠপুটে বিকট শব্দধ্বনি, রক্তের ফেনায় বুদ্বুদ উঠিতেছে।

আবার কোন পদে 'জয় দেবি দুর্গে দুরততারিণি' (১০), 'জয়জয় ভগবতি ভীমা ভয়ালী' (১১), 'জয় জয় ভগবতি জয় মহামায়া' (৫৯২) বলিয়া দুর্গতিতারিণী দুর্গার কল্যাণী মূর্তির জয়ধ্বনি করিয়াছেন। অবশ্য এই পদগুলিকে বিদ্যাপতি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায় না, সংখ্যাতেও নগণ্য। কবি সম্ভবতঃ তৎকাল প্রচলিত রীতির বশবর্তী হইয়া অল্প কয়েকটি শাক্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন; এই পদগুলিতে কবিপ্রতিভার অম্লান স্বাক্ষর নাই, তাহাও স্বীকার্য।

বিদ্যাপতির হরগৌরীবিষয়ক পদগুলি কিন্তু নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবদুর্গার লীলাকাহিনীবিষয়ক বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই বাঙলার বাহিরে পাওয়া গিয়াছে। মিথিলায় সে যুগে এবং এ যুগেও জনসাধারণের মধ্যে হরগৌরীবিষয়ক পদের বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। এইজাতীয় শিবগীতগুলিকে 'নাচারী' ও 'মহেশবাণী' বলা হয়।[৩] বিবাহাদি উৎসবে ঈষৎ লঘু ধরণের হরগৌরীবিষয়ক (অধিকাংশই শিব-পার্বতীর পরিণয় ঘটিত) গান মহিলাদের দ্বারা গীত হয়। 'নাচারী' শব্দটিতেই কিছুটা নৃত্যের চটুলতা আছে, বাংলা মঙ্গলকাব্যের 'লাচাড়ী'-র অনুরূপ। শুধু ছন্দেই নহে, বিষয়বস্তুর মধ্যে লঘুতা, হাস্যপরিহাস এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রভাব সূচিত হইয়াছে। এই শিবগীত আরও নানা কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পরে আবির্ভূত সুবংশলাল, কুমর, জয়মঙ্গল, পুলকিত প্রভৃতি কবিগণের অনেক শিবগীত রচনা করিয়াছিলেন; এখনও ত্রিহুতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বহু শিবগীত প্রচলিত আছে। অবশ্য এসমস্ত পদের কোন্‌গুলি বিদ্যাপতির রচিত, কোন্‌গুলি বা কবিযশঃপ্রার্থী কোন অক্ষম কবির রচনা তাহা স্থির করা সহজ নহে। এ পর্যন্ত যে শিবগীতগুলি হিন্দী ও মৈথিলী গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা একেবারে তুচ্ছ করিবার মতো নহে। নেপাল পুঁথি, 'রাগতরঙ্গিণী', গ্রীয়ার্সনের *Maithili Chrestomathy*, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত পদ, রামবৃক্ষ বেণীপুরী-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতিকী পদাবলী' এবং 'মিথিলা গীতসংগ্রহ' নামক পুস্তকে হরগৌরীলীলাবিষয়ক অন্যূন ৬২টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি'-তেই ২৮টি পদ আছে। পদগুলির আকরগ্রন্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পদ সংগ্রহে শিবদুর্গাবিষয়ক পদসংখ্যা অতিশয় অল্প। নেপাল পুঁথিতে ৭টি, 'রাগতরঙ্গিণী'তে ২টি এবং গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহে মোট ৩টি শিবদুর্গা-বিষয়ক পদ স্থান পাইয়াছে। রামভদ্রপুরের পুঁথিতে শিবদুর্গাবিষয়ক একটি পদও নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সঙ্কলন অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিদ্যাপতি পদাবলী', রামবৃক্ষ বেণীপুরীর 'বিদ্যাপতিকী পদাবলী' এবং 'মিথিলা গীতসংগ্রহে' হরগৌরীবিষয়ক পদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যাপতির আট শতাধিক পদের তুলনায় মাত্র ৬০টি হরগৌরী বিষয়ক

৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫৩

পদ কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। তবু যদি তাহা সাহিত্যাংশে বিশেষ মূল্যবান হইত, তাহা হইলে সংখ্যাল্পতা গুণগত ঐশ্বর্যের দ্বারা ঢাকিয়া যাইত। এই পদগুলিতে বাঙলার মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন শ্রেণীর একপ্রকার লৌকিক কাব্যধারার পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ জয়কান্ত মিশ্র *History of Maithili Literature* গ্রন্থে বলিয়াছেন, "The most important of those are his Mahesvani and Nacharis. These poems are traditionally his most devotional works" (p. 158). বিদ্যাপতির শিবদুর্গার পদ ভক্তির সাহিত্য বলিয়া যদি ত্রিহুতে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন প্রাচীন পদসঙ্কলনে এইরূপ পদ প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই কেন? পরবর্তী কালেও রামবৃক্ষ বেণীপুরী, ডঃ উমেশ মিশ্র, শিবনন্দন ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্কলন ও আলোচনাতেও শৈব পদের প্রাচুর্য না থাকিবারই-বা কারণ কি? আমাদের অনুমান, বিদ্যাপতির শৈব পদগুলি গ্রামীণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত, জনসাধারণের মুখে মুখে ফিরিলেও এগুলি কোন প্রামাণিক সঙ্কলনে বিশেষ গৃহীত হয় নাই। পরবর্তী কালে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর অতিশয় খ্যাতি ও প্রচারের জন্য তাঁহার নামে অন্যান্য অক্ষম কবির অনেক শৈব পদ চলিয়া গিয়াছে। আজ আসল-নকলে ভেদ করা দুষ্কর। এই পদগুলির মধ্যে কতকটা সহজপ্রাণের অকৃত্রিম রস আছে। মিথিলাবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিকায় এগুলির আবির্ভাব; সেই দিক দিয়া ইহারা সাহিত্যের ইতিহাসে ঠাঁই পাইবার দাবি করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী যেমন বিশিষ্ট নাগরিক মনোভাবজাত একটা নিখুঁত শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে, তাঁহার ঐ স্বল্পসংখ্যক "মহেশবাণী" সেরূপ কলাসমুৎকর্ষের সীমায় পৌঁছাইতে পারে নাই।

হরগৌরীবিষয়ক পদগুলিতে হরপার্বতীর বিবাহ ও সংসারযাত্রা অনেকটা শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। বৃদ্ধ, মাদকসেবী, কুলপরিচয়হীন শঙ্কর বুড়া বৃষে চড়িয়া হিমাচল-কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন; তাঁহার ভস্মভূষিত ও সর্পাভরণমণ্ডিত রূপ দেখিয়া জননী মেনকা ও প্রতিবেশিনীরা দুঃখ করিতেছে—অধিকাংশ পদে এই প্রকার ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। বিবাহার্থী শিবের বিড়ম্বিত রূপটি মেনকার খেদোক্তিতে চমৎকার ফুটিয়াছে—

চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউঁনি তোহ ন জোগ বর ॥
হর চাহ গুরু গউরবে গোরী।
কি করব তবে জপমালা তোরী ॥

* * *

ভাল বলই নযনানল রাসী।
ঝরকত মউল ডাঢতি পট সসী ॥
বড় সুখে সাসু চুমওবাহ মাথা।
ওঠ বুরত সুরসরিকে সথা ॥
করব সথাজনে কেলি অলাপে।
বিলগ হোএত যফু আএত সাপে ॥ (পদ—৭৮০)

অনু: হে দিগম্বর হর, তুমি ফিরিয়া যাও। আমার ঈশ্বরীর যোগ্য বর তুমি নও। হর অপেক্ষা গৌরী গৌরবে অধিক। তবে তোমার জপমালা দিয়া কাজ কি? তোমার ললাটে নয়নানলরাশি জ্বলিতেছে, গৌরীর মুকুট ঝলসিয়া যাইবে, পট্টবাস জ্বলিয়া যাইবে। বড় সুখে শাশুড়ী যখন মাথার স্ত্রী-আচার করিবেন, তখন সুরধুনী স্রোতে ওষ্ঠ পর্যন্ত ডুবিয়া যাইবে। সখীরা যখন কেলি-আলাপ করিবে, (তখন) নিকটে গেলেই সর্প বাহির হইয়া ফোঁস ফোঁস করিবে।

বিবাহের সময় অবশ্য সকলে 'চৌদহ ভুঅন সিব সোহাওন'—চৌদ্দ ভুবনের শোভাস্বরূপ শিবকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। হরি-ব্রহ্মা সকলেই উপস্থিত হইলেন, নারদ তম্বুবায় বিবাহমঙ্গল গাহিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাসরঘরে কেলিকৌতুকপরায়ণা রমণীদের অবস্থাই শোচনীয় হইয়া পড়িল। "সাপফুফকাবে নারি পড়াইলি বসন ঠাম নড়াএ"—সাপের ফোঁসফোঁসানিতে সেখানে বস্ত্র ফেলিয়া নারীরা পলায়ন করিল।

বিবাহের পর হরগৌরীর বাস্তবধর্মী দাম্পত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনাও বাঙলা দেশের মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত শিবের ঘরগৃহস্থালীর চিত্রের অনুরূপ। দরিদ্র শিব, কয়েকটি সন্তান লইয়া দুর্গার দুর্গতির অবধি নাই ; শিব মাঝে মাঝে মাদক সেবন করিয়া উন্মত্ত হইয়া কোথায় যে চলিয়া যান, তাহার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তখন দুর্গাই পাগলকে খুঁজিতে বাহির হন, পথের পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,

পুছিঅ পথুক জন তোহী।
এপথ দেখল কহুঁ বুঢ় বটোহী ॥ (পদ—৭৮৫)

অনু: হে পথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এপথে কি একজন বৃদ্ধকে যাইতে দেখিয়াছ?

কেহু দেখল নগনা।
ভিখিঅ মগইতে বুল আঙ্গনে আঙ্গনা ॥

অনু: কেহ নগ্নকে দেখিয়াছ? সে ভিক্ষা মাগিয়া অঙ্গনে অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উগনা হে মোর কতএ গেলা।
কতএ গেলা সি কি দহু ভেলা ॥
জে মোর কহতা উগনা উদেঅশ।
তাহি দেবঁও কর কঙ্গনা বেস ॥

অনু: আমার দিগম্বর কোথায় গেলেন, শিব কোথায় গেলেন, কি হইল? যে আমাকে আমার দিগম্বরের উদ্দেশ দিবে তাহাকে হস্তের কঙ্কণ দিব।

শিব কেনই-বা পাড়ায় পাড়ায় পলাইযা বেড়াইবেন না?

উমগল ফিরে মুস ঝোরী মোর কাটি ॥
ঝোরীরে কাটিএ মুস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈঠন সুরসরি জল পীবে ॥
বেটারে কাতিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝুর ॥
তোহ কে পোসল গৌরা সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা ॥

অনু: ইঁদুর আমার ঝুলি কাটিয়া দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ঝুলি কাটিয়া ইঁদুর জট' কাটিয়া খায়। মাথায় বসিয়া গঙ্গার জল পান করে। বেটা কার্তিক এক ময়ূর পুষিয়াছে, সেটাকে দেখিয়া আমার সাপ ভয়ে কাঁদে। গৌরী, তুমি যে বড মোটা এক সিংহ পুষিয়াছ, তাহাকে দেখিয়া আমার বৃষটা ভয় পায়।

গৃহিণী গৌরী কার্তিকেব বিবাহের জন্য শিবেব নিকট অনুযোগ কবেন; প্রতিদিনেব সংসাব লইয়া ব্যতিব্যস্ত গৌবী এবং তাঁহার 'বুড়া বরের' যে চিত্রটি এইসমস্ত পদে ফুটিযাছে, তাহাকে ঠিক উচ্চশ্রেণীব সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ কবা যায় না। তবে হিমাচলবাসী দেবদম্পতি ত্রিহুতেব পথেঘাটে নামিয়া আসিয়া আমাদের ঘরেব মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন—এইটুকুই উহার মূল্য।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, হরগৌরীবিষয়ক পদগুলি আমাদের লোকসাহিত্যের দোসরস্থানীয়; শিবের মহিমান্বিত মূর্তি এখানে ধুলিধুসর; মহাকাব্য-পুরাণের

শিবশঙ্কর এখানে মাদকাশ্রয়ী জীর্ণ বৃদ্ধ মাত্র। বিদ্যাপতি উঞ্ছবৃত্তিধারী শিবকে কৃষিকার্য করিতে উপদেশ দিয়া বলেন—

বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় 'বালো
কিরিষ-করিঅ মন লাই।
বিনু সরমে রহহ ভিখিএ পত্র মাগিঅ
গুণ গৌরব দূর জাই॥
খটগ কাটি হরে হর জে বঁধাওল ত্রিসূল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হরলএ জোতিঅ পাটএ সুরসরি ধারে॥ (পদ—১৯২)

অনু: হে শিব, আমি বারে বারে তোমাকে বলি, মন দিয়া কৃষিকার্য কর। লজ্জারহিত হইয়া তুমি ভিক্ষা কর, তাহাতে গুণগৌরব দূরে যায়। হে হর, খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙিয়া ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তোমার ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া জুতিয়া দাও; গঙ্গার ধারায় ক্ষেত্রের পাট কর।

ইহার সহিত 'শূন্যপুরাণের' অন্তর্গত—

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চস চাস।
কখনও অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥

এই শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইবে। বাঙলা দেশে অষ্ট্রিক সংস্কৃতির শেষধারা কৃষিকাযের দেবতা শিবের একটা অপৌরাণিক ও অব্রাহ্মণ্য মূর্তি নির্মাণ করিয়াছে। এখানে আযসভ্যতার বৃষভারূঢ় শিবশঙ্কর এবং ক্ষেত্রপাল শিবঠাকুর এক হইয়া গিয়াছেন। মিথিলাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই একথা অবশ্যই বলা চলিতে পারে, বাঙলা দেশের মতো মিথিলাতেও শিব সম্বন্ধে যে সমস্ত লোকগীতি ও লোকধর্মাচার প্রচলিত ছিল, বিদ্যাপতি তাহার সহিত পৌরাণিক সংস্কার মিশাইয়া এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির হরগৌরীবিষয়ক পদ ছাড়াও আরও নানা বিচিত্র ধরনের কিছু কিছু পদ সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দুর্গা ও গঙ্গার বন্দনাসূচক পদগুলি বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন অল্পশক্তি কবির লেখনীপ্রসূত হইলেও আমরা বিস্মিত হইতাম না। তেমনি গাথাসপ্তশতী, আযাসপ্তাশতী, অমরুশতক, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি সংস্কৃত-প্রাকৃত আদিরসাত্মক শ্লোকের ভাব অবলম্বনে তিনি যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবিপ্রতিভার ভস্মাবশেষ ব্যতীত কোন নূতন অগ্নিকণার বিচ্ছুরণ হয় নাই। এই পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির প্রতিভা যেন নাগরিক জীবনের দাস্যবৃত্তিতেই অধিকতর উল্লাস বোধ করিয়াছে।

রাজা ও রাজ-অমাত্যের জন্য শিল্পরসবর্জিত, স্থূলধরনের শৃঙ্গারভাবের সম্ভোগকে কেন্দ্র করিয়া এই শ্রেণীর পদগুলি রচিত।

হমে ধনে কুটনি পরিণতি নারি।
বৈসহু বাস ন কহেঁ৷ বিচার॥

(অনুবাদ পূর্বে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।)

অথবা, প্রাকৃত-সংস্কৃত আদিরসাত্মক শ্লোক বা অলঙ্কারশাস্ত্রে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতার ছায়ানুসরণে রচিত—

হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেশ।
লগ নহি বসএ পাড়াসিয়াক লেস॥
সাসু দোসরি কিছুও নহিঁ জান।
আঁখ রতৌঁধি সুনএ নহিঁ কান॥

অনু: আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিয়াছেন। নিকটে একটিও পড়শী বাস করে না। আমা ছাড়া বাড়ীতে শাশুড়ী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সেও কিছু জানে না। চোখে রাতকানা, কানেও শুনে না।

এই পদের সহিত 'শৃঙ্গারতিলকের' "বালা যাহং মনসিজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢ়-প্রকম্পা" শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কিংবা এক পথিকের প্রতি প্রোষিতভর্তৃকা যুবতীর উক্তি—

আবহ বৈসহ পিব লহ পানি।
জে তোঁ খোজবহ সে দিব আনি॥
সসুর ভৈঁসুর মোর গেলাহ বিদেস।
স্বামিনাথ গেলছথি তনিক উদেস॥
সাসু ঘর আহুরি নৈন নহিঁ সুঝ।
বালক মোর বচন নহিঁ বুঝ॥ (পদ—৫৯০)

অনু: এস, এস, জলপান কর, তুমি যাহা খুঁজিবে, তাহা আনিয়া দিব। আমার শ্বশুরভাসুর বিদেশে গিয়াছেন, স্বামীও তাহার উদ্দেশে গিয়াছেন। ঘরে শাশুড়ী অন্ধ, চোখে দেখিতে পান না, আমার বালক কথা বুঝে না।

কিংবা

পিয়া মোর বালক হম তরুণী।
কোন তপ চুকলেঁাহ ভেলেঁাহি জননী॥

অনু: আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী, কোন তপঃভ্রষ্ট হইয়াছি, যে ইহার জননীতুল্য হইলাম।

পদটিতে যুবতী নারী ও বালক বরের বিড়ম্বিত জীবনচিত্র বাস্তবধর্মী সন্দেহ

নাই। যখন ঐ যুবতীটি কোন পথিককে ডাকিয়া তাহার দুঃখের কথা বলিয়া পিতার কাছে প্রার্থনা জানায়—

কহিহুন ববাকে কিনএ ধেনু গাঈ।
দুধবা পিয়াইকেঁ পোসতা জামাই॥

অনু: বাবাকে বলিও যেন ধেনু গাই কিনেন, দুধ পান করাইয়া জামাইকে পোষণ করেন।

এই পদে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস এবং বিড়ম্বনাজনিত নারীজীবনের ব্যর্থতা একই সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া উদ্ভট বিচিত্র রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির প্রহেলিকাজাতীয় পদেব উল্লেখ করিয়া আমরা রাধাকৃষ্ণের পদাবলী আলোচনায অগ্রসব হইব। এই প্রহেলিকা পদগুলি কবিতা হিসাবে অতিশয নিকৃষ্ট, বুদ্ধিব কৌশলই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। নানারূপ উপমা, প্রতীক, উদ্ভট কল্পনা, কষ্টকল্পিত অর্থবিস্তার ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধরনের কলাকৌশলের অতিরেক এই পদগুলিকে কাব্যের কোঠায় উঠিতে দেয নাই। ইহার মধ্যে বহু পদের তাৎপযই বুঝা যায না। একটি পদেব কিয়দংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে—

মাধব জাগতি দেখবি পথ রামা।
গরুড়াসন-সখ-তাতক বাহন তাসম গতি অভিরামা॥
দচ্ছ-সুতা চারিমপতি-ভগনা তনয় ঘরনি সমরূপে।
সুরপতি-অরি-দুহিতা-পতি-বৈরী তেঁ ভরি ভেলি অনূপে।

অনু: মাধব যাইতে যাইতে পথে রামাকে দেখিল। তাগার গতি গরুড়াসনের (কৃষ্ণের) বন্ধুর (অর্জুনের) পিতার (ইন্দ্রের) বাহনের (অর্থাৎ ঐরাবতের) মত অভিরাম; অর্থাৎ রাধার গতি ঐরাবতের মত মন্থর। সে রূপে দক্ষের চতুর্থ কন্যার (রোহিণীর) পতির (চন্দ্রের) ভগিনীর (রুক্মিণীর অর্থাৎ লক্ষ্মীর) তনয়ের (প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেবের) পত্নীর (রতির) সমতুল্য। অর্থাৎ রাধার রূপ রতির সমতুল্য।

এই সমস্ত পদে, আর যাহাই হউক, কাব্যরসের বাষ্পবিন্দুও নাই। বুদ্ধির কৌশল চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভা এই প্রহেলিকা-জাতীয় পদগুলির দ্বারা যে কিছু মাত্র বর্ধিত হয় নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী

ভূমিকা ॥

পূর্বভারতের মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে বিদ্যাপতিকে কোন রসগ্রাহী সমালোচক 'কবি সার্বভৌম[৪] বলিয়াছেন।' কেহ-বা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহার "কল্পনার বিশাল, বিশ্বব্যাপী, অসীমকালে প্রসারিত সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদকারী পরিধির (cosmic imagination)" সহিত "কীটসের সৌন্দর্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও শেলীর আদর্শসন্ধানে উর্ধ্বাভিযানপিয়াসী হৃদযাবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড একাত্মতায় যুক্ত হইয়াছে।"[৫] কেহ-বা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীর উৎকর্ষকে কিঞ্চিৎ খর্ব করিযা বলিয়াছেন, "কিন্তু তাঁর রচনার ভাবরসের সে সর্বভূমিকতা সে প্রাণশক্তি নেই যাতে কবে অনাগত দিনেও তা সাহিত্যরসিকের কৌতূহলের পসাব না হযে জীবনরসিকের পাথেয় হবে।"[৬] এই সমালোচকের মতে বাঙলার লুই-কাহ্ন, পঞ্জাবের বাবা ফরীদউদ্দিন, কাশীকোশলের কবীব, রাজস্থানের মীবা, বুন্দেলখণ্ডের গোযিনদাস এবং বাঙলাব বাউলদের পদে যে জাতীয "জীবনেব স্পর্শ" আছে, "বিদ্যাপতির দরবারি অলঙ্কারের কিংখাপে মোডা" পদাবলীতে সেই জাতীয় "কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবরস" এবং "সার্বজনীন ও সর্বকালিক" মহিমা নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ এবং নিছক শৃঙ্গাররসের পদাবলী যে অতিশয় বিচিত্রমুখী, তাহা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বাবাই প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পের ব্যক্তিচিত্ত-প্রভাববর্জিত নির্বিশেষ সাধারণ রূপ নাই, এক-এক চিত্তে তাহা এক-এক প্রকার শিল্পবোধ সৃষ্টি করিযা থাকে। বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার পদের বৈচিত্র্যই সূচিত হইতেছে। বিভিন্ন সমালোচকের মনের প্রবণতা ও বাসনাসংস্কারের নিরিখে এই পদসমূহ কখনও বিচিত্র কল্পনার বর্ণাঢ্য শিল্পকৃতি এবং চিত্তগহনের নিরুপম রসচৈতন্য বলিয়া নন্দিত হইবে, কখনও-বা ইহাতে মণ্ডনকলাব চিত্তচমৎকারী ঐশ্বর্য ব্যতীত প্রাণরসের কোন গভীর অনুভূতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না।

৪ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

৫ ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের কথা

৬ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বিদ্যাপতিগোষ্ঠী

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ বিচার করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এতদিন ধরিয়া যাহা রাধাকৃষ্ণাশ্রিত পদ বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল, মূলতঃ তাহা সাধারণ নায়ক-নায়িকার জীবনকেন্দ্রিক অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত শৃঙ্গাররসের পদ মাত্র। কারণ তথাকথিত রাধাকৃষ্ণপদে রাধা, কৃষ্ণ বা তাঁহাদের লীলাসংক্রান্ত কোন উল্লেখ নাই; উপরন্তু বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেও কোনরূপ 'অপ্রাকৃত' লীলাব ইঙ্গিত নাই। উক্ত মিলন-সম্ভোগের পদগুলি প্রায়শঃই জৈবসংস্কারেব উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। অমরুশতক, শৃঙ্গারাষ্টক, গাথাসপ্তশতী প্রভৃতি উগ্র আদি-রসাত্মক উদ্ভট শ্লোকের আদর্শই তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; রাজসভার কবি বিদ্যাপতি বাজা, রাজমহিষী, মন্ত্রিপারিষদের মনোরঞ্জনের জন্য আদিরসের উল্লাসকেই কেন্দ্র করিয়া পদ রচনা করিবেন, তাহাতে আব আশ্চর্য কি? কিন্তু বিদ্যাপতির পদসাহিত্যকে কেবলমাত্র মর্ত্যচেতনাব (secular) দ্বারা বিচাব করা যায় না। তাঁহার কোন কোন পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাহা যে রাধারকৃষ্ণবিষয়ক পদ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অবশ্য কিছু পদ বিশুদ্ধ বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আদিরসাত্মক পর্যায়েব অন্তর্ভুক্ত হইবে। "হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ পর্যন্ত মিথিলা, নেপাল ও বাঙলা দেশ হইতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যত পদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে রাধাকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এইরূপ প্রসঙ্গযুক্ত পদেব সংখ্যা পাঁচ শতেব কম নহে। ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদাব ধৈর্যসহকারে নেপাল, মিথিলা ও বাঙলায় প্রচলিত পদসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া এই সংখ্যা বাহির করিয়াছেন।"[৭] অবশ্য যে সমস্ত পদে প্রত্যক্ষতঃ রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবনসংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত নাই, তাহাদের সবগুলিকেই সাধারণ প্রেমেব কবিতা বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

---

৭ নিম্নে সেই সংখ্যাগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

নেপালপুঁথি	...	...	১৩১ পদ
রাগতরঙ্গিণী	...	...	২০ "
রামভদ্রপুরের পুঁথি		...	৩৯ "
তরৌণীর তালপত্রের পুঁথি	...		১২১ "
গ্রীয়ার্সনের সঙ্কলন		...	৫০ "
বাঙলার পদসঙ্কলন		...	১৩৮ "
যমুনা, গোপ, রাহী প্রভৃতি শব্দযুক্ত			৫ "

সখি হে, আজ জায়ব মোহী।
ঘর গুরুজন ডর না মানব
বচন চুকব নহী ॥

অনু : হে সখি, আমি আজ যাইব, গৃহের গুরুজনের ভয় মানিব না, বাক্যচ্যুত হইব না, অর্থাৎ প্রিয়তমের কাছে যাইব বলিয়া যে অঙ্গীকার করিয়াছি, গুরুজনের ভয়ে তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না।

অথবা, জব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা
দন্দ পসারি গেলি।

অনু : গোধূলির সময় যখন সুন্দরী গৃহ হইতে বাহির হইল, তখন মনে হইল, নব জলধর ও বিদ্যুৎরেখা বিবাদ বিস্তার করিয়া গেল।

প্রভৃতি পদে রাধা বা কৃষ্ণের স্পষ্ট কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহাকে রাধাকৃষ্ণের পদের অন্তর্ভুক্ত করিলেও কোন দোষ হইবে না। বিদ্যাপতি সাধারণ প্রেমের কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া যে-পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, তাহাকেই সাধারণ প্রেমেব পদের পর্যায়ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। উল্লিখিত পদটি ('জব গোধলি সময বেলি') যে কৃষ্ণের উক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকে না ; কারণ ঐ পদের বাকি অংশ একজনের উক্তি, এবং সে উক্তি যে কৃষ্ণেরই, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। বিদ্যাপতির এমন অনেক পদ আছে যাহাতে কৃষ্ণ বা রাধার উল্লেখ না থাকিলেও পদেব তাৎপর্য ও পূর্ব প্রসঙ্গ ধরিযা সেগুলিকে রাধাকৃষ্ণের পদের মধ্যে গ্রহণ কবা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বিদ্যাপতিব প্রায আট শতাধিক পদের মধ্যে পাঁচ শত পদেই রাধাকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে। অবশিষ্ট তিন শতের মধ্যে হরগৌরী, গঙ্গাস্তোত্র, প্রহেলিকা, সীতারামবিষয়ক ও নিছক আদিরসাত্মক কবিতার সংখ্যাও শতাধিক হইবে। বাকি দুই শত পদে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ না থাকিলেও ইহাদের অনেকগুলি যে রাধাকৃষ্ণপ্রসঙ্গ-বহির্ভূত নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, বিদ্যাপতির আট-শতাধিক পদের অধিকাংশই (অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ) রাধাকৃষ্ণবিষয়ক।

রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশ ॥

বাঙলা দেশে প্রচলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী

কালের যাবতীয় বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহে রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'ধৃত রসপর্যায় অনুসারে পদসমূহ সজ্জিত হইয়াছে। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র পূর্বে বা প্রায় সমকালে মিথিলাতেও একখানি গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদসংগ্রহের প্রামাণিক গ্রন্থ লোচন-কবিকৃত 'রাগতরঙ্গিণী' ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত হয়। কিন্তু ইহাতেও রসের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে পদ সজ্জিত হয নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী পূর্বে মিথিলায় ও বাঙলা দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে প্রচলিত ছিল। চৈতন্য-তিরোধানের পরে বাঙলা দেশে প্রধানতঃ রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' অবলম্বনে পদগুলিকে বিশিষ্ট লীলানুসারে সাজানো হইযাছিল। এই পদসঙ্কলন-গ্রন্থগুলির কৃত্রিম বিন্যাসপদ্ধতি বাদ দিলেও দেখা যাইবে, বিদ্যাপতির বিক্ষিপ্ত পদের মধ্যেও একটা বিশেষ ক্রম আছে। বিদ্যাপতি রূপগোস্বামীর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং 'উজ্জ্বলনীলমণি'ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই— তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের এবং আদিরসাত্মক সংস্কৃত ও প্রাকৃতেব 'শতক'জাতীয় শ্লোকগুচ্ছের সহিত রাজসভার কবি বিদ্যাপতি ঠাকুবেব ঘনিষ্ঠ পরিচয থাকাই স্বাভাবিক। তিনি যখন রাধাকৃষ্ণ-বিষযক পদ রচনা করিযাছিলেন, তখন যে বিশৃঙ্খলভাবে করেন নাই, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের নাযিকাপ্রকরণ অবলম্বনেই রাধাচরিত্রেব পরিকল্পনা ও রাধাকৃষ্ণলীলা অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান কবা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত এবং গীতগোবিন্দের প্রভাব তাঁহার শিল্পবোধকে কতদূব নিযন্ত্রিত কবিয়াছিল, তাহা অবশ্য সন্দেহস্থল। কিন্তু রাধাচবিত্র ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও সংযোগসূত্রহীন বিক্ষিপ্ত পদাবলীর সমষ্টি নহে। রাধার দিক ইহতে বিচার করিলে ইহাতে একটা ক্রমবিকাশের স্তব লক্ষ্য করা যাইবে। অবশ্য পরবর্তী কালে যে-ভাবে বিদ্যাপতির পদগুলিকে পূর্বরাগ, দূতীসংবাদ, সখীশিক্ষা, অভিসার, মিলন, রসোদ্গার, মান, মানান্তে মিলন, প্রেমবৈচিত্ত, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা অর্বাচীনকালের পদসঙ্কলকগণের কৃত। কিন্তু এইরূপ পদবিন্যাসপদ্ধতি ঈষৎ আধুনিককালের হইলেও, বিদ্যাপতির পদাবলীকে সেই পর্যায়ে সাজাইলে পদের অর্থ বা ক্রমপর্যায়ের কোন ব্যত্যয় হয় না।

বয়ঃসন্ধি হইতে মাথুরবিরহের আর্তি পর্যন্ত পদসমূহের মধ্যে রাধাচরিত্রের
 স্বরূপটি আভাসিত হইয়াছে, তাহার অভিনবত্ব বিদ্যাপতিকে অমরত্বের

সিংহাসন দান করিয়াছে।) চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্বদর্শন ও ভক্তিবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে আস্বাদন করিয়া মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশে বিদ্যাপতি যে মহিমা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সাধনমার্গ, তত্ত্বদর্শন ও জীবনচর্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু সাধারণ রসবোধ থাকিলেই বিদ্যাপতির রাধাচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাইবে। একটি বালিকা কেমন করিয়া রহস্যব্যাকুল বয়ঃসন্ধির চিত্তদ্বন্দ্বের তটে নিক্ষিপ্ত হইল, কেমন করিয়াই-বা প্রেমের বিষামৃতপূর্ণ রসধারা পান করিয়া এবং ভোগবতীর উত্তাল তরঙ্গলীলা পার হইয়া বিরহ-লোকের অশ্রুপূত অমরাবতী লাভ করিল, রাধাচরিত্র পরিকল্পনায় সেই চিরকালীন রসরূপটি, ধর্মীয় বাতাবরণ সত্ত্বেও মানুষের পরম উপভোগ্য হইয়াছে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিকাশবর্ণনা এবং তদ্দ্বারা মর্ত্যমানবীকে ক্ষণে ক্ষণে অমর্ত্যচারিণীতে পরিণত করিতে গিয়া বিদ্যাপতিকে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। পূর্ববর্তী কাল হইতেই সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্য ও শ্লোকসংগ্রহের মধ্য দিয়া রাধাকৃষ্ণ বা কৃষ্ণের গোপলীলাকে কেন্দ্র করিয়া একপ্রকার আদিরসাত্মক অথচ ভক্তিরসোজ্জ্বল গীতিসাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উপরন্তু ভাগবত, জয়দেব এবং সম্ভবতঃ 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র (লীলাশুক) প্রভাবে পূর্বভারতে ১৫শ শতাব্দীর পূর্বেই কৃষ্ণকেন্দ্রিক যে ভক্তিতত্ত্ব ক্রমেই জনপ্রিয় হইতেছিল, কবি তাহার বাহিরে ছিলেন না। তিনি স্বহস্তে ভাগবত নকল করিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভৈরবসিংহ বোধহয় ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন, কবি বহু পদে প্রত্যক্ষতঃ রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতেই মনে হইবে যে, নিছক মর্ত্যবোধ বা secular দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার রাধাকৃষ্ণপদাবলী রচিত হয় নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া অষ্টশতাধিক পদাবলীর পশ্চাদপটে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একপ্রকার ভক্তিরস প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল, শুধু কবিতার 'আলম্বন-বিভাব' হিসাবেই রাধাকৃষ্ণ পরিকল্পিত হন নাই।

রাধাচরিত্র আলোচনাপ্রসঙ্গে ইহার মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যাইবে—বয়ঃসন্ধি বা মুগ্ধাভাব, অভিসার-মিলনসম্ভোগ মান এবং মাথুর বা বিরহ।) বিরহের পর ভাবসম্মিলন পরিকল্পিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিরহেই এই চরিত্রের চরমোৎকর্ষ, সংস্কৃত নাটকের 'ভরতবাক্যে'র মতো ভাবসম্মিলন স্বাভাবিক অথচ পূর্বপরিকল্পিত বিষয়সন্নিবেশ মাত্র। রাধার বয়ঃসন্ধির পদগুলির কাব্যসমুৎকর্ষ

অবশ্য প্রশংসনীয়। চিত্রকল্প ও মণ্ডনশিল্পের রাজযোটক মিলনের ফলেই বালিকা ও যুবতী রাধার প্রথম যৌবনের ভীতিমিশ্রিত কৌতুক এবং অবাধবাসনার প্রচ্ছন্ন উল্লাস এই বয়ঃসন্ধির পদগুলিকে পদসাহিত্যে একটা বিশেষমূল্য দিয়াছে। কবি ধীরে ধীরে কুশলী রূপদক্ষের মতো বালিকা রাধার কিশোরী হইতে নব-যুবতীতে পরিণত হওয়ার শারীরিক পরিবর্তনের একটি কান্তিময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বালিকার চাঞ্চল্য, নবযৌবনের গন্ধসারে আচ্ছন্ন বালাযুবতীর প্রথম রূপচেতনা, অনাবৃত বাল্য এবং আত্মগোপনচারী প্রথম যৌবনের যে বিমিশ্র দ্বন্দ্ব রাধার যৌবন-আবির্ভাবের চিত্রে সংযোজিত হইয়াছে, সমগ্র বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে একমাত্র বিদ্যাপতির শিষ্য গোবিন্দদাস ভিন্ন অন্যত্র প্রায় দুর্লভ বলিলেই চলে। কবি শুধু শিল্পীর মতো রঙরেখা দিয়া, আলো-আঁধারের ছায়াপাত করিয়া, পাথর কাটিয়া-কুঁদিয়া বালা ও যুবতীর দেহদ্বন্দ্ব-সঙ্কুল চিত্রই অঙ্কন করেন নাই, সেই দেহের অভ্যন্তরে একটি আত্মসচেতন, যৌবনবিহ্বল, নারীমূর্তির মনোদ্বন্দ্ব এবং অকারণ-অবারণ উল্লাসের অনাস্বাদিত আবির্ভাবে থরথর-কম্পিত দেহমনের আরক্ত পুলক কয়েকটি সোনার আখরে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাধার এই বয়ঃসন্ধিচিত্র একাধারে চিত্ররীতির সঙ্কেত এবং ভাস্কর্যরীতির ইন্দ্রিয়গম্যতাকে মিশাইয়া দিয়াছে। কবি বালিকা রাধার এই যে কায়াপরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা স্বয়ং রাধা সভয়ে এবং সকৌতুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সখীগণ তাঁহার আচার-আচরণের মধ্যে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া কৌতুক বোধ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া, বিশেষতঃ তাঁহার এই অর্ধ মুকুলিত দেহচাঞ্চল্য এবং অঙ্গের মধ্যে অনঙ্গের হঠাৎ-আবিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ-উল্লাসে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

রাধা আপনাকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করিলেন, আবিষ্কার করিলেন যে, 'আওল যৌবন শৈশব গেল'। বালিকামূর্তির অন্তরালে বালারমণীর যৌবনের গন্ধমধু লুকাইয়াছিল; কস্তুরীমৃগের মতো রাধা আপন নাভিগন্ধে উন্মনা হইয়া পড়িলেন।

—খনে খনে নয়নকোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরঈ॥
খনে খনে দসনছটা ছুটহাস।
খনে খনে অধর আগে করু বাস॥

অনু: ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তদ্বারা অনুসরণ করে, ক্ষণে ক্ষণে বসনের ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া

তনুকে ধূলিপূর্ণ করে। ক্ষণে ক্ষণে হাস্য করায় দশনের ছটা যুক্ত হয়, ক্ষণে ক্ষণে অধরের সম্মুখে বাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ মুখে কাপড় দেয়।

এখানে বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য এবং কিশোরীসুলভ কৌতূহল—দুই-ই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিসহ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। রাধা যৌবনের স্পষ্ট আবির্ভাব দেখিলেন—

নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি।
হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥

অনু: নির্জনে সে কতবার পয়োধর দেখে, আপনার পয়োধর দেখিয়া সে হাসে।

কবি শুধু রাধার দেহের পরিবর্তনই অঙ্কিত করেন নাই, রাধার অন্তরে ভাবান্তরের উদ্রেক, নিজ দেহকে দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত পুলক উপলব্ধি—বালারমণীর এই চিত্রটি কবি অতি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। কবি যখন রাধার বাহ্যিক সৌন্দর্যের কথা বলেন—

লোচন জনু ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিএ উড়ই না পার॥

অনু: মধুমত্ত ভৃঙ্গ যেমন উড়িতে পারে না, লোচন দুইটিও সেইরূপ স্থির হইয়া আছে।

তখন রাধার প্রথম যৌবনের প্রথম চেতনার উপলব্ধি বর্ণনা করেন—

কবহু বান্ধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥

*　　　*　　　*

চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভান।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥

অনু: কখনও কেশ বাঁধে, কখনও খুলিয়া রাখে, কখনও অঙ্গ আবৃত রাখে, কখনও দেহের আবরণ খুলিয়া ফেলে। চঞ্চল চরণ। চিত্তও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কখনও-বা সখীদিগকে তিনি রভসলীলার কথা জিজ্ঞাসা করেন—

সুনইত রসকথা থাপয় চীত।
জইসে কুরঙ্গিনী সুনএ সঙ্গীত॥

অনু: যেরূপ মৃগী সঙ্গীত শুনে, সেইরূপ সে রসের কথা শুনিলে মনস্থির করিয়া শুনে।

সখি পুছইত আবে দরসএ লাজ।
সীঁচি সুধাও অধ বোলিও বাজ॥

অনু: সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জা দেখায়, সুধাবর্ষণ করিয়া লজ্জাবশতঃ অং কথা বলে।

এমনি করিয়া চিত্রের পর চিত্র অঙ্কিত করিয়া কবি নবযৌবনা রাধার বিচিত্র আচার-আচরণের পরিচয় দিয়াছেন।

রাধার এই জীবনদ্বন্দ্বের চিত্রটি সর্বাগ্রে কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। তিনিও রাধার এই কৈশোর-যৌবনের সঙ্কটটিকে দূর হইতে উপভোগ করিয়াছেন—

চঞ্চল লোচন বাঙ্কে নিহারএ অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবনে পেলল, অলিভরে উলটাএ॥

অনু: চঞ্চল লোচন বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছে, অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে আন্দোলিত কমল ভ্রমরের ভরে উলটাইয়া গিযাছে।

কিংবা

গমন-পরস খসু অম্বর রে দেখল ধনি দেহ।
নব জলধর-তর চমকযে রে জনি বীজুরী রেহ॥

অনু: পবনের স্পর্শে বসন সরিয়া গেল, আমি সুন্দরীর দেহ দেখিলাম। মনে হইল যেন নূতন মেঘের নীচে বিদ্যুৎরেখা চমকাইতে দেখিলাম।

আর-একস্থলে—

চিকুর নিকর তম সম পুনু আনন পুনিব সসী।
নঅন-পঙ্কজ কে পতিআওল এক ঠাম রহু বসী॥

অনু: রাধার কেশকলাপ অন্ধকারের ন্যায়। কিন্তু বদন পূর্ণিমার চাঁদের মতো, আর নয়ন কমলতুল্য। কে বিশ্বাস করিবে যে অন্ধকার, পূর্ণচন্দ্র এবং পঙ্কজ একস্থানে থাকিতে পারে?

কৃষ্ণের রূপোল্লাস এবং রাধার বয়ঃসন্ধিব চলচঞ্চল সৌন্দর্য বর্ণনায কবি দেহের যে আলো-আঁধারিপূর্ণ ইঙ্গিতের দ্যোতনা সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীব রোমান্টিক কবির ঈর্ষার বস্তু। দেহকে ঘেরিযা মুকুলিত বাসনাব ক্ষণে ক্ষণে পাখা বিস্তার কবিযা সুদূর আকাশে উডিবাব প্রয়াসটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাব মধ্য দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। দেহকে স্বীকৃতি দিয়া এবং অনঙ্গকে অঙ্গময় করিয়া কবি দেহকামনার চাবিদিকে একটা দুর্জ্ঞেয়তার জালাবরণ টানিয়া দিয়া ভর্তৃহরি বা অমরুর কামকলাপিচ্ছিলতা হইতে রাধার প্রথম দেহচেতনাকে রক্ষা করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণের যে বাসনাজর্জর রূপোল্লাস, তাহা যেমন জৈব প্রেরণাজাত, তেমনি আবার তাহাতে একটা সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যচেতনার অশরীরী ভাবরস স্থূলত্ববর্জিত প্রতীকের সাহায্যে আভাসিত হইয়াছে—

জঁহা জঁহা পদযুগ ধরঈ
তঁহা তঁহা সরোরুহ ভরঈ॥

জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ॥

অনু: যেখানে যেখানে পা দুটি পড়ে, সেখানে সেখানে যেন কমল ভরিয়া উঠে, যেখানে যেখানে তাহার অঙ্গের জ্যোতি ঝলক পড়ে, সেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ উঠে।

মিথিলাবাসীর পরম দুর্ভাগ্য যে, এই অপূর্ব পদটি মিথিলায় পাওয়া যায় নাই। এখানে লক্ষণীয় বিদ্যাপতি সাধারণতঃ জীবনের বহিরঙ্গে বিচরণ করিতে উৎসুক, অনঙ্গকে অঙ্গের বাসনাপ্রদীপে দীপ্তিময় করিতে অভিলাষী—"রাধার অঙ্গবিশেষের উপমা জোগাইতে বিদ্যাপতি জড় জীব কিছুই বাকি রাখেন নাই"।৮ তিনিই আবার কৃষ্ণের দেহকেন্দ্রিক সম্ভোগবাসনার উত্তাপ হ্রাস করিয়া ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে সৌন্দর্যকে অনুভূতিবেদ্য করিয়া তুলিয়াছেন। রাধার বয়ঃসন্ধি এবং কিশোরী রাধার প্রতি কৃষ্ণের আবেগে "গভীরতার অটল স্থৈর্য নাই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য" (রবীন্দ্রনাথ)। শুধু এইটুকু বলিলেই রাধাচরিত্রের প্রথম স্তরের সব কথা বলা হইল না। কৃষ্ণকে প্রথম দেখিয়া 'নবএঞাবদনী' রাধার দেহে-মনেও লীলাচাঞ্চল্যের জোয়ার আসিয়াছে—

অবনত আনন কএ হম রহলিহু বারল লোচনচোর।
পিয়া মুখরুচি পিবএ ধাওল জনি সে চাঁদ চকোর॥
ততহু সঞে হটে হটি মোঞে আনল ধএল চরণ রাখি।
মধুপ মাতল উডএ ন পারএ তইঅও পসার এ পাঁখি॥

অনু: মাধবের সহিত যখন দেখা হইল, তখন আমি মুখ নীচু করিয়া রহিলাম, লোচনচোরকে বারণ করিলাম, কিন্তু চকোর যেমন চাঁদের দিকে ধায়, আমার নয়ন তেমনি প্রিয়ের মুখরুচি পান করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেখান হইতে জোর করিয়া আমি চোখকে হঠাইয়া আনিলাম, চরণের দিকে চোখ রাখিলাম। মধুমত্ত মধুকর যেমন উড়িতে পারে না, তবু পক্ষ বিস্তার করে।

এখানে প্রথম প্রেমের লজ্জারক্তিম আত্মপ্রকাশটি চমৎকার ফুটিয়াছে। 'দরসন-রস রভস লীলা লোভে গরাসলি লাজে' (দর্শনজনিত রহস্যলীলারসের লোভ লজ্জাকে গ্রাস করিল)। কিন্তু শুধু এই লাজচঞ্চল সন্নত ভাবটি আর রহিল না, অকস্মাৎ বালার অঙ্গে যৌবনের অনঙ্গ জাগিল, 'তনুপসেবে পসাহনি ভাসলি পুলক তৈসন জাগু। চুনি চুনি ভএ কাঁচুআ ফাটলি বাহুবলআ ভাগু॥' (স্বেদে দেহের প্রসাধন ভাসিয়া গেল, এমন পুলক জাগিল যে কাঁচুলি চুনচুন

৮ কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

করিয়া ফাটিয়া গেল, বাহুর বলয় ভাঙিয়া গেল)—তারপর অভিসার ও মিলন। অনঙ্গ যখন জাগিয়াছে তখন দেহের বন্ধন তো ঘুচিবেই—

নব অনুরাগিণী রাধা। কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান। পথবিপথ নাহি মান॥

রাধা দারুণ দুর্যোগে অভিসারে বাহির হইলেন—

ভীম ভুজঙ্গম সরণা। কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥

* * *

গগন সঘন মহিপঙ্কা। বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা॥
দসদিস ঘন আন্ধিয়ার। চলইত খলইত লখই না পার॥

ইহার পর রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন, বালারমণীর দেহমন্থনজাত অনাস্বাদিত রসের প্রথম উল্লাস। আনন্দ-বেদনার এমন অপূর্বচিত্র ও নারীজীবনের গভীরতম মর্মরহস্য একমাত্র বিদ্যাপতির পদেই মিলিবে। এক মুহূর্তেই রাধার ভীরু বালাসুলভ শঙ্কাসংমূঢ়তার অবসান হইল। তারপর জীবন-উদ্যানে যৌবনবসন্তের আবির্ভাব,—অভিসার মিলন, বাসকসজ্জা, মান—রাধার সঙ্কীর্ণ জীবনকে ঘেরিয়া বিচিত্র রসের আবির্ভাব।

মানের পর মিলনবর্ণনায় বিদ্যাপতি রঙের পরে রঙ দিয়া, সংস্কৃত-প্রাকৃত শতককাব্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া রাধামাধবের দেহাশ্রিত অনঙ্গলীলার অসহ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই মিলনরভসের উন্মত্ত লীলা—

অম্বর খসল ধরাধর উলটল ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরিগণ করু রোলে॥

অনু: বসন খসিয়া পড়িল, পর্বত উলটাইল, ধরণী ডগমগ করিয়া দুলিতে লাগিল, প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছে, ভ্রমরীরা কলরব করিতেছে।

কিংবা

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল স্রবণে দুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেলা॥

* * *

কিঙ্কিনী কিনিকিনি কঙ্কন কনকন কলরব নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥

অনু: চিকুর গলিত হইয়া মুখমণ্ডলে মিলিত হইল, মেঘমালা চন্দ্রকে বেষ্টন করিল। মণিময় কুণ্ডল কানে দুলিতে লাগিল, ঘামে তিলক মুছিয়া গেল। কিঙ্কিণী, কঙ্কণ ও নূপুর বাজিতে লাগিল, মদন নিজের গর্বে পরাভব পাইল।

এই বর্ণনাগুলি স্থূল দেহধর্মকেই অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে এমন একটা আলঙ্কারিক নিপুণতা এবং গতিবেগ আছে যে, অনঙ্গরসের উত্তাপ চিত্তকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না।

(বিদ্যাপতির মাথুর বা বিরহের পদে রাধাচরিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূর্বরাগ হইতে মিলনসম্ভোগ পর্যন্ত রাধাচরিত্র প্রধানতঃ নায়িকা মাত্র; দেহের লীলাবৈচিত্র্য রাধার নবযৌবনচঞ্চল মনোজগতে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।) বয়ঃসন্ধিই হউক, আর বাসকসজ্জা-মান-মানান্তে মিলনই হউক—সর্বত্র প্রত্যহের জীবনটাই নানা রূপরঙ্গের মধ্য দিয়া শত ধারায় বিকীর্ণ হইয়াছে। (কিন্তু বিরহের পদে রাধা কেবলমাত্র প্রাকৃত নায়িকা হইয়া রহিলেন না; দুঃখবেদনার অগ্নিতাপে লীলাবিলাসের ছলাকলা কিংশুক মঞ্জরীর মতো ঝরিয়া পড়িল। নবোঢ়া নায়িকার দেহসম্ভোগের প্রতি শঙ্কিত কৌতূহল এবং প্রগল্ভা নায়িকার পরিণত মনের পরিপূর্ণতা রাধাচরিত্রের মধ্যে এমন একটা শিল্পসমৃদ্ধ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা রসিক পাঠকের পরম আদরণীয়। মর্ত্যজীবনের বাতায়নে বসিয়া রাধা জীবনের পুলক উপলব্ধি করিয়াছেন, দেহপ্রমাথী প্রেমের অপূর্ব রসরঙ্গ বয়ঃসন্ধিকালের রাধাকে ধীরে ধীরে পুষ্পের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছে। প্রেম ও কামের যুগপৎ প্রভাবে রাধার দেহ অপেক্ষা মনের বয়স দ্রুতবেগে বাড়িয়া গিয়াছে।

কাম প্রেম দুহু একমত ভএ রহু কখনে কম করাবে।

অনু: কাম ও প্রেম যখন একমত হইয়া যায়, তখন কি না করাইতে পারে?

রাধাচরিত্রের এই যে ক্রমিক বিকাশ, ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের দল উন্মোচন, রোমান্টিক আখ্যানের নায়িকারূপে রাধার এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ প্রশংসা দাবী করিতে পারে। যে-জয়দেবকে বিদ্যাপতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধাচরিত্রের বিশেষ কোন বিকাশধারা লক্ষিত হয় না; বিদ্যাপতির সমকালে কোন প্রাদেশিক ভাষায় লেখা কোন চরিত্র-প্রধান রচনারও সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং রাধাচরিত্রের পরিকল্পনা এবং বয়ঃসন্ধি হইতে মাথুর বা বিরহের পূর্ব পর্যন্ত রাধার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া জীবনের পরম রসরহস্য অনুধাবন,—এই বিষয়টি বিদ্যাপতির মৌলিক কল্পনার সার্থক দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই পর্যায়ের রাধাচরিত্র বহুলাংশে মর্ত্যচারিণী; দেহকে ঘেরিয়াই তাঁহার যত কিছু ফেনিল অভিজ্ঞতা, কৃষ্ণকে ঘেরিয়াই তাঁহার অনবরুদ্ধ প্রাণের যত কিছু নর্মলীলা; তাঁহার মুখের হাসি ও চোখের জল যেমন

বাসনারসে টলমল করিয়াছে, ঠিক তেমনি করিয়া চিত্তলোকের গভীর রহস্য একটা দিব্যদাহে জ্যোতির্ময় হইতে পারে নাই। কবি সাধারণ হিন্দুর দেববিশ্বাসের বাতায়নে বসিয়া এই পর্বের রাধা-চরিত্রে রঙ্ ও রেখা সন্নিবেশ করিয়াছেন; কিন্তু রাধার মর্ত্যচেতনালব্ধ পার্থিব রূপটি যে-পরিমাণে মানসিক বিকাশপরম্পরা অবলম্বন করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে দেহাশ্রিত প্রেম বাসনাজর্জর প্রাণের অনন্ত পুলক ও অসীম আর্তনাদকে সুরে ভরিয়া দিতে পারে নাই। বিদ্যাপতি তাহার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন নাই। সমালোচক ও ঐতিহাসিক ইহার কারণস্বরূপ বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবনকেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিদ্যাপতি যতদিন শিবসিংহের ছায়াতলে বসিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন, ততদিন তিনি নিভর জীবনের প্রসন্ন সুখ উপভোগ করিযাছিলেন, কিন্তু শিবসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগ্যবিপযয় আরম্ভ হয় এবং বিপন্ন কবিকে বেশ কিছুকাল স্বদেশ ত্রিহুত ত্যাগ করিযা নেপালে অন্য এক রাজবংশের কৃপাপ্রার্থী হইযা বাস করিতে হয়। ফলে শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদসমূহ (এমন কি বিরহের পদেও) যেরূপ জীবন রসভোগের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়, তাহার পরবর্তী কালে রচিত পদসমূহে সেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত লীলা পরিলক্ষিত হয় না। শিবসিংহের যুগের পদে বিলাস-বিহ্বল দেহাসক্তির প্রবলতা, বিরহের মধ্যেও অঙ্গহীন দেবতার অনঙ্গলীলার চাঞ্চল্য ও বৈচিত্র্য; কিন্তু রাজবনৌলীতে অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশ ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবির নাগরিক চিত্তের উচ্চকিত লীলাবিলাস হ্রাস পাইয়া যায়, তাই পরবর্তী কালের পদে বিলাস অপেক্ষা বেদনা অধিক। মিলনের পদেও আসন্ন বিচ্ছেদের আভাস, বসন্তের মত্ত লীলারঙ্গের মধ্যেও বিরহী মনের বহ্নিজ্বালা ('বিরহ বিপদ লাগি, কেসু উপজিল আগি'—কিংশুক ফুলে চারিদিক লালে লাল হইয়া গিয়াছে, যেন বিরহীদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে) ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সমালোচক এইভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া সন্ধান করিয়াছেন।[৯]

এই বিশ্লেষণ কিন্তু অযৌক্তিক নহে। কারণ বাস্তবিক বিদ্যাপতির গভীর চেতনালব্ধ পদগুলি শিবসিংহ-আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় রচিত। কিন্তু তাহার

৯ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী', ৬৮/০-৭/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণস্বরূপ শুধু বিদ্যাপতির ভাগ্যবিপর্যয়কে দায়ী করিলেই চলিবে না। বিদ্যাপতি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসিয়া যৌবনের উচ্ছলতা ত্যাগ করিয়া পরিণত মনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের প্রথম দিকের রচনায় কিছু কিছু তারল্য, চপল জীবনোর্মির চাঞ্চল্য থাকিবেই। কিন্তু জীবনের দ্বিতীয় যামে পৌঁছাইয়া কবি চেতনার গভীরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই পরবর্তী কালের বিরহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা—

বিরহ সহাইঅ নারি,
জৈবক কে ন হানিঅ মারি ॥

অনু: নারীকে প্রাণে মারিত যদি তো অনেক বেশি ভাল ছিল, এ যে মরণের অধিক যন্ত্রণা !

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলীর মধ্যে এই বিরহ বা মাথুর পদের মধ্যেই যেমন কবিকৃতির চরমোৎকর্ষ, তেমনি রাধাচরিত্রেরও পূর্ণতম বিকাশ। এমন কি তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত পদাবলীর মধ্যে প্রেমের বিচিত্র নর্মলীলা ও জীবনযৌবন-সম্ভোগের অজস্র উচ্ছ্বাস প্রধান হইলেও ঐ যুগের বিরহের পদেও কিঞ্চিৎ গভীরতা সঞ্চারিত হইয়াছে। রাজসভায় বসিয়া রাজা, রাজমহিষী, মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্নীদের প্রীতি লাভ করিবার জন্যই যদি ঐ যুগের অধিকাংশ পদাবলী রচিত হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার বিরহের পদে অন্যান্য পদ অপেক্ষা চিত্ততলদেশের বিপুল রহস্যের কিছু কিছু আভাস আছে। সুতরাং একথা বোধহয় বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অন্যান্য পর্যায়ের পদে বিলাসকলাকুতূহল ও চঞ্চলতা থাকিলেও বিরহের পদে রাধার বেদনাপীড়িত আশাহীন আর্তিটুকু মানবচিত্তের অন্তস্তলশায়ী গভীর বিলাপকে লবণাক্ত অশ্রুধারায় বাণীময় করিয়া তুলিয়াছে।

শিবসিংহের নামাঙ্কিত পদসমূহে জীবনের উজ্জ্বল দিকটি অধিকতর জীবন্ত হইয়াছে, তাহা সত্য বটে; যে-সমস্ত পদে বিরহবেদনার কথা আছে, তাহা যেন বড় বেশি কৃত্রিম, প্রথাসিদ্ধ (conventional); তাহাতে অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়িকা-প্রকরণের 'বিরহ'-পর্যায়ের প্রতি অধিকতর আনুগত্য দেখা যায়। তথাপি এই যুগের বিরহের পদেও রাধার বেদনাকাতর অশ্রুমুখী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণবিরহে কুলস্বজনভীতা রাধার গোপন বিলাপ 'চোর জননি জঞো মনে মনে ঝাখিঞোঁ রোঞেঁ বদন ঝপাঞ' (চোরের মায়ের মতো

মনে মনে শোক করিতেছি, মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতেছি)—এখানে একটি উপমায় অসহায় রাধার মনের পীড়নটি চমৎকার ফুটিয়াছে, এই পর্যায়ের একটি পদে বিরহবিষণ্ণ রাধার পরিচয় কয়েকটি শব্দচিত্রের সাহায্যে বিকশিত হইয়াছে—

একহি শয়ন সখি সুতলরে অছল বালভ নিসি মোর।
না জানল কতিখন তেজি গেলরে বিছুরল চকেবা জোর॥
সুন সেজ হিয় সালয়ে রে পিয়াএ বিনু মরব মোয়ে আজি।
বিনতি করঞো সহি লোলনি রে মোহি দেহে অগিহর সাজি॥

অনু: সখি, রাত্রিতে আমার বল্লভ একশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। কোন সময় ত্যাগ করিয়া গেল, জানিলাম না, চকবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, প্রিয়বিরহে আজ আমি মরিব। সখি মিনতি করিতেছি, আমার দেহ অগ্নিতে সাজাইয়া দাও।

কখনও রাধা পথের পথিককে ডাকিয়া বলেন—

অরেরে পথিক ভইআ সমাদ লএ জইহ জাহি দেস বস মোর নাহ।
হমর সে দুখসুখ তহি পিয়া কহিহ সুন্দরি সমাহাল বাহ॥

অনু: হে পথিক ভাই, যে দেশে আমার নাথ বাস করেন সেখানে সংবাদ লইয়া যাও। আমার সুখদুঃখ সেই প্রিয়তমকে কহিও [illegible] ও, সুন্দরী অগ্নি প্রবেশ করিয়াছে।

রাধার এই বিরহবিষণ্ণ করুণ কোমল মূর্তিটি কয়েকটি ইঙ্গিতে বিকশিত হইয়াছে—'সখিগণ কন্দ ধ খোহি কলেবর ঘর সঞো বাহিব হোয' (সখীগণের কাঁধে দেহ রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হয়), কখনও বা তিনি কৃষ্ণবিরহে চমকিয়া উঠেন, 'জীবন চাহি মরণ ভেল ভাল' (বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরণ ভাল), কখনও বা নিজ ভাগ্যকে দোষ দিয়া বলেন, 'জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস। হমর অভাগ হুনক কোন দোস॥' (লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে বাস করুক, যুগ যুগ জীবিত থাকুক, উহার কি দোষ? আমারই অভাগ্য।) মিথিলা ও নেপালে প্রাপ্ত পদে রাধাবিরহের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত না মিলিলেও বিরহে পৌঁছাইয়া রাধার অন্তর্জীবনের যে আমূল পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ইহাতেই পাওয়া যাইবে।

বাংলা দেশের পদসঙ্কলনে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত অথচ মিথিলার রাজাদের নামোল্লেখহীন যে পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মৈথিলী ও হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিশেষ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। বাংলা

দেশেও কেহ কেহ এই মতে বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাংলা পদসঙ্কলনের পদগুলির অধিকাংশই মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত নহে। কারণ এই সমস্ত পদে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলেও রাজা শিবসিংহ, রাণী লছিমা-দেবী, অন্যান্য রাজা এবং তাঁহাদের 'বিরুদ'-নামের কোন ইঙ্গিত নাই। এ বিষয়ে আমরা পরে 'বিদ্যাপতি সমস্যা' নামক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। উপস্থিত প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, বিদ্যাপতির যে বিরহের পদগুলি সর্বোৎকৃষ্ট, যাহা অবলম্বনে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পরিণত বুঝা যায়, তাহা বাঙলা দেশেই পাওয়া গিয়াছে। হয়তো পদসঙ্কলকগণ যখন বিদ্যাপতির মূল পদগুলি সঙ্কলনে ঠাঁই দিয়াছিলেন, তখন বাঙালীর মনের দিকে চাহিয়া বিদ্যাপতির ভাষাকে কিছু পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছিলেন; সেই সময়ে খুব সম্ভব কোন কোন পদ হইতে রাজাদের নাম বাদ পড়িয়া গিয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, বিদ্যাপতি যখন মিলন-সম্ভোগের পদ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন মিথিলেশের মুখের দিকে চাহিয়াই পদ রচনা করিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ শিবসিংহের নামযুক্ত এই রূপ একটা পদের উল্লেখ করা যাইতেছে। এই পদে (৩৫) রাধা বলিতেছেন, 'সপনে মোএ দেখল নন্দকুমার' (স্বপ্নে আমি নন্দকুমারকে দেখিলাম)। বিদ্যাপতি সেই প্রসঙ্গে ভণিতায় রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

সিবসিংঘ রায় তোরা মন জাগল কাহ্নু কাহ্নু করসি ভরমে।

অনু: শিবসিংহরায় তোমার মনে জাগিয়াছে, ভ্রমবশে তুমি কানু কানু করিতেছ।

এখানে রাজসভাজীবী ও রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির চাটুকার-সুলভ দীন মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাঙলা দেশের বিভিন্ন পদসঙ্কলনে বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট বিরহের পদে শিবসিংহ বা অন্য কোন রাজা বা রাজমহিষীর উল্লেখ নাই। তখন বিদ্যাপতি এমন একটা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া-ছিলেন, রাধাজীবনের এমন একটা মর্মগূঢ় অভূতপূর্ব ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, রাজসভা ও রাজন্যবর্গের মনস্তুষ্টির কথা তখন তাঁহার মনে ছিল না বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সমস্ত বিরহের আর্তি—'সখি হে হামরি দুখের নাহি ওর', 'পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা' প্রভৃতি পদের শিল্পমূল্য বিচারের অপেক্ষা রাখে না।

অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সো পিয়া নেহে॥

অনু: রৌদ্রের তাপে অঙ্কুর যদি পুড়িয়া যায় তাহা হইলে জলভরা মেঘে কি হইবে? এ নবযৌবন যদি বিরহে কাটে, তাহা হইলে দয়িতের স্নেহ কি হইবে?

অরুণ নয়ন লোরে তীতল কলেবর বিলুলিত দীঘল কেসা।
মন্দির বাহির করইতে সংসয় সহচরি গণতহি সেসা॥

অনু: তাহার অরুণনয়নের জলে দেহসিক্ত হইল। দীর্ঘ কেশ আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, গৃহের বাহির করাও সংশয়, সহচরীরা শেষ গণনা করিতেছে।

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মধাঈ।
ও নিজভাব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবুধাঈ॥

অনু: অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে সুন্দরী মাধব হইল। আপনগুণে লুব্ধ হইয়া সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলিয়া গেল।

অথবা, বাঙলা দেশে প্রচলিত ভাবসম্মেলনের পদে রাধার অপার্থিব মিলন-রসের বাসনাজাত পদগুলি উল্লেখযোগ্য—

আজ রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ দসদিস ভেল নিরদন্দা॥

কিংবা

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

কিংবা সেই অপূর্ব পদটি—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয
সোই পিরীতি অনু রাগ বখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয।

ইহার তুলনা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

বাঙলা দেশে-প্রচলিত বিরহ ও ভাবসম্মেলনের পদে চিরবিরহের বিলাপ ও আসন্ন মিলনের উল্লাস এমন একটা শিল্পসৌকুমার্য লাভ করিয়াছে যে, মিথিলায় প্রাপ্ত তথাকথিত বিশুদ্ধ পদে তাহার বিশেষ প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে না। মিলনসম্ভোগের মধ্যে রাধার বিষামৃতমাখা আনন্দোৎসবের উত্তাল বিক্ষোভ বিরহের ব্যবধানে প্রশমিত হইল, এত দিন রাধা জীবনের বহিরঙ্গ লইয়াই মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে হারাইয়া তাঁহার যেন দ্বিতীয় জন্ম হইল, শুধু উপরিতলের তরঙ্গলীলা নহে, জীবনসমুদ্রের লবণাক্ত অতলে ডুবিয়া রাধা কৃষ্ণকে আরও নিবিড় করিয়া পাইলেন। রাধাবিরহ তাই রাধার ব্যর্থ প্রেমের

চিত্র নহে, অশ্রুকাতর বিলাপের মধ্য দিয়া রাধা কৃষ্ণকে জীবনের গভীরে উপলব্ধি করিলেন। ইহা আর প্রথম মিলনের সাধ্বস অনুরাগ নহে, অভিসারের বিপুল আকাঙ্ক্ষাজনিত দুঃসাহসও নহে, অভিমানের বর্ণসুষমা নহে, বা প্রগল্‌ভা রাধার দেহচেতন কামরঙ্গও নহে; বিরহের হাহাকার রাধাকে স্বস্থ করিয়াছে। বিকশিত শিরীষ কুসুমের দলগুলি যেমন ঝরিয়া যায়, বিরহে পৌঁছিয়া রাধাও তেমনি আভরণ ছাড়িয়া যৌবনজ্বালার সব উত্তাপটুকু চোখের জলে ধুইয়া দিয়া একটা নূতন রূপ লাভ করিয়াছেন। 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি এই দিক দিয়া জয়দেবকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। (জয়দেবের রাধা প্রেমসরোবরের প্রস্ফুট কমলিনী, কৃষ্ণ-প্রতিকূলতার সামান্য বাতাসেই ভাঙিয়া পড়েন; কিন্তু বিদ্যাপতির রাধাকে কৃষ্ণবিরহের সমস্ত ব্যথা সহিয়া প্রেমের মূল্য দিতে হইয়াছে। এই বিরহের পটভূমিকায় রাধার ভাবসম্মেলনের পদগুলি তাই এত বেদনামাধুরী-মিশ্রিত করুণ ও কোমল হইয়া উঠিয়াছে।) রাধা চিরবিরহের সমুদ্রপারে নির্বাসিত, তবু তিনি বাসনালোকে মিলনরভসের উল্লাস তিল তিল করিয়া জমাইয়া রাখিয়াছেন। শয়নমন্দিরে প্রিয় আসিলে তিনি দেহকে মাঙ্গলিকে সাজাইয়া প্রিয়কেই অর্ঘ্যদান করিবেন, যখন প্রিয় রভস মাগিবে, তখন 'মুখমোড়ি বিহসি বোলব নহি তবহি' (মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিব—না, না), এই মিলন-আকাঙ্ক্ষা দেহকে অবলম্বন করিলেও ইহার অনুভূতির গভীরতা ও দেহাতীত ব্যঞ্জনা মিথিলায় প্রাপ্ত পদে অতি অল্পই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির বিচ্ছিন্ন পদেও এই ভাবে রাধা চরিত্রের একটা বিকাশধারা লক্ষ্য করা যায়।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

॥ ১ ॥

বিদ্যাপতির কবিত্ব

গত চারি শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র পূর্ব-ভারত বিদ্যাপতির কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়া আসিতেছে, অবশ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিদ্যাপতি ও তাঁহার পদাবলীকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে আস্বাদ করিয়া থাকেন, তাহা ধর্মীয় চেতনার সহিত সংযুক্ত। বিদ্যাপতির কবিত্ববিচারে এই জাতীয় ধর্মকেন্দ্রিক মনোভাব অন্যতম বাধা কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ বিদ্যাপতি যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে যুগ চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মচর্যা ও রসসাধনার পূর্ববর্তী যুগ, বৃন্দাবনের গোস্বামি-প্রভুগণ,—বিশেষতঃ সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী-ব্যাখ্যাত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রচারিত পরকীয়া সাধনতত্ত্বের কোন প্রভাব বিদ্যাপতির পদে পাওয়া সম্ভব নহে। গীতগোবিন্দের ভাবাদর্শ এবং সংস্কৃত প্রাকৃত আদিরসাত্মক উদ্ভট কবিতার দ্বারা তিনি অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ভাগবতের প্রভাবও অসম্ভব নহে, কারণ কবি স্বয়ং ভাগবতের এক নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পদে গৌড়ীয় রাগানুগা ভক্তি অপেক্ষা, বরং ভাগবতের ঐশ্বর্যমিশ্রা ভক্তির কথঞ্চিৎ প্রভাব দেখা যায়। কাজেই বিদ্যাপতির পদের রসাস্বাদন করিতে হইলে ভারতীয় মনের কৃষ্ণবিষয়ক সাধারণ প্রবণতার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারে। পরবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবপদশাখা ও রসতত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় বিদ্যাপতির পদ রসায়নের কাজ করিয়াছিল। কিন্তু সে আদর্শকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শের দ্বারা বিচার করা যায় না, করিতে গেলে 'কালানৌচিত্য' নামক আলঙ্কারিক দোষ ঘটে। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিত্ব-বিচারে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুশাসন বা সাধনমার্গের সহায়তা লইবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া মৈথিলী সমালোচকদের (মহাঃ উমেশ মিশ্র) মতো

বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের পদাবলীকে বিশুদ্ধ পার্থিব ব্যাপার (secular) বা শৃঙ্গাররসের পদ বলিলে ইহার যথার্থ কবিত্ব বুঝা যাইবে না। পুরাণ হইতে জাত কৃষ্ণলীলা ও লৌকিক কৃষ্ণায়ণ কাব্যে কবিতার আদর্শ স্মরণ রাখিয়া বিদ্যাপতির কবিত্ব আলোচনা করিতে হইবে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ ও রাধা বাহিরের দিক হইতে মর্ত্যচারী নহেন, তাঁহারা বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী; তবে বিদ্যাপতির বৃন্দাবন মধ্যভারত ত্যাগ করিয়া ত্রিহুতে হাজির হইয়াছিল। তিনি রাধাকৃষ্ণের ভগবৎসত্তা সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত হইয়াও মর্ত্যজীবনের বেদনামাধুরী হইতে রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন এবং আদি-রসাত্মক সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য-কবিতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া সেই লীলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে প্রাকৃত রসরুচির ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবিরহে রাধা যখন বলেন—

অব ন ধরম সখি বাঁচত মোর।
দিন দিন মদন দুগুন সর জোর॥

অনু: আর আমার ধর্ম রক্ষা হইবে না, দিন দিন মদনের শরাঘাত দ্বিগুণ হইতেছে।

মাধব জনু দীঅহ মোর দোস।
কত দিন রাখব হুনক ভরোস॥

অনু: মাধব, আমায় যেন দোষ দিও না, তোমার ভরসায় আর কত দিন উহাকে অর্থাৎ ধর্মকে রাখিব?

কৃষ্ণ যদি না আসেন, তাহা হইলে রাধা যে কত দিন 'ধর্ম' রক্ষা করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিতেছেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাপতি যদি এই পদ লিখিয়াও থাকেন, তাহা হইলে এই চরিত্রের চারি দিক হইতে প্রাকৃত নায়িকার স্থূলতা লোপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কোন কোন পদে স্থূল প্রাকৃত জীবনের অমসৃণ হস্তাবলেপ আছে। কিন্তু এইরূপ সামান্য কয়েকটি পদ বাদ দিলে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদে বিস্ময়কর কবিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। অবহট্ট ভাষায় লিখিত তাঁহার দুইটি পদ এবং 'কীর্তিলতা'র শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এই কাব্যে জৌনপুরের বর্ণনা এবং কীর্তিসিংহ ও অসলানের সংঘর্ষ বর্ণনায় কবি শব্দাম্বুধি মন্থন করিয়া এমন সমস্ত চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির অপেক্ষা রাখে। বিশেষতঃ কীর্তিসিংহের বীর্যবর্ণনায় যুক্তাক্ষরবহুল অবহট্ট শব্দের স্ফুলিঙ্গবর্ষণ বিদ্যাপতির অসাধারণ শব্দচাতুর্য প্রমাণ করে। কিন্তু বিদ্যাপতির কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক

পদাবলী। কেহ কেহ তাঁহাকে যে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা দিতে চাহেন, তাঁহার পদাবলীর কবিত্ব বিচার করিলে তাহা আদৌ অযৌক্তিক মনে হইবে না।

প্রথমতঃ ছন্দের কথাই ধরা যাক। বিদ্যাপতির সমকালে বাঙলা দেশে অবশ্য পয়ারত্রিপদী এবং ইহার বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য কাব্যক্ষেত্রে ঠাঁই করিয়া লইয়াছিল। ছান্দসিক সমালোচক বিদ্যাপতির বিচিত্র ছন্দোনৈপুণ্যের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন।[১] পজ্ঝটিকা, দোহা, ত্রিপদী, চর্চরী প্রভৃতি নানা প্রকার ছন্দে বিদ্যাপতির বিস্ময়কর কারুকৃতিত্ব প্রশংসনীয়। তিনি প্রধানতঃ হিন্দী চৌপাঈ এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশের ছন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ছন্দের পারিভাষিক খুঁটিনাটি তথ্য বাদ দিলেও পজ্ঝটিকার অন্তর্গত—

> শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।
> কাজলে সজল মদন সন্দেশ।।

অথবা মিশ্র ছন্দ (৮+৮+৮+৩)

> অরিসম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে আপন মনোরথ আই।

কিংবা চর্চরী—

> গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহসি পলটি নিহারি।
> ইন্দ্রজালক কুসুম শায়ক কুহুকি ভেল বরনারী।।

এইসমস্ত ছত্রে তাঁহার ছন্দকুশলতা প্রশংসনীয়। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির ছন্দের দোলা সহজেই চিত্তকে স্পর্শ করে—

> ১। চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তায়।
> জনু ইন্দীবর পবনে পেলল অলিভরে উলটায়।।
> ২। ঘনঘন গরজয়ে, ঘন মেহ বরিখযে দশদিশ নাহি পরকাসা।
> পথ বিপথহুঁ চিহ্নয়ে না পারিয়ে কোন পুরয়ে নিজ আসা।।
> ৩। তোহর হৃদয় কুলিশ কঠিন বয়ন অমিঞ ধার।
> পহিলহি নহি বুঝএ পারল, কপটক বেবহার।।
> ৪। চানন ভেল বিসম সরয়ে ভূসন ভেল ভারী।
> সপনহুঁ নহি হরি আএল রে গোকুল গিরধারী।।

[১] কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

৫। আএল ঋতুপতি-রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবি-পন্থ ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। কেসর কুসুম ধএল হেমদণ্ড ॥
৬। ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর সর হন্তিয়া ॥

এই পংক্তিগুলির ছন্দের মধ্যে এমন একটা দোলন অনুভব করা যায়, যাহা সাধারণ বক্তব্যকেও সুরে ও ঝঙ্কারে পূর্ণ করিয়া তোলে।

(গীতিকবির একটা বড় লক্ষ্য চিত্রসৃষ্টি; বিদ্যাপতি ঠিক আধুনিক অর্থে গীতিকবি না হইলেও তাঁহার চিত্রাঙ্কনশক্তি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কবির সমতুল্য।) চিত্রাঙ্কনের জন্য কিছু কিছু আলঙ্কারিক কৌশলের প্রয়োজন। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে বিদ্যাপতির কবিকৃতি আধুনিক কালেও অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবী করিতে পারে। 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণীসমাজে', 'চোর জননি জঞে মনে মনে ঝাখিঞোঁ রোঞেঁ বদন ঝপাঞে' (চোরের মা যেমন গোপনে কাঁদে আমিও তেমনি মুখে কাঁপড় দিয়া কাঁদিতেছি) 'চিকুরে গরএ জলধারা। জনি মুখসসি ডবে রোঅএ আঁধারা ॥' (কেশকলাপ হইতে জলধারা ঝরিতেছে, যেন মুখশশী-ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে), 'মধুসম বচন, কুলিশ সম মানস প্রথমহি জানি ন ভেলা' (মধুর ন্যায় বচন, বজ্রের ন্যায় কঠোর মন, প্রথমে জানিতাম না), 'দুই মন মেলি সিনেহ অঙ্কুর দোপত তেপত ভেলা। সাখা পল্লব ফুলে বেআপল সৌরভ দহদিস গেলা ॥' (দুইটি মন মিলিত হইলে প্রেমের অঙ্কুরে দ্বিপত্র ত্রিপত্র হইল, শাখাপল্লব ফুলে ব্যাপ্ত হইল, দশ দিকে তাহার সৌরভ গেল), 'হাথিক দসন, পুরুষ বচন কঠিনে বাহার হোএ' (হাতীর দাঁত আর পুরুষের বচন অনেক কষ্টে বাহির হয়), 'বঙ্ক বিলোচন বিকসিত থোরা। চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥' (বঙ্কিম নয়ন ঈষৎ বিকশিত—যেমন চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্র উদ্বেল হয়), 'জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বদন সুচ্ছন্দ। দামচম্পক কাম পূজল জইসে সারদ চন্দ' ॥ (তাহার ভুজযুগ ঘুরাইয়া তাহার মুখ সুন্দর ছাঁচে বেষ্টন করিল, যেন মদন চম্পকদলের দ্বারা শারদ চন্দ্রের পূজা করিল), 'অতি খীন তনু জনু কাঞ্চন রেহা' (তাহার দেহ যেন একটি ক্ষীণ স্বর্ণরেখার ন্যায়), 'মরকত স্থলি সুতলি আছলি বিরহে সে খীন দেহা। নিকস পাসানে যেন পাঁচ বানে কসিল কনক রেহা ॥' (মরকত নির্মিত হর্ম্যতলে সে বিরহক্ষীণ দেহে শুইয়া ছিল, মদন যেন নিকষ-পাষাণে কনকরেখা কষিয়াছে), দুহু দিসে দারুদহনে জৈসে দগধই আকুল

কীটপরাণ' (কাঠের দুই দিকে আগুন জ্বালাইলে যেরূপ তাহার মধ্যে কীটের প্রাণ আকুল হইয়া দগ্ধ হয় সেইরূপ রাধার অবস্থা), 'তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগর লহর সমানা' (তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই লীন হয়, যেমন সমুদ্রতরঙ্গ সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া আবার সমুদ্রেই বিলীন হয) – ইত্যাদি বাক্যাংশে অলঙ্কারের সাহায্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির যে হীরকদ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, সমগ্র পদাবলীসাহিত্যে একমাত্র গোবিন্দদাস কবিরাজকে ছাড়িয়া দিলে অন্য কোথাও ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। ভারতচন্দ্রের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্যবোধক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু সেখানে শুধু আলঙ্কারিক নিপুণতা প্রকাশের জন্যই উপমারূপকের ডাক পড়িয়াছিল। কবিপ্রত্যয়ের গভীর স্তরে তাহার বিশেষ কোন প্রভাব নাই।

শুধু উপমার মতো অলঙ্কারেই নহে, স্বভাবোক্তি ('আওল যৌবন শৈশব গেল। চরণক চপলতা লোচন লেল ॥'), অতিশয়োক্তি ('মালতি সফল জীবন তোর। তোবে বিরহে ভুবন ভমযে ভেল মধুকর ভোর ॥'), দৃষ্টান্ত ('অধর নীরস মঝু করল নি মন্দা। রাহু গরাসি নিসি ভেজল চন্দ্রা ॥'), নিদর্শনা ('অধর সুরঙ্গ জনি নীবস পবার। কোন লুটল তুঅ অমিঅ ভাণ্ডার ॥') ভ্রান্তিমান্ ('কতিহুঁ মহন তনু দহসি হমারি। হম নহ সঙ্কর হু বরনারী ॥') প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত মূল্যবান রত্নমাণিক্যের মতো বিদ্যাপতির পদসমূহে সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্যকে বিচিত্র দিক হইতে উপভোগ করিয়া তাহাকে নানা রূপে রসে বিকশিত করা বিদগ্ধ কবির অন্যতম লক্ষ্য। বিদ্যাপতি প্রধানতঃ রাজসভা-আশ্রয়ী ছিলেন বলিয়া শুধু গ্রামীণ সৌন্দযের সুলভ চিত্রাঙ্কনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, শিল্পী যেমন নানা স্থুল বস্তুপিণ্ড হইতে সূক্ষ্মতর শিল্পের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন, তেমনি বিদ্যাপতির সৌন্দর্যলিপ্সু মন রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনায় নানা চিত্ররূপ সৃষ্টি করিয়াছে এবং সে চিত্রকল্পগুলি প্রধানতঃ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যবোধক অলঙ্কার হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বাস্তবিক কয়েকটি শব্দাশ্রয়ী চিত্র বা প্রতীকের সাহায্যে বিদ্যাপতির সৃষ্টিক্ষম কবিকর্ম বিশেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রাধার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় কৃষ্ণের উক্তি—

সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘমালা সয় তড়িত লতা জনি
হিরদয়ে সেল দই গেল ॥

অনু : সজনি, ভাল করিয়া দেখা হইল না, মেঘমালার সঙ্গে বিদ্যুল্লতা যেন হৃদয়ে শেল দিয়া গেল।

এই চিত্রটিতে বয়ঃসন্ধিতে উপনীত অর্ধ-মুকুলিতা রাধার রহস্যময় সৌন্দর্য ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কিংবা অভিসারের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির বর্ণনা—

রজনী কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরএ দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড অভিসার॥

অনু : রাত্রি কাজল উদ্গীরণ করিতেছে, ভীম সর্প, দুর্বার কুলিশ বর্ষিত হইতেছে। গর্জনে মন ত্রস্ত, মেঘ কুপিত হইয়া জলবর্ষণ করিতেছে—অভিসারে সংশয় পড়িল।

কবি কাজল-উদ্গীরণকারী রাত্রির যে রূপটি দুই-একটি পার্শ্বচিত্রের সাহায্যে (ভুজঙ্গ, কুলিশ) ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার স্তব্ধ শঙ্কাতুর ভীমকান্ত কজ্জলরুচি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর রেখাশিল্পীর ঈর্ষার বস্তু। অথবা কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমমুগ্ধ উক্তি—

হাথক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখিক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হম তুহু জানি॥

অনু : তুমি আমার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের মৃগমদকস্তুরী, গলার হার, দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার, তুমি পাখীর পাখা, মৎস্যের জল, জীবের জীবন, আমি তোমাকে এই রূপেই জানি।

নিজের সঙ্গে কৃষ্ণের সম্বন্ধ নির্ণয়ে পৃথিবীর যেখানে দুই-এর মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতা বা একান্ত নিবিড় আসঙ্গ রহিয়াছে, রাধা তাহার সঙ্গেই কৃষ্ণের তুলনা দিয়াছেন। তবু সব তুলনা উপমা দিয়াও তিনি কৃষ্ণের সহিত ঠিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে না পারিয়া শেষে বলিলেন, 'তুঁহু কইসে মাধব কহ তুঁহু মোয়' (মাধব, তুমি কেমন, তাহা আমায় বল)। এখানেও লক্ষ্য করা যাইবে রাধা বারবার নানা উপমার সাহায্য লইয়াও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। এখানেও কবি নানা প্রতীক রচনা করিয়া তৃপ্তি পাইলেন না, উপমার উপর উপমা সাজাইয়াও খুশি হইলেন না,—সর্বশেষে সব সৌন্দর্য, সব চিত্রের অন্তিম পরিণতি হইল একটি বিস্ময়রসাবিষ্ট প্রশ্নে। মরমী কবি রাধার প্রশ্নটির

উত্তরও দিয়াছেন, 'বিদ্যাপতি কহ তুহু দোহো হোয়' (বিদ্যাপতি বলিতেছেন—দুই জনেই দুই জনের মতো)।

ইহা তো গেল বিদ্যাপতির সৌন্দর্যসৃষ্টির কথা। কিন্তু জীবনের গভীর উপলব্ধির কথা, প্রাণরসতীর্থের ঘাটে ঘাটে অবগাহন করিয়া বোধির অতলে তলাইয়া যাওয়ার অনির্বচনীয় আস্বাদন সমকালে বা তাহার পরবর্তী কালে আর কাহার মধ্যেই-বা এত অজস্র পরিমাণে পাওয়া যাইবে? তাঁহাকে শুধু আদিরসাত্মক পদাবলীর লেখক বলিলে এই গভীর রসের ব্যাখ্যা করা যাইবে না। কৃষ্ণকে হারাইয়া রাধার বিলাপোক্তি—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিস শূন ভেল সগরী॥
কৈসনে যাওব যমুনাক তীর।
কৈসে নেহারব কুঞ্জকুটীর॥

কিংবা সেই ভরা ভাদ্র ও শূন্য গৃহের বেদনা—'ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন মন্দির মোর রে', কিংবা রাধার ভাবসম্মেলনের উল্লসিত বাসনা—

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোএল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

সর্বশেষে রাধার কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন,—সেই প্রেম যাহা 'তিলে তিলে নূতন হোয়',—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবনহি শূনল
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিঅ জুড়ন ন গেল ।।[১]

বিদ্যাপতির এই পদে এমন একটা অপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, অপরিতৃপ্তির ব্যঞ্জনা ও অনুভূতির গহন গভীর ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, স্বয়ং বিদ্যাপতিও ইহার সমতুল্য আর কোন পদ রচনা করেন নাই।

শুধু কাব্যরস ছাড়িয়া দিলেও ভারতচন্দ্রের উজ্জ্বল উক্তির মতো বিদ্যাপতির অনেক উক্তি বাঙলা ও মিথিলায় প্রচলিত আছে। 'সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দহইতে কনক দ্বিগুণ হোঅ মূল॥' 'সুজনক পীরিতি পাষাণক রেহা', 'চৌরী পীরিতি হোঅ লাখগুণরঙ্গ' প্রভৃতি পংক্তিগুলিতে জীবন ও জীবনসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বিশেষ তির্যকতা অবলম্বন করিয়াছে। এই জাতীয় উজ্জ্বল উক্তিগুলির জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছেন, "বিদ্যাপতি সাধারণতঃ

[১] এই পদটি নানা সঙ্কলনে কবিবল্লভের ভণিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'তে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইহা বিদ্যাপতির নহে, কবিবল্লভ নামক অপর কোন কবির রচনা। উপরন্তু ইহাতে কবি যে 'অনুরাগ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণির' 'অনুরাগ' সংজ্ঞার সহিত মিলিয়া যায়। রূপগোস্বামীর 'অনুরাগের' সংজ্ঞা—"যে রাগ বা প্রেম নব নব রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব নব রূপে আস্বাদিত করায় তাহাকেই অনুরাগ বলে।" বিদ্যাপতির 'তিলে তিলে নূতন হোয়' পংক্তির সহিত রূপগোস্বামি প্রদত্ত সংজ্ঞার মিল দেখা যাইতেছে বলিয়া ইহা রূপগোস্বামীর পরে রচিত, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় 'বিদ্যাপতির পদাবলী'তে (৪৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা) নানা প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া সতীশচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। এমন একটা প্রথম শ্রেণীর পদ কবিবল্লভ নামক উত্তরকালের কোন কবির লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে অথচ তাঁহার ভণিতাযুক্ত আর কোন উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায় নাই কেন? ডঃ মজুমদার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: " 'জনম অবধির' ন্যায় কবিতা যিনি লিখিয়াছেন, তাঁহার কলম দিয়া দুই একটির বেশি ভাল কবিতা বাহির হয় নাই এরূপ অনুমান অসঙ্গত বিবেচনায় নূতন কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ইহা বিদ্যাপতির রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম।" কোন এক রসজ্ঞ সমালোচক শুধু সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করিয়া এই পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: "সমস্ত বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া বিদ্যাপতি ছাড়া কোন কবিকে ইহার রচয়িতা বলিয়া কল্পনা করা যায় না" (বাংলা সাহিত্যের কথা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। যাহা হউক আমরা অনুমান করি, বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট স্তরের কবির পক্ষে এইরূপ একটি অনবদ্য পদ রচনা করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক বটে। রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি'র 'অনুরাগ' শব্দ ধরিয়া এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করা যায় না।

চাতুর্যের কবি।"[৩] বিদ্যাপতির পদের কোন কোন স্থলে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কারপ্রীতি কাব্যরসকে ছাড়াইয়া উঠিলেও তাঁহার অসংখ্য পদে, বিশেষতঃ বাঙলা দেশে প্রচলিত পদে সৌন্দর্যের যে শিল্পচেতনা এবং অনুভূতির যে গভীর রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে তাঁহাকে শুধু 'চাতুর্যের কবি' বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ছন্দের অলঙ্কারে শব্দবিন্যাসে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে তাঁহার পদ যেমন হীরকখণ্ডের মতো আলোক বিচ্ছুরণে সহস্রমুখী, তেমনি জীবনের আলো ও আঁধার, বিপুল পুলক ও অশান্ত বেদনা, রূপোল্লাস ও ভাবোন্মাদনা, মিলন ও বিরহ, মাথুর ও ভাব সম্মেলনে তাঁহার পদ অদ্যাপি তুলনারহিত।

॥ ২ ॥

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা ও ব্রজবুলি

মিথিলার অধিবাসী বিদ্যাপতি ঠাকুর কোন্ ভাষায় রাধাকৃষ্ণপদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া এক দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—এই সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা অদ্যাপি সুদূরপরাহত। মধ্যযুগে বাঙালী বৈষ্ণব ও সাধারণ রসিকগণ বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির পদ যে বাংলা নহে, বরং মৈথিলী বা ঐ জাতীয় কোন উপভাষার নিকটবর্তী, তাহা সে যুগের বাঙালীরাও বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই এই ভাষাকে 'ব্রজবুলি' নামে অভিহিত করা হইত। 'ব্রজবুলি' শব্দটি কবে লিখিতভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ আধুনিক যুগের পূর্বে বাঙলা দেশে পুঁথিপত্রের কোথাও ব্রজবুলি শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্য ১৬শ শতাব্দীতে আসামে 'ব্রজবোলী' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে।[৪] সাহিত্যের ঐতিহাসিকের মতে আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্তই 'ব্রজবুলি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।[৫] অথচ মধ্যযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙলা দেশে জনসাধারণের মুখে 'ব্রজবুলি' বহুলভাবে চলিয়া আসিতেছে, এবং বিদ্যাপতির আদর্শে বহু বৈষ্ণবকবি ব্রজবুলিতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়া

৩ শ্রীকালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য

৪ ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বিচিত্র সাহিত্য, ২য়

৫ ঐ—বিদ্যাপতিগোষ্ঠী

বাঙলার বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর ৭ম-৮ম দশকে জন বীম্‌স, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও গ্রীয়ার্সন সাহেব যখন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত উদ্ধার করিলেন, তখনই 'ব্রজবুলি'-সমস্যা জটিলাকার ধারণ করিল।

ইতিপূর্বে বাঙালী পাঠক ও বৈষ্ণবভক্ত মনে করিতেন যে, এই ব্রজবুলি ব্রজের অর্থাৎ মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা। বাংলা, মৈথিলী ও ব্রজমণ্ডলের ভাষা অর্থাৎ মথুরা বৃন্দাবনের দুই-চারিটি শব্দ মিশিয়া গিয়া যে কৃত্রিম বুলি বা dialect-এর সৃষ্টি হয়, ভ্রমক্রমে সে যুগের বাঙালীরা তাহাকে ব্রজের ভাষা অর্থে 'ব্রজবুলি' বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বোধহয় মনে করিতেন যে, এই ব্রজবুলিতেই বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ও সখাসখীগণ কথা বলিতেন। কিন্তু এখন ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়াছে যে, ব্রজের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশের (শৌরসেনী) বংশধর এবং ইহা একটি কথিত ভাষা; মথুরা-বৃন্দাবনের জনসাধারণের ভাষাই ব্রজভাষা বা ঐ অঞ্চলের লোকমুখে 'ব্রজ্ ভাখা' নামে পরিচিত। অপরদিকে বাংলা দেশে ব্রজবুলিতে রচিত যে পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূরবীয়া অপভ্রংশ (মাগধী) হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। 'ব্রজভাষা' জীবন্ত কথিত ভাষা—অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 'ব্রজবুলি' কৃত্রিম ভাষা, বৈষ্ণব পদাবলী বা ঐ জাতীয় সাহিত্য ব্যতীত অন্যত্র ব্যবহৃত হয় নাই; ইহাতে কেহ কখনও কথা বলে নাই।[১] বাঙলা দেশে-প্রাপ্ত বিদ্যাপতি গোবিন্দ-দাস প্রভৃতি কবির ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলির ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা প্রধানতঃ মৈথিলী ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, অবশ্য কিছু কিছু বাংলা শব্দও যুক্ত হইয়াছে। ব্রজবুলিতে মৈথিলী শব্দ বা ব্যাকরণ সর্বত্র মিথিলার ভাষারীতি অনুসরণ করে নাই। তাহা হইলেও ব্রজবুলির মূল কাঠামো যে মৈথিলী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি, প্রধানতঃ মৈথিলীভাষী কবি, মিথিলা ও নেপাল হইতে তাঁহার বিশুদ্ধ মৈথিলী পদ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির পদ ব্রজবুলি নাম ধারণ করিল কেন, মিথিলার কবি যদি এই *Mischsprache* বা মিশ্রভাষায় পদ লিখিয়াই থাকেন, তবে কেন লিখিলেন, অথবা কীর্তনীয়া বা লিপিকরপ্রমাদে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদই বিকৃত হইয়া 'ব্রজবুলি' নাম-ধারণ করিয়াছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

[১] জন বীম্‌স সাহেব ১৮৭৩ সালে *The Indian Antiquary* পত্রে সর্বপ্রথম বিদ্যাপতির ভাষাকে পূরবীয়া হিন্দী ('Extremely Eastern Hindi')

এবং মৈথিলী ('Old Maithili than Bengali') বলিযাছিলেন। পরে ১৮৭৫ সালে তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে বিদ্যাপতির ভাষাকে বাংলা ও হিন্দীর মাঝামাঝি ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন। রাজকৃষ্ণ যখন প্রমাণসহযোগে দেখাইলেন যে, বিদ্যাপতি বাঙালী নহেন, মৈথিলী,—তখন তথ্যজিজ্ঞাসুর মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, তাহা হইলে বিদ্যাপতি কি বিশুদ্ধ মাতৃভাষা অর্থাৎ মৈথিলী ভাষার পদ রচনা করিযাছিলেন? বাঙলা দেশের পদসঙ্কলনগ্রন্থে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কি খাঁটি মৈথিলী ভাষার উদাহরণ আছে? গ্রীয়ার্সন সাহেব দীর্ঘকাল উত্তর-বিহার ঘুরিয়া বিদ্যাপতি রচিত ৮২টি পদ সংগ্রহ করেন। তাহার কিছু কিছু পদ বাঙলার সঙ্কলনেও মিলিতেছে। কিন্তু উহার ভাষার সহিত বাঙলায প্রচলিত বিদ্যাপতির পদের বেশ পার্থক্য আছে। ব্রজবুলি পদগুলি বাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য নহে, কিন্তু গ্রীয়ার্সন-সংগৃহীত পদের অনেকটাই বাঙালীর অপরিচিত। গ্রীয়ার্সন তাঁহার *An Introduction to the Maithili Language of North Bihar Containing A Grammar, Chrestomathy and Vocabulary* (Vol. II) গ্রন্থে এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিযাছিলেন। তাহার মতে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষাতেই পদ রচনা করেন, কিন্তু বাঙালী মৈথিলী ভাষা বুঝিতে পারিত না বলিয়া উহাতে কিছু কিছু বাংলা শব্দের ভেজাল দিয়া, কখনও বা মৈথিলী শব্দপ্রকরণকে বদলাইয়া বিদ্যাপতিকে কিছুটা বাঙালী করিয়া লইযাছে। বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ মৈথিলী পদ বাঙালীর হাতে পড়িয়া এবং বাংলা ভাষার প্রভাবে বেশ খানিকটা রূপান্তরিত হইয়া গেল। এই নূতন কৃত্রিম ভাষার নাম দেওয়া হইল 'ব্রজবুলি'। তাঁহার উক্তিটি উদ্ধৃত হইল, "To a Bengali, Bidyapati wrote in a different and strange, though cognate language, and his words were hard "to be understanded of the people", so first a few of his hymns were twisted and contorted, lengthened out and curtailed, in the procrustean bed of the Bengali language and metre, into a kind of bastard language neither Bengali nor Maithili.' পরবর্তী কালে যাঁহারা মৈথিলী বা ব্রজবুলি লইয়া গবেষণা করিযাছেন বা বিদ্যাপতির পদের ভাষা লইয়া আলোচনা করিযাছে, তাঁহারা ইহার অধিক তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই।

বাঙলা দেশে এইভাবে ব্রজবুলির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব :—খ্রীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলা দেশ মুসলমানের কবলীভূত হইলে স্থানীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতি, বিশেষতঃ সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা কিছুকালের জন্য ব্যাহত হইয়াছিল। তখনও মিথিলার বিদ্যাসমাজ তুর্কীর আক্রমণে নষ্ট হইয়া যায় নাই। ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক (১৩২৪ খ্রীঃ) হইতে মিথিলায় দিল্লীর সুলতানের প্রভাব আরম্ভ হয়। সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক মিথিলার কর্ণাটবংশীয় রাজা হরিসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া ত্রিহুতকে দিল্লীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পরে কয়েকবার মুসলমান অভিযান মিথিলার সমাজ-জীবনকে কিয়ৎপরিমাণে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। তথাপি মিথিলার বিদ্যা-সমাজ ও সংস্কৃতচর্চার চরম ক্ষতি হয় নাই। মঠমন্দিরাদি ধ্বংস, বিদ্যাকেন্দ্রের বিচূর্ণীকরণ, পণ্ডিতসজ্জনের বিনাশ—তুর্কীগণ বিজিতের প্রতি যে নীতি প্রয়োগ করিতেন, মিথিলায় সেরূপ কোন ব্যাপক বিনাশের চেষ্টা হয় নাই। ফলে মুসলমান আক্রমণ চলিলেও মিথিলার বিদ্যাসমাজ নিরুদ্বেগে সংস্কৃত ন্যায়মীমাংসার চর্চা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। বাঙলা দেশে কিন্তু পাঠান আক্রমণের প্রথম দিকে সংস্কৃতির এই দিকটায় বিশেষ আঘাত লাগে; ১৩শ-১৪শ শতাব্দী ধরিয়াই সেই চণ্ড শাসন চলিয়াছিল। এই কারণে বাঙলা দেশ হইতে বহু ছাত্র মিথিলায় ন্যায়-মীমাংসা-স্মৃতি পড়িতে যাইত। শুধু বাঙলা দেশ নহে, আসাম ও উড়িষ্যা হইতেও এইরূপে ছাত্রগণ সংস্কৃত বিদ্যালাভ করিবার জন্য মিথিলায় যাতায়াত করিত। তখনও বাঙলার সীমা ইংরাজ আমলের মতো সঙ্কুচিত হয় নাই। কাজেই মিথিলার সহিত বাঙলার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দী হইতেই মিথিলায় মৈথিলী ভাষার বিশেষ সম্মান ছিল, মিথিলার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাঙালীর মতো মাতৃভাষাকে 'দেশভাষা' বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতেন না। বিদ্যাপতির সমসাময়িক মিথিলার পণ্ডিত ও কবিগণ মৈথিলী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। জয়দেবের ভাবাদর্শে এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদিরসাত্মক কবিতার রূপাদর্শে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবৎকালেই এই পদগুলি সমগ্র পূর্বভারতে—বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যায় সুপ্রচারিত হইয়াছিল। মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী ছাত্রগণ বিদ্যাপতির অপূর্ব পদগুলি বাঙলা দেশে আনিতেন। আসাম ও উড়িষ্যা সম্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। বিদ্যাপতির আবির্ভাবের দুই শতাব্দী পূর্ব হইতেই বাঙলার জয়দেবের কান্তকোমল পদাবলী শুধু পূর্ব-ভারতেই

নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ে ভক্তিরসার্দ্র ও আদিরসাত্মক সংস্কৃত কাব্য ও প্রকীর্ণ শ্লোক এই অঞ্চলে অজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই বিদ্যাপতির পদ এত দ্রুত পূর্ব ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী ছাত্রগণ মৈথিলী ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির পদগুলি এ দেশে লইয়া আসিলেও লোকমুখে প্রচারিত হইবার ফলে উক্ত পদের মূল মৈথিলী ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে আরম্ভ করে, অনেক মৈথিলী শব্দ বাঙালী বুঝিতে পারিত না, কোন কোন মৈথিলী শব্দ তাহার নিকট কিছু কর্কশ মনে হইত। কালের ব্যবধানে বিদ্যাপতির মৈথিলী গান বাঙলায় আসিয়া বাঙালী গায়ক ও পাঠকের প্রভাবে কিছু কিছু বাংলা শব্দ গ্রহণ করিল, অজ্ঞতার জন্য মৈথিলী ব্যাকরণের নিয়মাবলীতেও শিথিলতা আসিয়া পড়িল এবং ইহাতে বাংলা বাকরীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। পরবর্তী কালে বঙ্গীয় গোস্বামিসম্প্রদায়ের প্রভাবে এই কৃত্রিম ভাষা (অর্থাৎ মৈথিলী ও বাংলার সংমিশ্রণ) বৈষ্ণব পদসাহিত্যে বিপুলভাবে অনুশীলিত হইয়াছিল। ইহাই 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত। এ-কথা অবশ্য স্বীকার—বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষাতেই যাবতীয় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, দুই-একটি পদ অবহট্টেও রচিত।[৬] বিদ্যাপতির পদাবলী পূর্ব-ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে আঞ্চলিক রূপ লাভ করে। আসাম, উড়িষ্যা ও বাঙলা দেশে এই ব্রজবুলির বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। বাঙলায় যেমন ইহা 'ব্রজবুলি' নামে পরিচিত হইয়াছিল, তেমনি ১৬শ শতাব্দী হইতে

[৬] ভাষাতাত্ত্বিকের মতে ব্রজবুলির উৎস মৈথিলী নহে, অবহট্ট ভাষা। মৈথিলী প্রাদেশিক কথিত ভাষা, অবহট্ট সমগ্র উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সাহিত্যিক অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষা। পরবর্তী কালে এই অবহট্টের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়া বিভিন্ন প্রদেশে 'ব্রজবুলি' নামক একটি কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হয়। ইহার বিকাশ দেখা যায় নেপাল, ত্রিহুত ও মোরঙ্গের রাজসভায়। ১৪শ শতাব্দীর উমাপতি উপাধ্যায় নামক এক মৈথিলী কবির 'পারিজাত হরণ' শীর্ষক একখানি গীতিনাট্যে সর্বপ্রথম ব্রজবুলির অনুরূপ পদ পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, বাঙলা দেশের ব্রজবুলি বাঙলা দেশে সৃষ্ট নহে, মিথিলা তথা পূর্ব হইতে অবহট্ট ও মৈথিলী-মিশ্রিত ব্রজবুলি ধরনের একপ্রকার কৃত্রিম কবিভাষা প্রচলিত ছিল, যাহা বাঙলা, আসাম ও উড়িষ্যাতে সেই অঞ্চলের ভাষার সামান্য মিশ্রণসহ ব্রজবুলি সৃষ্টি করে। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন-প্রণীত 'বিচিত্র সাহিত্য', (২য়)—দ্রষ্টব্য।

আসামেও ইহা 'ব্রজবোলি' নামে আখ্যাত হইত। প্রধানতঃ মৈথিলী শব্দের সহিত বাংলা, আসামী, উড়িয়া ও নেপালী শব্দের মিশ্রণে ব্রজবুলির কলেবর গড়িয়া উঠে। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদাবলী কেমন করিয়া ব্রজবুলির আকার লাভ করিল, তাহা জানা যাইবে নেপাল ও মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদসঙ্কলনগুলির সহিত বাংলা পদসঙ্কলনে-ধৃত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের তুলনা করিলে। ′বাঙলা দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কয়েকটি পদ (মোট ১৬টি) নেপাল ও মিথিলার পুঁথি এবং গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহেও পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙলা, মিথিলা ও নেপালের পদের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকিলেও ভাষাগত পার্থক্য আছে। তাহার কারণ মিথিলা ও নেপালে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদের বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙলা দেশে বাংলা ভাষার প্রভাবে সেই পদগুলিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তিত ভাষাকেই 'ব্রজবুলি' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, মূল পদগুলি বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন; পরে বাঙলা দেশে আনীত এই পদে বাঙলীর প্রভাবে কিছু কিছু ভাষা ও ব্যাকরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। বিদ্যাপতির পদে রূপান্তরিত ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলি কবির তিরোধানের অল্প পরেই বাঙলা দেশের বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে এবং বৈষ্ণব মহাজন ও রসিকের নিকট দ্বিতীয় মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়।/

এ প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, কী ভাবে বা কেমন করিয়া, কত দিন ধরিয়া পরিবর্তনের ফলে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষা ব্রজবুলির আকার লাভ করিয়াছে এবং এই পরিবর্তন বরাবর চলিয়াছিল অথবা মাঝখানে একটা স্থায়িরূপ লাভ করিয়া থামিয়া গিয়াছিল। উড়িষ্যা ও আসামেও অল্প পরিমাণে ব্রজবুলির প্রচার হইয়াছিল। আসামে শঙ্করদেব বিদ্যাপতির অনুকরণে আসামী ব্রজবুলির প্রচলন করেন। অবশ্য আসামী ব্রজবুলি প্রায় বাঙলার অনুরূপ; কারণ মধ্যযুগে আসামী ভাষার পৃথক কোন সত্তা ছিল না, তাহা বাঙলারই উপভাষা বলিয়া গণ্য হইত।′ আসামী ব্রজবুলিতে রাধার কথা নাই, তাঁহারা এই ভাষায় দাস্যভাবের পদই অধিক রচনা করিয়াছিলেন। আসামী ব্রজবুলিতে-রচিত পদকে 'বরগীত' (দেবলীলা) বলা হইত। নাটকের মধ্যেও এইরূপ অর্ধ-মৈথিলী অর্ধ-আসামী গীত ব্যবহৃত হইত। তাহাকে বলা হইত 'অংকের গীত'। এ পর্যন্ত আসাম হইতে মোট ২০৭টি 'বরগীত' বা আসামী-মৈথিলী ভাষায় রচিত

পদ পাওয়া গিয়াছে। শঙ্করদেব, মাধবদেব, রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর, পুরুষোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি আসামী কবিগণ ব্রজবুলিতে অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যাতেও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক রায় রামানন্দ-রচিত ব্রজবুলির পদ পাওয়া গিয়াছে। চম্পতিরায় নামক এক ওড়িয়া কবি বিদ্যাপতির অনুকরণে এমন নিপুণভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনেক পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। মাধবী দাসী, কানুদাস, মুরারি রামদামোদর, চন্দকবি, যদুপতিদাস প্রভৃতি ওড়িয়া কবিগণ বিদ্যাপতির ভাবাদর্শ অনুসরণে ওড়িয়া ব্রজবুলিতে অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। অনুমান বাঙলা দেশ হইতে এই নূতন শিল্পরীতির তরঙ্গ উড়িষ্যাতেও পঁহুছিয়াছিল। বাঙলা দেশের প্রাচীনতম ব্রজবুলির পদ হইল 'রসমঞ্জরী'-তে উল্লিখিত যশোরাজখানের একটি পদ। এই পদে হুসেনশাহের নাম উল্লিখিত হইযাছে, সুতরাং ইহা হুসেনশাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ ১৫১৯ খ্রীঃ অঃ) রচিত হইযাছিল বলিয়া অনুমিত হয়।[৭]

বাঙলা দেশেব যে সমস্ত ছাত্র ন্যায়চর্চার জন্য মিথিলায় যাইত তাহারাই বিদ্যাপতির পদ কণ্ঠে লইযা আসিত। কালক্রমে বিদ্যাপতির মৈথিলী পদে বাংলা শব্দ প্রবেশ করে, এবং এইরূপে ব্রজবুলির উদ্ভব হয়—এই মতটি এখন একপ্রকাব স্বীকৃত হইযাছে।[৮] অবশ্য ব্রজবুলি উৎপত্তির অন্য কাবণও অনুমিত হইতে পাবে। চৈতন্যপ্রভাবে বাঙলা দেশে যে কীর্তনীযাসম্প্রদায় বৈষ্ণব মহাজনের পদ সংগ্রহ করিতেন, তাঁহারা যে বাঙালী শ্রোতাব বোধসৌকর্যের জন্য বিদ্যাপতির মৈথিলী পদকে খানিকটা ভাঙিযা চুরিযা বাংলা করিযা লন নাই, তাই-বা কে বলিতে পারে? পদসংগ্রাহকগণ সাধারণতঃ কীর্তনীযাদের নিকট হইতেই পদ সংগ্রহ কবিযা সঙ্কলনগ্রন্থে রক্ষা কবিতেন। কীর্তনীয়াদেব দ্বারা গীত পদগুলি শ্রোতৃসমাজে সুপবিচিত ছিল। আমাদের অনুমান কেবলমাত্র মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী ছাত্রের দ্বারা মৈথিলী ভাষায় ব্রজবুলির মতো এতবড়

[৭] হুসেন সাহের কর্মচারী যশোরাজখান বোধহয় কোন কৃষ্ণায়ণ ধরনের কাব্য লিখিয়া ছিলেন। পীতাম্বরদাসের সঙ্কলনগ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'তে ইহা হইতে একটি পযার এবং একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই পদের কিয়দংশ—

এক পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজেই গোর।
হিমধরাধর কনকভূধর কোরে মিলল জোর॥

[৮] অবশ্য ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই মত স্বীকার করেন না। তাঁহার মতামতের জন্য 'বিচিত্র সাহিত্য', ২য় দ্রষ্টব্য।

একটা পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতির পদ প্রধানতঃ কীর্তনীয়াদের মারফতে বাঙালীর শ্রুতিগোচর হইয়াছে। পদসঙ্কলন গ্রন্থগুলি ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে সঙ্কলিত হয় নাই, তাহারও অন্ততঃ দুই শত-আড়াই শত বৎসর পূর্ব হইতেই বিদ্যাপতির পদ বাঙলা দেশের বৈষ্ণবসমাজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। যখন উক্ত পদগুলি পদসঙ্কলনে ঠাঁই পায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের ব্রজবুলিতে রূপান্তর হইয়া গিয়াছিল।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিদ্যাপতির পদ বাঙালী ছাত্র ও কীর্তনীয়াদের দ্বারা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার পর দুই তিন শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজ সেই বিকৃতির সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। বরং বিদ্যাপতির মতো বহুভাষাবিদ্ কবি নিজেই ইচ্ছা করিয়া মৈথিলী ও বাংলা মিশাইয়া মধুরতর ব্রজবুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এইরূপ অনুমান অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, অবহট্টে দুইখানি গ্রন্থ এবং কিছু পদ লিখিয়াছিলেন, তিনি যে ব্রজবুলির মতো একটা শ্রুতিমধুর কোমল মিশ্র ভাষা সৃষ্টি করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্কটলণ্ডের কবি উইলিয়ম বার্ণস স্কচ্ ও ইংরাজী ভাষা মিশাইয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ভারতচন্দ্র বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত মিশাইয়া 'চণ্ডী নাটক' লিখিয়াছিলেন, কবি ঈশর গুপ্ত তাঁহার 'বোধেন্দুবিকাশে' বাংলা হিন্দী মিশাইয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রও অনুরূপ মিশ্র ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে হিন্দী ও বাংলা মিশাইয়া কৌতুকজনক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন (শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিদ্যাপতিও যে অনুরূপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া স্বয়ং ব্রজবুলি উদ্ভাবন করেন নাই, তাই-বা কে বলিল?*

এই মতের বিরুদ্ধে একটা প্রবল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে। বিদ্যাপতি যে ব্রজবুলির স্রষ্টা নহেন—তাহার বড় প্রমাণ, তাঁহার একই পদ মিথিলা-নেপালে মৈথিলী ভাষায় এবং বাঙলা দেশে ব্রজবুলির আকারে পাওয়া গিয়াছে। আমরা পূর্বে ব্রজবুলিতে রচিত বিদ্যাপতির যে ১৬টি পদের কথা বলিয়াছি, তাহা খাঁটি ব্রজবুলিতে রচিত। এইগুলি আবার 'রাগতরঙ্গিণী', রামভদ্রপুরের

* খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত 'বৈষ্ণব রসসাহিত্য' এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুঁথি, নেপালের পুঁথি, মিথিলায়-প্রাপ্ত তালপত্রের পুঁথি, এবং গ্রীয়ার্সনের সংগৃহীত *Chrestomathy*-তে সম্পূর্ণরূপে মৈথিলী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাপতি একই পদ মিথিলাবাসীর জন্য মৈথিলী ভাষায় এবং বাঙালীর জন্য ব্রজবুলিতে লিখিয়াছিলেন—এ অনুমান নিতান্তই হাস্যকর। বরং ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, মিথিলায়-প্রচলিত মৈথিলী পদগুলি বাঙলা দেশে আসিয়া ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়।

এই ব্রজবুলি কি বাঙালীর সৃষ্টি? ১৬শ শতাব্দীতে আসামেও এই শব্দটি অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই ব্রজবুলি বাঙালীর একচেটিয়া সৃষ্টি, তাহা মনে হয় না। বিদ্যাপতির মৈথিলী পদগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া সেই আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্রজবুলি নাম ধারণ করে। আসাম ও উড়িষ্যায় ব্রজবুলিতে মৈথিলী শব্দের সহিত আসামী ও ওড়িয়া শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিযাছিল। কাজেই ব্রজবুলি বলিতে শুধু বাংলা ব্রজবুলিকে নির্দেশ করিলে চলিবে না, অন্যান্য প্রদেশেও ইহার উদ্ভব হইয়াছিল।

সম্প্রতি গবেষকগণ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, নেপাল-মোরঙ্গে বিদ্যাপতির পদের প্রথম রূপান্তর হইতে আরম্ভ হয়। উমাপতির 'পারিজাতহরণ' নাটকের গানগুলিতে ব্রজবুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায। উমাপতি বিদ্যাপতির কিছু পূর্ববর্তী নাট্যকার। মিথিলা ও নেপালে-প্রাপ্ত পদসংগ্রহে বিদ্যাপতির পদের সহিত আর যে-সমস্ত কবির পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাব কোন কোনটিতে মৈথিলী অপেক্ষা যেন ব্রজবুলিরই অধিকতর প্রাধান্য দেখা যায। নেপালে-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পুঁথিতে যে কয়জন কবির পদ আছে, তন্মধ্যে সিবিধরেব একটি পদে ('কা লাগি সিনেহ বঢাওলি সখি অহনিসি জাগি') ব্রজবুলিব ছায়া দেখা যায়। 'রাগতরঙ্গিণী'তেও কংসনাবায়ণ ভণিতাযুক্ত একটি পদে ('তনুসুকুমাব পযোধর গোরা। কনকলতা জনি সিরিফল জোরা॥ দেখলি কমলমুখি বরণই জাই। মন মোর হরলক মদন জগাই॥') বাঙলার ব্রজবুলিরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রজবুলিকে বাঙালীর 'কারচুপি' বলিযা বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাঙলা দেশের পদগুলির প্রামাণিকতা এক কথায় উড়াইযা দেওয়া যায় না।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুমান করিয়াছিলেন যে, বাঙলায়-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদ মূলতঃ মৈথিলীতে রচিত। কিন্তু সমস্ত পদ মিথিলায় পাওয়া যায় নাই বলিয়া উহাদের মৈথিলী আকার বুঝা যাইতেছে না। নগেন্দ্রনাথ

অতি-উৎসাহবশতঃ বাঙলা দেশে ব্রজবুলিতে-রচিত বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে মৈথিলীতে রূপান্তরিত করিয়া বিশুদ্ধ রূপ দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত এই রূপান্তর বাঙালী পাঠকসমাজ গ্রহণ করে নাই। বহুস্থলে এই পরিবর্তন হাস্যকর হইয়াছে। বাঙলা দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদগুলির পৃথক মহিমা আছে। বিশুদ্ধ মৈথিলী পদেব ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলেও বৈষ্ণবসমাজ ও রসিক পাঠকসম্প্রদায় এখন কেবলমাত্র মিথিলায়-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির মৈথিলী পদে সন্তুষ্ট থাকিবেন কিনা সন্দেহ। ব্রজবুলি পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, গ্রীয়ার্সন এই পদাবলীকারকে 'pseudo Bidyapati' বলিয়া যতই তুচ্ছ করুন না কেন, বাঙালীর ভাবজীবনেব সহিত বিদ্যাপতির এই ব্রজবুলিগুলির গভীর সম্পর্ক। 'খাঁটি মৈথিলী পদ লইয়া মৈথিলী পণ্ডিত এবং হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। কিন্তু বাঙালী পাঠক ব্রজবুলির বিদ্যাপতিকেই ঘরের মানুষ করিয়া লইয়াছে।, আসল বিদ্যাপতিতে তাহারই-বা কী প্রয়োজন, আর বাংলা সাহিত্যের সহিতই-বা তাহার কতটুকু যোগাযোগ ?'

॥ ৩ ॥

বিদ্যাপতির ধর্ম

বিদ্যাপতির ধর্মবিশ্বাস লইয়া নানারূপ জল্পনাকল্পনা চলিয়াছে এবং এ বিষয়ে বিষম মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শৈব অথবা বৈষ্ণব—ইহা লইয়াই যত কিছু সমস্যা। অবশ্য কবির ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ও কাব্যের মধ্যে সব সময়ে অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। কারণ কবি যখন সামাজিক মানুষ, তখন তাঁহার গোষ্ঠীগত ধর্মবিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু যখন তিনি কবিচেতনার উচ্চ চূড়া অবলম্বন করেন তখন গোষ্ঠীগত ধর্মবিশ্বাস প্রায়ই লুপ্ত হইয়া যায়। কবির যদি কোন ধর্ম থাকে, তবে তাহা কবির একান্ত ব্যক্তিগত আত্মিক ধর্ম। যেমন আধুনিক কালেব মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদন ধর্মমতে খ্রীষ্টান ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; অথচ তাঁহারা হিন্দুর পৌরাণিক ধর্মসংস্কারকে আদৌ বিসর্জন দেন নাই। বিদ্যাপতির ধর্মবিচার-প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

বাঙলার গোস্বামিসমাজে বিদ্যাপতি অন্যতম ধর্মগুরুরূপে পূজিত; রাধা-

কৃষ্ণের পরম ভক্ত বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগ এবং আধুনিক কালের বাঙালী সমাজ বৈষ্ণব বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যত পদ পাওয়া গিযাছে, তাহাতে তাঁহাকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী বলিলে অন্যায় হয না। সহজিয়াবা তাঁহাকে 'নবরসিকে'র অন্যতম বলিযাই প্রচার কবিয়াছেন এবং রাণী লছিমাদেবীকে কবির সাধনসঙ্গিনী বানাইযাছেন। চণ্ডীদাসের সহিত বিদ্যাপতির দেখাসাক্ষাৎ এবং সাধনতত্ত্ব লইযা আলোচনাসংক্রান্ত যে-সমস্ত পদ বাঙলা দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহাকে সহজিয়া মতেব পথিক বলিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এমন কি বিদ্যাপতিব ভণিতাযুক্ত সহজিয়া ধবনের কিছু কিছু বাগাত্মিকা পদও পাওয়া গিয়াছে।

বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায এবং গ্রীযার্সন কর্তৃক ১৯শ শতাব্দীব শেষভাগে বিদ্যাপতিব জীবন ও কবিত্ব-সম্পর্কে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে বাঙালীব বিদ্যাপতিসংক্রান্ত চিবাচবিত সংস্কাবে আঘাত লাগিল। এত দিন ধরিয়া আমরা বিদ্যাপতিকে পবম ভাগবত, বৈষ্ণবচূডামণি, বাধাকৃষ্ণপদাবলীব ব্যাস, কখনও বা সহজিযা মতেব নববসিকেব অন্যতম বলিযা গ্রহণ কবিযা আত্মপ্রসাদ লাভ কবিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু নূতন তথ্যাদিব আলোকে বিদ্যাপতির অজ্ঞাতপূর্ব স্বরূপ আমাদেব নিকট রূঢভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতিব পদেব নূতন সঙ্কলন প্রকাশ করিবাব সময মিথিলা হইতে অনেক নূতন পদ সংগ্রহ কবেন, বিদ্যাপতিব পদযুক্ত মৈথিলী সঙ্কলনও আবিষ্কাব কবেন এবং বাধ্য হইয়াই বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মন্তব্য কবেন: "বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পবম ভক্ত শৈব ছিলেন।" মহামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ শাস্ত্রী অবহট্ট ভাষায় রচিত বিদ্যাপতিব 'কীর্তিলতা' সম্পাদনা-কালে আবও তথ্য উদ্ধাব কবিযা বিদ্যাপতিকে পঞ্চোপাসক হিন্দু বলিযা প্রচাব কবেন,—"বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিযা ছিলেন না, তিনি মিথিলা, বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষেব অন্যান্য দেশেব ব্রাহ্মণের ন্যায স্মার্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতিব ব্যবস্থা মানিযা চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য, শিব বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতাব উপাসনা করিতেন। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধাব প্রেমের অনেক পদ লিখিয়াছিলেন, তেমনি শিবগঙ্গার বিষযেও অনেক পদ লিখিযা গিযাছেন।"

বাঙালীদের আবিষ্কৃত তথ্যাদি অবলম্বনে মিথিলাবাসীরা এবং হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিদ্যাপতিকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিযা প্রচার করিতেছেন, এবং বিদ্যাপতি যে কদাপি বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা প্রমাণের জন্য বিশেষ প্রয়াস

করিতেছেন। রামবৃক্ষ বেণীপুরী বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করিতেন গিয়া কবির ধর্মমত সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "ইনকে পিতা শৈব থে। শিব কী উপাসনা কে বাদ হী উন্হোঁনে যহ পুত্ররত্ন প্রাপ্ত কিয়া থা। ঐসী অবস্থামেঁ ইনকা শৈব হোনা বহুত সম্ভব হৈ।" অর্থাৎ ইঁহার পিতা শৈব ছিলেন। শিবের উপাসনা করিবার পর তিনি এই পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ইঁহার শৈব হওয়াই অধিকতর সম্ভাবনা। মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র 'বিদ্যাপতি ঠাকুর' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মিথিলায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—তিন ধর্মমতই প্রচলিত, তবে শৈবমতের অধিকতর প্রাধান্য। মিথিলায় এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে দুই-একটি শিবমন্দির নাই। তথাপি এই দেশে অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতের প্রসারের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম লইয়া পরস্পরের মধ্যে কোন বিদ্বেষ ছিল না। বিদ্যাপতিও ঐরূপ ধর্মমতসহিষ্ণু মিথিলায় আবির্ভূত হইয়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব—ত্রিবিধ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—'বিদ্যাপতি নে ভী ঔরোঁ কী তরহ ইসে অনুকরণ কিয়া থা" (বিদ্যাপতি এ বিষয়ে ঐ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন)।

হরপ্রসাদের 'কীর্তিলতা' প্রকাশিত হইবার পর পণ্ডিত রমানাথ ঝাঁ 'কীর্তিলতা'র আর-একটি হিন্দী সংস্করণ সম্পাদনা করেন। তিনি উহার ভূমিকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলীগুলি নিছক শৃঙ্গাররসের আদর্শে রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মমতে তিনি ছিলেন শৈব। ঝাঁ মহাশয়ের সিদ্ধান্তের অনুকূলে কয়েকটি স্পষ্ট যুক্তি আছে। যথা—

১। মিথিলায় বিদ্যাপতির শিবদুর্গা গানেরই অধিক প্রচলন। রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নাই।

২। ঐ রাধাকৃষ্ণপদাবলী মিথিলাবাসীরা ভক্তির গান বা ভজন গান হিসাবে ব্যবহার করে না, বরং তাহারা তুলসীদাস ও সুরদাসের ভজনগীতিকাই গান করিয়া থাকে।

৩। উক্ত রাধাকৃষ্ণপদাবলী দুই-চারিটি বৈষ্ণব সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও আপামর জনসাধারণের মধ্যে তাহার বিশেষ জনপ্রিয়তা নাই।

৪। তথাকথিত শৃঙ্গাররসাত্মক পদাবলীর অধিকাংশেই রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই ; কৃষ্ণের যাহাও-বা আছে, অধিকাংশ স্থলে তাহার দ্বারা কৃষ্ণবর্ণের শিবসিংহ-কেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

৫। তাঁহার নিজহস্তে ভাগবত নকলের ঘটনায়ও তাঁহার বৈষ্ণবমতের অনুকূলতা প্রমাণ হয় না। তিনি শৃঙ্গাররসের প্রচুর পদাবলী লিখিয়াছিলেন এবং শিবসিংহের মৃত্যুর পর দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। তাই বোধহয় অনুতপ্ত চিত্তে প্রায়শ্চিত্তের জন্য (শৃঙ্গাররসের কবিতা লিখিবার অপরাধে?) তিনি ভাগবত নকল করিয়াছিলেন।

রমানাথ ঝাঁর এই মতামত আমরা যথাস্থানে বিচার করিব। হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিক ('হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস') রামচন্দ্র শুক্লও অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন, "বিদ্যাপতি শৈব থে। উন্হোঁনে ইন পদোঁ কী রচনা শৃঙ্গার কাব্যকী দৃষ্টিসে কী হৈ, ভক্তকে রূপমেঁ নহীঁ। বিদ্যাপতিকো কৃষ্ণভক্তো কী পরম্পরামেঁ ন সমঝনা চাহিয়ে" (বিদ্যাপতি শৈব ছিলেন। শৃঙ্গারকাব্যের দৃষ্টিরশেই উনি ঐ পদ রচনা করিয়াছিলেন, ভক্তের রূপে নয়। বিদ্যাপতি কৃষ্ণভক্তের অন্তর্ভুক্ত নহেন, তাহা বুঝিতে হইবে।)।

উপরে আমরা বাঙালী ও অবাঙালী সমালোচক ও ঐতিহাসিকের মত উল্লেখ করিলাম। এখন মূল প্রশ্নটি বিচার করিয়া দেখা যাক।

বিদ্যাপতি মৈথিলী ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হওয়ার পর এমন কতকগুলি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহাকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিতেই হইবে। পরোক্ষ প্রমাণের মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

মিথিলাবাসীরা কবি বিদ্যাপতিকে শৈব বলিয়াই জানে, বাঙলা দেশের বাহিরে তিনি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, শৈব বংশেই তাঁহার জন্ম। তাহার পূর্বপুরুষদের নামগুলিও শৈব ধর্মের অনুকূল। যথা—গণপতি, চণ্ডেশ্বর, বীরেশ্বর ইত্যাদি। বিদ্যাপতি নাকি স্বগ্রামে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বিসপীর উত্তরে ভেডরা গ্রামে বাণেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে কবি উপাসনা করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। বাজিতপুরে তাঁহার মৃত্যু হইলে সেখানে তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সে মন্দির এখনও আছে। তিনি মিথিলায় যে রাজবংশের ছত্র-ছায়াতলে বাস করিতেন, সেই বংশ—বিশেষতঃ রাজা শিবসিংহ শৈবমতাবলম্বী ছিলেন। এইগুলি বিদ্যাপতিকে শৈব প্রমাণের পরোক্ষ উপাদান।

প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলির যৌক্তিকতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

১। মিথিলার সর্বত্র যে গান সুপ্রচলিত, বিদ্যাপতি মিথিলায় যে জন্য অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তার দ্বারা নন্দিত, তাহা হইতেছে তাঁহার হরগৌরী-বিষয়ক পদাবলী। এই শৈব পদগুলি বাঙলা দেশে আদৌ প্রচলিত না থাকিলেও মিথিলায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ অপেক্ষা এই শৈব পদগুলির জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব সমধিক। শৈব পদগুলির জন্যই বিদ্যাপতি স্বদেশে শৈবধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত। বাঙালী তাঁহাকে বৈষ্ণব বানাইতে চাহিলেও ইতিহাসের নির্দেশ, কবির স্বদেশবাসীদের মত এবং মিথিলার তথ্যাদিকে অধিকতর মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

২। বিদ্যাপতি কোন কোন পদে হরিহরের একাত্মতা প্রচার করিয়াছেন, কোথাও বা শিবকেই অধিকতর গৌরব দিয়াছেন। একটি পদে কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

ঈস চাঁদ গজ হরিকমলা ন
সবে পরিহরি হমে দেবা।
ভগতবছল প্রভু বান মহেসর
ই জানি কইলি তুঅ সেবা॥ (৭৭০)

অনু: ইন্দ্রচন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ, কমলাসন হরি, সকল দেবতাকেই আমি পরিহার করিয়াছি। বাণ মহেশ্বর ভক্তবৎসল প্রভু, এই জানিয়া তোমার সেবা করিয়াছি।

আবার কোন কোন পদে তিনি হরিহরকে সমান গৌরব দান করিয়াছেন, "গরুড়বাহন দেব নারায়ণ" এবং "বসহ-চঢ় মহেশ" (গরুড়বাহন নারায়ণ এবং বৃষে-চড়া মহাদেব)—উভয়কেই অসাম্প্রদায়িক ভক্তির দ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া বলিয়াছেন—

ভল হর ভল হরি ভল তুঅ কলা। খন পিত বসন খনাহ বঘছলা॥
খন পঞ্চানন খন ভুজচারি। খন সঙ্কর খন দেবা মুরারি॥
খন গোকুল ভএ চড়াইঅ গায়। খন ভিখি মাঁগিএ ডমরু বজায়॥

* * *

এক সরীর লেল দুই বাস। খন বৈকুণ্ঠ খনহি কৈলাস॥
ভণই বিদ্যাপতি বিপরিত বানি। ও নারায়ন ও সুলপানি॥

অনু: হর ভাল, হরি ভাল, তোমার লীলা ভাল। ক্ষণে পীতবসন, ক্ষণে বাঘছাল, কখনও পঞ্চানন, কখনও শঙ্কর, কখনও দেব মুরারি। একই দেহ, দুই বাসস্থান লইয়াছে, ক্ষণে বৈকুণ্ঠ ক্ষণে কৈলাস। বিদ্যাপতি এই অশ্রুত কথা বলিতেছে—যে নারায়ণ, সেই শূলপাণি।

এতদ্ব্যতীত অনেক পদে শিবকে আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিয়া

অধমকবি যমদ্বার হইতে মুক্তির জন্য অনুতপ্তচিত্তে মহাদেবের কৃপা কামনা করিয়াছেন—

তোহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর হম নিরদীন অনাথে ॥
করম ধরম তপহীনে। পড়লহুঁ পাপ অধীনে ॥
বেড ভাসল মাঝ ধারে। ভৈরব ধরু করুআরে ॥
সাগর সম দুখভারে। অবহু করঅ প্রতিকারে ॥

অনু: হে হর, তুমি ত্রিভুবনের নাথ। আমি নিরুদ্দেশ অর্থাৎ নিকৃষ্ট অনাথ। আমি তপস্যা ও ধর্মবিহীন, পাপের অধীনে পড়িলাম। নৌকা স্রোতের মাঝে ভাসিল, হে ভৈরব, তুমি হাল ধর। সাগর সমান দুঃখভারে। এখন প্রতিকার কর।

শিবের নিকট অকৃতী কবির এই অন্তিম প্রার্থনাই কবিকে শৈব বলিয়া পরিচিত করিতেছে।

৩। বিদ্যাপতি হরগৌরী, কালী, গঙ্গা ও রামসীতার বিষয়েও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই পদগুলির সবই মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে, বাঙলায় নহে। সুতরাং তিনি শুধু কৃষ্ণরাধার বিষয়ে পদ লিখিয়াছিলেন, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি ধর্মমতে অতিশয় অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, শৈবমতের মধ্যেই এইরূপ ঔদার্য আছে। শৈবমতাবলম্বীর পক্ষে অন্য ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করা দুরূহ নহে। এই প্রমাণের বলে, তাঁহাকে বিশুদ্ধ শৈব বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবু কিছুতেই বৈষ্ণব বলা চলিবে না।

৪। বিদ্যাপতি স্বহস্তে ভাগবত নকল করিয়াও কৃষ্ণ বা বিষ্ণু সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু একাধিক গ্রন্থে (শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলী ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী) শিবশক্তি সম্বন্ধে স্মার্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রমাণের বলে সমালোচক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে আপত্তি করার কিছুই থাকে না: বিদ্যাপতির কুলধর্ম ও ব্যক্তিধর্ম উভয়ই শৈবধর্মানুমোদিত ছিল, কিংবদন্তীও তাহাই বলে। তিনি যে রাধাকৃষ্ণের পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিছক শৃঙ্গার রসানুমোদিত, ধর্মীয় চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু পদে রাধাকৃষ্ণ বা বৃন্দাবন-সম্পর্কে কোন উল্লেখই নাই।

এখন প্রমাণগুলির যৌক্তিকতা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। প্রথমেই 'ধর্ম' কথাটির রহস্য বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। কুলধর্ম ও ব্যক্তিধর্মের মধ্যে

কোন কোন সময় মিল নাও থাকিতে পারে। বিশেষতঃ কবিধর্ম ও কুলধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে, কখনও-বা বিপরীত হইতে বাধা নাই। প্রথার বশে কবি বাহ্যতঃ একরূপ আচার আচরণ মানিয়া চলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের প্রবণতা ভিন্ন পথে যাইতে পারে। ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদী ধর্মাদর্শ রবীন্দ্রনাথের কুলধর্ম, অথচ কবিতায় তিনি শুধু আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রবক্তা নহেন, হিন্দু পৌরাণিক আদর্শও তাঁহার বহু কবিতায় ব্রাহ্মসমাজ-অননুমোদিত পৌরাণিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব বিদ্যাপতি কুলধর্মে শৈব হইয়াও রাধাকৃষ্ণের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি নিবেদন করিতে পারিতেন। মিথিলায় লোকে তাঁহাকে শৈব বলিয়া জানে, তিনি শৈববংশে জন্মিয়াছিলেন, বহু শৈব পদ ও গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন—এ সমস্তই কবি-জীবনের বাহ্য লক্ষণ মাত্র। কবির আন্তরধর্ম বিচারে ইহাদের গুরুত্ব সমধিক নহে। কবিধর্ম বিচারে কবির আন্তরধর্মের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, তাঁহার হরগৌরীবিষয়ক পদাবলীর কথা। মিথিলায় নাকি সর্বত্র বিদ্যাপতির হরগৌরীবিষয়ক পদেরই অধিকতর প্রচলন রহিয়াছে। লোকশ্রুতি ও অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিয়া তথ্যে আসিলে দেখা যাইবে যে, এ কথা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত নহে। কারণ এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির যত পদ সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। স্বয়ং গ্রীয়ার্সন সাহেব উত্তর-বিহারে ঘুরিয়া লোকমুখ হইতে যে ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৭৬টি পদই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক। অবশিষ্ট ৬টি শাক্ত ও শৈব পদ। নেপালের পুঁথি, লোচনকবির 'রাগতরঙ্গিণী', তরৌণী গ্রামে প্রাপ্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তালপত্রের পুঁথি—সমস্ত সংগ্রহেই শৈব পদ নামমাত্র, অধিকাংশ পদই রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। বিদ্যাপতির আট শতাধিক পদের মধ্যে মাত্র ৬৫টি হরগৌরীবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে। এই ৬৫টি পদের মধ্যে আবার ৩০টি পদ কোন পুঁথিতেই পাওয়া যায় নাই, মিথিলায় লোকমুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। না হয় স্বীকার করা গেল যে, বাঙলার অভিসন্ধিপরায়ণ পদসঙ্কলকগণ বাছিয়া বাছিয়া বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাস মিথিলায় তো শৈবধর্মের প্রাধান্য, বিদ্যাপতিও শৈব, জনসাধারণ প্রধানতঃ শৈব; তাহা হইলে মিথিলা নেপালের পুঁথিতে হরগৌরীবিষয়ক পদ-সংখ্যা নগণ্য কেন? যদি মিথিলার লোকসমাজে বিদ্যাপতির শৈব পদের এতই জনপ্রিয়তা হইবে, তাহা

হইলে গ্রায়ার্সন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামবৃক্ষ বেণীপুরী, ডঃ উমেশ মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিত-গবেষকগণও দুই-চারিটি ব্যতীত হরগৌরীবিষয়ক প্রচুর পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই কেন? এ প্রশ্নের বিশেষ কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। আর একটা কথাও বিবেচ্য। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হরগৌরীবিষয়ক যে-সমস্ত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য। লোক-সাহিত্যের আদর্শেই তাহা বিচার্য, বাঙলা দেশের শিবায়নজাতীয় গ্রন্থের সহিত তাহার অধিকতর সাদৃশ্য। শৈবপদই যদি বিদ্যাপতির প্রধান সাহিত্যকৃতি হইত, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী কালে লোকস্মৃতিতে কতটুকু আশ্রয় পাইতেন? কাব্যধর্মবিচারে তাঁহার রাধাকৃষ্ণপদাবলী শিবগীতিকা অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি দুই-একটি পদে হরি অপেক্ষা হরকে অধিকতর গৌরব দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই জাতীয় প্রায় সমস্ত পদেই হরিহরের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং এই একটি প্রমাণের বলে তাঁহাকে পুরাপুরি শৈব বলা যায় না, বরং পরমতসহিষ্ণু পঞ্চোপাসক হিন্দুর অনুভূতিই হরিহরাত্মক পদগুলিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, তিনি নানা বিষয়ে পদ লিখিয়াছিলেন; শিবদুর্গা, কালী, গঙ্গা, গণেশ, রামসীতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার কিছু কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে। শিবপার্বতীসংক্রান্ত পদের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বিদ্যাপতির সময়ে বিপন্ন মিথিলার সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য প্রধানতঃ শৈব ও শাক্ত পৌরাণিক আদর্শ সমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। এখনও মৈথিলী সমাজে বাঙলা দেশের মত শক্তি-উপাসনা প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতি এই আদর্শের পরিপোষক ও প্রচারক ছিলেন বলিয়া শিব ও পার্বতীর বিষয়ে পদ রচনা করিয়াছিলেন; অবশ্য এইরূপ পদের সংখ্যা অধিক নহে এবং ঐ পদগুলিতে প্রথাসিদ্ধ পৌরাণিক ভক্তিবাদের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। উহাতে কবিমনের নিবিড় স্পর্শ প্রায়ই অনুপস্থিত। তাঁহার রামসীতাবিষয়ক যে দুই-চারিটি পদ আছে, তাহাতেও রাধাকৃষ্ণ পদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অতএব তাঁহাকে পুরাপুরি বৈষ্ণব বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তাহা হইলেও শুধু এই কয়টি হরপার্বতীবিষয়ক পদের দোহাই দিয়া তাঁহাকে শৈব বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। অবশ্য তাঁহাকে ঠিক বৈষ্ণবও বলা যায় না। কারণ বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণবমত বলিতে আমরা যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করি, তাহা

প্রধানতঃ চৈতন্যপ্রভাবে একটা 'কাল্ট্' বা বিশেষ সম্প্রদায়রূপে গড়িয়া উঠে, তৎপূর্বে কাহাকেও ঠিক উত্তর-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। গীতগোবিন্দ রচনাকালে জয়দেবও কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি নিবেদন করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায় না। তেমনি 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতিও তাঁহার অসংখ্য পদে কৃষ্ণভক্তি নিবেদন করিলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মাদর্শে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা চলিবে না। বাহ্যতঃ তিনি কুলধর্ম ও লোকধর্ম অর্থাৎ শৈবধর্ম মানিয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর্জীবনে শৈব ও শাক্ত ধর্ম যে গভীর প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তথাকথিত শৈব পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিলেই বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে তাহার 'প্রার্থনা' পর্যায়ের পদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পদে দুঃখদহনের বিষজ্বালা হইতে তিনি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন, অন্তিম বিদায় মুহূর্তে কৃষ্ণের চরণতরী ভরসা করিয়া ভুবনের ঘাট ছাড়িয়াছেন। 'পদকল্পতরু' ও পদামৃতসমুদ্র' ধৃত বিদ্যাপতির প্রার্থনাবিষয়ক সেই বিখ্যাত তিনটি পদ—'তাতল সৈকত বারিবিন্দুসম সুতমিত রমণী সমাজ', 'জতনে জতেক ধন পাপে বটোরলুঁ মেলি পরিজনে খায়' এবং 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়'—ইহা শুধু পুণ্যলোভাতুর লোকান্তরযাত্রীর নিবেদবৈরাগ্য নহে, ইহার মধ্যে একটি ব্যর্থ মানুষের প্রাণের কথা সমুদ্রতটে তরঙ্গবিলাপের মতো যেভাবে ভাঙিয়া পড়ে, বিদ্যাপতির শৈব পদের অন্তে-সংযুক্ত প্রার্থনাপদে ঠিক সেই রকম নৈরাশ্যপীড়িত প্রাণের পরম আর্তি ফুটিয়া উঠে নাই। তিনি শৈব পদের একটি 'প্রার্থনা'য় শিবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

অপথ পথচারণ চলাওল উগতি মতি ন দেলা।
পরধন ধনি মানস লাওল মিথ্যাজনম দুর গেলা ॥
কপট কলেবর গীড়ল মদন গোহে।
ভালমন্দ হমে কীছু ন গুনল সময় বহল মোহে ॥
কএল মঞে, উচিত ভেল অনুচিত আবে মন পচতাবে।
তাবে কী করব সীরপএ ধুল রাগ ন দীন নাহী আবে ॥

অনু: আমাকে তুমি বিপথে পদক্ষেপ করিয়া চালাইলে, উন্নতির পথে চলিবার মতি দিলে না। পরের ধন ও রমণীর প্রতি মন গেল। বৃথা জন্ম বহিয়া গেল। মদনরূপ হাঙর ছল করিয়া আমার দেহকে গ্রাস করিল। আমি ভালমন্দ কিছুই বিচার করিলাম না; মোহে কাল কাটাইলাম। কর্তব্য না করিয়া অকর্তব্য করিলাম, এখন মনে অনুতাপ হইতেছে। এখন কি করিব? শিয়রে মরণ উপস্থিত, এখন আর সময় নাই।

তাই বিদ্যাপতি মহাদেবচরণে শরণ লইয়া বলিয়াছেন, "সূন মহেসর তৈলোক আনন দেবা"—মহেশ্বর শুন, তুমি ছাড়া ত্রিলোকে আর দেব নাই। এখানে মৃত্যুভীত হতাশ কবির বিলাপের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা নাই। কিন্তু 'আধজনম হম নিন্দে গোঁঙায়লু' বা 'অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লুঁ', প্রভৃতিতে মানবরস ফুটিয়াছে এবং,

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥

প্রভৃতি অংশে অন্তরের অন্তিম আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে।

গণইতে দোস গুণলেস না পাওবি জব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥

ইহার মধ্যে যে পরম আশ্বাস রহিয়াছে, হরবিষয়ক পদের প্রার্থনার অংশে তাহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় কি? উল্লিখিত কয় পংক্তির সহিত নেপাল-পুঁথিতে-প্রাপ্ত শিবের নিকট প্রার্থনা পদের পংক্তি কয়টি মিলাইয়া লইলেই একের সহিত অপরের পার্থক্য ধরা পড়িবে—

এ হর গোসাঞে নাহ, মো দেহ নু উপেখি।
গমঅগামুহ উত্তর উরছাউত, জবে বুঝাওত লেখী॥

অনু: হে নাথ হে হরগোস্বামী, আমাকে উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিও না। যখন আমার কৃতকর্মের হিসাব লেখা হইবে, তখন আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিও।

কবিতার গুণাগুণ বিচার করিয়াও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিদ্যাপতিরচিত কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা পদের সহিত শিবের নিকট প্রার্থনা পদের কাব্যাংশে 'আসমান জমিন ফারাক'! কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতি শৃঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ণপদাবলী লিখিয়া নাকি অনুতপ্ত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভাগবত নকল করিয়াছিলেন।[১০] এইরূপ উদ্ভট কল্পনা কত দূর হাস্যকর তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। হিন্দীভাষাভাষী সমালোচকগণ বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারিলেই যেন খুশি হইতেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে একপার্শ্ব হইতে দর্শন করিবেন, তাঁহারা বলিবেন, "তিনি শিবগঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণবভাব তাঁহাতে নাই বলিলেই হয়। তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন,

১০ পণ্ডিত রামনাথ ঝা-সম্পাদিত 'কীর্তিলতা'র হিন্দী সংস্করণের ভূমিকা

সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।"[১১] কিন্তু একথা বুঝিয়া দেখিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী 'গাথাসপ্তশতী' নহে, 'অমরুশতক' নহে, 'শৃঙ্গারশতক' নহে, দামোদরগুপ্তের 'কুট্টনীমতম্' নহে। ইহা স্বীকার না করিলে "তিনি সৌন্দর্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন"—এইরূপ আংশিক উক্তি করিতে হইবে।

কেহ-বা সামঞ্জস্যের মনোভাব লইয়া দুই বিরোধী শিবিরের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "কবি প্রথম জীবনে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা লইয়া শৃঙ্গাররসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বৈষ্ণবীয় সাধনার রসে নিমগ্ন হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলার গান করিয়াছিলেন।"[১২] 'বৈষ্ণব' শব্দটি লইয়াই গোল বাধিয়াছে। (যাঁহারা বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব বলেন, তাঁহারা উত্তর-চৈতন্যযুগের আদর্শ অনুসারেই বলিয়া থাকেন; যাঁহারা তাঁহাকে অবৈষ্ণব বলেন, তাঁহারাও সেই একই ভ্রান্তিবশতঃ উত্তর-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব আদর্শে বিচার করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হন। কিন্তু মৈথিলী ও হিন্দী পণ্ডিতদের একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলীকে নস্যাৎ করিবার কুযুক্তি এবং গৌড়ীয়দের বিদ্যাপতিকে 'নবরসিকে'র অন্যতম করিয়া লইবার অপচেষ্টা—উভয়ই ব্যর্থ হইতে বাধ্য।) (বিদ্যাপতি শৈব হউন, শাক্ত হউন, পঞ্চোপাসক হউন, যাহাই হউন না কেন, ইহা তাঁহার কুলধর্ম, দেশধর্ম। কিন্তু পদাবলীর মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত মনন ও অনুভূতি নিহিত রহিয়াছে; তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম, ঐকান্তিক ও প্রাণময় ভক্তিনিষ্ঠা উৎসৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব না বলিলেও তাঁহার মনোভাবের মধ্যে তাহার প্রচুর উপাদান ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আসলে বহু ব্যক্তিত্বের (multi-personality) সমবায়ে বিদ্যাপতির মনোভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল। কখনও রাজসেবক, কখনও কবি, কখনও পৌরাণিক সংস্কৃতির সংস্থাপয়িতা, কখনও-বা রাজবয়স্যোচিত রঙ্গরসে বিদ্যাপতি কলকণ্ঠ। কিন্তু রাধাকৃষ্ণপদাবলীর মধ্যে বিদ্যাপতির যে নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে এবং সেই নিষ্ঠা যেভাবে অপূর্ব কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে

---

১১ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'কীর্তিলতা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১২ মিত্র ও মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখিত মন্তব্য হইতে উদ্ধৃত।

শুধু শৈব বা পঞ্চোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার চিত্তের পূর্ণ স্বরূপটি বুঝা যাইবে না।

॥ ৪ ॥

বিদ্যাপতি-সমস্যা

চণ্ডীদাস-সমস্যার মতো বিদ্যাপতি-সমস্যা উৎকট আকার ধারণ না করিলেও, উহাও কম জটিল নহে। সমগ্র পূর্ব-ভারতে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, এক এক প্রদেশের ভাষার সহিত বিদ্যাপতির পদের মৈথিলী শব্দ মিশিয়া গিয়া কৃত্রিম ব্রজবুলি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। অনেক কবি বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ অমরত্বলাভের সুলভ পন্থা হিসাবে বিদ্যাপতির ভণিতা গ্রহণ করিয়া অক্ষম পদকে লোকসমাজে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রীয়ার্সন তাঁহার *Modern Literary History of Hindusthan*-গ্রন্থে যথার্থ বলিয়াছেন, 'Numbers of imitators sprang up, many of whom wrote in Bidyapati's name, so that it is now difficult to separate the genuine from the imitations, especially as the former have been altered in the course of ages to suit the Bengali idiom and metre." সত্যই বাঙলা দেশের পদসঙ্কলনে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এমন পদ আছে যাহা কস্মিনকালেও মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির লেখনী হইতে বাহির হইতে পারিত না। 'পদকল্পতরু'-তে ধৃত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ৮টি পদ[১৩] বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত। নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যাইবে ঃ—

১। শুনলো রাজার ঝি
তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধনে পরাণে বধিলি
একাজ করিলা কি ॥

১৩ পদকল্পতরুতে গৃহীত ২১৫, ২২৬, ৫১১, ১০৯৩, ১১০৩, ১৬৪২, ১৬৮০ ও ২৫২৫ সংখ্যক পদ।

২। একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায় ॥

৩। রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকের কোলে ॥

৪। মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥

এই পদগুলির ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম থাকিলেও এইরূপ বাংলা পংক্তি যে বিদ্যাপতির লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং কোন বাঙালী কবি বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়া ঐ পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যাপতির নামের আড়ালে অনেক নকল বিদ্যাপতি আশ্রয় লইয়াছিলেন, ঐ পংক্তিনিচয়ের বিশুদ্ধ বাংলা দেখিয়া তাহাই অনুমিত হইতেছে। সুতরাং এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত যে, মিথিলার বিদ্যাপতি ছাড়াও বাঙলা বা বাঙলার বাহিরে একাধিক 'বিদ্যাপতি' বর্তমান ছিলেন।

(বাঙলা দেশের পদসঙ্কলনে কবিরঞ্জন, কবিশেখর, শেখর, চম্পতি, বল্লভ ভূপতিসিংহ, দশঅবধান প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে সাধারণতঃ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মিথিলা নেপালের পদাবলী বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ উপাধিগুলি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। কারণ বিদ্যাপতির কোন মৈথিলী পদে ঐ ভণিতার কোনটি পাওয়া যায় নাই। সুতরাং বাঙলা দেশের যে সমস্ত পদসঙ্কলনে এইরূপ ভণিতা আছে, তাহা অন্য কবির রচিত বলিয়া অনুমান করাই সমীচীন। ঠিক তেমনি মিথিলার পদসঙ্কলনে পঞ্চানন, অমিঅকর, ধৈরযপতি, জসোধর, রুদ্রধর, আতম, বিষ্ণুপুরী, লখিমিনাথ, ভানু, কংসনারায়ণ, রতন, সিরিধর, পৃথিবীচন্দ প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না। ইঁহারা বিদ্যাপতির সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালের মৈথিলী কবি।)

এখন দেখা যাক বিদ্যাপতি স্বনামে এবং কি কি 'বিরুদ'-ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছেন। মিথিলায়-প্রাপ্ত উপকরণ অবলম্বনে সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি নিজ নাম ছাড়াও ভণিতায় এই 'বিরুদ'গুলি ব্যবহার করিতেন: কবিকণ্ঠহার, সরসকবিকণ্ঠহার, নবজয়দেব এবং অভিনব

জয়দেব। যে সমস্ত মৈথিলী এবং ব্রজবুলির পদে এই 'বিরুদ' বা উপাধি অথবা বিদ্যাপতির নাম আছে, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিয়দংশে নিঃসংশয় হওয়া যায়।) কিন্তু বাঙলার সঙ্কলনে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, চম্পতি, বল্লভ প্রভৃতি যে সমস্ত নাম বা 'বিরুদ' বিদ্যাপতির ভণিতা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ নামের কোন কোন কবি বিদ্যাপতির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য কবিচম্পতি বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন, তাঁহার উপাধিও ছিল 'বিদ্যাপতি'। ফলে মৈথিলী বিদ্যাপতির পদের সহিত 'চম্পতি-বিদ্যাপতি'র পদের গোলমাল বাধিয়া যায়। চম্পতির অনেক পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে এবং 'চম্পতি' বিদ্যাপতির উপাধি—এইরূপ ভুল ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। নবকবিশেখর, রায়শেখর, শেখর—ইহাও বিদ্যাপতির 'বিরুদ' নহে। বাঙলা দেশের প্রসিদ্ধ পদকর্তা রায়শেখর এই তিন ভণিতায় বিদ্যাপতির আদর্শে পদ রচনা করিতেন। শেখরের ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলিতে-রচিত পদগুলি বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। (সর্বাপেক্ষা গোল বাধিয়াছে, 'কবিরঞ্জন' ভণিতা লইয়া। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বিশুদ্ধ বাংলা পদগুলিই প্রধান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, বিদ্যাপতির নাম বা উপাধিধারী কোন কবি এই বাংলা পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ মৈথিলী বিদ্যাপতি বাঙালীর সুবিধার জন্য বাংলা ভাষায় পদ রচনা করিবেন, কল্পনাকে এতটা টানিয়া লওয়া যায় না।) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বাঙালী বিদ্যাপতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিদ্যাপতি-সমস্যা অনেকটা সরল করিয়া আনিয়াছেন।[১৪] শ্রীখণ্ডের রামগোপালদাস 'রসকল্পবল্লী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাস পিতার গ্রন্থ অবলম্বনে 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন। রামগোপালের আর-একখানি গ্রন্থ—'শ্রীখণ্ডের শাখানির্ণয়'। এই গ্রন্থে তিনি শ্রীরঘুনন্দনের এক শিষ্য কবিরঞ্জন-নামীয় এক বৈদ্য পদকর্তার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতি ভণিতায় পদ রচনা করিতেন—

ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥

১৪ ১৩৩৬ সনের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ এবং ১৩৩৮ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৩য় সংখ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

'ছোট বিদ্যাপতি' কবিরঞ্জন কখনও শুধু বিদ্যাপতি ভণিতায়, কখনও স্বনামে অর্থাৎ কবিরঞ্জন ভণিতায় পদরচনা করিতেন। এই কবিরঞ্জন তন্ত্রোক্ত ত্রিপুর-সুন্দরীর ভক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাংলা পদগুলি ইহারই রচনা বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত প্রহেলিকাজাতীয় পদটি যে উত্তর-চৈতন্যযুগে রচিত, তাহা ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে।

গোপতি নন্দন সো কাহে মারব আপহি তেজব পরাণ ॥
গিরিতনয়াধর কতহি নাম লব জপি জপি জীবনশেষ।
* * * *
অমরাবতিপতি ঘরণি গুণদ্বয় যদি মঝু হোয়ত মাই।
বিদ্যাপতি ভন ভাবি মরব কাহে না মিলন নিঠুর মাধাই ॥

অনু: সেই রাখালের হাতে কেন মরিব? আপনিই প্রাণত্যাগ করিব। গঙ্গাধরের নাম আর কত লইব? জপিতে জপিতে প্রাণ শেষ হইল।...অমরাবতীর পতি ইন্দ্র তাহার ঘরণী শচীদেবী, গুণদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয় গুণ বা রজঃ, শচীরজ অর্থাৎ শচীঅঙ্গজ শ্রীগৌরাঙ্গদেব যদি আমার হন, তবে বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নিঠুর মাধাই নাই বা মিলিল, কি জন্য ভাবিয়া মরিব?

এই প্রহেলিকা-পদটির প্রচ্ছন্ন অর্থ আবিষ্কার করা গেলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপতি কৃষ্ণকে না পাইয়া শচীনন্দনের বন্দনা গাহিয়া তাঁহার শরণ লইয়াছেন। এই পদ মৈথিলী বিদ্যাপতির কদাপি নহে। অনুমান, এই বিদ্যাপতি শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন। ইনি এমন নিপুণভাবে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিয়াছিলেন যে, বাহ্যতঃ এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই মনে হয়।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলনসংক্রান্ত যে-সমস্ত পদ পাওয়া গিয়াছে, সমালোচকগণের অনেকেই তাহাকে অপ্রামাণিক ও অযথার্থ বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতির পক্ষে গঙ্গাতীরে আসিয়া চণ্ডীদাসের সহিত রসতত্ত্ব (সহজিয়া?) আলোচনা করা অনৈতিহাসিক অলীক কল্পনামাত্র। কিন্তু শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতি-উপাধিক কবিরঞ্জনের পরিচয় আবিষ্কৃত হইবার পর উক্ত বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-মিলনসংক্রান্ত পদগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করা যাইতে পারে। নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত দীনচণ্ডীদাসের সহিত রঘুনন্দনের শিষ্য কবিরঞ্জনের মিলন ও সহজিয়া রসতত্ত্ববিষয়ক পদগুলি মৈথিলী বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনসংক্রান্ত অলীক গল্পের আকারে চলিয়া গিয়াছে। বিদ্যাপতির ভণিতায়, বিশেষতঃ যাহাতে বাংলা ভাষার প্রভূত প্রভাব দেখা যায়, বা যাহাতে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই বাঙালী বিদ্যাপতি বা ছোট

বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া এখন স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এইভাবে দুই যুগে দুই দেশে দুই বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। একজন আসল, আর একজন আসলের নকল। এই নকল কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতিকে গ্রীয়ার্সনের ভাষায় 'pseudo Bidyapatı' বলিতে পারা যায়। তাই বলিয়া বাঙলা দেশে বিদ্যাপতি-ভণিতা-যুক্ত সমস্ত পদই যে এই 'pseudo Bıdyapati'-র রচনা, তাহা কদাপি সত্য নহে। গ্রীয়ার্সনের এইরূপ সিদ্ধান্ত বিদ্যাপতিসংক্রান্ত ভ্রান্তধারণাপ্রসূত।

বিদ্যাপতির সহিত বাঙালীর চারি শত বৎসরের সম্পর্ক ; আমরা মৈথিলী-"বিদ্যাপতির কুর্তাপাগড়ী খুলিয়া ধুতী চাদর পরাইয়াছি" (দীনেশচন্দ্র), বিদ্যাপতিকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। ঐতিহাসিক ও গবেষক মৈথিলী নেপালী উপকরণকেই অধিকতর প্রাধান্য দিবেন এবং বাঙলা দেশের পদসঙ্কলনে-ধৃত ব্রজবুলিতে লিখিত বিদ্যাপতির পদ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিবেন।* কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিলী বিদ্যাপতির আলোচনার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। যে বিদ্যাপতি বাঙালীর সহিত বাঙালী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক। সুতরাং ঐতিহাসিক যাহাই বলুন না কেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির স্থান নির্ণয় করিতে হইলে বাঙলা দেশে প্রচলিত পদেরই সাহায্য লইতে হইবে। বিশুদ্ধ মৈথিলী পদের দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল মিটিতে পারে মাত্র, তাহার সহিত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী-মানসের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই।

* আর. আর. দিবাকর-সম্পাদিত *Bihar Through the Ages* নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে বাঙালার সহিত বিদ্যাপতির সম্পর্কের প্রতি নীরব ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী

॥ ১ ॥

ভূমিকা : রামায়ণী কথা

(সমগ্র ভারতসংস্কৃতির সহিত রামায়ণকথার এমন একটি অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক আছে যে, বিশ্বের অন্য কোন মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা একবাক্যে বলা যায় না। অবশ্য প্রত্যেক দেশের মহাকাব্য সেই দেশের অন্তর্জীবন হইতেই রস আহরণ করে। জাতি ও জীবনের সহিত মহাকাব্য মাত্রেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগাযোগ থাকে। কিন্তু রামায়ণ মহাকাব্য শুধু সারস্বত-মন্দিরের বিগ্রহরূপেই নহে, সমগ্র ভারতজীবন ও প্রাণরসের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে জড়াইয়া গিয়াছে। গত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের মনঃপ্রকৃতির চতুঃসীমায় রামায়ণকাহিনীর বিচিত্র দেবদেউল গড়িয়া উঠিযাছে। জনপদ, জনজীবন, ভূগোল ও ইতিহাসের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও রামায়ণকথা দেশে দেশে ও কালে কালে নব নব রূপ লাভ করিয়াছে, কখনও একের সহিত অপরের কথা, চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়া আদৌ সাদৃশ্য নাই, কখনও-বা এক অঞ্চলের কাহিনী অপর অঞ্চলে-প্রচলিত কাহিনীর সাক্ষাৎ বিরোধী ; তথাপি সামগ্রিক বিচারে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে যদি কোন একখানি গ্রন্থ সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহা রামায়ণ।) বেদ-উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, নানা পুরাণ-উপপুরাণ—এই সমস্ত গ্রন্থও ভারতজীবনকে নানাভাবে গঠন করিযাছে, পরিবর্তিত করিয়াছে প্রভাবিত করিয়াছে ; কিন্তু রামায়ণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, ভাবগভীর ও চিরায়ু। মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের সশস্ত্র সংঘাত, মহাভারতনাটকের সূত্রধার কৃষ্ণবাসুদেবের মহদাদর্শ—পরিশেষে পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান ;—সমগ্র ভারতবর্ষ এই রণরঙ্গমুখর রাজসিক ঐশ্বর্যলীলা এবং তাহারই সহিত বৈরাগ্যের গৈরিক নির্বেদ ও জীবনের অস্তিনাস্তিকে অতিশয় প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি রামায়ণের প্রভাব স্বতন্ত্র।

মহাকাব্য হিসাবে রামায়ণ আদি মহাকাব্য ; ইহাতে পুরাণাদির মতো

ধর্মনীতি ও চারিত্র-আদর্শেরও প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে; হয়তো সমগ্র কাহিনীটির অন্তরালে কোন ঐতিহাসিক সত্য বা জাতিগত বিরোধের অলিখিত ইতিবৃত্ত লুকাইয়া আছে। কিন্তু (রামায়ণের যদি কোন আকর্ষণ থাকে—যাহা বহু শতাব্দী পরেও ভারতচিত্তে অদ্যাপি অম্লান হইয়া রহিয়াছে,—তাহা হইল ইহার গার্হস্থ্য জীবনচিত্র। মহাভারত বহিরঙ্গচারী বৃহদ্ জীবনের মহাকাব্য; রামায়ণ সীমাবদ্ধ গৃহধর্মাদর্শের চরিতকথা। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ গৃহধর্মকেই জীবনাদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে।) বৌদ্ধযুগে কয়েক শত বৎসরের জন্য গৃহত্যাগী প্রব্রজ্যার কাষায়মণ্ডিত জীবনাদর্শ প্রাধান্য পাইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের যদি কোন চিরকালীন বাণী থাকে, তবে তাহা হইতেছে গৃহজীবনের শান্ত শুচিস্নিগ্ধ চারিত্র নীতি। (ভারতবর্ষ যাহা হইতে চাহিয়াছে, রামায়ণে তাহা সে পাইয়াছে। আমাদের পুণ্য-পারিবারিক সম্পর্ক, জীবনের একটা স্বাদু সীমাবদ্ধ পবিত্রতা,—এক কথায় যাহাকে ভারসাম্য বা balance বলে, রামায়ণের মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।) ইহাতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ আছে; নরবানর, ঋক্ষ-যক্ষ-রক্ষ ও দেবদানবের রণকোলাহল মাঝে মাঝে রামায়ণের শান্ত জীবনচ্ছবিকে কিছুটা খর্ব করিলেও, আসলে ইহাতে পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগিনী, স্বামীস্ত্রী, প্রভুসেবক, বন্ধুবান্ধব—এই সম্পর্কগুলি প্রাত্যহিক জীবনরসে আর্দ্র হইয়া দ্যুলোকচারী মহাজীবনকে ঘরের মধ্যে স্থাপন করিয়াছে।[১] ফলে কাহিনীর ঘটনাসূত্র বাহিরের সহিত জড়িত হইলেও অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেই সমস্ত ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে। ঘরের কথার প্রভাব ইহাতে এত অধিক যে, শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী বনে বাস এবং ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব বানরাদির আত্মগোপন করিয়া অবস্থিতি এই পারিবারিক সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথমেই বাল্মীকি নারদকে প্রশ্ন করিযাছিলেন,

"হে মুনে! বর্তমান কালে পৃথিবীতে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্যবান্, ধার্মিক, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন?—কোন্ ব্যক্তি সর্বপ্রাণীর হিতানুষ্ঠান করেন? কোন্ ব্যক্তি বিদ্বান্ এবং কোন্ ব্যক্তি সন্ধি-বিগ্রহাদি সকল কার্যেই সমর্থ ও প্রিয়দর্শন? কোন্ ব্যক্তি ধৈর্যশীল, কোন্ ব্যক্তি অতিশয় কান্তিমান্, কোন্ ব্যক্তি রোষ ও পরশ্রীকাতরতাকে পরাস্ত করিয়াছেন? দেবগণও যুদ্ধে কাহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিলে ভীত হইয়া থাকেন?"*

১ রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত "রামায়ণ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* বসুমতী সাহিত্যমন্দির-প্রকাশিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ

সেই নরোত্তম রামচন্দ্রের কাহিনীটি এই মহাকাব্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-উজ্জ্বল পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে। বাল্মীকি আদর্শ জীবনচিত্র অঙ্কন করিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আদর্শ জীবন-সমুত্থ অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব চিত্র। পরবর্তী কালে রামচরিত্র ও রামায়ণকাব্য ভক্তিরসের দ্বারা পরিবর্তিত হইলেও ইহার মূল আদর্শ বাস্তব প্রতীতির দ্বারা গার্হস্থ্য জীবনকেই পরিশুদ্ধ করিয়াছে। কাজেই রামায়ণকাব্য যে-ভাবে ভারতবর্ষের জীবনের সহিত স্বাঙ্গীকৃত হইয়া গিয়াছে, অন্য কোন কাব্য বা মহাকাব্য বা পুরাণ ঠিক সেইভাবে সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণ ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। এতদিন ধরিয়া জীবনসম্বন্ধে যে-সমস্ত জ্ঞান, মনন ও ভাবনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূল্যমান যদি কোন দিন একেবারে বদলাইয়া যায়, তাহা হইলে হয়তো সেই দিন রামায়ণের মহদাদর্শ ভারতজীবন হইতে লোপ পাইবে। কিন্তু সেরূপ আশঙ্কার আশু কোন সম্ভাবনা নাই। খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ খ্রীষ্টের জন্মের পর প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া রামচরিতকথা ভারতবাসীর জীবন ও সাধনাকে যেভাবে ধারণ করিয়া আছে, তাহাতে কোন নৈসর্গিক বা আত্মিক উপপ্লব না ঘটিলে ভারতবাসীর সহিত রামায়ণকাহিনীর সম্পর্ক চিরকাল অচ্ছেদ্য থাকিবে।

সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত (বাল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড) এবং ২৪,০০০ অনুষ্টুপ শ্লোকে গ্রথিত সুবৃহৎ রামায়ণী কাহিনীটি নানা দিক দিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাল্মীকি আদিকবি, এবং রামায়ণ আদিকাব্য বলিয়া কীর্তিত; শিল্পসম্মত ও আলঙ্কারিক কাব্যকৃতিরূপে রামায়ণই প্রথম কাব্য; ইতিপূর্বে কাব্য রচিত হইলেও ornate poetry বা আলঙ্কারিক কাব্যরচনার প্রচেষ্টা বাল্মীকি-রচিত রামায়ণেই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষ কাণ্ডটি (বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড) সম্ভবতঃ বাল্মীকির রচনা নহে, পরবর্তী কালের সংযোজনা। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনীটি সংহত ও মহাকাব্যের রীতিসম্মত। উপরন্তু এই পঞ্চ কাণ্ডে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বা পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রায় কোথাও প্রচার করা হয় নাই। তিনি প্রধানতঃ বীর ও আদর্শ নরচরিত্র; চরিত্রবল ও বাহুবলের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছেন, পঞ্চকাণ্ডে কাহিনীটি এইভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডে

তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেইভাবে ভক্তি নিবেদন করা হইয়াছে। অনুমান পরবর্তী কালে রামচন্দ্র যখন আর কেবলমাত্র নরকুলচন্দ্রমা হইয়া রহিলেন না, পরন্তু ভক্তিরসের দ্বারা পরিগৃহীত হইলেন, তখনই হয়তো এই দুইটি কাণ্ড সংযোজিত হইযাছিল। শেষ কাণ্ডটিতে রামচন্দ্রের কাহিনী মাত্র এক-চতুর্থাংশ, অবশিষ্ট অংশ পুরাণশ্রেণীর নানা অপ্রাসঙ্গিক ঘটনায় পূর্ণ। উপরন্তু এই দুই কাণ্ডে বাল্মীকির প্রতি যে সম্ভ্রমাত্মক উক্তি আছে, তাহাতে তিনি যে এই দুই কাণ্ড লিখিযাছিলেন, তাহা মনে হয় না।

'রাম না হতে রামাযণ' প্রভৃতি প্রবাদবাক্য অথবা কৃত্তিবাসের—

রামজন্ম পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর॥

প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, রামজন্মের ষাট হাজার বৎসর পূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রবাদ পুরাণকথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মূল রামাযণে দেখা যাইতেছে যে, রামের জীবৎকালে বাল্মীকি জীবিত ছিলেন এবং রামের জীবনের ঘটনার ঈষৎ পরেই রামায়ণ রচনা করিয়া থাকিবেন। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর দিকে রামাযণকাহিনীটিকে বাল্মীকি বর্তমান রূপ দান করেন। বোধহয় সহস্র খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতেই রামাযণের কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিযাছিল এবং সেই সময়েই বিচ্ছিন্ন কাহিনী গল্পের আকারে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। পরে বাল্মীকির ন্যায় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি আবির্ভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলিকে সংহত শিল্পরূপ দান করেন।[২]

রামাযণের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি কাহিনী আছেঃ অযোধ্যার কাহিনী, কিষ্কিন্ধ্যার কাহিনী এবং লঙ্কার কাহিনী—অথবা নর, বানর ও রাক্ষসের কাহিনী। এই তিনটি কাহিনী প্রথমে বোধহয পৃথকভাবে বা পরস্পর-সম্পর্কহীনভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ পালিভাষায় 'দশরথজাতক' নামক যে জাতকগল্প আছে, তাহার সহিত বাল্মীকির কাহিনীর অনেক মৌলিক পার্থক্য আছে। 'দশরথজাতকে' দশরথ বারাণসীর রাজা, অযোধ্যাপতি

---

২ *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal. 1915*

নহেন; সীতা জনকনন্দিনী নহেন[৩]—দশরথকন্যা, রামের ভগিনী। রাম দশরথের উপদেশে বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতাসহ হিমাচলের অরণ্যপ্রদেশে নির্বাসন যাপন করেন। তাঁহার নির্বাসনকাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতা রাজধানী বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন। নির্বাসনকাল পূর্ণ হইলে রাম বারাণসীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন এবং নিজ ভগিনী সীতাকে বিবাহ করেন। এই অদ্ভুত গল্পের সহিত বাল্মীকির কাহিনীর কতটুকু সাদৃশ্য আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই জাতকে রাবণ বা সুগ্রীবাদির কোন প্রসঙ্গ নাই। যে সীতাহরণ রামায়ণের কেন্দ্রীয় ঘটনা, 'দশরথজাতকে' তাহার আভাস মাত্র নাই। আমাদের অনুমান, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের নানা স্থানে সীতারাম-সংক্রান্ত নানা গালগল্প প্রচলিত ছিল; জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা অনুসারে এক-একটি জনপদে এই কাহিনী পৃথক পৃথক রূপ লাভ করিয়াছে। এই ধরনের কোন উপকথা হইতে 'দশরথ-জাতকে'র গল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; হয়তো এই উৎস হইতেই কাহিনী গ্রহণ করিয়া বাল্মীকি প্রতিভাবলে উপকথাকে মহাকাব্যে রূপান্তরিত করেন।

মূল কাহিনীটির পশ্চাতে কোন প্রকার ঐতিহাসিক ইঙ্গিত থাকা সম্ভব। বেবর প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামায়ণকাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে রূপকধর্মী বলিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে রামায়ণ আর্যসভ্যতার কৃষিজীবনের প্রতীক। সীতার অর্থ—হল্যা ভূমি, রামচন্দ্র অরণ্যসঙ্কুল দক্ষিণ দেশকে আর্যসভ্যতা ও কৃষিকর্মের অনুকূল করেন। রাবণ নামক দ্রাবিড়বংশোদ্ভূত আর্যবিরোধী রাজা এই কর্মে বাধা দিয়া রামের সীতাকে হরণ করেন, অর্থাৎ কৃষিকর্মের প্রধান সম্পদ্ হল্যা ভূমিকে বিনষ্ট করিয়া কৃষিকর্মের ক্ষতি সাধন করিয়া দাক্ষিণে আর্যসভ্যতা বিস্তারে

৩ 'জনকনন্দিনী'—পিতার কন্যা অর্থাৎ ভগিনী অর্থে পালিতে গৃহীত হইয়াছিল কিনা গবেষকগণ বিচার করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা ব্যাজস্তুতির উদাহরণ স্মরণীয়—

রামচন্দ্রের আপাতঃ নিন্দা—

জনম হে তব অতি বিপুলে, ভুবনবিদিত অজের কুলে।
জনকতনয়া বিবাহ করি', তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥

এখানে 'জনকতনয়া বিবাহ করি' উক্তিটি আপাতঃ ব্যঙ্গচ্ছলে প্রযুক্ত হইলেও, এইরূপ কোন শব্দের ধ্বনিসাম্য হইতে অর্থবিভ্রাট ঘটিয়া 'সীতা রামের ভগিনী'—"দশরথজাতকে" এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে কিনা কে বলিতে পারে?

বাধা দিয়াছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যাবাসী বানরগণ আর্যেতর হইলেও আর্যনেতা রামচন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল, রামচন্দ্র তাহাদের সহায়তায় রাবণের প্রাণনাশ করিয়া দক্ষিণ ভারতে কৃষিসভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র যে কৃষিসভ্যতার প্রতীক—তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এইভাবে কেহ কেহ রামায়ণকে সম্পূর্ণরূপে রূপকধর্মী কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, দক্ষিণ ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের কথা রামায়ণের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তাই বলিয়া ইহাকে পুরাপুরি রূপককাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে যুগে ইহা জনসমাজে প্রচলিত ছিল, তখন রূপকধর্মী তাৎপর্য এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। ইহার প্রধান আবেদন গল্পরস, চারিত্র নীতি ও গার্হস্থ্য জীবনাদর্শ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইহার উপর সমাজসচেতন আধুনিক তত্ত্ব আরোপ করিলে কালানৌচিত্য নামক আলঙ্কারিক ভ্রান্তির মধ্যে পড়িতে হইবে।

দক্ষিণভারতে রামায়ণ-সংক্রান্ত যে কাহিনী বহুপূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহাতে হয়তো রাবণকে এতটা কলঙ্কিত করিয়া অঙ্কিত করা হয় নাই। 'লঙ্কাবতারসূত্র' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে আছে যে, বুদ্ধদেবের সহিত পরমধার্মিক লঙ্কেশ্বর রাবণের সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রাবণকে মহাযান বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য লেখক রাবণের ন্যায় ধার্মিক বৌদ্ধ নরপতিকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, ধর্মকীর্তি নামক এক বৌদ্ধ লেখক তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাবণবংশের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। রাম অপেক্ষা রাক্ষস ও বানরদের গল্পই ইহার কলেবর পূর্ণ করিয়াছে। তপঃপূত রাবণ-চরিত্রকেও রামের তুলনায় মহত্তর করা হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে জাতককাহিনীগুলি প্রচলিত ছিল, 'লঙ্কাবতারসূত্র' ২য়-৩য় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ধর্মকীর্তি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জৈনরামায়ণ ১২শ শতকে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টের জন্মের পর পাঁচ ছয় শত বৎসর হইতে শুরু করিয়া এক-হাজার বৎসর পরেও দক্ষিণ-ভারতের কাহিনীগুলিতে রাম অপেক্ষা রাবণ প্রাধান্য পাইয়াছেন এবং প্রায়শঃই রাবণকে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা চলিয়াছে। আমাদের অনুমান, সমগ্র রামায়ণকাহিনীর পশ্চাতে জাতিগত বিরোধ এবং ধর্মগত (ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ও অব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ) দ্বন্দ্বের আভাস আছে—

অন্ততঃ দক্ষিণভারতের অধিবাসীরা যে তাহাদের জাতীয় বীর রাবণকে অধিকতর গৌরব দিতে চাহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামায়ণে মোট ২৪,০০০ শ্লোক ছিল। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ (জেকবি-প্রণীত Das Ramayana) অনুমান করেন, এই শ্লোকসমূহের মধ্যে বড়জোর এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ প্রায় ৬,০০০) বাল্মীকির রচনা; বাকিটুকু কালে কালে মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোকরচনাও দুষ্কর নহে; কাজেই সুত, ভাট, মাগধ প্রভৃতি গায়ক-সম্প্রদায়, জনসাধারণ, রাজপরিবার ও রাজসভায় যখন রামায়ণ গান করিত, তখন তাহারাও শ্রোতাদের রুচি ও মনোভাব অনুসারে কোন কোন অংশে অনেক কিছু নিজেরাই যোগ করিয়া দিত, এইরূপে রামায়ণের মূল আকার ক্রমে ক্রমে বিপুলায়তন লাভ করিয়াছে। পণ্ডিতবর্গের এ অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। তাহার কারণ এ পর্যন্ত যত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মূল কাহিনীটি মোটামুটি অনুসৃত হইলেও একের সহিত অপরের বহু স্থলে বৈষম্য আছে।

ভারতে যত রামাযণ পাওয়া গিযাছে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে তাহাদিগকে তিনটি শাখায় বিভক্ত কবা যাইতে পারেঃ (১) গৌড়ীয় পুঁথি বা পূর্বাঞ্চলের পুঁথি; (২) দাক্ষিণাত্যের পুঁথি; (৩) উদীচ্যের পুঁথি বা উত্তরাপথের পুঁথি। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও উদীচ্য পুথিগুলির মধ্যে অধিকতব সাদৃশ্য বর্তমান; কিন্তু গৌড়ীয় বা পূর্ব-ভারতীয় পুঁথির সহিত অপর দুই অঞ্চলের পুঁথির বহুতর পার্থক্য ও বৈষম্য আছে। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, রামাযণে প্রক্ষেপ প্রবেশ করিযাছে। ফলে বিশুদ্ধ রামায়ণ আবিষ্কার করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা কৃত্তিবাসী রামাযণে অনুচিত প্রক্ষেপ দেখিয়া বিষণ্ণ হন, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, মূল বাল্মীকির রামায়ণেও প্রক্ষেপাংশের পরিমাণ কিছু কম নহে। অবাঙালী সমালোচকবর্গ গৌড়ীয় পুঁথি অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য ও উদীচ্যের পুঁথিগুলিকেই বাল্মীকির অধিকতর বিশুদ্ধ সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। এই দাক্ষিণাত্য ও উদীচ্যের পুঁথির পাঠই রামায়ণের বোম্বাই সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য, উদীচ্য বা দাক্ষিণাত্য—কোন অঞ্চলের পুঁথিকেই বাল্মীকির বিশুদ্ধ রামাযণ বলা যায় না। বরং প্রাচ্য বা গৌড়ীয় গ্রন্থকেই অধিকতর প্রামাণিক বলা যাইতে পারে, কারণ রামায়ণ প্রধানতঃ পূর্ব-ভারতের কাহিনী,—মহাভারত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উপাখ্যান। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের গৌড়ীয়

পুঁথিগুলিকে অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। রামায়ণের যে, সংস্করণ সর্বপ্রথম য়ুরোপে প্রেরিত হইয়াছিল তাহা গৌড়ীয় পুঁথি। G. Gorresio য়ুরোপে সর্বপ্রথম গৌড়ীয় রামায়ণ প্রকাশ করেন। বন্ (Bonn) হইতে A. W. von Schlegel রামায়ণের আর-একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর হইতে কেরী ও মার্শম্যান যে বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশ করেন (১৮০৩), তাহা আর কোন পুঁথি দৃষ্টে মুদ্রিত। সুতরাং প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণে যে কী পরিমাণে প্রক্ষেপ অনুপ্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

পরবর্তী কালে মূল রামায়ণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া বহু লেখক বিভিন্ন কাব্য-নাট্য রচনা করিয়াছেন। যেমন হিমাচল হইতে গঙ্গার শীর্ণ ধারাটি নামিয়া আসিয়া যতই সমতল ভূমির উপর দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঠিক সেইরূপ রামায়ণকাহিনী আদিতে যাহাই থাকুক, পরবর্তী কালে নানা কবি ইহায় নানা রূপ দান করিয়াছেন। রামায়ণকাব্য হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতে যে সমস্ত কাব্য, নাটক ও পুরাণ রচিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া যাইতেছে :—

১। বাল্মীকির নামে প্রচারিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
২। ঐ অদ্ভুত রামায়ণ
৩। ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত অধ্যাত্ম রামায়ণ
৪। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড (৩৭শ-৭১তম অধ্যায়)
৫। অগ্নিপুরাণ (৫ম-১১শ অধ্যায়)
৬। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৯ম স্কন্ধ (১০ম-১১শ অধ্যায়)
৭। মৎস্যপুরাণ (১২শ অধ্যায়)
৮। কূর্মপুরাণ (২১শ অধ্যায়)
৯। বায়ুপুরাণ (৮৮তম অধ্যায়)
১০। দেবী ভাগবত (৩।২৮-৩০ অধ্যায়)
১১। বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্বখণ্ড (১৮শ-৩০শ অধ্যায়)
১২। কল্কিপুরাণ (৩।৩-৪ অধ্যায়)
১৩। জৈমিনিভারত (২৫শ-৩৬শ অধ্যায়)
১৪। কালিদাসের রঘুবংশম্
১৫। ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্যম্

১৬। ভবভূতির উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, মহানাটক
১৭। মুরারির অনর্ঘরাঘব
১৮। অভিনন্দের রামচরিত
১৯। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ইত্যাদি

শুধু সংস্কৃতেই নহে, প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণকাহিনী ক্রমে ক্রমে অনূদিত হইতে আরম্ভ হয়। আধুনিক প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম তামিল ভাষায় ১১শ শতকে বাল্মীকি-রামায়ণ অনূদিত হয়। কম্বন্-রচিত রামায়ণ তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীধর মারাঠী ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। ১৫শ শতাব্দীর কৃত্তিবাস ও ১৭শ শতাব্দীর তুলসীদাস মূল রামায়ণের আংশিক অনুবাদ করেন; কোথাও নূতন কাহিনী যোগ করিয়া, কোথাও বা মূল কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া এবং রামায়ণের বীরগাথাকে ভক্তি-রসে দ্রবীভূত করিয়া ইঁহারা পূর্বভারতে রামভক্তিপ্রচারে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের যে সমস্ত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে।[৪]

কেবল ভারতবর্ষেই নহে, বহির্ভারতেও রামায়ণকাহিনী কোথাও মূল আকারে, কোথাও-বা পরিবর্তিতরূপে জনচিত্তে স্থান পাইয়াছে। বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এশিয়ার নানা অঞ্চলে রামায়ণকাহিনী বিস্তার লাভ করিয়াছে। বৃহত্তর ভারত বা ব্রহ্ম, শ্যাম-কম্বোজ, কোচিন চীন বা চম্পা, ভিয়েটনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের কাহিনী কখনও চিত্রশিল্পে, কখনও-বা সাহিত্যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্থান পাইয়াছে। যবদ্বীপে যবদ্বীপীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। ৪৭২ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ভারত হইতে চীনদেশে রামায়ণকাহিনী পৌঁছাইয়াছিল। চীনের রামায়ণকাহিনী অনেকটা 'দশরথ-জাতকে'র মতো, অর্থাৎ সীতা রামের ভগিনী, পরে সহধর্মিণী। কিন্তু ইহার দুই শত বৎসর পরে মধ্য-এশিয়ার সোগ্‌দিয়ানা বা চুলিক দেশে যে রামায়ণকাহিনী প্রচারিত

৪ প্রাগাধুনিক যুগে ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত রামায়ণের সংখ্যা—

(১) মারাঠী— ৮ খানি	(৪) উৎকল—১ খানি
(২) তেলুগু— ৫ ,,	(৫) হিন্দী— ১১ ,,
(৩) তামিল—১২ ,,	(৬) বাংলা—২৫ ,,

(বিশ্বকোষ)

হইয়াছিল, তাহা বাল্মীকির কাহিনীর অনুরূপ। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় খ্রীঃ প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যেই রামচরিতকথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্যামদেশের এক রাজবংশের রাজগণ আপনাদের নামের সহিত 'রাম' শব্দ যোগ করিয়া রামকাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। শ্যামে 'হুঙ্গ' (*Hnang*) নামক প্রসিদ্ধ ছায়ানাট্যে এখনও বামায়ণকাহিনী অভিনীত হইয়া থাকে। অবশ্য এই সমস্ত অঞ্চলে বাল্মীকির কাহিনী অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

কোন কোন য়ুরোপীয় লেখক মহাভারতকেই প্রাচীনতর বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাহারও মতে রামায়ণকাহিনীটিই নবীনতর; কাহারও-বা মতে যে-আকারে বাল্মীকির রামায়ণ অধুনা প্রচলিত আছে, তাহা মহাভারতের পরবর্তী কালের রচনা। কারণ রামায়ণের ভাষা নবীনতর, প্রায় কালিদাসের নিকটবর্তী। বিষয়বস্তু—পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি; কাহিনী—পূর্বাপরসঙ্গতিযুক্ত ও সংহত। ইহার চরিত্র ও চরিত্র-পরিণাম মহাভারতের রূঢ় প্রচণ্ডতা ত্যাগ করিয়া ন্যায়ধর্মানুমোদিত শান্ত ও শুচিস্নিগ্ধ জীবনচ্ছবি-রূপে বিকশিত হইযাছে। মহাভারতে বরং আদিমতর জীবনেব প্রচণ্ড কঠোরতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাভারতের রচনা কেবল কাহিনীকেন্দ্রিক নহে, ইহাতে পুরাণের মতো অনেক প্রসঙ্গ, নীতিকথা, ধর্মীয় আদর্শ প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত রামায়ণকাহিনী এবং কাব্যকে মহাভারত অপেক্ষা নবীনতর বলিয়া থাকেন। কারণ রামায়ণ যদি আদিকাব্যই হইত, তাহা হইলে ইহার রচনা এরূপ পরিপক্ক শিল্পগুণান্বিত হইতে পারিত না; নিশ্চয় ইহার পূর্বে কোন কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে রামায়ণের মতো আদিকাব্য বা প্রথম কাব্যেই এইরূপ রসপরিণতি ও শিল্পসমুৎকর্ষ পাওয়া যাইত না। পাণিনিতে বাসুদেব, যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের উল্লেখ থাকিলেও রামচন্দ্রের প্রসঙ্গও নাই, নামও নাই। অনুমান, পাণিনির যুগে রামায়ণ মহাভারতের মতো কাব্যরূপ লাভ করে নাই; অতএব এই দিক দিয়া রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা কিছু নবীন মনে হইতে পারে।

বেবর সাহেবের মতে, মহাভারতের ঘটনা রামায়ণের পূর্ববর্তী, কারণ মহাভারতে উত্তরভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আর্যগণ অগ্রে উত্তরাপথে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পরে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিলেন। সুতরাং রামায়ণের ঘটনা মহাভারতের পূর্ববর্তী হওয়াই সম্ভব।

এই সমস্ত যুক্তি কিয়দংশে গ্রহণযোগ্য বটে ; কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী। রামায়ণের বর্তমান আকারও যে মহাভারতের পূর্ববর্তী, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহাভারতেই স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করা যাইবে। প্রথম প্রমাণ—মহাভারতে প্রচুর পরিমাণে রামায়ণপ্রসঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোন আভাস নাই। রামায়ণ মহাভারতের পরে সঙ্কলিত বা রচিত হইলে তাহাতে নিশ্চয়ই মহাভারতের কোন না কোন প্রসঙ্গ থাকিত। অপরদিকে মহাভারতের বনপর্বে ২৭৭-২৯১ অধ্যায়ে রামায়ণকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, বাল্মীকিকে মহামুনি বলা হইয়াছে এবং দ্রোণপর্বের ১৪৩ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকে রামায়ণ হইতে উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে। উপরন্তু মহাভারতের কোন কোন কাহিনীতে রামায়ণের স্পষ্ট প্রভাব আবিষ্কার করা কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নহে। পৃথিবীজাতা সীতা ও যজ্ঞবেদীসমুত্থিতা দ্রুপদনন্দিনী, সীতাহরণ ও দ্রৌপদীহরণ, সীতার লাঞ্ছনা ও দ্রৌপদীর অপমান (বস্ত্রাকর্ষণ), পঞ্চপাণ্ডবের বনগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসন, রাম-অর্জুনের বাহ্যসাদৃশ্য—ইত্যাদি ব্যাপারে মহাভারতে রামায়ণ কাহিনীর ছায়াপাত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ভিণ্টারনিৎস্, হপকিন্স, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে অন্ততঃ রামায়ণকাহিনী মহাভারত অপেক্ষা নবীনতর। রামায়ণের ভাষাশিল্প ও ঘটনাবিন্যাস মহাভারত অপেক্ষা চমৎকার ও মহাকাব্যের অধিকতর নিকটবর্তী বলিয়া ইহাকে তাঁহারা নবীনতর বলিতে চাহেন। ইঁহাদের এই যুক্তিতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেবল শিল্পরূপ বিচার করিয়া কোন গ্রন্থের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। বরং বলা চলিতে পারে, রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের ঘটনা জটিলতর, বিশালতর, মহাকাব্যের বিরাট পটভূমিকায় অধিকতর সুষ্ঠু ; রামায়ণের মহাকাব্যোচিত বিশালতার সহিত গীতি-রসের সকরুণ মূর্চ্ছনা সমগ্র কাব্যটিকে একটি মানবিক রসানুভূতিতে পূর্ণ করিয়াছে। অপরদিকে, মহাভারতের স্পন্দমান জীবন-কল্লোলের মধ্যে পরবর্তী কালের ভারতবর্ষের দ্বন্দ্বসংঘাতমুখর বৃহদ্ জীবন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতে দক্ষিণভারতের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে মনে হইতেছে, মহাভারত রচনার পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত প্রমাণের বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রামায়ণকাহিনী মহাভারতকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীনতর, এবং বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের যে-রূপটি অদ্যাপি প্রচলিত, তাহা অধুনা-প্রচলিত মহাভারতের কাব্যরূপ অপেক্ষা প্রাচীন।

রামায়ণকে সাধারণতঃ মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আধুনিক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ রামায়ণকে মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও মহাভারতকে ঠিক মহাকাব্যের গৌরব দিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে রামায়ণের কাহিনী সংহত হইয়া যেরূপ মহাকাব্যের আকার লাভ করিয়াছে, মহাভারতের বৃহৎ ও জটিলকাহিনী ঠিক সেইরূপ সংহত আকার পায় নাই। বরং ইহাকে পুরাণ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ ইহাতে মহাকাব্যের বহির্ভূত অনেক অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, চরিত্র, রাজা-রাজবংশের বিবরণতালিকা, যুদ্ধবিগ্রহ, ভক্তিতত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রচুরপরিমাণে স্থান পাইয়াছে। মহাভারতের কাব্যরূপ মহাভারতপ্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে। উপস্থিতক্ষেত্রে রামায়ণপ্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, পূর্বে রামায়ণ গল্পকাহিনী বা Ballad আকারে প্রচলিত থাকিলেও বাল্মীকি ইহাকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও সংহত আকার দান করেন।

সাধারণতঃ মহাকাব্য তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে জনসাধারণের মনের উপযোগী কোন বিশেষ বা বিরাট ঘটনা অথবা কোন বীরপুরুষের জীবনকথা গল্প, উপকথা বা Ballad আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকে। কোন কবি হয়তো কোন একটি স্থানীয় ভাষায় এই গল্পগুলিকে রূপ দিয়া গানের দ্বারা প্রচার করিতে থাকেন। একই কাহিনী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় এবং বিশেষ বিশেষ জনপদে নানারূপ প্রচারলাভ করে। তখনও তাহা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে লঙ্কাবিজয় বা ট্রয়বিজয়কাহিনী ভারত এবং গ্রীসের ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপকথার আকারে প্রচলিত ছিল। ইহা নৃত্যগীতের মাধ্যমে জনসাধারণের মন হরণ করিত। রামায়ণকাহিনী কাব্যের আকার লাভ করিবার পূর্বে বিশাল ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ইহা নানা ধরনের উপগল্পের আকারে ছড়াইয়া ছিল। 'দশরথজাতক' ঐরূপ একটি উপকথার ভগ্নাবশেষ। এই আদিম ধরনের মহাকাব্যের উপাদান এখনও দেশে বিদেশে যে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা মনে হয় না। য়ুরোপে আদিম ধরনের মহাকাব্য গত শতাব্দীতেও বর্তমান ছিল। ফিন্ জাতির মধ্যে 'কালেওয়ালা' (*Kalewala*) এবং এস্টোনিয়দের মধ্যে 'কালেউইপোয়েগ' (*Kalewipoeg*) নামক দুইখানি গীতাত্মক মহাকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 'কালেওয়ালা' মহাকাব্যটি ফিন্ জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া গানের আকারে লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল।

১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা সর্বপ্রথম ফিনিস ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বত্রিশ সর্গে এবং বার হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ 'কালেওয়ালা' মহাকাব্যের গীতাত্মক রূপের আধুনিক দৃষ্টান্ত। হোমরের ইলিয়াড, অডিসি, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত প্রথমে এইরূপ গীতি-আখ্যানের আকারে প্রচলিত ছিল। তাহারই একটা আদিম রূপ ত্রিপিটকের দশরথজাতকে মিলিবে।

সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রথমশ্রেণীর মহাকবির আবির্ভাবের ফলে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যের সংহত আকারের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে থাকে। ইহাই যথার্থ মহাকাব্য, ভারতবর্ষের আর্ষ-মহাকাব্য, য়ুরোপের Authentic Epic-এর সহিত তুলনীয়। রামায়ণ-মহাভারত ইলিযাড-অডিসি, শাহ্‌নামা (ফের্দৌসী)—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি দীর্ঘকাল ধবিয়া মানবজীবনের মর্মমূলে রস সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। এই মহাকাব্যগুলি পরবর্তী কালে Ballad-এর গীতাত্মক রূপ ত্যাগ করিয়া লিখিত রূপ লাভ করিয়াছে। ইলিযাড প্রভৃতির সহিত জার্মান 'Edda' বা মহাকাব্য *Nibelungenlied*-ও উল্লেখযোগ্য।

মহাকাব্যের তৃতীয় স্তরকে কৃত্রিম মহাকাব্য বা Literary Epic বলা যাইতে পাবে। এই স্তরের মহাকাব্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা এবং প্রায়শঃই পুরাতন মহাকাব্য হইতে এই শ্রেণীর মহাকাব্যের উপাদান সংগৃহীত হয়। এই সাহিত্যিক বা কৃত্রিম মহাকাব্য সারস্বত সমাজের জন্য রচিত হয়, শিল্পমূল্যই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃহৎ জনতার সহিত ইহার বিশেষ যোগাযোগ না থাকিবারই কথা। ভার্জিলের *Aeneid*, Wolframvon Eschenbach-এর *Parzival* এবং Camoens-রচিত *Lusidas*, মিলটনের *Paradise Lost*, ভলতেয়রের *Henriad*, টমাস হার্ডির *The Dynasts*,* কালিদাসের রঘুবংশম্, মাঘের শিশুপালবধম্, ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ প্রভৃতি এই তৃতীয় পর্যায়ের মহাকাব্য। রামাযণ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘুবংশম্, ভট্টিকাব্য, রামচরিত (অভিনন্দ) প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্য এবং প্রাকৃত 'সেতুবন্ধ' কাব্যে সেই পরিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া যায়।

পাদটীকা—পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

॥ ২ ॥

রামভক্তিবাদ

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষ্ণভক্তিশাখা একাধারে দার্শনিক-তত্ত্ব ও জীবনচর্যারূপে জনসাধারণের মধ্যে সুপ্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কোন দার্শনিক শাখা বা ধর্মশাখা প্রাচীন ভারতে বিশেষ কোন গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। রামায়ণ প্রধানতঃ মহাকাব্য, এবং নরকুলচন্দ্রমা রামচন্দ্র বীরশ্রেষ্ঠপুরুষ-রূপেই দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণের সপ্ত কাণ্ডের মধ্যে বালকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বীরত্বব্যঞ্জক পৌরুষকে ভক্তির বিল্বদলে শুচিস্নিগ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের মতে এই দুই কাণ্ড বাল্মীকির রচিত নহে, মূল গ্রন্থেও ছিল না,—পরিবর্তী কালে রামচন্দ্র যখন ভাগবত সত্তার জ্যোতির্লোকে উপস্থাপিত হইলেন, তখনই রামভক্তিবাদ এই জাতীয় প্রক্ষেপ সৃষ্টি করিল। এখন দেখা যাক রামচন্দ্র কখন মর্ত্যসীমা ছাড়াইয়া দেবলোকে উন্নীত হইলেন।

বাল্মীকি রামচন্দ্রকে প্রধানতঃ মহাকাব্যের বীরনায়ক-রূপে অঙ্কন করিলেও মহাভারতের যুগে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। হয়তো মহাভারতের পূর্বেই বালকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডের এই ব্যাপার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণেও তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। কালিদাসের যুগে রঘুবংশের ১০ম সর্গে রামচন্দ্রকে অনুরূপভাবে বিষ্ণুর অবতার-রূপে প্রচার করা হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব হইতেই রামচন্দ্রকে ভক্তির সাহায্যে অভিষিক্ত করিবার রীতি বিশেষ প্রচার লাভ করিলেও প্রাচীন যুগে কৃষ্ণের মতো রামকে ঘেরিয়া বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই। দীর্ঘ কাল পরে, প্রায় খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতে কৃষ্ণভক্তিশাখার অনুরূপ রামভক্তিশাখার অভ্যুত্থান হয় বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১১১৭ খ্রীঃ অব্দে সুদূর কাশ্মীরে রামদেব নামক একজন বৌদ্ধ নৃপতি আরিগোম (শ্রীনগরের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত) নামক স্থানে নূতন করিয়া

---

* এখনও মহাকাব্যের ধারা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। আধুনিক গ্রীক-কবি কাজানৎজাকিস রচিত *The Odyssey—a Modern Sequel* এবং ফরাসী-কবি সাজন প্যার্স-রচিত *Amers* ('সৈকতচিহ্ন') নামক আধুনিক মহাকাব্য দুইখানি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে।

রামচন্দ্রের মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্বেও রামচন্দ্রের মন্দির বা বিগ্রহ ছিল; নৃপতি রামদেব তাহারই সংস্কার করেন।

১৩শ শতাব্দীতে দার্শনিক মধ্বাচার্য দক্ষিণ-ভারতের উদীপী হইতে ভারতের পূর্ব-উপকূলে পুরীধামে তাঁহার দুই জন শিষ্যকে রামসীতার আসল বিগ্রহ আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৩শ শতাব্দীতে শুধু কাশ্মীরেই নহে, দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে রামসীতার বিগ্রহ-উপাসনা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্বেই নিশ্চয় রামকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রদায় বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ ১৩শ শতাব্দীর পূর্বেই চৈত্রমাসে রামের জন্মোৎসব পালিত হইত। হেমাদ্রি (১৩শ শতাব্দী) নামক এক লেখক রামের জন্মোৎসব রচনা করিয়াছিলেন। ১০১৪ খ্রীঃ অব্দে জৈন লেখক অমিতগিরি রামচন্দ্রকে সর্বজীবের অধিকর্তা ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজের অনুপন্থী রামানন্দ (১২৯৯ খ্রীঃ অঃ) রামভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি রাঘবানন্দের নিকট ভক্তিবাদ শিক্ষা করেন এবং রামচন্দ্রকেই ভক্তাধীন উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন। তৎপন্থিগণ 'রামায়েৎ' নামে পরবর্তী কালে পবিচিত হইয়াছিলেন। রাম-সীতাকে বিষ্ণুলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত করিতেও অধিক বিলম্ব হয় নাই।

রামায়ণের প্রভাবে আরও তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ। ২৭ সর্গে সম্পূর্ণ এবং ১,৩৬০ শ্লোকে রচিত অদ্ভুত রামায়ণ বাল্মীকিব নামে প্রচারিত হইলেও ইহা অতিশয় আধুনিক কালের রচনা। সীতা রাবণের কন্যা—ইহাই এই কাব্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সাঙ্খ্যযোগ, ভক্তিবাদ এবং তন্ত্রাশ্রিত শাক্ততত্ত্ব অদ্ভুত কাহিনীর মারফতে বিবৃত হইয়াছে। সীতাকর্তৃক সহস্রশির রাবণবধ ইহার মৌলিক ঘটনা। ইহার ঘটনা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ইহাতে অর্বাচীন যুগের ভক্তিবাদের প্রাধান্যও সর্বাধিক। এই তিনখানি গ্রন্থেই শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করা হইযাছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামে প্রচারিত হইলেও, ইহা যে অর্বাচীন কালের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও কাহিনীপ্রসঙ্গে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা অধিকতর মূল্যবান্। এখানেও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মস্বরূপ। মহাদেব পার্বতীকে রামকাহিনী ও রাম-সংক্রান্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন—এইভাবে প্রতিটি সর্গ আরম্ভ হইয়াছে। উত্তরাকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ৫ম সর্গটি

'রামগীতা' নামে পরিচিত। উহাতে রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তাশ্রিত ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও বাল্মীকির নামে প্রচলিত। এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায় যে, বাল্মীকি ২৪,০০০ হাজার শ্লোকে যে সপ্ত-কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণের পূর্বখণ্ড; বশিষ্ঠ-রামায়ণ রামায়ণের উত্তরখণ্ড নামে অভিহিত হইতে পারে। রামচন্দ্র বৈরাগ্যবশতঃ বিষয়কর্মে উদাসীন হইলে বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ; ইহাতে ষড়দর্শনের নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এই কাব্যত্রয় হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরকালে ভক্তি ও দর্শনে মিলিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে কোথাও পূর্ণব্রহ্ম রূপে, কোথাও-বা বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রচার করিয়াছিল। ষড়্দর্শন, দ্বৈতবাদী ভক্তিবাদ, সাঙ্খ্যতত্ত্ব ইত্যাদি নানা দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্বালোচনা রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিযাছিল। রামচন্দ্রকে যখন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলা হইযাছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, রঘুপতিকে ঘেরিযা যেমন দার্শনিক তত্ত্ব গড়িযা উঠিতেছিল, তেমনি ধর্মসম্প্রদায়েরও উদ্ভব হইতেছিল। এই দার্শনিক তত্ত্ব অবশ্য বেদান্তেব ব্রহ্মতত্ত্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত। অদ্ভুত রামাযণে রামচন্দ্র সাঙ্খ্যযোগ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত কবিযা আপনাকে "সর্বব্যাপনশীল জ্ঞানময় শান্ত পরমেশ্বব" বলিয়াছেন। খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দীর পূর্বে রামকেন্দ্রিক কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা তত্ত্ববাদী দর্শনশাখা গড়িয়া উঠিযাছিল বলিয়া মনে হয় না। ১১শ শতাব্দীর পরে যখন সেইরূপ সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনও নূতন কোন দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব হয় নাই, তখন রামকেই পরমব্রহ্ম বলিয়া বেদান্ততত্ত্বকে স্বীকার করিযা লওয়া হইয়াছিল। রামানন্দপন্থিগণ পরবর্তী কালে (১৬শ শতাব্দী) রামচন্দ্রকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামকে ভক্তের ভগবান ও উপাস্য দেবতা-রূপে প্রথম প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইতেছে ১৫শ শতাব্দীর কৃত্তিবাস এবং ১৭শ শতাব্দীর তুলসীদাসের মধ্যে। কৃত্তিবাস রামাশ্রয়ী ভক্তিবাদ এবং তুলসীদাস দ্বৈতবাদী ভক্তির আর্দ্র আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তুলসীদাসেব ভক্তিবাদ সমগ্র উত্তরভারতকে অচিরে গ্রাস করিয়া লয়; কিন্তু কৃত্তিবাসের নামতত্ত্ব পরিবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে গৃহীত হওয়ার জন্য তাঁহাব গ্রন্থকে ঘেরিয়া বাঙলা দেশে বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।[৫]

---

৫ এই প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাঙলা দেশে কৃত্তিবাসের পূর্বে রামকাহিনীর বিশেষ প্রভাব থাকিবারই কথা। শুধু তুর্কী-আক্রমণের ফলেই যে পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের মহদাশ্রয়ের প্রতি পর্যুদস্ত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহা নহে। তুর্কীবিজয়ের পূর্বেও বাঙলা দেশে রামকাহিনী একেবারে অপরিচিত ছিল না। অভিনন্দের 'রামচরিত' বাঙলা দেশে রচিত হইয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' দ্ব্যর্থবোধক শ্লেষকাব্য হইলেও ইহার বাহ্যিক অর্থ রামায়ণকেই অবলম্বন করিয়াছে। বাঙলা দেশে বাল্মীকি-রামায়ণ যে বহুল প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ—রামায়ণের গৌড়ীয় পাঠ উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্যের পাঠের মতোই জনপ্রিয় হইয়াছিল। অবশ্য প্রাচীন বাঙলার শিল্প, শিলালেখ ও প্রত্নতত্ত্বে রাম ও সীতাব জীবনসংক্রান্ত বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণসত্যভামা, বিষ্ণুলক্ষ্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত যুগলমূর্তির শিল্পনিদর্শন ও লিপিলেখনেব উল্লেখই অধিক পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু রামায়ণোক্ত রামকাহিনী প্রাচীন বাঙলায় প্রধানতঃ মহাকাব্য রূপেই গৃহীত হইয়াছিল, কৃষ্ণকথার মতো ব্যাপক ভাগবত মহিমা লাভ করিতে পারে নাই। পরবর্তী কালেও কৃষ্ণায়ণ কাব্য, পদাবলীশাখা ও গৌড়ীয় ভক্তিমার্গের প্রভাবে রামায়ণ কাব্যলোক ত্যাগ করিয়া ভক্তিলোকে উধাও হইতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রামায়ণকাহিনীর সামান্য উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকার ৩৪ সংখ্যক পদে "রাআ রাআ রাআ রে, অবর বাঅ মোহরে বাধা" পংক্তিটিতে কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (উৎপত্তি প্রকরণ, ১৫শ-২০শ সর্গ)-বর্ণিত রাজা পদ্ম এবং রাণী লীলাসংক্রান্ত অধ্যাত্ম কাহিনীর প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন।[৬] অবশ্য এ সাদৃশ্য কষ্টকল্পিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোন কোন স্থলে রামায়ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাম্বূলখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের দূতী বড়ায়িকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলে কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা॥

এখানে রামায়ণের হনুমানের দৌত্যের কথা মনে পড়িবে। দানখণ্ডে কৃষ্ণের উক্তি—

৬ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু—চর্যাপদ

হনুমান মহাবীর হৈলা সারথী।
তঁবে কৈলেঁা সেতুবন্ধ আগ্নে দাশরথী ॥
মাইল ইন্দ্রজিত ভাযি লক্ষ্মণে।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে ॥

এখানে রামাযণের লঙ্কাকাণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে। বিদ্যাপতি প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গারপদ রচনা করিলেও রামসীতাবিষয়ক কিছু কিছু গান লিখিয়াছিলেন। মিথিলায় লোকমুখে তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। চৈতন্যপবিকর মুরারিগুপ্ত হনুমানেব অবতাব বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইযাছিলেন, এবং তিনি প্রথম জীবনে রামভক্ত ছিলেন—এ সংবাদও উল্লেখযোগ্য। যাহা হউক, কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রামসীতার বিষয়ে সামান্য উল্লেখ দেখা যায়, তবে এ কথা সত্য যে, তখনও রামসীতা বিগ্রহরূপে বাঙলা দেশে ঠাঁই পান নাই; যেটুকু উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহা রামসীতাকাহিনীর জনপ্রিযতা সূচিত কবিতেছে, কিন্তু এই সময়ে কোন রামভক্তিশাখা গডিযা উঠে নাই বলিয়া অনুমিত হয।

॥ ৩ ॥

কৃত্তিবাস-পরিচয়

গত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র বাঙলা দেশে—রাজমহল হইতে চট্টগ্রাম এবং উডিষ্যার উপকূল হইতে কামরূপ পর্যন্ত ভূভাগে কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বামাযণ পাঁচালী অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তাব করিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী বাঙালীর রসাবেশমুগ্ধ মর্ত্যচেতনাকে ভাবস্বর্গের তুরীয় লোকে লইয়া গিযাছে, মঙ্গলকাব্য তাহাকে কঠিন মৃত্তিকাতলে টানিযা আনিযাছে, আর রামায়ণ পাঁচালী তাহার গৃহজীবনের পরিচিত আদর্শকে মহত্তর মূল্য দিযাছে।

ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস ভগীরথের মতো সাধনা করিয়া পাবনী ভাগীরথী ধারার মতোই রামায়ণকথাকে বাঙালীর চিত্ততটে প্রবাহিত করিয়াছেন। অথচ যিনি বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে একটা উচ্চতর ও সুস্থ জীবনাদর্শের দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, মুরারি ওঝার পৌত্র সেই কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট তথ্যবহ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণপুঁথির নানা কাণ্ড এখনও বাঙলা দেশের যত্রতত্র

ছড়াইয়া আছে; সভ্যতার আলোক হইতে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রামাঞ্চলের গায়েন ও কথকগণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী আবৃত্তি করে এবং সুরে তালে গাহিয়া থাকে; আধুনিক কালে মুদ্রাযন্ত্রের যুগে এখনও যে কৃত্তিবাসের পুঁথি নকল হয় না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের সংস্পর্শে আসে। তাহার পরে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রিত হইলেও পুঁথি-নকলের রীতি হ্রাস পায় নাই। ছাপার যুগেও কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু নকল পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের যে সমস্ত পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহাদের অনেকগুলি ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নকল করা হইয়াছিল। একদা পুঁথিনকল পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। বিংশ শতকের প্রারম্ভেও সে আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কৃত্তিবাসের পরিচয়, আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থরচনাসম্পর্কিত প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। বড়ুচণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিলে এ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য লইয়া যত বিতর্কমূলক আলোচনা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসী আলোচনা জটিলতম এবং বহু মতভেদের কণ্টকে সমাকীর্ণ। বস্তুতঃ ফুলিয়ার মুখুটি বংশোদ্ভূত সুশীল পণ্ডিত কৃত্তিবাস, যিনি বাঙলা দেশের দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতেছে না—ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ কুলাচার্য ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত 'মহাবংশাবলী' (১৪৮৫ খ্রীঃ অঃ)[৭] নামক কুলপরিচয়-জ্ঞাপক গ্রন্থে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে: "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ। এইরূপ প্রাচীন উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়—

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥

এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগের গ্রন্থে কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অর্বাচীন কালের কুলজীগ্রন্থে ভরদ্বাজ গোত্রের মুখুটি গাঁই বর্ণনা-প্রসঙ্গে কুলাচার্যগণ কৃত্তিবাস পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

৭ ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য। ডক্টর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই গ্রন্থ ১৫০০-১৫১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলিকাতার বাংলা ছাপাখানা হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত জীবন ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য জানিবার জন্য সে যুগের বাঙালী পাঠক বিশেষ কৌতূহলী হয় নাই। শ্রীরামপুর-প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ (১৮০২-৩) বা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৮৩০-৩৪) কৃত্তিবাসের জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত হয় নাই। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' নামক পুস্তিকায় কাশীরাম দাস সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক দীর্ঘ আলোচনা করিলেও কৃত্তিবাসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, কোন তথ্যও পরিবেশন করেন নাই। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্র *The Calcutta Review* পত্রিকায় 'Bengali Literature' নামক যে প্রবন্ধ রচনা করেন[৮], তাহাতে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য থাকিলেও কৃত্তিবাসের কোন পরিচয় উদ্ধৃত হয় নাই। ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাস-পরিচয় মুদ্রিত করেন হরিশচন্দ্র মিত্র '৺কৃত্তিবাসের পরিচযসংগ্রহ' (ঢাকা হইতে প্রকাশিত) নামক একখানি পুস্তিকায় (১৮৭০ খ্রীঃ অঃ)। নিম্নে তাহা হইতে বারটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল :

মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি ॥
হইলেন তাঁহার পুত্র বনমালী নাম।
রাম ভক্ত অনুরক্ত নানাগুণধাম ॥
বাপ বনমালী ওঝা মান্‌কি উদরে।
কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে ॥
কৃত্তিবাস, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত ভাস্কর।
সবে সুপণ্ডিত অতি নানা গুণধর ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে জন্ম শুভক্ষণ।
ভাষা করি রচিলেন গ্রন্থ রামায়ণ।
পরম আদরে বন্দি তাঁহার চরণ।
গাইব রচিলা যেমন রামায়ণ ॥

হরিশ্চন্দ্র মিত্র রামায়ণগায়কদের নিকট কৃত্তিবাস-পরিচয়জ্ঞাপক পংক্তি কয়টি উদ্ধার করিয়া উক্ত পুস্তিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমাদের অনুমান, কুলজীগ্রন্থের

৮ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'মিত্র প্রকাশের সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধ রচনা করেন।

সহিত মিল রাখিয়া কোন রামায়ণগায়ক বা কথক এই আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বিবরণীটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১ম ভাগ) হরিশ্চন্দ্রের পুস্তিকার কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়। তিনিও কোন পুঁথিতে কৃত্তিবাসের পরিচয় পান নাই। পুঁথি হইতে তিনি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মাত্র এই কয়টি পংক্তি উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন ঃ

(১) ফুলিয়ার কৃত্তিবাস গায় সুধাভাণ্ড।
(২) রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস।
(৩) কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥

এই পংক্তিগুলি পরবর্তী কালের মুদ্রিত রামায়ণেও পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১ম) নামক গ্রন্থে আছে যে, ১৫৬৯ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। এই সনতারিখ তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলেন নাই। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং বটতলাপ্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামাযণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামক সংস্কৃত কলেজের এক পণ্ডিতের সংশোধন—তিনি এইটুকু সংবাদ দিযাছিলেন। রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে বলেন যে, কৃত্তিবাস ১৪৬০ শকে (১৫৩৮ খ্রীঃ অঃ) রামায়ণ রচনা করেন। এই সনতারিখের উৎস কোথায়, তাহা তিনিও নির্দেশ করেন নাই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' নামক পুস্তিকায়, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেবীবর ঘটকের কুলজীগ্রন্থের বর্ণনানুসারে সিদ্ধান্ত করেন যে, কৃত্তিবাস ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে রামায়ণ রচনা করেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধে বটতলা হইতে বহু কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইলেও সে যুগে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বাঙালী বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তজ্জন্য কেহ উদ্বেগও বোধ করে নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে'র (১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ অব্দ) প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও কবির পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার

করিতে পারেন নাই। বাংলা ১৩০৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের 'বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বিবরণ' নামক খণ্ডে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক নয়টি পয়ারপংক্তি উল্লেখ করেন। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে) কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কোন আত্মবিবরণী ছিল না। প্রথম সংস্করণের পাঁচ বৎসর পরে ১৯০১ সালে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তাহাতেই সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের স্বরচিত আত্মবিবরণ সমগ্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং তাহার পরেই কৃত্তিবাসের পরিচয় জানিবার জন্য বাঙালী পাঠক কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। এত দিনে কৃত্তিবাসের যথার্থ বিবরণ পাওয়া গেল বলিয়া সকলেই তৃপ্তিলাভ করিলেন। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কৃত্তিবাসের পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা করিলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সাহিত্যপরিষদ-পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হইয়া যায়; এই কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বাংলা ১৩০২ সালে (১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে "কৃত্তিবাস রামায়ণসমিতি" গঠিত হয়। কৃত্তিবাসের বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের অভিপ্রায়ে হীরেন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড এবং ১৩১০ সালে উত্তরাকাণ্ড মুদ্রিত করেন। তিনিও, "কৃত্তিবাস অন্যূন ৪৫০ বৎসরের লোক", ইহার অধিক তথ্য সংগ্রহ কবিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে বিভিন্ন গবেষক—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের পরিচয় ও পুঁথি লইয়া মৌলিক গবেষণা করিয়া অনেক নূতন তথ্য উদ্ধার করেন। তথাপি এখনও কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সমস্ত রহস্যের সমাধান হয় নাই। গবেষকগণের গবেষণার ফলে সমস্যা কেবলই জটিলরূপ ধারণ করিতেছে, একের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সহিত অন্যের তথ্যসিদ্ধান্তেরও মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। কোন দুইজন গবেষকই কৃত্তিবাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে একমত হইতে পারেন নাই।

প্রধানতঃ কৃত্তিবাসের তথাকথিত 'আত্মবিবরণ' এবং কুলজীগ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যের দ্বারা কৃত্তিবাসের আবির্ভাব, পারিবারিক পরিচয় ও রামায়ণ রচনার কাল নির্ধারিত হইয়া থাকে। আমরা প্রথমে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বর্ণনার তথ্যবিচার করিয়া তাহার পরে কুলজীগ্রন্থে-ধৃত তথ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিব।

কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়॥

এ পর্যন্ত বাঙলা দেশে কৃত্তিবাস লইয়া যত গবেষণা হইয়াছে, তাহার পনের আনা অংশ কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় সংক্রান্ত তথ্যাদি লইয়াই বিব্রত। এই আত্মবিবরণীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোয়েন্দাবুদ্ধির শরণ লইতে হইবে। কারণ তথাকথিত 'আত্মবিবরণ' লইয়া যে 'কারচুপি' চলিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, ১৩০৪ সালে 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' 'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকাণ্ডে' নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত্তিবাসের 'আত্মপরিচয়'-শীর্ষক পয়ারের প্রথম নয় ছত্র উদ্ধৃত করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১ খ্রীঃ অব্দ) সমস্ত পরিচয়টুকু উল্লেখ করেন। অথচ কৃত্তিবাসী পুঁথিসমূহে এই আত্মপরিচয়ের বিশেষ কোন চিহ্নই নাই। নগেন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র তাহা হইলে কোন্ পুঁথি হইতে এই পয়ারগুলি পাইলেন?

বাঁকুড়া ও হুগলী জিলার সীমায় অবস্থিত বদনগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ কথক তাঁহার অনেকগুলি পুঁথি উক্ত গ্রামবাসী প্রাচীন সাহিত্যামোদী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভক্তিনিধি পুঁথির বাণ্ডিলের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি প্রাচীন পুঁথিতে (১৫০১ খ্রীঃ অঃ) কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ার পাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হারাধন দত্তের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। ভক্তিনিধি মহাশয় পূর্বোক্ত পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয়জ্ঞাপক পয়ারগুলি নকল করিয়া দীনেশচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা মুদ্রিত করেন। তাহার পরে এই আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া গৃহীত হয় এবং ইহা অবলম্বনে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে দুই বার (সন ১৩১৮ ও ১৩৪০ সাল) কৃত্তিবাসের আবির্ভাব সন গণনা করেন। ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন যে, বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি নগেন্দ্রবালা মুস্তফী নাম্নী মুস্তফীপরিবারের এক বধূর নিকটে ঐ পুঁথিগুলি বিক্রয় করেন। অবশ্য হারাধন দত্তের নিকটেও ঐ পুঁথির নকল ছিল। ইতিমধ্যে নগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করেন (১৩১৩ সাল); তৎপরে উল্লিখিত আত্মপরিচয়জ্ঞাপক মূল

পুঁথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হারাধন দত্তের নিকট যে নকল ছিল, তাহাও অদৃশ্য হইয়া যায়। যত দিন ভক্তিনিধি মহাশয় জীবিত ছিলেন, তত দিন তিনি কাহাকেও মূল পুঁথি বা তাহার নকল দেখান নাই। (দীনেশচন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে আত্মপরিচয়টুকু নকলের আকারেই পাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' যে নয় পংক্তি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয় ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রেরিত কোন নকল হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। মূল পুঁথি, যাহা নগেন্দ্রবালা মুস্তফী কিনিয়াছিলেন, এবং উহার নকল, যাহা হারাধন দত্তের নিকট ছিল বলিয়া প্রচারিত, উহাদের দুইখানিরই কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই বলিয়া কৃত্তিবাসের তথাকথিত 'আত্মবিবরণ' কত দূর প্রামাণিক, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া দুরূহ। অনেকে মনে করিলেন যে, হারাধন দত্তের উক্ত পুঁথি এবং তাহাতে উদ্ধৃত আত্মবিবরণ যথেষ্ট প্রামাণিক নহে; কেহ বলিলেন, ঐ পুঁথির অস্তিত্বই নাই।) ১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' নামক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "এখন মনে হইতেছে, ইহা বুঝি সেই সাপের পা ও ও ডুমুরের ফুল স্বরূপ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি, যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ লোকের চর্মচক্ষে ভিড়ে না।" (কিন্তু ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত চারি খানি কৃত্তিবাসী পুঁথির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ারগুলি অলীক নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে বর্ণিত কৃত্তিবাসী কাহিনীর সহিত প্রচলিত আত্মবিবরণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মূল পুঁথি বা তাহার নকল কোথায় গেল, সে বিষয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩৪৯ সালের 'ভারতবর্ষে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নলিনীকান্ত "কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ" নামক প্রবন্ধে পুঁথি নিখোঁজ হওয়ার রহস্যকে অনেকটা সরল করিতে পারিয়াছেন।)

যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা ১৩২০ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যখন কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনও স্বর্গীয় হারাধন দত্তের বাড়ীতে পুঁথির নকল ছিল। পরে যোগেশচন্দ্র সন্ধান করিয়াও ঐ পুঁথি বা নকলের কোন সূত্র পান নাই। ইহার অনেক পরে (ডঃ ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট রক্ষিত কুলজী পুঁথিগুলি ক্রয় করিবার চেষ্টা করেন। তাহার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার

পূর্ব্বোত্ত সাক্কত দখবাণ্ডব

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র শরণং ॥ রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াপতয়ে নমঃ ॥
রামলক্ষণ পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয় ধার্মিকং
রাজেন্দ্রং সত্যসিন্ধুং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিং বন্দেলোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রা
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের পুঁথি

অধ্যক্ষ ডক্টর সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত পুঁথির তালিকা প্রস্তুত করিতে প্রেরণ করেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পুঁথিসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া দেখেন যে, "কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-সম্বলিত ত্রিপত্রাত্মক কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের একখানা পুঁথির আরম্ভ মাত্র আছে।" সুবোধচন্দ্র ঐ পুঁথির নকল লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ তাহার অনুমতি দেন নাই।) সুবোধচন্দ্রের মতে প্রচলিত আত্মবিবরণ এবং বসু মহাশয়ের কাছে রক্ষিত ঐ ত্রিপত্রাত্মক খণ্ডিত পুঁথিতে বর্ণিত আত্মবিবরণ প্রায় একপ্রকার। যাহা হউক, নগেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুঁথি বিক্রয়ে সম্মত হন নাই। তখন ভট্টশালী অনুমান করিলেন যে, যখন দীনেশচন্দ্র, স্টেপল্‌টন সাহেব ('ঢাকা রিভিউ'), নলিনীকান্ত, যোগেশচন্দ্র প্রভৃতি গবেষকগণ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ লইয়া নানা দ্বিধাসংশয়ের মধ্যে কোন কূলকিনারা পাইতেছিলেন না, তখনও ঐ পুঁথির খণ্ডিত অংশ (পৃষ্ঠা ১-৩) নগেন্দ্রনাথের কাছে ছিল; কিন্তু তিনি ঐ আত্মবিবরণী প্রকাশ করিয়া সমস্যা সমাধানে কেন অগ্রসর হইলেন না, তাহা এক রহস্যের ব্যাপার।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুর পর ভট্টশালী বাংলা ১৩৪০ সালে বসু মহাশয়ের উত্তরাধিকারীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঐ পুঁথিগুলি ক্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণমূলক ঐ তিনখানি পৃষ্ঠাও ছিল (মুদ্রিত চিত্রলিপি দ্রষ্টব্য)। ভট্টশালী দেখিলেন যে, ঐ তিনখানি পত্র কোন একটি পুঁথির প্রথম দিকের খণ্ডিতাংশ। পুঁথির পৃষ্ঠাগুলি তুলোট কাগজের, লিপি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। পুঁথিটি বাংলা ১২৪০ সালের নকল। সুতরাং এতদিন ধরিয়া হারাধন দত্তের নিকট সংরক্ষিত ১৪২৩ খ্রীঃ অব্দের যে পুঁথির কথা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা অলীক। ভট্টশালী মহাশয় প্রচলিত আত্মবিবরণী এবং ঐ তিন পত্রে বর্ণিত আত্মবিবরণ মিলাইয়া দেখিলেন যে, ঐ তিনখানি পত্রের বিবরণীতে পরে কেহ (হারাধন দত্ত?) হস্তক্ষেপ করিয়া ইচ্ছামত শব্দ বা পংক্তি বদলাইয়া লইয়াছেন, নূতন পংক্তি যোগ করিয়াছেন। এতদিন পরে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-সংক্রান্ত রহস্যের সন্ধান মিলিল। এই তিনখানি পত্রযুক্ত পুঁথিটিই (খণ্ডিত) নিরুদ্দিষ্ট পুঁথি—যাহা হারাধন দত্তের অধিকারে ছিল, হয়তো নগেন্দ্রবালা মুস্তফী ইহাই কিনিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট কেমন করিয়া আসিল, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

নলিনীকান্ত পুঁথিটির তিনখানি পত্র তো পাইলেন। কিন্তু পুঁথির অবশিষ্ট অংশ কোথায় গেল? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত ১৫নং পুঁথিখানিই বোধহয় সেই নিরুদ্দিষ্ট পুঁথির অবশিষ্টাংশ। সাহিত্য পরিষদের পুঁথি চারি পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহার কাগজ, আকার, ও লেখা পূর্বতন তিন পত্রের সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে। নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট সংরক্ষিত ঐ তিনখানি পৃষ্ঠার সর্বশেষে আছে—

কাহা হইতে রামনাম হবেক প্রচার ॥
নারদ বলেন গোসাঞি শুন মোর বাণী।

সাহিত্য পরিষদের পুঁথির আরম্ভের ৪ পৃষ্ঠায় আছে—

অত্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি ॥
তাহার ঘরেতে হবে বিষ্ণু অবতার।
তিহোঁ শ্রীরামের কথা করিবেন প্রচার ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নারদের উক্তির প্রথম পংক্তিটির ('নারদ বলেন গোসাঞি শুন মোর বাণী') সহিত সাহিত্য পরিষদের পুঁথির প্রথম পংক্তির ('অত্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি') পূর্ণ সঙ্গতি আছে। উপরন্তু সাহিত্য পরিষদের পুঁথির পুষ্পিকায় আছে—

"লিখিতং শ্রীপিতমলাল সুকুল। সাকিম সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠনার্থে শ্রীরঘুনাথ ভকত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ। সন ১২৪০ বারসও চল্লিশ সাল তারিখ ২৮ আঠাস্যা কার্ত্তিক রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন প্রহরে সমএ সমাপ্ত হইল।"

এই পুঁথিটি বদনগঞ্জে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের নিকট ছিল, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অতএব নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকটে রক্ষিত তিন পৃষ্ঠা এবং সাহিত্য পরিষদের ১৫নং পুঁথি একই পুঁথির অংশ। পুঁথির প্রথম তিনখানি পত্র নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট কেমন করিয়া আসিল, এবং অবশিষ্টাংশই-বা সাহিত্য পরিষদে কি করিয়া রহিল—তাহার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। সাহিত্য পরিষদের পুঁথির বিবরণীতে হুগলী জেলা হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, শুধু এইটুকু উল্লেখ আছে।

এই পুঁথির আত্মবিবরণ এবং দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ধৃত আত্মবিবরণে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। হারাধন দত্ত দীনেশচন্দ্রকে এই বিবরণীটুকু লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানই স্বাভাবিক যে, দত্ত মহাশয়ের অনবধানতাবশতঃ দীনেশচন্দ্রকে প্রেরিত বিবরণী

ও তাঁহার কাছে রক্ষিত পুঁথির বিবরণীতে কিছু কিছু বৈষম্য বা ভুলভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এখানে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত বিবরণীর কিয়দংশ মুদ্রিত হইল :

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্র বাড়য় সন্ততি।
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
শত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্য্যায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়ায়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হইল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
*   *   *
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য) মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
*   *   *
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥

কবি বিদ্যার্জনের পর গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি।
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥

কবি নয় দেউড়ী পার হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রাজা পাত্র-মিত্রসহ মাঘমাসের খরা পোহাইতেছেন,

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥

*   *   *

রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাতশ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুশি হইয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

*   *   *

চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মূল পুঁথির আত্মবিবরণী উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং পরবর্তী কালে বহুলভাবে

প্রচারিত 'আত্মবিবরণ'টিতে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, উহার ভাষাতেও আধুনিক কালের ছায়া পড়িয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী মূল পুঁথি হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ সাল), এখানে তাহা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হইল।

।। মূল পুঁথির পাঠ ।।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

অথো আদিকাণ্ড আরম্ভ

আদিকাণ্ড রামাযণ শুনহ কাহিনি।
প্রথম কাণ্ড রামায়ণ মধুরসবানি ।।
পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ।।
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড় ওঝা আইল গঙ্গাতীর ।।
সুখ ভোগ কর্য্যা বিহরএ গঙ্গাকুলে।
বসতি করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ।।

*   *   *

গ্রামরত্ন ফুলিয়া জে জগতে বাখানি।
দক্ষিণ পস্চিম চাপ্যা বহেন গঙ্গা সোনি ।।
ফুলিয়া চাপিআ হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্রপৌত্রে বাড়এ সন্ততি ।।

*   *   *

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমি পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মর্দ্ধে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ।।

*   *   *

এগাড নীবড়ে যখন বারতে প্রবেস।
হেনবেলা পড়িতে গেল্যাম উর্ত্তর দেস ।।
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে সুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার ।।

*　　*　　*

সাত শ্লোকে ভেটিল্যাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহসম রাজা আমি করিলাম গোচর ॥

*　　*　　*

মুখটী বংশ ওঝা বংশ সংসার বিদিত।
তথি উপজিল এই কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বনমালি রোঝা মানিকী উদরে।
জনম লইলাম রোজা ছয় সহোদরে ॥*

সুতরাং দেখা গেল যে, দীনেশচন্দ্র-উদ্ধৃত 'কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে' অনেক হস্তক্ষেপ ঘটিলেও উহা অলীক বা অযথার্থ নহে। নলিনীকান্তের এই আবিষ্কারের পর আত্মবিবরণীটির জাল অপবাদ খণ্ডিত হইল। আত্মবিবরণীর প্রামাণিকতার আরও নিদর্শন মিলিয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Oriental Texts Publications Committeeর উদ্যোগে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য গ্রন্থমালা'র চতুর্থ গ্রন্থরূপে "মহাকবি কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণে"র আদিকাণ্ড টীকাটিপ্পনীসহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া মিশ্ররচনের কাব্যখানি ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি চারিখানি পুঁথির উল্লেখ করেন যাহাতে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের অংশতঃ উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে দুইখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে (১২ নং এবং ১২৪ নং), একখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৭১ নং) এবং একখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে (K 488)। নিম্নে ঐ পুঁথির প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করা যাইতেছে।

॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি ॥

(ক) পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কিত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কিত্তিবাস ছয় সহোদর ॥
পঞ্চভাই পণ্ডিত কিত্তিবাস গুণসালি।
অনেক শাস্ত্র পঢ্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালি।
শুনিতে অমৃতধার লোকেতে প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তিবাস ॥ (পুঁ সংখ্যা—১২)

উদাহরণস্বরূপ কেবল প্রাসঙ্গিক ছত্রগুলি উদ্ধৃত হইল।

(খ) কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতী॥
মুখুটি বংষে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাঝে কির্ত্তিবাস যে পণ্ডিত॥
পিতা বনমালি মাতা মানিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর‍্যা বেড়ায় বিস্তার উদ্ধার॥
বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥ (পুঁ. সংখ্যা—১২৪)

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ॥

(গ) রাড দেস ফুলিয়া জার নাম।
মুখুটি বংশেতে জর্ম্ম অতি অনুপাম॥
বাপ বনমালি মা মানকির উদরে।
ছয় ভুজা জন্মিলেন ছয় সহোদরে॥
ছোটর বন্দো বডর বন্দো বড গঙ্গার পার।
জথা তথা করিয়া বেডান বিস্তার উদ্ধার॥
রাড়া মধে বন্দিনু আচায চুডার্মণি।
জার ঠাই কির্ত্তিবাস পডিলা আপুনি॥ (ক বি. পুঁ. সংখ্যা—১৭১)

॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ॥

(ঘ) চতুর্দ্দিক ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী॥
মুকুটি বংশে জন্ম সংসারে বিদীত।
তথাএ উপজিল কির্ত্তিবাস পণ্ডিত॥
বাপ বনমালী মাও মালীকা উদরে।
জন্ম লভিল পণ্ডিত ছয় সহোদরে॥
মাও মালিকা জার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয়জন সর্ব্বগুণে জানি॥
সরস কবিতা বাক্য লোকেতে প্রকাশ।
ফুলিঞা নগরে বাশ হেন কীর্ত্তিবাশ॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে স্বরস্বতী।
ধ্যান করি বশী দেখে শভার আরতি॥

(ঢা বি. পুঁ. সংখ্যা—K 488)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব হইতে কৃত্তিবাসের পরিচয়-জ্ঞাপক কিছু কিছু তথ্য পুঁথিপত্রে উল্লিখিত ছিল। হারাধন দত্তের পুঁথি (নলিনীকান্ত-সংগৃহীত) ১২৪০ (১৮৩৩-৩৪ খ্রীঃ অঃ) সালে লিপীকৃত হইয়াছিল; উল্লিখিত চারিখানি পুঁথিও বিশেষ প্রাচীন নহে, ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে লিখিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতক এবং পরবর্তী কালে লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুঁথিতে কৃত্তিবাসের পরিচয়জ্ঞাপক পয়ারছত্র পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে ১৫২টি ছত্র এবং ভট্টশালী-আবিষ্কৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে (নগেন্দ্রনাথের হেফাজতে রক্ষিত পুঁথি) ১৮২টি পংক্তি পাওয়া যাইতেছে। উভয় বর্ণনার ৫০টি ছত্র অবিকল একরূপ; কিন্তু অবশিষ্ট ১০০ পংক্তিতে সাদৃশ্য অল্প, কোথাও-বা নূতন শব্দ ও পংক্তি সংযোজিত। নলিনীকান্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত বিবরণীতে বহু হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে, হারাধন দত্ত যখন দীনেশচন্দ্রকে নকল করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন এইরূপ অজস্র পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় প্রায় ১০০ পংক্তিতেই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই মত মানিয়া লইতে কিছু সঙ্কোচ হয়। তবে সত্যকে স্বীকার করিতেই হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত যে চারখানি পুঁথির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসেব পরিচয় অতিশয় সংক্ষিপ্ত, ৮ হইতে ১২ পংক্তির অধিক নহে। দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে এবং ভট্টশালীর সংগৃহীত পুঁথিতে এই বর্ণনা বিস্তৃততর; কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ, পিতামহ, পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, পাঠশিক্ষা, গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। অপর দিকে উক্ত চারিখানি পুঁথিতে শুধু ফুলিয়া গ্রাম, কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, মাতা মেনকা (মানিকি, মানকি, মালীকা), ছয় সহোদর, ছোটগঙ্গা বড়গঙ্গা পারে বিদ্যাভ্যাসে যাত্রা—মাত্র এইটুকু তথ্য আছে। নিম্নে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের বিবরণ এবং ভট্টশালীর পুঁথির বর্ণনা অনুসারে কৃত্তিবাসের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

পূর্বে বেদানুজা মহারাজার পাত্র (মতান্তরে পুত্র) নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গে বাস করিতেন। পূর্ববঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত হইলে নিরাপদ আশ্রয় পাইবার জন্য ওঝা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে এক গ্রামে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে পূর্বে মালীরা ফুলবাগান করিয়া বাস করিত, তাই তাহার নাম ফুলিয়া। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিত। এই ফুলিয়া গ্রামে নারসিংহ ওঝা পুত্রপৌত্রাদি লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র—মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভৈরবের রাজসভায় বিশেষ সম্মান ছিল। অপর পুত্র বনমালী। বনমালীর ছয় পুত্র, এক কন্যা। কৃত্তিবাস জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। মুখুটিবংশে শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য মাঘমাসে আদিত্যবার (রবিবার) কৃত্তিবাসের জন্ম। কৃত্তিবাস এগার হইতে বার বৎসরে পদার্পণ করিয়া, উত্তরবঙ্গে বড়গঙ্গা পারে অর্থাৎ পদ্মাপারে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করিলেন। বিদ্যার্জনের পর গুরুদক্ষিণা দিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজাব নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সপ্তঘটি বেলায সভা ভঙ্গ হইলে দ্বারী কৃত্তিবাসকে রাজার নিকট লইয়া গেল। কবি নয় মহল পার হইয়া স্বর্ণরৌপ্যখচিত কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন সভাশেষে পাত্রমিত্র পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। রাজার দক্ষিণে পাত্র জগদানন্দ, পার্শ্বে ব্রাহ্মণ সুনন্দ, বামে কেদাব খাঁ, দাহিণে নারায়ণ—সভাশেষে ইহাদের লইয়া গৌড়েশ্বর হাস্য-পরিহাস করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত আরও সভাসদ (কেদার রায়, তরণী, শ্রীবৎস্য, রাজপণ্ডিত মুকুন্দ, মহাপাত্রের পুত্র জগদানন্দ) রহিযাছেন। চারিদিকে নাটগীতি হইতেছে। আঙ্গিনায় রাঙা মাজুরি পড়িয়াছে, তাহাব উপর পাটের সূক্ষ্ম বস্ত্র পবিবৃত। মাথার উপবে পাটের চাঁদোযা শোভা পাইতেছে। মাঘমাসের প্রভাতে পাত্রমিত্রসহ মাজুরির উপর বসিয়া গৌড়েশ্বর 'খরা' পোহাইতেছেন। রাজার ইঙ্গিতে কৃত্তিবাস তাঁহার নিকটে গিয়া সাতটি শ্লোক পড়িলেন। রাজা খুশি হইয়া কবিকে পুষ্পমালা দিলেন, কেদার খাঁ কবির শিরে চন্দনের ছড়া বর্ষণ করিলেন, রাজা কবিকে একখানা পাটের পাছড়াও দান করিলেন। পাত্রগণ কবিকে বলিলেন, গৌড়েশ্বরের নিকট যা চাহিবে তাই পাইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কবি শুধু গৌরব ভিন্ন আর কিছু লইতে সম্মত হইলেন না। কবি রাজসভার বাহিরে আসিলে লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য

করিতে লাগিল। সকলে বলিল, মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাল্মীকি মুনি, আর পণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস পণ্ডিত। বাপমায়ের আশীর্বাদে এবং গুরুর কল্যাণে জনসাধারণের জন্য দেবতার সৃষ্ট সাতকাণ্ড রামায়ণ অবলম্বনে কৃত্তিবাস রামায়ণ গান রচনা করিলেন।

দীনেশচন্দ্র ও নলিনীকান্তের উদ্ধৃতির মধ্যে অনেক বৈষম্য সত্ত্বেও এইরূপ মোটামুটি সাদৃশ্য আছে। এই বিবৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গবাসী নারসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার পাত্র ছিলেন। ঐ অঞ্চলে প্রমাদ হইলে (সম্ভবতঃ মুসলমানের অধিকার) নারসিংহ ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধর মুরারি ওঝা, তাঁহার পুত্র বনমালী, বনমালীর ছয় পুত্র (মতান্তরে সাত), এক কন্যা। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস মাঘ-মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মলাভ করেন এবং দ্বাদশ বৎসরে উত্তরবঙ্গে পদ্মাতীরে বিদ্যাজনের জন্য যাত্রা করেন; সেখানে দশ বার বৎসর অধ্যয়ন করিয়া যৌবনবয়সে গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান লাভ করেন এবং মাতাপিতা ও গুরুর আদেশে রামায়ণ পাচালী রচনা করেন। এই বর্ণনা হইতে কয়েকটি তথ্য লক্ষণীয়: (ক) কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের কোন এক বেদানুজ রাজার সভাসদ ছিলেন। (খ) কৃত্তিবাস পুণ্য মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে (রবিবার) জন্ম গ্রহণ করেন। (গ) বিদ্যার্জনের পর গৌড়েশ্বরের সভায় সম্মান লাভ করেন। এখন বেদানুজ রাজা ও গৌড়েশ্বরের সন্ধান করিতে পারিলেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল মোটামুটি স্থির করা যাইবে।

১। বেদানুজ রাজা।। দীনেশচন্দ্র তাহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণসূচক যে পয়ারগুলির উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'বেদানুজ' মুদ্রিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র অনুমান করিয়াছিলেন, ইহা 'যে দানুজ মহারাজা' হইবে। ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে দনুজ নামধারী তিন জন বাঙালী রাজার নাম পাওয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে দনুজমাধব বা রায়দনুজ নামক এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আবার ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ অব্দে দনুজমদনদেব বাঙলায় প্রাধান্য লাভ করেন।[১] চন্দ্রদ্বীপে দনুজরায় নামক আর-এক রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিংবদন্তী বাদ দিলে ইতিহাসে অন্ততঃ

১ ইঁহার নামে প্রচারিত সুবর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইনি রাজা গণেশ।

দুই জন দনুজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একজন দনুজমাধব, দনুজরায় বা দনুজামাধব। ইনি ১২৮০ খ্রীঃ অব্দে বল্‌বনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোনার গাঁয়ের রাজা দনুজরায়ের সহিত তুঘরল খাঁয়ের (১২৬৮-৮১ খ্রীঃ অঃ) বিরোধের কথা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইদিলপুরের ঘটকদের গ্রন্থে দেখা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক বরিশাল) দনৌজরায় কায়স্থ নামক একজন রাজার দ্বারা স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যাঁহাকে সোনার গাঁয়ের 'রায়' (অর্থাৎ রাজা) দনৌজরায় বলিয়াছেন, এবং ঘটকদের চন্দ্রদ্বীপের দনৌজরায় কায়স্থ একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদশরথ দনৌজামাধব তুঘরলের পূর্বে সেনরাজাদের অধিকারভুক্ত সোনার গাঁয়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর এক দনুজমর্দনের নামে যে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ১৪১৭-১৮ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি মুদ্রিত হইয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে, শেষোক্ত দনুজমর্দন যেই হউন, নারসিংহ ইঁহার সময়ে বর্তমান ছিলেন না। সম্ভবতঃ নারসিংহ ওঝা পূর্বোক্ত দনুজরায়ের (চন্দ্রদ্বীপের রাজা) পাত্র ছিলেন। যে দনুজ ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, নারসিংহ তাঁহার পাত্র হইলে ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাসের জন্ম হওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে।

দীনেশচন্দ্র 'বেদানুজ'কে 'দনুজ' করিযা লইযাছেন। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন করিয়া লওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? দীনেশচন্দ্রের নিকট হারাধন দত্তের যে লিখিত বিবরণ ছিল, তাহাতে 'বেদানুজ'-ই ছিল, নলিনীকান্ত ভট্টশালী নগেন্দ্রনাথ বসুর নিকট যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও 'বেদানুজ মহারাজা' আছে। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের দনুজরায়ের তারিখ ধরিয়া নারসিংহ ওঝার তারিখ নির্ণয় কিছু সন্দেহজনক হইয়া পড়িতেছে। তাই কোন কোন গবেষক বেদানুজকে বেদানুজ নামে পৃথক কোন রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন,[১০] এবং কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ে দনুজ-বেদানুজ প্রসঙ্গ পরিহার করিতে চাহেন। যদি এমন প্রমাণ করা যায় যে, দীনেশচন্দ্রের বিবরণ এবং নগেন্দ্রনাথের পুঁথি অন্য কোন আদর্শ পুঁথি হইতে গৃহীত, যাহাতে 'দনুজ মহারাজা'ই ছিল, তাহা হইলে নারসিংহ ওঝার কালনির্ণয়ে এই নামটির প্রয়োজন আসিতে পারে। কিন্তু যেহেতু কৃত্তিবাসের পরিচয়জ্ঞাপক

১০ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ, ৯৯-১০০

বিবরণটি উপস্থিত ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন উৎস হইতে পাওয়া যায় নাই, সেই হেতু বেদানুজ-দনুজ সমস্যার আশু মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু 'বেদানুজ' প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও নারসিংহ ওঝা, ১৩শ শতকের শেষের দিকেই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন; তাহা না হইলে চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে কৃত্তিবাসকে পাওয়া যায় না।

/২। **কৃত্তিবাসের জন্মসন॥** যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সর্বপ্রথম (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮ সাল) জ্যোতিষগণনার সাহায্যে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র-উদ্ধৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীর মধ্যে আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

যোগেশচন্দ্রের পূর্বে প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু এবং দীনেশচন্দ্র সেন কৃত্তিবাসের জন্মসন নির্ধারণের চেষ্টা করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে ১২৫৭ শক (১৩৩৫ খ্রীঃ অঃ), নগেন্দ্রনাথের মতে ১৩৩৫ শক (১৪১৩ খ্রীঃ অঃ) এবং দীনেশচন্দ্রের মতে ১৩৮০ খ্রীঃ অব্দ কৃত্তিবাসের জন্মসন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ১৩১০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র 'খনা' নামক একটি প্রবন্ধে অনুমান করিয়াছিলেন, ১৩৭৮ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। পরে তিনি দেখিলেন, এই দুইটি সনই ভুল। ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় পুনরায় গণনা করিয়া দেখিলেন যে, ১২৫০ হইতে ১৭৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে (১৩৩৭ খ্রীঃ অঃ) ৩০এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খ্রীঃ অঃ) ২৯এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ২৮ দণ্ড। 'পূর্ণ মাঘ মাস' বলিতে মাঘ মাসের সমাপ্তি বুঝাইলে এই দুই সনের কোন একটিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিবে। ১২৫৯ শকের (১৩৩৭ খ্রীঃ অঃ) ভোরে বা ১৩৫৪ শকের (১৪৩২ খ্রীঃ অঃ) রাত্রিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হইতে পারে। ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে মাঘ মাসের শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাসের শেষ। যোগেশচন্দ্রের মতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খ্রীঃ অঃ). ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রিতে।

/যোগেশচন্দ্রের এই জ্যোতিষিক গণনা আর-একদিক দিয়া সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ হইতে মনে হইতেছে যে, তিনি কোন

হিন্দু রাজার সভায় গিয়াছিলেন, মুসলমান সুলতানের নহে। ১৪৩২ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে তিনি অন্ততঃ বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে (আনুমানিক ১৪৫২ খ্রীঃ অঃ) গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন। তখন শেষ পর্যায়ের ইলিয়াসশাহী বংশধর নাসিরুদ্দিন মাহ্মুদ (১৪৪২-৫৯ খ্রীঃ অঃ) গৌড়ের সুলতান। সুতরাং 'পূর্ণ মাঘ মাস' অনুসারে জ্যোতিবিক গণনা করিলে গৌড়ের সিংহাসনে কোন হিন্দু রাজাকে পাওয়া যাইতেছে না। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অনুরোধে যোগেশচন্দ্র 'পূর্ণ' শব্দকে 'পুণ্য' ধরিয়া বিচারে অগ্রসর হইলেন। কারণ পুরাতন বাংলা লিপিতে 'পুণ্য' এবং 'পূর্ণের' মধ্যে লিপিগত বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। তাই যোগেশচন্দ্র 'পুণ্য মাঘ মাস' ধরিয়া গণনা করিয়া[১১] নিম্নলিখিত সনতারিখগুলি পাইলেন।/

১৩০৮-২০ শকের (১৩৮৬-৯৮ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবার ৫ দণ্ড পর্যন্ত শুক্লা চতুর্থী। ঐ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে, তিনি তখন বিশ বৎসরের যুবক (১৪১৮ খ্রীঃ অঃ)। তখন গণেশ স্বল্পকালের জন্য গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ইঁহার সভায় গিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩২০ শক অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম, এই মত গৃহীত হইয়াছে। এই সন সত্য হইলে কৃত্তিবাস ১৪০৯-১০ খ্রীঃ অব্দে ফুলিয়া ত্যাগ করিয়া উত্তরবঙ্গে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন এবং ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজা গণেশের সভায় উপনীত হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে গণেশই দনুজমর্দনদেব নাম ধারণ করিয়াছিলেন।*

৩। গৌড়েশ্বর ॥ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে তিনি পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এই গৌড়েশ্বরের সভা ও সভাসদের বিস্তৃত বর্ণনা আত্মবিবরণীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। কবি গৌড়েশ্বরের সভাসদগণের নাম ও পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেও ঐ বিবরণীর কোথাও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই। কবি কেন নিজ জন্মশক

---

১১ ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নগেন্দ্রনাথের যে পুঁথি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে 'পুণ্য মাঘ মাস'-ই আছে, 'পূর্ণ' নহে।

* সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' নামক গ্রন্থে (পৃ. ৪৫-৪৯) রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্‌কেই এই গৌড়েশ্বররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি তথ্য নূতন চিন্তার উদ্রেক করিবে।

গোপন করিলেন, কেনই-বা গৌড়েশ্বরের নাম উহ্য রাখিলেন, তাহা এক সমস্যার বিষয়।

পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কেলে গুণের হয় পূজা ॥

সেই গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান লাভ করিয়াও কবি তাঁহার কোন পরিচয় দেন নাই। অথচ দেখিতেছি কবি রাজসভাসদগণের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। এইজন্য তিনি কোন্ গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র 'পুণ্য মাঘ মাস' ধরিয়া যে জ্যোতিষিক গণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, কৃত্তিবাস ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ন্যূনপক্ষে বিশ (অর্থাৎ ১৪১৮ খ্রীঃ অঃ)। তখন গৌড়ের সিংহাসন কাহার অধিকারে, তাহার অনুসন্ধান করা যাক। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে প্রথম ইলিয়াসশাহী বংশধারা সৈফুদ্দিন হামজাশাহের (১৪০৯-১০ খ্রীঃ অঃ) সহিত সমাপ্ত হইয়া গেলে রাজশাহীর প্রসিদ্ধ ভূস্বামী গণেশ প্রাধান্য অর্জন করিয়া ১৪১৪ খ্রীঃ অব্দে বাঙলার সুলতান হন। ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদুসেন বা জলালুদ্দিন বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। কৃত্তিবাস যদি ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে গণেশের রাজসভায় গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। অবশ্য কৃত্তিবাসের মতো প্রতিভাবান পণ্ডিত[১২] ও কবি নবীন বয়সেই গৌড়েশ্বরের নিকট সম্মান পাইলে বিস্ময়ের কি আছে? মহাপ্রভু নিতান্ত তরুণ বয়সেই 'নিমাই পণ্ডিত' রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মিল্ সাহেব বালক বয়সেই ল্যাটিন গ্রীক আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

রাজা গণেশ অত্যল্পকালের জন্য গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেও অতিশয় বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন; সুতরাং চতুর্দিকে আমীর ওমরাহ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সভাস্থলে কিছু কিছু হিন্দুর ভাবধারা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রগণ সকলেই উচ্চবংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ; কৃত্তিবাসকে সম্মানপ্রদর্শনের রীতিটিও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য

১২ রামায়ণে কৃত্তিবাস নিম্নলিখিতভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:
(ক) কবি—কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী। (কিষ্কিন্ধ্যা)
(খ) পণ্ডিত—সপ্তকাণ্ড গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। (লঙ্কা)
(গ) সর্বশাস্ত্রদর্শী—কৃত্তিবাস কবিবর সর্বশাস্ত্র সুগোচর। (লঙ্কা)

অন্যতম পারিষদ কেদার খাঁয়ের 'খাঁ' উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, সভাতে যে একেবারে মুসলমানী ভাবধারা ছিল না, তাহা নহে। হয়তো গণেশের সভাতেও মুসলমান আমীর-ওমরাহের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু রামায়ণে যবনসংস্পর্শ না থাকাই স্বাভাবিক, এবং কবি হয়তো ইচ্ছা করিযাই মুসলমান নাম বা চিহ্ন মুছিয়া দিযাছেন। অবশ্য ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

গণেশের পুত্র যদু 'জলালুদ্দিন' নাম ধারণ করিয়া ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ কবেন। তিনি মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের প্রতি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেব প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং অনেক ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক মুসলমান করিযাছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস জলালুদ্দিনেব সভায় যান নাই। কেহ কেহ বলেন, গণেশই যদি গৌড়েশ্বর হইবেন, তাহা হইলে তিনি 'রাঙ্গা মাজুরি'-র উপব 'নেতের পাছুড়ি' পাতিযা তাহার উপর বসিয়া মাঘ মাসেব খরা পোহাইতেছেন, এ কিরূপ গৌড়েশ্বর? 'পঞ্চ গৌড় চাপি গৌড়েশ্বব রাজা'—তিনি সাধারণ গ্রাম্য ভূস্বামীর মতো বযস্যদেব লইয়া মাঘ মাসের সকালে রৌদ্র সেবন করিতেছেন—ইহাতে গৌড়েশ্বরেব মহিমা খর্ব হইযাছে। এ সম্বন্ধে আমাদেব বক্তব্য: রাজা গণেশ হিন্দু রাজা; বাঙলা দেশেব হিন্দুরাজগণ ঐশ্বর্যেব দম্ভ প্রদর্শনেব জন্য বিখ্যাত হন নাই, বরং পাঠান এবং মুঘলযুগের সুলতান ও শাসনকর্তারাই ঐশ্বর্যসমুদ্রে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সুতরাং কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের রাজসভা যদি গণেশেরই রাজসভা হয়, তাহা হইলে তাহার অনলঙ্কৃত বর্ণনা এমন কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই। যোগেশচন্দ্রেব 'পুণ্য মাঘ মাস' গণনা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে কৃত্তিবাস রাজা গণেশেব সভায গিযাছিলেন, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এখনও সকলেব নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই গৌড়েশ্বর গণেশ নহেন—তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ১৩৪০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ তাহা প্রমাণেব চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব *Descriptive Catalogue of Old Bengali Mss.*-এব সম্পাদক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মত মানিয়া লইয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বসন্তকুমার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগের বাংলা' এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' (২য়)-এর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন।

১৩০৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গৌড়েশ্বরকে চন্দ্রদ্বীপের (বাক্‌লা) সেনবংশীয় কোন ভূস্বামী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। ১৩৪৮ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যায় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু "কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী ও কালনির্ণয়" নামক প্রবন্ধেও এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন যে, কৃত্তিবাস গণেশের সমসাময়িক তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণের সভাতেই গিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন রায়ের মতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ সাল) আত্মবিবরণীতে গৌড়েশ্বরের যে পার্ষদগণের নাম রহিয়াছে, লিপিকরপ্রমাদে তাহাতে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। কেশব খাঁ আত্মবিবরণে হইয়াছে কেদার খাঁ। শ্রীকৃষ্ণ হইযাছে শ্রীবৎস। সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও সদানন্দ তিন সহোদর—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ রাজা কংসনারায়ণের ভগিনীপতি। মুকুন্দ ভাদুড়ী শ্রীকৃষ্ণের পিতা। আত্মবিবরণে উল্লিখিত সভাসদের মধ্যে অনেকেই কংসনারায়ণের আত্মীয। সুতরাং এই গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের কংসনারায়ণ ব্যতীত আর কেহ নহেন—অন্ততঃ কুলজী গ্রন্থানুসারে তাহাই মনে হয়। 'প্রেম-বিলাসে'ও আছে—

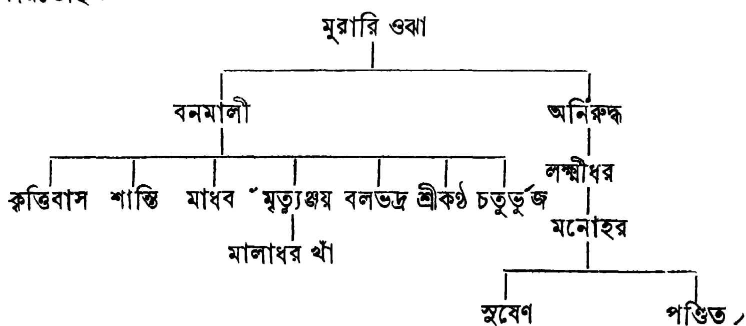
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈলা আবির্ভাব।
সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব॥

বসন্তরঞ্জন রায়েব মতে ১৩৫৪ শক রাজা কংসনারায়ণের কাল। কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'প্রেমবিলাসে'র সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কারণ উক্ত গ্রন্থে অনেক অযথার্থ কথা আছে। ভট্টশালী যাদব চক্রবর্তী-প্রণীত 'কুলশাস্ত্রদীপিকা', নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এবং লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধ নির্ণয়' অবলম্বনে তাহিরপুরের বংশাবলীর যে ক্রম নির্ণয় করিযাছেন, তাহাতে দেখা যায়, কংসনারায়ণ তাহিরপুরের রাজবংশের ৪র্থ বা ৫ম পুরুষ। রাজসাহী গেজেটিয়ার অনুসারে কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় (১৫৮২ খ্রীঃ অঃ) তাহিরপুরের ৫২ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্যনারায়ণ শাহ্‌-সুজার কোপে পড়িয়া জমিদারী হইতে বঞ্চিত হন এবং দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় নীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান। ১৬৫০ খ্রীঃ অব্দের দিকে শাহ্ সুজা রাজস্ব বন্দোবস্ত করিবার সময় জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন এবং

তাহিরপুরের সূর্যনারায়ণের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে। ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে সূর্যনারায়ণের পতন হইলে তাঁহার পিতা ইন্দ্রজিৎ ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে জমিদারী লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলে ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে কংসনারায়ণের কাল পিছাইয়া লওয়া যায় না। ইহাব পূর্বেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। সুতরাং ১৬শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আবির্ভূত কংসনারায়ণকে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে উল্লিখিত 'গৌড়েশ্বর'রূপে গ্রহণ করা যায না।

কুলজীগ্রন্থের প্রমাণ

রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণবংশ-সংক্রান্ত কুলজীগ্রন্থে কৃত্তিবাসেব প্রসঙ্গ থাকা স্বাভাবিক। কৃত্তিবাসেব ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খানী" মেলের এবং খুড়তুতো ভাইযেব নাতি গঙ্গানন্দ "ফুলিযা" মেলের 'প্রকৃতি' (প্রবর্তক)। সুতরাং ঘটকগণ মেলবন্ধনপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশপরিচয আলোচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য বিভিন্ন কুলশাস্ত্রের মধ্যে নানা মতভেদ রহিযাছে। কৃত্তিবাস সম্বন্ধেও এক কুলগ্রন্থেব সহিত অপব কুলগ্রন্থের তথ্যগত নানা বৈষম্য আছে। আমরা নিম্নে সর্বাধিক-প্রচারিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী' নামক কুলগ্রন্থ হইতে কৃত্তিবাসের পিতামহ মুবারি ওঝা হইতে কৃত্তিবাসের খুড়তুতো ভাই-এব পৌত্রের পুত্র পর্যন্ত বংশতালিকা উল্লেখ করিতেছি:



কুলজীগ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে যে, ভরদ্বাজ গোত্রের আদি পুরুষ শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত বাইশ পুরুষ, শ্রীহর্ষ হইতে মাধবাচায ত্রয়োদশ পুরুষ; মাধবাচার্যের পরবর্তী বংশতালিকা:—মাধব—উৎসাহ (বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্যপ্রাপ্ত)—আয়িত (লক্ষ্মণসেনের দ্বারা কুলীনকৃত)—উদ্ধব—

শিব—নৃসিংহ (ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন)—গর্ভেশ্বর—মুরারি ওঝা—বনমালী—কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস মুরারির পৌত্র, বনমালী মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার ভ্রাতৃগণের নাম—শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ, চতুর্ভুজ। চারিটি ভগিনী, কিন্তু নাম জানা যায় না। ভগিনীপতিদের নাম—পুরন্দর গাঙ্গুলী, দিবাকর মিশ্র, বৃহস্পতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৪৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দেখাইয়াছেন যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী'তে ('মহাবংশ' নহে) কুলীনদের যে "সমীকরণ"[১৩] বর্ণিত হইযাছে, তাহার তারিখ ধরিয়া মনে হয় যে, ১৪৩৩ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসের জন্ম হইতেই পারে না। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ ও কুলশাস্ত্রের বিবৃতির মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। ধ্রুবানন্দের মতে কৃত্তিবাসকে লইয়া বনমালীর আট পুত্র, আত্মবিবরণ অনুসারে কৃত্তিবাসকে লইয়া ছয় পুত্র। ডঃ ভট্টাচার্য 'ঘটককেশরী কুলপঞ্জিকা' নামক আর-একখানি নূতন আবিষ্কৃত কুলপঞ্জিকা হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাসের পুত্রের নাম শঙ্কর, পৌত্রের নাম কালিদাস।[১৪] বার্ধক্যে কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ কবিয়াছিলেন।

কুলপঞ্জিকা অনুসারে দেখা যায় যে, ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) কৃত্তিবাসেব ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খানী" এবং খুড়তুতো ভাইয়ের পৌত্র গঙ্গানন্দ "ফুলিযা" মেলের 'প্রকৃতি' নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ কুলপঞ্জিকা হইতে আবও জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের জীবিতকালেই তাঁহাকে বাদ দিযা তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শান্তি ও মৃত্যুঞ্জয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভরত 'সমীকরণ' দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কি করিয়া 'সমীকরণ' দ্বারা সম্মানিত হইতে পারেন? অনুমান, কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করিযাছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া কুলক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকিবে। ডঃ ভট্টাচার্য কুল-

---

[১৩] সমীকরণ—"গোষ্ঠীপতিদিগের যত্নে ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমপর্যায়ের কুলীনদিগের যে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা 'সমীকরণ' পদবাচ্য।" —বিশ্বকোষ

[১৪] ডঃ ভট্টাচার্য আর-একখানি কুলপঞ্জিকা অনুসারে কৃত্তিবাসের চারি পুত্রের নাম পাইয়াছেন —অর্জুন পাঠক, শ্রীধর, বংশধর ও শঙ্কর।

পঞ্জিকার প্রমাণাদি বিচাব কবিযা বলেন যে, ১৪১০ খ্রীঃ অব্দের পরে কৃত্তিবাসেব জন্ম সম্ভব নহে। তিনি ১৩৮৯ খ্রীঃ অব্দকেই কৃত্তিবাসেব জন্মাসন বলিযা স্থিব কবিয়াছেন।

ডঃ ভট্টাচার্য কুলজীগ্রন্থাদি অবলম্বনে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আবও কিছু নূতন তথ্য উদ্ধাব কবিয়াছেন। কৃত্তিবাসের শ্বশুবকুলেবও কিছু কিছু পবিচয় পাওযা গিযাছে। যেমন তাঁহাব শ্বশুরেব নাম শঙ্কব, শঙ্কবেব ভাই উৎসাহ। উৎসাহেব বৃদ্ধপৌত্রই নৈযাযিক কণাদ তর্কবাগীশ। কণাদ বাসুদেব সার্বভৌমেব ছাত্র এবং প্রবাদানুসাবে বঘুনাথ শিবোমণিব সহাধ্যাযী। অবশ্য কণাদেব 'চিন্তামণিটীকা য "সার্বভৌমপদাম্ভোজ ভ্রমবীকৃত মৌলিনা" এই উক্তি আছে। সুতবাং কণাদ বাসুদেব সার্বভৌমেব শিষ্য ছিলেন। ১৭৬০ ৬৫ খ্রীঃ অব্দেব মধ্যে বঘুনাথ শিবোমণিব জন্ম হইযাছিল। বঘুনাথও বাসুদেবেব ছাত্র ছিলেন। তাঁহাব প্রপিতামহেব ভগিনীপতি কৃত্তিবাসেব জন্মাব্দ ১৩৭৫ খ্রীঃ অব্দেব পবে নহে। কাবণ এক পুরুষে গড়পড়তা ৩৫ বৎসব ধবা হয।

ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাযেব তাব একটি প্রমাণ উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসের পিতামহ মুবাবি ওঝা '৩৭ সমীকরণে'ব বিখ্যাত কুলীন। 'সমীকবণে'ব হিসাব ধবিযা ডঃ ভট্টাচাযেব অনুমান, ১২৮০ খ্রীঃ অব্দেব মধ্যে মুবাবিব জন্ম হইযাছিল। সুতবাং ১৪শ শতাব্দীব তৃতীয পাদে (১৩৫০-৭৫ খ্রীঃ অঃ) কৃত্তিবাসেব জন্ম হইতে পাবে। "আদিত্যবাব শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাসেব" হিসাব ধবিযা লেখক গণনা কবিযা দেখিযাছেন যে, নিম্নলিখিত তিনটি তাবিখে শ্রীপঞ্চমী পড়িযাছিল :—

(১) ১৩৫২ খ্রীঃ অঃ, ২২এ জানুযাবী, ২৬এ মাঘ ববিবাব
(২) ১৩৭২ খ্রীঃ অঃ, ১১ই জানুযাবী, ১৫ই মাঘ ববিবাব
(৩) ১৩৭৫ খ্রীঃ অঃ, ৭ই জানুযাবী, ১১ই মাঘ ববিবাব

তাঁহাব মতে, ১৩৭২ খ্রীঃ অব্দে কৃত্তিবাসেব জন্ম হইলে তিনি যখন গণেশেব সভায গিযাছিলেন, তখন তাঁহাব বযস ৪৫ বৎসব হইযাছিল।

কৃত্তিবাসেব আত্মবিববণ ও কুলজী-বংশমালাব বিবৃতিব মধ্যে মোটামুটি ঐক্য আছে বটে, কিন্তু নাম ও পবিচযে ঈষৎ পার্থক্য আছে। আত্মবিবরণ-মতে কৃত্তিবাসসহ বনমালীর ছয পুত্র। ধ্রুবানন্দেব 'মহাব শাবলী'ব মতে এই পুত্র আট জন—কবি ও ধীমান কৃত্তিবাস, শান্তি, সাধুপ্রকৃতির মাধব, প্রতিপক্ষকে জয়েচ্ছু মৃত্যুঞ্জয, শ্রীমান বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। আত্মবিববণেব শ্রীধর 'মহাবংশাবলী'তে শ্রীকণ্ঠে পবিণত হইযাছে। আত্মবিববণের শান্তি-মাধব

একজনের নাম, ভাস্কর আর-একটি অতিরিক্ত নাম। 'মহাবংশাবলী'তে শান্তি এবং মাধব বিভিন্ন ব্যক্তি ; ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে ভাস্করের কোন উল্লেখ নাই।

কৃত্তিবাসের ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে জন্ম হইতে পারে বটে ; কিন্তু তিনি কত দিন জীবিত ছিলেন ? কাহারও মতে তিনি ৭০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এ বিষয়ে একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে যে, মহাপ্রভুর আহ্বানে ফুলিয়ানিবাসী হরিদাস আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া পুরীধামে যাত্রা করেন। সেই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে গিয়া জয়ানন্দ ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ কুলীন মনোহরের পুত্র সুষেণের উল্লেখ করিয়াছেন। হরিদাসের সহিত সুষেণের হৃদ্যতা ছিল। এই সুষেণ হইতেছেন কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিত, ইনি ১৫১৬ খ্রীঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পিতামহ কৃত্তিবাস ১৫শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বা তাহার পরেও জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে ফুলিয়া মেল প্রবর্তিত হয়। কৃত্তিবাস তখন জীবিত থাকিলে তাঁহার নামেই মেল প্রবর্তিত হইত। কাজেই এই সময়ে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ)[১৫] কৃত্তিবাস বা তাঁহার ভ্রাতারা কেহই জীবিত ছিলেন না। ইহাতেও মনে হয় কৃত্তিবাস ৭০-৮০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচনা, কোন গায়েন বা কথকের সংযোজনা, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পিত—তাহা লইয়াও কিছু মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচনা নহে, কারণ ইহাতে কৃত্তিবাস আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন যাহা কিয়দংশে দাম্ভিকতাপ্রসূত বলিয়া মনে হইবে। ইহা তাঁহার রচিত হইলে কবি আপনাকে এত প্রশংসা করিতে পারিতেন কি ? ইহা বোধহয় রামায়ণ-গায়ক বা কথকদের সংযোজন। রামায়ণের পুঁথির প্রারম্ভে কোন গায়েন যদি কৃত্তিবাসের বংশপরিচয় উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? উদাহরণ-স্বরূপ পূর্বে উল্লিখিত চারিখানি পুঁথির সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। এই পুঁথিকয়খানিতে কৃত্তিবাসের যে বংশপরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে

---

১৫ অবশ্য কোন কোন কুলজীগ্রন্থে আছে যে, কৃত্তিবাস শেষ জীবনে কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন। তাই হয়তো তাঁহার জীবৎকালেই তাঁহাকে বাদ দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদের লইয়া মেল প্রবর্তিত হয়। সুতরাং এই সময়ে যে তিনি জীবিত ছিলেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

সামান্য কিছু গরমিল থাকিলেও আত্মবিবরণীর সহিত ইহার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। সুতরাং আত্মবিবরণীটি অলীক নহে,—যদিও তথ্যে কিছু কিছু ত্রুটি আছে। অবশ্য কুলগ্রন্থের সহিত মিল রাখিয়া যদি কোন গায়েন বা কথক এই আত্মবিবরণ রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। 'এই আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচিত হউক, আর নাই হউক, কুলজীগ্রন্থ ও আত্মবিবরণের তথ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যের ভাগই অধিক। এই সমস্ত কারণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটিকে অলীক বলিয়া ত্যাগ করিবার কারণ নাই।'

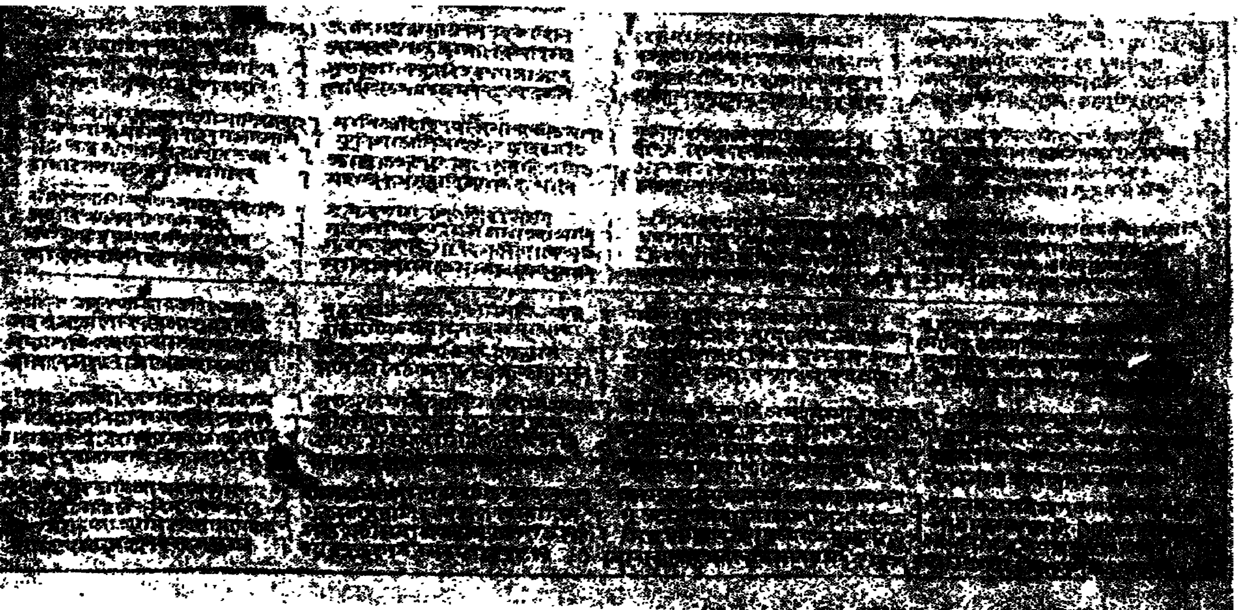
॥ ৪ ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি ও মুদ্রণ

॥ পুঁথির পাঠবৈষম্য ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীনতর পুঁথিব সংখ্যা স্বল্পতর হইলেও ঈষৎ অর্বাচীন কালের বহু পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিযাছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয ও শান্তিনিকেতনে কৃত্তিবাসের যে-সমস্ত পুঁথি সংগৃহীত হইযাছে, তাহাব সংখ্যা অনূ্যন দেড হাজার। কিন্তু প্রায সমস্ত পুঁথি ১৮শ শতাব্দীর অনুলিখন, ১৭শ শতাব্দীব পুঁথির সংখ্যা অতিশয় বিবল। দুই-একখানি ব্যতীত ১৬শ শতাব্দীর পুঁথি প্রাযই পাওয়া যায নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কৃত্তিবাসী রামাযণের প্রাচীন পুঁথি নাই। হীবেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০৭ সালে যে পুঁথি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ হইতে বামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড সম্পাদনা করিযাছিলেন, তাহা ১০০৯ সালে (১৬০৩ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত উত্তরাকাণ্ডের একখানি পুঁথি (পুঁথি নং—২০৮) আছে।

রামাযণের পুঁথিগুলি প্রায়শঃই রামায়ণগায়ক বা কথকদের অধিকারে থাকিত; গায়কগণ কালগতিকে নূতন পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতেন, পুরাতন পুঁথি অনাদরে পডিয়া থাকিত। সেইজন্য পুরাতন পুঁথির অদর্শন বা অপ্রতুলতা ঘটিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে পুঁথিগুলি গায়ক-কথকদের কবলে পডিয়াছে, তাহাতে যেমন বহু অপপাঠ



কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ সূচক পুঁথি

প্রক্ষিপ্ত হয়য়াছে, তেমনি আবার পুরাতন পুঁথিসমূহ লোকচক্ষুর অগোচরে নির্বাসিত হইয়াছে। এমনি করিয়া নূতন পুঁথি পুরাতন পুঁথির স্থান অধিকার করিয়াছে। বাসি ফুল যেমন কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখে না, তেমনি যে যুগে নূতন পুঁথি পাইলে পুরাতন পুঁথিকে কেহ সযত্নে তুলিয়া রাখিত না। গায়কগণ গণমনোরঞ্জনের জন্য মূল রামায়ণে অনেক নূতন পংক্তি ও বর্ণনা জুড়িয়া দিতেন ; কাজেই পুরাতন পুঁথি অপেক্ষা নূতন বর্ণনাযুক্ত পুঁথির আদর সমধিক হইত।

কৃত্তিবাসের যেমন পুরাতন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, তেমনি সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ পুরা রামায়ণ পুঁথিও বড একটা চোখে পড়ে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি সপ্তকাণ্ডে-সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের (১২০১ সাল, পুঁথি নং—১৫১) পুঁথি আছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরা সপ্তকাণ্ডের একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুঁথি (পুঁথি নং—৬৬০২) আসিয়াছে। অবশ্য শেষোক্ত পুঁথিটি বিশেষ প্রাচীন নহে ; পুঁথির কাগজ ও অক্ষরগঠন দেখিয়া ইহাকে দেড়শত বৎসরের অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইতেছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কোন পূর্ণাঙ্গ পুঁথি নাই। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ১৫৫৭ শকাব্দে (১৬৫৬ খ্রীঃ অঃ) নকল-করা সপ্তকাণ্ডের একখানি কৃত্তিবাসী পুঁথি পাইযাছিলেন। তৎসম্পাদিত 'রামায়ণের আদিকাণ্ডে' প্রধানতঃ এই পুঁথিটির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তিনি উক্ত গ্রন্থসম্পাদনে আরও অনেক পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিযাছিলেন।

খণ্ড খণ্ড ভাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ; কোন কোন পুঁথিতে আবার সমগ্র কাণ্ডটি উদ্ধৃত না হইয়া মূল কাণ্ড হইতে দুই-একটি জনপ্রিয় আখ্যান বা পালা গৃহীত হইযাছে। যেমন 'হরিশ্চন্দ্র পালা', 'রুক্মাঙ্গদ রাজার একাদশী পালা' 'যোগাদ্যার বন্দনা পালা' ইত্যাদি। মুদ্রণের যুগেও কৃত্তিবাসের একটি মাত্র কাণ্ড মুদ্রণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ১২৪৭ সালে ৩০ মাঘ লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দের 'জ্ঞান উল্লাস' যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামাযণের শুধু সুন্দরকাণ্ড গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ১২৪৮ সালে 'সারসংগ্রহ যন্ত্র' হইতে ঐ সুন্দরকাণ্ডের আর-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৫২ সালে উক্ত যন্ত্র হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডটিও মুদ্রিত হইয়াছিল।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অপেক্ষা পৃথক্ ভাবে বিভিন্ন কাণ্ড কেন পাওয়া গিয়াছে,

তাহার কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে। পাঁচালীর আকারে রামায়ণ গীত হইত, কখনও-বা কথকঠাকুর ইহার কিয়দংশ আবৃত্তি করিতেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণকথা গান ও কথকতায় ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে; এইজন্যই গায়ক ও কথকগণ হয়তো পৃথগ্‌ভাবে এক-একটি কাণ্ড বা কোন কাণ্ডের কোন জনপ্রিয় পালা গাহিয়া জনমনোরঞ্জন করিতেন। লঙ্কাকাণ্ডের প্রতি সে যুগের শ্রোতার অধিকতর আকর্ষণ ছিল বলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথির সংখ্যাই সর্বাধিক। পুরা পুঁথি কদাচিৎ অনুলিখিত হইত।

বাঙলা দেশের সর্বত্র কৃত্তিবাসী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংবক্ষিত অধিকাংশ পুঁথিই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্ববঙ্গ হইতেও কিছু কিছু কৃত্তিবাসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যদিও পূর্ববঙ্গে অদ্ভুত আচার্যের (নিত্যানন্দ) রামাযণ অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, তথাপি কৃত্তিবাসের পুঁথিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। মধ্যযুগীয় গৌডবঙ্গের অন্য কোন বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সারা বাঙলা দেশেই ১৫শ শতাব্দী হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত কৃত্তিবাসের অসংখ্য পুঁথি নকল হইযাছিল। "সাত নকলে আসল খাস্তা"—এ কথা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নিদারুণ সত্য। কৃত্তিবাসের পুঁথির প্রধান সংরক্ষক ছিলেন গায়ক ও কথকগণ; তাঁহাবা লোকরঞ্জনের জন্য মূল পুঁথিতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিতেন। অনেক সময় অশিক্ষিত গাযেন ও লিপিকাবগণের অজ্ঞতার জন্য পুঁথির পাঠ এমনভাবে বদলাইযা গিযাছে যে, আসল-নকল চিনিয়া লওয়া দুরূহ। অনেকে বলেন যে কৃত্তিবাসী রামাযণের মুদ্রিত সংস্করণগুলি বটতলার অর্ধ-শিক্ষিত প্রকাশকদের দ্বারা এমনভাবে 'পরিমার্জিত' হইযাছে যে, মূল পুঁথির পাঠ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছে। একদা প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন (১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত), "বরং কাশীরামের মহাভারতে দুই-একটা কাশীরামের নিজ লেখনীপ্রসূত শব্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃত্তিবাসে তাহাও নাই।" কথাটা অতিশযোক্তি নহে। প্রাপ্ত পুঁথি-গুলির পাঠ মিলাইলেই দেখা যাইবে যে, কোন দুইখানি পুঁথি একরূপ নহে। কিন্তু ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের

(আদিকাণ্ড) যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সুন্দরাকাণ্ডের কয়েকখানি পুঁথির আরম্ভ-অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কৃত্তিবাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা সর্বদা গ্রাহ্য নহে। কৃত্তিবাসী পুঁথির অতিশয় জনপ্রিয়তার জন্য প্রচুর পাঠভেদ ঘটিলেও অনেক পুঁথির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদের সুন্দরাকাণ্ডের পুঁথি (৫৪ নং, ৫৮ নং, ৮৯ নং, ১৩৫ নং, ১৩৯ নং, ১৪৪ নং, ১৬১ নং), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত ঐ কাণ্ডের কয়েকটি পুঁথি (৭৬ নং, ৭৯ নং, ৮২ নং, ৮৫ নং, ৮৮ নং) এবং ডঃ ভট্টশালী সংগৃহীত সুন্দরাকাণ্ডের আর কয়েকখানি পুঁথির (একখানি সপ্তকাণ্ড পুঁথি এবং এগারখানি শুধু সুন্দরাকাণ্ডের পুঁথি) প্রারম্ভপাঠ মিলাইয়া ভট্টশালী মহাশয় দেখিয়াছেন যে, উহাদের মধ্যে কিছু কিছু পাঠভেদ থাকিলেও, একেবারে যে সাদৃশ্য নাই, তাহা নহে। ডঃ ভট্টশালী যে-সমস্ত উদ্ধৃতিসহ এই মত প্রমাণ করিয়াছেন তাহাতে মনে হইতেছে যে, স্থানভেদ ও কালভেদের ফলে কৃত্তিবাসী পুঁথিতে যতটা পাঠভেদ ঘটা সম্ভব, তাহা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু মূল কাঠামো নষ্ট হয় নাই, বারো আনা অংশে মিল আছে। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসের একছত্রও নাই, ডঃ ভট্টশালী সে কথা মানিয়া লইতে সম্মত নহেন। নলিনীকান্তের এই মত যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত, কাজেই তাহা স্বীকার্য। কিন্তু আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের একই কাণ্ডের এমন অনেক পুঁথি দেখিয়াছি, যাহাতে বহু হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, রূপান্তর হইয়াছে, শব্দ বদলাইয়াছে, পংক্তি পাল্টাইয়াছে —এমন কি এক বর্ণনা বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নূতন বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অর্বাচীন পুঁথিতে যে অধিকতর পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে একখানি ১৭শ ও আর-একখানি ১৮শ শতাব্দীর পুঁথির পাঠ উল্লেখ করিয়া এই পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

মন্দোদরী কর্তৃক সীতাকে অভিশাপদান (লঙ্কাকাণ্ড)

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি, —১০১ নং (১৬১৩ খ্রীঃ অঃ)

দোলাখান বারি হৈল অসোকের বনে।
পথে মণ্ডোদরি সনে হৈল দরসনে॥
করিয়া রাক্ষস ক্ষয় জাহ স্বামি স্থানে।
আমাকে এড়িয়া তুমি জাহ কোন স্থানে॥

তোমার কারণে মোর প্রভুর মরণ।
পুরি মজাইয়া জাহ হরসিত মন॥
সিতা বলে মন্দোদরি সুনহ বচন।
পরে দুখ দানে রাবণ ভুঞ্জে কোন জন॥
সুন্ত ঘরে মোরে আনি করিল দুর্গতি।
সেই পাপে মজিল রাক্ষস অধিপতি॥
পরে দুখ দানে ভাই আপনারে ফলে।
মোরে কোন দোস দেহ জে ফলে কপালে॥
সিতার বচনে মন্দোদরি কোপ মন।
রাম সনে হোক তোমার বিস দরসন॥
আমাকে বিধবা করি জাহ স্বামি পাস।
রাম দরসনে সিতা হইবে নৈরাস॥
সাঁপ দীয়া মন্দোদরি করিলা গমন।
সুনিয়া সিতার হৈল চমকিত মন॥

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি—১২২ নং (১৭৯৪ খ্রীঃ অঃ)

সোকেতে আকুলি রাণি কেস নাহি বান্ধে।
সিতা দরসনে ধায় উচ্চস্বরে কান্দে॥
দোলা লামাহ সুন আর যত রাক্ষশগণ।
এ জনমের মত সিতায় করিএ দরসন॥
মন্দোদরির বোলে সভে লামায় চৌদুলী।
দোলার নিকটে আস্যা হইঞা ব্যাকুলী॥
প্রণিপাত হইঞা রাণি সিতাকে কয় কথা।
তুমি ত চলিলে মোরা থাকিব কোথা॥
তুমি ত চলিলে সিতা দরসনে পতি।
অভাগিনি মন্দোদরির কি হবেক গতি॥
সোকেতে জর্জ্জর রাণি সিতাকে কয় কথা।
কোপে না সুনেন সিতা হেষ্ট করিল্যা মাথা॥
রাবণ রাজার অপমান সিতার উঠে মনে।
মন্দোদরি জত বলে না সুনেন কানে॥
মন্দোদরি বলে সুন পতিব্রতা সিতা।
কোন অপরাধে মোরে নাহি কহ কথা॥
তুমি ত চলিলে নিজ স্বামি দরসনে।
আমি অনাথিনি গো থাকিব কোন স্থানে॥

ক্রোধে সিতা বলেন মোরে সুধাও কি কারণে।
আমি কি বল্যাছিলাঙ মোরে হরুক রাবণে॥
* * *
আমা হৈতে সিতা তুমি কত বড় সিয়ান।
তোমা হৈতে চতুর্গুণ মোর বুদ্ধিথান ॥
চতুরের কাছেতে চাতুরি নাহি সাজে।
অপমান করিলে মোর জাতি বন্ধ মাঝে ॥
সোকের উপর সোক মোর করাইলি সিতা।
আমি সাপ দিব কভু নহিবে অন্যথা ॥
মোরে দুঃখ দিঞা সিতা করিলে গমন।
নিশ্চয়েত সাঁপ দিব লঙ্ঘে কোন জন ॥
ঘৃণা করি আমার অসুখি কৈলে মন।
স্বামি সঙ্গে হউক তোমার অসুখ দরসন ॥
মোরে অনাথ করিঞা তোর আনন্দিত মনে।
মোর সাপে পড়িবি রামের বিস নয়নে ॥
মন্দোদরি সাপ দিল সতি পতিব্রতা।
সাপ খণ্ডিবারে নারে ব্রহ্মাদি দেবতা ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৭শ শতাব্দীর পুঁথির বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, ভাষা ও ছন্দেও নানা ত্রুটি আছে। অর্বাচীন কালের অনেক পুঁথিতে অশিক্ষিত গায়েন ও লিপিকারের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাতন পুঁথিতে অসংখ্য ছন্দত্রুটি ও শব্দপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, যুগভেদে ও দেশভেদে কৃত্তিবাসী পুঁথির যে বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কাণ্ডের বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। তবে অনেক সময় আঞ্চলিক পুঁথিগুলির মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যায়। ডঃ ভট্টশালী সুন্দরাকাণ্ডের প্রারম্ভ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কৃত্তিবাসী পুঁথির মধ্যে একেবারে ঐক্য নাই--ইহা সত্য নহে। কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, সুন্দরাকাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁথির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৪ নং পুঁথি (মেদিনীপুরে প্রাপ্ত), ১৩৯ নং পুঁথি (নদীয়ায় প্রাপ্ত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৬ নং পুঁথি (বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত) এবং ডক্টর ভট্টশালীর ক-সংখ্যক পুঁথির (বিক্রমপুরে প্রাপ্ত) বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও পার্থক্যও

আছে। নিম্নে বিভিন্ন পুঁথির সুন্দরাকাণ্ডের প্রথম কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :—

১। পিতাপুত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর॥
তর্জে গর্জে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখি গুণিলা প্রমাদ॥
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুথি—৫৪ নং, মেদিনীপুরে প্রাপ্ত)

২। বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
ভয়ে গর্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুনেন্ত প্রমাদ॥
(ঐ পুঁথি নং—৮৯, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত)

৩। বাপে পোএ পক্ষরাজ গেল দিক উত্তর।
বানর কটক লঞা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া বানর গুণিল প্রমাদ॥
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি নং—১৬, বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত)

৪। বাপে পুত্রে পক্ষি গেল আপনার ঘর।
কটক চলিয়া গেল দক্ষিণ সাগর॥
গর্জিয়া বানর সব ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের তরঙ্গ দেখি গণন্ত প্রমাদ॥
(ডঃ ভট্টশালীর 'ক' সংখ্যক পুঁথি—বিক্রমপুরে প্রাপ্ত)

৫। গর্জ্জএ বানর সন্য করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি ভাবেন্ত প্রমাদ॥
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পুঁথি নং—৬৬০২)

এই সমস্ত উদাহরণ দৃষ্টে পুঁথির পাঠবৈষম্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। দুই কারণে এইরূপ পাঠবৈষম্য ঘটিয়াছে। অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য কালক্রমে পুঁথির পুরাতন পাঠ ও শব্দ বদলাইয়া গিয়া নবকলেবর ধারণ করিয়াছে। লিপিকর ও কথকগণ দেশ ও কালের রুচিভেদে পুঁথির ভাষায় বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন, কাজেই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে নকল-করা পুঁথিতে অনেক আধুনিক ধরনের শব্দ ও বাক্যাংশ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে রীতিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদন

করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। নানা পুঁথির পাঠ মিলাইয়া মূল কৃত্তিবাস পুনরুদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে। যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সপ্তকাণ্ড পুঁথির অনেকগুলি কপি মিলিত এবং পুঁথিগুলি বিশেষ প্রাচীন-কালের অনুলিখন হইত, তাহা হইলে ঐ সপ্তকাণ্ডে-সম্পূর্ণ প্রাচীনতর পুঁথিগুলির পাঠ মিলাইয়া এবং সর্বপ্রাচীন পুঁথিটিকে মল পুঁথি ধরিয়া অগ্রসর হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আসলরূপ অনেকটা উদ্ধার করা যাইত। ডঃ ভট্টশালীর পূর্বে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবর্তনায় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড (১৩০৭ সালে প্রকাশিত) এবং উত্তরাকাণ্ড (১৩১০ সালে প্রকাশিত) সম্পাদনা করেন। তিনি একাধিক পুঁথির সাহায্যে এবং কোন একখানি পুঁথিকে মূল ধরিয়া যে রীতিতে ঐ দুই কাণ্ড সম্পাদনা করিয়াছিলেন, ডক্টর ভট্টশালীও প্রায় অনুরূপ রীতি অবলম্বন করিয়া ১৫৭১ শকাব্দে-অনুলিখিত বিক্রমপুরের এক বৈদ্যপরিবারের নিকট সংগৃহীত কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পুরা পুঁথির পাঠের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সময়ের নয়খানি পুঁথির পাঠের সাহায্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদনা (১৯৩৬ খ্রীঃ অঃ) করিয়াছেন। ডঃ ভট্টশালী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮, ১০ ও ১৫০ সংখ্যক পুঁথিকেই কৃত্তিবাসের নির্ভরযোগ্য রচনা বলিয়া স্বীকার করিযাছেন। তিনি তাঁহার হেফাজতে রক্ষিত ১৫৭১ শকাব্দের পুঁথিকে সর্বপ্রাচীন পুঁথি বলিয়াছেন ; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন পুঁথি আছে ; তন্মধ্যে একখানি আদিকাণ্ডের পুঁথি ১৬১০ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত। ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত একখানি পূর্ণাঙ্গ রামায়ণও (পুঁথি নং—২৮৩) আছে। ১৫৮০ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত উত্তরাকাণ্ডের একখানি পুঁথির (পুঁথি নং—২০৮) সন্ধান পাওয়া গিযাছে। সুতরাং ভট্টশালী মহাশয়ের নিজস্ব পুঁথিখানিকে প্রাচীনতম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি যে রীতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন পুঁথির তিল তিল লইয়া 'তিলোত্তমা' নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা আসল কৃত্তিবাসী রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা গভীর সন্দেহের বিষয়।

শুধু কালক্রমেই যে পুঁথির পাঠবৈষম্য ঘটিয়াছে তাহা নহে ; অঞ্চলভেদে কৃত্তিবাসী পুঁথিতে বহু পাঠান্তর ও আঞ্চলিক শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। তদুপরি আবার অন্য রামায়ণকারেরও বহু রচনা গায়েন-কথকদের কৃপায় কৃত্তিবাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কবিচন্দ্র ও অদ্ভুত আচার্যের কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের মধ্যে নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে। 'অঙ্গদের রায়বার' নামক অংশটি, যাহা

কৃত্তিবাসের মুদ্রিত সংস্করণে আছে, পুঁথিতেও আছে, তাহা কবিচন্দ্রের রচনা; এই ব্যঙ্গরসাত্মক উৎকৃষ্ট রচনাটি কিছু কিছু পরিবর্তনসহ কৃত্তিবাসের পুঁথির মধ্যে ঠাঁই পাইয়াছে। ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত লঙ্কাকাণ্ডের একখানি কৃত্তিবাসী পুঁথিতে ইহা পাওয়া যাইতেছে (ক, বি, পুঁথি নং—১৬৩)। ১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণেও 'অঙ্গদের রায়বার' ধরনের একটু বর্ণনা মুদ্রিত হইয়াছিল :—

অঙ্গদ বলে মর তুই পাগল রাবণে
কিসের বড়াই তুই করিস আমা বিদ্যমানে।
তাহার আগে বড়াই কর যে জন না জানে
তোর যত বিক্রম আছে আমার স্থানে।

* * *

আরবার গিয়াছিলি মোর পিতার নিকট
আমার বাপের আগে করিলি মুনি ষট।
সন্ধ্যা হেতু মোর বাপ না করিল রণ
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি বাবা তোরে বাঁধিল লেজে
লেজে বান্ধে ডুবাইল চারি সাগরের মাঝে।
লেজে বান্ধে ডুবাইল পানীর ভিতর
পানী খাইয়া রাবণ তুই হইলি ফাঁপর।
আমার বাপের লেজ যোজন পঞ্চাশ
পানীর ভিতর তুই মোর বাপ আকাশ।
আপন মুখে রাবণ তুই পাইলি পরাজয়
তবে সে বাপুর ঠাঞি পাইলি বিদায়।

অবশ্য প্রচলিত 'অঙ্গদের রায়বাব' এবং ১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দের সংস্কবণের উল্লিখিত অংশে বিষয়গত সাদৃশ্য থাকিলেও ভাষাগত পার্থক্যই অধিক। অনুমান হয়, কৃত্তিবাসী মূল রামায়ণে এইরূপ কোন রচনা ছিল। পরে কবিচন্দ্র তাহার উপরে কিছু রং ফলাইয়াছিলেন। এই অংশটি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মনে হয়, গায়েন-কথকগণ কৃত্তিবাসের রায়বার বাদ দিয়া কবিচন্দ্রের রায়বারকেই কৃত্তিবাসের বলিয়া চালাইয়াছিলেন। ডঃ ভট্টশালী দেখাইয়াছেন যে, কৃত্তিবাসের অনেক সরস রচনা অদ্ভুতাচার্যের (নিত্যানন্দ) পুঁথিতে মিলিতেছে।[১৬] তাঁহার

১৬ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মহাকবি 'কৃত্তিবাস-বিরচিত রামায়ণে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

মতে কৃত্তিবাস অপেক্ষা অদ্ভুতাচার্যের রচনা ও কবিত্ব অধিকতর প্রশংসনীয়। তাঁহার এই মত অবশ্য বঙ্গীয় পাঠক ও সুধীসমাজে স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার এই অভিমত সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কৃত্তিবাসের রচনায় অনেক কবির ভাল-মন্দ রচনা অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং কৃত্তিবাস একাই সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণ

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণের পাঠের সহিত পুঁথির পাঠের যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। ১৩০১ সালে হীরেন্দ্রনাথ দত্তই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে সুধীজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বটতলা হইতে মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আসল কৃত্তিবাসের এক ছত্রও রক্ষিত হয় নাই। হীরেন্দ্রনাথের কিছু পূর্বে কৃত্তিবাস-বিশেষজ্ঞ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ' বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" কৃত্তিবাসী বামাযণ মুদ্রণের ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে, পুঁথির ভাষা ও বর্ণনা মুদ্রিত সংস্করণে প্রায় কোথাও রক্ষিত হয় নাই।

১৮০২ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন হইতে কেরীর চেষ্টায় সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে এই মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পর পৃষ্ঠায় প্রথম মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ইংরাজী ও বাংলা আখ্যাপত্র উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(ইংরাজী আখ্যাপত্র)

THE *RAMAYUNU*

A POEM

IN FIVE VOLUMES

Translated from the Original Sangskrit

BY KIRTEE BASS

VOL. I.

SERAMPORE

PRINTED AT THE MISSION PRESS...

1802

(বাংলা আখ্যাপত্র)

(বাল্মীকি কৃত)

রামায়ণ

মহাকাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।—

প্রথম কাণ্ড।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

১৮০৩।—

ইতিপূর্বে হ্যালহেডের *The Grammar of the Bengal Language* (1778)-এ কৃত্তিবাস হইতে সামান্য উদাহরণ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীগণ এদেশীয় পণ্ডিতের সহায়তায় পুঁথির পাঠ মুদ্রিত করিলেও তাঁহারা নিশ্চয় প্রাচীন গ্রন্থসম্পাদনের আধুনিক রীতি গ্রহণ করেন নাই। তাই তাঁহাদের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় হাতের কাছে যে পুঁথি পাইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন ভাষা ও শব্দ অনুসারে পুরাতন পুঁথির পাঠ বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে পুঁথির পাঠ অবিকলভাবে গৃহীত হয় নাই। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, এতাবৎকাল পর্যন্ত যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অর্বাচীন, শ্রীরামপুরের মুদ্রিত সংস্করণ অপেক্ষাও আধুনিক। সুতরাং শ্রীরামপুরের মুদ্রিত সংস্করণ অর্বাচীন পুঁথি অপেক্ষা যে অধিকতর নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণের সহিত প্রচলিত পুরাতন পুঁথির পাঠে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা অপেক্ষাকৃত একখানি নবীন পুঁথির পাঠের সহিত শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পাঠের তুলনা করিয়া পাঠবৈষম্য নির্দেশ করিতেছি।

১১৭৪ সালের (১৭৬৮ খ্রীঃ অঃ) পুঁথি

বাপে পোএ পক্ষরাজ গেল দিক উত্তর।
বানর কটক লঞা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণসাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া বানর গুনিল প্রমাদ॥

দিগবিদিগ নাহি জানি ভূমি আকাশ মণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল ॥
জলজন্তু খলবল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে ছায়া দেখি দেব দাপুনি ॥
আকাশে উঠিয়া লাগে ঢেউ পর্বত প্রমাণ।
সাগরের কুলে বসিঞা বানরের দেয়ান ॥
সাগরের বিক্রম দেখিঞা বানর নৈরাস।
মহাবির অঙ্গদ দিলেক আশ্বাস ॥

(কলি. বিশ্ব. পুঁথি নং ৭৬)

শ্রীরামপুরের ১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দের মুদ্রিত সংস্করণ

বাণ পেয়ে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর
কটক লইয়া অঙ্গদ গেল দক্ষিণসাগর।
তর্জন গর্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ
সাগরের ঢেউ দেখিয়া গণিল প্রমাদ।
দিগ্বিদিগ না চিনিল গগন মণ্ডল
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল।
জলজন্তু কলরব করে সাগরের পানি
ত্রিভুবনের ছায়া যেন দেবের দাপিনী।
জলজন্তু সব দেখিতে পর্বত প্রমাণ
সাগরের কূলে চাপিয়া বানরের দেয়ান।
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস
মহাবীর অঙ্গদ তারে করিছে আশ্বাস।

এখানে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরামপুর মিসন-প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পাদক মোটামুটিভাবে পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিলেও ছন্দ ও ভাষার ত্রুটি কিছু কিছু সংশোধন করিয়া লইয়াছেন এবং দুই-একটি তৎসম শব্দ যোগ করিয়া পুথির পাঠকে যথাসম্ভব সংস্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণে পুঁথির পাঠ যে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ছন্দের সমতার জন্য কিছু কিছু শব্দ সংযোজিত হইয়াছিল, কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিছু-বা পরিবর্তিত হইয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তী কালে বটতলা হইতে প্রকাশিত রামায়ণে যেমন যে-কেহ যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, সেরূপ কোন আমূল পরিবর্তন শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু পরে ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে কলিকাতায়ও বহু বাংলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত মুদ্রাযন্ত্র হইতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, বৈষ্ণবগ্রন্থ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল ; ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে কলিকাতায় মুদ্রিত কোন রামায়ণের কপি পাওয়া যায় নাই। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন হইতে রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে এই মুদ্রণকার্য শেষ হয। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জযগোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণটি সম্পাদনা করেন। তিনি কাব্যেব অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নিজেরও কিছু কবিত্বশক্তি ছিল। ফলে এই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনাকালে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথম সংস্করণের পাঠ বহু স্থলে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করিযাছিলেন। শুনা যায় জয়গোপাল নাকি বলিতেন—"কৃত্তিবাসের রচনা বড গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বডই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে" (১৩০১ সনেব সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উদ্ধৃত)। সে যুগের প্রাচীন সাহিত্যামোদীরা বিশ্বাস করিতেন যে, কৃত্তিবাসী পুঁথিতে অনেক ভুলত্রুটি আছে, সুতরাং মুদ্রণে তাহার সংশোধন ও পবিমার্জন আবশ্যক। জযগোপাল কৃত্তিবাস-সংস্কারকার্যে অবতীর্ণ হইলে কেহই উদ্বিগ্ন হন নাই ; সকলে এই ভাবিযা আশ্বস্ত হইযাছিলেন যে, এত দিনে কৃত্তিবাসেব বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইবে—বিশুদ্ধ, অর্থাৎ জয়গোপাল-পরিমার্জিত। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দেব 'সমাচাব দর্পণে' এই মর্মে সংবাদ বাহির হয যে, ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দের পর কৃত্তিবাসী রামাযণ দীর্ঘকাল মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু পুনঃপ্রকাশের জন্য কোন সুপণ্ডিত কাব্যটির সংস্কার সাধন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য এই 'সুপণ্ডিত' হইলেন জযগোপাল তর্কালঙ্কার। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী বামায়ণের প্রথমখণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয। ঐ বৎসরের 'সমাচাব দর্পণে' প্রকাশিত হয় যে, "কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্তৃক তরজমা করা" এবং "উত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত" হইয়া উক্ত রামায়ণ বিক্রযার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে চারি বৎসরের মধ্যে (১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ অঃ) জয়গোপাল রামায়ণের সমস্ত কাণ্ড "সুসংশোধিত" করিয়া প্রকাশ করেন। জয়গোপালকৃত এই সংশোধন সে যুগের সকলেই জানিতেন এবং মানিয়া লইয়াছিলেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিতে' (১ম ভাগ, ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দ) বলিয়াছিলেন যে, প্রচলিত রামায়ণ জয়গোপাল কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে সংশোধিত হয় এবং বাজারে চলতি রামায়ণ জয়গোপাল-সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ

মাত্র। ঐ বৎসর প্রকাশিত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে' ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীরামপুর মিসন-প্রকাশিত রামায়ণের দ্বিতীয় সংস্করণে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহার কিছু রচনাশক্তি ছিল বলিয়া সংযোজনগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের সেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল কিনা সন্দেহস্থল। যদি সেরূপ শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনিও জয়গোপালের মতোই পুঁথির ত্রুটিযুক্তি পাঠ ও ছন্দঃপতন সংশোধিত করিয়া দিতেন,—দ্বিতীয় সংস্করণে জয়গোপালকে এত পরিশ্রম করিতে হইত না। জয়গোপাল কী পরিমাণে পাঠ বদলাইয়াছিলেন, নিম্নে দুই সংস্করণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

॥ আদিকাণ্ড ॥

১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভাকর পর
লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর।
অদ্ভুত গাছ আছে দেখিতে সুচারু
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু।
নাহি দিবা নাহি নিশি চন্দ্র সুর্য্যের প্রকাশ
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আওয়াস।
নেতপাট সিংহাসন ওপরেতে তুলি
বীরাসনে বসিয়াছেন ঠাকুর শ্রীহরি।
মনে ২ প্রভুর হইল উল্লাস
এক অংশে চারি অংশ হইব প্রকাশ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হইল ভরত শত্রুঘ্ন
এক অংশে চারি অংশ হৈল নারায়ণ।
লক্ষ্মীমূর্তি সীতাদেবী বসিয়াছেন বামে
সোনার ছত্র ধরিয়াছে ঠাকুর লক্ষ্মণে।
চামর বুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন
যোড়হাতে স্তব করে পবন নন্দন।

১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত জয়গোপাল-সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভাকার পর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চাই তাহা পাই নাম কল্পতরু ॥
দিবানিশি সদা চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী ॥
মনে ২ প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশ চারি অংশে হৈল নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীমূর্ত্তি সীতাদেবী বসেছেন বামে।
স্বর্ণ ছত্র ধরিয়াছে লক্ষ্মণ শ্রীরামে ॥
চামর ঢুলায় তারে ভরত শত্রুঘ্ন।
যোড়হাত স্তব করে পবন নন্দন ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, জয়গোপাল পয়ার ছন্দকে যথাসম্ভব চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যে আনিয়াছেন এবং তদ্ভব শব্দ বদলাইয়া তৎসম শব্দপ্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে বর্ণনা বা আবেগপ্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেখানে জয়গোপাল শুধু শব্দ পাল্টাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহু নূতন ছত্র যোগ করিয়া দিয়াছেন। এই নূতন পাঠগুলি সুখপাঠ্য, কিন্তু ইহাতে পুঁথির কৃত্তিবাস আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত 'সীতাহরণে রামের বিলাপ'-শীর্ষক পয়ার ছত্রগুলি বাঙলা দেশে সুপরিচিত। তৎসম শব্দ ও পয়ারবন্ধন এখানে রামের আর্তিকে ক্লাসিক সংহতি দান করিয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহার প্রায় সমস্তটাই জয়গোপালের রচনা—পুঁথিতে নাই, শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণেও ঠিক এই আকারে নাই। নিম্নে একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুঁথি এবং শ্রীরামপুরের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের (জয়গোপাল-সম্পাদিত) কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

অরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত

॥ সীতাহরণে রামের বিলাপ ॥

আশ্রমের চারি দিগে চাহে রঘুবিরে।
বিচারি বৃক্ষের তলে ডাকে উচ্চস্বরে ।।
কথা গেলা সিতা দেবি না দেয় উত্তর।
বহিতে আছে ধারাজল নয়নের ।।
না দেখী জানকি দেবি সর্ব দেখে খুন্য।
সিতা ২ বলি কান্দএ দুই জন ।।
পাছরে খাইয়া পড়ে রঘুবংসপতি।
মোরে ছাড়ি কথা গেলা গুনবতি ।।
কাল ক্ষেণে অরৈণ্যে আইলাম তিন জন।
হা সীতে হারাইলাম মুই কষ্ঠের ভোরণ ।।
কোন জনে হরি নীল আমার বনিতা।
আজি শুন্য পূরি মোর করিল বিধাতা ।।
ভাল সে করিল বাপে পাঠাইযা বনেতে।
আপনার বনিতা নারিলাম রাখীতে ।।
কেমনে করিমু মুই রার্য্যের পালন।
ত্রিভোবনে মোর সম নাহী অভাজন ।।
না জান লক্ষ্মণ ভাই সীতার জত গুন।
ক্ষেমাএ পৃথিবিসম কায্যেত নিপুন ।।
যুক্তীএ মুন্ত্রির তুল্য কর্ম্মকালে দাসী।
সয়ন কালেতে সীতা বেস্যা হেন বাসী ।।
ভোজনের কালে সীতা মাএর সমান।
এমত জানকি দেবি কি দিব উপ ম ।।
হাহা পৃয়া সীতাদেবি কোথা গেলা এড়ি।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরাইতে না পারি ।।
হরের ধনুক ভাঙ্গি কৈলাম পরিনয়।
তুমীহ বঞ্চনা মোরে দেখীয়া সমএ ।।
রার্য্য নাষ বনবাষ বাপের মরন।
অন্তকালে সীতা দেবি হারাইলাম বন ।।
না পারি সহিতে দুক্ষ আপনে দুর্ব্বল।
খিধা হইলে কাহাক্তে খুজিমু অন্নজল ।।

ঘুনিয়া হাসীব সব পৌরক্ষ আমার।
রাখীবারে না পারিলাম পত্নি আপনার ॥
ক্ষেণেকে গৃহেতে সোএ ক্ষেণেকে বাহির।
ভূমীতে লোটাই কান্দে রঘুবির ॥
হাহা সীতা করি রাম করে বিলাপন।
দুই ভুজ তুলী রাম পরিল তখন ॥

(ক. বি. পুঁথি—৬৬০২ ;
দেড়শত বৎসরের অনধিক পুরাতন)

১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম সংস্করণ

চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরী তীরে
সীতা ২ বলিযা রাম ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে।
তপোবনে আছে যত মুনি পত্নীগণ
রামের ডাক শুনিয়া তারা আইল ততক্ষণ।
কান্দিয়া বিকল রাম ফুলিল দুই আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত বনের পাখি।
কাদিতে ২ রামের ফুলিল দুই আঁখি
কোন বনে রহিয়াছে সীতা চন্দ্রমুখী।
সীতা ২ বলিয়া রাম পড়েন ভূমিতলে
ভাই ২ বলিয়া লক্ষ্মণ রাম কৈল কোলে।
দুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি
দেখা দিয়া রাখ প্রাণ সীতা চন্দ্রমুখী।
ত্রিভুবন জানে তুমি সোহাগে আগল
লুকাইয়া গন্ত কর হইনু পাগল।
আমারে লুকাইয়া কিবা আছ মুনির ঘরে
ঘরের ভিতর দেখি সীতা কি কর্ম্ম করে।

* * *

রাম বলেন দেখি কুড়িয়ার বাহিরে
লুকাইয়া সীতা আমারে উপহাস করে।
সর্ব্বজ্ঞ কোথা আছে কহত আমারে
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা খাইল সীতার তরে।
বনজন্তু পাইয়া সীতা করিল সংহার
ইহলোকে সীতার সনে দেখা নাহি আর।

ধাইয়া যায়েন রাম গোদাবরির কূলে
কাঁদি কাঁদি যান রাম আউদড চুলে।
ব্যাকুল হইয়া রাম চাহেন বনলতা
পাতি ২ করিলেন না দেখেন সীতা।
রাম বলেন গোদাবরীতে পদ্ম দেখি
পদ্ম আনিতে গিয়াছেন সীতাত জানকী।
পদ্ম আনিতে সীতা গিয়াছেন কৌতুকে
সীতা চাহিতে দুই ভাই পদ্মবনে ঢোকে।
শোক উপবাসে রাম হইল পাগল
আউদড় চুলে বেড়ান হইয়া বিকল।
রাম বলেন ভাই দুঃখ পাই অকারণ
সীতা লইয়া অন্তরীক্ষে গেল কোন জন।
নানা স্থানে চাহেন রাম বনের ভিতর
আরবার সীতা চাহিতে আইসেন সেই ঘর।
রাম বলেন পঞ্চবটী পুণ্যস্থান তুমি
গোদাবরির নিকট তেঁই রহিলাম আমি।
তাহার উচিত ফল দেহত আমারে
শূন্য দেখি নিকেতন সীতা নিল কোন চোরে।
রাম বলেন মৃগপক্ষী শুন বৃক্ষলতা
কে হরিয়া নিল মোর চন্দ্রমুখী সীতা।

১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ অব্দের দ্বিতীয় সংস্করণ

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে লইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রযাস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস ॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥
সৌদামিনী যেমন লুকায জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিনে সকলি অন্ধকার ॥
দশদিকে শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্য স্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥
তাহার উচিত ফল দিলা হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে ॥
শুন শুন মৃগপক্ষী শুন বৃক্ষলতা।
কে হেরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥

এখানে তিনটি পাঠ মিলাইলে দেখা যাইবে যে, জয়গোপাল প্রথম সংস্করণের পাঠের বহু স্থলে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মুদ্রিত সমস্ত কৃত্তিবাসী

রামায়ণে জয়গোপালের পরিমার্জিত পাঠই প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে। শুনা যায় বটতলার মোহনচাঁদ শীল নামক এক পুস্তক-ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম তের জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে জয়গোপালের সংস্করণটিকেও নানা স্থানে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মোহনচাঁদ শীলের সংস্করণই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল (দ্রষ্টব্য : পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকা)। আমরা জয়গোপালের পরবর্তী কালে মুদ্রিত কয়েকখানি প্রাচীন রামায়ণ দেখিয়াছি। নিম্নে এগুলির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। কৃত্তিবাসের সুন্দরাকাণ্ড (১২৪৭ সাল)। লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দের 'জ্ঞান উল্লাস' যন্ত্রে মুদ্রিত।

২। ঐ (১২৪৮ সাল)। ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সারসংগ্রহ যন্ত্র' হইতে প্রকাশিত।

৩। মহামুনি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ (১৮৫১-৫২ খ্রীঃ অঃ)। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে' মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)[১৭]

৪। রামায়ণ আদিকাণ্ড (১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ)

৫। উত্তরাকাণ্ড নামক গ্রন্থঃ (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ)

৬। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড (১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ)। কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংশোধিত।

৭। বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ)

৮। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড (১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ)

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত মুদ্রণ প্রায় হুবহু জয়গোপালের অনুকরণে প্রচারিত হইয়াছিল। বটতলার সুলভ ছাপাখানা হইতে বহু রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশকদের বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। ফলে জয়গোপালী সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত করিতে গিয়া তাঁহারা অনেক স্থলেই পাঠের গোলযোগ করিয়া ফেলিতেন। জয়গোপালের "দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ" ছত্রটি এই সমস্ত সংস্করণে হইয়াছে "তোমা নিবারণ", "পদ্মালয়া" হইয়াছে "পদ্মলতা", ইত্যাদি। গুপ্তপ্রেস সংস্করণেও বহু ভুলভ্রান্তি আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীরাম-পুর মিসন-প্রকাশিত ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের

[১৭] সে যুগে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আখ্যাপত্রে প্রায়ই 'বাল্মীকি রামায়ণ' এইরূপ উল্লেখ থাকিত।

দ্বিতীয় সংস্করণটি পরবর্তী কালে মুদ্রণ-আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে 'বটতলা সংস্করণ' নামে কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সংস্করণগুলি বাঙলা দেশের সর্বত্র প্রচার লাভ করিতেছিল, তাহাতে নানা ভ্রমপ্রমাদ প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু পাঠ মিলাইলে দেখা যাইবে যে, ঈষৎ পরিবর্তন সত্ত্বেও ঐ সংস্করণগুলি জয়গোপালী সংস্করণের প্রায় অবিকল মুদ্রণ। অবশ্য পরে যে-কেহ রামায়ণ ছাপাইয়াছিলেন, তিনিই উহাতে কিছু কিছু নূতন শব্দ বা ছত্র যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৩১৪ সনে যোগীন্দ্রনাথ বসু 'সরল কৃত্তিবাস' নামক যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও নিজে অনেক ছত্র যোগ করিযা দিযাছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে বটতলা সংস্করণটির পুনর্মুদ্রণ করিতে গিয়া কাব্যকণ্ডূযনের প্রলোভন দমন করিতে পারেন নাই, দুই-চারি পংক্তি নিজের রচনা কৃত্তিবাসের রচনার সহিত মিশাইয়া দিযাছেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে রামাযণের দুই-একটি কাণ্ড সতর্কতার সহিত সম্পাদনা করিলেও তাহা মুষ্টিমেয গবেষকের আলোচনার বস্তু হইযাছে, সাধারণ পাঠকসমাজে প্রচার লাভ করে নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়

কৃত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

কৃত্তিবাসের রামায়ণ সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তরে যেরূপ সুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তুলসীদাসের রামচরিতমানস ছাড়িয়া দিলে পূর্ব ভারতের আর-কোন কাব্য একটা বৃহৎ নরগোষ্ঠীর চিত্তলোকে এমনভাবে অধিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। বাঙালী-জীবনের উপর দিয়া নানা সঙ্কট ও ঝড়ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের মূল্য সম্বন্ধে এই জাতির যে আমূল মানসিক পরিবর্তন হয় নাই, তাহার একটা বড় কারণ এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ। আর্ষ রামায়ণ যেমন পুরাতন ভারতবর্ষকে নিরাপদ আদর্শের বেষ্টনী দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র পূর্ব ভারতকেও শান্ত স্নিগ্ধ জীবনাদর্শের মধ্যে নির্ভর আশ্রয় দিয়াছিল। বাংলা দেশে মধ্যযুগে নানা প্রকার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে: ভাগবত, মহাভারত, পুরাণের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, মহাজন-জীবনী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর বিশেষ ধরনের মনোভাব ধরা পড়িলেও রামায়ণকে বাদ দিলে এমন একখানি গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহা কালের সীমা ছাড়াইয়া বাঙালীর চিরন্তন মানসপ্রবণতাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্য একটা বিশেষ যুগ বা অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে সকলের মধ্যে এরূপ অখণ্ড জনপ্রিয়তা বাংলা দেশের অন্য কোন কাব্য লাভ করিতে পারে নাই। মুষ্টিমেয় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ বাদ দিলে, কৃত্তিবাসের সহিত পরিচয় নাই এমন বাঙালী দুর্লভ। আধুনিক কালে নূতন ভাবধারার আবির্ভাব হইলেও রামায়ণ-কথা আমাদের বর্তমান জীবন হইতেও মুছিয়া যায় নাই। বলিতে কি, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবিকা এবং জীবিকা বহির্ভূত মানসিক ঐতিহ্যের প্রতিটি পর্যায়ের সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে, সুখেদুঃখে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের আত্মার খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র—ইঁহাদের কবিত্বশক্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, কেহ-বা

উৎকৃষ্টতর সৃষ্টিশক্তির অধিকারী; কিন্তু কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন বাঙালী কবি, প্রাচীন ও নবীন—উভয় যুগের বাঙালীর মানসিক জীবন প্রবাহকে এমনভাবে গৃহাদর্শের দিকে ফিরাইতে পারেন নাই। কৃত্তিবাস বাঙালী-জীবনের মূল সুর যেন প্রাক্তন সুকৃতিবশেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। বাঙালী যাহা চাহিয়াছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাহা সে পাইয়াছে। বাঙালী-জীবনের কালনিরপেক্ষ এমন একটা সামগ্রিক রূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিকশিত হইয়াছে যে, মনে হয়, তিনি যেন পুরাণকথার আধারে বাঙালীর জীবনরসকেই পরিবেশন করিয়াছেন। পাঠানযুগের সমাজ মুঘলযুগে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিদেশী বণিকের অধীনে শুধু সমাজব্যবস্থা পাণ্টায় নাই, জীবনের মূল্যবোধও বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও অদ্যাপি বাঙালী-জীবনে কৃত্তিবাসের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কৃত্তিবাসের পর অন্যূন পঁচিশ জন কবি রামায়ণে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের বালুকাতলে কাহারও-পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না—কৃত্তিবাস এখনও বঙ্গসমাজে অম্লান মহিমা লইয়া বিরাজ করিতেছেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে তিন যুগে অমর হইবার বর দিয়াছিলেন; কৃত্তিবাসও সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। বাঙালী-জীবনের মূল্যাদর্শের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না হইলে বাঙলা দেশে কৃত্তিবাসের প্রভাব কোন দিনই খর্ব হইবে না।

॥ ১ ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণ-বিশ্লেষণ

কাহিনী ॥

কৃত্তিবাসের রামায়ণকে কোন কোন সমালোচক মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন, কেহ-বা ইহাকে পাঁচালীর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন যুগে কৃত্তিবাসকে সকলে পাঁচালীকার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন কুলজীগ্রন্থে তাঁহাকে "ধীমান্ পণ্ডিত" বলা হইয়াছে, কোথাও-বা "কবি কৃত্তিবাস" বলা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে মহাকবি এবং তাঁহার গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা হয় নাই। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় আলঙ্কারিক আদর্শ ধরিয়া বিচার করিলে ইহার কাহিনী, চরিত্র ও রসের ঐক্যজনিত সমুন্নতিকে মহাকাব্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরিলে অন্যায় হইবে না। ইহা বাল্মীকির আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও অনুসরণ বটে। ঘটনা ও চরিত্রে কিছু

কিছু শিথিলতা থাকিলেও, সপ্তকাণ্ডের মধ্যে যে কাহিনীগত ঐক্য নাই, তাহা নহে। বাল্মীকি সমগ্র কাহিনীকে (অযোধ্যাকাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত) যেভাবে ঘটনাবেগে গতিশীল করিয়াছেন, আকস্মিকভাবে ঝড়ো হাওয়ায় স্বাভাবিক পারম্পর্যকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়াছেন, বলিষ্ঠ বীর্য ও করুণ বেদনার সংমিশ্রণে মানবরসোজ্জ্বল মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ আর্ষ শক্তি, বেদব্যাসকে ছাড়িয়া দিলে, পৃথিবীর আর-কয়জন মহাকবিরই-বা আছে? সেই দিক দিয়া বাল্মীকির কাহিনীর সহিত কৃত্তিবাসের কাহিনীর তুলনাই হয় না। সুলভ ভক্তির আবেগার্দ্র উচ্ছ্বাস, করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ এবং নিয়তির অঙ্গুলিসঙ্কেতে-পরিচালিত জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কৃত্তিবাসের কাহিনীর বাহিরের বিশালতাকে আভ্যন্তরীণ মহাকাব্যের ভূলোক দ্যুলোকসঞ্চারী অখণ্ড করুণরসপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে নাই। বরং তুলসীদাসের রামচরিত-মানসের মধ্যে আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিভাবের পাবনী ধারা গীতিকাব্যোচিত আবেগে পরিণত হইলেও কাহিনীর বিশালতা এবং গম্ভীরতা কৃত্তিবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। জয়গোপাল এবং মোহনচাঁদ শীলের পরিমার্জনের ফলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির অনেক ত্রুটি দূর হইয়াছে। ইহাতে পুঁথির বিশুদ্ধি খর্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু এই কারণেই সমগ্র কাব্যটি আধুনিক যুগেও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাসের ধর্ম নষ্ট করিবার অপরাধে আমরা যখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মোহনচাঁদ শীল ও বটতলার প্রকাশকদের নিন্দা করিয়া থাকি, তখন একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুঁথির মধ্যে কৃত্তিবাসের যে কাব্যরূপটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা মুদ্রাযন্ত্রে অবিকলভাবে গৃহীত হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ গবেষক এবং কীটের ভোজ্যে পরিণত হইত, আধুনিক কালে বাঙালী জাতির নিকট এত মর্যাদা লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, গত একশত-দেড়শত বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তনের ফলে কৃত্তিবাসের মূল স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কাহিনীটি শিথিলতাদোষমুক্ত হইয়া বহিরঙ্গগত সংহতি ও বিশালতা লাভ করিয়াছে; ফলে মহাকাব্যের কাহিনীগত ঐক্য ও সংবেগমুখর ঘটনা-প্রবাহ ইহাকে পাঁচালীর পর্যায়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে দেয় নাই। যদিও কবি উত্তরকাণ্ডের অনেক কথা বালকাণ্ডে সারিয়া লইয়াছেন, অনেক অভিনব কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছেন, কখনও-বা মূল কাহিনীকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়াছেন, তবু তুলসীদাসের রামচরিতমানসের মতো উৎকৃষ্ট না হইলেও,

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কাহিনীগত পারম্পর্য ও সংহতি যে বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।)

(কেহ কেহ ইহার কোন কোন কাহিনীকে শিশুমনোরঞ্জনের উপযোগী বলিয়াছেন। তাড়কাবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, ভরতের বাঁটুলে হনুমানের আকাশ হইতে ভূমিতলে পতন, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ প্রভৃতি কাহিনীরচনায় কৃত্তিবাস শিশুসুলভ অতিরঞ্জন ও অবিশ্বাস্য আজগুবী ঘটনায় পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং এইজন্য তিনি কোন কোন সমালোচকের নিকট কিছু নিন্দিত হইয়াছেন। "কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙালীর চিত্ত অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতূহলী ছিল।" কৃত্তিবাসের কাব্যেও তাই শিশুপ্রীতিকর ঘটনাব বাহুল্য দেখা যায়। এ বিষয়ে আমাদেব মনে হয়, শিশুচিত্তরঞ্জনের অনুরূপ কাহিনী শুধু একা কৃত্তিবাসেই নাই, পাশ্চাত্ত্যে হোমার হইতে মিল্টন এবং প্রাচ্যে আর্য ও পৌরাণিক মহাকাব্যে বহু অতি-লৌকিক ও অনৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণিত হইযাছে। ভাবতীয পুরাণ এবং গ্রীক আখ্যানে যে কত অদ্ভুত গল্পকাহিনী আছে তাহা কৌতূহলী পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন।) যখন আধুনিক যুক্তিবাদের জন্ম হয নাই, জগৎ ও জীবনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয নাই এবং দেশ ও কালেব সীমা এত প্রসাবিত হয় নাই, তখন জনমনোরঞ্জনের জন্য লিখিত আর্ষ মহাকাব্যগুলি (Epic of Growth) যে আধুনিক রুচিব নিকট এইরূপ অতিবঞ্জন-দোষদুষ্ট ও শিশুসুলভ বিশ্বাসপ্রবণতায় উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু যে-কোন প্রাচীন মহাকাব্যেই এইরূপ শৈশব-প্রেরণা উপলব্ধি করা যাইবে। আর্য মহাকাব্যগুলি মানবসভ্যতাব প্রায শৈশবেই রচিত হইযাছিল।

(কৃত্তিবাসী রামায়ণেব কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কবি আর্য রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনীর মহাকাব্যোচিত বেগশীলতার মর্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, বহু স্থলেই তিনি মূল কাহিনীকে সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছেন, বাল্মীকির নিসর্গবর্ণনার অপরূপ মাধুরী প্রায়শঃই জাতিকুল হারাইয়া ফেলিয়াছে। তথাপি তাঁহার পাঁচালীব মধ্যে এমন কয়েকটি কাহিনী আছে যাহার মানবরস পরম উপভোগ্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত কাহিনীগুলির মধ্যে বাল্মীকির অনুরূপ বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় না থাকিলেও কৃত্তিবাসের স্নিগ্ধ জীবনাদর্শ ইহার মধ্যে একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে:—(১) দশরথ কর্তৃক সিন্ধুবধ, (২) রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন, (৩) সীতা-হরণে

রামের বিলাপ, (৪) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা, (৬) সীতা-নির্বাসন, (৭) লবকুশ কর্তৃক রামসৈন্যের পরাভব, (৮) সীতার পাতাল-প্রবেশ, (৯) রামের লক্ষ্মণবর্জন, (১০) হনুমানের দাস্যভক্তি।

এই কাহিনীগুলিতে মানবজীবনের পরিচিত সুখদুঃখের রূপটি অধিকতর ফুটিয়াছে ; বাঙালী রামরাবণের ভয়াবহ সংগ্রামের পার্শ্বেই একটা স্বচ্ছ জীবনরস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই কাহিনীগুলি মহাকাব্যের বিশালতা অপেক্ষা গীতিকাব্যের অন্তর্লীন গভীরতাসৃষ্টিতে অধিকতর সার্থক হইয়াছে

চরিত্র ॥

কৃত্তিবাস চরিত্রসৃষ্টিতে কত দূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন। (বলাই বাহুল্য যে, মূল রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে সুমহৎ আদর্শ ও বৃহৎ জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে, মধ্য-যুগীয় কৃত্তিবাসের মধ্যে তদনুরূপ চরিত্রচিত্রণ-কুশলতা আশা করা যায় না। কৃত্তিবাস যে সমাজ ও জনসঙ্ঘের সম্মুখে রামকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের মানসিক প্রবণতা অনুসারে কিছু গ্রহণবর্জনের দ্বারা তিনি আর্য মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে বাঙালীর জীবনাদর্শ ও চিত্তপ্রবণতার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং আর্ষ রামায়ণের যক্ষরক্ষ-দেবদানব নরবানরের পৌরাণিক বৈচিত্র্য কৃত্তিবাস-পরিকল্পিত চরিত্রে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। বাল্মীকি-রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ ভরত, সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান, রাবণ-বিভীষণ-কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিৎ, কৈকেয়ী-মন্থরা-সীতা-তারা-মন্দোদরী—প্রত্যেকটি চরিত্র বিশেষ দোষ বা গুণের প্রতীক হইয়াও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একান্ত-ভাবে ব্যক্তিস্বতন্ত্র।) রামায়ণের চরিত্র এক দিকে পৌরাণিক আদর্শের মহত্তম দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করিতেছে, অপর দিকে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র ও মানসিক গঠন শিল্পরূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা মহাকাব্যের সমতল চরিত্রকে পিছনে ফেলিয়া অমসৃণ, বক্র ও বর্তুল জীবনের নানা বিচিত্র বিস্ময়কে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই রামায়ণ মহাকাব্যের মাঝে মাঝে নাটকের মতো ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা এবং আধুনিক কথাসাহিত্যের চরিত্রানুরূপ জটিল জীবনদ্বন্দ্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। (দশরথের সত্যাশ্রয়ী বিষণ্ণতা এবং স্নেহব্যাকুলতা, কৈকেয়ীর নীচ

স্বার্থান্ধতার তীরবৎ ঋজুগতি, রামচন্দ্র ও সীতার সর্বংসহ জীবনাদর্শ, লক্ষ্মণের বাস্তবানুগামী বলিষ্ঠ পৌরুষ, ভরতের শুচিস্নিগ্ধ জীবনের পূত কথা, রাবণের বর্বর দম্ভ—এ সমস্তই উচ্চতর নাট্য ও মহাকাব্য-কৌশলের সহিত মিশ্রিত হইয়া একখানি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। আবার রামের নির্বাসনে দশরথের বিলাপ, সীতাহরণে রামের আর্ত ক্রোধ, বর্ষাগমে রামচন্দ্রের রোদনভারাতুর সীতাসঙ্গবাসনা—ইহার গীতিরসসিক্ত অপূর্ব মাধুরীর-ই বা তুলনা কোথায় মিলিবে? প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবন, ধর্ম, আদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা বারংবার পরিবর্তিত হইলেও আর্ষ রামায়ণের নীতিধর্ম, পৌরুষ, চারিত্রবীরত্ব, ত্যাগতিতিক্ষা—এ সমস্তই সমগ্র জনসমাজের প্রহরিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া আদর্শ ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনকেও অবহেলা করিয়াছে। আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার বিপুল ঐশ্বর্যের যুগেও রামকথা ভারতবাসীর আত্মার নিকটতম আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে আর্ষ রামায়ণের বিপুল ব্যাপ্তি, উচ্চ মহনীয়তা, অমানুষিক বর্বরতা—কোনটাই মহাকাব্যের বিশালতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারে নাই। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রাণ, অশ্রুসজল ও আবেগব্যাকুল, লক্ষ্মণ অপরিণামদর্শী উদ্ধত; স্ত্রৈণ দশরথ অসহায় ক্লীবমাত্র, কৈকেয়ী-মন্থরা নীচ স্বার্থকামী; ভরতের মহত্ত্ব ও ত্যাগ রক্ত-মাংসহীন পিঙ্গল আদর্শের নিষ্প্রাণতায় সমাচ্ছন্ন, বালি, সুগ্রীব, হনুমানাদি শাখামৃগত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, সীতা সর্বংসহা কান্তকোমল শাশুড়ী-তর্জিতা ও ননদী-ভীতা বঙ্গবধূর মতো অস্থিহীন কোমল মূর্তিমাত্র। রাক্ষস রাবণ একাধারে বর্বর দুর্বিনীত, অপরদিকে প্রচ্ছন্ন ভক্তির গঙ্গোদকে নিত্যস্নায়ী। বীরবাহু-তরণীসেন অহিরাবণ-মহীরাবণ—কেহ ভক্তিরসে, কেহ বীররসে, কেহ করুণরসে আর্দ্র হইয়া সজল বাঙলা দেশের প্রকৃতিকেই যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের রামকাহিনী বাঙলা দেশে আসন গ্রহণ করিয়া মহাকাব্যের গগনস্পর্শী আদর্শকে বাঙলার অপরিসর চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপন করিয়াছে। ছোট ছোট সুখদুঃখ, কোমল করুণা, সুসহ বেদনা, অমার্জিত রঙ্গরস—এককথায় মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবনাদর্শই যেন কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের পূর্বে বাঙলা দেশে মনুষ্যত্বের আদর্শ নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল; বীরত্ব বা ভক্তি—কোন দিকেই

বাঙালীর সদাসন্তুষ্ট সীমায়িত জীবন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তখন দেশে পাঠান-অধিকার সুস্থায়ী হইয়াছে, দুই-একজন হিন্দু ভূস্বামী পরিমিত সীমার মধ্যে কিছু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। গণেশ কয়েক বৎসর গৌড়ের মসনদে বসিলেও তাঁহাকে কিরূপ পরিবেশে মানাইয়া চলিতে হইয়াছিল, তাহা তৎপুত্র যদুর জলালুদ্দিন হওয়াতেই বুঝা যাইতেছে। রাষ্ট্র মুসলমানের কবলিত, অর্থভূসম্পত্তি আমীর ওমরাহের অংশীভূত, হিন্দুর ধর্ম পীর-ফকির-গাজী ও সুলতানের উৎপাতে সন্ত্রস্ত। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় মহাকাব্যের বিশাল মূর্তি ও চরিত্রের উচ্চতম সমুন্নতি আশা করা যায় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলি বাঙালীর গৃহাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া কাশী-কোশল-মগধ-বিদিশা ত্যাগ করিয়া বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই আর্ষ মহাকাব্যের সীতা-চরিত্র কৃত্তিবাসের লেখনীস্পর্শে বাঙালীর সর্বংসহা অশ্রুমুখী কুলবধূতে পরিণত হইয়াছে। বনগমনের প্রাক্কালে রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইতে সঙ্কুচিত হইলে ক্ষত্রিয়াণী জনকনন্দিনা মৃত্তিকাসম্ভবা হইয়াও আকাশচারী বিদ্যুৎশিখার মতো বলিয়াছিলেন :

> "হে রাম! আমার পিতা মিথিলাপতি জনকরাজ তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ ও ব্যবহারে স্ত্রী বলিয়া জানিতেন কি? বোধহয়, তাহা হইলে তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেন না।"

এই উক্তির ব্যঙ্গের তির্যকতা কৃত্তিবাসী রামায়ণে তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ফেলিয়াছে :

> পণ্ডিত হৈয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
> কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
> নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
> দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে॥

রাবণ সীতাকে হরণ করিতে আসিলে বাল্মীকির সীতা "সেই দুষ্টস্বভাব রজনীচর রাবণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় গাত্রকম্পে ব্যথিত হইয়াছিলেন।" কৃত্তিবাসের "জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ী।" অপহৃতা সীতা স্বীয় দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া রাবণকে নিন্দা করিয়া বলেন, "হা গুরুচিত্তপ্রসাদক মহাবাহু লক্ষ্মণ! কামরূপী রাক্ষস কর্তৃক আমি হৃতা হইতেছি; ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না। হা রাম! তুমি ধর্ম রক্ষার্থ প্রাণ, সুখ ও

অর্থ সমুদায়ই ত্যাগ করিয়া থাক। এক্ষণে আমি অধর্ম কর্তৃক হৃতা হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? হে শত্রুতাপন! তুমি অবিনয়ীদিগের শাসন করিয়া থাক; তবে কেন এবম্বিধ পাপাঙ্ক রাবণকে শাসন করিতেছ না?"* এইরূপ স্থলে কৃত্তিবাসের সীতা অসহায়ের মতো বিলাপ করিয়া বলেন:

ত্রাসেতে কান্দেন সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর॥
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ॥

লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র সীতাচরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং রূঢ় ভাষায় অপবাদ দিলেন, "সীতে! তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তুমি আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া নেত্ররোগীর সম্মুখস্থিত দীপশিখার ন্যায় দুর্বিষহ যন্ত্রণা দিতেছ।" তখন সীতা সতীত্বের গৌরবে এবং পিতৃকুলের মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, "মহাবাহো! আপনি যেরূপ বোধ করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি।... সামান্যা স্ত্রীলোকের চরিত্রদর্শনে আপনি স্ত্রীজাতিকেই আশঙ্কা করিতেছেন।... হে রাজশার্দূল! আপনি কেবল ক্রোধের বশবর্তী হইয়া লঘু মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত স্ত্রীধর্ম ব্যতীত কিছুই বিবেচনা করিলেন না। প্রখ্যাত ধার্মিক জনকের দুহিতা বলিয়া কি আমার পরিচয় নহে? যজ্ঞভূমি হইতে কি আমার উৎপত্তি হয় নাই?" এইরূপ স্থলে কৃত্তিবাসের সীতা বলেন:

সবে মাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ॥

বলাই বাহুল্য যে, বাল্মীকির সীতা ধরিত্রীজাতা হইলেও তাহার মধ্যে যজ্ঞবেদী-সমুত্থিতা দ্রুপদনন্দিনীর মতোই তীব্র দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে, কিন্তু কৃত্তিবাসের সীতার মধ্যে এইরূপ চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের তির্যক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না।

কৃত্তিবাসের রণক্ষেত্রে পতিত মুমূর্ষু রাবণ রামচন্দ্রকে "ব্রহ্ম সনাতন" ও "অনাদি পুরুষ" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছে:

অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ॥

* অনুবাদগুলি বসুমতী সাহিত্যমন্দির-প্রকাশিত বাল্মীকি রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার ॥

কিন্তু বাল্মীকির রাবণচরিত্রের বীর্য ও দার্ঢ্য কোথাও নতি স্বীকার করে নাই। যে হনুমানকে বাল্মীকি ঋকসামযজুর্বেদে পরম প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন, কৃত্তিবাস সেই হনুমানের যে-চিত্র অঙ্কন করিযাছেন, তাহাতে তাঁহার বানর-স্বভাব বহু স্থলেই প্রকটিত হইয়াছে। মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া হনুমান পবিত্র পূজার আয়োজন অপবিত্র করিয়া দিয়াছেন :

হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব ॥
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে।
ফুল ফল গঙ্গের ভাসিয়া যায় স্রোতে ॥

এইরূপ অমার্জিত গ্রাম্য বর্ণনার সহিত মূল রামাযণে সীতা-অন্বেষণে রাবণপুরীতে প্রবেশ করিয়া হনুমান রাবণবক্ষে প্রসুপ্ত মন্দোদরীকে সীতা মনে করিয়া বানর স্বভাববশতঃ যে-প্রকার চপল আচরণ করিযাছিলেন, তাহার বর্ণনা তুলনা করা যাইতে পারে :

> বানর-যূথপতি মহাবাহু পবননন্দন সেই সর্বাভরণভূষিতা মন্দোদরীর রূপ-যৌবনসম্পত্তি দর্শনে তাঁহাকেই সীতা মনে করিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন ; এবং বানরস্বভাব প্রদর্শনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, পুচ্ছচুম্বন, আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গী, গান ও লম্ফপ্রদানপূর্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।

রাবণকে বাল্মীকি স্বল্পতম রেখাপাতের সাহায্যে জীবন্ত করিয়া সৃষ্টি করিযাছেন : "পাপরাশিসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।" ইহার সহিত কৃত্তিবাসের বর্ণনা—

নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলধর যেন বিদ্যুৎসঞ্চারী ॥

পাঠ করিলেই মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কনে কৃত্তিবাসের অপটুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বাল্মীকির মহাকাব্য যেমন বিশাল, চরিত্রগুলিও তেমনি মনস্তত্ত্ববিচারে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে অতিশয় উজ্জ্বল। বাল্মীকির মানবচরিত্র আকারে-প্রকারে বাস্তবতা হইতে দূরে অবস্থান করিলেও কোন চরিত্রকেই প্রাণহীন যন্ত্র বলিয়া মনে হয় না। বালকাণ্ডে ও উত্তরাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের ভাগবত মহিমা প্রচারিত

হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি কাণ্ড বাদ দিলে অন্য পাঁচটি কাণ্ডে নর-বানর-রাক্ষসের চরিত্রে মানবীয় ভাবই প্রাধান্য পাইয়াছে। এইজন্য রামচন্দ্রের মধ্যে মানবীয় দুর্বলতাও লক্ষ্য করা যায়। সীতাহরণের পর বর্ষা ও শরৎ বর্ণনাপ্রসঙ্গে মহাকবি স্পষ্ট ভাষায় রামচন্দ্রের কামবিকার বর্ণনা করিয়াছেন। বালী রামকে যে-ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছেন, মহাকবি তাহাতে কোমলত্ব বা ভক্তিভাব সঞ্চারের চেষ্টা করেন নাই।

কৃত্তিবাসের চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে একটা কথা স্বীকার্য যে, পারিপার্শ্বিকতাকে কবি অস্বীকার করিতে পারেন নাই; সমসাময়িক দেশ ও কালের চিত্র অল্পাধিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। গীতিরসে নিমগ্ন আত্মসংহত কবিও সমাজ-পরিবেশ ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন না—বস্তু-প্রধান মহাকাব্যের তো কথাই নাই। হোমারের 'ইলিয়াডে' তৎকালীন গ্রীকজীবনের ছায়া পড়িয়াছে, ভার্জিলের 'ঈনিডে' রোমের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, বাল্মীকির মহাকাব্যেও একটা বিশেষ যুগের ভারত-জীবনাদর্শের প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। সুতরাং কৃত্তিবাস বাল্মীকির কাহিনী অনুসরণ করিলেও চরিত্র-চিত্রণে মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশের জীবন ও চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করিলে বিস্ময়ের কি আছে? সপ্তদশ শতাব্দীর তুলসীদাসও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিবাদ ও আবেগমূলক বাৎসল্য-রসের বাতায়নে দাঁড়াইয়া রামায়ণের মানবযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিকল্পিত চরিত্রেও বাল্মীকির মহিমান্বিত জীবনরহস্য অপেক্ষা গভীর ও আত্মলীন ভক্তির আদর্শই অধিকতর প্রতিফলিত হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার করিতে গিয়া সমস্ত কিছুতেই মধ্যযুগীয় বাঙলা দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিতে যাই, তাহা হইলে ইতিহাস ও সমাজচেতনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া সাহিত্যের যথার্থ তাৎপর্য অস্বীকার করিব। কোন-এক হিন্দী সাহিত্যসমালোচক কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে যাগযজ্ঞবিরোধী যে সমস্ত রাক্ষসদের বর্ণনা আছে, তাহারা আসলে বাঙলার হিন্দুধর্মাচার-বিরোধী বিদেশী সেমিটিক-সম্প্রদায় মাত্র।[১] সাহিত্যবিচারে এইরূপ সমাজমানসিকতার অতিরেক সর্বথা বর্জনীয়। বাঙলার

(১) বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৪শ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিত "সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা" প্রবন্ধে উল্লিখিত।

কোমল আর্দ্র মাটিতে সীতার মতো কল্যাণী গৃহবধূ, রামের মতো ভক্তিপ্রেমের পূত চন্দনপিষ্ট চরিত্র, লক্ষ্মণের মতো সুভ্রাতা ও ভক্তিনত দেবর, রাবণের মতো প্রচ্ছন্ন ভক্ত, বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতি বীরের ভক্তিরস-বীররস মিশ্রিত করুণকোমল অথচ বীর্যবান্ জীবনাদর্শ—এ সমস্তই বাঙলা দেশের নরনারীর জীবনের ছায়াতলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গগনস্পর্শী আর্য আদর্শ এবং বাঙালীর ভূমিচারী মধ্যযুগীয় আদর্শের যে-সমন্বয় কৃত্তিবাসের অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা তাঁহার সজ্ঞান সক্রিয় পরিকল্পনাজাত প্রয়াসের দ্বারা সৃষ্ট নহে। সমাজে বাস করিয়া, বিশেষ ধরনের সমাজচেতনার মধ্যে বর্ধিত হইয়া শিল্পীর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় যে-পরিমাণে দেশকালের প্রভাব সঞ্চারিত হয়, কৃত্তিবাসের কবিচেতনায় সেই পরিমাণেই বাঙালী জীবনের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার অধিক নহে। কাজেই কৃত্তিবাস অঙ্কিত চরিত্রবিচার-প্রসঙ্গে সর্বদা বাঙালী-মানসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রত্যেকটির মধ্যে গৌড়বঙ্গের নরনারীর দৈনন্দিন প্রতিচ্ছায়া আবিষ্কার করিতে গেলে কিছু ব্যর্থ হইতে হইবে।

রসবিচার ॥

প্রাচীন আলঙ্কারিক মত অনুসরণ করিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণে করুণরসকেই অঙ্গিরস বা প্রধান রস বলিয়া মনে হইবে। বীর, করুণ, আদি ও শান্ত—এই চতুর্বিধ রসের মধ্যে যে-কোনটি মহাকাব্যের অঙ্গিরস হইতে পারে; সেই দিক দিয়া আর্য রামায়ণের অঙ্গিরস হইতেছে করুণরস। কৃত্তিবাস রসনিষ্পত্তিতে আর্য আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যাকাণ্ডে-বর্ণিত রামনির্বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাকাণ্ডে-বর্ণিত সীতানির্বাসন ও সীতার ভূগর্ভে প্রবেশ কাহিনী পর্যন্ত সর্বত্রই করুণরসের প্রাধান্য। দশরথের মৃত্যু, রামের নির্বাসনে অযোধ্যাবাসীর বিলাপ, কৌশল্যার আর্তনাদ, অরণ্যে সীতাহরণ, সীতাশূন্য কুটীরে ফিরিয়া রামলক্ষ্মণের বিলাপ, রামচন্দ্রের বালী-বধের জন্য তারার ক্রন্দন, লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবংশ-ধ্বংস, রাবণের পতন, রাবণের বিধবা পত্নীদের আর্তনাদ, রাবণের অনির্বাণ চিতা, সীতার অগ্নিপ্রবেশ—সমস্ত ঘটনায় করুণরস প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উত্তরাকাণ্ডে সীতার নির্বাসন, রামের বিষণ্ণ বেদনা, সীতার পাতালপ্রবেশ এবং গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বে চারি ভ্রাতার সরযূ সলিলে তনুত্যাগ—ইহা অপেক্ষা বেদনাদায়ক করুণ-রসের কাহিনী আর-কোন্ মহাকাব্যে পাওয়া যাইবে? পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলি প্রায়শঃই রণদামামার

নির্ঘোষে বধির; সেখানে করুণরসের অবকাশ থাকিলেও বীররসই অঙ্গিরস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের রামায়ণে মানবজীবনের অশ্রুকাতর বিদায়মুহূর্ত ধীরে ধীরে বিষণ্ণ পরিণতির দিক অগ্রসব হইয়াছে। কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকির অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার উত্তরাধিকারী না হইয়াও করুণরসে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যেখানে করুণরসের প্রকাশ ঘটিবার অবকাশ দেখা দিয়াছে, সেখানেই বাঙালীর বেদনাকাতর বিলাপ সমস্ত ঘটনার উপরেই করুণ মাধুর্য ও কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস ছড়াইয়া দিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামাযণের করুণরস বাঙালী-মানসেব স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যকেই বিকশিত কবিয়াছে। শ্রীবামচন্দ্রকে বাঙালী পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া ভক্তি নিবেদন করিযাছে, রামচন্দ্রের দুঃখহত পবিণামকে দেবতার লীলা বলিয়া আশ্বস্ত হইয়াছে; তবু এই পরিণতিব মধ্য দিযা বিষ্ণুর অবতার পৌরাণিক রামচন্দ্র বেদনার রসে অভিষিক্ত হইযা বাঙালীর মানবীয মর্ত্যচেতনাব পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পৌরাণিক সীতাচবিত্র বাঙালী-কুলবধূব মূল বেদনার মধ্যে আশ্রব লাভ করিযা বাঙলা দেশেব কুলস্ত্রীর নিপীড়িত জীবনমাধুবীকেই বিকশিত করিযাছে। কৃত্তিবাসের সীতাব শুধু সতীত্বেব আদর্শই নহে, তাঁহার পূত চরিতকথাকে বাঙালী দৈনন্দিন জীবনের অশ্রুধাবায ধৌত কবিযা বাস্তব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

কৃত্তিবাস বীরবস ও হাস্যবসের কিছু কিছু চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন বটে; কিন্তু ফুলিয়ার ব্রাহ্মণকবি বীরবসের বর্ণনায বিশেষ সার্থকতা অর্জন কবিতে পারেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবকালে জলালুদ্দিনেব অবসানেব পব বাঙলা দেশে হাবসী অরাজকতা শুরু হইযাছিল; গৌড়েব সেই অবাজকতাব স্রোত বোধহয় নদীযায় প্রবেশ কবে নাই; অভিজ্ঞতাব অভাবে কৃত্তিবাসেব বীরবসাত্মক বর্ণনা যাত্রাদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা মাবাত্মক হইয়াছে বীররসের ক্ষেত্রে ভক্তির অনধিকার প্রবেশ। লঙ্কাকাণ্ডে ইহাব অতিরেক লক্ষ্য করা যাইবে। রাবণ, বীরবাহু, তরণীসেন—সকলেই ভক্ত,—কেহ প্রচ্ছন্ন, কেহ-বা প্রকাশ্য। সুতরাং তাহাদের যুদ্ধ ও পতন তো মুক্তির সুলভতম পন্থা মাত্র। এইরূপ বর্ণনার ফলে বীরবস বহু স্থলেই লঘু হইযা গিয়াছে। বলিতে কি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের যুদ্ধেব যে যৎসামান্য বর্ণনা আছে, তাহা যথেষ্ট বাস্তব হইতে পারে নাই। বরং হিন্দী ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বীররসাত্মক কাব্যে যথার্থ সামরিক পরিবেশ রচিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয়

বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি কোন দিনই দূরীভূত হয় নাই। মঙ্গলকাব্য ও মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহাও কৃত্তিবাসী যুদ্ধবর্ণনার মত কৃত্রিম ও দুর্বল।

পরিহাস-রসিকতায় কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান দাবী করিতে পারেন। যে প্রকার হাস্যরস বাঙালীর রুচিকর, সেই ঈষৎ স্থূল রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনায় কৃত্তিবাস করুণরসের মতোই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। বলাই বাহুল্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সার্থক হাস্যরসের দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিছু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিলক্ষিত হয়; মুকুন্দরাম জীবনের প্রসন্ন স্মিতবিকশিত দিকটিকে কিয়দংশে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন; রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরিত করিয়া করুণরসাশ্রিত আর্দ্র বাংলা সাহিত্যে সূর্যকরোজ্জ্বল শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি আনিয়াছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রঙ্গব্যঙ্গ ও ভাঁড়ামির অনুরূপ যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়াছে, তাহাতে মধ্যযুগীয় বাঙালীর সমাজজীবনের স্বরূপ যথার্থতঃ আত্মপ্রকাশ করিযাছে। হরধনু-উত্তোলনে ব্যর্থ সীতাবিবাহার্থী বিড়ম্বিত রাবণ—

কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশ নিরখে।
মনে ভাবে, পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে॥

সুন্দরকাণ্ডে রাবণের অনুচরগণ হনুমানকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিল—

মনে মনে হাসে তবে পবন কুমারে।
প্রস্রাব করিয়া দিল কান্ধের উপরে।

রাক্ষসগণ হনুমানকে ফেলিয়া পলাইল। বন্দী হনুমানকে দেখিয়া রাক্ষসীগণ রসিকতা করিলে হনুমানও সরস উত্তর দিয়া বলিল যে, রাবণ তাহাকে জামাতা করিবার জন্যই বাঁধিয়া আনিয়াছে:

পরম কুলীন আমি মৌলিক রাবণ।
কুলীনে মৌলিকে বিভা কিবা সুশোভন॥
রাবণ শ্বশুর হবে অন্য বিভাবরী।
সুন্দরী শাশুড়ী পাব রাণী মন্দোদরী॥
ইন্দ্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর।
আর কি হনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর॥

প্রমীলা শালাজ পাব পরমা রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি ॥
কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর।
ইহা জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর ॥

বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসরঘর ত্যাগ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সকৌতুকে লক্ষণীয়।)

লঙ্কাকাণ্ডে বীর নীল রাবণকে যেভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছে তাহার স্থূল বর্ণনা কিছু অমার্জিত ও গ্রাম্য হইলেও বাঙালীর হাস্যবঙ্গপ্রিয় সামাজিক চিত্রটি এখানে স্পষ্টতর হইয়াছে। পবননন্দন হনুমানের জন্মকথা লইয়া জাম্ববান্ ঈষৎ অম্লাক্ত রসিকতা করিলে পবননন্দনের উত্তরটি মারাত্মক হইয়াছে :

তুমি বা কাহার পুত্র মন্ত্রী জাম্ববান।
সকলের সব বার্তা জানে হনুমান ॥
যত যত আসিয়াছে বীর সেনাপতি।
কেবা না জানহ কহ কার মাতা সতী ॥

জন্ম লইয়া বাঙালী জনসাধারণের স্থূল আদিরসাত্মক রসিকতাকে হনুমান তীক্ষ্ণভাবে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

বাঙালীর পারিবারিক পরিহাসের এক উৎকট দৃষ্টান্ত উত্তরাকাণ্ডে পাওয়া যাইতেছে। সীতাকে নির্বাসনবার্তা জানাইবার জন্য লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলে সীতা সরল মনে দেবরের সহিত ভ্রাতৃজায়াসুলভ রসিকতা আরম্ভ করিলেন :

আইস দেবর আজি বড় শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ॥
চৌদ্দ বৎসর একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে।
রাজশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সে কারণে দেবর হে হয়েছ নির্দয় ॥
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতা দেবী বলে।
বার্তা কহ দেবর হে আছ ত কুশলে ॥
তোমা না দেখিয়া মম সদা পোড়ে মন।
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন ॥

"লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে"—এই পরিহাস একেবারে বাঙালী ধরনের

পারিবারিক হাস্যকৌতুক—যাহা বাঙালী ভিন্ন অন্যের নিকট কিছু জুগুপ্সিত মনে হইবে।

রামায়ণের সর্বাধিক জনপ্রিয় পরিহাসব্যঞ্জক অংশ বোধহয় 'অঙ্গদের রায়বার'। লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন :

হে অঙ্গদ মহাবলী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালি ॥

অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া দশাননকে যৎপরোনাস্তি গালি দিল; লঘু ছন্দেরচিত বাঙালীর কৌতুকরসের সার্থক দৃষ্টান্ত 'অঙ্গদের রায়বার' কৃত্তিবাসের মৌলিক রচনা অথবা কবিচন্দ্রের রচনা কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। সে যাহা হউক, এই 'রায়বার' (ধামালি ছন্দের মতো লঘু ছন্দে রচিত) বিদ্রূপাত্মক গালিগালাজ রাবণের প্রতি সার্থক-ভাবে বর্ষিত হইয়াছে; ইহা একদা বাঙালী শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও অন্যান্য সভাসদ শত শত রাবণমূর্তি ধারণ করিয়া অঙ্গদকে ছলনা করিতে চাহিলে যুবরাজ যে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় রাবণ ও রাবণপুত্রকে গালি দিয়াছে তাহার কৌতুকরস ঈষৎ অমার্জিত হইলেও পরম উপভোগ্য সন্দেহ নাই :

অঙ্গদ বলে, সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা ॥

* * *

ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে ॥

পরে গালির জ্বালায় রাবণ বাধ্য হইয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া অঙ্গদকে বলিলেন, যদি রামচন্দ্র নিজ হস্তে সেতু ভাঙিয়া দেন, বিভীষণ রাবণের পদতলে আশ্রয় লয়, হনুমান নাকে খত দেয়, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রকে ক্ষমা করিতে পারেন। তদুত্তরে অঙ্গদ পরিহাস করিয়া বলিল, সবই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু "শূর্পণখার নাককান কিসে যাবে জোড়া ?"

রাবণের প্রতি অঙ্গদের উক্তি—

যে তোর দারুণ পণ তেমন কর্বে কে।
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে ॥

তারপর অঙ্গদ গালির মাত্রা চড়াইয়া বলিতে লাগিল :

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হৈলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা শুনিস নাক এইটা বড় দুঃখ ॥

*　　*　　*

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্‌রে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্ত্তি কল্পতরু ॥
নৈলে তোরে বেঁচে থাকতে সাধ করে বলি।
লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥
ঘুষিবে আমার বাপের কীর্ত্তি জগন্ময়।
তাই বলি দিনকতক বাঁচলে ভাল হয় ॥

এইজাতীয় কবির লড়াই একদা সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। এক দিকে করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ, আর-একদিকে এই 'আধা-তর্জা'র স্থূল হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজের নিস্তরঙ্গ পরিবেশটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বাহিরের ভূখণ্ড তাতার-তুর্কী, পাঠান-মুঘল—কে অধিকার করিয়া লইল, সাধারণ বাঙালী সেজন্য বিশেষ চিন্তিত না হইয়া রামকথার করুণরসের অশ্রুপ্রবাহ এবং হাস্যরসের 'দন্তরুচিকৌমুদী'র ছটায় গতানুগতিক জীবনের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের সংঘাতে এই জাতির জীবন নীতিভ্রষ্ট হইয়া যে ভাসিয়া যায় নাই, তাহার কারণ, সে রামকথা হইতে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছে। রাম-লক্ষ্মণের সৌভ্রাতৃত্ব, সীতার সর্বংসহ বধূজীবন, সুগ্রীব-বিভীষণের সৌহার্দ্য, হনুমানের দাস্যভক্তি—এ সমস্তই আর্ষ মহাকাব্য ত্যাগ করিয়া বাঙালীর ঘরের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ২ ॥

কৃত্তিবাসের কবিত্ব

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কৃত্তিবাসকে কবি না বলিয়া অধিকাংশস্থলে 'পণ্ডিত' বলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কবির পাণ্ডিত্য যে অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল বাল্মীকি হইতে কাহিনীর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃত্তিবাস স্বীয় কল্পনার সহিত পুরাণ ও অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা মিশাইয়া দিয়া পুরাতনী রামায়ণী কথাকে বাঙলা দেশের মনোভাবের অনুকূলে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস পাঁচালী ও কথকতা শুনিয়া কাহিনী লিখিয়াছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল না—তাঁহাদের এই মন্তব্য প্রমাণসিদ্ধ নহে।

কারণ অধুনাপ্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণের কথা বাদ দিলেও কৃত্তিবাসের পুরাতন পুঁথিতেও পাণ্ডিত্যের অভাব নাই। ঐ সমস্ত পুঁথিতে ভাষা, শব্দ ও ছন্দোগত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও, কবি যে মূলকাব্য পাঠ না করিয়া পাঁচালীকথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মূল রামায়ণ-কাহিনীকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা বর্তমানকালে অনুমান করা সম্ভব নহে। তুলসীদাসের অনবদ্য রামভক্তিরসের কাব্য কৃত্তিবাসের কাব্যের প্রায় দুই শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল, এ কথা মনে রাখিলে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সহজেই বোধগম্য হইবে।)

(প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ মূল পুঁথি হইতে এত পরিবর্তিত হইয়াছে যে, কবির শিল্পকলাগত উৎকর্ষ বিচার করাও এক জটিল সমস্যা। কেহ কেহ অদ্ভুত আচার্যের (নিত্যানন্দ) রামায়ণকেই শিল্প হিসাবে অধিকতর গৌরব দিবার পক্ষপাতী।[২] কৃত্তিবাস কবিত্বশক্তিতে যে হীন ছিলেন না, আজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙালী তাহার প্রমাণ দিয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাসের কাব্য হইতেই বাঙালীর জীবন ও সাধনা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ইহার কাব্যরস সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না।) বাংলা দেশে কৃত্তিবাসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ভিন্ন কবিত্বশক্তিযুক্ত অন্য কোন কাব্যের আবিভাব হয় নাই। সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছন্দের মসৃণতা না দেখিতে পাইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এ পর্যন্ত যত কৃত্তিবাসী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রচুর অপপাঠ প্রবেশ করিয়াছে, এবং অর্ধ শিক্ষিত কথকদের কৃপায় ইহার বহু পংক্তি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। উক্ত পুঁথিগুলির ছন্দের মধ্যে কর্ণপীড়াকর অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ্য করা যাইবে। সমগ্র কাব্যটির প্রায় সমস্ত অংশ পয়ারচ্ছন্দে রচিত বটে, কিন্তু কবি বোধহয় সর্বত্র চৌদ্দ অক্ষরের বন্ধন মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত সংস্করণ এবং মোহনচাঁদ শীল-মুদ্রিত সংস্করণে পুঁথির ছন্দত্রুটি অনেকটা সংশোধিত হইয়াছিল। পুরাতন পুঁথির ছন্দে কবির কোনরূপ সতর্ক পারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্নে ত্রুটিযুক্ত পয়ারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

২ ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 'মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১। বনবাসে জদি চলিলা রঘুনাথে।
সেইদিন হইতে রাজা পড়্যা থাকে পথে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা রাজারে কৈল কোলে।
চন্দ্রতারা বেষ্টিত দশরথের শরীরে॥

(হীরেন্দ্রনাথ-দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড)

২। শ্রীরাম স্মঙরণ করে এক চিত্তে।
নখরে চিহ্ন দিল পর্ব্বতের চারি ভিতে॥
হাথে করিয়া পর্ব্বতে দিল নাড়া।
টলবল করিয়া উপড়ে পর্ব্বতের গোড়া॥

(ক বি পুঁথি—৯৭)

৩। পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
ওলটি পালটি চাহেন রাম গোদাবরির তীর॥
রাম বলেন সীতা বনে নাহি ভাইরে লক্ষ্মণ।
তোমার দোষ নাহি মোর দৈব ঘটন॥

(১৮০২-৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ)

ত্রিপদী (লাচাড়ী) ছন্দের মধ্যে কিছু ছান্দসিক নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়ঃ

১। রথরথী ঘোড়া সাজে নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে
মুনি সবে করে জয়ধ্বনি।
জয় জয় হুলাহুলি করে সবে কোলাকুলি
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী॥

২। শুন মহাশয় জানিনু নিশ্চয়
তুমি ত্রিদিবের-নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
কহি জোড় করি হাথ॥

এতদ্ব্যতীত 'রায়বার' নামক অংশে কবি শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহার করিয়া কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছেনঃ

আত্মছিদ্র না জানিস পরকে দিস খোঁটা।
বারে বারে কহিস কথা মর রে পাজি বেটা॥

রামায়ণের করুণরসের মধ্যে এইরূপ বাক্‌চাতুরী নূতনত্ব সঞ্চার করিতে পারিয়াছে।

কৃত্তিবাস অলঙ্কারপ্রয়োগেও অভিনবত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। একাধারে

সংস্কৃত ও দেশীয় অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া রামায়ণকে তিনি সর্বসাধারণের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ অসংখ্য অলঙ্কার ও প্রৌঢ়োক্তির মধ্যে স্বল্প কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে ঃ

১। দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥

২। সশোক থাকেন সীতা অশোক কাননে।
হৃদয়ে সর্ব্বদা রাম, সলীল নয়নে ॥

৩। চরণে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥

৪। পৃষ্ঠ ভরে কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী।
কুঁজ নহে তাহার, সে বুদ্ধির চুপড়ি ॥

৫। তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরী।

৬। বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া ॥

৭। তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশকাঁটা ফুটে।
তৃণহেন বসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥

৮। ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে।
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায় ॥

৯। কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে।

১০। খান্দা নাকে খান্দা লাগে ভাসে রক্ত স্রোতে।

১১। জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।

১২। তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব।
বাজন-নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥

১৩। গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন দুর্ব্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা ॥

১৪। রাজার রক্ষক যত সাক্ষাৎ তক্ষক।
রড়ে যথা ভক্ষ্য লক্ষ্যি সমক্ষে ভক্ষক ॥

১৫। নহে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥

১৬। কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥

এই সমস্ত উদাহরণে আলঙ্কারিক নিপুণতা, বাগ্‌ভঙ্গীর তির্যকতা—সর্বোপরি পৌরাণিক বাঁধা পথের আলঙ্কারিক কৌশলের সহিত বাঙালীর দৈনন্দিন

জীবনচিত্র মিশ্রিত হইয়া বক্তব্যকে তীক্ষ্ণতর করিয়াছে।) পরবর্তী কালে কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই জাতীয় লৌকিক উপমারূপকের ব্যবহার হ্রাস পাইয়া গিয়া ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কৃত্তিবাসের অলঙ্কারসন্নিবেশে শুধু কৃত্রিম গতানুগতিক চিত্র গৃহীত হয় নাই, বাঙলা দেশের দৈনন্দিন জীবনও কাব্যে স্থান পাইয়াছিল। এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙলা দেশে এত অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

(কল্পনার প্রসার ও ত্রিলোকসঞ্চারী গতিবিধি মহাকবির কবিত্বশক্তি প্রমাণ করে। কল্পনাশক্তি প্রখর ও সৃষ্টিশীল না হইলে কবির পক্ষে বর্ণনামূলক বিবৃতি জমাইয়া তোলা সহজ হয় না। বাল্মীকির অলোকসামান্য প্রতিভার বলে যে-কোন বর্ণনাই সাহিত্যাশ্রয়ী হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যের শোভা, বর্ষা ও শরতের বর্ণনা এবং তাহার সহিত মানবমনের সম্পর্ক, সমুদ্রের বিচিত্র রূপ, লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ—যে-কোন তথ্য ও বিবৃতি আর্য রামায়ণে এমন একটা ঘন পিনদ্ধ রসরূপ লাভ করিয়াছে যে, তাহার অনুরূপ বর্ণনা কৃত্তিবাসে আশা করা যায় না। কৃত্তিবাসের কল্পনা বাঙালীর আটচালা আর 'পঁচিশের বন্দ' ঘরের উপরে উঠিতে পারে নাই। সরল বাঙালীর মনোভাবের অনুকূল এবং অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত ঘরোয়া বর্ণনায় কৃত্তিবাসের কল্পনার বন্ধনহীন উৎকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়, এ বিষয়ে তুলসীদাসের সংযম প্রশংসনীয়। কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যে পাঁচালীকারের প্রতিভাই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। তাই তিনি বৃহৎ চিত্র-অঙ্কনে বা বিরাট আদর্শ-সংস্থাপনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকূট পর্বত আমাদের ধান্যক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কল্লোলিত সমুদ্র বাঙলা দেশের খাল-বিল-জলাশয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে পরিণত হইয়াছে। বানরগণ একেবারেই শাখামৃগ, রাক্ষসগণ নরমাংসভোজী বর্বর অনার্য। (বাল্মীকি-বর্ণিত নিসর্গ সৌন্দর্য, নরনারীর চরিত্রবিশ্লেষণ, বৃহৎ ও মহৎ জীবনের আদর্শ কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে পূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার্য। কারণ "এই বাঙলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে (রবীন্দ্রনাথ)।" সেইজন্য কৃত্তিবাসী বর্ণনায় বাঙলা দেশের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, বাল্মীকির কল্পনার বর্ণাঢ্যলীলা গৌড়ীয় কবির কল্পনাকে বিশেষ উদ্দীপিত করিতে পারে নাই।

॥ ৩ ॥

কৃত্তিবাসে ভক্তিবাদ

(কাহারও কাহারও মতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রধানতঃ ভক্তিবাদপ্রতিষ্ঠার জন্য রচিত হয়। অবশ্য পরবর্তী কালে চৈতন্যযুগপ্রভাবে ইহাতে ভক্ত ও ভগবানের ভক্তির উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে এক দিকে যেমন বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের—বিশেষতঃ দাস্যভক্তির ছায়াপাত হইয়াছে, তেমনি আবার অপর দিকে শাক্ত ভক্তিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবদলের হস্তক্ষেপের ফলে ইহাতে কখনও বিষ্ণু, কখনও-বা শাক্ত সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের ফলে কিছু শাক্ত প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তিবাদ যে পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে তাহা মনে হয় না। মূল বাল্মীকিতে বালকাণ্ডে বিষ্ণুর চারি অংশে জন্মগ্রহণের বর্ণনায় ঈষৎ বৈষ্ণব ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু বাল্মীকি-রামায়ণে শাক্ত ভক্তির প্রভাব নাই বলিলেই চলে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রভাব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলিয়াছিলেন যে, বটতলা সংস্করণে বৈষ্ণবপ্রভাব বেশি পড়িয়াছে, অন্যান্য সংস্করণে শৈব (শাক্ত) প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হয় ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা')। দীনেশচন্দ্র সেনও দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে পরবর্তী কালে প্রবলভাবে বৈষ্ণবপ্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল।)

মূল বাল্মীকির কাব্যে বৈষ্ণবপ্রভাব অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রভাব অধিকতর স্পষ্ট ছিল। অবশ্য এই বিষ্ণুপ্রভাব আর্য কবির বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডেই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে, সম্ভবতঃ এই দুই কাণ্ড বাল্মীকির রচনা নহে—অন্ততঃ ইহাতে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, বাল্মীকির পরে সংস্কৃত ভাষায় যে-সমস্ত রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে শাক্ত অথবা তান্ত্রিক প্রভাব পড়িয়াছিল। অদ্ভুতরামায়ণে যুগপৎ বিষ্ণু ও চণ্ডীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; রামচন্দ্র কর্তৃক পুষ্কর দ্বীপের সহস্রস্কন্ধ রাবণ আক্রান্ত হইলে তাহার প্রচণ্ড বিক্রমে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন স্বয়ং সীতা চণ্ডীর রণোন্মাদিনী রূপ ধারণ করিয়া সহস্রশীর্ষ রাবণ বধ করেন। রামচন্দ্র ও দেবতাদি সীতাকে আদ্যাশক্তি ও মূল প্রকৃতি বলিয়া গুণকীর্তন করেন। অধ্যাত্মরামায়ণে রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে বন্দনা করা হইয়াছে। বাঙলা

দেশের প্রাচীন যুগের কবি অভিনন্দ-রচিত সংস্কৃত 'রামচরিত' কাব্যে শাক্ত-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে ভক্তিবাদের দুই স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে নামাশ্রয়ী রামভক্তিবাদ, আর-একদিকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তির বাৎসল্য-ভাব। বাঙলা দেশে চৈতন্যপ্রভুর সমকালে এবং পরবর্তী যুগেই যে শুধু ভক্তিরসাশ্রিত ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নহে। ইতিপূর্বে আমরা দেখাইয়াছি (দ্বিতীয় পর্ব—সপ্তম অধ্যায়) চৈতন্যের পূর্ব হইতেই বাঙলা দেশে কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে চৈতন্যধর্মের অন্তর্গত নামতত্ত্ব, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা কৃত্তিবাসের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্মরামায়ণ ও অদ্ভুত-রামায়ণে এইরূপ ভক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। বাঙলা দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রধানতঃ নামতত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রত্নাকর দস্যু রামনাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও শুধু 'মরা মরা' বলিয়াই উদ্ধার পাইল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রারম্ভ এই নামবাদে। অবশ্য এই নামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নহে, অধ্যাত্ম-রামায়ণেও 'মরা মরা'র উল্লেখ (প্রক্ষিপ্ত ?) পাওয়া যাইতেছে।[৩]

একবার রামনামোচ্চারণে বিশ্বলোক ধন্য হইয়া যায়—দশরথ ও বামদেব প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস তাহা বিবৃত করিয়াছেন। দশরথ ভ্রমক্রমে অন্ধক মুনির পুত্র বধ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হন। বামদেব—

বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ।
বাল্মীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ ॥
তিনবার বলাইল সেই রামনাম।
পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥

দশরথ তিন বার রামনাম জপ করিয়া মহাপাতক হইতে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু তিন বার রামনাম উচ্চারণ করাইবার অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র বামদেবকে বশিষ্ঠ অভিশাপ দিলেন :

এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥

৩ ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা ॥

মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল।
দূর হ'য়ে বামদেব হবি যে চণ্ডাল।

পিতৃশাপে বামদেব গুহকচণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

লঙ্কাকাণ্ডের একস্থলে রামনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। লঙ্কাযুদ্ধে নিহত বানরগণের সদ্গতি হইল না, কিন্তু দুরাচার রাক্ষসগণ মুক্তি পাইল কেন? যুদ্ধাবসানের পর রামচন্দ্র ইন্দ্রকে এই রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজ বলিলেন :

রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার পাইবে বল কি রামের জোরে॥
রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস॥

রামনামের এমনই মহিমা! কদাচারী রামশত্রু রাক্ষসগণ শুধু 'রামে মার' এই শব্দোচ্চারণ করিয়া স্বর্গলাভ করিয়াছে। যেমন করিয়া যে মনোভাবের বশেই হউক, 'রাম' উচ্চারণ করিলেই মুক্তি। কবি নিজেও রামনাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি কামনা করিয়াছেন :

রামনাম লইতে না কর ভাই হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা॥

*　　*　　*

রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদতরী॥

অন্যত্র,

রামনাম স্মরিলে যমের দায় তরি।
শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি

আর-একস্থলে,

রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেলা॥
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়॥

পরবর্তী কালে বৈষ্ণবপ্রভাবে যে নামতত্ত্ব ভক্তিবাদের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, কৃত্তিবাসের মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিচয় লক্ষিত হইবে। অবশ্য নামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নহে, তাঁহারও পূর্ব হইতে বাঙলা দেশে নামতত্ত্ব চলিয়া

আসিতেছে। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে মাধবেন্দ্রপুরী ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া বাঙলা দেশে নামবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। তবে ১২শ শতকেব লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল)-রচিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে' নামতত্ত্বের আভাস আছে, এবং লীলাশুকের ঐ গ্রন্থ বাঙলা দেশে অজ্ঞাত ছিল না, তাহার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে (পৃ. ৮২) জয়দেবপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

এই নামতত্ত্বের সঙ্গে হনুমানের দাস্যভক্তিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। হনুমানের আত্মনিবেদন পবম উপভোগ্য—

তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়াধাম।
তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম॥
দুর্ব্বল হনুর তুমি একমাত্র বল।
তোমা বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল॥
তুমি পিতা তুমি মাতা তুমিই সকল।
তুমিই হনুর এক জুড়াবার স্থল॥
* * *
রাম হনুমৎপ্রভু হনু রামদাস।
থাকুক সর্ব্বদা এই হনুর বিশ্বাস॥
তুমি প্রভু আমি ভৃত্য চরণে তোমার।
এ সম্বন্ধে যেন দেব না ঘুচে আমার॥

এই দাস্যভক্তি বাঙলা দেশে যে মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দাসমনোভাবকে বহু দূরে ছাড়াইয়া গিবা প্রভুভৃত্যেব প্রযোজনেব সম্পর্ককে স্নিগ্ধ সৌন্দযে ভবিযা দিযাছে।

কবি কৃত্তিবাস বামচন্দ্রকে প্রেমের দেবতারূপে অঙ্কন করিযাছেন। রামের বীরত্বের পরিচয় কবি যথেষ্টই দিযাছেন। বালক রামচন্দ্রের বর্ণনা—

ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে॥
ধনু হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ।
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ॥

কৃত্তিবাসেব রামচরিত্রে কিছু কিছু বীরত্ব থাকিলেও বাল্মীকির রামচন্দ্রের মধ্যে বীরত্বেব যে মহিমা আছে, অদ্ভুত পৌরুষের প্রজ্জ্বলন্ত চিত্র আছে, কৃত্তিবাস-অঙ্কিত রামচরিত্রে বীর্যের সে আদর্শ কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, ভক্তির স্রোতে বীরত্ব ও পৌরুষের পাষাণস্তূপ ভাসিয়া গিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডেই এই ভক্তির চূড়ান্ত

রূপ লক্ষ্য করা যায়। বিভীষণপুত্র তরণীসেন রামের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে—

অঙ্গে লেখা রামনাম রথ চারিপাশে।
তরণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।

ভক্তের ভগবান রামচন্দ্র এমন ভক্তের গাত্রে কি করিয়া অস্ত্রাঘাত করিবেন? বরং তিনি সীতা উদ্ধার না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, তবু ভক্তের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিবেন না—

কায নাই সীতা আমি না যাব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে।।
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।
ভক্ত মোর পিতামাতা ভক্ত মোর প্রাণ।
কেমনে এমন ভক্তে প্রহারিব বাণ।।

ভক্ত তরণীর কাটামুণ্ড 'রামরাম' বলিয়া নিত্যধামে প্রস্থান করিল। এমনই রামভক্তের মহিমা যে, পিতা বিভীষণ রামচন্দ্রকে পুত্র তরণীসেনের বধোপায় বলিয়া দিলেন। রাবণও যুদ্ধ করিতে আসিয়া রামচন্দ্রের মধ্যে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করিয়া মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠলাভ করিবেন, এই আশায় আনন্দিত হইলেন—

যদ্যপি রামের হাতে হয়ত মরণ।
একান্ত বৈকুণ্ঠে যাব, না হয় খণ্ডন।।

রাবণের যুদ্ধযাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ দেখিয়া রাণী মন্দোদরী বিলাপ করিলে রাবণ তাহাকে আশ্বাস দিলেন:

মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে।।

যুদ্ধকালে অনুতপ্ত রাবণ রামচন্দ্রের স্তুতি করিলে রামচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া বলিলেন:

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রাম নাম না লইবে আর।।

কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর।
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর ॥

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলে রামচন্দ্র মুমূর্ষু ভক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাবণ রামচন্দ্রের মধ্যে ব্রহ্মসনাতনকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন, এবং অন্তিম প্রার্থনা জানাইলেন ঃ

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার ॥

এই ভক্তি বাঙালীর জীবন ও সাধনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। (এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির রামচন্দ্রকে অনুসন্ধান করিলে ব্যর্থ হইতে হইবে। বাল্মীকির রামায়ণে আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডে বিষ্ণু-অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইলেও বাঙলা দেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্ত ভগবানের যেপ্রকার নৈষ্ঠিক রতির কথা বলা হইয়াছে, বাল্মীকির রচনায় সেরূপ কোন আবেগব্যাকুল ভক্তিভাবের অতিরেক নাই। বাঙলা দেশে দশম-দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তির স্রোত বহিতেছিল; একদিকে শাক্ত, আর-একদিকে বৈষ্ণব—এই উভয় প্রকার ভক্তিরস বাঙালীর স্বাভাবিক চিত্তধর্মের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র কখনও ব্রহ্মসনাতন, কোথাও বিষ্ণুর অংশাবতার কোথাও-বা ভক্তের ভগবান।) কখনও-বা রামচন্দ্র ও দেবী চণ্ডীর মধ্যে বাৎসল্যসম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, পরবর্তী কালের বৈষ্ণবগণ রামকে চৈতন্যের সমপর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন, এবং তাহার জের মিটাইবার জন্য শাক্তগণও শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া চণ্ডীপূজা করাইয়া লইয়াছেন, এবং এইভাবে রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্তের যুগপৎ হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের সেই মত ও মন্তব্য বিচারপ্রসঙ্গে মনে হয় যে, রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব থাকিলেও তাহার অন্তরালে যে দলবিশেষের সজ্ঞান এবং স্পষ্ট প্রয়াস ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবপ্রভাব বাঙলা দেশে চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং পূর্ব-চৈতন্যযুগে আবির্ভূত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তির প্রভাব দেখিলে বিস্মিত হইবার কি আছে? (ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য বাঙালীর দীর্ঘকালের সংস্কার; কৃত্তিবাস সেই সংস্কারকেই পরিপুষ্ট করিয়াছেন। পরবর্তী কালের লিপিকার,

গায়েন ও কথকদের দ্বারা তাহাতে ভক্তিরসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু কৃত্তিবাস যে বাল্মীকির মতো মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ গড়িতে বসেন নাই, বরং মানুষের জীবনকে ভাগবত মহিমার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

॥ ৪ ॥

কৃত্তিবাসের মৌলিকতা ও পৌরাণিক রামকথা

একদা শিক্ষিত বাঙালী বিশ্বাস করিতেন যে, কৃত্তিবাস কথকদের মুখ হইতে শুনিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তিনি বোধহয় মূল রামায়ণ পাঠ করেন নাই, পাঠ করিবার মতো সংস্কৃত জ্ঞানও তাঁহার ছিল না। এইরূপ অনুমানের পক্ষে কিছু কিছু কারণও আছে। মূল বাল্মীকির রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী-বর্ণিত কাহিনী ও চরিত্রের অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তিনি মূল বাল্মীকি পাঠ করিলে আদিকবির রচনায় কখনই হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, বাল্মীকির সহিত আক্ষরিক পরিচয়ের অভাবের জন্য কৃত্তিবাস কথক ও গায়কদের নিকট এই কাহিনী শুনিয়া, কখনও-বা তাহাতে নিজস্ব কল্পনাসৃষ্ট কাহিনী যোগ করিয়া দিয়া রামায়ণ পাঁচালী রচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, মধ্যযুগে কোন কবিই প্রাচীন-মহাকাব্য বা পুরাণের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। মূল কাহিনীটিকে অনুসরণ করিলেও তাঁহারা আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া বরং ভাবানুবাদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ মূল বাল্মীকির অবিকল অনুসরণ নহে, আক্ষরিক অনুবাদ তো নহে-ই ; কৃত্তিবাস নিশ্চয়ই বাল্মীকির রামায়ণ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বহু স্থলে বাল্মীকিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মবিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হইবে। উপরন্তু প্রাচীন কুলজীগ্রন্থে কৃত্তিবাসকে প্রায় সর্বত্র 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। নিজ ভণিতাতেও তিনি পুনঃ পুনঃ 'পণ্ডিত' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির ভাষায় নানা ত্রুটি থাকিলেও, কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, ইহার কোন প্রমাণ নাই, বরং বিপরীত প্রমাণই পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে,

কৃত্তিবাস বাল্মীকির কাহিনী মোটামুটি অনুসরণ করিলেও ঋষিকবির কোন কোন কাহিনী বর্জন করিয়াছেন, কোথাও মূল কাহিনী ও চরিত্রকে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন, কোথাও রামকথাবিষয়ক কাব্যপুরাণাদি হইতে নূতন কাহিনী গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও-বা কল্পনা হইতে মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বাল্মীকিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া যেমন বলিয়াছেন :

বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥

তেমনি আবার যেখানে বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উৎস হইতে গল্পের আখ্যান বা চরিত্রবৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়াছেন, ভণিতায় তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন। লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে হনুমানের ঔষধ আনয়নের ঘটনা বিবৃত করিয়া কবি বলিতেছেন :

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥
এক রামায়ণ শত সহস্র প্রকার
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥

উত্তরাকাণ্ডে লবকুশ কর্তৃক ভরত, শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ পরাভূত ও নিহত হইলেও বাল্মীকির প্রসাদে তাঁহারা পুনর্জীবিত হইলেন। এই কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে নাই; কৃত্তিবাস ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই :

এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে ॥

সুতরাং কৃত্তিবাস যে বাল্মীকির সহিত পরিচিত ছিলেন না, তাহা সত্য নহে। যখন তিনি বাল্মীকির মহাকাব্য ত্যাগ করিয়া অন্য উৎস হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

(কৃত্তিবাস বাল্মীকির যে-সমস্ত কাহিনী পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত আখ্যানগুলি প্রধান :

১। কার্তিকের জন্ম
২। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ
৩। বিশ্বামিত্র কথা
৪। অম্বরীষ যজ্ঞ
৫। রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য-হৃদয় স্তব পাঠ

কৃত্তিবাস নিম্নলিখিত কাহিনীগুলি বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করেন নাই, সম্ভবতঃ কোন পুরাণ হইতেও ইহার উপাদান পান নাই ; সুতরাং এগুলি তাঁহার স্বকীয় কল্পনা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় :

১। সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী
২। দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি
৩। গণেশের জন্ম
৪। সম্বরাসুর বধ
৫। কৈকেয়ীর বরলাভ
৬। গুহকের সঙ্গে মিতালি
৭। হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে ধারণ
৮। বীরবাহুর যুদ্ধ
৯। তরণীসেন-মহীরাবণ অহিরাবণ কাহিনী
১০। রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক দেবী চণ্ডিকার অকাল-বোধন এবং একশত আটটি নীলপদ্মের কাহিনী
১১। গণকের ছদ্মবেশে হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ।
১২। মুমূর্ষু রাবণের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতিশিক্ষা
১৩। দেবর-বধূদের অনুরোধে সীতা কর্তৃক খড়ির দ্বারা রাবণের মূর্তি অঙ্কন, এবং তাহা দেখিয়া রামের মনে সীতা সম্বন্ধে সংশয় সৃষ্টি, যাহার ফলে সীতানির্বাসন।
১৪। লবকুশের যুদ্ধ।

অবশ্য সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনেক কাহিনী ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন, কোথাও-বা অন্যান্য পুরাণ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

আদিকাণ্ডে দস্যু রত্নাকর 'মরা মরা' বলিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা বাল্মীকিতে নাই ; অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে এই কাহিনী পাওয়া যাইতেছে। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান নানা পুরাণ ও মহাভারতে আছে। কবি কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত, যোগবাশিষ্ঠ-

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণে ইহার উৎস সন্ধান করা যাইবে। গঙ্গা আনয়নপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস যে কাণ্ডার মুনির গল্প সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ড হইতে গৃহীত। সেতুবন্ধনের সময়ে রামচন্দ্র যে শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা বাল্মীকিতে না থাকিলেও কূর্মপুরাণে এবং, বিশল্যকরণী ঔষধ আনিবার সময় কালনেমির বাধা দিবার কাহিনী অধ্যাত্মরামায়ণে আছে। কেবল ধান্যমালী অপ্সরাকে কৃত্তিবাস 'গন্ধকালী'তে রূপান্তরিত করিয়াছেন। দেবীর অকালবোধন দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং কালিকাপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অদ্ভুতরামায়ণে আছে যে, সহস্রস্কন্ধ রাবণবধের জন্য সীতার দেহ হইতে চৌষট্টি যোগিনীর আবির্ভাব হয়। কৃত্তিবাস কুম্ভকর্ণহত্যা-বর্ণনায় এই চৌষট্টি যোগিনী নিযোগ করিয়াছেন। রামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর সীতা হনুমানকে মূল্যবান স্বর্ণহার প্রদান করিলে পবননন্দন তাহা দন্তদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন, কারণ তাহাতে রামনাম লেখা ছিল না। এই কাহিনী অধ্যাত্মরামায়ণে আছে। দশরথের রাজ্যে যে শনির প্রকোপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস হইতেছে স্কন্দপুরাণ ও কালিকাপুরাণ। লবকুশের সহিত রাম ও ভরত-লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের যুদ্ধবিবরণ জৈমিনিভারত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই সমস্ত উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস কোন কোন কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিছু-বা পুরাণাদি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক উক্তি সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা বা শাস্ত্রপুরাণাদি হইতে গৃহীত হইয়াছে। একটু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ

১। পরম প্রচণ্ড প্রভু তব কোপানল।
সীতা মার শ্বাসবায়ু পরম প্রবল॥
লঙ্কাপুরী শুষ্ককাষ্ঠ জ্বলিয়াই 'ছল।
এ হনু নিমিত্ত মাত্র তথায় জুটিল॥ (সুন্দরাকাণ্ড)
রামকোপানলেনৈব সীতানিশ্বাসবায়ুনা।
দগ্ধা পুরৈব লঙ্কেয়ং নিমিত্তমভবৎ কপিঃ॥
(ভবভূতি—মহানাটক)

২। পুরুষের অষ্ট গুণ স্ত্রীলোকের কাম।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম॥
স্বভাবে পুরুষ হ'তে কামে মত্তা নারী।
তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি॥ (উত্তরাকাণ্ড)

আহারো দ্বিগুণস্তাসাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুগু ণা।
ষড়গুণা মন্ত্রণা তাসাং কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ।। (মনুসংহিতা)

ক্ষুদ্রবৃহৎ ঘটনা বাদ দিলেও কৃত্তিবাসের মধ্যে ভক্তির যে স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে—কোন কোন সমালোচক এই মত পোষণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ বাল্মীকি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, এই বৈশিষ্ট্য কৃত্তিবাসের মৌলিক আবিষ্কার নহে। রামকথাযুক্ত নানা পুরাণ বা অন্য রামায়ণকাব্যে (অধ্যাত্ম-রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ইত্যাদি) মন্দোদরী, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও কালনেমি প্রচ্ছন্ন রামভক্তরূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। রাবণ যখন জানিতে পারিলেন যে, বিষ্ণুর হস্তে বিনষ্ট হইলে অন্তিমে মোক্ষপদ লাভ করা যায়, তখন তিনি বিষ্ণু-অবতার রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইবার বাসনা করিয়াই সীতাকে হরণ করিলেন। অধ্যাত্মরামায়ণে এইরূপে প্রচ্ছন্ন ভক্ত রাবণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়, তাহা সমস্তই পরবর্তী কালের সংযোজনা, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ নানা পুরাণ এবং বিভিন্ন রামায়ণে অনুরূপ ভক্তিভাবের অনেক কাহিনীর উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত উৎস হইতেই এই রাম-ভক্তিবাদের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

কৃত্তিবাস ও বাঙালী

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে আমরা সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছি। তুলসীদাসের রামায়ণে যেমন কোশলের জীবন ও সাধনার প্রভাব পড়িয়াছে, সেইরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণেও যে বাঙালী-মানসের কিছু কিছু প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মহাকবির কল্পনা সাধারণতঃ বস্তুভাবমণ্ডলে বিচরণ করে বলিয়া মহাকাব্যের চারিদিকে একটা দেশ ও কালের পরিপার্শ্বচেতনা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী উত্তরভারত হইতে দক্ষিণভারত পর্যন্ত বিস্তৃত

হইলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভূগোল-ইতিহাস কিন্তু পূর্বভারতকে ঘেরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। দশরথ-পত্নীরা মাতৃত্ব লাভ করিলে নবজাতকের জাতকর্ম বর্ণনাব সময় কবি বাঙলা দেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারকেই স্মরণ করিয়াছেন। রামচন্দ্রাদির জন্মের পর পাঁচ দিন 'পাঁচুটি', ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, আট দিনে 'অষ্টকলাই', ত্রয়োদশ দিনে জননাশৌচান্ত, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন প্রভৃতির বর্ণনা উল্লেখযোগ্য।

মুনিপত্নীগণ সীতাকে রামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ঃ

লাজে অধোমুখী সীতা, না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী হনি যে আমার॥

এই বর্ণনায় বাঙালীবধূর ব্রীড়াবনত লাজনম্র মূর্তিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বাক্ষসদিগকে 'বাটাভবি গুয়া' দিবাব প্রলোভন দেখাইয়াছেন। গঙ্গা-অবতরণ বর্ণনাকালে কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরের যে সমস্ত তীর্থের নাম করিয়াছেন তাহার সবগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত—মেড়াতলা, নদীয়া, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আকনামাহেশ প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গেব প্রসিদ্ধ গ্রামেব কথা উল্লিখিত হইযাছে। অবশ্য কৃত্তিবাস নিজ গ্রাম ফুলিয়ার কেন উল্লেখ করেন নাই তাহা বুঝা যাইতেছে না। হয়তো তাঁহাব সময়ে মালীদের ফুলের মালঞ্চ ফুলিয়া গ্রামহিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন কবিতে পাবে নাই।

(কৃত্তিবাসী রামাযণেব বহু স্থলে পশ্চিমবঙ্গেব দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনেব বিশেব প্রভাব আছে। হনুমান লঙ্কাদহনেব নিমিত্ত প্রথমেই 'বড ঘবের চালে'ব উপর লম্ফ প্রদান করিলেন। কোন কোন সমালোচক বলিযাছেন যে, কৃত্তিবাসেব লেখনীর মুখে স্বর্ণলঙ্কা যেন ফুলিযা গ্রামে পরিণত হইয়াছে। কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। "কুমাবেব চাক যেন ঘুরাইযা ফেলে" প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষা বাঙলা দেশের জীবন হইতে সংগৃহীত। ভরত রামান্বেষণে বহির্গত হইয়া গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তখন গুহক তাঁহাকে দধিদুগ্ধ, নারিকেল-গুবাক, কদলী-আম্র-পনস দিয়া অভ্যর্থনা করেন, রোহিত চিতলমাছ আনিতেও বিস্মৃত হন নাই। ভবদ্বাজের আশ্রমে ভরত যে আতিথেয়তা লাভ করেন তাহার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—

চন্দ্রবতী বড়া পীঠে মুগের সামলী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি।

নির্ম্মল কোমল অন্ন, যেন যূঁথিফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥

আর-একস্থলের বর্ণনা

ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি।
পাকা কাঁঠালের কোষ সবে খায় চুষি ॥
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ গাড়ু।
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল লাড়ু ॥

ভরদ্বাজ-আশ্রমে ঋষি ভরদ্বাজ রামচন্দ্রের বানরবাহিনীকে যে সমস্ত ভোজ্যদ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন তাহা বাঙলা দেশের রসনালোভন খাদ্যসামগ্রী। এই তালিকার মধ্যে বাঙালীর প্রিয় খাদ্য স্থান পাইয়াছেঃ মতিচুর, মোণ্ডা, রসকরা, মনোহরা, সরুচাকুলি, গুড়পিঠে, রুটি, লুচি, খুরমা, কচুরি, ক্ষীর, ক্ষীরসা, ক্ষীরলাড়ু মুগের সাউলি, অমৃতা, চিতুইপুলি, নারিকেল পুলি, কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া, ছানাভাজা, খাজা, গজা, জিলাপি, পাঁপড়, অন্ন পায়স এবং পিষ্টক। উত্তরাকাণ্ডে সীতাদেবী স্বয়ং রন্ধন করিয়া চৌদ্দ বৎসরের উপবাসী লক্ষ্মণকে ভোজন করাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য—

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপ আদি দিলেন সানন্দ ॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ ॥
শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত ॥

এই ভোজনতালিকা অযোধ্যা-মিথিলার নহে, একেবারে বাঙলা দেশের দৈনন্দিন সূপশালায় প্রস্তুত গাহর্স্থ্য জীবনের স্বাদুমধুর চিত্র।)

উত্তরাকাণ্ডে "গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব" নামক আখ্যানে যে পক্ষিবিবরণ আছে, তাহা বিশেষভাবে বাঙলা দেশের চিত্র—

সারস-সারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা।
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচা ॥
সারী-শুক কাকাতুয়া চড়া মৎস্যরঙ্ক।
খঞ্জন-খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কঙ্ক ॥
বাউই-পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল।
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সঞ্চাল ॥

বকবকী বাদুড়-বাদুড়ী ফুরিটিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে চামচিকে কাঠঠোকরিয়া॥

(এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া কৃত্তিবাসের বাঙালী-মানস প্রমাণ করা যাইতে পারে। চরিত্রচিত্রণে কৃত্তিবাস সমসাময়িক বাঙলা দেশের দ্বারা কী পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা চরিত্রবর্ণনা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

কৃত্তিবাসের কোন-এক সমালোচক বলিয়াছেন, "যে যত বলুক, এবং কৃত্তিবাসের রাজারাজড়া ও নবাবসুবোর সভায় বেড়ানর যতই প্রমাণ দিউক, আমি কিন্তু কেবল তাহার কাব্যপাঠ করিয়াই বলিতে পারি যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লী ফুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যায় নাই।"[৪] কৃত্তিবাস কোন রাজসভায় গিয়াছিলেন কি-না তাহা আমরা এই পর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। (কিন্তু "পাঁচালী-প্রবন্ধে"-রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে সমসাময়িক বাঙলা দেশের কিছু কিছু বাস্তব প্রভাব আছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উক্ত কাব্যের নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। "এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য) যে অমূলক নহে, তাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী পাঠ করিলেই অনুভূত হইবে।

আর্ষ কবির অনুষ্টুপছন্দে-গ্রথিত আদিমহাকাব্য ও গৌড়ীয় কবির পয়ার-লাচাড়ীছন্দে-রচিত রামায়ণ পাঁচালী সাহিত্যবিচারে যে একাসনে আহূত হইবার উপযুক্ত নহে, তাহা সত্য ; কিন্তু বাল্মীকির প্রাদেশিকীকরণের ফলে যে গ্রন্থগুলি দেশভাষায় রচিত হইয়া বিশেষ জনপদের প্রাণের বাণী বহন করিয়াছে, তন্মধ্যে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-কবি কৃত্তিবাস ও বারাণসীর ভক্তকবি তুলসীদাসের কাব্যদুইখানি প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করিবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই

৪ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪

পঞ্চদশ অধ্যায়

মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ

॥ ১ ॥

ভূমিকা

মহাভারতের কথা অমৃতসমান ॥

ভারতের অমৃত আত্মা, জাতি ও জীবনের সমগ্র সত্তা, প্রাণ ও মনের ক্ষুধা ও সুধা সমস্তই মহাভারতের শিলাস্তূপে এখনও যেন চিরন্তনের স্মারকচিহ্নরূপে বিরাজ করিতেছে। রামরাবণের যুদ্ধনিনাদ সিংহলের সমুদ্রতটে শান্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু কুরুবংশের ভ্রাতৃবিরোধ অনাগত কালের মানব সভ্যতা ও সমাজের জন্য আশা, সান্ত্বনা ও আদর্শ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মনে হয় মহাভারতের বিপুল কলেবরের মধ্যে যেন সুদূর যুগের পরপার হইতে বহু মানবের রণদুর্মদ হুঙ্কার ও আশাহীন বিলাপের করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের ভ্রাতৃবিরোধের পটভূমিকায় একদা সমগ্র ভারতবর্ষই যেন রক্ত-মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচণ্ড বিরোধ, পাশব প্রতিহিংসা, দেবোপম ক্ষমা, আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ও নির্বেদ-বৈরাগ্য, জয়ী রাজগণের উল্লাস এবং পতি-পুত্রহীনা রমণীদের বিলাপ যেন একই সঙ্গে কানে আসিয়া বাজে।

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার,

সবই কালের বালুতটে একাকার হইয়া গিয়াছে—

তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে,
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে।

মহাভারত রচনার বহু শতবর্ষ পরে আর এক মহাকবি মহাভারতের বিদায়বিষণ্ণ সফলতার ফলশ্রুতিটি যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। "যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ"—ভারত-যুদ্ধের ইহাই একমাত্র পরিণাম; পঞ্চপাণ্ডব জয়ী হইয়াছেন, দুর্যোধনাদি ধার্তরাষ্ট্রগণ ও দাম্ভিক ক্ষত্রিয়সমাজের শোচনীয় অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাভারত মহাকাব্যের অন্তিমে বিজয়ীর উল্লাস পরাভূতের ক্ষীণকণ্ঠে ডুবিয়া গিয়াছে। বিধবা রমণীদের হাহাকার, স্বজন বিনাশের নৃশংসতা, ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভূত অকল্যাণ সৃষ্টি—ইহার জন্যই কি পঞ্চপাণ্ডব সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন? তাই তো দেখা যায়—এত আয়োজন, স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়ন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যুযুধান ক্ষত্রিয়সমাজের এত আন্দোলন—সব কিছু সফলতার শেষ পরিণাম স্ত্রীপর্বে বর্ণিত বামাকণ্ঠের আকুল আর্তনাদ, সমস্ত জয়পরাজযেব একমাত্র পথসঙ্কেত—মহাপ্রস্থানের উত্তরাপথ। তাই এই মহাকাব্যে জয়ধ্বনি ও শ্মশানসঙ্গীত একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া মানবজীবনের অনন্ত বেদনাকে, ব্যর্থ পরিণামকে, মুখর আকাঙ্ক্ষাব নিদারুণ নিঃসঙ্গতাকে বৈরাগ্যের ধূসর আস্তরণে আবৃত কবিযাছে। মহাভারত মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি, সফলতার নিস্ফল পরিণতি, জীবনাসক্তিব গৈরিক বৈবাগ্য। পঞ্চপাণ্ডব যাহা চাহিযাছিলেন তাহাই অর্জন করিতে পারিযাছিলেন, কিন্তু করায়ত্ত সিদ্ধি তাঁহাদের হস্তগত হইযাও ব্যর্থ হইয়া গেল। তাই মহাভাবতে সাফল্যের মধ্যেই পরাভবের বিষণ্ণতা নিহিত রহিযাছে। মহাভারতের একপ্রান্তে সভাপর্ব, আর এক প্রান্তে মহাপ্রস্থানিক পর্ব। একপ্রান্তে ধর্মাধর্মেব মন্ত্রণা, জযপরাজযের সংঘর্ষ, সাফল্য লাভের জন্য অবিরাম চেষ্টা, রক্তোৎসবেব প্রবল বন্যা,—আর একপ্রান্তে হাহাকার ও ধ্বংস। ইহাতে জযের বিলাসও পরাভূতেব বিলাপে স্তিমিতজ্যোতি হইয়া পড়িযাছে। কোন গ্রীক নাট্যকার মানুষের বাঁচিয়া থাকার মধ্যে, জয়ী হওযার মধ্যে এত বড় নিদারুণ ট্র্যাজেডি কল্পনা করিতে পাবেন নাই।

বাস্তবিক মহাভারতকে শুধু পুবাণ-মহাকাব্য-ইতিহাস-ধর্মগ্রন্থ বলিলেই ইহার সমস্ত পরিচয় দেওয়া যায় না। "যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি ন তৎক্বচিৎ"—ইহাতে যাহা আছে, অন্যত্র তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও নাই। ইহা একই সঙ্গে "অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্র-মিদং মহৎ। কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥" অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র,

কামশাস্ত্র। ধর্মার্থকামমোক্ষ—এই চারিবর্গের তিনটি বর্গই ইহার ফলশ্রুতি। ইহাকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়া থাকে। এমনকি মহাভারত পড়িলেই যথেষ্ট, অন্য বেদ পড়িবার প্রয়োজন নাই—"বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন্।"

রবীন্দ্রনাথ মহাভারত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন, "মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।" বাস্তবিক রামায়ণেও ভারতসভ্যতার ইতিহাস আছে, কিন্তু তাহাকে রূপকের আবরণ হইতে বাহির করিয়া লইতে হয়; কিন্তু মহাভারতের ঘটনার মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ইতিহাস এতই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতীতির জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আবশ্যক করে না। ইহাকে তাই শিল্পশাস্ত্রের আদর্শ ধরিয়া শুধু কাব্য-মহাকাব্য বলিলেই সব কথা বলা হইল না। "Indeed in a certain sense, the Mahabharata is not one poetic production at all, but rather a whole literature."[১] এখানে ভিন্‌তারনিৎজ 'whole literature' বলিতে মানুষের, তথা জাতির সমগ্র জীবন যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনুসরণে আমরা মহাভারতকে ভারতসভ্যতার হিমালয় আখ্যা দিতে চাহি।[২] উত্তরাধীশ হিমালয় যেমন অতীতে উত্তরের বহিরাক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে এবং শিখর হইতে স্নেহধারা নামাইয়া দিয়া ভারতভূমিকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি মহাভারত একদিকে বহিরাগত বিভিন্ন ও বিরোধী ভাবসংঘাতের প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভারতবর্ষকে সংহত জীবনাদর্শে গ্রথিত করিয়াছে, আর একদিকে দেশের ও মনের মাটিকেও কর্ষণোপযোগী করিয়াছে। একটা দেশের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের অযুত তরঙ্গলীলা যদি কোন একখানি কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে মহাভারত। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক কাশীরাম দাস বলিয়াছিলেন, "মহাভারতের কথা অমৃতসমান।" মহাভারতে মানবজীবন-মন্থনে শুধু অমৃতই উঠে নাই, গরলও উঠিয়াছিল। তাই মহাভারতে মানবজীবনের বিষামৃতের কাহিনী মূর্তি লাভ করিয়াছে।

---

১ M. Winternitz—*History of Indian Literature*, Vol. 1. (C. U.)

২ মহাকাব্যের লক্ষণ—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ভাবতযুদ্ধ ও মহাভারতীয় কাহিনীব প্রাচীনতা ॥

মহাভারত মূলতঃ পাণ্ডবদেব সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদেব পারিবারিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের বিরাট পটভূমিকায স্থাপিত হইযাছে। এই জ্ঞাতিশক্রতার পশ্চাতে একটা বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস যে লুকাইযা আছে, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে মহাভাবত ও মহাভাবতে বর্ণিত নানা উপকাহিনী ও চবিত্রের উল্লেখেই প্রমাণিত হয। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান কবিযাছেন যে, খ্রীষ্টেব জন্মেব প্রায একহাজাব বৎসর পূর্বে ভরতবংশীযদেব মধ্যে জ্ঞাতিবিবাদ বাধিযাছিল।[৩] ইহাই ভাবতযুদ্ধ বা মহাভাবত। কুরুবংশও এই ভবতবংশীযদেব অন্তর্ভুক্ত। এ সম্বন্ধে সনতাবিখ লইযা বিশেষজ্ঞমহলে নানা মতভেদ আছে। দ্বিতীয পুলকেশীর ঐহোল শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে, ভাবতযুদ্ধেব ৩৭৩৫ বৎসব পবে দ্বিতীয় পুলকেশীব মৃত্যু হয (৫৫৬শক—৬৩৪ খ্রীঃ অঃ)। আযভটের মত বিচার কবিলে মনে হয যে, ৩১০২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ভাবতযুদ্ধ সংঘটিত হইযাছিল। অন্যান্য জ্যোতির্বিদেবা এই মত নির্বিচাবে গ্রহণ কবেন নাই। বৃদ্ধ গর্গ, ববাহমিহির প্রভৃতির মতে শকাব্দ আবম্ভেব ২৫২৬ বৎসব পূবে অর্থাৎ খ্রীঃ পূব ২৪৪৯ অব্দে মহাভাবত যুদ্ধ ঘটিবাব সম্ভাবনা। কিন্তু নানা পুবাণে উল্লিখিত আছে যে, মহাপদ্মেব আবিভাবেব ১০৫০ বৎসব পূর্বে পবীক্ষিতেব জন্ম হয,[৪] এবং পরীক্ষিতের জন্মেব সমযে বা সামান্য পূর্বে মহাভাবতেব যুদ্ধ হইযাছিল। মহাপদ্মনন্দেব সন ধরিবা দেখা গিয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ১৫শ-১৪শ শতাব্দীতে পরীক্ষিতেব জন্ম এবং ভাবতযুদ্ধ হইযাছিল।[৫] বেদে পাণ্ডু, পাণ্ডব বা পাণ্ডব-কৌববেব যুদ্ধকাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। তাই মনে হয, বেদসঙ্কলনেব পরে এই মহাযুদ্ধ ঘটিযাছিল। পাশ্চাত্য সমালোচকগণেব মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের দিকে বেদ সঙ্কলিত হইতে থাকে। সুতবাং এই সনতাবিখ ঠিক হইলে মহাভাবতীয় যুদ্ধঘটনাকে আবও কিছু আগাইযা আনিযা খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের

[৩] Hastings—*Encyclopaedia of Religion and Ethics* (হপকিন্‌স্ লিখিত 'মহাভারত' শীর্ষক প্রবন্ধ)। হপকিন্‌স্ তাঁহার *Great Epics of India* গ্রন্থেও লিখিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১০০০ অব্দের মধ্যেই মহাভারতের ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম হইয়াছিল।

[৪] কোন কোন পুরাণে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায়—

মহাপদ্মাভিষেকাত্তু যাবজ্জন্ম পরীক্ষিতঃ।
এবং বর্ষসহস্রংতু জ্ঞেয়ং পঞ্চাসদুত্তরম্ ॥

[৫] H C. Roychoudhury—*Political History of Ancient India*

দিকে স্থাপন করা যায়। অন্য প্রমাণের অভাবে উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া গেল যে, খ্রীষ্টের জন্মের হাজার-বারোশত বৎসর পূর্বে মহাভারতীয় সংগ্রাম ঘটিয়াছিল।

এখন দেখা যাক, মহাভারতীয় যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের কাহিনী এবং মহাভারতে গৃহীত অন্যান্য আখ্যান-উপাখ্যান কত প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, বেদে কুরুক্ষেত্র সমর বা পাণ্ডবদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই প্রায় সকলেই অনুমান করিয়াছেন—বৈদিক সংহিতা সঙ্কলনের অনেক পরে মহাভারত রচিত অথবা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি—বেদসঙ্কলনের চারি-পাঁচ শত বৎসর পরে এবং খ্রীষ্টের জন্মের হাজার খানেক বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছিল। তাহা হইলে মহাভারতের মূল কাহিনী নিশ্চয়ই মহাভারত যুদ্ধ সংঘটনার পর প্রচলিত হইয়াছিল। একটা বৃহদাকারের যুদ্ধবিগ্রহ বা বিপ্লব ঘটিবার পর সমাজসভ্যতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে তিন-চার শত বৎসর অতিবাহিত হইতে পারে—এরূপ অনুমানের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের দিকে যদি কুরুক্ষেত্র সমর ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার চার-পাঁচশত বৎসর পরে সেই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের গল্প ছোটখাট 'ব্যালাড' বা উপকাহিনীর আকার ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যের আকার লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ আনুমানিক হিসাব অনুসারে মহাভারতীয় কাহিনী-সংক্রান্ত 'ব্যালাড'গুলি খ্রীঃ পূঃ ৫-৪ শতাব্দীর দিকেই বিশালকায় মহাকাব্যের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। এখন মহাভারত যে আকারে চলিতেছে, খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দীতেও তাহার প্রায় সেইরূপ আকার ছিল।[৬] সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী হইতে খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দী—মোট হাজার বৎসরের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী-উপকাহিনী সংক্রান্ত 'ব্যালাড'গুলি প্রচলিত মহাভারতের বিশাল আকার নির্মাণ করিয়াছে। রামায়ণ মূলতঃ একজন কবির রচনা, উপরন্তু তাহা প্রধানতঃ কাব্য। কাজেই তাহাতে মূল ঘটনার ঋজুগতি অধিকতর স্পষ্ট, অপ্রাসঙ্গিকতার বিশেষ বাহুল্য নাই। অপর দিকে মহাভারত নিছক কাব্য-মহাকাব্য নহে, ইহা পঞ্চম-বেদ, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সংহিতা,

[৬] "About 1500 years ago, this Mahabharata was already just as we possess it to-day in our manuscripts and editions—or at least very similar—one work which was of about the same extent as our epic to-day."—M. Winternitz—*History of Indian Literature* (Vol. I)

সমাজেতিহাস, ~~রাষ্ট্রনষ্ট~~—সমস্ত বিষয়ের একত্র সমাহার। তাই ইহাতে বহু জনে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, নানা কবি গালগল্প জুড়িয়া দিয়াছেন, যুগে যুগে কত নীতিকথা ও সমাজাদর্শ ইহাতে অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। শুধু কাব্য-মহাকাব্য হইলে ইহাতে কেবলমাত্র পাণ্ডব-বিজয়কথাই স্থান পাইত। কিন্তু যে আকারে সংস্কৃত মহাভারত চলিতেছে, তাহাতে পাণ্ডবযুদ্ধের বর্ণনা অর্ধেকেরও কম। বোধহয় প্রথম দিকে মূল মহাভারতে হাজার কুড়ি শ্লোকে পাণ্ডবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছিল; তারপর কালক্রমে যুগের প্রয়োজনে সেই শ্লোকসংখ্যা দাড়াইয়াছিল লক্ষাধিক। বর্তমান মহাভারতে প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোক পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈদিক যুগে কাব্য, আখ্যান ও গল্পের প্রচলন ছিল, কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে দশ দিন ধরিয়া ব্রতী গায়কগণ নানা উপাখ্যান অবলম্বনে গান গাহিত। সপ্তম দিনে যে আখ্যান গীত হইত, তাহার নাম 'ইতিহাস'। 'ইতিহাস' শব্দটি প্রাচীন যুগে বহু স্থলে মহাকাব্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে গাথা, নারশংসী, ইতিহাস এবং আখ্যানের উল্লেখ আছে। 'নারশংসী'র অর্থ বংশবিবরণ—প্রাচীন রাজবংশ ও মুনিবংশের গুণকীর্তন। মহাভারত রচনায় বৈদিক যুগের এই সমস্ত নারশংসী ইতিহাস প্রভৃতি হইতে অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল।

প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে পরীক্ষিত ও জন্মেজয়ের উল্লেখ থাকিলেও কুরুক্ষেত্র সমরের কোন ইঙ্গিত নাই। যজুর্বেদের বহু স্থলে কুরু-পাঞ্চালের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণে অর্জুনের নাম আছে, কিন্তু সেখানে অর্জুন নামটি ইন্দ্রের গুপ্ত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রেই মহাভারতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, মহাভারত পাঠ করিলে পুণ্য হয়। শাংখায়ন শ্রৌতসূত্রে বলা হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবেরা বিনষ্ট হইয়াছিল। পাণিনিতে পাণ্ডু বা পাণ্ডবের উল্লেখ না থাকিলেও ভারত ও কুরুবংশের (যুধিষ্ঠির ভীমাদি) পরিচয় রহিয়াছে। 'অষ্টাধ্যায়ী'তে 'মহাভারত' শব্দটি পাওয়া গেলেও পাণিনি কোন গ্রন্থ অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। অবশ্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ভীম, নকুল ও সহদেবকে কুরুবংশজাত বলিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। পালি জাতকেও (জাতক-৪৯৫) দেখা যায় যে, 'জুধিট্‌ঠিল' 'ইন্দপত্তে' রাজত্ব করিতেন এবং তিনি 'কোরব্ব' বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হোল্‌ৎজ্‌ম্যান তাঁহার *Das Mahabharata* গ্রন্থে

বলিয়াছেন যে, খ্রীঃ ৯০০-১১০০ অব্দের মধ্যেই নাকি মহাভারত অধুনা প্রচলিত আকার লাভ করে এবং এই সময় হইতে এই গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এ মত যুক্তিসহ নহে। খ্রীঃ পূঃ ৫-৪ শতকের মধ্যেই যে মহাভারত বর্তমান আকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং তাহার অল্প পরেই এই মহাগ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থরূপে বিখ্যাত হইয়াছিল। খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী হইতেই মহাভারত শুধু এ দেশে নহে, কম্বোজেও ধর্মগ্রন্থ রূপেই পরিচিত হইয়াছিল। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে আছে যে, খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে শ্রোতারা পরম ভক্তিভরে মহাভারত পাঠ শুনিত। 'হর্ষচরিতে' বাণভট্ট মহাভারতের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্য বুলার ও ক্রিষ্টে *Indian Studies*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়াছেন যে, খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতেই মহাভারত ধর্মগ্রন্থরূপে শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিল। ভিন্‌তারনিৎজ্‌-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।[৭] সুতরাং প্রায় নিঃসন্দেহে বলা চলিতে পারে যে, খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে মহাভারত মহাকাব্য ভারতে এবং যবদ্বীপ-কম্বোজে ধর্মগ্রন্থের বিপুল মর্যাদা ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছিল।

কাহিনী-উপকাহিনী ও মহাভারত ॥

মহাভারতের বিশাল আখ্যানে নানা উপকাহিনী, রাজবংশ-মুনিবংশানুচরিত, নানা নীতি-উপদেশ, গল্পকথা, ধর্মতত্ত্ব স্থান পাইলেও ইহা মূলতঃ পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জ্ঞাতিবিরোধের কাহিনী। কিন্তু অধুনা প্রচলিত মহাভারতে এমন সমস্ত গল্প-আখ্যান ও নীতি উপদেশ অর্ধেকেরও অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে যে, ইহার সঙ্গে মূল ভারতযুদ্ধের অধিকাংশ স্থলেই কোন যোগ নাই, উপরন্তু বহু বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে—মাঝে মাঝে মনে হয়, ইহার কিয়দংশ অন্ততঃ বেদব্যাসের লেখনী প্রসূত নহে। এই জন্য ভিন্‌তারনিৎজ্‌ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত উদ্ধৃত করিয়া তিক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, "In truth, he who had believed with orthodox Hindus and the above mentioned Western scholars, that our Mahabharata, in its present form is the work of a single man, would be forced to the conclusion that this man was at one and the same time, a great poet and a

৭ M. Winternitz—*History of Indian Literature*, Vol. I

wretched scribbler, a sage and an idiot, a talented artist, and ridiculous pedant. .

নানা পণ্ডিত ও গবেষকের অনুসন্ধানে যে সমস্ত তথ্য আলোক লাভ করিয়াছে তাহাতে মনে হয়, খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা উপকাহিনী বা 'ব্যালাড' দেশের মধ্যে ছড়াইয়া ছিল। পরবর্তী কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একটি সূত্রে গাঁথিয়া ভারতসংগ্রাম কাহিনী অবলম্বনে বিরাট মহাকাব্য রচনা করেন। আদিযুগের রামায়ণের মতো মূলে মহাভারত যুদ্ধের মহাকাব্যই ছিল[৯]; পরে ইহাতে নানা কাহিনী-উপকাহিনী ও নীতিধর্ম সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক তত্ত্বকথা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। বাস্তবিক মহাভারতের কাহিনী ও তত্ত্বকথা বিশ্লেষণ করিলে ইহাতে পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করা যাইবে: (১) কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম, (২) ক্ষত্রিয় রাজবংশের কাহিনী, (৩) ঋষি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কাহিনী, (৪) তীর্থবর্ণনা, সমরনীতি, রাজনীতি, নীতিশাস্ত্র ও অধ্যাত্ম বিদ্যা, (৫) পশুপক্ষীর গল্পকাহিনী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, দুর্যোধনাদির সভায় বোধহয় সূত বা ভাটগণ কুরুবংশের গৌরব গান করিত, সে যুগে প্রত্যেক রাজবংশের কীর্তি প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ বা সূতসম্প্রদায় নিযুক্ত হইত। মহামানী দুর্যোধনের রাজসভাতেও ঐরূপ সূত-মাগধের যাতায়াত ছিল, এবং তাহারা দুর্যোধনাদির গুণকীর্তন করিয়া এবং কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের নিন্দা করিয়া 'নারশংসী' বা বংশানুচরিত রচনা করিয়া থাকিবে। পরে কুরুক্ষেত্রে চাকা ঘুরিলে বিজয়ী পাণ্ডবদের পক্ষ লইয়া আবার সেই সূতেরাই পাণ্ডববংশের গুণকীর্তন করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন সহায়কদের মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকথা বর্ণনা করিয়াছিল; সেইটিই রক্ষা পাইয়াছে এবং তাহার কলেবর বাড়িয়া বাড়িয়া বর্তমান মহাভারতের বিশাল আকার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সুচিন্তিত অভিমত। তাঁহাদের এরূপ অদ্ভুত অনুমানের কারণ, মহাভারতের অনেক স্থলে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্যে নিন্দা এবং কৃষ্ণের প্রতি কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে। প্রয়োজন স্থলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক কূট-কৌশল অবলম্বনের উপদেশ পাইয়া পাণ্ডবগণ মাঝে মাঝে এমন সমস্ত পন্থা

৮ Ibid.

৯ "Thus as in the *Iliad* and in the *Nibelungen*-song the tragedy of a terrible war of annihilation forms the actual subject of the heroic poem.' —Ibid.

অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ধর্মযুদ্ধে সমর্থনযোগ্য নহে। উপরন্তু দ্রৌপদী-বিবাহে তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের রীতি ত্যাগ করিয়া ঘৃণিত অনার্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুন্তীও কি পাকেপ্রকারে বহুস্পৃষ্টা হন নাই? এই কারণে হপ্‌কিন্‌স্ বলিয়াছেন, "It is undoubtedly a genuine bit of tradition which serves to mark the Pandus as a ruder race than the old and long respected Kurus."[১০] যেহেতু পাণ্ডবগণ একভার্যার বহুস্বামিত্বের (polyandry) পাতকে অপরাধী, এই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই পাণ্ডুপুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের আচার-আচরণের প্রতি অহেতুক বিরূপ হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, পাণ্ডুপুত্র ও ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে কোন পারিবারিক বা বংশসম্পর্ক ছিল না। পাণ্ডবেরা খুব সম্ভব কোন পাহাড়ী জাতি, ঈষৎ বর্বরতা-আশ্রয়ী।—এই মন্তব্য অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক। কারণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাণ্ডবদিগকে কৌরব বা কুরুবংশোদ্ভূতই বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি 'মহাভাষ্যে' ভীম, নকুল ও সহদেবকে কুরুবংশোৎপন্ন বলিয়াছেন। পালি জাতকে যুধিষ্ঠিরকে 'কোরব্ব' অর্থাৎ কৌরব বলা হইয়াছে। অতএব হপ্‌কিন্‌স্ ও ভিন্‌তারনিৎজের পাণ্ডবসংক্রান্ত মতামত প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সূত বা মাগধগণ কৌরব-পাণ্ডব সভায় বা অন্য ক্ষত্রিয় রাজাদের সভায় বিশেষ বিশেষ রাজবংশের গুণকীর্তন করিয়া গান বা আখ্যান রচনা করিত, তাহা মিথ্যা নহে। মহাভারতের মূল আখ্যান নিশ্চয়ই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই রচিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে রাজসভার সূতগণ কুরুপাণ্ডব সংক্রান্ত যে সমস্ত আখ্যান গান করিত, তাহাই মূল

[১০] Hasting's *Encyclopaedia of Religion and Ethics* Vol. VIII, (An essay on the Mahabharata by E. W. Hopkins) ভিন্‌তারনিৎজ আরও সুর চড়াইয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "While the poem in its present form absolutely takes the part of the Pandavas, and describes the Pandavas as not only brave beyond measure, but also as noble and good and on the other hand represents the Kauravas as treacherous and mischeavous, the poem, in remarkable selt-contradiction relates that all the persons of the Kauravas fall through treachery or in unfair fight. It is still more striking that all the treachery emanates from Krishna that he is always the instigator of all the deceit and defends, the conduct of the Pandavas"—M. Winternitz—HOIL, Vol. I. pp. 454-55.

মহাভারতের উৎস, এবং সে যুগে বীর-রসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহই প্রধান বর্ণিত বিষয় হইয়াছিল। ভিনতারনিৎজ্ অনুমান করেন যে, অধুনা মহাভারত যে-আকারে চলিতেছে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ইহার আকার ঠিক এইরূপ ছিল না। খুব সম্ভব আদিম মহাভারত ভরতবংশীয় পাণ্ডব ও দুর্যোধনাদির জ্ঞাতি-সংগ্রামকেই কেন্দ্র করিয়া আখ্যান বা 'ব্যালাডের' আকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মহাভারতে আর যে সমস্ত গল্পকাহিনী আছে, সেগুলি পরে সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, সূত বা মাগধগণ ইহাতে বিভিন্ন রাজবংশ ও ক্ষত্রিয়সমাজের কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছিল, কবিগণ ব্রাহ্মণ, মুনিঋষি ও দেবসমাজের গল্প সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে মহাভারত প্রায় লক্ষাধিক শ্লোকে গ্রথিত হইয়া বিরাট কলেবর লাভ করে। বর্তমান কালে মহাভারতে হাজার কুড়ি শ্লোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, অবশিষ্ট প্রায় সমস্তটা মূলঘটনা-বহির্ভূত। তাই ভিন্‌তারনিৎজ মনে করেন যে, আদিম মহাভারত বোধ হয় সভাপর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া স্ত্রীপর্বে শেষ হইয়াছিল। রামায়ণে যে আদিকাণ্ড ও শেষকাণ্ডটি পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেইরূপ মহাভারতের আদিপর্ব ও স্ত্রীপর্বের পরবর্তী পর্বগুলি এবং মধ্যবর্তী পর্বের কিছু কিছু অংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়া মূল মহাভারতের (অর্থাৎ পাণ্ডব দুর্যোধনাদির যুদ্ধ) আকার বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়াছে।

ব্যাস, জৈমিনি ও ব্যাস-শিষ্য ॥

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। তাই মহাভারত কার্ষ্ণ মহাভারত নামেও পরিচিত। মহাভারতের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, ব্যাস প্রথমে এই মহাকাব্য রচনা করিয়া শিষ্য বৈশম্পায়নকে শুনাইলেন। বৈশম্পায়ন পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর জনমেজয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্পসত্রে এই মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। ব্যাস প্রথমে যে মহাভারত রচনা করেন, তাহা ৮,৮০০ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল।[১১] তার পর ইহা ২৪,০০০ শ্লোকে বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে।[১২] বোধ হয় বৈশম্পায়ন

[১১] "অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোক শতানি চ।" (আদি—৮১)

[১২] চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারত-সংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ (আদি—১০১)

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এই ২৪,০০০ শ্লোকে গ্রথিত মহাভারত-সংহিতা পাঠ করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণে অন্যান্য আখ্যান ছিল না, অথচ ইহাকে সংহিতা বলা হইয়াছে। আমাদের অনুমান, ২৪,০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণে মূল ঘটনাটি (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ) বর্ণিত হইয়াছিল, আর তাহার সঙ্গে ধর্ম-নীতি-রাষ্ট্র সংক্রান্ত অনেক তথ্যও স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য ক্ষত্রিয়সমাজ ও রাজবংশের কোন পৃথক কাহিনী ছিল না। ইহাকে 'মহাভারত-সংহিতা' বলা হইয়াছিল, কারণ ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ছাড়াও নীতিতত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক কথাও গৃহীত হইয়াছিল। জনমেজযের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন যখন এই দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করেন, তখন সেই সভায় সূত উগ্রশ্রবাঃ ঋষি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে এটটি পাঠ করিযাছিলেন, তখন বোধ হয় ইহা লক্ষাধিক শ্লোকে পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে দেখা গেল, মহাভারত চারিটি স্তরের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। ব্যাসের পূর্বে লোকসমাজে ভরতবংশীয়দের জ্ঞাতি-শত্রুতা সংক্রান্ত পাণ্ডববিজযকথা[১৩] প্রচলিত ছিল (প্রথম রূপ)। ব্যাসদেব এই ব্যালাডকে মহাকাব্যের রূপ দান করিলেন এবং নিজপুত্র শুকদেব ও আরও চারিজন শিষ্যকে (সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকবৈশম্পায়ন) এই মহাভারত শুনাইলেন (দ্বিতীয় রূপান্তর)। ইহার পর তৃতীয় স্তরে বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এই কাব্য পাঠ করেন—তখন কাব্যটির আকার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এই শিষ্যগণ গুরুর রচনায যে কিছু কিছু সংযোজন করিযাছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যেই আছে। আদিপর্বের ১ম অধ্যায়ের ৮৮-৮৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্যাসদেব নিজপুত্র শুকদেব সহ পাঁচজন শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া তারপর মহাভারত পড়াইলেন, অতঃপর তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন ঃ

বেদানধ্যাপযামাস মহাভারত পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্ ॥
প্রভুর্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ ॥

---

১৩ মহাভারত পাণ্ডবদের বিজয়কথা বলিয়া কোন কোন স্থলে 'মহাভারত' না বলিয়া ইহাকে 'জয়' বলা হইয়াছে—"জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।" প্রথম যুগের বাংলা মহাভারত 'পাণ্ডববিজয়' বা 'বিজয়পাণ্ডব' নামে জনপ্রিয় হইয়াছিল।

এখানে কথাপ্রসঙ্গে জৈমিনি-ভারত সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা যাইতে পারে। জৈমিনির রচিত বলিয়া স্বীকৃত অশ্বমেধ পর্ব এখনও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জৈমিনি নাকি গোটা মহাভারত সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, "কিন্তু প্রবাদ এই যে, উক্ত গ্রন্থ কবিত্ব ও ঘটনাবৈচিত্র্যে ব্যাসের মহাভারত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে ব্যাসদেবের আদেশে ইহার প্রচার বারিত হইয়াছিল।"[১৪] মহর্ষির উপর এরূপ অলীক অভিযোগের উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তত্ত্ববিচারে জনকল্পনা ও প্রবাদবাক্য বেদবাক্য নহে, ইহা মনে রাখিলে এরূপ অন্যায় অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত করিবার প্রযোজন হইবে না। যাহা হউক অদ্যাপি জৈমিনি রচিত অশ্বমেধপব ভিন্ন আর কোন পর্ব বা পুরা মহাভারত পাওয়া যায় নাই। বাঙলা দেশে জৈমিনির অশ্বমেধপর্বের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন চন্দ্রনাথ বসু, ১৩১৭ সালে এই জৈমিনি ভারতের দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইযাছিল। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' অনুবাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন, "অনেকের সংস্কার আছে, মহর্ষি জৈমিনি অন্যান্য পর্বেরও রচনা করিযাছেন, কিন্তু আমরা কাশী প্রভৃতির ন্যায় কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ স্থলে প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সমাজে স্বতঃ পরতঃ বহু যত্নে সন্ধান করিযা যাহা জানিয়াছি, তাহাতে ঐ সংস্কার ভ্রমমূলক বোধ হয়।" চন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত ঠিকই। জৈমিনি-ভারতের অশ্বমেধ পব ব্যতীত আর কোন পর্ব পাওযা যায় নাই, সুতরাং এ অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে যে, জৈমিনি অশ্বমেধপর্ব ব্যতীত মূল মহাভারতের আর কোন পর্ব রচনা করেন নাই। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বটি ব্যাসমহাভারত অপেক্ষা বিস্তৃততর এবং অনেকগুলি নূতন আখ্যায়িকাও ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিযাছিল। বাঙলা দেশে মহাভারতের অনুবাদে অনেক কবি অশ্বমেধপর্বে জৈমিনি-ভারতকে অধিকতর অনুসরণ করিযাছেন।

ব্যাসের শিষ্যগণ মূল মহাভারতে অনেক নূতন আখ্যান-উপাখ্যান ও নীতি-দর্শনতত্ত্ব জুড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা অমূলক নহে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সূত উগ্রশ্রবাঃ উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে পূর্বশ্রুত মহাভারত পাঠ করেন, জনমেজয়ের সভায় পঠিত মহাভারতই তিনি শৌনকের যজ্ঞে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই চতুর্থ সংস্করণটি (চতুর্থ রূপান্তর) পরবর্তী কালে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের

---

১৪ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য (২য়)

মধ্যে এমন অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যাহাতে মনে হয়, ইহাতে অনিবার্য-ভাবে নানা হাতের ছাপ পড়িয়াছে। মহাভারতে উল্লেখ হইতে মনে হয়, একই কালে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ও বর্ধিত সংস্করণ প্রচলিত ছিল। আদিপর্বের ৫১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বিদ্বানলোকে এই মহাগ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত —দুই আকারে পাইতে ইচ্ছা করিলে স্বয়ং মহর্ষি এই মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত ও সুপরিসর দুই আকার প্রদান করেন।[১৫] অর্থাৎ ব্যাসদেবের যুগে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ও প্রশস্ত দুই রূপই বর্তমান ছিল। বহুজনের হস্তক্ষেপের ফলে মহাভারতের আকার যে বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহার উল্লেখ মহাভারত হইতেই পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অর্বাচীনকালে কেহ এই ধরনের শ্লোক মূলগ্রন্থে জুড়িয়া দিয়াছিল। মহাভারতের আদিপর্বের (১,২৬) শ্লোকে শ্রৌতি বলিয়াছেন ঃ

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥

এই ইতিহাস পূর্বে অনেক কবি বলিয়াছেন, এখনও অনেকে বলিতেছেন এবং পরেও অনেকে বলিবেন। এই উক্তি হইতেই সহজে অনুমিত হইতে পারে যে, ব্যাসদেবের পূর্বে অনেকে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পরেও ইহাতে আরও অনেক কবি অনেক কাহিনী ও নীতিতত্ত্ব যোগ করিয়াছিলেন। ব্যাসীয় মহাভারত সম্ভবতঃ দুই আকারে ৮,৮০০ শ্লোকে (সংক্ষিপ্ত) এবং ২৭,০০০ শ্লোকে (বিস্তারিত) প্রচলিত ছিল। মহাভারত পাঠক ব্রাহ্মণগণও যে কোন স্থল হইতে মহাভারত আরম্ভ করিতেন, কেহ মন্ত্রশ্লোক হইতে, কেহ মনু হইতে, কেহ আস্তিকের আখ্যান হইতে, কেহ-বা উপরিচরের উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আদিপর্ব গণনা করিতেন।[১৬] এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে মহাভারত ৮,৮০০ শ্লোক হইতে ২৪,০০০ শ্লোক, এবং তাহা হইতে লক্ষশ্লোকে পরিণত হয়। এমনকি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে হাল আমলের সংস্কৃত পুঁথিতেও বহু হস্তক্ষেপ চলিয়াছে, প্রক্ষিপ্ত শ্লোক নির্বিবাদে প্রবেশ করিতেছে, পুরাতন আখ্যানের স্থলে নূতন আখ্যান অবিরোধে স্থান করিয়া লইয়াছে।

---

১৫ বিস্তীর্যৈতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিঃ সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্ ॥

১৬ মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥ (আদি ১।৫২)

মূলে এ কাহিনী কোন একটি অঞ্চলের জ্ঞাতিবিরোধের যুদ্ধকাহিনী মাত্র ছিল। "হয়তো কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎযুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।"[১৭] রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়াড-অডিসি এইরূপ অঞ্চল-বিশেষের স্বল্প-পরিমিত উপকথাকে অবলম্বন করিয়া বিশালত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে এত বড ব্যাপার ঘটিতে যেমন বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তেমনি ইহাতে বহু হস্তের ছাপ পড়িয়াছে, নানা অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, নানা বিরোধিতা দেখা দিয়াছে; 'ব্যাসকূটের' দোহাই দিয়া সব অসঙ্গতিকে ঢাকা যায় না, এবং যায় না বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কখনও পাণ্ডবদের বর্বর বলেন,[১৮] কখনও-বা কৃষ্ণকে শঠ-বঞ্চক বলিয়া গালি দেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণও ইহাতে অসঙ্গতি, স্वবিরোধ ও নীতির ছদ্মবেশে আবির্ভূত আপত্তিকর দুর্নীতি লক্ষ্য করিয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ প্রাচীন যুগের আদর্শের সঙ্গে অধুনাতন নীতি ও জীবনচর্যার অনেক পার্থক্য দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নানা যুগে নানা মতাবলম্বী কবি-সূত-মাগধ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের ফলে ইহাতে রচনাগত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

মহাভারতের বিবর্তন ॥

শুধু প্রাচীন যুগেই যে মহাভারতের নানা পরিবর্তন হইয়াছে, বহুজনের হস্তক্ষেপের ফলে ইহার সংহতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা নহে, পরবর্তী কালে নানা অঞ্চল-ভেদে মহাভারতের মূল রচনাতেও নানা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। অঞ্চল-ভেদে ও পুঁথির লিপি অনুসারে মূল মহাভারতের নানা পরিবর্তন-সংযোজন নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

মহাভারতের পুঁথি বিচার করিয়া পরলোকগত বিষ্ণু সুকৃথঙ্কর দেখিয়াছিলেন যে, উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাত্যের পুঁথিগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। রামায়ণেও যেমন উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাপথের পুঁথির মধ্যে তত্ত্ব ও আখ্যানগত পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি মহাভারতের পুঁথিতেও এইরূপ নানা পরিবর্তন দেখা যায়। উত্তরাপথে প্রচলিত মহাভারতে আঠারো 'পর্ব দাক্ষিণাত্যের

১৭ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'মহাকাব্যের লক্ষণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮ ইতিপূর্বে হপকিন্‌স্ ও ভিন্‌তারনিৎজের মন্তব্য উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে চব্বিশ পর্বে পরিণত হইয়াছে। উত্তরাপথের আদিপর্ব ভাঙিয়া দাক্ষিণাত্যের পুঁথিলেখক তিনটি আলাদা পর্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—আদি, আস্তিক ও সংভব। উত্তরাপথের রচনায় যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে, দাক্ষিণাত্যের পুঁথিতে তাহার স্বল্পতা বা অনুপস্থিতি বিস্ময়কর। দাক্ষিণাত্যের মহাভারতের পরিধি উত্তরাপথের পরিধি অপেক্ষা স্বতঃই দীর্ঘ। তাহার কারণ দাক্ষিণাত্যের পুঁথিতে অনেক আখ্যান বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরাপথের পুঁথিতে যাহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, বা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই, দাক্ষিণাত্যের সংস্করণে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যাইবে। যেমন উত্তরাপথের পুঁথিতে ব্যাস-জননী সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধার পিতার কোন নাম নাই, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সংস্করণে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা। উত্তরাপথের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানে আছে যে, নায়ক নায়িকা প্রাগ্‌বৈবাহিক অবস্থায় গান্ধর্বমতে মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণের রক্ষণশীল পুঁথিলেখকগণ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সংযোগের পূর্বেই পুরোহিত ডাকাইয়া যথারীতি বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথের সংস্করণে আরও অনেক পার্থক্য আছে। যেহেতু দক্ষিণভারতের পুঁথিতে সঙ্গতির ত্রুটি নাই, রচনাগত বিশৃঙ্খলার কোন সংস্পর্শ নাই, এবং আখ্যানগুলি বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে, সেইহেতু সুকৃথঙ্কর উত্তরাপথের পুঁথির নিন্দা করিয়া দাক্ষিণাত্যের পুঁথির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, 'The South recension impresses us thus by its precision, schematization and thoroughly practical outlook. Compared with it, the Northern recension is distinctly vague, unsystematic, sometimes even inconsequent more like a story rather naively narrated, as we find in actual experience."[১৯] সুকৃথঙ্করের একথা অবশ্য সত্য। দাক্ষিণাত্যের পুঁথি অনেক শৃঙ্খলাপূর্ণ, রচনাও সংহত। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। উত্তরাপথের মূল মহাভারত নিশ্চয় কিছু বিলম্বে দক্ষিণদেশে পৌঁছাইয়াছিল। পরবর্তী কালের দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ও পুঁথিলেখকগণ শিথিল কাহিনীগুলিকে সংহত আকার দিয়া, সংক্ষিপ্ত বা অনুক্ত ব্যাপারকে কল্পনার বলে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের ক্লান্তিকর বর্ণনা দিয়া মূল মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি

১৯ *Mahabharatam*, Adi Parvan, Introduction by Vishnu S. Sukthamkar.

করিয়াছেন। সত্যবতীর পিতার নাম কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, উত্তরের কাহিনীতে এ নাম নাই—প্রয়োজন নাই বলিয়া। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলনের মাঝখানে পঞ্চবাণকে না ডাকিয়া পুরোহিত মহাশয়কে আনিয়া ফেলিয়া দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ দুষ্মন্তকাহিনীর মূল রস মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গোপন কামজ প্রেমের সঙ্গে শকুন্তলার শেষাংশের কাহিনীর যে সংযোগ ও সম্পর্ক, তাহা দাক্ষিণাত্যের নীতিবাগীশ ও রক্ষণশীল পণ্ডিত মহাশয়গণ ধরিতে পারেন নাই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের নামেই ভারতবর্ষ, ভারত-বংশ ও ভারতযুদ্ধ; তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ কি করিয়া কানীন পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিবেন? তাই এইভাবে রফা করিয়া দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলনকে পুরোহিতের সাহায্যে সামাজিক মর্যাদা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এসমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর আপোয-রফা। এ যেন 'দুর্গেশনন্দিনীর' উপসংহার—'নবাব-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলার' উপসংহার—'মৃণ্ময়ী'। সে যাহা হউক, উত্তরাপথের সংস্করণে নানা বিশৃঙ্খলা থাকিলেও তাহাই প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য, এবং দাক্ষিণাত্যের সংস্করণ যতই সঙ্গতিপূর্ণ হউক, উত্তরাপথের মতো প্রামাণিক ও মৌলিক নহে। কারণ উত্তরাপথের পুঁথিই দক্ষিণাপথে গিয়া নব কলেবর লাভ করিয়াছে। সুতরাং উত্তরভারতের পুঁথি আলোচনায় সর্বাগ্রে গ্রহণ করা উচিত।

শুধু উত্তর ও দক্ষিণ ভারতেই নহে, নানা অঞ্চলের লিপিভেদেও মহাভারতের নানা রূপান্তর হইয়াছে। সংস্কৃত মহাভারতের যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আট প্রকার লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে—(১) কাশ্মীরের শারদা অক্ষর, (২) নাগরী অক্ষর, (৩) বাংলা অক্ষর, (৪) নেপালী অক্ষর, (৫) মৈথিলী অক্ষর, (৬) তেলুগু অক্ষর, (৭) মালায়ালী অক্ষর, (৮) তামিল ('গ্রন্থ') অক্ষর। ইহাদের মধ্যে উত্তরাপথের অন্তর্ভুক্ত বাংলা অক্ষরের পুঁথিগুলি নানা বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও দেবনাগরী অক্ষরের পুঁথি অপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।[২০] সুকৃথঙ্কর মহাভারত সম্পাদনায় দাক্ষিণাত্যের পুঁথির পাঠকে অধিকতর বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। তাঁহার এ অভিমত পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তিনিও পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছেন যে, বাংলা পুঁথির চেয়ে দেবনাগরী অক্ষরের পুঁথিতেই অধিকপরিমাণে প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। অনেকের ধারণা আছে যে, নাগরী অক্ষরের মহাভারতের পুঁথি

সুকৃথঙ্কর সম্পাদিত মহাভারতের আদিপর্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বুঝি অধিকতর বিশুদ্ধ। সুকৃথঙ্করের মতে, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। তাঁহার এ অভিমত অবহেলার যোগ্য নহে।

মুদ্রাযন্ত্রের যুগে কলিকাতা, বোম্বাই ও কুম্ভকোনমে (দাক্ষিণাত্য) মুদ্রিত সংস্করণগুলি অঞ্চল-বিশেষে প্রচারলাভ করিয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি, কোন একটি সংস্করণকে আদর্শ, মৌলিক বা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কারণ মূল মহাভারত নানা অঞ্চলে নানা আকার লাভ করিয়াছিল। ফলে মূল ঘটনা না হইলেও অপ্রধান ঘটনা, বর্ণনা ও তত্ত্বে কিছু কিছু পরিবর্তন হইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

ভারতের বাহিরে মহাভারত যে কিরূপ প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ অদ্যাপি কম্বোজ ও যবদ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে 'বরতযুদ্ধ' অর্থাৎ মহাভারতের কাহিনী যবদ্বীপের ভাষাতেও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেই ভারত সংস্কৃতি যবদ্বীপে প্রচার লাভ করে এবং খ্রীঃ ৪র্থী শতাব্দীর মধ্যে ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ দ্বীপময় ভারতে জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যবদ্বীপের সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, এবং যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির আরম্ভ হইয়াছিল মহাভারতীয় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া। অবশ্য স্থানান্তরিত হইবার ফলে যবদ্বীপীয় মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়াছে। যেমন—যুধিষ্ঠির যবদ্বীপে পুন্তাদেব নামে পরিচিত। শিখণ্ডী হইয়াছেন শ্রীকান্ত—যবদ্বীপে ইনি আবার দ্রৌপদীর কনিষ্ঠা ভগিনী এবং অর্জুনের পত্নী। এখনও যবদ্বীপে সুম্বদ্রা (সুভদ্রা), বিম (ভীম), নকোল, সওদেও (নকুল সহদেব), অশ্বতমা (অশ্বত্থামা) প্রভৃতি মহাভারতীয় চরিত্রের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির আছে। খ্রীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দীতে যবদ্বীপীয় গদ্যে মহাভারতের অনুবাদ হইয়াছিল, ইহাও লক্ষণীয়। এখনও যবদ্বীপ-বালিদ্বীপে মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে ছায়াভিনয় ও ছায়ানৃত্য খুব জনপ্রিয় আনন্দানুষ্ঠান। যদিও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মুসলমান, কিন্তু আনন্দানুষ্ঠান ও সাহিত্যানুশীলনে তাঁহারা এখনও মহাভারতের ঐতিহ্য কিয়দংশে মানিয়া চলেন। অবশ্য অধুনা মহাভারতীয় উপাখ্যানে কিছু কিছু মুসলমানী ভাবধারাও প্রবেশ করিয়াছে।

প্রাদেশিক ভাষায় মহাভারত ॥

ভারতবর্ষের উত্তরাপথের আর্যভাষা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা—উভয়

অঞ্চলেই আধুনিক প্রাদেশিক ভাষাসমূহে মহাভারতের অনুবাদ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তামিল, তেলুগু প্রভৃতি দক্ষিণী ভাষা এবং বাংলা হিন্দী প্রভৃতি উত্তরাপথের সাহিত্য অতি প্রাচীন কাল হইতে কখনও মহাভারতকে অনুবাদ করিয়া, কখনও-বা তাহা হইতে ভাব আহরণ করিয়া বিশেষভাবে পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য মহাভারতের দ্বারা যে কতদূর প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা তামিল, তেলুগু প্রভৃতি সাহিত্যের মধ্যযুগের সামান্য পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন কানাড়া ভাষার কবি গুণবর্মা 'সমস্ত ভারত' শীর্ষক কাব্যে ব্যাসের মহাভারত হইতে অনেক উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬শ শতাব্দীর কবি কুমারব্যাস মহাভারতের প্রথম দশপর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে কবি পম্পার 'ভারত' কাব্য মহাভারত অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল। মালায়ালী ভাষাতেও মহাভারতের নানা অনুবাদ হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামানুজম্ ইজুথাকেনের অনুবাদ মালায়ালী সাহিত্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ১৩শ শতাব্দী হইতে তেলুগু সাহিত্যে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ হয়। টিক্কনের মহাভারত মূল গ্রন্থের কয়েকটি পর্বের অনুবাদ, তাহার অসমাপ্ত অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন নান্ন এবং যেবপ্রসাদ নামক আর দুইজন কবি। কুচবিহাররাজ নরনারায়ণের নির্দেশে রামসরস্বতী প্রাচীন আসামী ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মারাঠী ভাষাতেও প্রসিদ্ধ ভক্ত একনাথের পৌত্র মুক্তেশ্বর মহাভারতের কয়েকটি পর্বের অনুবাদ করিয়া মারাঠী সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৪শ শতাব্দীর ওড়িয়া কবি সরলদাসের মহাভারত ঠিক অনুবাদ না হইলেও মহাভারতের ঘটনাকেই ভিত্তি করিয়াছে।

বাংলা দেশে মহাভারত অনুবাদ সূচনা হয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুবাদের কিছু পরে। মহাভারতের বিশাল আকারের জন্যই হোক, বা যে কোন কারণেই হোক, পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুবাদ মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে খুব অল্পই লক্ষ্য করা যাইবে। দুই একটি পর্বের অনুবাদেই কবিগণের অধিকতর নিষ্ঠা ছিল, এবং মহাভারতের মূল কাহিনী ও দুইচারিটি জনপ্রিয় কাহিনী (যথা দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান, সুভদ্রাহরণ, নীলধ্বজের কাহিনী) ভিন্ন কেহ মহাভারতের তত্ত্বাংশ, নীতিকথা, জীবনদর্শন প্রভৃতি অনুবাদে বিশেষ অগ্রসর হন নাই। রামায়ণের অনুবাদ অথবা স্বাধীন রচনা যেমন বাঙালী মনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে, মহাভারতের

ঐতিহ্য ঠিক ততটা নৈকট্য লাভ করে নাই। বাঙালীর নিকট রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-রাবণ-বিভীষণ-মন্দোদরী-হনুমান যতটা পরিচিত, যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুন-দ্রৌপদী-দুর্যোধনাদি ঠিক ততটা নিকটতম ব্যক্তি নহেন।[২১] একলব্যের গুরুদক্ষিণা, কর্ণের নিজ পুত্র দ্বিখণ্ডিতকরণ, অর্জুনের মৎস্যচক্রভেদ, দ্রৌপদীর নির্যাতন, ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্ত পান ও গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের পরাভব, সুভদ্রাহরণ, সাবিত্রী-সত্যবান, প্রভৃতি কাহিনী বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় মনে হইয়াছিল। এবার বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগের মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাব

॥ ২ ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগলী মহাভারত

বাংলা মহাভারতের নানা কবি ॥

ইতিপূর্বে আমরা সংস্কৃতে রচিত ব্যাসমহাভারত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, স্থানভেদে ও কালভেদে ব্যাস-সংহিতার নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, প্রক্ষেপের ফলে অনেক অসঙ্গতি, অথাবনতি প্রভৃতি ব্যাপারের অনাহূত প্রবেশের ফলে এই মহাগ্রন্থের মধ্যেও কিছু কিছু অংশ আছে যাহাতে 'দিঙনাগ'দের স্থূল হস্তাবলেপ সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বর্গত বিষ্ণু সুকথঙ্কর মহাভারতের নানা পুঁথির পাঠ মিলাইয়া ব্যাস-মহাভারতের একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা কতদূর প্রামাণিক এবং ব্যাসদেবের যথার্থ লেখনীপ্রসূত, তাহা বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন, কিন্তু কালবশে ব্যাস-ভারতে যে বহু ছোট-বড় কবি, গায়ক, সূত, লিপিকারগণ কবিত্ব করিবার প্রেরণায় ইহাতে দুইচারি পংক্তি জুড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাংলা দেশে কাশীরামদাসের মহাভারতের অনুবাদ অধিকতর জনপ্রিয় হইলেও তাহার পূর্বে ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও মহাভারতের অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল এবং সে অনুবাদের

---

[২১] কেবল মধ্যম পাণ্ডব ভীম তাঁহার স্থূল কলেবর, অপার্থিব ভোজন বিলাস এবং অগ্রজের প্রতি আনুগত্যের জন্য প্রাচীন বাঙালার বিশেষ স্নেহ-কৌতুক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সে যুগের বাঙালীদের ভীমের প্রতি অধিকতর অনুরাগের কারণ, ভীম 'দাদা' (অর্থাৎ যুধিষ্ঠির) ও গদা ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। পরবর্তী কালের যাত্রা ও নাট্যগীতিতেও ভীমচরিত্র বীরত্ব ও স্থূলবুদ্ধির জন্য নির্মল কৌতুকরস পরিবেশন করিত।

রীতিপ্রকরণ, কবিদের নামধাম, স্বরূপ প্রভৃতি লইয়া যেরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার তুলনায় মূল মহাভারতের জটিলতা এমন কিছু নহে। এ পর্যন্ত বাংলা মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদ বা রচনাকার হিসাবে চারিজন কবির নাম পাওয়া গিয়াছে, কাহারও কাহারও কাব্যও উদ্ধার করা হইয়াছে—(১) কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (২) শ্রীকরনন্দী, (৩) সঞ্জয়, (৪) বিজয়পণ্ডিত।

ইঁহাদের সম্বন্ধে এত জল্পনা, মতান্তর ও লিপিযুদ্ধ হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও গোবিন্দদাসের কড়চা ছাড়িয়া দিলে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কোন কবি ও কাব্য সম্বন্ধে এরূপ মতবৈষম্য ঘটে নাই। উমেশচন্দ্র বটব্যাল সর্বপ্রথমে 'সাহিত্যে' (১৩০২, মাঘ-ফাল্গুন) কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বিষয়ে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করেন। তারপর নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মনীন্দ্রমোহন বসু, সুকুমার সেন—ইঁহারা নানাস্থানে মহাভারতের আদি বাংলা অনুবাদক সম্বন্ধে নানা সমস্যার অবতারণা করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু বিজয়পণ্ডিত নামক কোন এক অনুবাদককে মহাভারতের আদিতম অনুবাদক বলিয়া প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাহা নস্যাৎ করিয়া দিয়া সঞ্জয়কেই সর্বপ্রধান অনুবাদক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারতকে সঞ্জয়ের কিছু পরে রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন যে, সঞ্জয় নামে কোন স্বল্প প্রাচীন অনুবাদক মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী এক ও অভিন্ন। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজয়পণ্ডিত ও সঞ্জয়—উভয়কেই বাতিল করিয়া দিয়া শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতের কিয়দংশ মানিয়া লইয়াছেন এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীকে একই কবি বলিয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু বিজয় পণ্ডিত ছাড়া আর তিন জনেরই (সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী) প্রামাণিকতায় বিশ্বাস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র প্রথম সংস্করণে সঞ্জয়কে আংশিকভাবে এবং বিজয়পণ্ডিতকে পুরাপুরিভাবে বাতিল করিয়া শুধু কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীকে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাধুনিক সংস্করণে দেখা যাইতেছে যে, তিনি সঞ্জয় সম্বন্ধে বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই, তবে তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত যে কবীন্দ্রেরই 'বিজয়পাণ্ডবকথা' তাহা তিনি নবসংস্করণের পাদটীকায় একটি অর্ধপংক্তির সাহায্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন।

এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক, উল্লিখিত কবিচতুষ্টয়ের মধ্যে কে ভূতশরীরে বর্তমান ছিলেন, কেই-বা লিপিকার গায়েনদের লেখনীমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় পুঁথিবিচার একটা বিরক্তিকর শ্রমসাধ্য ব্যাপার। নিত্যই নূতন নূতন পুরাতন পুঁথি গোশালার মঞ্চ হইতে গলিতাবস্থায় আবিষ্কৃত হইতেছে; সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা এখনও সুকর হয় নাই; কারণ কবে যে আবার একটি অভিনব পুঁথি বাহির হইয়া পুরাতন সিদ্ধান্তে ফাটল ধরাইয়া দিবে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত মহাভারতেও এইরূপ নানা জঞ্জাল সৃষ্টি হইয়াছিল। লিপিকারগণ যথেচ্ছা পাঠ বদলাইয়াছেন, ভণিতা বদলাইয়াছেন, নূতন ভণিতা যোগ করিয়া দিযাছেন, একজনের পুঁথিতে অপবের পুঁথির অংশ বেমালুম চালাইয়া দিয়াছেন, আবার একটু বুদ্ধিমান লিপিকার পুঁথির প্রকৃত ভণিতা চাপিয়া গিয়া নিজ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন, আসল গ্রন্থের কিছু কিছু পংক্তি বদলাইয়া দিয়া নিজ নামে আর একখানি মহাভারত সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের মতে কৃত্তিবাসী রামাযণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইবার ফলে এই রামায়ণে সর্বাধিক প্রক্ষেপ প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের এক পুঁথির সঙ্গে অন্য পুঁথির প্রচণ্ড পার্থক্য বহিযা গিয়াছে। সেই যুগে লিপিকারগণ বানান সম্বন্ধে অত্যন্ত বেপরোয়া ছিলেন, কবির প্রতিও নিষ্ঠা ও আনুগত্য রক্ষা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে লিপিকার-পাঁচালীকারগণ কবিদের ভণিতা পাল্টাইয়া ফেলিতেন। পংক্তির পর পংক্তি গোলমাল করিয়া দিয়া বা নিজেদের দুইচারি পংক্তি যোগ করিয়া দিয়া তাঁহারা পুঁথির বিশুদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি অনুসন্ধান করিলে এই দুষ্কর্মের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। যাহা হউক ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে অনূদিত বলিয়া পরিচিত মহাভারতের আদি অনুবাদক ও অনুবাদগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া দেখা যাক যে, জটিল সমস্যার কোন প্রকার সমাধান হয় কি না। প্রথমে আমরা চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরিচয় লইব।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরিচয় ॥

মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের অন্যান্য পরিচয় না

পাওয়া গেলেও তাঁহার আবির্ভাব-কাল বা গ্রন্থঅনুবাদ-কাল সম্বন্ধে একটা স্থুল ধরনের সনতারিখের নিরিখ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর নহে। গৌড়ের প্রসিদ্ধ সুলতান হুসেন শাহ এবং তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহের সমকালে চট্টগ্রামে বসিয়া কবীন্দ্র ব্যাস-মহাভারতের সমস্ত পর্বগুলি সংক্ষেপ অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইতিহাসের পটে কোনও প্রকারে স্থাপন করা যাইতে পারে। এবিষয়ে ত্রিপুরার 'রাজমালা' আমাদিগকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে। হুসেন শাহ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্রায় ছাব্বিশ বৎসর গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯ হইতে ১৫৩২ খ্রীঃ অব্দ, অর্থাৎ প্রায় তের বৎসর বিস্তৃত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার 'পাণ্ডববিজয়ে'[২২] হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :

(ক) সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ ॥ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪)

(খ) শ্রীযুক্ত নায়ক সে নসরত খান।
রচাইল পাঞ্চাল্য যে গুণের নিদান ॥ (প্রতিভা, ১৩৩১)

অতএব অনুমান করিতে হয় যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি (১৪৯৩) হইতে নুসরৎ শাহের সমাপ্তিকালের (১৫৩২) মধ্যে বর্তমান ছিলেন, এবং এই পর্বের মধ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এখন ত্রিপুরার 'রাজমালা' অবলম্বনে এবিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। অবশ্য ত্রিপুরার মুদ্রিত 'রাজমালা' এবং পুঁথির 'রাজমালা'র মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে।[২৩] ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য নাকি প্রথমে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়া কিছু সাফল্য লাভ করেন। ইহাতে হুসেন শাহ শঙ্কিত হইয়া ধন্যমাণিক্যের শক্তি খর্ব করিতে সচেষ্ট হইলেন।[২৪] (১৫১৪-১৫ খ্রীঃ অঃ)। ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দের দিকে চট্টগ্রামে ধন্যমাণিক্য জয়লাভ করেন, গৌড়ের সৈন্য

২২ কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই কাব্যকে সর্বত্র 'পাণ্ডববিজয়' বলিয়াছেন।

২৩ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ. ২১৭

২৪ শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে।
চৌদ্দশ পাচত্তিস শকে নিজ বাহু বলে ॥
চাটীগ্রাম বিজই বলি মোহর মরিল।
গৌড়েশ্বরের সৈন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥ (রাজমালা, সাহিত্য পরিষদের পুঁথি—২২৫৯, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে উদ্ধৃত।)

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পাণ্ডববিজয়ের পুঁথি

চট্টগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তখন হুসেন তাঁহার সেনাপতি গৌরাই মল্লিককে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম জয়ে পাঠাইয়া দিলেন, অনুমান গৌরাই মল্লিক ধন্যমাণিক্যের নিকট পরাভূত হন নাই। ধন্যমাণিক্যের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রায় উৎকীর্ণ তারিখ (১৪৩৫ শক—১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) দৃষ্টে মনে হয়, এই সময় তিনি চট্টগ্রাম হইতে হুসেনের অধিকার হটাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, হুসেন ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করেন। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জয়ের জন্য হুসেন নিজ পুত্র নুসরৎ খান ও সেনাপতি পরাগল খানকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়া চট্টগ্রামে গৌড়েশ্বরের প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরাগল খান 'লস্কর' (শাসনকর্তা) উপাধি পাইয়া চট্টগ্রাম শাসন করিতে লাগিলেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও লস্কর পরাগল খান ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের গ্রন্থে পরাগল খানকে রাস্তি খানের পুত্র বলা হইয়াছে। পরাগলের পর তাঁহার পুত্র ছুটিখান যথারীতি 'লস্কর' উপাধি পাইয়া পূর্ববৎ চট্টগ্রামের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।[২৫] মোহাম্মদ খান রচিত 'মক্তুল হোসেন'-এর পুঁথিতে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি, ৩৫৬।৬৪৩) আর এক রাস্তি খানের নাম আছে। মোহাম্মদ খানের ('মক্তুল হোসেনে'র কবি) পূর্বপুরুষ রাস্তি খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।[২৬] ইঁহার পুত্রের নাম মিনা খান। 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে মিনা খান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি।" মিনাখানের পুত্র গাভুর খান এই কাব্যে 'ত্রিপুর বিজেতা' রূপে সম্মান পাইয়াছেন। এই রাস্তি খান যদি পরাগল খানের পিতা হন, তাহা হইলে 'মিনা খান' পরাগলের আর এক নাম হইতে পারে, গাভুর খানকেও ছুটিখান (ইঁহার প্রকৃত নাম নুসরৎ খান) বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে বর্ণিত রাস্তি খান-মিনা খান-গাভুর খান এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের উল্লিখিত রাস্তি খান-পরাগল খান-ছুটিখান এক ব্যক্তি কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই সমস্ত সংশয় সন্দেহের মধ্যে না গিয়া সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দ্বারা বলা যাইতে

[২৫] পরে শ্রীকরনন্দী প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

[২৬] ৮৭৮ হিজরা বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ অব্দে এই মসজিদ নির্মিত হয়। দ্রষ্টব্য—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় —বাঙ্গালার ইতিহাস (২য়)

পারে যে, হুসেন শাহ ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য কুমার নুসরৎ খানকে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে পরাগল খানকেও উচ্চ পদ (সৈনাপত্য ?) দিয়া পুত্রের সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই পরাগল খান যে মুসলমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'পরাগল' শব্দটিকে 'অন্-আর্য' ভাষার শব্দ অনুমান করিয়া কষ্টকল্পনীয় ব্যাখ্যার দ্বারা "পরাক্রমে অগ্রগণ্য"—এরূপ দুঃসাধ্য অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই।[২৭] পরাগল খান অন্যধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মহাভারতের কাহিনী বড একটা জানিতেন না। তাই তাঁহার শাসনে চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপিত হইলে, এবং ত্রিপুরাধিপতির রাজ্যের অনেকাংশ গৌড়ের সুলতানের কবলিত হইলে লস্কর (শাসক) পরাগল খান বোধহয় নিজ সভাতে কিছু কিছু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ করিয়াছিলেন। একদা তাঁহার ভারতকথা অর্থাৎ মহাভারত শুনিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু "সংস্কৃত মহাশ্লোক অতি গুরুতর" ;[২৮] তদুপরি এরূপ দীর্ঘকাহিনী শুনিবার মতো ধৈর্যও বোধহয় খানসাহেবের ছিল না ; তিনি তাই আদেশ দিলেন ঃ

এহি সব কথা সংক্ষেপে করিয়া।
একদিনে শুনিতে পারি পাচালি রচিয়া ॥[২৯]

মহাভারত পুরাণকে এমন সংক্ষেপে পাঁচালীর আকার দিতে হইবে যে, যেন লস্কর একদিনের মধ্যেই সবটা শুনিতে পারেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে এই ভারত পাঁচালী রচনা করিলেন—ইহাই বিজয়পাণ্ডব বা পাণ্ডববিজয় নামে পরিচিত হইয়াছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ভারত পাঁচালীতে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ ও পরাগলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলেও নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, শুধু কাব্যে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর—এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহার নাম 'পরমেশ্বর', 'কবীন্দ্র' উপাধি। আবার কেহ বলেন, আসলে কবির নাম শ্রীকরনন্দী, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' বোধ হয় পরাগল খান প্রদত্ত উপাধি—যেমন মালাধর বসু গৌড়ের সুলতানের নিকট গুণরাজ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর একই ব্যক্তির নাম, এরূপ কোন সুদৃঢ় প্রমাণ

২৭ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (পূর্বার্ধ)

২৮ বর্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথির ৫৩৪ক পৃষ্ঠায় উল্লিখিত। ডঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৯ ঐ পুঁথি।

পাওয়া যায় নাই। কারণ কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী একই কবি হইলে অশ্বমেধ পর্বের দুইটি পৃথক পালা মিলিত না। কিন্তু দুইজনের দুইটি আলাদা অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩০]

কবীন্দ্র পরমেশ্বর লস্কর পরাগল খানের আদেশে ব্যাস-মহাভারত অবলম্বনে সংক্ষেপে অনুবাদের রীতিতে পাণ্ডববিজয় বা ভারত পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন —ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত' শীর্ষক যে মহাভারত ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কামতারাজ নরনারায়ণের কবীন্দ্র পাত্র নামে যে মন্ত্রী ছিলেন, তিনিই মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর—কুচবিহার অঞ্চলে সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। অথচ কবীন্দ্র মহাভারতের কোথাও নরনারায়ণের নাম নাই, সর্বত্র পরাগল খানেরই উল্লেখ রহিয়াছে।[৩১] সুতরাং সম্পাদক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর এ অনুমান ধোপে টিকিতেছে না। অহোম বুরঞ্জী, দরঙ্গরাজ বংশাবলী, কুচবিহাররাজ-বংশাবলী প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ইতিহাসাশ্রয়ী বংশতালিকায় কবীন্দ্র পাত্রের উল্লেখ আছে বটে ; কিন্তু তিনিই যে মহাভারতের অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহার কোন প্রমাণ নাই।[৩২] অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হুসেন শাহ অথবা/এবং নুসরৎ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে ব্যাসভারতের সমস্ত পর্বের ভাবানুবাদ করিযাছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কবীন্দ্র পাত্রের কোন যোগ নাই।

পরাগল খান যে অতি উদারমতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তিনি কেন মহাভারত শুনিতে চাহিবেন? কোন ফার্সী 'কিচ্ছা' বা কারবালা কাহিনীর অনুরূপ কোন ইসলামি গল্পকাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি যে প্রত্যহ পুরাণের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন তাহার সংবাদ একখানি পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে—"পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত

৩০ পরে শ্রীকরনন্দী প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩১ সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'কবীন্দ্র' উপাধি, তাঁহার আসল নাম বাণীনাথ। রাজমন্ত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহার সোপাধি নাম দাঁড়ায়—কবীন্দ্র পাত্র। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহার মত গৃহীত হইতে পারে না। দ্রষ্টব্য—শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশপর্ব মহাভারত'।

৩২ সুখময় মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ২৮৭

মতি"।[৩৩] তাঁহার সভাসদদের মুখে (সম্ভবতঃ তাঁহার কিছু কিছু হিন্দু সভাসদ ছিল) তিনি পাণ্ডবদের কাহিনী শুনিয়াছিলেন—

কুতূহলে বহুল ভারতকথা শুনি।
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানি॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম কৈল বনের ভিতর॥[৩৪]

এই সমস্ত গল্পকাহিনী জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে সংক্ষেপে মহাভারত রচনা করিতে আদেশ দিলেন। তখন কবীন্দ্র :

তাঁহার আদেশ মালা মস্তকে ধরিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া॥

কবীন্দ্র নিজ পৃষ্ঠপোষক পরাগল সম্বন্ধে কাব্যের মধ্যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পরাগলের দানশীলতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :

লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণসম
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।

অন্যত্র :

শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র ভুঞ্জন যেই অনাথের গতি॥

পরাগলের আদেশে ও তাঁহার প্রীত্যর্থে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যাস মহাভারতের সমস্ত পর্বেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন। "কবীন্দ্র জৈমিনি ভারত অবলম্বন করিয়াছিলেন"[৩৫] ইহা কদাপি সত্য নহে। কারণ জৈমিনির নামে শুধু অশ্বমেধ পর্ব পাওয়া যায়, তিনি মহাভারতের অন্যান্য পর্ব লিখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না; লিখিলে সারা ভারতের কোথাও না কোথাও তাঁহার পুঁথি মিলিত। কবীন্দ্রের পরে শ্রীকরনন্দী জৈমিনি ভারত অবলম্বনে শুধু অশ্বমেধ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, কবীন্দ্র অশ্বমেধপর্বের কোন কোন স্থলে জৈমিনির অনুসরণ করিলেও অন্যান্য পর্বে ব্যাসদেবের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৩৩ বর্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথি
৩৪ ঐ
৩৫ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ)

কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী ॥

কেহ কেহ বলেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী একই কবি। আসলে নাকি কবির নাম শ্রীকরনন্দী, উপাধি—কবীন্দ্র পরমেশ্বর। এরূপ অনুমানের হেতু, কবীন্দ্রের মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে শ্রীকরনন্দীর ভণিতাও আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক খানি কবীন্দ্র বিরচিত পরাগলী মহাভারতের পুঁথিতে শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্রের ভণিতা একসঙ্গে পাওয়া যাইতেছে। ১৯২৬-২৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Annual Reports-এ পুঁথি-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যে সমস্ত পরাগলী মহাভারত আছে, তাহাতে একই সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। ইহার এক বৎসর পূর্বে ঢাকার 'প্রতিভা'য় (১৩৩১) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব সর্বপ্রথম এবিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধ পর্বে কবীন্দ্র পরমেশ্বরেরও নাম রহিযাছে। অতএব শহীদুল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেন যে, কবির প্রকৃত নাম শ্রীকরনন্দী, লস্কর প্রদত্ত খেতাব—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।[৩৬] অতঃপর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঢাকার পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, শহীদুল্লাহ্ ও সুশীলকুমার দে মহাশয়দের অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত পরাগলী মহাভারতের বহু স্থলে যুগপৎ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর ভণিতা আছে। ঢাকার ২০২৫ সংখ্যক পুঁথিতে কোথাও শ্রীকরনন্দী + পরাগল খাঁন, কোথাও ছুটীখান + কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কোথাও বা শ্রীকরনন্দী + পরাগল—এইরূপ উল্লেখযুক্ত ভণিতা আছে। যথা :

শ্রীকরনন্দী + পরাগল খান—

শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি।
কুতুহলে পুছিলেত ভারত কাহিনি।
* * *
পুরাণ ভারতকথা পাঞ্চালী রচিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর + ছুটিখান—

৩৬ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের এ মত ভ্রান্ত। শ্রীকরনন্দী প্রসঙ্গে তাঁহার মতের আলোচনা করা হইয়াছে।

লস্কর ছুটিখান কর্ণসম জার দান
মেদিনি মহিমা সমসর।
তাহান আদেস মাথে জুধিষ্ঠীর নরনাথে
কবিন্দ্রে যে রচিল পয়ার ॥ (ঢা. বি. পুঁথি—২০২৫)

এই জন্য সুশীলকুমার দে ও শহীদুল্লাহ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী একই ব্যক্তি। তাহা না হইলে পরাগলী মহাভারতে কবীন্দ্র + শ্রীকর নন্দী + পরাগল + ছুটিখানের এইরূপ মিশ্রণ কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? তাই বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন: "শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন।"[৩৭] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য: কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দীর ভণিতা মিশিয়া গিয়াছে, পুঁথিগুলিতে নানা বিশৃঙ্খলা অনুপ্রবেশ করিয়াছে—ইহা ঠিক বটে, এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। দুই কবিই চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, দুইজনের মধ্যে কালগত বিশেষ ব্যবধান নাই। কাজেই লিপিকারগণের অজ্ঞতার জন্য একের পুঁথিতে অপরের ভণিতা, এমন কি রচনাংশও স্থান পাইয়াছে।[৩৮] তাই কবীন্দ্রের মহাভারতে (পরাগলী) শ্রীকরনন্দীর ভণিতা বা পদাংশ পাওয়া যাইতে পারে, আবার শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্বেও (ছুটিখানের মহাভারত) কবীন্দ্রের ভণিতা ও রচনাংশ এমন কিছু বিস্ময়কর নহে। কিন্তু দুইজনে যে পৃথক কবি, তাহার প্রমাণ, শ্রীকরনন্দীর নামে শুধু জৈমিনি ভারতের অনুসরণে লেখা অশ্বমেধপর্ব মিলিয়াছে, কিন্তু কবীন্দ্রের নামে গোটা মহাভারতখানাই মিলিতেছে, এবং তিনি মোটামুটি ব্যাসভারতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে এমন হইতে পারে যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর অথবা শ্রীকরনন্দী, পিতা পরাগল খান ও পুত্র ছুটি খান উভয়েরই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।[৩৯] কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডঃ সুশীল-কুমার দে ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীকে যে একই কবি মনে

৩৭ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৪ (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—'শ্রীকরনন্দী, বিজয়-পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত')

৩৮ পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩৯ পরে দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।[৪০] অতএব অন্যকোন দৃঢ়তর বিপরীত প্রমাণ পাওয়া না গেলে ভণিতার গোলমাল সত্ত্বেও একথা না মানিয়া উপায় নাই যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী সম্পূর্ণ পৃথক কবি : হয়তো তাঁহারা একসময়ে ও একস্থানে বর্তমান ছিলেন, একই বিষয়ে কাব্য লিখিয়াছিলেন এবং একই বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া একের কাব্যে অপরের ভণিতা ও কিছু কিছু রচনাংশ প্রবেশ করিয়াছে—লিপিকারদের অনবধানতাই তাহার প্রধান কারণ।

বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত সমস্যা ॥

এই প্রসঙ্গে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্বন্ধে দুই-এক কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে নগেন্দ্রনাথ বসু (প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব) মহাশয় বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া প্রবল ঢক্কানিনাদের সঙ্গে মহাভারতের আদি ও অকৃত্রিম অনুবাদকের নাম ঘোষণা করিয়া সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ১৩০৩ সালের (শ্রাবণ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার পূর্বে প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ রচনার ছয় বৎসর পূর্বে ১২৯৭ সনে (১৮৯০-৯১) তিনি আজিমগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) এক বৈষ্ণব বাবাজীর নিকট অনেকগুলি পুঁথি দেখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাংলা ১১৫০ সনে অনুলিখিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতও ছিল। পুঁথির ভিতরে বিশেষ কোথাও বিজয়পণ্ডিতের ভণিতা ছিল না, কেবল পুঁথির শেষে ছিল :

মহাভারতের কথা স্নুনে জেই জনে।
সকল অধর্ম্ম হরে পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে ।।
বিজয় পণ্ডীতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ।।

তখন তিনি তিনখানি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া সাহিত্য পরিষদ হইতে 'বিজয়-

---

৪০ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রমে' কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীকে একই কবি মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সদ্য প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসে দুশো বছরে' (পৃ ৪১৫-১৬) তিনি দুইজনকে পৃথক কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াও, "পূর্বমতের (অর্থাৎ দুইজন একই কবি) পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না", কেন বলিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝা গেল না।

পণ্ডিতের মহাভারত (প্রথমাংশ)' প্রকাশ করিলেন। তিনখানি পুঁথির মধ্যে দুইখানি পুঁথির পাঠ সম্পাদককে খুব সাহায্য করিয়াছিল। একখানি পুঁথি তিনি পূর্বেই কোন এক বৈষ্ণব বাবাজীর নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর একখানি পুঁথি, তাঁহার পুঁথিসংগ্রাহক পাত্রসায়রনিবাসী রামকুমার দত্তের দ্বারা তিনি বিষ্ণুপুর হইতে সংগ্রহ করেন। বসুমহাশয় বহু পরিশ্রমে কুলজী গ্রন্থ ঘাঁটিয়া এই বিস্মৃতনামা বিজয়পণ্ডিতের কাব্য ও পরিচয় উদ্ধার করিলেন। মূল গ্রন্থের মাত্র দুই স্থলে (সভাপর্ব ও অভিষেক পর্বাধ্যায়ের শেষে) বিজয়পণ্ডিতের ভণিতা আছে; বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত পুঁথিটির দ্রোণপর্বের শেষে "মেলাধিপ শ্রীবিজয়পণ্ডিত বিরচিতে বিজয়পাণ্ডবে দ্রোণপর্বে" এইরূপ এক ছত্র আছে। ইহার সূত্র ধরিয়া কুলজী-বিশারদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থ হইতে এক সংবাদ পাইলেন যে, সাগরদীয়াব বন্দ্যবংশে বিজয়পণ্ডিত হইতে 'বিজয়পণ্ডিতী' নামক মেলেব সৃষ্টি হইযাছে। বিজয়পণ্ডিত রাঢ়ী ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন। দেবীবরের 'ঘটককারিকা' হইতে জানা যায় যে, ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) মেলবন্ধন হয়। তখন বিজয়পণ্ডিতের পুত্রকন্যাব বিবাহ হইয়া গিয়াছে, অতএব তখন তিনি প্রধান হইয়াছিলেন। ১৪০৭ শকে (১৭৮৫ খ্রীঃ অঃ) ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' রচিত হয়।[৪১] তাহাতেও বিজয়পণ্ডিতের কুলক্রিয়ার পরিচয় আছে। এইরূপ নানা সূত্র হইতে নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, কুলগ্রন্থের বিজয়পণ্ডিত এবং মহাভারতেব অনুবাদক বিজয়পণ্ডিত একই ব্যক্তি। তাঁহার আরও অনুমান, ১৪০২ শকের (১৫৮০ খ্রীঃ অঃ) পূর্বেই এই মহাভারত অনূদিত হইযা থাকিবে।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আর একটি ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের সঙ্গে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারতের হুবহু সাদৃশ্য আছে। কেবল কবীন্দ্রের মহাভারত কিছু সংক্ষিপ্ত, আর তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত কিছু বিস্তারিত। তিনি স্বসম্পাদিত 'বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে'র ভূমিকায় লিখিতেছেন: "বড়ই আশ্চর্যের বিষয় পরাগলী মহাভারতের কতকগুলি উপাখ্যান এবং অপ্রাসঙ্গিক ও মূল মহাভারত বহির্ভূত কথাগুলি বাদ দিলে আমাদের আলোচ্য বিজয়পণ্ডিতের ভারতকথার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হয়।" কেন এইরূপ আশ্চর্য সাদৃশ্য, নগেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,

৪১ এই সনতারিখ নগেন্দ্রনাথ বসু নির্ধারিত।

"প্রায় ৪০০ বর্ষ গত হইতে চলিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী মহাভারত রচনা করেন। তাঁহারা যেরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, যেরূপ তৎকাল-প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে সেইরূপ শব্দ বিন্যাস ও সেইরূপ সরল ভাষা ব্যবহার দেখিতে পাই।...বিজয়পণ্ডিত, নয় কবীন্দ্র পরমেশ্বর, উভয়ের মধ্যে একজন অপরের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন।"[৪২] কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য') এই রহস্যের খানিকটা কিনারা করিয়া লিখিযাছিলেন, "সম্প্রতি বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত নামক যে গ্রন্থখানি সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সঙ্গে এত বেশী মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।" পরে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'শ্রীকরনন্দী, বিজয়পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত' শীর্ষক প্রবন্ধে[৪৩] এই রহস্যের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়াছেন। তিনি কবীন্দ্রে পুঁথির পাঠ মিলাইয়া দেখিলেন যে, কবীন্দ্রের পরাগলী মহাভারতে প্রায় সর্বত্র এইরূপ ভণিতা আছে:

বিজয়পাণ্ডব কথা অমৃতলহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি।।

লিপিকর প্রমাদে 'বিজয়পাণ্ডব কথা'-ই 'বিজয়পণ্ডিতে' পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তন ইচ্ছাকৃতও হইতে পারে। কবীন্দ্রের মহাভারতের ভণিতা:

ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক উভয় উদ্ধার।।

বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে দাঁড়াইয়াছে:

বিজয়পণ্ডিত নাম অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক করে উপকার।।

পাণ্ডববিজয়কথার দ্বারা ইহলোক-পরলোক উদ্ধার হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে 'বিজয়পণ্ডিতের নাম' শুনিলেই ইহলোক-পরলোকে উপকার হইবে—এরূপ উক্তি কিরূপ হাস্যকর, এবং কিরূপ কাঁচাহাতের চৌর্যবৃত্তি তাহার স্বরূপ নগেন্দ্রনাথ বসু ধরিতে পারেন নাই বা ধরিতে চাহেন নাই। তিনি স্বকপোলকল্পিত 'থিওরি' খাড়া করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করিতেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরই পরবর্তী কালে বিজয়পণ্ডিতকে নকল করিয়াছিলেন এবং

৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০২

৪৩ সা-প-প, ১৩৩৪

কুলগ্রন্থের একটি অর্ধোক্তি অবলম্বনে ('বিজয়পণ্ডিতী মেল'—ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী') হুলুস্থুলু বাধাইয়া দিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ অযৌক্তিক গবেষণা চলিত, নগেন্দ্রনাথ আয়োজিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের বিরাট কাণ্ডকারখানার কৌতুককর ব্যাপার একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীনযুগের বড় কেহ পুঁথির বিশুদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিত না, বানান গ্রাহ্য করিত না, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমাজ যখন বাংলা পুঁথি লিখিতেন, তখন তাঁহারাও শব্দাভিধান ও ব্যাকরণাদির সাধারণ নিয়ম কবরস্থ করিতে আদৌ কুণ্ঠিত হইতেন না। নানা স্থানে প্রাপ্ত একই কবির পুঁথিতে নানা বিশৃঙ্খলা পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিবর্জন দেখা যাইবে। প্রাচীন বাংলা পুঁথি লইয়া গবেষণার মতো বিড়ম্বনার ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'বিজয়পাণ্ডবকথা'ই অজ্ঞ পুঁথিলেখক, অশিক্ষিত শ্রোতৃসমাজ এবং আধুনিক গবেষকের কৃপায় 'বিজয়পণ্ডিত' নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত ও কবীন্দ্রের 'বিজয়পাণ্ডবকথাব' যে কোন অংশ মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে।[৪৪] বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিজয়পণ্ডিত সম্বন্ধে সকৌতুকে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অতিশয় যুক্তিযুক্ত, "ইনি (বিজয়পণ্ডিত) 'মসীগোত্রে', 'লেখনীক্ষেত্রে', 'অনবধানতার গর্ভে' উদ্ভূত কোন অদ্ভুত" ব্যক্তি হইবেন।[৪৫] অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ন্যায়সঙ্গত যে, কবীন্দ্রই মহাভারতের প্রথম অনুবাদক; লিপিকারের অজ্ঞতা ও অনবধানতার জন্য 'বিজয়পাণ্ডবকথা' কোন একখানি পুঁথিতে বার দুই 'বিজয়পণ্ডিত' লেখা হইয়াছে বলিযাই কুলশাস্ত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া এবং জোড়াতালি দিয়া তথাকথিত আদি ও অকৃত্রিম বিজয়পণ্ডিতের সঞ্জীবন মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন নাই। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই আবার বহু পুঁথির আকার, পাঠ, শব্দ বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন—ইহা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। ইতিপূর্বে আমরা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথের এরূপ

৪৪ দ্রষ্টব্য—সা. প. প. ১৩৩৪ ; বসন্তকুমারের মন্তব্য—"লিপিকর প্রমাদবশতঃ এই সকল পুষ্পিকা কোনও কোন পুঁথিতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। 'বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত' নামক যে মহাভারতখানি পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ একটা ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

৪৫ সা. প. প. ১৩৩৪

একটা ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিছুকাল পূর্বে, এমনকি এখনও যাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গবেষণা করেন, তাঁহারা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত আন্দাজ করিয়া লইয়া সমস্ত উপাদানকে ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা সেই দিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। কিছুকাল পূর্বে এই ব্যাপার আরও নিরঙ্কুশভাবে চলিত। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণে'ই তাহা বুঝা গিয়াছে।[৪৬]

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যপরিচয়॥

এবার কবীন্দ্রের কাব্যসম্বন্ধে দুই-এক কথা আলোচনা করা যাক। কবীন্দ্র যে ব্যাসভারতকেই সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। কারণ ব্যাসমহাভারতের প্রত্যেক পর্বের অনুবাদ কবীন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে—সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় এরূপ অনেক পুঁথি রহিয়াছে। সুতরাং তিনি জৈমিনি ভারত অবলম্বন করেন নাই এই সিদ্ধান্তও অবশ্য স্বীকার্য হইয়া পড়ে। এই কাব্য চট্টগ্রামে রচিত হইয়াছিল, কাজেই ভাষার মধ্যে কিছু কিছু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, মধ্যযুগের কোন অনুবাদ-গ্রন্থেই আক্ষরিক অনুবাদের রীতি অনুসৃত হয় নাই। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কবিগণ অধিকাংশ স্থলেই মূল কাহিনীটি গ্রহণ করিয়া নিজের কথায় বলিয়া যাইতেন, কদাচিৎ মূলের তত্ত্ববর্ণনা বা অন্য কোন ঘটনা বর্ণনার ধারা মূলানুযায়ী রচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় সর্বত্র ভাবানুবাদের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। কোন কোন কবি আবার মূলের অনেক বর্ণনা বা তথ্য বাদ দিয়া নিজের কল্পনা হইতে কাহিনী সৃষ্টি করিতেন, বর্ণনার ধারায়ও নিজস্ব রীতি অনুসরণ করিতেন। সেই দিক দিয়া দেখিলে কবীন্দ্রের রচনায় খুব একটা উল্লেখযোগ্য শিল্পচাতুর্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি অতিশয় সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কারণ পরাগল খান একদিনের মধ্যে সমস্ত ভারত-পাঁচালী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য কবীন্দ্রের কাব্য স্বতঃই সঙ্কুচিত—কাশীরাম বা কৃত্তিবাসের কাব্যের মতো সুপরিসর নহে। কেহ কেহ অনুমান

৪৬ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি বলিয়া পূর্বশ্রুত ময়ূরভট্টের 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামক যে কাব্যখানি সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা জালগ্রন্থ। লেখক কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের এক স্কুলের শিক্ষক। মদীয় 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা থাকিবে।

করেন, তাঁহার ভণিতায় মহাভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত ও একখানি বিস্তৃত অনুবাদ প্রচলিত আছে।[৪৭] কবীন্দ্রের মূল রচনাকে ছাঁটিয়া বাদ দিয়া বর্ণনা সঙ্কুচিত করিয়া কোন লিপিকার যে মহাভারতটি চালাইয়াছেন তাহাই তথাকথিত 'বিজয়পণ্ডিতের' মহাভারতে পরিণত হইয়াছে এবং যেটি বৃহত্তর, তাহাই বোধ হয় 'সঞ্জয়ের মহাভারত'রূপে পূর্ববঙ্গে অতিশয় প্রচার লাভ করিয়াছে।[৪৮]

কবীন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, স্বতঃ প্রবহমানতা। বস্তুতঃ তাঁহার পরিচ্ছন্ন, সহজ, অনলঙ্কৃত বর্ণনা অভূতপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত না হইলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য। নিম্নে ভীষ্মপর্ব হইতে যুদ্ধের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া কবীন্দ্রের সরল পয়ারের যৎসামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ঃ

সর্ব্ব সন্য বেরিল অর্জ্জুন একশ্বর।
হেন কালে রণে আইল বির বৃকোদর ॥
তবে ভিষ্মে পেচাইল সর্ব্ব বিরগণ।
সবে মিসি কর গিয়া ভীমের নিধন ॥
কালান্তক জম জেণ ভীম মহাবির।
সাবধানে মার গিয়া রথে হইয়া স্থির ॥
ভগদত্ত জাও ঝাটে বিলম্ব না কর।
ভীমের উপরে শবে মহা অস্ত্র কর ॥
ততক্ষণে বেরিয়া মারন্ত যোধগণে।
অন্ধকার করিলেক শর বরিষণে ॥
মেঘে জেন আবরিল না দেখি ভাস্কর।
শঙ্খ জালে আবরিল বির বৃকোদর ॥

(কলি. বিশ্ব. পুঁথি.—২১৪৮)

৪৭ এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা নূতন সংবাদ নহে যে, তথাকথিত পরাগলী মহাভারতের দুইটি রূপ প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়—একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত রূপটি বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত এবং বিস্তৃতটি সঞ্জয়ের মহাভারতে পরিণত হইয়াছে" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ)। তাঁহার এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবিক নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের সঙ্গে গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত কবীন্দ্রের মহাভারতের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিল আছে। শুধু তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতখানি কিছু সংক্ষিপ্ত। এই জন্য ডঃ সেনের পূর্বে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুমান করিয়াছিলেন, "বিজয়পণ্ডিতের নামে প্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্ত সার।" (সা. প. প. ১৩৩৪)

৪৮ পরে সঞ্জয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই জাতীয় বিবৃতিমূলক বর্ণনায় কবীন্দ্র কিছু কিছু উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া একটা চিত্ররূপের আভাস দিতে চাহিয়াছেন।

জেন গন্ধমাদনে বরিসএ মেঘগণে
ঝরবৃষ্টি দ্রোণের উপর। (ঐ পুঁথি)

কিংবা,

জৈন দুই অগ্নি আসি একত্রে মিলিল।
ভীষ্ম ধনঞ্জয় দুই মিশামিশি হৈল॥ (ঐ পুঁথি)

অথবা,

ক্রুদ্ধ হৈল দুর্যোধন আদেশিল দুঃশাসন
দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি।
রাজার আদেশ পাইয়া দুঃশাসন গেল ধাইয়া
সভাতে আনিল একেশ্বরী॥
একবস্ত্র রজস্বলা সভাত আনিল বালা
যেন রাহু গ্রাসে শশিকলা।

আর একটি বর্ণনা,

অগ্নি জেন বন দহে নিদাঘ সময়।
অর্জুনএ ভীষ্ম বীরে সৈন্য করে ক্ষয়॥

এই সমস্ত দুইচারি পংক্তিতে চমৎকার চিত্ররূপ ফুটিয়াছে। "সিংহ যেন মৃগ ধরে বনের ভিতর", "অর্জ্জুনের বাণ যেন জমের দোসর" প্রভৃতি বাক্যাংশগুলি কৃত্তিবাস অপেক্ষা নিন্দনীয় নহে।

কৃষ্ণ যখন কর্ণকে বলিলেন যে, ভীষ্ম কর্ণকে তো অবজ্ঞা করেন, তখন তিনি কেন পাণ্ডবের পক্ষে যোগদান করিতেছেন না, তদুত্তরে কর্ণ ও কৃষ্ণের সংলাপ নাটকীয় উক্তি হিসাবে মন্দ হয় নাই:

কর্ণ বীর দেখি কৃষ্ণ বলিলা আদরে।
ভীষ্ম হৈল শেনাপতি তোহ্মা না আদরে॥
এত বড় অবজ্ঞা শরীরে তোর সহে।
রণেতে উপেক্ষা কৈলে খেত্রি ধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবে পুজিব লোক স্থন বলি হিত।
পাণ্ডবের বলে আইষ করি সমিহিত। (ঐ পুঁথি)

তাহার উত্তরে কর্ণ বলিতেছেন:

কৃষ্ণের বচন শুনি হাসি কহে কর্ণ।
দুর্য্যোধন কার্য্যে মই প্রাণ কৈল পণ ॥
জাবত গোবিন্দ মোর কষ্টে রহে জীব।
দুর্য্যোধন রাজার অপ্রিয় না করিব ॥ (ঐ পুঁথি)

এ সমস্ত স্থলে স্বল্প কথায় সংলাপের রীতিটি নাটকীয় হইয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, "সংক্ষিপ্ত বলিয়া পাণ্ডব বিজয় অত্যন্ত বর্ণনামূলক এবং তজ্জন্যই ইহাতে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ ছিল না।"[৪৯] তবু অনেক স্থলে কবি কিছু কিছু আলঙ্কারিকতাব সাহায্য লইয়াছেন, এবং কাব্যটি বর্ণনামূলক হইলেও অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ উক্তিব সংলাপ উপেক্ষার যোগ্য নহে। যদিও কবি মূল মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, তবু মাঝে মাঝে তিনি মূলকে যথাযথ অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাঁহার পরিচয ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার পযার ত্রিপদীগুলি বেশ মসৃণ হইযাছে। দুই-চারিটি স্থানীয় উপভাষার শব্দ বাদ দিলে তাঁহার ভাষা মূলতঃ সাধুভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সংস্কৃতভাষা উত্তমরূপে অধিগত করিযাছিলেন বলিযাই ভাষাতে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য সহজেই দৃষ্টিগোচব হইবে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যদিও ইহা ইসলামধর্মাবলম্বী পরাগল খানের প্রীতির জন্য রচিত হইয়াছিল, এবং সভায় বসিয়া তিনি ইহা নিয়মিত শুনিতেন, তবু কবি ইহাতে ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য তাঁহার পুঁথিতে নানা হস্তক্ষেপ ঘটিযাছে বলিয়া রচনাগত কোন্ গৌরবটুকু তাঁহার প্রাপ্য তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। তাঁহার পুথিগুলি বিশেষ প্রাচীন নহে, ভাষাতে অর্বাচীনত্বের লক্ষণও দুর্লভ নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের পুঁথির ভাযা ধরিয়া তাঁহার ভাষার গুণ ব্যাখ্যান উচিত নহে। যাহা হউক, চৈতন্যযুগেব প্রারম্ভে মহাভারত অনুবাদ করিয়া তিনি 'ভারত' সাগরে পাড়ি জমাইতে গিয়া যে ব্যর্থ হন নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

৪৯ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম (১ম সংস্করণ)

॥ ৩ ॥

শ্রীকরনন্দী ও ছুটিখানের মহাভারত

কবি ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ॥

চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তার সহিত আর এক মহাভারতের অনুবাদকের নাম জড়াইয়া গিয়াছে, ইনি শ্রীকরনন্দী, কোন কোন পুঁথিতে শ্রীকরণনন্দী নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ইঁহার ঈষৎ পূর্বগামী কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যাস-মহাভারতের সমস্ত পর্বেরই সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন, শ্রীকরনন্দী কিন্তু সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই। ইঁহার ভণিতায় শুধু অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এবং কবি মূল হিসাবে ব্যাসকে অবলম্বন না করিয়া জৈমিনি ভারত অনুসরণ করিয়াছেন। জৈমিনির নামে সংস্কৃতে রচিত শুধু অশ্বমেধ পর্বই পাওয়া যায়, তাঁহার অশ্বমেধপর্ব ব্যাসের রচনা অপেক্ষা বিস্তৃততর। তাই সবিস্তারে অশ্বমেধপর্ব বর্ণনা করিবার জন্য শ্রীকরনন্দী জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে অনেক জটিলতা, সংশয় ও মতানৈক্য আছে। কারণ কবীন্দ্রের পুঁথিতে অশ্বমেধ পর্ব ছাড়াও অন্যান্য পর্বে শ্রীকর নন্দীর ভণিতা আছে। লিপিকার প্রমাদেই হউক, আর যে-কোন কারণেই হউক, কবীন্দ্রের মহাভারতে যে শ্রীকরনন্দীর ভণিতা পাওয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না, এবং এইজন্য এমন কথাও উঠিয়াছে যে, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী পৃথক কবি নহেন। কবির নাম শ্রীকরনন্দী, লস্কর প্রদত্ত উপাধি—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।[৫০]

পরাগল খানের পুত্র ছুটিখান (অর্থাৎ ছোটখান), তাঁহার অপর নাম সম্ভবতঃ নসরৎ খান, যদিও শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্বের প্রায় সর্বত্র ছুটি খান নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কবীন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ খান যখন চট্টগ্রাম বিজয়ে প্রেরিত হন, তখন সেই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন পরাগল খান। পরাগল খান কিছুকাল বিজিত চট্টগ্রামের 'লস্কর' অর্থাৎ শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পর চট্টগ্রামের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন তাঁহার পুত্র ছুটিখান। তখন বোধ হয় হুসেন শাহ জীবিত ছিলেন। কারণ ছুটিখান বীরত্ব সহকারে ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিলে সুলতান তাঁহাকে সম্মান করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদ

৫০ পরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

বিহারী কাব্যতীর্থের সম্পাদনায় ১৩১২ সালে সাহিত্য পরিষদ হইতে 'ছুটিখানের মহাভারত' (অশ্বমেধ পর্ব) নামে যে পুস্তিকাটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রারম্ভ ভাগে ছুটিখান, পরাগল খান, হুসেন সাহও শ্রীকরনন্দী সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। যথা ঃ

নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
রাম বহুশিষ্ট পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হোসেন সাহা যেন্ন ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ড ভেদে পালএ বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান ॥

*   *   *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয় ॥

তাঁহাব শৌর্যবীয ও গুণের পবিচয পাইযা স্বযং সুলতান হুসেন শাহ্ পরাগলের পুত্র ছুটিখানকে বিশেষ সম্মান দেখাইলেন, তাঁহাকে একটি অশ্বও উপহার দিলেন—বোধহয় ত্রিপুরা জয়ের পুরস্কার। অতঃপর ছুটিখানও পিতার মতো চট্টগ্রামেব 'লস্করী বিষয়' (অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্ব) লাভ করিলেন ঃ

লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥

ত্রিপুররাজা তাঁহার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পর্বতগহ্বরে লুকাইয়া রহিলেন। যদিও তখন ছুটিখান ত্রিপুরার উপর আর অত্যাচার করিতেন না, তবু ত্রিপুরাধিপতি ভয়ে ভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছুটিখানের সুশাসন প্রচারিত হইল; অতঃপর একদিন তিনি পাত্রমিত্র ও পণ্ডিতজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সভায় বার দিযা বসিয়া আছেন। সেই সময়ে তিনি শুনিলেন (বোধ হয় হিন্দু পণ্ডিতদের নিকট), "মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা।" জৈমিনি সংস্কৃতে অশ্বমেধ পর্ব রচনা করিয়াছিলেন শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, দেশীয় ভাষায় এই কাহিনী রচিত হইলে তাঁহার (ছুটিখানের) কীর্তি ছড়াইয়া পড়িবে।

দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারেকৈ কীর্তি মোর জগৎ সংসার ॥

তখন ছুটিখান শ্রীকরনন্দীর উপরে এই অশ্বমেধ পর্ব রচনার ভার দিলেন।

ছুটিখান ত্রিপুরা জয় করিয়া এবং চট্টগ্রামে সুশাসন প্রচলিত করিয়া আপনাকে হয়তো পাণ্ডুনন্দনদের সমতুল্য ভাবিয়াছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুরূপ বিশাল ঐশ্বর্যময় অসপত্ন গৌরবলাভের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাই পাণ্ডবদের অশ্বমেধ পর্বের বীরত্ব কাহিনীপূর্ণ ঐশ্বর্যের বর্ণনা তাঁহার এত মনোরঞ্জন করিয়াছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, পাঠান সুলতান বা শাসনকর্তাগণ শুধু কবিদের উৎসাহ দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, সংস্কৃত পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনার প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ কৌতূহল ছিল। বিশেষতঃ মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহাদির মধ্যে যে পৌরুষ, বীরত্ব, প্রচণ্ড শক্তি ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠান শাসক ও সুলতানের প্রীতিকর হইবারই সম্ভাবনা। আরও লক্ষণীয় যে, ইঁহারা তাতার-তুর্কী-খোরাসান যেখান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে কিছু দিন বাস করিয়া বাংলা ভাষা বুঝিবার মতো জ্ঞান সংগ্রহ করিতেন। সংস্কৃত ভাষা না বুঝিলেও সে বিষয়েও উৎসাহ প্রদান করিতেন। ছুটিখানের সভায় হিন্দু পণ্ডিতগণ সংস্কৃতে রচিত জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের কথা বলিলে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট এই অশ্বমেধ পর্বের সারমর্ম শুনিয়াছিলেন, এবং পঞ্চপাণ্ডবের গৌরবজ্ঞাপক ঐশ্বর্য-বীরত্বের কাহিনী বাংলা ভাষায় পুনরায় রচনার জন্য হিন্দু কবিকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। পরাগলও একদিনের মধ্যে যতটা পড়া যায় ততটুকু সময়ের মধ্যে গোটা মহাভারতকাহিনী শুনিতে চাহিয়াছিলেন।[৫১]

এখন শ্রীকরনন্দীর পৃথক অস্তিত্ব লইয়া যে জট পাকাইয়াছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাতের চেষ্টা করা যাক। আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পুঁথিতে বহুস্থলে শ্রীকরনন্দীর ভণিতাও আছে—যদিও তাঁহার পুরা ভণিতায় শুধু অশ্বমেধ পর্ব পাওয়া গিয়াছে, অন্য কোন পর্ব পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবির প্রকৃত নাম শ্রীকরনন্দী, 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' খেতাবটি বোধ হয় লস্কর পিতা বা পুত্র প্রদত্ত। কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে পরাগলের নামের সঙ্গে তাঁহার গুণবান পুত্র ছুটিখানেরও উল্লেখ আছে।

৫১ এহি সব কথা সংক্ষেপ করিয়া।
একদিনে শুনিতে পারি পাচালি বলিয়া॥ (বর্ধমান সাহিত্যসভার কবীন্দ্রের মহাভারতের পুঁথি)

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুররাজকে অপসারিত করেন এবং ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করেন তাহা 'রাজমালা' হইতে অনুমান করা যায়। 'রাজমালা'র মতে ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়া লইলে হুসেনের সেনাবাহিনী প্রায় এই সময়েই ধন্যমাণিক্যের নিকট হইতে চট্টগ্রাম কাড়িয়া লয়, ত্রিপুরারাজ্যেরও কিয়দংশ অধিকার করে—অবশ্য শেষোক্ত বর্ণনাটি 'রাজমালা'য় নাই, না থাকাই স্বাভাবিক। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক নিজ দেশের অগৌরবের কথা কেনই-বা লিখিবেন? কিন্তু ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অব্দের দিকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ হুসেন শাহের সেনাবাহিনীর অধিকারে ছিল, এবং তাহার নেতৃত্বভার পরাগল খানের উপর পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সোনারগাঁও অঞ্চলে একটি মসজিদে ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিযাছে। তাহাতে মসজিদ-নির্মাতা খওয়াস খান ত্রিপুরার "সর-এ-লস্কর" অর্থাৎ শাসন-কর্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।[৫২] অতএব অনুমান করা যায় যে, ১৫১৩ খ্রীঃ অব্দ বা তাহার কিছুপূর্বে পরাগল খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা লস্কর হিসাবে প্রেরিত হন। কারণ তিনিই এই অভিযানে কুমার নুসরৎ খানের সঙ্গী হইয়াছিলেন।[৫৩] কিন্তু পরাগলের পুত্র ছুটিখান ত্রিপুররাজকে যথার্থ দমন করিযাছিলেন, এবং এই বীরত্বের জন্য তিনি হুসেন শাহের নিকট অভ্যর্থনা ও খেলাত লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ছুটিখান যখন লস্করী পান, তখনও হুসেন জীবিত ছিলেন। হুসেনের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অব্দে ত্রিপুরায় অভিযান প্রেরিত হয, সেই সময়েই পরাগল চট্টগ্রামের 'লস্কর' রূপে শাসনভার গ্রহণ করেন।

[৫২] সুখময় মুখোপাধ্যায়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ. ২২৯

[৫৩] কেহ কেহ মনে করেন যে, চট্টগ্রাম অভিযানে পরাগল খানের কোন যোগাযোগ ছিল না। চট্টগ্রাম পূর্ব হইতেই গৌড়ের সুলতানের অধিকারে ছিল। তবে বোধ হয ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্য কিছুকালের জন্য গৌড়েশ্বরের হাত হইতে চট্টগ্রাম কাড়িয়া লইয়াছিলেন (১৫১৩-১৪)। তারপর চট্টগ্রাম পুনরধিকার ও ত্রিপুররাজকে শাস্তি দিবার জন্য হুসেন শাহ নিজ পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য—সুখময় মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থের ২৭২ পৃষ্ঠা।) কিন্তু হুসেন শাহ যে ত্রিপুররাজকে শায়েস্তা করিতে পরাগলকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দের (১৬১০ শক) একটি পুঁথিতে আছে:

সুলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাথ॥ (সা. প. প. ১৩২৪)

ছুটিখান নিশ্চয় ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই লস্করী পাইয়াছিলেন, কারণ এই সময়ে তিনি ত্রিপুররাজকে একেবারে কোণঠাসা করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে, পরাগল খান অধিক দিন লস্করী ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তিনি লস্করী পান নাই, এবং ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্বেই তাঁহার পুত্র ছুটিখান লস্করী পাইয়াছিলেন। বোধহয় পিতার চেয়ে পুত্রের কৃতিত্ব সমধিক বিবেচিত হইয়াছিল, তাই কবীন্দ্রের মহাভারতের কোথাও কোথাও ছুটিখানের উল্লেখ আছে, এবং শ্রীকরনন্দী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ছুটিখানের নানাবিধ সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালের (১৪৯৩-১৫১৯) মধ্যে কবীন্দ্রের মহাভারত অবশ্যই রচিত হইয়াছিল, এমন কি ছুটিখানের নির্দেশে রচিত শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধ পর্বও হুসেন শাহের শাসনকালের মধ্যে সূচিত হইতে পারে। হুসেনের পুত্র নুসরৎ শাহের সময়ে শ্রীকরের অশ্বমেধপর্ব রচিত হইলে কবি নিশ্চয অধিকতর গৌরববাচক শব্দে তদানীন্তন সুলতানের গুণগান করিতেন। অতএব আমাদের অনুমান, শ্রীকর-নন্দীর কাব্য ১৫১৯ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি সময়েই রচিত হইয়াছিল।

শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর ॥

ডঃ মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ ১৩৩১ সালের 'প্রতিভা'য় (৪র্থ সংখ্যা) একটি প্রবন্ধে ("শ্রীকরনন্দী কবীন্দ্র পবমেশ্বর") প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিযাছেন যে, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী দুইজন পৃথক কবি নহেন। কবিব আসল নাম শ্রীকরনন্দী, 'কবীন্দ্রপরমেশ্বর' শাসনকর্তা প্রদত্ত উপাধি, এইরূপ অনুমানের কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত শ্রীকরনন্দীর পুঁথিতে কবীন্দ্রের বচনা পাওয়া যাইতেছে। এমন কি, তিনি (কবীন্দ্র) যে ছুটিখানের আদেশেই কাব্য রচনা কবিতেছেন, তাহা স্পষ্টই নির্দেশ করিযাছেন। এইরূপ কয়েক ছত্র উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ

(১) অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
পিবন্ত ভকত জনে দুই কর্ণভরি ॥
লসগর পরাগল খানের তনয়।
কর্ণসম দাতা ছুটীখান মহাশয় ॥
তাহার আদেশমালা মাথে আবোপিয়া।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাঞ্চালী রচিয়া ॥

(২) শ্রীকরনন্দীর আর এক পুঁথিতে কবীন্দ্রের ভণিতা আছে ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ শত তন্ত্রের সার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার ॥

(৩) কবীন্দ্রের এক পুঁথিতে ছুটিখানের এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ

তনয় যে ছুটীখান পরম উজ্জল।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল ॥

(তিনটি উদ্ধৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি হইতে গৃহীত)

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিয়া কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত অনেক পুঁথিতে শ্রীকরনন্দীরও অনেক ভণিতা পাইয়াছেন। তাই তিনিও শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী একই কবি।

শহীদুল্লাহ ও বসন্তকুমার—উভয়েব যুক্তিই অত্যন্ত দুর্বল। কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী প্রায় এক সময়ের কবি, একই শাসকবংশের ছায়াতলে ছিলেন, এবং উভয়েরই অবলম্বন মহাভারত। তবে কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন, আর শ্রীকরনন্দী শুধু জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। বস্তুতঃ শ্রীকরনন্দীর ভণিতাযুক্ত অশ্বমেধ পর্বের পুঁথিতে কবীন্দ্রের ভণিতা নাই, কিন্তু যে অশ্বমেধপর্বগুলি কবীন্দ্রের গ্রন্থের সঙ্গে ঠাই পাইয়াছিল, তাহাতেই ভণিতার এইরূপ গোলমাল স্বাভাবিক। শ্রীকরনন্দী যে শুধু জৈমিনি ভারতের (অশ্বমেধ পর্ব) অনুবাদ করিযাছিলেন, তাহার প্রমাণ—শ্রীকবনন্দীর ভণিতাযুক্ত অশ্বমেধ পর্বের পুঁথির গোডাতেই দেখা যাইতেছে যে, ছুটিখান পণ্ডিতদেব নিকট জৈমিনি ভাবতের অশ্বমেধ পরিকল্পনা শুনিয়া তাহাই দেশভাষায় শুনিতে চাহিলেন এবং তাঁহার আদেশ পাইয়া শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করিলেন।[৫৪]

এ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী পৃথক কবি, যদিও প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত। লিপিকারদের অজ্ঞতার জন্য একের পুঁথিতে অপরের ভণিতা চলিয়া গিযাছে। লিপিকার বা পাঁচালীগায়ক, পাঠক ও কথকগণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য দুই কবির গ্রন্থ হইতেই বাছিয়া বাছিয়া অংশসমূহ নির্বাচন করিতেন, সুতরাং কবীন্দ্রের মহাভারতে শ্রীকরনন্দীর রচনা ও ভণিতা দেখিলে বিস্মিত হইবার কি আছে? আর তাহা ছাড়া শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব অধিকাংশ সময়ে কবীন্দ্রের পুঁথির

৫৪ ছত্রগুলি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সঙ্গেই মিলিতেছে। এরূপ জোড়াতালির সময় নানা বিভ্রাট ঘটা সম্ভব। উপরন্তু উৎসাহী লিপিকার বা গায়ক কথকগণ একজনের রচনায় স্বচ্ছন্দে অপরের ভণিতা চালাইয়া দিতেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে যেরূপ ভণিতার গোলমাল হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় সেরূপ হইতে বাধা কোথায়? বিশেষতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী যখন প্রায় এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের রচনায় আরও অধিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। অবশ্য একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দুই জনের রচনার মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে। কবীন্দ্রের রচনায় বর্ণনার বাহুল্য, ভাষা প্রয়োগে কিঞ্চিৎ অসতর্কতা আছে, সংক্ষেপীকরণের দিকেই তাঁহার প্রবণতা অধিক। কোন কোন স্থলে তিনি আলঙ্কারিক কৌশলও আমদানি করিযাছিলেন। অপরদিকে শ্রীকরনন্দীর ভাষা ঈষৎ লঘু ধরনের, অনাবশ্যক অলঙ্কার তাঁহার রচনায় বিশেষ নাই, পরিহাস ও ব্যঙ্গের দিকে তাঁহার আকর্ষণ ছিল, কিন্তু কবীন্দ্রের রচনায় ব্যঙ্গপরিহাস বিশেষ সুলভ নহে।

শ্রীকরনন্দীর কবিত্ব ও জৈমিনি ভারত॥

জৈমিনির নামে প্রচারিত অশ্বমেধপর্বটি যে শ্রীকরনন্দীর প্রধান অবলম্বন, তাহা তিনি কাব্যের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছেন। সমর বিজয়ী এবং হুসেন শাহের নিকট অতিশয় সম্মানপ্রাপ্ত ছুটিখান চট্টগ্রামকে কল্পনার বলে যেন ইন্দ্রপ্রস্থের অশ্বমেধ যজ্ঞে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নির্দেশে শ্রীকরনন্দী জৈমিনির অশ্বমেধপর্বের ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বলাই বাহুল্য আক্ষরিক অনুবাদ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, মূল ঘটনাকে লস্করের বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করিযা তিনি নিজ পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ অর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই হুবহু ভাষান্তরের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। তাই বলিয়া তিনি কবীন্দ্রের মতো অতিসংক্ষেপীকরণের রীতিও অবলম্বন করেন নাই। নিম্নে মূল জৈমিনির গদ্যানুবাদ এবং শ্রীকরনন্দীর পয়ারে রূপান্তরের উল্লেখ করা যাইতেছে:

জৈমিনি ভারত:

ভীম কহিলেন, পুত্র, যেদিন আমরা তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেই আমাদিগের অত্যন্ত লজ্জা উপস্থিত হয়। বৃষকেতু কহিলেন,—অপরাপর ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে কুৎসিতকর্ম্মা পিতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া

তাঁহার উপকারই করিয়াছেন, ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি ? তিনি আপন সহোদর-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অবিনীত ধর্ম্মবিদ্বেষী দুর্য্যোধনের সেবা করিয়া কি সাধুকার্য্য করিয়াছিলেন ? নারীকুলের আদর্শভূতা দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে গুরুজন সমক্ষে সেইরূপ অপমানিতা দেখিয়াও উদাসীন্যের ন্যায় উপহাস করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছিল ?......অতএব পাপকর্ম্মা পিতাকে নিহত করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই দুষ্কৃতি ভাজন হয়েন নাই। হে মহামতে। ইহাতে আপনাদিগের কিছুমাত্র লজ্জার সম্ভাবনা নাই। আপনাদিগের প্রসাদে তিনি সূর্য্যলোকে গমন করিয়াছেন।......

(চন্দ্রনাথ বসু অনূদিত)

শ্রীকবনন্দীর রচনা ঃ

কি পুনি তোহ্মার বাপ যে হোন্ত মারিল।
তোর মুখ চাহম যে লজ্জা আবরিল ॥
এ হেতু তোহ্মারে পুনি খাইবারে সমর।
বলিবারে একমুখে না আইসে উত্তর ॥
ভীমের বচনে বৃষকেতুএ বোলন্ত।
না করিলা অপকর্ম্ম শুন মতিমন্ত ॥
উপকার কৈলা মোর জনক সংহারি।
সদা এ আছিল দুর্য্যোধন সেবাকারী ॥
ধর্ম্মেত হয়ন্তি তেঞি পাণ্ডুর তনয।
নিজ সৈন্য এড়ি কৈল শত্রুতে বিনয ॥
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কামহত চিত্তে।
আলোকন করি সব সভার বিদিতে ॥
সে সব অধর্ম্মনাশ কৈলে তুহ্মি সব।
সন্মুখ সমরে তান কৈলা পরাভব ॥
স্বর্গে গেলা বাপ মোর তোহ্মার প্রসাদে।
উপকার মানি আহ্মি না চিন্ত প্রমাদে ॥

(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব)

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে, অনুবাদ ঠিক আক্ষরিক না হইলেও, মূল কথাগুলি বিশেষ বাদ পড়ে নাই। শ্রীকবনন্দী শুধু অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে মূলকে অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন— সে সুযোগ কবীন্দ্রের ছিল না। কারণ কবীন্দ্র পুরা ব্যাস ভারতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিযা স্বল্প পরিসরে শুধু কাহিনীটিকে বিবৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীকরনন্দীর রচনাগত একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো। ইতিপূর্বে আমরা শ্রীকরের রচনায় হাস্য-পরিহাসের কথা বলিয়াছি। জৈমিনি ভারতে কিছু কিছু কৌতুকরসের পরিচয় আছে, ব্যাস-সংহিতার বিরাট পরিসর, প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও আসন্ন বিনাশের পটভূমিকায় লঘু কৌতুক ও হাস্যরস ঠিক জমিতে পারে নাই। কিন্তু জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতে কয়েক স্থানে কৌতুকরস চমৎকার ফুটিয়াছে। শ্রীকরনন্দীর কবিপ্রকৃতি হাস্যকৌতুকের প্রতি বিমুখ ছিল না, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সঙ্গে ভীমের যাইবার প্রস্তাব উঠিলে কৃষ্ণ আপত্তি করিয়া বলিলেন, ভীম স্থূলোদর, বহুভক্ষক, রাক্ষসীভার্যাসহচর; অতএব এরূপ ব্যক্তিকে এই দুরূহ কর্মে প্রেরণ করা কর্তব্য নহে। এই উক্তিতে ভীম চটিয়া উঠিয়া কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের স্বরে কৃষ্ণকে বলিলেন :

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল ॥
তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন ॥
তুমি স্থূলোদর নহে, আমি স্থূলোদর।
বিমর্শিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর ॥
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইবা তুহ্মি।
তোহ্মা হোন্তে বহু ভক্ষ হইলু কি আহ্মি ॥
ভাল্লুক কুমারী তোহ্মার ঘরে জম্বাবতী।
তা হোতে অধিক নিকি হিড়িম্বা যুবতী ॥
নিজনারী সত্যভামা প্রিয় করিবার।
রণেত জিনিল জ্যেষ্ঠ ভাই আপনার ॥
ক্ষিতিত আনিল তুহ্মি পুষ্পপারিজাত।
দেবগণে পাইল বহুল উৎপাত ॥
তুহ্মি নারীজিত নহে আহ্মি নারীজিত।
আপন না চাহি মোকে বোল বিপরীত ॥

ভীমের কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তিতে কৃষ্ণ ঠিক জবাব পাইয়া খুশী হইলেন :

ভীমের বচনে কৃষ্ণ বহু আনন্দিল।
ভাল ভাল বলি ভীম উঠি আলিঙ্গিল ॥

এই তীক্ষ্ণ বাক্‌রীতি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এ রচনা শ্রীকরের নিজস্ব

সৃষ্টি হইলে আমরা এই কবিকে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একজন বিরল প্রতিভার কবি বলিয়া বিশিষ্ট সম্মান দিতে পারিতাম।[৫৫] এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, "ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধৃত ছত্রগুলিতে তোৎলার রাগ মনে পড়ে" ('বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য')। কিন্তু যুগ ও স্থানীয় উপভাষার প্রভাব বিচার করিলে 'আহ্মি' 'তুহ্মি' প্রয়োগকে 'ভাষার জটিলতা' বলা যায় না। তোৎলার রাগ, অর্থাৎ ক্রোধের বশে তোৎলার যেমন রাগ প্রকাশের ভাষা বাধা পায়, সেইরূপ। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে কিন্তু ভাষা বাধা পায় নাই, বরং ব্যঙ্গের খোঁচায় ভাষা তীক্ষ্ণতর হইয়াছে।

আর একটা তীব্র ব্যঙ্গের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করা যাইতেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনে সমাগত দ্রৌপদীকে সত্যভামা পঞ্চস্বামীর মনোরঞ্জনকারিণী বলিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন:

দেবী সত্যভামা তবে পাইযা অবকাশ।
দ্রৌপদীকে বোলে তবে কিছু পরিহাস॥
ষোড়শ সহস্র নারী আহ্মি একত্রিত।
এক কৃষ্ণে করিবারে না পারি তাপিত॥
তুহ্মি একাকিনী নারী বড়াহি চাতুরী।
পঞ্চজন নায়কের থাকা আশা পুরি॥
কেমত উপাএ জান ভাল তুহ্মি দেবি।
উদ্দেশে জে তোহ্মাক চরণ আহ্মি সেবি॥

এই রঙ্গকৌতুক কিন্তু মূল জৈমিনিতে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালায় পর্যবসিত হইয়াছে। সেখানে পরিহাসের ঝোঁকে সত্যভামা রুচিব সীমা লঙ্ঘন করিযা দ্রৌপদীকে বলিযাছিলেন, "তুমি কিরূপে পঞ্চপাণ্ডবকে বশে রাখিযাছ? আমরা একমাত্র পতিকেও বশ কবিতে পারিলাম না।...অয়ি বরাননে! বোধ হয় তুমি বাসুদেবকেও আপনার আযত্ত করিয়াছ। তুমি তাঁহার ভগিনী, কিন্তু

---

[৫৫] জৈমিনি ভারতেও এই রূপ তীক্ষ্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে; সেখানেও ভীম অনুরূপ কোপ-কটাক্ষে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, 'আপনি নিখিল ভুবন উদরে ধারণ করিয়া আমাকে স্থূলোদর বলিয়া নিন্দা করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। আমার রাক্ষসী ভার্য্যা সত্য বটে, কিন্তু আপনি গুণজ্ঞ হইয়াও রুক্মিণী দেবীকে কুরূপাবোধে কিরূপে ভল্লুক দুহিতা জাম্ববতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলেন।......আপনি স্ত্রীর নিমিত্ত সুরতরু পারিজাত উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার অপেক্ষা স্ত্রীজিত ও কামুক আর কে আছে? (চন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

কিরূপে তিনি তোমার হৃদয় গ্রহণ করিলেন, ক্ষণমাত্রও তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন না। তুমিও এই হরি বিনা ক্ষণমাত্র প্রাণধারণে সমর্থ হও না। তুমি সর্বদা অন্তঃপুরে রুদ্ধ ও নিত্য পঞ্চপাণ্ডবের সন্নিহিত আছ। তথাপি, কি উপায়ে গোবিন্দকে আয়ত্ত ও বশীভূত করিলে, বল। ঈদৃশ গর্হিতকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া এই সকল মহাজনের নিকট তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? অথবা আমাদিগকেও তোমার ভয় হয় না?"[৫৬] বলাই বাহুল্য শ্রীকরনন্দীর বর্ণিত সত্যভামার উক্তি নিছক রঙ্গপরিহাসের ব্যাপার, দ্রৌপদী-বাসুদেব সংক্রান্ত কোন অশোভন ইঙ্গিত নাই। কিন্তু মহামুনি জৈমিনির অশ্বমেধপর্বে সত্যভামার রঙ্গপরিহাস তীব্র, কটু ও অশুচি হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বাঙালী কবির রুচিজ্ঞানের মাত্রা প্রশংসনীয়।

জৈমিনি ভারতে ভীম ও কৃষ্ণের আহার ও রঙ্গরসের যে বর্ণনা আছে, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যে একপ্রকার দুর্লভ বলিলেই চলে। শ্রীকরনন্দী এই অংশটুকু অনুবাদ করিলে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কৌতুকরসের পরিচয় পাইতাম। যাহা হউক, কবি স্বল্প পরিসরের মধ্যে জৈমিনি ভারতের মূল ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বর্ণনা আলঙ্কারিক কবিত্বে খুব একটা সমৃদ্ধ না হইলেও স্বচ্ছন্দ প্রবাহের জন্য প্রশংসা দাবি করিতে পারে। কাশীরাম দাস পল্লবিত কবিত্ব প্রকাশ করিয়া মহাভারত কাব্যকে যেরূপ শিল্পরূপ দিয়াছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকরনন্দী—কাহারও রচনায় সেরূপ সৃষ্টিধর্মী পরিচয় পাওয়া যাইবে না, কিন্তু 'ভারত'-পথের তাঁহারা প্রথম পথিকৃৎ বলিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে শ্রদ্ধাসম্মান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

॥ ৪ ॥

সঞ্জয়-সমস্যা

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সঞ্জয়ের মহাভারতের কিছু কিছু পুঁথি এই যুগেও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমরা সঞ্জয়ে ভণিতাযুক্ত মহাভারতের কয়েক পর্ব দেখিয়াছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কয়েকখানি পুঁথিতে আবার সঞ্জয়দাস ভণিতা রহিয়াছে।[৫৭]

---

৫৬ চন্দ্রনাথ বসু অনূদিত জৈমিনি ভারত।

৫৭ পুঁথি সংখ্যা—৬১৪৯ (আদি-দ্রোণ), ৬১৫০ (বিরাট, ভীষ্ম), ৬১৫৪ (দ্রৌপদীর যুদ্ধ, সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার), ৬১৫৬ (মুষল পর্ব) এবং ৬১৫৭ (দানপর্ব)।

সঞ্জয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্র প্রচার করেন যে, কবীন্দ্র নহেন, সঞ্জয়ই মহাভারতের আদি অনুবাদক, "অনেক স্থলেই কবীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া চিত্রগুলি বিকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ('বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য')। অর্থাৎ দীনেশচন্দ্রের মতে সঞ্জয়ই সর্বাদৌ মহাভারতের অনুবাদ করেন, তৎপরে কবীন্দ্র সেই সঞ্জয়ের রচনাকেই আত্মসাৎ করিয়া ও রং ফলাইয়া পরাগলের সভায় খ্যাতি লাভ করেন। ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবীন্দ্রের মহাভারত রচিত হয়; তাহা হইলে সঞ্জয়ের মহাভারত নিশ্চয় তারও পূর্বে রচিত হইয়াছিল।/ দীনেশচন্দ্র শুধু সঞ্জয়ের মহাভারতই আবিষ্কার করেন নাই, কবির গোত্রকুলের খবরও বাহির করিযাছেন। তিনি সঞ্জয়ের একখানি পুঁথিতে কবির কুলপরিচায়ক এই পয়ারটি পাইযাছিলেন ঃ

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম ॥

বিক্রমপুরে নাকি ভরদ্বাজগোত্রীয বৈদ্যবংশ আছে। দীনেশচন্দ্র কল্পনার রং চড়াইয়া অনুমান করিযাছেন, "ইনি (সঞ্জয়) হযত সেই কুলই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এরূপ উক্তি কোথাও নাই" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)। তাঁহার এ সিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট যুক্তিসহ নহে, তাহার প্রমাণ— সঞ্জযের কোন কোন পুঁথিতে তাঁহাকে ব্রাহ্মণকুমার রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫৮] বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত সঞ্জয়ের এক পুঁথিতে এই দুই ছত্র পাইয়াছিলেন ঃ

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালি প্রকার ॥

সুতরাং সঞ্জয় বিজযপণ্ডিতের মতো লিপিকর সৃষ্ট কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন, এই নামে প্রকৃতই কোন কবি বর্তমান ছিলেন এরূপ বিশ্বাস করিবার পক্ষে অনুকূল যুক্তি আছে। দীনেশচন্দ্রও নাকি অক্রূরচন্দ্র সেনের নিকট সঞ্জয় মহাভারতের একটি দুর্লভদর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক দীনেশ-

---

৫৮ আর একখানি পুঁথিতে আছে—

ভরদ্বাজ উত্তমবংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারতকথা কহে কুতুহলে ॥

১৩২৫ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সুধীরকুমার সেনের প্রবন্ধ "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারতে" উল্লিখিত।

চন্দ্রের মতে অগ্রবর্তী সঞ্জয়ের বর্ণনাকে আত্মসাৎ করিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাই কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের রচনায় এত সাদৃশ্য দেখা যায়।

নগেন্দ্রনাথ বসু তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের পুঁথি সম্পাদনা কালে বিজয়পণ্ডিত ও সঞ্জয়ের রচনার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শুধু তাই নহে, তিনি দেখিয়াছিলেন যে, "সঞ্জয়ের ভারত পাঁচালী ও কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত এক ছাঁচে ঢালা।" আর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন, "সঞ্জয়ের শকুন্তলার উপাখ্যান, যযাতি চরিত, শান্তনুচরিত প্রভৃতি ভারতের প্রথমাংশ বাদ দিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের উৎপত্তি হইতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত সঞ্জয় যেরূপ ভাবে ও যেরূপ ভাষায় রচনা করিয়াছেন, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় বিজয়পণ্ডিতের রচনার মধ্যেও আমরা ঐরূপ ভাব ও ভাষার ঐক্য পদে পদে পাইয়াছি।......সুবিজ্ঞ সমালোচক উভয়েরই রচনা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই স্বীকার করিবেন, এক ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহাই নকল করিয়াছেন" (বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের ভূমিকা)। নগেন্দ্রনাথের মতে বিজয়পণ্ডিতই প্রাচীনতম অনুবাদক সঞ্জয় তাঁহাকেই নকল করিয়াছেন, কোথাও-বা কিছু কিছু নিজেও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মত দীনেশচন্দ্রের মতের বিপরীত। দীনেশচন্দ্রের মতে, সঞ্জয়ই প্রাচীনতর অনুবাদক, কবীন্দ্র তাহাকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কবীন্দ্রই (অথবা শ্রীকরনন্দী) আসল অনুবাদক, সঞ্জয়ের নামে কোন অনুবাদ-মহাভারত পাওয়া যায় নাই। পুঁথির লেখক, অভিসন্ধিপরায়ণ কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তিরা কবীন্দ্রের গ্রন্থকেই সঞ্জয়ের ভণিতায় চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ কবীন্দ্র ও সঞ্জয় মহাভারতের মধ্যে প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। বসন্তকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবীন্দ্র ও সঞ্জয় মহাভারতের পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত কবীন্দ্র ও সঞ্জয় মহাভারতের একই পর্বের পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছি যে, উভয়ের মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্য নাই। এখানে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের মহাভারত হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে:

কবীন্দ্রের মহাভারত—

কচ [ ] ধিয়া তবে বোলে দেবজানি।
পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি॥
কৈন্যার বচনে কচ চলিল ত্বরিতে।
পুষ্পবন মধ্যে দিয়া পুষ্প আনি দিতে॥
কচকে পাইয়া লাগ কাটিলেক বেটি।
প্রাণ নেইল তার অগ্নি দিয়া পুড়ি॥
খণ্ড খণ্ড করি মাংশ জল আনে রিতি।
শুক্ররে খোবাইল তার মদ্ধের সংহতি॥
বিকাল সময় হৈল কচ নাইল ঘরে।
কচ না দেখিয়া কৈন্যা ব্যাকুল সত্বরে॥
বাপের সাক্ষাৎ গিয়া কহে সুবদনি।
ঘবেত না আইল কচ কিহেতু না জানি॥

(ক. বি. পুঁ.—২১৪৮)

সঞ্জয় মহাভারত—

কচ সঙ্গে দিয়া বাক্য বোলে দেবজানি।
পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি॥
কন্যাব বচনে কচ চলিলা তোরিৎ।
পুষ্পবন মৈদ্ধে যাএ পুষ্পের নিচিত॥
সর্তরে আসিয়া দৈত্য মারিলেক বেড়ি।
প্রাণ লইয়া তারে অগ্নি দিযা পুরি॥
খণ্ড খণ্ড করি মাংস যেন য়াছে নিত্য।
যুক্রের খাবাইল নিয়া মৈদ্যের সহিত॥
বিকাল সময় হৈল কচ না বাইল।
কচ না আইল কন্যা ব্যাকল হৈল॥
বাপের ঠাইতে বোলে কন্যা যুবধনি।
ঘরেত না আইল কচ কি দৈব না জানি[৫৯]॥

(ক. বি পুঁ.—৬১৪৯)

[৫৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতেও এইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়:

কবীন্দ্র— কালি তোর দ্বারেতে আসিব একরথ।
অতি বিল্যোক্ষন রথ না ভুবনেত॥

এইভাবে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের মহাভারত তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে এইরূপ অসংখ্য সাদৃশ্য দেখা যাইবে। কবীন্দ্রের সন তারিখ ও অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত করা গিয়াছে! অতএব সঞ্জয় নামক কোন কবি বর্তমান ছিলেন না, কবীন্দ্রের মহাভারতই অল্পস্বল্প পরিবর্তন সহ সঞ্জয় নামে চলিয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। সঞ্জয়ের ভণিতা বিচার করিয়াও বসন্তকুমার দেখাইয়াছেন, যেন কবি সঞ্জয় পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। যথা—

(১) সঞ্জয় গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয়।
(২) সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।
(৩) ঘোটক ধ্বজের ভেদ দ্রোণ পর্বএ।
সঞ্জয় কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥
(৪) ব্যাসের চরিত্র এহি দ্রোণপর্ব কথা।
পাঁচালি সঞ্জএ কহে সঞ্জএর কথা॥
(৫) সঞ্জয়ের কথা শুনি।
সঞ্জয় রচিল পুথি॥
(৬) ভারত মাণিক্যনিধি আছিল অপার।
সঞ্জএ বেকত কৈল সরস পয়ার॥

এই সমস্ত ভণিতা দৃষ্টে মনে হয়, পুঁথির সঞ্জয় হেঁয়ালির ছলে পৌরাণিক মহাভারতকথক সঞ্জয়ের দোহাই দিয়াছেন। এই সঞ্জয় প্রকৃত কোন কবির নাম' অথবা কোন গায়ক বা লিপিকার কবীন্দ্রের মহাভারতের সামান্য রদবদল করিয়া সঞ্জয় নামের আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। বসন্তকুমার এ বিষয়ে ঠিকই বলিয়াছেন যে, কোন গায়ক বা সঙ্কলক কবীন্দ্রের রচনায় পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়া দিয়া এই গ্রন্থের উপাদেয়তা ও উৎকর্ষবৃদ্ধির চেষ্টায় দ্ব্যর্থবোধক 'সঞ্জয়' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি যদি যথার্থই ভরদ্বাজ গোত্রে উৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমার হইতেন, তাহা হইলে সে কথা পরিষ্কার করিয়া ভণিতার নানা স্থানে উল্লেখ করিতেন। এই জন্য বসন্তকুমার

সেই রথ আরোহণ না করিবা তাত।
আপনা কুসল জদি চাহ নরনাথ॥ (ঢা. বি. পুঁ—২০২৪)

সঞ্জয়— কালি তোমার দ্বারেতে আসিব এক রথ॥
ভুবন বিজই রথ দেখিতে মহন্ত্য॥
কদাচিত্য আরোহণ না করিয় তাথ।
আপন কুসল যদি চাহ নরনাথ॥ (ঢা. বি. পুঁ—১৫৫০)

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "আমিও পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়ী মহাভারত ও বিজয়পণ্ডিতের নামে মুদ্রিত মহাভারত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এত মিল দেখিয়াছি যে, এই তিনটি গ্রন্থকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না।······সঞ্জয় মহাভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রন্থ।"[৬০] আমরাও বসন্তবাবুর সঙ্গে স্বর মিলাইয়া এইভাবে বলিতে পারিতাম যে, পুঁথির সঞ্জয় পৌরাণিক সঞ্জয়ের ভৌতিক সংস্করণ, কোন প্রকৃত কবি নহেন। কোন লিপিকার বা গায়ক-কথক কবীন্দ্রের উপর কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়া কবীন্দ্রের ভণিতার স্থলে কাল্পনিক সঞ্জয়ের ভণিতা, অথবা নিজেদের নামটি (সঞ্জয় তাঁহাদের নাম হইতে পারে) চালাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্জয়-সমস্যা এত সহজে সমাধান হইবার নহে, তাহার কারণ এবিষয়ে আরও কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দিযাছে। নিম্নে সেই সংশয়গুলি উত্থাপিত হইতেছে :—

১। সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের রচনার মধ্যে প্রায় হুবহু সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু আবার অনেক স্থলে দুইজনের রচনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও আছে। মনে হয়, সঞ্জয়ের মহাভারত যেন কবীন্দ্রেরই বর্ধিত সংস্করণ। এ বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিযাছেন, "যদিও সঞ্জযভারতের সহিত পরাগলী ভারতেব ভাব ও ভাষার অশ্চর্যরূপ সৌসাদৃশ্য দেখা যায, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও আছে। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটিতেও অমিলেব কথা ইতিপূর্বেই উদাহৃত হইয়াছে।[৬১] ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্বের সমস্তটাই সঞ্জযভারতে পৃথক। পরাগলী ও ছুটিখানী অশ্বমেধ পর্ব সঞ্জয়ভারতে সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে।···মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জযভারতে কিছু বেশী কথা আছে।[৬২] ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়।" (সা-প-প, ১৩৩৪)

২। সঞ্জয়ের অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় দুর্লভ নহে। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' (১) একখানি মহাভারতের ভণিতা হইতে সঞ্জয় নামেব কিনারা হইতে পারে। এই মহাভারতে নানা

[৬০] সা-প-প, ১৩৩৪

[৬১] এ বিষয়ে ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

[৬২] কিন্তু সুধীরকুমার সেন (সা-প-প, ১৩৩৫) সঞ্জয়ের একখানি পুঁথির সঙ্গে কবীন্দ্রের মহাভারতের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কবীন্দ্রের পর্বগুলি সঞ্জয় হইতে পৃথক। সুতরাং তাঁহার মতে কবীন্দ্রই সঞ্জয়ের নকল করিয়াছিলেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের অনুসরণ করেন নাই।

কবির ভণিতা আছে, তন্মধ্যে সঞ্জয়ের ভণিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই ভণিতায় দেখা যাইতেছে যে, হরিনারায়ণ নামা কোন কবি সঞ্জয় নাম গ্রহণ করিয়া মহাভারত অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকটি ভণিতা উল্লিখিত হইতেছে :

(ক) হরিনারায়ণদেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী ॥
ব্যাসদেব হোতে মহাভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালি পয়ার ॥

(খ) শ্লোক ভাঙ্গিয়া পোথা করিয়া পদের গাথা
ত্রিভুবনে করিতে উপাএ।
দীনহীন মূঢ়মতি হরিনারায়ণ গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ ॥

(গ) রচনা বিশেষতঃ নানা রসময়ে।
হরিনারায়ণদেব বাখানে সঞ্জএ ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে, হরিনারায়ণ সঞ্জয়ের নাম গ্রহণ করিয়া ভারত পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। হয়তো ইনিই বিজয়পাণ্ডব মহাভারতের একটা বিস্তারিত আকার দিয়াছিলেন, কবীন্দ্রের রচনায় অনেক নূতন পংক্তি সংযোজিত করিয়াছিলেন। 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' নামক একটি সম্পূর্ণ নূতন পালা সঞ্জয় ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ইঁহার কবিব্যক্তিত্ব এককথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না।[৬৩] সুতরাং আপাতত সঞ্জয় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, এই নামে কোন কবি, পাঁচালীকার বা লিপিকার বর্তমান ছিলেন। তবে তিনি নিজে যে কবীন্দ্রের রচনার উপর অল্পবিস্তর রং ফলাইয়া তথাকথিত সঞ্জয় মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছেন এমন কথা কোথাও বলেন নাই। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিান হয় তো ইচ্ছা করিয়াই কবীন্দ্রের নাম চাপিয়া গিয়া মহাভারতীয় সঞ্জয়ের আড়ালে আধুনিক সঞ্জয়কে লুকাইতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ সঞ্জয় ভণিতায় যে মহাভারতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে পুরাপুরি কবীন্দ্রের ধনে পোদ্দারি, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আবার এ কথাও মানিতে হইবে যে, তিনি কবীন্দ্রের রচনাকে কোন কোন স্থলে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, দু একটি নূতন পালাও

৬৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১৫৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য। পরে এই পুঁথি হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। পুঁথির আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

যোগ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ হউন,[৬৪] বৈদ্য হউন,[৬৫] অথবা অব্রাহ্মণ হউন,[৬৬] তাঁহার পরিচয় অস্পষ্ট, ভণিতাতে পৌরাণিক ও লৌকিক দুই সঞ্জয়ের সংমিশ্রণের ফলে কে নকল কে আসল, তাহাও নির্ধারণ করা দুরূহ। তাঁহাকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না, অথবা দীনেশচন্দ্রের মতো এই কবিকে বাংলা মহাভারতের আদি অনুবাদক বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না।[৬৭] মোট কথা সঞ্জয়ের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, উভয় দিকেই যুক্তি আছে। তবে সমস্ত উপাদান বিচার করিয়া মনে হয় যে, কবীন্দ্রেব পরে সঞ্জয় নামীয় (ইহা ছদ্মনাম হইতে পারে, আসল নাম হয় তো হরিনারায়ণ) কোন কবি বা লিপিকার বা পাঁচালীগায়ক কবীন্দ্রের রচনাকে নিজের বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া এবং কোন কোন অংশকে একটু-আধটু বর্ধিত করিয়া সাজাই-গুছাইয়া একখানি নূতন মহাভারতেব অনুবাদের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সঞ্জযের অস্তিত্ব এরূপ সূক্ষ্ম সূত্রে লম্বিত থাকিলে তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করাও নিবর্থক হইয়া পড়ে।

তবে সঞ্জয়েব কোন কোন পুঁথিতে দুই একটি নূতন রচনা পাওয়া যায। তিনি যেমন কবীন্দ্রের রচনা পুবাপুরি গ্রহণ কবিয়া তাহাতে কিছু কিছু স্বকৃত পংক্তি জুড়িযা দিয়াছিলেন তেমনি দুই একটি পালা নূতন করিয়া লিখিযাছিলেন, এরূপ অনুমান কবিবাব পক্ষে কারণ আছে। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, সঞ্জয়ভণিতার দ্রোণপর্বেব পুঁথিতে 'দ্রৌপদীব যুদ্ধ' শীর্ষক একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায সঞ্জয বচিত 'দ্রৌপদী যুদ্ধ' নামক একখানি স্বতন্ত্র পুঁথি আছে (পুঁ. সং—৬১৫৪)।* তাহাতে মূল মহাভারত বহির্ভূত দ্রৌপদীর যুদ্ধ বিষযক উপকাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হইযাছে। এ কাহিনীটি অন্যকোন বাংলা মহাভারতেও পাওযা যায নাই। দ্রোণপর্বে আছে যে, সপ্তরথী

৬৪ সা. প. প. ১৩৩৫, সুধীর কুমার সেনের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬৫ দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

৬৬ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম সংস্করণ) ১ম খণ্ড

৬৭ এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 'যিনিই হউন, একজন সংগ্রহকার যে জোড়াতাড়া দিয়া 'সঞ্জয় মহাভারত' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। এবং সংগ্রহকার যে পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকর্তব্য।'' তাঁহার মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত।

* আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয়ের মহাভারতের (দ্রৌপদীর যুদ্ধ) পুঁথি

পরিবেষ্টিতাবস্থায় বীরকিশোর অভিমন্যু নিহত হইয়াছিল। সঞ্জয় ইহার পর প্রতিবিধিৎসার জন্য দ্রৌপদী ও অন্যান্য মাতৃকাকে যুদ্ধক্ষেত্র অবতীর্ণ করাইয়াছেন। দ্রৌপদী, রেবতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সুভদ্রাদি পাণ্ডবপক্ষীয় অন্তঃপুরিকাগণ অভিমন্যু হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সদলবলে রণবেশে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন—

রথ আন রণে জাই পরিলেক ডাক।
সারথী সকলে রথ জোগাএ লাখে লাখ॥
জার জার নিজ রথে সকলে উঠিল।
চারি সেনাপতি রণে বিচারিআ দিল॥
সত্তভামা বিচারিল বাহিনী সকল।
তবে রণে চলি গেল সৈন্য মোহাবল॥
সত্যভামা জাম্ববতি যুভদ্রা রেবতি।
সৈন্য অধিপতি সেই চারি সেনাপতি॥
সেনাপতি হইলেক দ্রৌপদনন্দিনি।
সর্ব্বসৈন্যে অধিকার হৈল রুকমিনি॥[৬৮]

দ্রৌপদী সেনাপতি এবং রুক্মিণী সেনাধ্যক্ষ হইয়া সত্যভামাদিসহ যুদ্ধে চলিলেন। দারুণ যুদ্ধে দ্রোণ পর্যন্ত দ্রৌপদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত, বিপর্যস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ঃ

দ্রৌপদী কাটিল বাণ দেখিল ব্রাহ্মণে।
দ্রৌপদী উপরে বাণ হানিলা তখনে॥
সেই বাণ দ্রৌপদীএ কাটিল সমস্ত।
দেখি দ্রোণ সেনাপতি হইলেক ত্রস্ত।
... ...
বাণ কাটিআ বাণ দ্রোণভিতে গেল।
মোহ হৈআ দ্রোণ বিরের প্রাণ রক্ষা হৈল॥

যুদ্ধে দুর্যোধনের অবস্থাও সঙিন হইয়া দাঁড়াইল ঃ

আগু হৈআ দুয্যোধন রাখিতে নারিল।
দ্রৌপদী দেখিআ তারে হাসিতে লাগিল॥

৬৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১২৪ সংখ্যক পুঁথি হইতে এইটি এবং পরবর্তী উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হইয়াছে।

সংখধ্বনি করিতে লাগিল নারিগণ।
দ্রৌপদী আদি নারিগণ হৈল একস্থান ॥
সকলে বাহিআ সংখ কৈল ঘোরতর।
বরিসা সময়ে জেন গর্জ্জে জলধর ॥
জয় বাদ্য বাজাইতে লাগে অন্যে অন্যে।
রথের উপরে উঠি নাচে নারিগণে ॥

দ্রৌপদী যুদ্ধে জয়ী হইলে সকলে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ঃ

দ্রৌপদীরে কোলে করি রহিল রুকমিনি।
যুদ্ধান্ত হৈল সব যুগ মোহামানি ॥
একে একে কোলাহল করিল রমণি।
দ্রৌপদীর প্রসংসা করিল পুনি পুনি ॥
পরম হরিসে তান জিনিআ সমর।
সঞ্জএ বোলেন রাজা যুণ তারপর ॥
দ্রৌপদীর জঅ অন্ত কুরুগণ পরাজএ।
পদবন্ধ রচি রামকৃষ্ণ দাস কএ ॥

বর্ণনায় কিছু অভিনবত্ব আছে বটে, কিন্তু কোনরূপ রচনাকৌশল নাই

এই অংশের সর্বশেষ পংক্তিটির ("পদবন্ধ রচি রামকৃষ্ণ দাস কএ") প্রতি কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। এই রামকৃষ্ণ দাস আবার কে? সঞ্জয়মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত যে রচনাটিকে (দ্রৌপদীর যুদ্ধ) আমরা সঞ্জয়ের প্রকৃত রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহাতে রামকৃষ্ণদাসের ভণিতা রহিয়াছে কেন, তাহা এক সমস্যার বিষয়। এই রামকৃষ্ণ দাস কি কোন লিপিকার বা পাঁচালীগায়ক? তাহা হইলে এই 'দ্রৌপদীর যুদ্ধ' পালাটি সঞ্জয়মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সঞ্জয়ের রচনা নহে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। রামকৃষ্ণ দাস নামীয় অন্যকেহ যদি এই পালার রচনাকার হন, তবে তিনি পুরাণাদিতে নিতান্ত অনভিজ্ঞ অর্বাচীন ছিলেন, কারণ এই বর্ণনার একস্থলে সুভদ্রা দুর্যোধনের দূতকে বলিতেছেন যে, যেহেতু দুর্যোধন গদাঘাতে তাঁহার স্বামীকে মারিয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্য তিনিও দুর্যোধনকে বিনাশ করিবেন—

সুভদ্রাএ কহে দুত আপনে কহিবা।
সমরে আসিলে জেন বিমুখ না হৈবা ॥
দুর্জ্জধন প্রতিজ্ঞা যে পালিতে কারণ।
আমি আছি তান সঙ্গে করিবারে রণ ॥

সামিরে মারিলে মোর জেন গদাঘাতে।
আমিঅ বধিব তাক কহিলুম তোমাতে ॥

এখানে সুভদ্রার উক্তিটি নিশ্চয় উত্তরার উক্তি হইবে। যাহা হউক, সঞ্জয় মহাভারতে কবীন্দ্রের রচনা ব্যতীত যেটুকু মৌলিক অংশ আছে, তাহার মৌলিকতা যেমন সংশয়াতীত নহে, তেমনি রচনাচাতুর্যেও তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। সঞ্জয় প্রসঙ্গের উপসংহারে কিছু সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া এই মাত্র বলা যায় যে, কবীন্দ্রের রচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন অল্পমেধাবী লেখক, লিপিকার বা পাঁচালীগায়ক পৌরাণিক সঞ্জয়ের নামের অন্তরালে বসিয়া কবীন্দ্রের যশে ভাগ বসাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত রামচন্দ্র খান (অশ্বমেধপর্ব) ও দ্বিজরঘুনাথের (অশ্বমেধপর্ব) কয়েকখানি পুঁথি মিলিতেছে। ইঁহারা প্রায় সকলেই জৈমিনি-ভারতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত অশ্বমেধপর্বের অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের রচনা অপরিসর, কাব্যগুণ বর্জিত ও প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল না।

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি চৈতন্য প্রভাব পরিপক্বতা লাভ করিলে পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদির প্রতি বাঙালী কবির বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সূচনা হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে। রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদের মধ্য দিয়া বাঙালী যে অতিক্রান্ত মঙ্গলকাব্যের সংস্কারের স্থলে পুরাণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মহাভারতের অনুবাদ-গুলির স্বল্প পরিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। আর একটা কথা—পাঠান নৃপতি, শাসক ও অভিজাত সমাজে যে বাঙালী হিন্দুর সম্মান ছিল, মুসলমান সমাজও হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত অনুবাদ প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে। দুঃখের বিষয় সর্বগ্রাসী মুঘল আমলে এই যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

ষোড়শ অধ্যায়

মালাধর বসুর (গুণরাজ খান) শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গুণরাজ খান-উপাধিক মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় পূর্ব-চৈতন্য যুগে একশ্রেণীর পাঠক ও ভক্তের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে রচিত গ্রন্থের মধ্যে ইহার যে একটা উল্লেখযোগ্য মহিমা আছে, তাহা মধ্যযুগের বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহা ভক্তিরসার্দ্র ধর্মগ্রন্থরূপে কদাচ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই; এই সময়ে বাঙলা দেশে কৃষ্ণতত্ত্বকেন্দ্রিক কোন বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ঈষৎ পরে রচিত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অন্তরালে শুধু কাব্য-রসধারা প্রবাহিত হয় নাই, একটা অস্পষ্ট ধর্মীয় দল বা সম্প্রদায়ের আভাস পাওয়া যাইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে নামাশ্রয়ী ভক্তির প্রাধান্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। চৈতন্যাবিভাবের পূর্ব হইতে নামবাদ ও ভক্তিরস সকলের অলক্ষ্যে বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এই ভক্তিবাদের প্রথম সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দে। সেই কৃষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিকথা ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে বাঙালীর চিত্তে নূতন ধর্মপিপাসা জাগাইয়া তুলিল; মহাপ্রভুর আবির্ভাবের জন্য পথ খনিত হইল। বৈষ্ণবভক্তির স্পষ্ট সূচনা মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বাঙলা দেশে দ্বাদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে বাঙালীর অন্তরে যে ভাগবতের অনুরূপ একপ্রকার কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ববাদ ও রসানুভূতি জাগিয়াছিল, পূর্বভারতে মাধবেন্দ্রপুরী কর্তৃক ভাগবতকথা-প্রচারের দ্বারা তাহা দৃঢ়মূল হয়। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর দিকে মাধবেন্দ্রপুরী বাঙলা দেশে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিত ভাগবত প্রচার করেন। তাঁহার পূর্বে বাঙলা দেশে ভাগবতের বিশেষ প্রভাব ছিল কি-না জানা যায় না। যাহা হউক, আমরা ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে পারি যে, বাঙলা দেশে ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে ভাগবতের বিশেষ প্রভাব ছিল না। অবশ্য লোকজীবনে কৃষ্ণলীলাকথার যে

প্রচার ছিল না, তাহা নহে। শিল্পকলাতেও কৃষ্ণলীলার প্রভাব পড়িয়াছিল। পাহাড়পুর খননকার্যের ফলে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুরূপ অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেনযুগ হইতেই বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপ্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণলীলাবহুল ভাগবত যে বাঙলা দেশে ১৪শ শতাব্দী হইতেই লোকচিত্তে স্থান পাইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পূর্ব হইতেও এই প্রভাব লোকজীবনে সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে। মাধবেন্দ্রপুরী বাঙলা দেশে প্রথম ভাগবত প্রচার করেন। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, প্রায় এই সময় হইতে বাঙলা দেশে ভাগবত পুরাণ, বিশেষতঃ ইহার দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা লাভ করিযাছিল।

॥ ১ ॥

ভাগবত-পরিচয়

অনুমান খ্রীঃ পূব ৪র্থ শতক হইতে সংস্কৃত ভাষায় একপ্রকার কাহিনী-কেন্দ্রিক ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়, যাহা সাধারণতঃ পুরাণ নামে অভিহিত। পুরাণ একাধারে ইতিহাস, কাহিনী, দর্শন ও কাব্য। সংজ্ঞা অনুসারে ইহা পঞ্চ-বিভাগাত্মক—যে গ্রন্থে সর্গ (সৃষ্টিতত্ত্ব), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টি), বংশ (দেবতাদের উৎপত্তিবিষয়ক কাহিনী), মন্বন্তর (মনুর অধিকৃত যুগবিভাগ) এবং বংশানুচরিত (পৌরাণিক রাজাদের আখ্যায়িকা) বর্ণিত হয় তাহা পুরাণ নামে অভিহিত।* পুরাণগুলিকে ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার বলিলেই চলে। এই পুরাণসাহিত্য সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম ও সংস্কার বিচূর্ণ হইয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধিও বজায় রহিল না, ভগবান তথাগতের ধর্ম অতিক্রুত অবনতির পিচ্ছিল পথ বাহিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে নির্জিত হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবার চেষ্টা করে। প্রধানতঃ হিন্দুর চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম-সংস্কারকে পূর্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ধর্ম, নীতি ও ইতিহাসের সহিত কিংবদন্তীর খাদ মিশাইয়া একপ্রকার

* সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

সাহিত্যসৃষ্টি হয়, যাহা প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্গঠনেই নিয়োজিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের দিনেও উপক্রুত ও পরাভূত হিন্দুসমাজ এই পুরাণগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল; মুসলমানপ্রভাবের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এই পুরাণগ্রন্থের রচনা ও অনুশীলন চলিয়াছিল। ইহাতে অনেক অলৌকিক, অসম্ভব, অবাস্তব, অনৈতিহাসিক কথা থাকিলেও তদানীন্তন সমাজজীবনের অনেক ঐতিহাসিক উপাদানও ইহার মধ্যে নিহিত আছে। পুরাণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—বৈদিক সংস্কৃতির অবসানের পর বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইল, এই পুরাণগুলি সেই শূন্যতাকে অনেকাংশে পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সমগ্র ভারতজীবনে প্রধানতঃ পৌরাণিক সংস্কারই জয়ী হইয়াছে। কালক্রমে বৈদিক পূষণ্, নাসত্য, ঊষা, মরুৎ, পর্জন্য, অগ্নি, রুদ্র প্রভৃতি দেব-দেবীরা অন্তরালে চলিয়া গেলেন, কেহ-বা নামরূপ পাল্টাইয়া পৌরাণিক দেব-মণ্ডলে স্থান লাভ কবিলেন, ক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণ ভারতীয় ধর্মমহামণ্ডল অধিকার করিলেন। যদিও কোন কোন যুগে পৌরাণিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে ধর্মগুরু বা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিলেন, তথাপি পৌবাণিক প্রভাব ভারতীয় মানস হইতে কখনই অপসৃত হয় নাই; বরং বিভিন্ন সংস্কৃতিব সংঘাত সত্ত্বেও এই পুরাণাশ্রয়ী আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস ও জীবনচেতনা ক্রমেই ভারতীয় মনে দৃঢ়মূল হইয়াছে। ইদানীং রামমোহন ও দযানন্দ স্বামী পৌরাণিক সংস্কৃতিকে বৈদিক ও ঔপনিষদিক সংস্কৃতির দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে, কোথাও-বা অবলুপ্ত করিতে চাহিলেও পৌবাণিক ভাবাদর্শকে বিশেষ ক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এখনও পর্যন্ত সাধারণ ভারতবাসী অনেকাংশে পৌরাণিক আদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারত-সংস্কৃতির গত দেড়-হাজার বৎসরের ইতিহাস মূলতঃ পৌরাণিক সংস্কৃতিরই ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ভারতজীবনে কিরূপ প্রগাঢ় প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারখানি মহাপুরাণ এবং আঠারখানি উপপুরাণ অর্থাৎ অর্বাচীন পুরাণ প্রচারিত আছে।

মহাপুরাণ ॥ ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, নারদীয়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

উপপুরাণ ॥ আদিপুরাণ, নারসিংহপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ, ধর্ম-পুরাণ, দুর্বাসাপুরাণ, নারদপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, উশনঃপুরাণ, কপিলপুরাণ, বরুণপুরাণ, শাম্বপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মহেশ্বরপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবপুরাণ, পরাশরপুরাণ, মরীচিপুরাণ, ভাস্করপুরাণ।

৺এই ছত্রিশখানি পুরাণের মধ্যে ভাগবতপুরাণের প্রভাব ভারতবর্ষে যে সর্বাধিক অনুভূত হইযাছে তাহা পুরাণজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ তদানীন্তন ও আধুনিক কালের বৈষ্ণব ভাগবতসম্প্রদায় ঐ পুরাণকে প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন; তাই দীর্ঘ সহস্র বৎসব ধরিযা এই পুরাণের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণেব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে কি-না তাহা লইয়া নানা মতভেদ ও সংশয় সৃষ্টি হইযাছে। এই সংশয়ের কারণ—বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মতবিরোধ। শাক্তগণ দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহেন; তাঁহাদের মতে বৈষ্ণব ভাগবত পুরাণ প্রামাণিক মহাপুরাণ নহে—অর্বাচীন। কিন্তু ভাগবতকে অর্বাচীন বলিয়া তুচ্ছ করিবার কারণ নাই। পরবর্তী কালের 'নিবন্ধে' ভাগবত বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, তাহা এই শ্রীমদ্ভাগবতকেই নির্দেশ করিতেছে। বল্লালসেন, মাধব আচার্য, হেমাদ্রি, রঘুনন্দন, গোপালভট্ট এই বৈষ্ণব ভাগবত হইতেই শ্লোক উদ্ধার করিযাছেন, ইহার বহু প্রসঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন। উপরন্তু ভাগবতে দেবীভাগবতের উল্লেখ নাই, অপরদিকে দেবী-ভাগবতে ভাগবতকে উপপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দেবীভাগবতকার যেন ঈষৎ বলের দ্বারা আপনার প্রাধান্য ও মহিমাপ্রচারে বদ্ধপরিকর। ইহাতে অনুমিত হইতেছে যে, ভাগবতই প্রামাণিক মহাপুরাণের অন্তর্গত। দেবীভাগবত ভাগবতের মত প্রাচীন নহে, অথবা মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভাগবত বা দেবীভাগবত—কোন্‌খানি মহাপুরাণ, তাহা লইয়া প্রাচীনকালেও মতভেদ দেখা দিয়াছিল। শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন, 'ভাগবতং নামান্যদিত্যাপি নাশঙ্কনীয়ম্" অর্থাৎ ভাগবত নামে অন্য পুস্তক আছে, এরূপ শঙ্কা

করা কর্তব্য নহে। শ্রীধরস্বামীর সময়েও (১৪শ শতাব্দী) ভাগবতের প্রামাণিকতা বা মহাপুরাণের অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছিল। হোরেস হেমান উইলসন্ সাহেব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগাবে কয়েকখানি সংস্কৃত পুঁথি দেখিয়াছিলেন যাহাতে এই মতকলহের কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত আছে। এক লেখক 'ত্বজন মুখচপেটিকা' (অর্থাৎ দুর্জনের মুখে চড) নামক পুঁথিতে ভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিযা গ্রহণ কবিযাছেন, দেবী ভাগবতকে নহে। ইহাব উত্তব দেন কাশীনাথ ভট্ট নামক আর এক শাক্ত লেখক 'দুর্জন মুখ-মহাচপেটিকা' লিখিয়া। তিনি এই গ্রন্থে দেবীভাগবতকেই মহাপুবাণরূপে প্রতিষ্ঠিত কবিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম নামক আব একজন বৈষ্ণবলেখক 'ভাগবত-স্বরূপবিষযশঙ্কা-নিবস(ন)-ত্রযোদশ' নামক পুঁথিতে তেবটি যুক্তিব সাহায্যে ভাগবতেব প্রামাণিকতা ঘোষণা কবেন। স্বয়ং উইলসন সাহেব দেবীভাগবতের অধিকতব পক্ষপাতী ছিলেন। ভিনতাবনিৎজও অনুরূপ মতাবলম্বী।

ভাগবতেব রচনাকাল লইয়াও প্রচুব গবেষণা হইযাছে, যদিও এ সম্বন্ধে কোন স্থিব সিদ্ধান্ত এখনও স্বীকৃত হয নাই। একদল গবেষক ভাগবতেব প্রাচীনত্বে বিশেষ সন্দিহান। যাঁহাবা ইহাকে মহাপুবাণেব স্বীকৃতি দিতে অসম্মত, তাঁহাবা ইহাকে যে কিছু অবাচীন বলিবেন, তাহাতে আব বিস্ময়েব কি আছে? বুর্ণফ, কোলব্রুক ও উইলসন অনুমান কবিযাছিলেন, 'মুক্তাফল' ও 'হবিলীলা'ব (ভাগবতেব 'অনুক্রমণী' বা Index) বচনাকাব বোপদেবই এই পুবাণেব বচনাকাব। 'মুক্তাফল' ভাগবতেব উপবেই বচিত 'হরিলীলা'ও ভাগবতেব সূচীমাত্র। কাজেই ভাগবতেব গ্রন্থকর্তৃত্ব, কাহাবও কাহাবও মতে, বোপদেবেব উপব বর্তাইযাছে। বোপদেব হেমাদ্রিব (১২৬০-১৩০৯ খ্রীঃ অঃ) সমসাময়িক। সুতবাং বোপদেব যদি ভাগবতেব বচনাকার হন, তাহা হইলে এই ভাগবত ১৩শ বা ১৪শ শতাব্দীতে বচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভাগবতকে এতটা অর্বাচীন যুগে কিছুতেই স্থাপন করা যায় না। কাবণ ১৩শ শতকেই ভাগবত ভক্তিগ্রন্থরূপে প্রায সর্বত্র প্রচারিত হইযাছিল। আনন্দতীর্থ মাধব (১১৯৯-১২৭৮ খ্রীঃ অঃ) ভাগবতের টীকা রচনা করিতে গিয়া ইহাকে মহাভাবতের সমতুল্য মনে করিয়াছিলেন। রামানুজ (১২শ শতাব্দী) প্রধানতঃ বিষ্ণুপুবাণের উপর নির্ভর করিলেও ভাগবতের নাম উল্লেখ করিতে

ভুলেন নাই।[১] ভারতপর্যটক আলবেরুনি ১১শ শতকের গোড়ার দিকে আরবী ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাসুদেবের লীলাসংক্রান্ত ভাগবত পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালসেন 'অদ্ভুতসাগরে' ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং 'দানসাগরে' ভাগবতপ্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নহে। সি. ভি. বৈদ্য মনে করেন[২], ভাগবত শঙ্করাচার্যের পরবর্তী এবং জয়দেবের পূর্ববর্তী। ভাণ্ডারকরের মতে ভাগবত আনন্দতীর্থের (৯ম শতাব্দী) দুই শত বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ ৭ম শতাব্দীতে) রচিত হয়। পার্জিটার ও ফার্কুহারের মতে ইহার রচনাকাল ৯ম শতাব্দীর পরে যাইতে পারে না। সি. এলিয়ট মনে করেন যে, যেহেতু ইহাতে স্মৃতির আচার-আচরণের উল্লেখ আছে, এবং মন্দিরে গিয়া দেবোপাসনার উল্লেখ নাই, সেই হেতু ইহা অর্বাচীন-কালের রচনা নহে। ভিন্‌তারনিৎজ্‌-এর মতে ইহা ১০ম শতাব্দীর রচনা। অবশ্য ইহার বিষয়বস্তু ও মালমশলা আরও পূর্ববর্তী কালের। আধুনিক গবেষকগণ সমস্ত উপাদান বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভাগবত পুরাণ ৮ম শতাব্দীর পরবর্তী নহে।[৩]

পুরাণসমূহের মধ্যে এই ভাগবতই সর্বপ্রথম য়ুরোপে অনুবাদের আকারে পৌঁছাইয়াছিল। ১৮৪০-৪৭ খ্রীঃ অব্দে এম. ইউজেন বুর্নফ্‌ সাহেব (M. Eugene Burnouf) মূল সংস্কৃত হইতে *Le Bhaguvata Purana ou histoire poetique de Krichna* নামক ভাগবতের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা প্রকাশের ফলে য়ুরোপ সর্বপ্রথম মূল সংস্কৃত হইতে অনূদিত ভারতীয় পুরাণের আস্বাদ লাভ করিতে পারিল। কিন্তু বুর্নফ্‌ সাহেবেরও পূর্বে য়ুরোপে ভাগবত পৌঁছাইয়াছিল—অবশ্য মূল সংস্কৃতের অনুবাদ নহে। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে ভাগবতের তামিল অনুবাদ ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে জুরিখ হইতে এই ফরাসী অনুবাদটি আবার জার্মান ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১ *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, XIV, 1932-33, pp. 188 ff.

২ *J. B. R. A. S.* 1925, I.

৩ *Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs*—Dr. Rajendrachandra Hazra, M. A. Ph. D.

ব্যাসদেবের নামেই ভাগবত পুরাণ চলিয়া আসিতেছে। শুকদেব তাঁহার জনক ব্যাসের নিকট ভাগবতকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন; রাজা পরীক্ষিত ঋষিশাপে অভিশপ্ত হইলে শুকদেব তাঁহাকে ভাগবতকথা শুনাইয়াছিলেন। কাজেই পৌরাণিক মতে ব্যাসদেবই ভাগবতরচয়িতা। পদ্মপুরাণে আছে যে, বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ প্রণয়ন করিলেন, তৎপরে আরও ষোলখানি পুরাণ রচনার পর ঐ সতেরখানি পুরাণের সার আকর্ষণ করিয়া—

অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্বতঃ।
কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতম্॥

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভাগবত রচনা করিয়া পুত্র শুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত পৌরাণিক কথা ছাড়িয়া দিলে ভাগবতের রচনাকার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না—কোন পুরাণ সম্বন্ধেই তাহা বলা যায় না। পুরাণগুলি এক ব্যক্তির রচনা নহে, বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে ইহাদের উৎপত্তি। সুতরাং ইহার রচনাকার যেমন কোন-একজন ব্যক্তি নহেন, তেমনি ইহা শুধু সাহিত্যপাঠের তৃষ্ণা মিটাইবার জন্যও রচিত হয় নাই। পুরাণসাহিত্য প্রধানতঃ গোষ্ঠীজীবী ও সমষ্টিকেন্দ্রিক, সুতরাং কোন-একজন মুনিঋষিকে ইহার রচনাকার হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। মহাভাবতস্রষ্টা গীতাসঙ্কলক ব্যাসদেবের নামেই পুরাণগুলি চলিতেছে বটে, কিন্তু ইতিহাসবিচাবে ইহাদের অনেকগুলিই যে ব্যাসদেবের রচনা হইতে পারে না, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভাগবত সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। অনুমান ভক্তিধর্মের প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণভারতে ভাগবত জন্ম লাভ করিযাছিল, এতদ্ব্যতিবিক্ত ভাগবত বা ইহার রচনাকার সম্বন্ধে আর-কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক, ৩৩২ অধ্যাযে সম্পূর্ণ, ১৮,০০০ শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের অনেক কাহিনী পুনরুক্ত হইয়াছে। কপিল ও বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতাররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার প্রায সর্বত্র মহাভারত ও গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দশম স্কন্ধে যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের রাসলীলা অতিশয় বিস্তৃত; এই অংশই পরবর্তী কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল; প্রাদেশিক ভাষায় ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ বা অনুসরণ সবিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় ও ভক্তদের প্রভাবেই এই স্কন্ধত্রয় ভারতবর্ষে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও

সুপরিচিত হইয়াছিল। ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণজন্ম, বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, কুরুক্ষেত্রকাহিনী এবং একাদশ স্কন্ধে যদুকুলধ্বংস ও কৃষ্ণের কলেবর-ত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং বাঙলা দেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় এই এই স্কন্ধ অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

॥ ২ ॥

মালাধর বসুর পরিচয়

কুলকথা ॥

কবি মালাধর বসু সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও, প্রামাণিক-ভাবে এমন কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই যাহার দ্বারা তাঁহার আবির্ভাবকাল এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। তবু তাঁহাকে অজ্ঞাতকুলশীল বলা যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাঁহার কাব্যে বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং মালাধরের পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। এই কারণে তাঁহার সম্বন্ধে যৎসামান্য উপাদান বিস্মৃতির গ্রাস হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে।

গুণরাজ খান-উপাধিক মালাধর বসু বর্ধমানের কুলীনগ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অধুনা ঐ কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামালপুর থানার অন্তর্ভুক্ত, মেমারী রেল স্টেশনের নিকট অবস্থিত। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বেই যে এই গ্রাম বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। শুনা যায় যবন হরিদাস এই গ্রামেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক বা ঈষৎ পূর্ববর্তী মালাধর এই গ্রামে বাস করিয়া এবং বাংলা ভাষায় ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া এই গ্রামটির বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তী কালে এই গ্রাম বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। স্বয়ং মহাপ্রভু এই গ্রাম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জনে বহুদূর॥

মালাধর এই গ্রামের মাহীনগর-সমাজভুক্ত কুলীন কায়স্থবংশে জন্ম গ্রহণ

করেন। কুলজীগ্রন্থমতে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত পঞ্চ কায়স্থ আনাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে দশরথ ছিলেন অন্যতম। ইনিই মালাধরবংশের আদিপুরুষ। মালাধর এই আদিপুরুষ হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। ১৩৪৯ সালের 'কায়স্থসমাজ' (আষাঢ়-শ্রাবণ) পত্রিকায় প্রমথনাথ ঘোষ "কবি গুণরাজ খাঁ বংশ" প্রবন্ধে বহু কুলজীগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া মালাধরের কুলকথা আবিষ্কার করেন। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ৪০১ চৈতন্যাব্দে (১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনা করেন, তাহাতে মালাধরের বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এই বংশতালিকা কুলজীগ্রন্থে-প্রচারিত বংশতালিকা হইতে কিছু পৃথক। প্রমথনাথ ঘোষের মতানুসারে মালাধরের বংশতালিকা:—(১) দশরথ, (২) কৃষ্ণ, (৩) ভবনাথ, (৪) হংস, (৫) মুক্তি, (৬) দামোদর, (৭) অনন্ত, (৮) গুণাকর, (৯) মাধব, (১০) শ্রীপতি, (১১) যোগেশ্বর, (১২) ভগীরথ, (১৩) গুণরাজখাঁ (মালাধর)। কুলজীগ্রন্থে মালাধর গুণরাজখাঁ নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ বাংলা ১২৯৩ সালে কুলীনগ্রামে গিয়া মালাধরের কুলপরিচয় সংগ্রহ করেন। তাঁহার মতে মালাধরের বংশতালিকা:—(১) দশরথ, (২) কুশল, (৩) শুভশঙ্কর, (৪) হংস, (৫) মুক্তিরাম, (৬) দামোদর, (৭) অনন্তরাম, (৮) গুণীনায়ক, (৯) মাধব, (১০) শ্রীপতি, (১১) কৃপারাম, (১২) ভগীরথ, (১৩) মালাধর (গুণরাজখাঁ)। এই দুই তালিকায় বিশেষ পার্থক্য আছে। শুধু সাদৃশ্য এইটুকু যে, উভয় তালিকাতেই দশরথ হইলেন মালাধর-বংশের আদিপুরুষ এবং মালাধর দশরথ হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

মালাধর সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। শুনা যায় তিনি নাকি বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা অস্বীকার করিয়া পুরুষোত্তম দত্তবংশীয় শ্রীপতিদত্তের কন্যার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মানসিক বলের পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, তিনি সে যুগের সমাজে সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও অনুমিত হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর জন্মের সময়েও জীবিত ছিলেন। সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সত্যরাজ খান ও রামানন্দপ্রসঙ্গ ॥

মালাধর তাঁহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই। পুঁথিতে সামান্য যে দুই-একটি ইঙ্গিত আছে তাহা হইতে শুধু নিম্নলিখিত স্বল্পতম তথ্য পাওয়া যাইতেছে :

(১) কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস।
(২) বাপ ভগিরথ মোর মা ইন্দুমতি।
(৩) গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।
(৪) সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।

এই ছত্রগুলি হইতে শুধু এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, কুলীনগ্রামে কায়স্থ-বংশে মালাধরের আবির্ভাব হয়। পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী এবং পুত্র সত্যরাজ খান। কুলজী মতে কবি সতেরটি সন্তানের জনক, তন্মধ্যে সত্যরাজ খান কবির দ্বিতীয় পুত্র। চৈতন্যদেবের পার্ষদ রামানন্দ বসু কোন কোন মতে কবির পৌত্র, সত্যরাজ খানের পুত্র। আবার কেহ-বা সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুকে একই ব্যক্তি বলিতে চাহেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এমনভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে মাঝে মাঝে সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে যখনই সত্যরাজ খানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই রামানন্দের কথাও বলা হইয়াছে :

(১) কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ।
(২) ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
(৩) কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥

এখানে স্বতঃই মনে হইতে পারে, সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু এক ও অভিন্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এক স্থলে আছে :

কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাজখান।
তারে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ ॥

(চৈ চ. মধ্য, ২৪ অধ্যায়)

এই স্থলে সত্যরাজ ও রামানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে। তাঁহারা পৃথক ব্যক্তি বা পিতাপুত্র হইলে নিশ্চয় এখানে তাহার কোন উল্লেখ থাকিত এবং মহাপ্রভু একবচন বাচক "তুমি" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতের আর-এক স্থলে আছে যে, মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রথযাত্রার দিন ভক্তদের সহিত মিলিত হন; তিনি নিজেও রথের অগ্রে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার নির্দেশে কীর্তনের বিভিন্ন দল গান গাহিতে থাকে। এই কীর্তনসমাজ এক-একজন বৈষ্ণবভক্তের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়া সমাজ রামানন্দ-সত্যরাজ খানের নেতৃত্বে নৃত্যকীর্তনাদি করিয়াছিল:

কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়া সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥

এখানেও লক্ষণীয় যে, 'রামানন্দ সত্যরাজ' শব্দ একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যকীর্তনে বিভিন্ন সমাজের মাত্র একজন করিয়া নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ-সত্যরাজ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি—এই সাত জন নৃত্যকীর্তনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং রামানন্দ-সত্যরাজ যে একই ব্যক্তি তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে বোধগম্য হইবে। এ বিষয়ে আরও একটি গৌণ প্রমাণ আছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল যদিও নিঃসংশয়রূপে প্রামাণিক চৈতন্যজীবনগ্রন্থ নহে, তথাপি উহার এক স্থলে আছে যে, মহাপ্রভু সন্ন্যাস লইয়া কুলীন গ্রামে উপস্থিত হইলে—

গুণরাজ ছত্রী তনয় মহাশয়
নানা মহোৎসব করি।
দেখিঞা প্রকাশ ঠাকুর হরিদাস
রহাইল চরণে ধরি॥

গুণরাজ ছত্রীর (ক্ষত্রিয়?) তনয় এবং হরিদাস মহাপ্রভুকে অভ্যর্থনা করেন। ইনি রামানন্দ—গুণরাজ ছত্রীর তনয় (অর্থাৎ মালাধর বসুর পুত্র), পৌত্র নহেন।

আরও একটি আনুমানিক প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্যাবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হয়। তাহা হইলে মালাধরের পৌত্রের পক্ষে চৈতন্যদেবের পার্ষদ হওয়া সম্ভব কি? অতএব রামানন্দকে মালাধরের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। হয়তো রামানন্দও গৌড়েশ্বরের নিকট 'সত্যরাজ খান' উপাধি পাইয়া থাকিবেন। গৌড়েশ্বর বরবকশাহ কুলধর নামক এক বণিককে প্রথমে 'সত্যখান' এবং পরে

'শুভরাজ খান' উপাধি দিয়াছিলেন। হয়তো রামানন্দও পরবর্তী কোন গৌড়েশ্বরের নিকট এইরূপ 'সত্যরাজ খান' উপাধি পাইয়া থাকিবেন।

ইহার বিরুদ্ধেও (অর্থাৎ সত্যরাজ খান মালাধরের পুত্র, রামানন্দ পৌত্র) কিছু কিছু প্রমাণ আছে। কেদারনাথ দত্ত কুলীনগ্রামে গিয়া বসুবংশের যে কুলজী সংগ্রহ করেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, মালাধরের চৌদ্দটি পুত্র; তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি—সত্যরাজ খান। এই সত্যরাজের পুত্র রামানন্দ বসু—মহাপ্রভুর পার্ষদ। অবশ্য কেদারনাথের সংগৃহীত কুলজী কত দূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাও সন্দেহের বিষয়।

ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থেই এমন দুই-একটি ছত্র আছে, যাহাতে সত্যরাজ ও রামানন্দকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কুলীন গ্রামীরে কহে প্রভু সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডোরী লৈয়া ॥
গুণরাজ কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তান বংশের হাত ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর ॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য, ১৫শ অধ্যায়)

এই স্থলে "রামানন্দ আর সত্যরাজ খান" বাক্যে 'আর' সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা দুই জন যে পৃথক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। চৈতন্যদেব এই স্থলে দুই জনকেই 'তোমার' (মধ্যম পুরুষের একবচন) বলিয়াছেন; "রামানন্দ আর সত্যরাজ" ও চৈতন্যদেবকে "গৃহস্থ বিষয়ী আমি" (উত্তম পুরুষের একবচন) বলিয়া

আপনাদিগকে নির্দেশ করিয়াছেন: দুই জন পৃথক হইলে চৈতন্যদেব 'তোমার' শব্দের স্থলে 'তোমাদের' বা 'তোমা দোঁহার' এইরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন; তাঁহারাও 'গৃহস্থ বিষয়ী আমি' না বলিয়া বহুবচনবাচক উত্তম পুরুষ ব্যবহার করিতেন। সুতরাং সত্যরাজ ও রামানন্দ যে পৃথক ব্যক্তি, এ কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। অবশ্য বৈষ্ণবসমাজে সত্যরাজ খান ও রামানন্দের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। সতীশচন্দ্র রায় 'পদকল্পতরু'র পঞ্চম খণ্ডেও সেই প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে রামানন্দকে মালাধরের পৌত্র বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের যে সমস্ত বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক-গণও কেদারনাথ দত্তের এই মত (অর্থাৎ রামানন্দ বসু মালাধরের পৌত্র) গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, রামানন্দের ভণিতায় কিছু কিছু বৈষ্ণব পদ পাওয়া গেলেও সত্যরাজ খানের নামে কোন পদ পাওয়া যায় নাই। তিনিও মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাহার কিছু কিছু পদ নিশ্চয় পাওয়া যাইত। তাহার ভণিতাযুক্ত কোন পদ পাওয়া যায় নাই বলিয়া সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, সত্যরাজ ও রামানন্দ একই ব্যক্তি হইলে রামানন্দ-ভণিতাযুক্ত পদের কোথাও না কোথাও সুলতান দত্ত উপাধি (?) 'সত্যরাজখান' এই ভণিতা ব্যবহৃত হইত। হয়তো রামানন্দ সুলতানপ্রদত্ত খেতাব সগর্বে ব্যবহার করিতেন, যেমন মালাধর বসু 'গুণরাজ খান' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই সত্যরাজ খান যে রামানন্দ অপেক্ষা কোন পৃথক ব্যক্তি নহেন, তাহা পদের ভণিতার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় না।

সত্যরাজ খান সম্পর্কে আর-একটা প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। কুলীনগ্রামে এখনও মালাধর বসুর ভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং তাহার চতুর্দিক পরিবেষ্টিত গড়ের চিহ্ন বর্তমান। সত্যরাজ খান এবং রামানন্দ বসু-প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মূর্তি এখনও ঐ গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার অনতিদূরে একটি শিবমন্দির আছে এবং শিবমন্দিরের পার্শ্বে একটি বৃষমূর্তি আছে। ঐ বৃষমূর্তির গলদেশে-উৎকীর্ণ এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে:

শাকে বিশতি বেদে খে মনৌহি শিব সন্নিধৌ।
খান-শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিতোঽয়ং ময়া বৃষঃ॥

'১৪০৪ শকের (১৪৮২ খ্রীঃ অঃ) প্রারম্ভে আমি শ্রীসত্যরাজ খান এই বৃষ স্থাপিত করিলাম।' সত্যরাজ খান ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে চৈতন্যদেবের জন্মের তিন বৎসর পূর্বে এবং মালাধর কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনার দুই বৎসর পরে এই বৃষমূর্তি স্থাপন করেন। সত্যরাজ ও রামানন্দ যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে সত্যরাজ শুধু উপাধি ব্যবহার করিলেন, নিজ নাম 'রামানন্দ বসু' উল্লেখ করিলেন না, ইহাও বিশেষ রহস্যময়। সুতরাং এই প্রমাণের বলেও সত্যরাজ ও রামানন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে না। এই তথ্যটি কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১০ম পৃষ্ঠা) প্রকাশ করেন। তিনি বাংলা ১২৯২ অব্দের শীতকালে কুলীনগ্রাম ভ্রমণে গিয়া এই তথ্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আসেন। গ্রামবাসীর নিকটেও তিনি মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান এবং সত্যরাজের পুত্র রামানন্দের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই উপরোক্ত প্রমাণ ও এই সাক্ষ্যের বলে সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে পিতাপুত্র বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কুলীনগ্রামবাসী হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, সত্যরাজ খান প্রভৃতি কুলীনগ্রামবাসীরা হরিদাসের ভক্ত ছিলেন—

তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামিজন।
সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥

(চৈ. চ. আদি, ১০ম অধ্যায়)

এখানে কৃষ্ণদাস গ্রামবৃদ্ধ হিসাবে সত্যরাজের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, পুত্র রামানন্দের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সত্যরাজ-রামানন্দ এক ব্যক্তি হইলে হয়তো এখানে তাহার কোন নির্দেশ থাকিত।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় চৈতন্যজন্মের পাঁচ বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হইলে চৈতন্যপার্ষদ রামানন্দ মালাধরের পৌত্র হইতে পারেন না, পুত্রই হইবেন। কিন্তু কেনই-বা তিনি পৌত্র হইতে পারিবেন না? শ্রীকৃষ্ণবিজয় যদি মালাধরের সুবৃদ্ধ বয়সের রচনা হয় (অন্ততঃ ষাট বৎসর), তাহা হইলে এই সময়ে কবির পৌত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর পার্ষদ হইবার বাধা কোথায়? সাধারণতঃ প্রতি ত্রিশ বৎসরে

একপুরুষ ধরা হইয়া থাকে। মালাধরের ষাট বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্রের বয়স তিরিশ বৎসর হওয়া অসম্ভব নহে, এই সময়ে যদি রামানন্দের জন্ম হইয়া থাকে তাহা হইলে তিনি চৈতন্যদেবের প্রায় সমবয়সী হইবেন। কাজেই বংশধারার হিসাবমতে রামানন্দ যে মালাধরের পৌত্র হইতে পারেন না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক, নূতন কোন উপাদান না পাইলে এই বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব নহে। প্রচলিত মতানুসারে আমরা রামানন্দকে মালাধরের পৌত্র বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

মালাধরের আবির্ভাব সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হইতে পারে। পূর্বোল্লিখিত বৃষমূর্তির গাত্রে উৎকীর্ণ সনতারিখ (১৪০৪ শক, ১৪৮২ খ্রীঃ অঃ) অনুসারে দেখা যাইতেছে, ১৪৮২ খ্রীঃ অব্দে তাহার পুত্র সত্যরাজ খান বৃষ প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন কবি মালাধর নিশ্চয় সুবৃদ্ধ। যদি ধরা যায়, এই সময় তাহার বয়স অন্যূন ষাট বৎসর হইয়াছিল, তাহা হইলে মনে হয়, তিনি ১৪২০ ২২ খ্রীঃ অব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

মালাধরের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বর ॥

মালাধর যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন, তখনই তিনি গৌড়েশ্বর কর্তৃক গুণরাজ খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কাব্য সম্ভবতঃ ১৩৯৫ ১৪০২ শকের (১৪৭৩ ৮০ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। এই সময় কোন সুলতান বঙ্গাধিপ ছিলেন তাহা নির্দেশ করিতে পারিলেই কবির কাব্যরচনাকাল ও আবির্ভাবের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ এই গৌড়েশ্বর বলিতে বিদ্যোৎসাহী হুসেনশাহ্‌কেই নির্দেশ করিতে চাহেন।[৪] কিন্তু কোন হিসাব মতেই হুসেনশাহ্‌কে মালাধর-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর বলা যায় না। কারণ হুসেনশাহ্ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করিয়াছিলেন। হুসেনশাহের সময় কবি বর্তমান ছিলেন কি-না জানা যায় না, তবে এই গুণরাজ উপাধি হুসেনশাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রুকনুদ্দিন বরবকশাহ্ ১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। কবি কাব্য আরম্ভ করিতেছেন ১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীঃ অব্দে। সুতরাং বরবকশাহই বোধহয় কবিকে এই উপাধি দিয়াছিলেন। কাব্য সমাপ্ত হয় ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দে; তখন সামসুদ্দিন ইউসুফশাহ্ (১৪৭৪ ৮১ খ্রীঃ অঃ) গৌড়ের সুলতান।

৪ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগের বাঙালী, পৃ ৩৭

বরবকশাহ্ এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহাও অনুমান মাত্র। কারণ কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মুদ্রিত সংস্করণে সনতারিখজ্ঞাপক যে শ্লোকটি[৫] প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উপরেই এই গৌড়েশ্বরের প্রামাণিকতা নির্ভর করিতেছে। এই তারিখ পাওয়া না গেলে আমরা বরবকের পুত্র বিদ্যোৎসাহী সুলতান সামসুদ্দিন ইউসুফশাহ্কে মালাধর-কথিত গৌড়েশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম। বরবকশাহ্ রাজ্যবিস্তারেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুলতান সামসুদ্দিন তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধি ও বিচারশক্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন। কেদারনাথ দত্ত আবিষ্কৃত ঐ তারিখটি সম্মুখে না থাকিলে আধুনিক গবেষক মালাধরের গৌড়েশ্বরকে সামসুদ্দিন ইউসুফশাহ্ বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারিতেন। যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত *History of Bengal* (Vol 2) গ্রন্থে কিন্তু মালাধরের পৃষ্ঠপোষকরূপে বরবকশাহকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত অংশের লেখক ডক্টর এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ সাহেব কেদারনাথ দত্ত-সংগৃহীত ঐ শ্লোকটির প্রতিবিরুদ্ধ আর কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত না হইলে আমরা মালাধরের পৃষ্ঠপোষকরূপে বরবকশাহকেই গ্রহণ করিতে পারি।

রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক ॥

মালাধরের আবির্ভাব ও কাব্যরচনাকালের অংশনির্ণীত প্রমাণরূপে কাল-জ্ঞাপক কিছুই পাওয়া যায় নাছে। ইতিপূর্বে আর-কোন কাব্যে সনতারিখের স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। তাই কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে সনতারিখযুক্ত প্রথম বাংলা গ্রন্থের গৌরব দিতে চাহেন। ইদানীং মালাধরের যত পুথি পাওয়া যায় তাহাদের কোনখানিতেই কালজ্ঞাপক পয়ার নাই। এখন দেখা যাক এই শ্লোকটি কি করিয়া কোথা হইতে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে স্থান পাইল।

৭৯১ চৈতন্যাব্দে (১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অঃ) কেদারনাথ দত্তের 'অনুমত্যানুসারে' এবং রাধিকাপ্রসাদ দত্তের প্রকাশনায় মালাধরের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্বেও বটতলা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তবে তাহা প্রামাণিক নহে, তাহাতে কোনরূপ

[৫] তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।

সনতারিখের উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। রাধিকাপ্রসাদ দত্ত-প্রকাশিত এবং কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত এই সংস্করণটি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রথম প্রামাণিক সংস্করণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থের সমাপ্তির দিকে কালজ্ঞাপক নিম্নলিখিত পয়ারটি আছে :

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥

অর্থাৎ মালাধর বসু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) ইহা সমাপ্ত করেন। এই শ্লোকের দ্বারা আমরা মালাধরের পৃষ্ঠপোষক বরবকশাহ্‌কে পাইতেছি, এবং কবির আবির্ভাবকালেরও ইঙ্গিত পাইতেছি। মুদ্রিত সংস্করণে এই শ্লোকটি প্রকাশিত হইবার পূর্বেও আর-এক স্থলে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ রাধিকাপ্রসাদ দত্ত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' নামক বৈষ্ণব পত্রিকায় ১২৯৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়কাব্য মুদ্রিত হইতেছে। সেই বিজ্ঞাপনে তিনি সর্বপ্রথম উল্লিখিত কালজ্ঞাপক পয়ারটি মুদ্রিত করেন। তাহার অল্প পরে তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র বৈষ্ণব ডিপোজিটরী প্রেস হইতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং ছাপার অক্ষরে এই পংক্তিদুইটি গ্রন্থে প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্বে সর্বপ্রথম 'শ্রীসজ্জনতোষিণী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

এই শ্লোকটি কেদারনাথ দত্ত ও রাধিকাপ্রসাদ দত্ত কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহারা একখানি প্রাচীন পুঁথি (ইহা নাকি ১০০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৩ খ্রীঃ অব্দে অনুলিখিত) অবলম্বনে গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তাহাতেই নাকি এই শ্লোকটি ছিল। এই পুঁথিটি কী পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তাহা আমরা পরে 'পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণ' নামক অনুচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। উক্ত পুঁথিটি অন্য কেহ দেখেন নাই, তাহার কোন অস্তিত্বও পাওয়া যাইতেছে না। উপরন্তু এ যাবৎ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিতেই ঐ পয়ারটি নাই। সুতরাং এত দুর্বল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত শ্লোকের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় কি? কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ ঐ একটি শ্লোকের উপর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল স্থাপন করিয়াছেন। এই শ্লোক মনগড়া হইলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নির্দেশ করা যাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথি (১৮শ শতাব্দী)

॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথি ও মুদ্রণ

শ্রীকৃষ্ণবিজযেব পুঁথিব সংখ্যা সুপ্রচুর নহে, ইহা প্রধানতঃ বৈষ্ণব সমাজেই অধিকতব প্রচলিত ছিল বলিয়া কৃত্তিবাসেব বামাযণেব মতো ইহার পুঁথি-সংখ্যা প্রচুব নহে। সপ্তদশ শতাব্দীব পূর্ববর্তী কোন পুঁথিও আমাদেব দৃষ্টি-গোচব হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পুঁথিশালাব শ্রীকৃষ্ণবিজযেব যতগুলি পুঁথি আছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম পুঁথিখানি (পুঁথিসংখ্যা—২৫০) ১০১৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেও শ্রীকৃষ্ণবিজযেব এত পুবাতন পুথি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয হইতে খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশযেব সম্পাদনায শ্রীকৃষ্ণবিজযেব যে সংস্কবণটি প্রকাশিত হয, তাহা এই ১০১৩ বঙ্গাব্দেব পুঁথিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ কবিযাছে। ১৯৭৫ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা হইতে নন্দলাল বিদ্যাসাগব ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যতীর্থেব সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণবিজযেব আব-একটি সংস্কবণ মুদ্রিত হইযাছে। নন্দলাল বিদ্যাসাগবও উক্ত গ্রন্থসম্পাদনায প্রাচীন পুঁথি ব্যবহাব কবিতে পাবেন নাই, যে পুঁথিগুলিব সাহায্য লইযাছেন, তাহাদেব কোনখানি ১৮শ শতাব্দীব পূর্ববর্তী নহে।

প্রাপ্ত পুঁথিব মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীব পুথিব পাঠেব মধ্যে মোটামুটি ঐক্য থাকিলেও লিপিকাব বা গাযেনেব প্রক্ষেপেব ফলে এক পুথিব সহিত অন্য পুঁথিব পাঠেব অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। নিম্নলিখিত পুঁথিসমূহেব পাঠ তুলনা কবিলেই দেখা যাইবে যে, পুঁথিব পাঠ বিভিন্ন পুঁথিতে কিরূপ পবিবর্তিত হইযাছে।

১১০৬ সালেব (১৬৯৯ খ্রীঃ অঃ) পুঁথি

এত বলি দ্বারকাএ দারুক পাঠাল্য।
স্বরির ছাড়িতে তরু সাখা আরোহিল॥
এক সাখা আরোহিআ আর সাখাএ বসে।
একপদ বাহিরে আর পদ উরুদেসে॥
অতিবাতে আপনা বসি থাকীলা আপনে।
ইসত নাচাএ গোসাঞি চরণে॥
হেনকালে আল্য তথা ব্যাধ জরা নামে।
মুসলের সেষ লোহ আছে জার স্থানে॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই দেখে আচম্বিতে।
হরিণের রূপ দেখে চরণ লোহিতে ।।
হরিণ বলিয়া তাহে বানে জে এড়িল।
ব্রহ্ম সাঁপে বান গিআ চরণে বাজিল ।।

(ক. বি. পুঁথি—৯৫২)

১১১০ সালেব (১৭০৩ খ্রীঃ অঃ) পুঁথি

এত বলি দ্বারকাএ দারুকে পাঠাইল।
তনুত্যাগ করিতে প্রভু তরু সাখা কৈল ॥
এক ডালে মাথা থুয়্যা আর ডালে বৈসে।
এক পদ বাহিরে আর পদ উরুদেশে ॥
আপনি আপন ভাবি থাকিলা তখন।
ইসত দোলান তাথে বাহির চরণ ॥
হেন কালে আল্যা তথা ব্যাধ জরা নামে।
মুসলের সেষ লৌহ বান জার স্থানে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা গেলা আচম্বিত।
হরিণের বর্ণ্য হেন চরণ লোহিত ॥
হরিণের জ্ঞানে ব্যাধ বাণ জুড়িল।
ব্রহ্ম সাঁপ হৈতে বান চরণে বাজিল ॥

(ক বি. পুঁথি—৪৭৭৫)

১২১৯ সালেব (১৮১২ খ্রীঃ অঃ) পুঁথি

এত কহি দারুকের দ্বাবকা পাঠাইল।
সরির ছাড়িতে তরু সাখা আরোহিল ।।
এক সাখা আরোহিএ আর সাখায় বেসে।
এক পদ বাহিরে আব পদ তরুদেশে ॥
নিম্ব বৃক্ষে আরোহিএ থাকিলা তখন।
ইসত টানিল তথা বাহির চরণ ॥
হেনকালে আইল তথা ব্যাধ জম নামে।
মুষলের শেষ লোহ বান জার স্থানে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখিল আচম্বিতে।
হরিণের বর্ণ হেন দেখিল লোহিত ।।
হরিণ জ্ঞানে সেই ব্যাধ বান জে এড়িল।
ব্রহ্ম সাঁপে বাণ গিএ চরণেতে দিল ।।

(ক বি পুঁথি—৬১৪৪)

কেদারনাথ দত্ত-সম্পাদিত মুদ্রিত পাঠ

এত বলি দ্বারকায় দারুক পাঠাল।
শরীর ছাড়িতে তরু শাখায় বসিল॥
এক শাখায় যায় গিয়া আর শাখায় বৈসে।
এক পা বাহির আর পাও তরুদেশে।/
হেনকালে আইল নামে তথা ব্যাধ জরা।
মুষলের লৌহ আছয়ে স্থান তার॥
ভ্রমিত ভ্রমিতে তথা দেখে আচম্বিতে।
হরিণের বর্ণ যেন চরণ লোহিতে॥
হরিণীর বর্ণ বুঝি বাণ এড়িল।
ব্রহ্ম শাপে লৌহ গিয়া চরণ বিন্ধিল॥

(১৮৮৬ ৮৭ সালে মুদ্রিত)

এখানে লক্ষণীয় যে, ভাষাকে কিছু কিছু পরিবর্তন করিবার দিকেই লিপিকার বা গায়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভাষা, শব্দ ও বাক্য পরিবর্তনের অন্তরালে কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণ নাই, অনেকটা রুচি ও খেয়ালখুশি মতো পুঁথির লিপিকারগণ শব্দ বদলাইয়া দিয়াছেন। অনেক সময় কোন কোন পুঁথিতে সম্পূর্ণ নূতন পালাও সংযোজিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভাগবতবহির্ভূত রাধা-কৃষ্ণলীলা ও দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ভারখণ্ডের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের পুঁথিতেই অযথা অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম পুঁথিতে একস্থলে রাধার উল্লেখ আছে বটে (খগেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠা), কিন্তু দানলীলা বা ভারখণ্ডের বর্ণনা নাই। এই বর্ণনাগুলি পরবর্তী পুঁথিতে মিলিতেছে। নন্দলাল বিদ্যাসাগর ঢাকা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের পুঁথিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কাজেই তাহাতে রাধাকৃষ্ণসংক্রান্ত দীর্ঘ বর্ণনা আছে।

এইবার শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মুদ্রিত সংস্করণগুলি আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা নিম্নলিখিত মুদ্রিত সংস্করণের সন্ধান পাইয়াছি :

১। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের 'অনুমত্যানুসারে' রাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক বৈষ্ণব ডিপজিটারী, ১৮৯ নং মাণিকতলা হইতে প্রকাশিত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—৪০১ চৈতন্যাব্দ (১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অঃ)

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয—১৯৪৪ খ্রীঃ অঃ।

৩। ঢাকা হইতে নন্দলাল বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয—১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ।

এই তিনখানি মুদ্রিত সংস্করণের পূর্বেও বটতলা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহার কোন কপি দেখি নাই। সুতরাং তাহা কোন্ আদর্শে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে না। বটতলা-প্রকাশিত কোন প্রাচীন কাব্যই নির্ভরযোগ্য নহে, অর্ধ-শিক্ষিত প্রকাশকগণ জনরুচির দিকে চাহিয়া পুরাতন পুঁথির পাঠ যথেচ্ছা বদলাইয়া লইতেন—কৃত্তিবাস-প্রসঙ্গে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এখনও এ রীতি অব্যাহত আছে। সে যাহা হউক, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের প্রবর্তনায় ১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণ মুদ্রিত হয়, তাহাই এতদিন ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। কেদারনাথ দত্তের পর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল কি-না বুঝা যাইতেছে না। এই মুদ্রিত গ্রন্থে কালজ্ঞাপক পয়ারটি আছে বলিয়া ইহার মূল্যও বিশেষভাবে বিবেচ্য। এখন দেখা যাক কেদারনাথ দত্ত কিভাবে ইহা সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ভক্তিবিনোদ মহাশয় উক্ত সংস্করণের প্রারম্ভে যে 'উপক্রমণিকা' যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার মুদ্রণের ইতিহাসও সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। সম্পাদক যে পুঁথি অবলম্বনে ইহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা ১৪০৫ শকাব্দে (১৭৮৩ খ্রীঃ অঃ) দেবানন্দ বসু কর্তৃক অনুলিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথি। প্রসিদ্ধ আউল মনোহর দাস বাবাজী এই পুঁথির অধিকারী ছিলেন। তিনি কৃপারাম সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে উহা দান করেন। এই কৃপারাম সিংহ উদ্ধারণ দত্ত বংশজাত হুগলীর বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির প্রমাতামহ। পুঁথিটি হারাধন দত্তের নিকট ছিল, সম্পাদক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণবিজয় মুদ্রণের সময় ঐ প্রাচীন পুঁথিটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। উহার অনেক স্থল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সম্পাদক সেই স্থলে কিছু কিছু সংযোজনা করিয়া থাকিবেন। মূল পুঁথিটি ১৪০৫ শকাব্দের (১৪৮৩ খ্রীঃ) হইলে মালাধর কাব্যরচনার অত্যল্পকালের মধ্যেই এই পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগের পুঁথিতে যেরূপ প্রাচীনত্বের চিহ্ন থাকা উচিত, কেদারনাথ দত্ত-সম্পাদিত গ্রন্থে সেরূপ

প্রাচীন ভাষার কোন চিহ্ন নাই বলিলেই চলে। তুই-চারিটি শব্দকে প্রাচীন বলিয়া মনে হইলেও সেগুলি রাঢ় অঞ্চলে ব্যবহৃত আধুনিক শব্দ। ভাষার দিক দিয়া কেদারনাথ সম্পাদিত গ্রন্থ অতিশয় অর্বাচীন, ১৯শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। হারাধন দত্তের কথা আমরা কৃত্তিবাসপ্রসঙ্গে সবিস্তারে বলিযাছি। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ার সর্বপ্রথম তাহার হাতে আসে, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের কালজ্ঞাপক শ্লোকও তাহার সংগৃহীত পুঁথিতে ছিল—ব্যাপার কিছু রহস্যজনক বটে। সে যাহা হউক, উক্ত পুঁথি প্রাচীন বলিয়া ধরিযা লইলেও, সম্পাদক কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ যে উহাতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিযাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকায বলিতেছেন, "এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয, ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয নাই। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল-সতর অক্ষর বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায।" সুতরাং তিনি যে পুঁথির ভাষা কথঞ্চিৎ মার্জিত করিযা মুদ্রিত করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? হারাধন দত্তের নিকট ভক্তিবিনোদ মহাশয যে পুঁথিটি পাইযাছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওযা যায নাই বলিযা কেদারনাথ দত্তের শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে যথেষ্ট প্রামাণিক বলা যায না। নিম্নে একখানি প্রাচীন পুঁথি (১০১৩ বঙ্গাব্দ—১৬০৭ খ্রীঃ অঃ) এবং কেদারনাথ দত্তের মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে:

পুঁথির পাঠ

রাজার আদেশে দুষ্ট বৎসক অসুরে।
বাছুর রূপে সান্তাইল গোঠের ভিতরে ।।
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ সেই মাযাসুরে।
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই হলধরে ।।
হেরে দেখ বৎস অসুর পাপমতি।
আমা মারিতে পাঠাইল কংস নরপতি ।।
মারিতে আইল পাপ মরিব এখন।
কৌতুকে দেখহ ভাই উহার মরণ ।।
এত বলি সান্তাইল বাছুর ভিতরে।
পাছুকার দুই পা লেঞ্জ সনে ধরে ।।
পাক দিয়া উভ করি পেলে গোবিন্দাই।
গাছে ঠেকী প্রাণ দিল অসুর তথাই ।।

মায়া ছাড়ি প্রাণ দিল বাছুর ভিতরে।
পর্বতকায় দেখি ত্রাস ছাওালেরে ।।
হেন অদ্ভুত কথা সুন সর্বজনে।
মরিল বৎসাসুর গুণরাজ ভণে ।।

(ক. বি. পুঁথি—৯৫০)

কেদারনাথ-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পাঠ

রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে।
বাছুর রূপে সান্ধাইল বাছুর ভিতরে ।।
দেখিয়া জানিল কৃষ্ণ চিনিল অসুরে।
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল ভাই বলাইরে ।।
হেরে দেখ ভাই বৎসক পাপমতি।
আমাকে মারিতে পাঠায়েছ কংশ নরপতি ।।
মারিতে আইল পাপ মরিবে এক্ষণে।
কৌতুক দেখহ ভাই উহার মরণে ।।
এত বলি গোবিন্দাই পরি পীত ধরি।
উভ চান্দে বান্ধে চূড়া দিয়া ছান্দন দড়ি ।।
মালসাট মারিয়া চলিলা দেব শ্রীহরি।
অসুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি ।।
সান্ধাইল গদাধর গোঠের ভিতরে।
বাছুর দুই পায়ে লেজে ধরিল দামোদরে ।।
উভ করি পাক দিয়া ফেলিলেন দূরে।
গাছে ঠেকি প্রাণ দিল দুরন্ত অসুরে ।।

(১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অব্দে মুদ্রিত)

এই দুই বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, কেদারনাথ দত্তের অবলম্বিত পুঁথির পাঠের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোথাও শব্দ পরিবর্তিত হইয়াছে, কোথাও-বা নূতন ছত্র সংযোজিত হইয়াছে। উপরন্তু ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত গ্রন্থের ভাষা অতিশয় মার্জিত ও আধুনিক। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থের পাঠ যথেষ্ট প্রাচীন ও প্রামাণিক কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো তিনি যে পুঁথি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন হইতে পারে, কিন্তু যে পাঠ মুদ্রণের জন্য গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে

পুঁথিমুদ্রণের সময় প্রাচীন গ্রন্থমুদ্রণের বৈজ্ঞানিক ও ভাষাতাত্ত্বিক রীতি অনুসৃত হইত না। এখনও যে সমস্ত পুঁথি মুদ্রিত হয়, তাহাতে ইচ্ছামত পাঠ বিকৃত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পূর্বোল্লিখিত নন্দলাল বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের (১৯৭২ খ্রীঃ অঃ) সংস্করণটি নির্দেশ করা যাইতে পারে। সম্পাদক মহাশয় প্রাচীন পুথি অবলম্বন করিয়াও মুদ্রিত গ্রন্থের ইচ্ছামত পাঠ সংশোধন করিয়াছেন; প্রাচীন পুঁথি-সম্পাদনার রীতি সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সকৌতুকে লক্ষণীয়, "আধুনিক আধ্যক্ষিক সাহিত্যিকগণ (?) পুঁথির পাঠ মিলাইয়া গ্রন্থ-সম্পাদনকালে যেরূপ 'মাছিমারা কেরাণী'-বৃত্তিকে অকৃত্রিমতা-সংরক্ষণের আদর্শ বলিয়া মনে করেন এবং তৎফলে অপ্রাকৃত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গুরুবর্গকে নিরক্ষর গ্রাম্য লিপিকরের সহিত সাযুজ্য প্রদান করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত হন না, আমরা সেরূপ প্রণালীকে কথনই অকৃত্রিমতার নিদর্শন বলিয়া স্থান দিতে প্রস্তুত নহি। মহাকবি শ্রীমালাধর বসু বা শ্রীভাগবতাচার্য শুদ্ধ বানান জানিতেন না, তাঁহারা 'অকাট মূর্খ' হইয়া 'শ্রীমদ্ভাগবতের' ন্যায় গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কোনও সুধী ব্যক্তি ইহা ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারেন না (ভূমিকা)।" প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনা করিতে গিয়া একজন আধুনিক কালের সম্পাদক যদি এই মন্তব্য করেন, তাহা হইলে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে যে পুঁথি-সম্পাদনের বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পাঠ সম্বন্ধে কিছু সংশয় পোষণ করা স্বাভাবিক।

কেদারনাথ দত্তের সংস্করণের অনেক পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনায় (১৯৪৪ খ্রীঃ অঃ) এবং ঢাকা হইতে নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় (১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ প্রধানতঃ ১০১৩ বঙ্গাব্দে অনুলিখিত একখানি পুঁথির (পুঁথিসংখ্যা—৯৫০) পাঠকে অবলম্বন করিয়াছে। অবশ্য আরও অনেকগুলি পুঁথি হইতে পাঠান্তর প্রদত্ত হইয়াছে।[৬] ঢাকা হইতে নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় (১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ), তাহাতে প্রধানতঃ কেদারনাথ দত্তের মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (পুঁথিসংখ্যা—

৬ পুঁথিসংখ্যা—১৩৬০ (১০৯৯ বঙ্গাব্দ), ৯৫৮ (১২৫৪ বঙ্গাব্দ), ৩১১৬ (তারিখ নাই)।

১১৯৫, ১২৮৮, ২৬৬৮) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পুঁথিসংখ্যা—৭৪৪, ২২৭৮A) পুঁথির পাঠও আলোচনা করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে বিভিন্ন পুঁথির পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যপরিচয়

সাধারণ কথা

(মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় 'গোবিন্দবিজয়' ও 'গোবিন্দমঙ্গল' নামেও পরিচিত। কদাচিৎ 'শ্রীকৃষ্ণবিক্রম' আখ্যাও পাওয়া যায়)[৭] এই কাব্য ভাগবতের অনুবাদ বা অনুসরণ হিসাবে বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত, কিন্তু তাহার বাহিরে ইহার যে খুব একটা জনপ্রিয়তা ছিল, তাহা মনে হয় না। কারণ রামায়ণ মহাভারতের যেমন অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এখনও পাওয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথির সেরূপ প্রাচুর্য লক্ষিত হয় না। মুদ্রণের যুগেও ইহার বহুল প্রচার হয় নাই, দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের পরিচয়জ্ঞাপক পুস্তকপুস্তিকায় মালাধরের কোন প্রসঙ্গই মুদ্রিত হয় নাই। বটতলা হইতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদের সংস্করণ (১৮৮৬ ৮৭ খ্রীঃ অঃ) ব্যতীত আমরা ১৯শ শতাব্দীতে মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কপি দেখি নাই। অদ্যাপি দুইখানি ব্যতীত উহার কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন—কৃষ্ণদাস সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। চৈতন্যদেব কুলীন গ্রামের সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর ॥

কুলীন গ্রাম মালাধরের বাসভূমি বলিয়া মহাপ্রভু এই গ্রাম ও গ্রামবাসীকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একস্থলে বলিয়াছেন ঃ

৭ নন্দলাল বিদ্যাসাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥

চৈতন্যদেবের সপ্রশংস উক্তির ফলেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে। কারণ কাব্যটি বিস্ময়কর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক নহে। অবশ্য ইহার জনপ্রিয়তার অন্য কারণ বর্তমান থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, ইহা ভাগবতের অনুবাদ—যে-ভাগবত ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসমাজে উপনিষদরূপে আজিও পূজিত। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহাই ভক্তের রচিত প্রথম কাব্য। কৃত্তিবাস, বড়ুচণ্ডীদাস—ইঁহারা প্রধানতঃ কবি; কিন্তু মালাধর প্রধানতঃ ভক্ত—তাঁহার কবিত্বশক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। তৃতীয়তঃ, ইহাতে ঐ যে 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্যটি রহিয়াছে, যাহা চৈতন্যদেবকে মুগ্ধ করিয়াছিল, ঐ বাক্যের 'প্রাণনাথ' শব্দটি পরবর্তী কালের বৈষ্ণবভক্তদের মনে রাগানুগা-সাধনার আভাস দান করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইয়াও এই সমস্ত কারণে ইহা বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামটির প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা লইয়াও কিছু কিছু মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ 'বিজয়' অর্থে মৃত্যু বা মহাপ্রয়াণ বুঝিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শেষে কৃষ্ণের কলেবর-পরিত্যাগের কথা আছে। কিন্তু 'বিজয়' শব্দটির এইরূপ কোন তাৎপর্য নাই। 'বিজয়' সাধারণতঃ দেবতার শোভাযাত্রা কীর্তিকথা, বিজয়গৌরব—এই অর্থে সে যুগে ব্যবহৃত হইত, এ যুগেও হয়। প্রতিমাবিজয়ার মূলেও এইরূপ তাৎপর্যই নিহিত আছে। প্রতিমাবিজয়া, অর্থাৎ মূর্তি নিরঞ্জনের পূর্বে শোভাযাত্রা। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় কৃষ্ণের গৌরবলীলা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে কবি এই গ্রন্থকে 'গোবিন্দমঙ্গল' আখ্যা দিয়াছেন। 'মঙ্গল' শব্দটি মঙ্গলকাব্যেও দেবতার গৌরবপ্রচারের প্রতীকশব্দ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। মালাধর মঙ্গল শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণলীলামহিমা-প্রচারই এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, সুতরাং সেই দিক দিয়া 'বিজয়' বা 'মঙ্গল' শব্দ প্রয়োগ যথোচিত হইয়াছে।

কাহিনী পরিচয়॥

মালাধর বসু ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের কাহিনীসূত্র অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করিয়াছিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে' কৃষ্ণের জন্ম

হইতে দ্বারকালীলা পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে কাহিনী সামান্যই, যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগই প্রধান ঘটনা। অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ ও উদ্ধবের কথোপকথনের সাহায্যে মুক্তি, ধ্যানযোগ, শ্রীহরির বিভূতি, যতিধর্ম, জ্ঞানকর্ম-ভক্তিযোগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মালাধর একাদশ স্কন্ধ হইতে কাহিনীটি গ্রহণ করিয়াছেন; কিছু তত্ত্বাংশ আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ সামান্যই। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কিছু কিছু কাহিনী ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুরাণকথা ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই বাংলা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। কথক, পাঁচালীকার, গায়কগণ বিভিন্ন পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লোকসমাজে তাহার প্রচার করিতেন। মালাধর এই সমস্ত পাঁচালীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা হইতে অনেক সাহায্যও পাইয়াছিলেন। তিনি বোধহয় প্রথমে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পাঁচালীশ্রেণীর কাব্যরচনার অভিলাষ করিয়াছিলেন:

> ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
> লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
> ভাগবত অর্থ যত পয়ার বান্ধিয়া।
> লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥

অবশ্য তিনি যে শুধু পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত জানিতেন না—তাহা সত্য নহে। যদিও শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঁচালীজাতীয় রচনা, তবু ভাগবতের অনেক শ্লোকের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কবি আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা না করিলেও অনেক স্থলে প্রায় অনুবাদের মতো হইয়াছে।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা অনুসরণ করিয়াছেন। বৃন্দাবনলীলায় রাধাকৃষ্ণের রাস, নৌকালীলা, দানলীলা প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবতবহির্ভূত; কাহারও কাহারও মতে ইহা পরবর্তী কালে অন্য কোন কবি কর্তৃক সংযোজিত। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুরাতন পুঁথিতে এই লীলাগুলি পাওয়া যায় নাই, রাধার প্রায়ই উল্লেখ নাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অর্বাচীন পুঁথিতে ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখীগণেরও উল্লেখ আছে। এই সখীগণের নামকরণ চৈতন্যযুগে পরিকল্পিত হইয়াছে, তৎপূর্বে

নহে। সুতরাং কৃষ্ণের সখাসখীর প্রসঙ্গ ও নাম নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

এই কাব্যের বৃন্দাবনলীলায় কিছু কিছু আদিরস থাকিলেও কাব্যটিকে বীররসাত্মক মহাকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য-বীরত্বের দিকটি অধিকতর ফুটিয়াছে। মহাপ্রভু 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্যটিকে যতই শ্রদ্ধা করুন না কেন, রাস বর্ণনা বাদ দিলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কাহিনীতে আদিরস অপেক্ষা বীররসের প্রাধান্যই অধিক। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত শ্রীচৈতন্যের উক্তিটির জন্য বৈষ্ণবসমাজে ইহার বিশেষ প্রচার হইয়াছিল। তাহা না হইলে ভাগবতের ঐশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্যভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের বিষয়।

কবি যে মূল ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধ কাহিনীতে গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার সহজাত পরিমাণবোধ প্রমাণিত হইয়াছে। ভাগবত প্রধানতঃ পুরাণ-গ্রন্থ; ইহাতে কৃষ্ণকাহিনী ব্যতীত আরও অনেক কাহিনীপ্রসঙ্গ তত্ত্ব-দর্শন-ইতিহাস-কিংবদন্তী প্রভৃতি আছে যাহা মহাকাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই মালাধর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে কাব্যের রূপ দিতে গিয়া মহাকাব্যের অনুরূপ আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটা সর্বাবয়ব কাহিনী নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। কৃষ্ণলীলার আদিকাহিনী কৃষ্ণজন্ম হইতে মথুরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত,[৮] মধ্যকাহিনী মথুরায় কংসবধ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।[৯] অন্ত্যকাহিনীতে দ্বারকাপুরীতে সবান্ধবে কৃষ্ণের যাত্রা হইতে দ্বারকা ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে প্রত্যেকটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

১। আদ্যকাহিনী (বৃন্দাবনলীলা)॥ ভারাবনতা বসুমতী, ভার-হরণের জন্য মর্ত্যধামে আবির্ভূত হইতে বিষ্ণুর অঙ্গীকার, মহামায়ার যোগমায়ারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণে স্বীকৃতি, বসুদেব ও কংসভগিনী দেবকীর বিবাহ, দৈববাণী, কংসকর্তৃক বসুদেব-দেবকী কারারুদ্ধ, দেবকীর ছয় পুত্র

৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পৃ. ২১—১৮২ দ্রষ্টব্য।

৯ ঐ, ১৮২—২৩৭ দ্রষ্টব্য।

বিনষ্ট, সপ্তম গর্ভের গর্ভপাত ছলে দেবকীর জঠর ত্যাগ করিয়া রোহিণীর জঠরে স্থানলাভ, অষ্টম গর্ভে ভগবান বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপে জন্ম, নন্দালয়ে কৃষ্ণের অবস্থিতি, যশোদাগর্ভে মহামাযার জন্ম, মহামায়াকে দেবকীর কন্যা বলিয়া প্রচার, কংসকর্তৃক শিলাপটে মহামায়া নিক্ষিপ্ত, আকাশবাণী, নন্দালয়ে কৃষ্ণ লালিত-পালিত, পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ, যমলার্জুনভঙ্গ, কংসের অত্যাচারের ভয়ে গোকুল ছাড়িয়া নন্দঘোষের সপরিবারে ও সবান্ধবে বৃন্দাবন-যাত্রা, বৎসকাসুরবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুববধ, বলরামকর্তৃক ধেনুকবধ, কালিয়দমন, কৃষ্ণের দাবাগ্নিপান, প্রলম্বাসুরবধ, বস্ত্রহরণ, ব্রাহ্মণ রমণীগণ কর্তৃক কৃষ্ণবন্দনা; কৃষ্ণকর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ, ইন্দ্রের অবিরাম বারিবর্ষণ, গোবর্ধনধারণ, শরৎপূর্ণিমায রাসের অনুষ্ঠান,[১০] কৃষ্ণকর্তৃক এক গোপী পরিত্যক্ত, গোপীদের বিলাপ, গোপীদের কাত্যায়নী ব্রত, অরিষ্টাসুরবধ. কংসকর্তৃক কৃষ্ণবিনাশের মন্ত্রণা, কেশীবধ, ব্যোমাসুরবধ, কৃষ্ণ আনযনেব জন্য অক্রূর বৃন্দাবনে প্রেরিত, কৃষ্ণবলরামেব মথুরা যাত্রা।

২। মধ্যকাহিনী (মথুরালীলা)॥ কৃষ্ণকর্তৃক কংসের রজক নিধন, মালাকার কর্তৃক রাম ও কৃষ্ণের অভ্যর্থনা, কুব্জাসংবাদ, কৃষ্ণকর্তৃক কংসেব যজ্ঞভঙ্গ, রাম ও কৃষ্ণেব কংসের সভায উপস্থিতি, কৃষ্ণকর্তৃক কংসের হস্তিবধ, চাণুরবধ, মুষ্টিকবধ, কংসবধ, কৃষ্ণকর্তৃক উগ্রসেনকে মথুবার সিংহাসনদান, উগ্রসেনের সেবক হইয়া কৃষ্ণের মথুরারাজ্য পালন, জনক-জননীর সহিত মিলন, রামকৃষ্ণের সংস্কার-করণ, সান্দীপণি মুনিব নিকট শিক্ষার জন্য বলবাম ও কৃষ্ণ প্রেরিত, বিদ্যালাভান্তে মথুরায় প্রত্যাবর্তন, গোপীদিগকে সান্ত্বনা করিতে উদ্ধবকে গোকুলে প্রেরণ, গোপীদের কৃষ্ণরতি দেখিয়া উদ্ধবের বিস্ময, কৃষ্ণকর্তৃক কুব্জাব তোষণ ও কুব্জার মুক্তি, পাণ্ডবদের সংবাদ আনিবার জন্য কৃষ্ণকর্তৃক অক্রূর হস্তিনাপুরীতে প্রেরিত, কৃষ্ণবলরাম-কর্তৃক জরাসন্ধের পুরী আক্রান্ত, জরাসন্ধ নির্জিত, জরাসন্ধকর্তৃক কৃষ্ণবিনাশের ষড়যন্ত্র; মথুরা ত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলদুর্গের মধ্যে দ্বারকাপুরী-স্থাপনের জন্য কৃষ্ণবলরামের মন্ত্রণা।

১০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রাসবর্ণনায় রাধার উল্লেখ আছে

রমণি মণ্ডল মাঝে দেব নারায়ণ।
রাধার অঙ্গেতে সে অঙ্গের হেলন॥ (পৃ-১৫১)

৩। অন্ত্যকাহিনী (দ্বারকালীলা)।। বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয় গ্রহণ, কৃষ্ণের বুদ্ধিকৌশলে মুকুন্দ (মুচকুন্দ) কর্তৃক কালযবন নিপাত, মুকুন্দের কৃষ্ণবন্দনা, বলরামের রেবতী-বিবাহ, কৃষ্ণের রুক্মিণী-বিবাহের চেষ্টা, শিশুপালের সহিত রুক্মিণী-বিবাহের ব্যবস্থা, রুক্মিণীর কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ, কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, বিবাহার্থী নৃপগণ কৃষ্ণের দ্বারা পরাভূত, কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহ, কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের (কামদেব) জন্ম, রতি ও কামের পুনর্মিলন, প্রদ্যুম্নকর্তৃক সম্বরাসুরবধ, স্যমন্তক-মণির আখ্যান, জাম্ববতীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ, সত্রাজিত-কন্যা সত্যভামার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ, কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, ভদ্রা ও রাজা নগ্নজিতের কন্যাকে কৃষ্ণের বিবাহ, মৎস্য-চক্রভেদ করিয়া ভদ্ররাজার কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ, মুরদৈত্যবধ, নরকাসুর-বধ, নরকাসুরের বন্দিনী ষোড়শ সহস্র একশত রমণীকে কৃষ্ণের বিবাহ, পত্নীগণ লইয়া কৃষ্ণের দ্বারকায় অবস্থান সত্যভামার অনুরোধে পারিজাতলাভের জন্য ইন্দ্রের সহিত কৃষ্ণের বিরোধ ; বাণাসুরের কন্যা ঊষার সহিত অনিরুদ্ধের মিলন, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধকে বন্ধন, বাণের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ, মহাদেবের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণের সহিত বাণের সন্ধি স্থাপিত, অনিরুদ্ধ ও ঊষার বিবাহ, সাম্বের দুর্যোধনকন্যাকে বিবাহ, কৃষ্ণের পৌণ্ড্র বাসুদেববধ, কৃষ্ণ ও ভীম-কর্তৃক জরাসন্ধ আক্রান্ত, জরাসন্ধ নিহত, রুক্মিবধ, বজ্রনাভবধ, রামায়ণকথন, প্রদ্যুম্ন ও বজ্রনাভকন্যা প্রভাবতীর মিলন, বসুদেবের যজ্ঞ, সুভদ্রাহরণ, কৃষ্ণপুত্র সাম্বকে নারী সাজাইয়া ঋষিদিগকে প্রতারণা, ঋষিদের অভিশাপ, উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের সাধনতত্ত্ব-ব্যাখ্যান, দ্বারকাপুরী-ধ্বংস, যদুবংশ-বিনাশ, জরাব্যাধের দ্বারা বাণবিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের তনুত্যাগ।

এই কাহিনী অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, মালাধর যেরূপ নিষ্ঠাভরে মূল ভাগবতের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন, সেরূপ নিষ্ঠা ঐ যুগের আর-কোন অনুবাদকের মধ্যে পাওয়া যায় না। দুই-একটি প্রসঙ্গ বাদ দিলে কবি মূল কাহিনীকে প্রায় রেখায় রেখায় অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রায় সমগ্র অংশ এবং একাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণ-উদ্ধবের অধ্যাত্মযোগ কথন, যদুবংশ-ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তনুত্যাগের কাহিনীটুকু মালাধর গ্রহণ করিয়াছেন। এই অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধ হইতেও কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কবি কৃষ্ণের বল, প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কথাই অধিকতর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন ;

বরং কৃষ্ণের আদিরসের কাহিনীর প্রসার কিছু সঙ্কুচিত। মূল ভাগবতের দশম স্কন্ধের মোট আটটি অধ্যায়ে (২১, ২২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, অধ্যায়) গোপীপ্রসঙ্গ এবং ঐ আটটি অধ্যাযের অন্তর্গত পাঁচটি অধ্যাযে (২৯, ৩০, ৩১, ৩২ ৩৩ অধ্যায়) বিস্তারিত আকারে রাসলীলা বর্ণিত হইযাছে। মালাধর কিন্তু গোপীপ্রসঙ্গ এবং রাসলীলা ঈষৎ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। কাহিনীটি পাঠ করিলে, এবং ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের বিস্ময়কর গ্রন্থনিপুণতা বিচার করিলে, কবি যে পাঁচালী শুনিযা কাব্য রচনা করিযাছিলেন, তাহা মনে হইবে না। তিনি মূল ভাগবতের সতর্ক পাঠক ছিলেন। অবশ্য কোন কোন পুঁথিতে ভাগবতবহির্ভূত রাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তারিত বর্ণনা থাকিলেও তাহা মালাধরেব রচিত নহে, পরবর্তী কালের লিপিকার ও গাযেনদের সংযোজনা হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিজযের পুরাতন পুঁথিতে ঐ পালাগুলি পাওযা যায় না। মালাধর সাধাবণতঃ ভাগবতের কাহিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবতবহির্ভূত লৌকিক রাধাকৃষ্ণলীলাকে তিনি এতটা প্রাধান্য দিবেন, তাহা মনে হয় না। রাধাব উল্লেখ করিতে হইলে, যেখানে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ কোন এক গোপীকে ত্যাগ করিয়া চলিযা গেলেন, এবং সেই গোপী বিলাপ করিতে লাগিল, সেই পবিত্যক্তা গোপীকে কবি রাধা বলিযা উল্লেখ করিতে পারিতেন। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত কবিলে অযৌক্তিক হইবে না যে, মালাধব বসু শ্রীকৃষ্ণবিজযে ভাগবতের আক্ষবিক অনুবাদ না কবিলেও কাহিনীসংস্থাপনে প্রধানতঃ ভাগবতকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ।।

শ্রীচৈতন্য অকুণ্ঠভাষায মালাধরের প্রশংসা কবিযাছেন বটে, কিন্তু সে প্রশংসা কবির ভক্তিনত মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য যতটা বর্ষিত হইয়াছে, কবির শিল্পচাতুরীর জন্য বোধহয ততটা নহে। 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই একটি বাক্যেই চৈতন্যদেব কুলীনগ্রামের বসুবংশের কাছে বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায ভক্তের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাব্যবিচারের সাধারণ মাপকাঠি লইয়া বিচার করিলে মালাধরের রচনাশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় বলিযা মনে হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, মালাধর সর্বোপরি ভক্ত, তাহার পরে কবি। কিন্তু যাঁহার উপর কবিত্বশক্তির প্রসাদ বর্ষিত হয়, তিনি ভক্তই হউন, আর নাই হউন, রচনাতে কবিত্ব আত্মপ্রকাশ করিবেই।

উপরন্তু কবি মালাধর ঠিক ভাববিহ্বল ভক্তির দ্বারা উচ্ছ্বসিত হন নাই, একটা সংযত শাস্ত্রমার্গীয় শান্তরসাস্পদ ভক্তির প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ভাববিহ্বলতার জন্য কবিত্ব সুপ্রকাশিত হয় নাই, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। আমাদের অনুমান, ভাগবতের কাহিনীটিকে বাংলা পয়ারত্রিপদীর বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য তিনি যতটা ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কবিত্বপ্রকাশের জন্য বোধহয় ততটা সচেতন ছিলেন না।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, কবি মূল ভাগবতের কাহিনীকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিলেও স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সংযোজনা বা মূল ঘটনাকে পরিবর্তিত করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। অবশ্য মূলের গাম্ভীর্য ও রচনাসৌকুমার্য তাঁহার মধ্যে আশা করা যায় না। নিম্নে মূল ভাগবতের কিয়দংশ এবং মালাধরের অনুরূপ রচনা হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ৪৩ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক)

অনু: তখন অগ্রজের সহিত রঙ্গে প্রবেশ করিলে তিনি মল্লগণের পক্ষে বজ্র, মানবগণের পক্ষে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, রমণীগণের পক্ষে মূর্তিমান্ কন্দর্প, গোপগণের পক্ষে স্বজন, দুরাত্মা মহীপালদিগের পক্ষে শাসনকর্তা, তাঁহার আপন পিতামাতার পক্ষে শিশু, ভোজপতির পক্ষে মৃত্যু, অজ্ঞগণের পক্ষে জড়, যোগিগণের পক্ষে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম দেবতারূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। (পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত)

মালাধরের বর্ণনা—

হাসিতে হাসিতে দুহেঁ করিল গমন।
সেই কালে নানা মুর্ত্তি ধরে নারায়ণ।।
মল্ল সব দেখে যেন বর্জ্জের সমান।
ধার্ম্মিক রাজা দেখে সুন্দর মূর্ত্তিমান।।
স্ত্রিগণ দেখে জেন অভিনব মদন।
নন্দ আদি গোপ দেখে জেন সিসুগণ।।
রাজা সব দেখে জেন দণ্ড হস্তে কাল।
বসুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওাল।।
প্রাণ নিতে জম আসে দেখে কংস রাএ।
জোগিসিদ্ধগণ দেখে জোগসিধ্যামএ।।

জদুবংস বৃষ্টীবংস দেখিল তথাই।
কুলের পৃদিপ মোর সুন্দর কানাঞি ।।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ. ২০২-২৩)

এখানে লক্ষণীয় যে, মূল সংস্কৃতের ভাষাগাম্ভীর্য মালাধরের রচনায় প্রায় নাই বলিলেই চলে, তাহা সম্ভবও নহে। তদানীন্তন দুর্বল বাংলা ভাষায় মেঘস্তনিত সংস্কৃত বাক্স্পন্দন ফুটাইয়া তোলা অতিশয় দুরূহ, সন্দেহ নাই। তবে স্নিগ্ধ কোমল বর্ণনার স্থলে কবি কথঞ্চিৎ সিদ্ধকাম হইয়াছেন, ভাষার মধ্যে শিল্পসুষমারও কিঞ্চিৎ স্পর্শ পাওয়া যায়। ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের রাসলীলার প্রারম্ভে সমাগত গোপীদিগকে কৃষ্ণ স্বামীব কাছে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলে তাহাবা অভিমানে বলিল :

"পতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক ; তাহাদিগকে লইয়া কি হইবে ? অতএব হে পরমেশ্বর ! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন ! অনেক দিন হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন করিও না। আমাদিগের যে চিত্ত যে করদ্বয় এতকাল স্বচ্ছন্দ গৃহকার্যে রত থাকিত, সুখস্বরূপ তুমি তাহা হরণ করিয়াছ। তোমার পাদমূল হইতে চরণযুগল একপদও চলে না। অতএব ব্রজে কি করিয়া গমন করি ? কি-ই বা করিব ? তোমার হাস্যময় দৃষ্টি ও মধুরগীতে যে মদনাগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি তোমার অধর-সুধাধারা সেবনদ্বারা প্রশমিত কর।...হে পুরুষরত্ন, আমাদিগকে দাসী হইতে দাও। (পঞ্চানন তর্করত্ন-অনূদিত)

ইহার সহিত মালাধরের নিম্নোদ্ধৃত ছত্রকযটি তুলনা করিলে গুণরাজের কবিত্বশক্তি নিতান্ত দুর্বল বলিয়া মনে হইবে না :

ছাড়িয়াত স্মামি পুত্র তেজি বন্ধু জন।
তোমাকে দেখিতে প্রাণ জাউক এখন ।।
ছাড়ে ছাড়ুক স্মামি তারে নাহি বেথা।
তোমার বিপ্রিয় বোল সুনি মনকথা ।।
কি লাগি নিঠুর এত বল চক্রপাণি।
তোমাকে ভজিয়া মনে তেজিব পরাণি ।।
জম্মে জম্মে পাই যেন তোমার চরন।
তুমি স্মামি তুমি পুত্র তুমি বন্ধুজন ।।
না জাইব কেহো ঘর সব গোপনারী।
অধম অমৃত দিয়া জিয়ায় শ্রীহরি ।।

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৮-৪৯)

মালাধর বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধেয় ভক্তকবি বলিয়া গৃহীত হইলেও সাধারণ পাঠক কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় পাঠকালে মাঝে মাঝে ধৈর্য হারাইয়া ফেলিবেন। বৃন্দাবনলীলা তবু উপভোগ্য, কিন্তু মথুরা ও দ্বারকালীলা বর্ণনায় কবির কবিত্বশক্তি যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। বাস্তবিক কবি যে-পরিমাণে ভক্তিপ্রকাশে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই পরিমাণে রচনা-সৌকুমার্যের প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। তথাপি ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যশোদার গর্ভে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিয়া নবজাতার মতোই কাঁদিতে লাগিলেন ঃ

উঙা উঙা করিয়া কান্দএ কন্যাখানি।
চিযাইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি॥

এখানে 'উঙা উঙা' শব্দে নবজাত কন্যার ক্রন্দন মানবীয় রসে সিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল অদর্শনেব পর যশোদার সহিত পুত্র কৃষ্ণের মিলন হইলে অভিমানিনী মাতার উক্তি—

তবে আসি যশোদা কৃষ্ণ কোলে করি।
কান্দিতে কান্দিতে বলে সুনহ শ্রীহরি॥
কেমতে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন।
কেমতে পাসরিলে তুমি গোপগুপিগণ॥
কেমতে পাসরিলে তুমি গোকুল নগরী।
কেমতে পাসরিলে সেই গোবর্দ্ধন গিরি॥
কেমতে পাসরিলে তুমি নদি সে জমুনা।
কেমতে পাসরিলে বাপু আমা দুই জনা॥

এই শেষ পংক্তিটিতে নিরাভরণ প্রাণের অভিযোগ বাৎসল্যরসকে আশ্রয় করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের তৃণক্ষেত্রে এইরূপ দুই-একটি স্রোতোধারার সাক্ষাৎ নিতান্ত বিরল নহে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বে গোপীগণের যে হাহাকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি লক্ষ্য করা যায় ঃ

আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরুমূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥

কৃষ্ণ গেলেঁ থাকিয়া সখী আর কিবা কাজ ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ ॥
অন্য ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে ।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে ॥ [১১]

মালাধর রচনার বিশেষ পারিপাট্য দেখাইতে পাবেন নাই, যদিও পযারত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হইযাছে, তবু তাহা স্বচ্ছন্দ ও কাব্যবসসিক্ত নহে। ববং বড়ুচণ্ডীদাসেব অনেক পংক্তি কাব্যগুণে প্রশংসনীয। কেদাবনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ শ্রীকৃষ্ণবিজযেব মুদ্রিত সংস্কবণেব ভূমিকায লিখিয়াছিলেন। "এই গ্রন্থেব ভাষা অলঙ্কৃত নয, ইহাব পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয নাই। চৌদ্দ অক্ষবের পযাবেব অনেক স্থলে ষোল সতব অক্ষব বা বাব-তেব অক্ষব দেখিতে পাওয়া যায়।" এ কথা অযথার্থ নহে। যদিও মালাধব ইহাতে কিছু কিছু অলঙ্কাব ব্যবহাব কবিযাছেন, কিন্তু বচনাভঙ্গিমাব মধ্যে বিশেষ কোন শিল্প-কৌশল লক্ষ্য কবা যায না। পয়াবেব পংক্তিতে যে অক্ষবসমতা নাই, তাহা মালাধবেব একাব অপবাধ নহে। মধ্যযুগেব প্রায সমস্ত কাব্যেই এইরূপ ছন্দ-বৈষম্য আছে। কাব্যগুলি প্রধানতঃ গান কবা হইত, দ্বিতীযতঃ পযাবচ্ছন্দ সুব কবিযা পড়া হয। সুতবাং মাত্রাব হ্রাসবৃদ্ধিতে তান বা সুবেব কোন বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে না। এইজন্যই মধ্যযুগীয বাংলা কবিতাব ছন্দে মাত্রাগত বিশৃঙ্খলা ঘটিযাছিল, অবশ্য সে ছন্দপতন অধুনা সুববর্জিত পাঠেই ধবা পড়ে, সে যুগে গান পাঁচালীতে কোন ত্রুটি দেখা যাইত না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয অনুসন্ধান কবিলে কিছু কিছু অলঙ্কাবকৌশল প্রত্যক্ষ কবা যাইবে। নিম্নে এইরূপ কযেকটি অলঙ্কাবপ্রযোগেব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল ঃ

১। চিয়াইযা জসোদা পুত্র দেখি পাসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন উদয আকাসে ॥

২। লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি।
গিরিসম স্কন্ধ নাসিকা দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥ (পুতনার বর্ণনা)

৩। পুণিমার চাঁদ জিনি বদন কমল।
খঞ্জন জিনিঞা শোভে নয়ান জুগল ॥

* * *

[১১] এই ছত্রগুলি সব পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

পিতবস্ত্র পরিধান দেখ বনমালি।
নুতন মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি ॥

৪। চৌদিকে গোপিনিগণ মদ্ধে নন্দবালা।
পুন্নিমার চাঁদ জেন উদয় সোলকলা ॥

৫। গারড়ের হেন জুদ্ধ মাথে মাথে করি।
বুকে বুকে রাক্ষসি ছন্দ অবতরি ॥ (চানুর ও কৃষ্ণের যুদ্ধ)

৬। কুটিল কুন্তল সোম্ভে মস্তক উপরে।
আকাশ মণ্ডলে জেন রাহু সসোধরে ॥ (রুক্মিণীর রূপবর্ণনা)

৭। অচেতন হৈয়া দেবি পৃথুবিতে পড়ে।
কদলির গাছ জেন পড়ে অল্প ঝড়ে ॥ (রুক্মিণীপ্রসঙ্গ)

এখানে লক্ষণীয়, কবি প্রায়শঃই উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন; অধিকাংশই সংস্কৃত অলঙ্কারের বাংলা রূপান্তর মাত্র। ইহার মধ্যে দুইটি বর্ণনাতে (২ ও ৫ সংখ্যক উদ্ধৃতি) বাঙালীজীবনের ছায়া পড়িয়াছে এবং কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধা পথ ত্যাগ করিয়া পরিচিত জীবনের মধ্যে নামিয়া আসিয়া উপমা নির্বাচন করিয়াছেন। অবশ্য ঈষৎ পূর্ববর্তী কবি বড়ুচণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনাশক্তি ও অলঙ্কারনৈপুণ্য যে মালাধর অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মালাধর কবিত্বশক্তিতে বড়ুচণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সমকক্ষ নহেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। কোন কোন সমালোচক শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাগ্‌ভঙ্গিমার প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।[১২] মালাধরের কোন কোন পংক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যায়। যথা—

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১। নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে।
২। আউটহাত প্রমাণ আমার কলেবরে।
৩। সম্মুখে আনিয়া তারে ভেটি দেয় কোল।
৪। অপনা চিহ্নয়া দেহ বস্ত্র অলঙ্কার।

[১২] ডক্টর সুকুমার সেন—বিচিত্র সাহিত্য, প্রথম খণ্ড

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১। তিরীবধ দিব কাহ্নাঞি তোহ্মার উপরে।
২। আহুট হাত কলেবর তোর।
৩। ভিড়ি দেহ আলিঙ্গন দানে।
৪। আপনা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে।

শুধু এইরূপ বাক্যগত মিল নহে, দুই কাব্যের মধ্যে বাক্যাংশ বা শব্দগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়

১। সর্বাঙ্গে সুন্দরী রামা গরুয়া নিতম্ব।
২। কৃষ্ণকে চাহিয়া বুলে সব গোপীগণে।
৩। মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাঁচসাত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১। গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিত্তমানে।
২। বাপ নন্দঘোষ চাহিআঁ বুলে।
৩। বেহু রাধা মনত গুণসি পাঁচসাত।

ইহাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাগ্‌ভঙ্গিমা শ্রীকৃষ্ণবিজয়কেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইহা সত্য হইলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়েব পূর্বে রচিত তাহা এই সাদৃশ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায়। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কাবণ নাই। উক্ত বাক্য বা বাক্যাংশগত মিলগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ জাতীয় বাক্‌রীতি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষারই বাগ্‌ভঙ্গিমা বিশেষ। কৃত্তিবাস প্রভৃতির প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তাঁহাদের পুঁথিতে ঐরূপ বাক্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিতেছে না। বরং বলা চলিতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে যে-জাতীয় বাগ্‌ধারা পুঁথিতে ব্যবহৃত হইত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে; একের ভাষাভঙ্গিমা অপরকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহা মনে হয় না।

মালাধর বসুর বাঙালী-মনোভাব ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য হিসাবে তাদৃশ উৎকৃষ্ট না হইলেও ইহাতে বাঙালী মনোভাবের বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া ইহার অন্য আর-এক প্রকার মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। মালাধরের গ্রন্থই প্রথম পুরাণানুবাদ বা অনুসরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঠিক পুরাণশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বাঙালী এই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবসমাজের প্রধান গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত পরিচিত হইয়াছে এবং প্রাক্‌চৈতন্য যুগে বাংলার বৈষ্ণবমনোভাব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে এই গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে রাগানুগা প্রেমধর্ম অপেক্ষা কৃষ্ণেব ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্যগোচর হইবে। ভাগবতেও কৃষ্ণের প্রতাপান্বিত বিবাট ব্যক্তিত্ব এবং ভক্তিরসাশ্রিত আবেগোচ্ছল মূর্তি—উভয়ই পূর্ণ স্বরূপে চিত্রিত হইয়াছে; তবে ভাগবতের বারটি স্কন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যগুণান্বিত স্বরূপটিকেই অধিকতর প্রধান বলিয়া মনে হইবে। মালাধরের এই কাব্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকা লীলার মধ্যেও ঐশ্বর্যমূর্তির গুরুত্বই সমধিক পরিলক্ষিত হইবে। যিনি শাস্তা, পাতা,—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যাঁহার নরোত্তম হইবাব একমাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহার বল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যই যে অধিকতর প্রাধান্য পাইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্তু ভাগবত অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণবিজয়েই কৃষ্ণের প্রতাপের রূপটি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। রাস, গোপীলীলা প্রভৃতি আদিরসাশ্রিত বর্ণনাকে মালাধর অনেকটা সঙ্কুচিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মূল ভাগবতে এই অংশগুলি বিস্তৃততর রূপে বিবৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তদানীন্তন সমাজমানসকেই নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। মুসলমান অভিযানের প্রবল বন্যা সরিয়া গেলে বাঙালী হিন্দুসমাজ প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একজন বলিষ্ঠ ও বীর্যবান নরোত্তমের আদর্শ খুঁজিতেছিল। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ঐশ্বর্য ও প্রতাপের মধ্যে বাঙালীজাতি সেই জাতীয় বীরকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মালাধরও এই সামাজিক পরিবেশে বর্ধিত হইয়া নিজেও যেন একটা আদর্শ বীর্যবান্‌ চরিত্রাঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছিলেন। সুতরাং এই সমস্ত সমালোচকের মতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা অধিকতর বিকাশ লাভ

করিয়াছে, তাহার কারণ—সেই যুগের সমাজপরিবেশ ও বাঙালীর বাসনা ঐরূপ চরিত্রই চাহিতেছিল।

এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, তৎকালীন বাংলা সাহত্যকে এইরূপ সমাজ-সচেতন পরিপ্রেক্ষিতে অসংশয়ে স্থাপন করা যায় কি-না সন্দেহ। ইতিপূর্বে আমরা একাধিক স্থলে দেখাইয়াছি যে, সমাজচৈতন্য নামক যে-জাতীয় মনোভাবের দ্বারা অধুনা আমরা শিল্পসাহিত্য বিচার করিতেছি, তাহা আধুনিক কালের সামগ্রী। মালাধরের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্রের প্রেমের দিক অপেক্ষা ঐশ্বর্যের দিকটি অধিকতর বিকশিত হইয়াছে। ভাগবতে ঐশ্বর্যমিশ্র লীলাই প্রধান; মালাধরও সেই ভাগবত অনুসরণ করিয়াছিলেন; কাজেই তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণের মাধুর্যরূপ অপেক্ষা ঐশ্বর্যরূপের অধিকতর প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। উপরন্তু আমরা কৃষ্ণের যে মাধুর্যলীলার কথা বলিয়া থাকি, তাহার অনেকটাই চৈতন্য-পারিষদগণের পরিকল্পনা। মালাধরের কাব্যে তাহা আশা করা যায় না। যদি সমাজ প্রয়োজনকেই এত প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রায় সমকালে বা ঈষদ্ পূর্বে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণেই-বা রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যবীরত্ব অপেক্ষা ভক্তির রূপটি অধিকতর প্রাধান্য পাইল কেন? সাহিত্যে সমাজচৈতন্যই যদি একমাত্র প্রভাব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কৃত্তিবাস বাল্মীকির পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ রামচন্দ্রকে ভক্তের ভগবানে রূপান্তরিত করিয়াছেন কেন? রামচন্দ্রকে তিনি সহজেই নির্জিত বাঙালীর আদর্শপুরুষ-রূপেই তো অঙ্কন করিতে পারিতেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কৃষ্ণচরিত্রের ঐশ্বর্যবীর্যের জন্য মূল ভাগবতকেই দায়ী করা যায়, তৎকালীন বাঙালীর সমাজমানসের অবিকল প্রতিফলন বলিয়া ইহাকে পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না।

অবশ্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু স্থলে কবির বাঙালী-মনোভাব ধরা পড়িয়াছে। কবি বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে বাঙালী, তাহা তিনি অজ্ঞাতসারেই রচনার মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন; —যেমন অন্নপানের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের বহু স্থলে ভাত খাইবার বর্ণনা আছে। যশোদা ক্রীড়ারত শিশু কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ভাত খায়্যা পুনরপি খেলাহ আসিয়া।" বৃন্দাবনে গোচারণে গিয়া কৃষ্ণ অন্যান্য গোপ-বালকদিগকে "সব ছাওালে ভাত কৃষ্ণ বাঁটিয়াত দিল।" ঋষির যজ্ঞে ক্ষুধাতুর গোপবালকগণ ভাত চাহিয়া বিফলমনোরথ হইল, "না সুনিল বোল কেহো না দিলেক ভাত।"

এই কাব্যের আরও নানা স্থানে বাঙলার তদানীন্তন দেশকালের ছায়াপাত হইয়াছে। কৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিলে বিদীর্ণদেহ দানব ভূমি আশ্রয় করিল, "ফুটি কাঁকুড়ি জেন হৈল খান খান।" এই 'ফুটি-কাঁকুড়ে'র উপমা বাঙালীর বাস্তব জীবন-পরিবেশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মথুরার যে মালাকর কৃষ্ণকে পুষ্পমাল্য দান করিয়াছিল, সে কৃষ্ণের বরে 'জলচল' জাতি হইল—

উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে।
জল আচরএ জেন সংসার ভিতরে ॥

এখানে বাঙলা দেশের 'জলচল' ও 'জল-অচল' শূদ্রসমাজের কথা ইঙ্গিতে বলা হইয়াছে।

মথুরায় কৃষ্ণ দেখিলেন, "গোয়ানারিকেল দেখি দুয়ারে দুয়ারে।" রুক্মিণীর স্বয়ংবরসভায় বিদর্ভরাজ কৃষ্ণকে কন্যা রুক্মিণী দান করিতে চাহিলে জরাসন্ধ জাতিপাঁতি তুলিয়া বলিলেন ঃ

তুমিত বংসজ রাজা জগতে ঘোষএ।
তারে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লএ ॥

এখানেও কুলপঞ্জিকাকারদের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করা যাইতেছে।

কাব্যসমাপ্তিতে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

ম্লেচ্ছ জাতি রাজা হব অধর্ম্ম পালিব।
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব ॥

ইহা কি তৎকালীন পাঠান-শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ করিতেছে?

কবি বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনাকালে তুলসী, মালতী, জাতি, পদ্ম, কনকচাঁপা, কুমুদ প্রভৃতি পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃক্ষবর্ণনাতেও আমলকী, বাসক, নারিকেল, তমাল, রামগুয়া, পাকুড়, তাল শিমুল, পলাশ, গুয়া, জলপাই, কামরাঙা, রক্তচন্দন, অর্জুন, খর্জুর, অশ্বত্থ, হেন্তাল প্রভৃতি বাঙলা দেশের পরিচিত বৃক্ষলতাকে স্মরণ করিযাছেন। রুক্মিণীস্বয়ম্বর-সভায় বিদর্ভরাজও "দ্বারে দ্বারে কলা রুইল গোবাক স্থন্দর।" বাঙলা দেশের গাছপালা, লতা-পাতার দ্বারা কবি যদি বৃন্দাবন-মথুরা দ্বারকাপুরীকে সজ্জিত করিতে চাহেন, তাহাতে কাহারও বিশেষ আপত্তি হইবার কথা নহে। কৃত্তিবাসপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, রামায়ণের কবি বাঙলা দেশের পটভূমিকাকে অনেক স্থলেই

অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন ; ঠিক সেইরূপ মালাধরও কৃষ্ণকাহিনী-বর্ণনার সময় বাঙলা দেশের পরিবেশ ভুলিতে পারেন নাই ।।

মালাধরের ভক্তিবাদ ॥

এই প্রসঙ্গে মালাধরের ভক্তিনত মানসবৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা দেশে কৃষ্ণভক্তের অপ্রাচুর্য না থাকিলেও তখনও কোন ধর্মপ্রণালী ও মতবাদ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে যে-ভক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা ভাগবতে-বর্ণিত বৈধীভক্তি, আত্মনিবেদনমূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণবভক্তি নহে। যখন তিনি বলেন,

কৃষ্ণের চরিত্র নর সুন একমনে।
কলিঘোর তিমির করিতে বিমোচনে ॥
হেন কথা শুনিবারে না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা ॥

অথবা যখন যমরাজ সবিনয়ে কৃষ্ণকে বলেন :

তোমার স্রীজিত স্রীষ্টি তুমি অধিকারী।
আমার সকতি কীছু করিতে না পারি ॥
কর্ম্মসূত্রে আইসে জাএ জত কর্ম্ম করে।
সাক্ষিরূপে আমা এড়িয়াছ গদাধরে ॥

তখন শাস্ত্রমার্গীয় ভক্তির বাঁধাপথ অনুসরণ করেন। এই সমস্ত বর্ণনায় প্রাকচৈতন্যযুগের সাধারণ ভক্তির আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, অনুরাগমূলক গৌড়ীয় ভক্তির আদর্শের সহিত ইহার স্বরূপলক্ষণগত পার্থক্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে কৃষ্ণলীলা অবসানের পর মর্মাহত অর্জুনকে প্রদত্ত ব্যাসদেবের উপদেশটিও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে বিবৃত নীতিকথার অনুরূপ—

সর্ব্বভূত সম হরি সর্ব্বধর্ম্ম ময়।
সভার আকৃতি হরি উতপতি প্রলয় ॥
তিহোঁ তেজ তিহোঁ বল তিহোঁ পরাক্রম।
সভাকার আত্মা তিহোঁ তিহোঁ নারায়ণ ॥
নির্গুণ নির্লেপ তিহোঁ অক্ষয় আনন্দ।
স্থুল মোক্ষ (সূক্ষ্ম ?) সব তিহোঁ প্রকাসে স্বচ্ছন্দ ॥

সংসার কারণ তিহোঁ তাঁহার সংসার।
তাঁহা হৈতে হয় সৃষ্টি তাহাঁ হৈতে সংসার॥
* * *
কারে কেহো নাহি জিনে কারে কেহো নাহি মারে।
কালরূপ হরি সভার ভালমন্দ করে॥
তাহার মায়াএ বদ্ধ সকল সংসার।
তাঁহারে ভাবএ জেই ভক্ত সেই তাঁর॥

উদ্ধব ও কৃষ্ণের কথোপকথন পুরাপুরি ভাগবতাশ্রয়ী, এখানেও কবি বিশুদ্ধ প্রেমমূলক ভক্তি ও আচরণমূলক তত্ত্বদর্শনের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য দুই-এক স্থলে তাঁহার বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়টি স্নিগ্ধমাধুর্যমণ্ডিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-প্রকাশিত সংস্করণের শেষে আছে—

দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥

ইহার সুর উত্তরচৈতন্য যুগের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করাইয়া দেয়।

মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় পরবর্তী কালের ভাগবত অনুবাদকদিগকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। যদিও পরচৈতন্য যুগে রাগানুগা ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যাহার ফলে ভাগবতগ্রন্থের জনপ্রিয়তা কিছু খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি মালাধরের গ্রন্থখানির সাহায্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুরাণের সহিত বাঙালী পরিচিত হইতে পারিয়াছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্বে যেমন মাধবেন্দ্রপুরী বাঙলা দেশে ভাগবত প্রচার করিয়া বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনে নূতন ইতিহাসের আভাস দিয়াছিলেন, সেইরূপ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও চৈতন্যদেবের পূর্বেই পশ্চিম বাঙলার জনসমাজে ভাগবতবর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। অবশ্য তাহার পূর্ব হইতেই বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীলার যথেষ্ট সমাদর ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পূর্বচৈতন্যযুগের বৈষ্ণবীয় ধর্মচেতনার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে এই পুঁথিতে বহু হস্তক্ষেপ হইয়াছে; সেই হস্তক্ষেপের অর্থ—পরবর্তী কালের রাগানুগা মতবাদের অনুপ্রবেশ। অর্বাচীনকালের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পুঁথিতে যে রাধাকৃষ্ণলীলা এত প্রধান্য পাইয়াছিল, তাহার কারণ স্বরূপ চৈতন্য-প্রভাবান্বিত রাগমার্গীয় বৈষ্ণবসাধনাকে নির্দেশ করা যাইতে পারে। অবশ্য বাঙলা দেশে বহু পূর্ব হইতে রাধাকৃষ্ণকাহিনী লোকজীবনেও

সুপ্রচলিত ছিল। কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড প্রভৃতি এই জনজীবন হইতেই উত্থিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাহা বিবৃত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পরবর্তী কালের পুঁথিতেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের মূল পুঁথিতে সম্ভবতঃ রাধাপ্রসঙ্গ একেবারে ছিল না।

বাঙলা দেশে চৈতন্য-পূর্ববর্তী বৈষ্ণবধর্মকথা ও আদর্শ জানিতে হইলে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সাহায্য যে অবশ্যগ্রহণীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার

॥ ১ ॥

নানা কথা

খ্রীষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুই শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা প্রাচীনত্ব ত্যাগ করিয়া নূতন পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে। চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে একটা ভাষাতাত্ত্বিক ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রসঙ্কট বা যে-কোন কারণেই হউক, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা ভাষার বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। যদি এই সময়ের মধ্যে রচিত বাংলা রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইত, তাহা হইলে চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী বাংলা ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইত। উপরন্তু এই দুই শতাব্দীতে বাঙালী কোন্ ধরনের সাহিত্য রচনা করিয়াছিল তাহারও একটা নির্দেশ পাওয়া যাইত। আমাদের অনুমান, সেনবংশের প্রভাবের ফলে বাঙালী অভিজাতসমাজ ও মধ্যস্তরে সহজিয়া বৌদ্ধসাধনা সম্ভবতঃ অপাংক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিল। শৈব নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের আদিম রূপ এবং বৈষ্ণবপদ বা অনুরূপ কিছু হয়তো এই যুগে রচিত হইয়াছিল। পরে এই শাখাগুলি, বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। সেনবংশের ছায়াতলে বাঙলা দেশে পৌরাণিক সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই আমাদের অনুমান, এই দুই শত বৎসরে রামায়ণ-মহাভারত অথবা অন্যান্য পুরাণ-উপপুরাণের ঘটনা ও জীবনাদর্শ বাঙালী-সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিল। তবে এ সমস্ত আমাদের অনুমান মাত্র এবং সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাণযোগ্য উপাদান না পাইলে শুধু অনুমানের উপর সাহিত্যসৌধ নির্মাণ করা যায় না।

খ্রীষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দী অর্থাৎ পাঠানশাসন সুদৃঢ় হইবার সময় হইতে চৈতন্যাবির্ভাব পর্যন্ত—প্রায় দুই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে

স্পষ্টতঃ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবসাহিত্যের সার্থক পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাপতি বাঙালী না হইলেও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তিনি এবং তাঁহার পদাবলী ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়া তাঁহাকে আলোচনা হইতে বাদ দিবার উপায় নাই। এই সময়ে বাংলা ও মিথিলার ভাগবত ও গীতগোবিন্দের প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী কিয়ৎপরিমাণে লৌকিক ঐতিহ্য হইতে রস সংগ্রহ করিলেও তিনি প্রধানতঃ বিদগ্ধ নাগরিক মনের কবি। অপরদিকে, বড়ুচণ্ডীদাস গ্রামীণ আদর্শকেই কাব্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাস ভাগবতের ভাব-ধারার দ্বারা কিয়দংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দ দুই জন কবির উপরেই প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে সেনবংশ বিতাড়িত হইলেও, লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় যে বৈষ্ণব আদর্শ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহাই এই দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিল এবং শুধু দ্বিতীয় পর্বেই নহে,—চৈতন্যাবির্ভাবের পর প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া এই বৈষ্ণব আদর্শ ও সাহিত্য বাঙলা দেশের আধিমানসিক জীবন নিয়ন্ত্রণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের দ্বারা পুরাণপ্রভাবের স্বরূপ অনুভূত হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া গৃহীত হইলেও বাঙলা দেশে এই দুই মহাকাব্য প্রায়ই পুরাণের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে। কৃত্তিবাসের পুরাতন পুঁথি পাওয়া না গেলেও শুধু এইটুকু বোধগম্য হইবে যে, বাঙলা দেশে মধ্যযুগে পুরাণ ও উত্তরভারতীয় আর্যসংস্কৃতির প্রভাব জনমানসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইসলাম আক্রমণের প্রথম আঘাত হ্রাস পাইবার অন্ততঃ দুই শতাব্দী পরে বাঙালীসমাজ আবার আধিমানসিক সংস্কৃতির কথা ধীরভাবে ভাবিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। চৈতন্যের জন্মের পরে হুসেনশাহী যুগে বাঙলায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেও অন্ততঃ ইহার এক শতাব্দী পূর্ব হইতে এ দেশে রাষ্ট্রশৃঙ্খলার সূচনা হইতেছিল এবং তাহার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন বাঙালীসমাজ নিশ্চয় নূতন করিয়া জাতি ও জীবনের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইসলাম ধর্মের অভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে স্মৃতিসংহিতা-পুরাণ প্রভৃতির অনুশীলন

প্রয়োজন ; তাই বোধহয় খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতেই উত্তরাপথের পুরাণকেন্দ্রিক ও স্মৃতিশাসিত জীবনসাধনা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। বাঙলা দেশের অন্তস্তল দিয়া যে গ্রামীণ আদর্শের ধারা বহমান ছিল, তাহা অবশ্য মধ্যযুগে বাঙালী-মানস হইতে একেবারে অপসৃত হইয়া যায় নাই। পূর্বোল্লিখিত পুরাণ প্রভাবের সঙ্গে এই গ্রামীণ প্রভাবও বাঙালী-সমাজের আর একটি দিককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। বড়ুচণ্ডীদাসের যে রুচির জন্য আমরা কবিকে দুষিয়া থাকি, মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়াদের রাগাত্মিকা পদ, বাউলগান প্রভৃতির মধ্যে তাহাই জটিল ও মিশ্র রূপে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে।

আলোচ্য পর্বের দুই শত বৎসরের সাহিত্যকে কী পরিমাণে নাগরিক সাহিত্য বলা যায় তাহা সামান্য আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। এই যুগে একমাত্র বিদ্যাপতিই রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন কৃত্তিবাস কোন-এক গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়াছিলেন এবং অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন ; মালাধর বসু বোধহয় গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বরবক শাহের নিকট উপাধি লাভ করিযাছিলেন ; কোন কোন মতে তিনি গৌড়েশ্বরের কর্মচারী ছিলেন, তবে এ সম্বন্ধে এখনও সংশয় আছে। সে যাহা হউক, কৃত্তিবাস ও মালাধব কেহই রাজসভাজীবী কাব্যাদর্শ ও নাগরিক মনোভাবের অধিকারী ছিলেন না। বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে এই পর্বের অন্য কোন কবিকে নাগরিক কবি বলা যুক্তিসঙ্গত নহে।

॥ ২ ॥

সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় সাহিত্য এবং আলোচ্য পর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার যৌক্তিকতা আছে কি না, সে বিষয়ে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন। তদানীন্তন ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের যে বিপুল বিস্তার, রচনার যে অযুত ঐশ্বর্য এবং বিষয়বস্তুর যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার কণামাত্রও কি ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়? বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু

—মোট চারি জনের কাব্য ও পদাবলী এই দুই শতকের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ। এই স্বল্পপরিমিত সাহিত্য তদানীন্তন য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতা করা দূরে থাক, তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য কীভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপসন্ধানের জন্যই আমরা বাংলা ও সমকালীন ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের তুলনামূলক পরিচয় লইতেছি।

প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের কথা ধরা যাক। খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল; তবু এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ইংরেজী সাহিত্যে কাব্য, নাটক ও গদ্য রীতিমত অনুশীলিত হইত। 'শতবর্ষের যুদ্ধে' (১৩৩৮-১৪৫৩ খ্রীঃ অঃ) ফরাসী ও ইংরেজ জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংঘর্ষ চলিযাছিল। ফরাসী-সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ ইংরাজের দ্বারা অধিকৃত দেশের অংশ পুনরধিকার করিয়া লইলেন। ব্ল্যাক প্রিন্সের অকাল-মৃত্যু হইল, 'ব্ল্যাকডেথ্' বা মহামারীতে (১৩৪৭-৪৯ খ্রীঃ অঃ) লণ্ডনের এক-তৃতীযাংশ লোক প্রাণ দিল;—সর্বোপরি দ্বিতীয় রিচার্ডের ব্যর্থ শাসনের ফলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রে ও সমাজে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়া আসিল। আবার এই সময়ে (১৩৮১ খ্রীঃ অঃ) কেণ্টের কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই কাব্যে চসার, ল্যাংল্যাণ্ড ও গাওয়ারের আবির্ভাব হইল। ধর্মজগতে যুগান্তর সূচনা করিলেন উইক্লিফ। এমন কি, এই সময়ে ইংরেজীতে নাটকাভিনয়ও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

চসার প্রথম জীবনে লাতিনে লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যজীবনের প্রথমাংশে লাতিন, দ্বিতীয়াংশে ফরাসী এবং শেষাংশে ইংরেজীর দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার *The Canterbury Tales*-এ ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার সার্থক সমন্বয় ঘটিল এবং ইংরেজী কাব্য নাগরিক, শিল্পগুণান্বিত, বাস্তবধর্মী ও পরিহাসমুখর বৈচিত্র্য অবলম্বন করিল। ল্যাংল্যাণ্ড ও চসার সমসাময়িক। কৃষাণকবি ল্যাংল্যাণ্ডের *Vision Concerning Piers the Plowman* কাব্য হিসাবে চসারের কাব্যের অনেক নিম্নে, কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ ইংরেজের মনোভাবটি যথার্থ প্রকাশ পাইয়াছে। নাগরিক চসারের সাহিত্যে

নাগরিক মনোভাব ও ফরাসী প্রভাব স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু ল্যাংল্যাণ্ড কবি হিসাবে বিশেষ প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার মধ্যে খাঁটি ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে কবি গাওয়ারের অনেকগুলি গ্রন্থ (*Speculum Meditantis or Miroir de l' Homme, Confessio Amantis*) রচিত হয়। তিনি উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। নীতি ও সমাজের অত্যধিক প্রভাবই তাঁহার কাব্যের ব্যর্থতার কারণ। 'গোলাপের যুদ্ধে'র ফলে তদানীন্তন ইংলণ্ডেও শান্তি ছিল না। চসারের মৃত্যুর পর ১৫শ শতাব্দীতে যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চসারকে অনুকরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন নাই। হাওয়েস, অক্লিভ, লিড্গেট—কাহারও বিশেষ কবিপ্রতিভা ছিল না। সমস্ত ১৫শ শতাব্দীটাই ইংরেজী সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগ বলিয়া অভিহিত হয়। কারণ চসারের পর এই শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিভার উদয় হয় নাই। অবশ্য এই সময়ে স্কটলণ্ডের ব্যালাডগুলিতে কিছু কাব্যাস্বাদ পাওয়া যায়। এই যুগে ইংরেজী ভাষায় লিখিত ব্যালাডগুলিও (যথা—*Chevy Chase. Nut-brown Maid* প্রভৃতি) নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। ১৪৭৬ খ্রীঃ অব্দে ক্যাক্স্টন ওয়েস্টমিনিস্টারে সর্বপ্রথম ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; তাঁহার ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহু গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। রেনেসাঁসের বড় অস্ত্র এই মুদ্রাযন্ত্র; ইংলণ্ডে রেনেসাঁস ও মুদ্রাযন্ত্র প্রায় সমকালে আবির্ভূত হয়।

১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে ইংরেজী গদ্যের ব্যবহার থাকিলেও বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল না। বস্তুতঃ ১৫শ শতাব্দীতে রচিত ইংরেজী গদ্যগ্রন্থের সংখ্যাও অধিক নহে, তাহার কোন গুণগত বৈশিষ্ট্যও নাই। বরং ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত উইক্লিফের বাইবেলের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরাজী ও লাতিনে পোপকে আক্রমণ করিয়া ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে অনেক প্রচারপুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার গদ্যের শ্রীসৌষ্ঠব বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। সে যাহা হউক, ১৫শ শতাব্দীতে ক্যাক্স্টনের মুদ্রাযন্ত্র হইতে অনেক গদ্যগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। তথাপি ১৫শ শতাব্দীর ইংরাজী গদ্যসাহিত্য কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে বরং নাটকাদি কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে। গির্জার প্রাঙ্গণে ধর্মযাজকদের চেষ্টায় মিরাক্ল্ ও মরালিটি নাটকসমূহ অভিনীত হইত। এগুলি প্রধানতঃ ধর্মজগতের নাটক, এবং সে যুগে নাটক ধর্মেরই অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু পরে নাটকাভিনয়ে সাধারণে যোগ দিলে পাদ্রীসম্প্রদায়

নাট্যাভিনয় পরিত্যাগ করিয়া শুধু নাট্যগ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত রহিলেন। ১২শ-১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ধর্মীয় নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় হেনরীর (১২১৬—৭২ খ্রীঃ অঃ) সময়ে ইংরেজী ভাষায় প্রথম নাটক অভিনীত হইয়াছিল। যাহা হউক, খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত নাটকাভিনয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বিরাজ করিত।

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সমকালীন বাংলা সাহিত্যের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই যুগের বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক; ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজসমাজে নানাপ্রকার ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিলেও কবিগণ ধর্মকেই একমাত্র বক্তব্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যাপতির মার্জিত রচনার সহিত চসারের রচনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্যও খুব নিবিড় নহে। কিন্তু আর-এক দিকে উভয় সাহিত্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যেই ইংরাজ-সংস্কৃতিতে লাতিন প্রভাব হ্রাস পাইয়া যাইতেছিল এবং ইংরেজী ভাষা স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করিতেছিল। বাঙলা দেশেও খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে বাংলা ভাষা, বিদ্বজ্জনের নিকট না হউক, সাধারণ শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিল। অবশ্য তখনও বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতি প্রচলিত হয় নাই, মুদ্রাযন্ত্র তো দূরের কথা। ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙলা দেশে শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাংলা মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খ্রীঃ ১৫শ হইতে ১৮শ শতাব্দী, এই তিন শত বৎসরের মধ্যে ইংরেজী গদ্য সর্বকর্মক্ষম সাহিত্যভাষায় পরিণত হইয়াছে, আর বাংলা গদ্য ১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যে শুধু চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের মধ্যে বন্দী হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে বাংলা নাটকের দৃষ্টান্ত পাওয়া না গেলেও ইংলণ্ডের মিরাক্‌ল্ ও মরালিটি নাটকের অনুরূপ যাত্রা, ঝুমুর প্রভৃতি নাট্যশ্রেণীর লোকাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৫শ শতাব্দীর পরে ইংরেজী সাহিত্যে রেনেসাঁসের আশীর্বাদ বর্ষিত হইল; ঠিক তেমনি বাঙলা দেশেও চৈতন্যাবির্ভাবের ফলে ১৬শ শতাব্দী হইতে জীবন, সাধনা ও সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত হইল।

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য কোন কোন দিক হইতে ইংরেজী সাহিত্য অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গীতিকবিতা, নাটক, ইতিহাস

ও গদ্য উপন্যাস এই দুই শতাব্দীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'শতবর্ষ'-ব্যাপী (খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ) যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, যাহার ফলে এই সময়ে ফরাসী সাহিত্য বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে Francois Villon ব্যতীত অন্য কাহারও গীতিকাব্য কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নহে। কৃত্রিম বন্ধনের ফলে 'ক্রবেদুর'-দের কবিতা ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ হারাইয়া ফেলিল। এমন কি একদল কবি নীতিনিয়মের সুকঠোর বন্ধনকে গীতি-কবিতায় অবতারিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহারা *Grands Rhetoriqueurs* নামে পরিচিত। ইহাদের নেতৃস্থানীয় Chastellain কৃত্রিম কলাকৌশল ও আলঙ্কারিকতার বাহুল্যে গীতিকবিতার স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল Villon-এর প্রধান কাব্যগুলি (*Petit Testament*, *Grand Testament* এবং *Ballade des Dames du Temps jadis*) গীতিরস ও বাস্তব চেতনার সংমিশ্রণে অপরূপ মাধুর্য সৃষ্টি করিয়াছে।

কাব্য বাদ দিলেও ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে ফরাসী গদ্য এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, ইহাতে কিছু কিছু ইতিহাসও রচিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার পূর্বে ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে ফরাসী যাজকসম্প্রদায় লাতিন ভাষার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে Villehardouin-এর *Conquet de Constantinople* (1207) ফরাসী গদ্যে রচিত প্রথম ইতিহাস। তাঁহার পরেও Jean de Joinville, Foissart, Philipple de Commines প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ফরাসী গদ্যে নানা শ্রেণীর ইতিহাস রচনা করেন। ইহাদের গ্রন্থগুলি ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। শুধু ইতিহাস নহে, ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী গদ্যে উপন্যাসের অনুরূপ কিছু কিছু গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। Antoine de la Sab-এর *Le Palit Jehan de Saintre* নামক কাহিনীতে কিছু প্রাচীন বীরপ্রভাব থাকিলেও ইহা যে উপন্যাসের পূর্বসূচনা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে গদ্যে শুধু বীররসাশ্রিত রোমান্সই রচিত হইল না, সমাজজীবনকে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু কিছু বাস্তবধর্মী আখ্যানও গদ্যে রচিত হইয়াছিল। *Les Quinze Joyes de Mariage*, *Les cent Nouvelles Nouvelles* প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক গদ্যকাহিনী ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

নাটক প্রসঙ্গেও দেখা যাইবে যে, ১২শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে ফরাসী দেশেও

গির্জাপ্রাঙ্গণে ধর্মসংক্রান্ত অনেক নাটক অভিনীত হইত। অবশ্য শুধু ধর্মীয় নাটক নহে, কদাচিৎ ধর্মবহির্ভূত নাটকও গির্জায় অভিনীত হইত—যেমন ট্রয় অবরোধ। ক্রমে ধর্মীয় নাটকে জাগতিক ব্যাপার অনুপ্রবেশ করিল, যাহার ফলে Parlement de Paris হইতে গির্জায় নাটকাভিনয় বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই ধর্মীয় নাটকের সহিত বাস্তব জীবন অবলম্বনে অনেক কমেডিও অভিনীত হইত। Adam de la Halle-এর *Jeu de la feuille* (1262) এবং *Robin et Marion* (1285) বাস্তব জীবন অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল। হাস্যরসাত্মক নাটকাভিনয়ের জন্য ফরাসী দেশে ১৫শ শতাব্দী হইতেই অনেক নাট্যপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোন-এক অজ্ঞাতনামা লেখকরচিত রঙ্গনাট্য *L' Avcoat Patelin* (1470) শুধু ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতেই নহে, ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া ইহা ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

ফরাসী সাহিত্যের সহিত উল্লিখিত পর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনা কবিলে দেখা যাইবে যে, তখনও বাংলা ভাষায় নাটক রচিত হয় নাই, গদ্যে ইতিহাস বচনার কথা তখন কেহ ভাবিতেই পারিত না। তবে জনসাধারণের মধ্যে পূজাপার্বণে লোকাভিনয় প্রচলিত ছিল। অবশ্য ফরাসী সাহিত্যের কমেডি ও রঙ্গনাট্য এই যুগের বাংলা সাহিত্যে আশা করা যায় না। ফরাসী সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত প্রসার ও রচনারীতিগত বৈচিত্র্য ঐ শতাব্দীতে য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না—বাঙলার তো কথাই নাই।

ইতিপূর্বে[১] আমরা দেখিয়াছি যে, খ্রীষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে জার্মানীতে বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অতিশয় প্রচারলাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত কাব্যকাহিনী রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হইয়াছিল। ইহার গঠন প্রকৃতি অনেকটা মহাকাব্যের অনুরূপ। ১৪শ, বিশেষতঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে যথার্থ জার্মান সাহিত্যেব বিকাশ আরম্ভ হইল। ১৪শ শতাব্দীতে নাগরিক মনোভাব হইতে কাব্যরচনার উপাদান গৃহীত হইল; কাব্যে নাগরিকতার প্রভাবের ফলে মধ্যযুগীয় নাইটদের কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত মহাকাব্যশ্রেণীর বীরগাথা রচিত হইয়াছিল, কৃত্রিম নাগরিক মনোভাবের প্রভাবে তাহার বীরত্ব ও প্রেমের মহৎ আদর্শ কিছু খর্ব হইতে লাগিল এবং খ্রীষ্টান নীতি ও আদর্শ

১ এই গ্রন্থের ২১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

তদানীন্তন জার্মান কাব্যে একপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদী মরমীয়া আদর্শ স্থাপন করিল। Heinrich Seuse পূর্বতন বীরগণকে খ্রীষ্টানভক্তি ও ধর্মাদর্শের রূপক হিসাবে কাব্যে প্রয়োগ করিলেন। ১৪শ শতাব্দী হইতেই জার্মান সাহিত্যের সীমা সম্প্রসারিত হইল এবং কাব্যে টিউটনিক বীরগাথা এবং গদ্যে ইতিহাস রচিত হইল। ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে দুইটি মত প্রধান হইয়াছিল—একটি *Meistergesang* এবং অপরটি *Gesellschaftslied* নামে পরিচিত। প্রথমটিতে ধর্ম ও চরিত্রনীতি এবং কাব্যরচনার নানারূপ কলাকৌশল প্রাধান্য লাভ করিল, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে রচনারীতির সুকঠোর নিয়মানুগত্য হ্রাস পাইল এবং মার্জিত নাগরিক মনোভাব যথাযোগ্য স্থান করিয়া লইল। কালক্রমে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই জনপ্রিয়তার দ্বারা অভ্যর্থিত হইল।

এই শতকে জার্মান গদ্যের কথাও উল্লেখযোগ্য। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে জার্মান গদ্যে অনেক রোমান্টিক গল্প ও ভ্রমণকাহিনী জনপ্রিয় হইয়াছিল। *Tyll Eulenspiegel, Dr Faust, Die Schildburger* প্রভৃতি গদ্যগল্প এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। ১৩শ শতাব্দী হইতে জার্মান গদ্যে আইন রচনা শুরু হইয়াছিল। *Sachsenspiegel* এবং *Schwabenspiegel* নামক দুইখানি আইনগ্রন্থ ১৩শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত লাতিন ভাষা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত থাকিলেও ক্রমে ক্রমে জার্মান গদ্য প্রাধান্য লাভ করিল। ১৬শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিলে জার্মানীতে যেমন ধর্মসংস্কার আরম্ভ হইল, তেমনি লাতিন ভাষার স্থলে জার্মান ভাষা জনসাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিল।

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে একই সঙ্গে রাজসভাজীবী নাগরিক মহাকাব্য, প্রেমকাব্য এবং দেশপ্রেমমূলক ব্যালাড (*Volks lieder*) রচিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, কাব্যাদর্শ কি হইবে, তাহা লইয়া দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষও দেখা দিত। বিশেষতঃ এক দিকে গল্পকাহিনীতে, আর-এক দিকে ইতিহাস, আইনগ্রন্থ বিতর্ক প্রভৃতিতে গদ্যভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুই শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের এরূপ কোন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না। শুধু একটি সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য: জার্মানীতে যেমন লাতিন ভাষার স্থলে জার্মান ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিতেছিল, তেমনি বাঙলা দেশেও ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে--সংস্কৃত গ্রন্থাদি

রচিত হইলেও বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে বাঙালীর সাহিত্য হিসাবে প্রাধান্য পাইতেছিল। মার্টিন লুথার ১৬শ শতাব্দীতে যেমন জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া যুগবিপ্লবের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ঐ একই শতাব্দীতে চৈতন্যপ্রভাবে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে নূতন ভাবের প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল। বলিতে গেলে ১৬শ শতাব্দী হইতে সমগ্র য়ুরোপের জীবনবাণী শতকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইল; সেইরূপ বাঙলা দেশেও নবজীবনকেন্দ্রিক আর-এক প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি হইল। তবে তাহা মার্টিন লুথারের যৌক্তিক জ্ঞানবাদ নহে, চৈতন্যদেবের অনুরাগমূলক প্রেমভক্তিই পরবর্তী কালের বাঙালীর মানসজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সহিত ভারতে প্রাদেশিক সাহিত্য-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা ও পরিবেশ কিয়দংশে পৃথক হইলেও তাহাদের ভাবাবেগের সারস্বত অন্তঃপ্রবাহ প্রায় একই প্রকার। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উৎসমূল যাহাই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন আছে।

হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগেই (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী) ভক্তিশাখার যথার্থ সূচনা হয়। কিন্তু ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের বিশেষ কোন বিকাশধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে না। মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর প্রভৃতি ভক্তকবিগণের পদ ও দোঁহা ১৫শ শতকের শেষে, বিশেষতঃ ১৬শ শতাব্দীতে জনপ্রিয় হইয়াছিল—তখন উত্তরাপথের অন্যান্য প্রদেশেও ভক্তিসাহিত্যের রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইসলামের আক্রমণ, পরাক্রম ও ধর্মীয় উগ্রতার ফলেই বোধহয় খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে ভারতে ভক্তিধর্ম গণমানসে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; সেই প্রভাব ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে প্রবল আবেগের পাবনী ধারা রূপে প্রবাহিত হইল। ১৪শ শতাব্দীতে আবির্ভূত আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২০ খ্রীঃ অঃ) পুরাতন হিন্দীতে কবিতা রচনা

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এইরূপ হিন্দী কবিতার বিশেষ কোন নিদর্শন এখনও হস্তগত হয় নাই। সুতরাং ১৪শ শতাব্দীতে রচিত হিন্দী সাহিত্যের দৃষ্টান্ত নিঃসংশয়রূপে দেওয়া দুরূহ। উপরন্তু আমীর খসরু দক্ষিণভারতে বসিয়া কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—উত্তরভারতে নহে। সে যাহা হউক, হিন্দী সাহিত্য ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বিশেষ সৃষ্টিশীল না হইলেও মৈথিলী সাহিত্য এই দুই শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে—এখানে তাঁহার সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার ঈষৎ পূর্ববর্তী জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণনরত্নাকর' অনেকটা কোষগ্রন্থজাতীয় হইলেও ইহাতে মৈথিলী গদ্যের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইবে। উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাত-হরণ' নামক সংস্কৃত-প্রাকৃত নাটকে ২১টি মৈথিলী গান পাওয়া গিয়াছে যাহা কোন কোন দিক দিয়া বিদ্যাপতির সমকক্ষতা করিতে পারে। তাঁহার পরবর্তী কালে আবির্ভূত বিদ্যাপতি এই মৈথিলী গানের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়া দিলে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে মৈথিলী সাহিত্যে এমন কিছুই রচিত হয় নাই যাহা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সহিত সমতুলিত হইতে পারে বরং ১৬শ শতাব্দীতে ভারতীয় জীবন ও সাহিত্যে 'সগুণভক্তিশাখা' প্রাধান্য লাভ করিলে বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ অনেক দোঁহা হিন্দী ও অন্যান্য সাহিত্যে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যের তুলনায় যে অধিকতর শক্তিশালী ও সুপরিসর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৫শ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্যে যৎসামান্য ঐতিহাসিক কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে রচিত 'কাহ্নদদে প্রবন্ধ' নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে আলাউদ্দিন কর্তৃক ঝালোর অবরোধ ও গুজরাটের পতন বর্ণিত হইয়াছে। গুজরাট মুসলমানের দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিজিত হইলে কবিসম্প্রদায় রাজ-আশ্রয়চ্যুত হইয়া কোনপ্রকারে ক্ষত্রিয় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন। এইরূপ অধঃপতন ও জাতিগত নৈরাশ্যের যুগে আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিবাদের উৎপত্তি হয়; গুজরাটী সাহিত্যে ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে নরসিং মেটা ও মীরাবাঈ-এর ভজনগান ভক্তিসাধনার প্রধান উপাদান রূপে গুজরাটে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মীরাবাঈ সারা ভারতেই কৃষ্ণসাধিকারূপে পূজিত

হইয়াছিলেন। তাঁহার ভজনাবলী ১৬শ শতাব্দীতেই অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। নরসিং মেটার ভজন আধুনিক গুজরাটেও অতিশয় প্রচলিত। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনাসভায় নরসিং-এর 'বৈষ্ণব জনতো' ভজনটি প্রায় নিত্য ব্যবহার করিতেন। ১৬শ শতাব্দী হইতে গুজরাটে ভক্তিপন্থার প্রবলতা অনুভূত হয়, এবং সে ভক্তির অনেকটাই বৈষ্ণবভক্তি। অবশ্য ১৫শ শতাব্দীতে গুজরাটী সাহিত্যে ব্যালাড ধরনের প্রেম ও বীরত্বপূর্ণ অনেক লোকগাথা গায়ক ও কথকদের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। ' ১৭শ শতাব্দীর কবি সামল ভট্ট এইরূপ লোকগাথাকে রোমান্টিক আখ্যায়িকার আকারে নূতন রূপ দিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কিছু কিছু পুরাণজাতীয় রচনাও জনপ্রিয় হইযাছিল। মুসলমানের দ্বারা গুজরাট অধিকৃত হইলে বোধহয় পুরাণ সংরক্ষণ, বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ প্রচার প্রভৃতির দিকে কবি ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে 'কাহ্নদদে প্রবন্ধে'র মতো ঐতিহাসিক মহাকাব্য পাওয়া যায় না। মধ্যযুগীয় ভারতেব অন্যান্য সাহিত্যে ঐতিহাসিক রচনা জনসাধারণেব চিত্ত আকর্ষণ করিযাছিল, কিন্তু বাঙালী বৈষ্ণব সাহিত্য, পুরাণ, মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের ছায়াতল ছাড়িয়া ইতিহাসের বীররসোজ্জ্বল প্রান্তরে মিলিত হইতে পারে নাই। বর্গীর হাঙ্গামার মতো একটা ভয়ানক উৎপাতও কোন প্রথম শ্রেণীব বাঙালী কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে পারে নাই, গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিৎকর। ১৮শ শতাব্দীর ওড়িয়া কবি ঢেন্‌কানল-নিবাসী ব্রজনাথ বদজেনাব 'সমর তরঙ্গ' বর্গীর হাঙ্গামা অবলম্বনেই রচিত; এইরূপ বীররসাত্মক স্বাদেশিক ঐতিহাসিক কাব্য মধ্যযুগীয বাংলা সাহিত্যেব কোথাও মিলিবে না। কিন্তু এক বিষযে গুজরাটী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সহিত্যের জাতিগত যোগ দেখা যাইতেছে। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে পুরাণকেন্দ্রিক ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায; বাঙলা দেশেও ১৫ শতাব্দীর দ্বিতয়ার্ধে, বিশেষতঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে অনুরূপ ভক্তিবাদ ও পুবাণানুকরণ পরিলক্ষিত হয়। তবে বড়ুচণ্ডীদাস বা কৃত্তিবাসের মতো প্রতিভাবান কবি তখনও গুজরাটী সাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই।

জ্ঞানেশ্বর-নামদেবের পর ১৪শ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মারাঠী সাহিত্যের দুর্দিন—যখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্ব সার্থকভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ১৬শ শতাব্দীর পূর্বেই মারাঠী গদ্যে মহিমভট্টের 'লীলাচরিত্র' রচিত হইয়াছিল। বাংলা গদ্য সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে

ইহার অন্তত: তিন শত বৎসর পরে। ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাষ্ট্রের 'দত্তাত্রেয়' নামক গীতাবাদী ভক্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়; সরস্বতী গঙ্গাধর, দশোপান্ত প্রভৃতি ভক্তগণ এই সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করেন এবং অদ্যাপি মহারাষ্ট্রে এই মতের প্রভাব বর্তমান আছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের রচনাদি ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে প্রচারিত হয় নাই। ১৬শ শতাব্দীর একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ) লোক-শিক্ষাপ্রচারে রামায়ণ ও ভাগবতের প্রভাব স্বীকার করেন এবং তাঁহার দ্বারা ১৬শ শতাব্দী হইতে মারাঠী সাহিত্যে নূতনত্বের সূচনা হয়। ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই দিক দিয়া মারাঠী সাহিত্য অপেক্ষা অনেকটা অগ্রবর্তী।

বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে ওড়িয়া ও আসামী সাহিত্যের সহিত সমকালের বাংলা সাহিত্যের তুলনা চলিতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, ১৪শ শতাব্দীতে সারলদাসের মহাভারত হইতেই মধ্যযুগীয় ওড়িয়া সাহিত্যের যথার্থ আরম্ভ হইয়াছে। কৃষাণপরিবারে আবির্ভূত, শিক্ষাসংস্কৃতিতে অনগ্রসর সারলদাস সরল ওড়িয়া ভাষায় মহাভারতকে এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে, এখনও ওড়িয়া সাহিত্যে তাঁহার স্থান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তিনি বোধহয় সংস্কৃত ভাষার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন না; তাই মূল মহাভারতের অনেক কিছুই তাঁহার কাব্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তবে তিনি সাধারণ উড়িষ্যাবাসীর অন্তরের খবর জানিতেন বলিয়া এই মহাভারত মূল হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়াও ওড়িয়া জাতির অন্তরকে এমনভাবে আপনার করিয়া লইয়াছিল। হয়তো তাঁহার রচনায় ততটা সৌকুমার্য নাই, অনেক সময় অজ্ঞতার জন্য তিনি মূল মহাভারকে যথেচ্ছা পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন, তবু ইহাতে সমগ্র উড়িষ্যার ভূপ্রকৃতি ও জনজীবনের ছায়া পড়িয়াছে। বাঙলার কৃত্তিবাস সারলদাস অপেক্ষা শিক্ষিত ও আভিজাত্যগর্বিত ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণসাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল, বিশুদ্ধ কবিত্ববিচারে কৃত্তিবাস সারলদাস অপেক্ষা নিশ্চয় অধিকতর প্রশংসা পাইবেন। সারলদাসের প্রায় এক শতাব্দী পরে খ্রীঃ ১৫শ শতকে আরও পাঁচজন কবি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি অবলম্বনে ওড়িয়া সাহিত্যকে আরও প্রসারিত করেন। ইঁহারা ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'পঞ্চসখা' নামে পরিচিত—বলরামদাস, জগন্নাথদাস, অনন্তদাস, যশোবন্তদাস ও অচ্যুতানন্দদাস। ইঁহাদের মধ্যে বলরামদাসের রামায়ণ ও জগন্নাথদাসের ভাগবত বর্তমান যুগেও উড়িষ্যার সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থরূপে প্রচারিত। বলরামদাস ও জগন্নাথদাস এবং অন্য তিন জন কবি সংস্কৃত

মহাকাব্য ও পুরাণসংহিতাকে সরল ওড়িয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন। জগন্নাথের ভাগবতের রচনামাধুর্য ও কবিত্বগুণ সারলদাস অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয়। ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহারা তিরোহিত হইলে ১৬শ শতাব্দী হইতে ওড়িয়া সাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যরীতি ও কৃত্রিম কাব্যকলা প্রাধান্য অর্জন করে। এখানে লক্ষণীয় যে ১৫শ শতাব্দীতেই ওড়িয়া সাহিত্যে পুরাণীকরণ অনেকটা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস যেমন মূল রামায়ণের সহিত অনেক স্থানীয় বর্ণনা ও স্বকপোলকল্পিত ঘটনা যোগ করিয়া দিয়াছিলেন, ১৫শ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যেও তেমনি সেই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আসামী সাহিত্য বিচিত্র ঐশ্বর্যমণ্ডিত না হইলেও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সহিত সমতুলিত হইতে পারে। এই শতাব্দীর আসামী সাহিত্যে এক দিকে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের অনুবাদ এবং অন্য দিকে লোকগাথা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শঙ্করদেবের আবিভাব হইলে আসামে বৈষ্ণব ধর্ম ও মতবাদ সুপ্রচার লাভ করে। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আসামী সাহিত্য ও জনমানসে একপ্রকার ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা প্রধানতঃ পুরাণকেন্দ্রিক। শঙ্করদেব-প্রচারিত তত্ত্বের সহিত তাহার পার্থক্য আছে। মাধবকন্দলীর (খ্রীঃ ১৪শ-১৫ শতাব্দী) রামায়ণ শঙ্করদেবের পূর্বে আসামে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্য ইহার আদি ও উত্তরাকাণ্ড পাওয়া যায় নাই, বোধহয় অহোম ও কাছাড়ী সংঘর্ষের সময়ে এই অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মাধবকন্দলীও কৃত্তিবাসের মতো ভক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে রামকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন এবং রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে একপ্রকার লোকগাথা সঙ্গীতের আকারে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। পুরাণ বা মহাকাব্যের কোন রোমান্টিক আখ্যায়িকাকে সঙ্গীতের আকারে রচনা করিয়া এই যুগের তিন জন কবি—দুর্গাবর ('গীতিরামায়ণ'), পীতাম্বর ('উষাপরিণয়') ও মানকর ('বেহুলা-লখিন্দর') পৌরাণিক ঘটনাকে আদিরসের দ্বারা জনপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধ হইতে আসামে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রাধান্য সূচিত হয়। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও প্রচারক শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৯ খ্রীঃ অঃ) বাঙলা দেশের চৈতন্যের সহিত তুলনীয়। শঙ্করদেব শুধু আসামে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন নাই; তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন করিয়া এবং

তদানীন্তন ভারতের ভক্তসাধকদের সহিত পরিচিত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। বলিতে গেলে তিনিই সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেন। তিনি ভক্তিধর্মপ্রচারক নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া দুর্বল আসামী সাহিত্যকে একক চেষ্টার দ্বারা নবজীবনরসে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। শঙ্করদেবের ভাগবতপুরাণ, রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), রুক্মিণীহরণকাব্য, ভক্তিরত্নাকর (সংস্কৃত) এবং 'কীর্তনঘোষা' মধ্যযুগীয় আসামী সাহিত্যের সুবিখ্যাত গ্রন্থ। তন্মধ্যে 'কীর্তনঘোষা' নামক সঙ্কলন গ্রন্থটি আসামী সাহিত্যের সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের মতো তিনিও আসামে 'নামকীর্তন' প্রচার করেন। তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রধানতঃ ১৬শ শতাব্দীতেই অনুভূত হইয়াছিল।

আসামী সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বুঝা যাইতেছে যে, খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। পুরাণের প্রভাবই এই যুগের আসামী সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ এবং শঙ্করদেবের পূর্বে আসামী সাহিত্যেও একপ্রকার ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল ; ইহার সহিত কৃত্তিবাস ও মালাধর বসুর গ্রন্থে প্রকাশিত ভক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ১৬শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যেমন বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী জাতির জীবনে নব ভাবের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ আসামী সাহিত্যেও ১৬শ শতাব্দীর কিছু পূর্বে শঙ্করদেবের প্রভাবের অনুরূপ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছিল।

যাহা হউক, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ-লক্ষণে পার্থক্য থাকিলেও সামান্য-লক্ষণে কোথাও নিবিড় সাদৃশ্য, কোথাও-বা সামান্য সাদৃশ্যের আভাস পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় ভারতে এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের স্থানিক ব্যবধান থাকিলেও ভাবের দিক দিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধন দৃষ্টিগোচর হইবে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

সংযোজন

চর্যাপদ সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার

সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় লণ্ডন হইতে চর্যাপদ সম্বন্ধে চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হইলে শুধু চর্যাপদ নহে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাঙলা দেশ, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নূতন উপাদান লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইবে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' বিভাগের সংস্কৃতশাখার রীডার মিঃ আরনল্ড বাকে ডঃ দাশগুপ্তকে চর্য্যাপদ সম্বন্ধে এই নূতন তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করিযাছেন। অধ্যাপক বাকে প্রাচ্য সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ। গত ১৯৫৫ সালে পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহের নেশায় তিনি যখন নেপাল পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বৌদ্ধ বজ্রযানী শাখাভুক্ত এক নেপালী সন্ন্যাসীর নিকট কয়েকটি বিচিত্র সঙ্গীত শুনিয়া তিনি কৌতূহলের বশে তাহা 'টেপ রেকর্ড' করিয়া লন। এবার (১৯৫৫) ডঃ দাশগুপ্ত লণ্ডনে গেলে অধ্যাপক বাকে তাঁহাকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন, এগুলি বোধ হয় কোনও প্রকার লোকসঙ্গীত। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্তোত্রগীতির অনেকগুলির সঙ্গে বাংলা চর্যাপদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক বাকের নিকট ডঃ দাশগুপ্ত এইরূপ ২২টি পদের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাঁচটিতে চর্যার ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি আছে।

প্রাপ্ত গানগুলি মূলতঃ বজ্রযানপন্থী সাধকদের সাধনগীতিকা হইলেও ইহাতে শাক্ততন্ত্রের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। বজ্রবারাহী, বাশুলী প্রভৃতি দেবীর নানা বর্ণনা ও বন্দনাসূচকও অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে বাঙলাদেশে যে শাক্ত সাহিত্যের বিকাশ হয়, তাহার পূর্ব সূচনা এই বজ্রগীতিকাগুলিতে পাওয়া যাইবে। এখানে ডঃ দাশগুপ্ত সংগৃহীত এইরূপ একটি বজ্রগীতিকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

রাগ—ভৈরবী। তাল—শনি

এ মহিমণ্ডল হেরু সমুদ্রা
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দ্রা।
প্রেখুরে অমুম্মিন্ লোয়ন গয়নে
ফুল্ল পরিহাসই জিনগুণ লায়া ॥ ধ্রু ॥
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয়া বিষয় সর্ব একা
সমুদ্র তরঙ্গ জিম একু অনেকা।
পবন ছুয়ি ভেদিয়া দৃঢ় থিরে চিয়া
জ্বলয়ি বজ্রানল দহদিহ কাহা।
সুগত ভণি ভাবয়িয়া না হোয়িরে স্বধা
সুগত বজ্র ভণযিয়া অচিন্তালয় বোধা ॥

পদকার সুগতবজ্রের এই গানটিতে চর্যার ভাববস্তু, রূপকপ্রতীক ও প্রকাশ-রীতির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

নেপালে বৌদ্ধ সমাজে এ গীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 'চা-চা' গীতিকবিতা বলা হয়। ডঃ দাশগুপ্ত ইহার যথার্থ স্বরূপ ধরিতে পারিযাছেন, বাংলা সাহিত্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে তাঁহার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করিবে।

ডঃ দাশগুপ্তের মতে, তথাকথিত 'চা-চা' (চর্যা শব্দের অপভ্রংশ ?) গানের অন্তর্ভুক্ত এই বজ্র গীতিকাগুলি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতা অপেক্ষা প্রাচীন চর্যাপদের অধিকতর নিকটবর্তী। এই অঞ্চলে সন্ধান করিলে হয়তো বাংলা ভাষার ইতিহাস সংক্রান্ত আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

নির্ঘণ্ট